উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিশোধিত পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত।

রচনাবীথি

* বাঙলা প্রথমপত্রের ব্যাকরণ * বাঙলা দ্বিতীয়পত্রের ব্যাকরণ * অলঙ্কার * নির্ধারিত সমস্ত উপপাঠ্য গ্রন্থের ভাবসম্প্রসারণ * সারসংক্ষেপ * ভাবার্থলিখন * প্রবন্ধ-রচনা * বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত।

শ্রীকৃষ্ণপদ গোস্বামী এম.এ, পি. আর এস, ডি-ফিল.
গ্রিফিথ পুরস্কার প্রাপ্ত, আশুতোষ ও মোয়াট স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এবং রীডার, বাঙলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়; আদি-মধ্যযুগের বাঙলা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ প্রণেতা।


ভারতী ভবন  পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৯৩, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ
১৯৩, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৬০

[redacted]াকর : রমেন্দ্রচন্দ্র রায়
[redacted]ট্ স্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

SYLLABUS

30 Marks

ক। ভূমিকা-প্রকরণ—

ভাষা—সাধু ও প্রচলিত ভাষা।

খ। বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ—

(১) বর্ণের শ্রেণীবিভাগ : বাঙলা স্বর-ব্যঞ্জনের ও যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি, বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি, ধ্বনি বিলোপ ইত্যাদি।

(২) সন্ধি : বাঙলা ভাষার সন্ধির বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃত সন্ধির সঙ্গে পার্থক্য : স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গসন্ধির পূর্ণ আলোচনা।

(৩) ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান।

গ। পদ-প্রকরণ—

(১) পদের প্রকারভেদ : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়।

(২) লিঙ্গঃ স্ত্রী-প্রত্যয় (সংস্কৃত ও বাঙলা), লিঙ্গ পরিবর্তন।

(৩) বচন।

(৪) পুরুষ।

(৫) কারক ও তাহার বিভক্তি : অনুসর্গ : কারক ও অন্যপ্রকার বিভক্তি।

(৬) বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ : সংখ্যা ও পূরণবাচক বিশেষণ।

(৭) বিশেষণের তারতম্য।

(৮) ক্রিয়াপদ : ধাতু ও প্রত্যয়—মৌলিক ধাতু, প্রযোজক ধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু নামধাতু, সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ক্রিয়া, মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ারূপ।

(৯) অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ।

(১০) সমাস : আলোচনায় একশেষ দ্বন্দ্ব, অবিগ্রহ সমাস, স্বপদবিগ্রহ ও অস্বপদ-বিগ্রহ সমাস, প্রাদি সমাস, কু-তৎপুরুষ এবং সুপ্‌সুপা সমাস বর্জনীয়।

ঘ। শব্দ-প্রকরণ—

(১) শব্দ ও পদের পার্থক্য।

(২) বাঙলা শব্দ-সম্ভার : তৎসম ও তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী ও বিদেশী শব্দ : ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত।

৩) কৃৎ-প্রত্যয় :

সংস্কৃত কৃৎ—তব্য, অনীয়, যৎ, শতৃ, শানচ্, ক্ত, ক্তি, ণক, তৃচ্। অন—বাচ্য : ইষ্ণু, ক্বিপ্, আলু ইত্যাদি প্রধান প্রধান প্রত্যয় ও অ-প্রত্যয় (অচ্, অণ্, অপ্, অস্, ক, কঙ্, খঙ্, খচ্, খশ্, ঘঞ্, ট, ড, শ, ইত্যাদি সংস্কৃত প্রত্যয়গুলির অ ছাড়া বাকী অংশ ইৎ যায়, অতএব বাঙলায় শুধু অ প্রত্যয় বলিলেই চলিবে)।

বাঙলা কৃৎ—অন, অন্ত, আ, আনো, না, আনি, ই, উ, তি, উয়া, ইয়া, ত্যা, দি।

৪) তদ্ধিত প্রত্যয় :

সংস্কৃত—অ (ষ্ণ), ই(ষ্ণি), য(ষ্ণ্য), এয় (ষ্ণেয়), ঈয় (ষ্ণীয়), ঈন, ইক, ইত, ইল, ইন্, বিন্, ঈয়স্, ইষ্ঠ, তর, তম, ময়, মতুপ্, তন, তা, ত্ব, ইমন্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রত্যয়।

বাঙলা তদ্ধিত—ই, ঈ, ইয়া, উয়া, আ, আই, আনি, আলো, আনা, পনা, আলি গিরি, আরি (রী), দার, ইয়াল, ওয়ালা ইত্যাদি প্রধান প্রধান প্রত্যয়।

৫) উপসর্গ—অর্থ পরিবর্তন ও নূতন শব্দগঠন (বিস্তারিত আলোচনা)।

৬। বাক্য-প্রকরণ—

বাক্যের প্রকার ভেদ, সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য। বাক্যান্তরীকরণ—বিভিন্ন ধরণের বাক্য (অস্ত্যর্থক, নাস্ত্যর্থক, নির্দেশক, প্রশ্নবোধক ইত্যাদি) ও তাহাদের রূপান্তর সাধন।

বাচ্য : বাচ্য-পরিবর্তন।

শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ (Idiomatic use of words and phrases): প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগ্ধারা (Idiom and proverbs)—বিস্তারিত আলোচনা।

অলংকার—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ব্যতিরেক ও সমাসোক্তি।

REVISED SYLLABUS

Paper 1. Questions on Composition Grammar arising out of the detailed study of the prescribed texts. 30
(more attention should be paid to the idiomatic use of words and phrases. Questions may also include filling up of gaps both in prose and poetry.)

Paper II. 100 Marks.

(1)	Grammar and Composition	25
(2)	Rhetoric (অলংকার)	5
(3)	Essay Writing	20
(4)	History of Literature	20

প্রথম খণ্ড—১। বাঙলা ভাষার উদ্ভব। ২। মঙ্গলকাব্য—(ক) মনসামঙ্গল (খ) চণ্ডীমঙ্গল (গ) ধর্মমঙ্গল। ৩। রামায়ণ ও মহাভারত। ৪। চৈতন্যের জীবন ও জীবনী। ৫। গীতি সাহিত্য (ক) বৈষ্ণব পদাবলী (খ) শাক্তপদাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ড—১। বাঙলা গদ্যের অনুশীলন—(ক) ইউরোপীয় মিশনারী ও বাঙলা গদ্য। (খ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। (গ) রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ২। নাটক ও নাট্যশালা—(ক) কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা। (খ) নাটকরচনার সূত্রপাত। (গ) কয়েকজন নাট্যকারের পরিচয়—দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল। ৩। উপন্যাস ও ছোটগল্প—(ক) বঙ্কিমচন্দ্র (খ) রমেশচন্দ্র দত্ত (গ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ঘ) শরৎচন্দ্র। ৪। কাব্য ও কবিতা—(ক) মধুসূদন (খ) হেমচন্দ্র (গ) নবীনচন্দ্র (ঘ) বিহারীলাল। ৫। রবীন্দ্রনাথ।

(5) Substance (ভাবার্থ), Precis (সারসংক্ষেপ), and/or Amplification (ভাবসম্প্রসারণ) of the extracts from a number of specified books* of prose and verse for non-detailed study.

The texts to be read in classes X & XI will only be included in the final Examination to be conducted by the Board.

Answers to questions on Language subjects must be given in that language unless otherwise specified on the question paper.

*Class IX ১। কুরুপাণ্ডব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত। ২। গল্পে উপনিষৎ—ডঃ সুধীরকুমার দাসগুপ্ত। ৩। গাথাঞ্জলি- কালিদাস রায়।

*Class X ১। রামায়ণী কথা—দীনেশচন্দ্র সেন ২। রাজর্ষি—রবীন্দ্রনাথ ৩। কাব্য-মঞ্জুষা—মোহিতলাল মজুমদার [প্রার্থনা, শ্যামসুন্দর, কালকেতুর বিক্রম, ঈশ্বরী পাটনী, সীতার পঞ্চ-বটী বাস, রামের বিলাপ, কাশীরাম দাস, আত্মবিলাপ, কবির অন্ধদশা, পলাশির যুদ্ধ, মানব-বন্দনা, আষাঢ়, নিস্ফল-উপহার, পূজারিণী, বাসনা, চাষার ঘরে, ছিন্নমুকুল, ভক্তির যুক্তি, হাটে, বাঙ্গালীর সাধ, 'শাত-ইল-আরব', কারায় শরৎ]।

*Class XI ১। সীতার বনবাস—বিদ্যাসাগর (সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ দ্রষ্টব্য) ২। চরিত-কথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (নববিভাকর প্রেস) ১৩২০ (সংস্করণ অথবা 'অনুকূল ভবন' সংস্করণ দ্রষ্টব্য) ৩। কমলাকান্ত—বঙ্কিমচন্দ্র (পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সংস্করণ) ৪। সংকল্প ও স্বদেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র

॥ প্রথম খণ্ড ঃ ব্যাকরণ ॥

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ॥

॥ তৃতীয় খণ্ড ঃ উপপাঠ্য গ্রন্থ ॥

॥ চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রবন্ধ-রচনা ॥

বিষয় | পৃষ্ঠা

...ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ভাষার বিশুদ্ধ রূপ রক্ষা করিবার জন্য সৃষ্টি হয় ব্যাকরণ। ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অশুদ্ধরূপ হইতে শুদ্ধরূপটিকে নির্দেশ করাই ব্যাকরণের কাজ। ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ এই সব কলহ বিচার করিবার জন্য ব্যাকরণ সৃষ্টি করে নানা আইন।

মোটামুটিভাবে আমরা ব্যাকরণের সংজ্ঞা নিম্নরূপ দিতে পারি :

যে শাস্ত্র কোন ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেই ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে শিখায়, তাহা সেই ভাষার **ব্যাকরণ (Grammar)**।

'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে 'বিশ্লেষণ' (বি + আ + কৃ বা কর + অন্, অর্থাৎ 'বিশেষ এবং সম্যক্‌রূপে বিশ্লেষণ করা')।

॥ পঞ্চম খণ্ড : বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥

ভূমিকা

ভাষা ও ব্যাকরণ

ভাষা ঃ জীবকুলে মানুষ শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণস্বরূপ ধরার ধূলিতে সে অনেক স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে এবং রাখিয়া যাইতেছে। ভাষা সৃষ্টিও মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মানব সভ্যতার বিচিত্র প্রকাশ এবং ক্রমোন্নতির মূলে রহিয়াছে ভাষা-শক্তির অপরিমেয় দান। ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের বাহন। তাই ভাব প্রকাশের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই ভাষার উৎপত্তি। জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি মানুষ কণ্ঠে এবং লিপিতে মনের বিচিত্র ভাব নানাভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। কত কথা, কত গান, কত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, রূপলোকের, আনন্দলোকের কত অবিস্মরণীয় চিত্র এবং মাধুর্য এই ভাষার মাধ্যমে এক অপূর্ব ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

ভাষার আশ্চর্য শক্তি ও মানব সভ্যতায় তাহার অবদান সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা চলে। জীবনে চলার পথে পরস্পরের ভাব-বিনিময়ে ভাষার অপরিহার্যতা প্রতিটি মানুষ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়া থাকে।

এখন সেই ভাষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে আমাদের বলিতে হয় ঃ

বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, বাক্যে ব্যবহৃত বোধগম্য শব্দ-সমষ্টিকে **ভাষা** বলে। দেশ-কাল ও সমাজ ভেদে, ভাষার নানারূপ প্রভেদ দেখা যায়।

ব্যাকরণ ঃ আগে ভাষা পরে ব্যাকরণ। যেমন আগে কলহ পরে বিচার। বস্তুতঃ ভাষার স্রষ্টা জনসমাজ। জনসমাজে ভাষার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মধ্যে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। সাধারণের মুখে প্রচলিত ভাষায় বহু অশুদ্ধরূপ দেখা যায়। তখন ভাষায় এই অশুদ্ধি শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন হয়। ভাষার বিশুদ্ধ রূপ রক্ষা করিবার জন্য সৃষ্টি হয় ব্যাকরণ। ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অশুদ্ধরূপ হইতে শুদ্ধরূপটিকে নির্দেশ করাই ব্যাকরণের কাজ। ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ এই সব কলহ বিচার করিবার জন্য ব্যাকরণ সৃষ্টি করে নানা আইন।

মোটামুটিভাবে আমরা ব্যাকরণের সংজ্ঞা নিম্নরূপ দিতে পারি ঃ

যে শাস্ত্র কোন ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেই ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে শিখায়, তাহা সেই ভাষার **ব্যাকরণ (Grammar)**।

'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে 'বিশ্লেষণ' (বি + আ + কৃ বা কর + অন্, অর্থাৎ 'বিশেষ এবং সম্যক্‌রূপে বিশ্লেষণ করা')।

বাঙলা ভাষা ও বাঙলা ব্যাকরণ

পৃথিবীতে যেমন অনেক জাতি, অনেক দেশ তেমনি ভাষাও আছে অনেক। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাষা ও প্রকাশের রীতি আছে। কিন্তু প্রত্যেক ভাষারই ব্যাকরণ সৃষ্টি হইয়াছে একথা বলা চলে না। যে ভাষার ব্যাকরণ সৃষ্টি হয় নাই, সে ভাষার গতিপথ রুদ্ধ। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, সে জাতির সভ্যতাও আধুনিক মানবসভ্যতা হইতে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে সাঁওতাল ভাষার যথার্থ ব্যাকরণ অদ্যাবধি রচিত হয় নাই; সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় সভ্যতার ক্রমোন্নতির পথে তাহারা প্রাগ্রসর হইতে পারে নাই।

আমরা বাঙলা দেশে বাস করি। বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা। সুতরাং বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ জানিবার পূর্বে বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আমাদের জানা প্রয়োজন; জননীর পরিচয় না জানিলে যেমন সন্তানের সুসম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ জানিতে হইলে বাঙলা ভাষার জননী কে, তাহা জানিবারও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আবার মূল হইতে কাণ্ড পর্যন্ত বৃক্ষের শাখা এবং প্রশাখার ক্রমবিস্তার ও ক্রমোন্নতি লক্ষ্য না করিলে যেমন বৃক্ষের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া অসম্ভব, তেমনি ভাষার উৎপত্তি হইতে তাহার ক্রমবিকাশ, বিস্তার এবং উন্নতির পরিচয় রাখারও প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করা হইল।

বাঙলা ভাষার উদ্ভব

অনেকে সংস্কৃত ভাষাকে বঙ্গভাষার জননী বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আর্যগণ ভারতে আসেন। তাঁহাদের ভাষাতেই তখন বেদ রচিত হইয়াছিল। তাই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার আর এক নাম বৈদিক ভাষা (ছন্দস্ বা ছন্দোভাষা)। বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংস্পর্শে আসিয়া কালক্রমে বৈদিক ভাষা পরিবর্তিত হইয়া প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। এই প্রাকৃত ভাষাই তখন কথ্য আকারে সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল।

সংস্কৃত শব্দের অর্থ হইল 'মার্জিত'। মধ্য দেশে বসবাসকারী আর্যগণের কথ্য ভাষার মার্জিত রূপই হইল সংস্কৃত। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। এক সময়ে এই সংস্কৃত ভাষাই ছিল ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন এবং শিক্ষিত লোকের ভাষা। আর প্রাকৃত ভাষা ছিল জনসাধারণের ভাষা। কালক্রমে এই প্রাকৃত ভাষাই আবার রূপান্তরিত হইয়া অপভ্রংশ

ভাষার উৎপত্তি হয়। বাঙলা, হিন্দী, উড়িষা, মারাঠি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ বিভিন্ন অপভ্রংশ ভাষা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। তখন মগধ (বিহার) অঞ্চলে যে অপভ্রংশ ভাষার প্রচলন ছিল তাহা হইতেই **বাঙলা ভাষার উদ্ভব**। তাই প্রকৃতপক্ষে মাগধী অপভ্রংশকেই বাঙলা ভাষার জননী বলা যাইতে পারে।

এই বাঙলা ভাষার প্রথম সাহিত্য-গ্রন্থ রচিত হয় খ্রীষ্টীয় দশম শতকে। স্বর্গতঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থটি নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার হইতে কীটদষ্ট অবস্থায় উদ্ধার করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'। শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা'। তাহাতে বাঙলা ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

'বাজ-ণাব-পাড়ী পঁই আ-খালে বাহিউ
অদয় দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।' (ভুসুকু)

অর্থাৎ, বজ্র-নৌবাহিনী পদ্মার খালে বাহিল। নির্দয়ভাবে ডাকাতে দেশ লুঠিল।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বাঙলা ভাষার রূপ দেখান যাইতে পারে :

'অযোধ্যা-ভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার।'

চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব কবিদের হাতে বাঙলা ভাষা তাহার প্রাচীন দুর্বোধ্য রূপ হইতে অনেক সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়া আসিয়াছে :

'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বাহিয়া যায়।' (গোবিন্দদাস)

অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গলে :

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

ভাষার ক্রমোন্নতি ও প্রাঞ্জলতা সহজেই লক্ষণীয়।

ইহার পর উনবিংশ শতাব্দীতে আসিল বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যে নব-জাগরণ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংসর্গ বাঙালীর মর্মলোকে নূতন আলোক সম্পাত করিল। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের অবদানে ভাষাও হইল বলিষ্ঠ। মধুসূদন বাঙলা ভাষায় যাদু-শক্তির নৈপুণ্য দেখাইলেন। বঙ্গভাষা-প্রবাহে মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি কূলপ্লাবী জোয়ার সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রবাহের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গধারা বাহিয়া চলিলেন নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র—চলিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙলা ভাষার অসাধারণ শক্তি

দিনের পর দিন প্রকাশিত হইতে লাগিল রত্নপ্রসবিনী বঙ্গজননীর সুসন্তানগণের হাতে। রবীন্দ্রনাথে আসিয়া এই ভাষা চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে বলা যায়। এখানে বঙ্গভাষাপ্রবাহ যেন মহাসমুদ্রের মেঘ-মন্দ্রস্বরে ধ্বনিত।

রবীন্দ্রনাথেরও পরবর্তী যুগের কবির হাতে এই ভাষা-শক্তি বাঙলা ভাষাকে আরো কত পরিবর্তন ও বিবর্তনের পথে লইয়া গিয়া সরস-সঞ্জীবিত করিবে :

'আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে—
এই বাঙলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল
শালিখের বেশে' ; (জীবনানন্দ দাশ)

মোটামুটি এই হইতেছে বাঙলা ভাষার ক্রমবিকাশ ও বিস্তারের কথা।

সাধুভাষা ও চলিতভাষা

প্রত্যেক ভাষারই কথ্যরূপের সহিত লিখিতরূপের একটা পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণ মানুষের মুখে উচ্চারিত ভাষা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, অথবা এক কাল হইতে অন্য কালে নানা পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। বাঙলা ভাষায়ও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অখণ্ড বাঙলা দেশের জেলা ভেদে ভাষার পরিবর্তিত রূপ এমন ধারণ করে যে, ঐ বাঙলা ভাষাই এক জেলার লোকের কথা অন্য জেলার লোকের নিকট বোধগম্য হইবে না। যেমন, চট্টগ্রামের ভাষা বর্ধমানের লোকের নিকট দুর্বোধ্য। ইহাকেই বলি **কথ্য ভাষা**। কিন্তু বাঙলাতে চলিতভাষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা ঐ কথ্য ভাষাসমূহ নয়। বাঙলাতে চলিতভাষা কাহাকে বলা হয় তাহা আলোচনার পূর্বে আমাদের সাধুভাষার পরিচয় জানা প্রয়োজন।

সাধুভাষা : বাঙলাতে ভাষাকে সর্বজনবোধ্য করিয়া তুলিবার জন্য একটি সংস্কৃতানুগত ভাষা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ইহা বাঙলা দেশের বিশেষ কোন প্রান্তের ভাষা নয়—ইহা সমগ্র বাঙলার ভাষা। বঙ্গ ভাষাভাষী যে কোন শিক্ষিত লোক এই ভাষার পাঠোদ্ধার করিতে সক্ষম। এই ভাষা চট্টগ্রাম-বর্ধমান বিভেদ ঘুচাইয়া দিয়া একটা সর্বজনীন রূপলাভ করিয়াছে। এই ভাষারই নাম **সাধুভাষা (Standard Literary Language)**। কথ্য ভাষা হইতে এই ভাষা অনেক মার্জিত ও গভীর ভাব-ব্যঞ্জক। তাই এই ভাষার এত শক্তি ও সর্বজন গ্রাহ্য। নিম্নে ভাষার সাধুরূপের স্বরূপ দেখান হইল :

সাধুভাষা : 'তখন তাহার শরীরোপরি দীপরশ্মিসমূহ প্রপতিত হইলে রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে,

(গ) **ইতালীয়**—কোম্পানী, গেজেট ইত্যাদি।

(ঘ) **ওলন্দাজ**—ইস্কাবন, ইস্ক্রুপ, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি।

(ঙ) **গ্রীক**—কোণ, দাম, সুড়ঙ্গ ইত্যাদি।

(চ) **চীনা**—চা, চিনি, লিচু, লুচি ইত্যাদি।

(ছ) **জাপানী**—রিক্সা, হারিকিরি, ইত্যাদি।

(জ) **তুর্কী**—আলখাল্লা উজবুগ, কাবু, কাঁচী, কোর্মা, গালিচা, চাকু, দারোগা, বেগম, বাহাদুর, বিবি, বোঁচ্কা, লাশ, সওগাত ইত্যাদি।

(ঝ) **পারসীক**—পুঁথি, মুচি, মোজা ইত্যাদি।

(ঞ) **পোর্তুগীজ**—আনারস, কাকাতুয়া, চাবি, জানালা, তোয়ালে, নিলাম, পাউরুটি, পেঁপে, বোতাম, গামলা, বালতি, মিস্ত্রি, সাবান ইত্যাদি।

(ট) **ফরাসী**—কার্তুজ, কুপন, ডিপো, বিস্কুট, ফিরিঙ্গি ইত্যাদি

(ঠ) **ফারসী**—আয়না, আমীর, ইয়ার, কাগজ, কবর, খরমুজ, খোরাক, গোমস্তা, গোলাপ, চাঁদা, চাকর, জমা, জমিদার, তাজা, দোকান, দরকার, পছন্দ, পালিশ, পোশাক, ফর্দ, ফাঁস, বন্দর, বনিয়াদ ময়দান, মাহিনা, মোকদ্দমা, মোকাবিলা, রসদ, রসিদ, রোজ, শহর, সাবাস, হাজির ইত্যাদি।

(ড) **বর্মী**—ঘুগনি, লুঙ্গি ইত্যাদি।

(ঢ) **মালয়**—গুদাম, সাগু ইত্যাদি।

(ণ) **রাশিয়ান**—বলশেভিক, সোভিয়েত ইত্যাদি।

(৪) **মিশ্র শব্দ**—যে সকল শব্দ দুইটি বিভিন্ন ভাষার শব্দ অথবা এক ভাষার শব্দ ও অন্য ভাষার প্রত্যয় মিলিয়া গঠিত হয়, তাহাদিগকে **মিশ্র শব্দ** (**Hybrids**) বলে। যথা—বে (ফারসী) + টাইম (ইংরাজী) = বে-টাইম; গুরু (সংস্কৃত) + গিরি (ফারসী প্রত্যয়) = গুরুগিরি; মাষ্টার (ইংরাজী) + মহাশয় (সংস্কৃত) = মাষ্টার মহাশয়, নস্য + দান = নস্যদান; বে (ফারসী) + হেড (ইংরাজী) = বে-হেড; (বিদেশী + বিদেশী) পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট্ ইত্যাদি।

বাঙলা ভাষায় হিন্দী শব্দেরও বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—আচ্ছা, কুত্তা, চরখা, চানাচুর, বাচ্চা, ভয়সা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার শব্দও বাঙলা ভাষাতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতক ইংরাজীভাষা আবার কতক বা অন্য ভাষার পুস্তক বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে আসিয়াছে, আবার কিছু কিছু সরাসরি মূল ভাষা হইতেও গৃহীত হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। ভাষা কাহাকে বলে? বাঙলা ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। বাঙলা ব্যাকরণ কাহাকে বলে?

৩। বাঙলা ভাষায় শব্দগুলিকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং কি কি? প্রত্যেক প্রকারের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৪। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ দুইটিকে সাধু রীতি হইতে চলিত রীতিতে এবং চলিত রীতি হইতে সাধু রীতিতে পরিবর্তন কর:—

(ক) আমরা যাদৃশ লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণীমণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু-ব্যতিরেক জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়।

(খ) ছেলেটি দলে পড়ে একেবারে বিগড়ে গেছে। নাই দিয়ে মাথায় তুলে এখন গোল্লায় গেল বলে বুক চাপড়ালে চলবে কেন? (ক. বি. মাধ্যমিক ১৯৪৬)।

৫। 'তদ্ভব', 'তৎসম' ও 'অর্ধতৎসম' শব্দ কাহাকে বলে? উদাহরণসহ পরিস্ফুট কর। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)।

৬। উদাহরণ সাহায্যে ব্যাখ্যা কর:—অর্ধতৎসম শব্দ (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২)।

৭। তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ বলিতে বাঙলায় কিরূপ শব্দ বুঝা যায়? নিম্নলিখিত অংশে শব্দগুলিকে এই চারি প্রকারে ভাগ করিয়া দেখাও।

(ক) 'হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।' (রবীন্দ্রনাথ)

(খ) 'হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু, আয়, খোদা দয়াময়
আমার দাদুর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।' (জসীমউদ্দিন)

(গ) 'দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।' (নজরুল ইসলাম)

(ঘ) 'নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাট্যের খেলা!
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা।' (যতীন সেনগুপ্ত)

প্রথম অধ্যায়

বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ

মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ভাষা তাহার সাময়িক কাল এবং সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। (অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধরিয়া রাখিবার এবং দূর-দূরান্তরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে)। মানুষ তাহার নিকটবর্তী বর্তমানকালের প্রিয়জনকে শুধু কথা বলিয়াই সন্তুষ্ট নয়। দূরের মানুষকে এবং ভাবীকালের মানুষকেও তাহার চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, স্বপ্ন-কল্পনা ও ভাবনা শুনাইতে চায়। চিরন্তনত্ব দিতে চায় তাহার বাণীকে রূপে-রসে ক্ষণস্থায়ী মানুষ। তাই তাহাকে লিখিতে হইয়াছে।

আজ আমরা সহজ পন্থায় সাদা কাগজের বুকে কালো হরফে লিখিয়া যাই। কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন কোনপ্রকার কাগজই ছিল না। সেদিনের মানুষেও তাহার উত্তরকালের মানুষকে কথা শুনাইবার জন্য তালপাতায় বা শিলালিপিতে লিখিয়া গিয়াছে তাহাদের চিন্তা ধ্যান-ধারণা ও ভাব-ভাবনার কথা। তাই আমরা চণ্ডীদাসের মতো হারা যুগের কবিকেও আমাদের কাছে মানুষ করিয়া পাইয়াছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভাষার একটি লিখিত রূপ আছে।

ধ্বনি ঃ লেখার পূর্বে কথা। আমাদের স্বর-শক্তির মাধ্যমে আমরা কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি। এই স্বর-শক্তির মাধ্যমে কথা উচ্চারণের নাম **ধ্বনি** (**Sound**)। এক বা একাধিক ধ্বনি একত্র হইয়া শব্দের সৃষ্টি করে। যেমন—'এ কথা জানিতে তুমি..' (রবীন্দ্রনাথ)। এখানে 'এ' এক ধ্বনিতে গঠিত শব্দ, আবার কথা (ক+অ+থ্+আ) চারিটি ধ্বনির সমষ্টি।

বর্ণ ঃ এই মৌলিক ধ্বনিগুলি স্বতন্ত্রভাবে কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই সব সাংকেতিক চিহ্নের নাম **বর্ণ** (**Letter**)। 'ম' এ কথা উচ্চারণ করিলে উৎপন্ন হইল 'ম' ধ্বনি। উহাই এই 'ম' সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা লিখিত হইল। সমগ্র বর্ণমালাই এইরূপ বিশেষ বিশেষ ধ্বনির দ্যোতক।

বর্ণমালা ঃ ইংরাজীতে যাহাকে বলে alphabet বাঙলায় তাহাই বর্ণমালা। বাঙলা ভাষায় মোট বাহান্নটি বর্ণ আছে। ইহাদের মধ্যে স্বরবর্ণ তেরটি এবং বাকি উনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ। এই বর্ণসমষ্টির নাম **বর্ণমালা** (**Alphabet**)।

বর্ণের দ্বারা গঠিত হয় শব্দ এবং ধাতু। এই শব্দ এবং ধাতুর সহিত বিভক্তি যুক্ত করিয়া গঠিত হয় পদ। পদের আশ্রয়ে গঠিত হয় বাক্য। বাক্য এবং বাক্যসমষ্টি লইয়া হয় ভাষা। ইহাদের বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইল ঃ

বর্ণের শ্রেণীবিভাগ ও উচ্চারণস্থান

বর্ণ এবং বর্ণমালা কাহাকে বলে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে বর্ণের শ্রেণীবিভাগ ও উচ্চারণস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে :

বর্ণ দুই প্রকার—**স্বরবর্ণ** ও **ব্যঞ্জনবর্ণ**।

স্বরবর্ণ : যে ধ্বনিগুলি অন্য কোন ধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইতে পারে, তাহাকে **স্বরধ্বনি** (**Vowel Sound**) বলে। স্বরধ্বনির লিখিত রূপের নাম **স্বরবর্ণ**। যেমন—**অ, আ, অ্যা, এ, ও** প্রভৃতি। ইহাদের উচ্চারণ করিবার জন্য অন্য কোন ধ্বনির সাহায্য প্রয়োজন হয় না। অতএব 'অ' হইল স্বরধ্বনি। ইহারই লিখিতরূপ **'অ'** স্বরবর্ণ।

বাঙলায় তেরটি স্বরধ্বনি বা স্বরবর্ণ আছে। যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ।

দ্রষ্টব্য : বর্তমানে বাঙলা ভাষায় ৠ এবং ঌ এর কোন পৃথক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বরবর্ণের শ্রেণীবিভাগ : স্বরবর্ণ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—**হ্রস্বস্বর** ও **দীর্ঘস্বর**। অ, ই, উ, ঋ, ঌ এই কয়টি **হ্রস্বস্বর** (**Short Vowel**)। এবং আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ এই কয়টি **দীর্ঘস্বর** (**Long Vowel**)। উচ্চারণের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা অনুসারে ইহাদিগকে এই ভাবে বিভক্ত করা হইল। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী আবার স্বরবর্ণকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে :

(১) অ, আ—ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ; এইজন্য ইহাদিগকে **কণ্ঠ্যবর্ণ** (**Guttural**) বলে।

(২) ই, ঈ—এই দুইটি বর্ণ তালু স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম **তালব্য বর্ণ** (**Palatals**)।

(৩) উ, ঊ—ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ; সেইজন্য ইহাদের নাম **ওষ্ঠ্যবর্ণ** (**Labials**)।

(৪) ঋ, ৠ—ইহারা মূর্ধা স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **মূর্ধন্য বর্ণ** (**Cerebrals**) বলে।

(৫) ঌ—এই বর্ণটি দন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে **দন্ত্যবর্ণ** (**Dentals**) বলে।

(৬) এ, ঐ—এই দুইটি বর্ণ কণ্ঠ ও তালু স্পর্শ করিয়া উচ্চরিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **কণ্ঠ্যতালব্য বর্ণ** (**Gutturo-Palatal**) বলে।

(৭) ও, ঔ—ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ; সেইজন্য ইহাদের নাম **কণ্ঠ্যৌষ্ঠ্য বর্ণ** (Gutturo-Labail) বলে।

ইহা ছাড়া ই, এ এই দুইটি স্বরবর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **সম্মুখস্বর** (Front Vowel বলা হয়। আবার অ, আ, উ এই তিনটি স্বরবর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা পশ্চাতে যায় বলিয়া ইহাদিগকে **পশ্চাৎস্বর** (Back Vowel) বলে।

স্বরবর্ণের উচ্চারণস্থান

অ—'অ' কারের দুইরকম উচ্চারণ আছে। ইংরাজীতে Ball উচ্চারণ করিবার সময় আমরা 'অ' এর যে রকম উচ্চারণ করি তাহাই 'অ' এর প্রকৃত স্বর। 'অ' এর বিকৃত উচ্চারণ ইংরাজীর 'O' উচ্চারণের অনুরূপ। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাইতে পারে। 'বল', 'করা' প্রভৃতি শব্দে 'অ' কারের প্রকৃত উচ্চারণ। কিন্তু 'বসু', 'মতি' প্রভৃতি শব্দে অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। এখানে উচ্চারণ ইংরাজীর 'O' উচ্চারণের অনুরূপ অর্থাৎ 'বোসু', 'মোতি' ইত্যাদি।

শব্দের আদিতে 'অ' এর উচ্চারণ:

'সং' বাচক শব্দের আদিতে 'স' থাকিলে 'অ' এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়। যথা—শসব্দ, সজল, সতেজ ইত্যাদি।

'সম' উপসর্গ থাকিলে স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়। যথা—সমাচ্ছন্ন, সম্রাট, সমার্থক, সমাপন ইত্যাদি।

'না' বাচক 'অ' কার থাকিলে স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়। যথা—অমর, অধীর ইত্যাদি। কিন্তু ব্যক্তির নাম থাকিলে 'অ' বিকৃত উচ্চারণ হয়, যথা—অবিনাশ (ওবিনাশ), অতুল (ওতুল) ইত্যাদি। ধ্বন্যাত্মক শব্দের 'অ' সাধারণতঃ স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। যথা—'ঐ ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ বর্ষা পড়ে'।

কখনো কখনো 'ন', 'ণ' পরে থাকিলে 'অ' এর বিকৃত উচ্চারণ হয়। যেমন—'মন' (মোন), 'পণ' (পোণ) ইত্যাদি। কিন্তু 'রণ' শব্দের উচ্চারণ স্বাভাবিক। 'জনগণ, মন অধিনায়ক।'—(উচ্চারণ লক্ষণীয়)।

শব্দের অন্তে 'অ' এর উচ্চারণ:

শব্দের অন্তে অনেক সময় 'অ' উচ্চারিত হয় না। যথা—হাত, দাঁত, কান, চোখ, মুখ, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

যুক্তবর্ণ বা 'হ' শেষে থাকিলে 'অ' স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—হস্ত, লেহ, গেহ, দস্ত, কাষ্ঠ, অন্ত, গাহ ইত্যাদি।

অনুস্বার ং বা বিসর্গ ঃ থাকিলে 'অ' স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—কংস, বংশ, হংস, দুঃখ ইত্যাদি।

'ই' কার বা 'এ' কারের পরে 'অ' উচ্চারিত হয়। যেমন—প্রিয়, মেয় ইত্যাদি। 'তর', 'তম' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষ 'অ' ধ্বনি স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—প্রিয়তর, ব্যাকুলতর, প্রিয়তম, লঘুতম, মহত্তর, মহত্তম ইত্যাদি।

কয়েকটি শব্দে বা কোথাও কোথাও 'অ' স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয় না। যেমন—উত্তম (=উত্তম্), উত্তর (উত্তর্) ইত্যাদি।

ঋ-কার, ঐ-কার, উ-কার থাকিলে 'অ' স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—তৃণ, কৃশ, বৃষ, শৈল, ঐশ্বর্য, উর্ধ্ব ইত্যাদি।

আ—বাঙলাতে 'আ' কারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই প্রকার উচ্চারণ আছে। যেমন—পাকা, মাথা ইত্যাদি হ্রস্ব উচ্চারণ; কিন্তু 'মা' দীর্ঘ উচ্চারণ।

ই, ঈ,—ইহাদের উচ্চারণ সর্বত্রই হ্রস্বস্বর। যেমন—নিখিল বা নীরব উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই।

উ, ঊ—ইহাদের উচ্চারণ একই প্রকার। যেমন—উমা, ঊষা ইত্যাদি।

ঋ, ৠ—'ঋ' কার বলিতে 'রি' উচ্চাচরণ করি। যেমন—ঋষি (রিষি), ঋণ, পিতৃ, মসৃণ, তৃণ (ত্রিণ), পৃষ্ঠ (প্রিষ্ঠ) ইত্যাদি।

এ—বাঙলা ভাষায় 'এ' কারের উচ্চারণ দুইপ্রকার—যথা—(১) প্রকৃত ও (২) বিকৃত। প্রকৃত উচ্চারণ 'এ' এবং বিকৃত উচ্চারণ 'অ্যা'। যেমন—

(১) দেশ, বেশ, কেশ, মেষ, শেষ, মেঘ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণে 'এ' কারের প্রকৃত উচ্চারণ। (২) 'এক' (অ্যাক), 'দেখ' (দ্যাখ), 'ফেল' (ফ্যাল) প্রভৃতি উচ্চারণে 'এ' কারের বিকৃত উচ্চারণ।

ঐ—ইহা একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। বাঙলাতে ইহা 'অ' (উচ্চারণে 'ও') এবং 'ই' এই দুই ধ্বনির দ্রুত উচ্চারণের ফল। যেমন—শৈশব (শোইসব), বৈকাল (বোইকাল), ঐহিক (ওইহিক) ইত্যাদি।

ও—বাঙলাতে 'ও' হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—কোন, লোক, শোক, রোগ, ছোট, তোমার, গোলক, বিয়োগ, পৌরোহিত্য ইত্যাদি।

ঔ—ঔ এর উচ্চারণ ও+উ বা ওউ। যেমন—কৌরব, গৌরব ইত্যাদি।

সন্ধ্যক্ষর ঃ একাধিক স্বরধ্বনির সন্ধি বা মিলনে উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ এবং ঔ কারকে যৌগিকস্বর বা সন্ধ্যক্ষর (Diphthong) বলা হয়। ঐ=অ+ই (দ্রুত উচ্চারিত); ঐ=ও+ই (দ্রুত উচ্চারিত); ঔ=ও+উ (দ্রুত উচ্চারিত)। ঐ

এবং ঐ ছাড়াও বাঙলা ভাষায় আরও কতকগুলি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে, যেমন—ইয়ে = ই + এ ; ইয়া = ই + আ ; এয়া = এ + আ ; অও = অ + ও। উদাহরণ—(যথাক্রমে) লাফিয়ে (লা + ফ্ + ইয়ে) ; কাঁপিয়া (কাঁ + প্ + ইয়া) ; খেয়া (খ্ + এয়া ; লও (ল + অও) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণস্থান

যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাকে **ব্যঞ্জনধ্বনি** (**Consonant Sound**) বলে। ব্যঞ্জনধ্বনিকে যে সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা লিখিত হয়, তাহাকে **ব্যঞ্জনবর্ণ** বলে। যেমন, 'ক' এই ধ্বনি উচ্চারণের জন্য প্রয়োজন ক্ + অ = ক। 'অ' এই ধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হইল বলিয়া 'ক' ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণ। এইরূপ মি, = (ম্ + ই), আড়্ = (আ + ড়্) ইত্যাদি।

বাঙলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশটি। যথা—ক, খ, গ, ঘ, ঙ (ক বর্গ) ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ (চ বর্গ) ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ (ট বর্গ) ; ত, থ, দ, ধ, ন (ত বর্গ) ; প, ফ, ব, ভ, ম, (প বর্গ) ; য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ং ; ঃ, ঁ।

স্পর্শ বর্ণঃ ক হইতে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের সময় কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, এবং ওষ্ঠ স্পর্শের প্রয়োজন হয় বলিয়া এই বর্ণগুলিকে **স্পর্শবর্ণ** (**Stops**) বলে। এই বর্ণগুলিকে আবার পাঁচটি বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে **বর্গীয় বর্ণ**ও বলে। প্রত্যেক বর্গের প্রথম বর্ণ অনুসারে সেই বর্গের নামকরণ করা হইয়া থাকে।

(১) ক, খ, গ, ঘ, ঙ—ইহাদের উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা ও কণ্ঠ স্পর্শ করে বলিয়া ইহাদের নাম **কণ্ঠ্যবর্ণ** (**Gutturals**)।

(২) চ, ছ, জ, ঝ, ঞ—ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বা ও তালু স্পর্শ করে বলিয়া ইহাদের নাম **তালব্যবর্ণ** (**Palatals**)।

(৩) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—ইহাদের উচ্চারণ করিবার সময় মূর্ধা স্পর্শ করে বলিয়া ইহাদের নাম **মূর্ধন্যবর্ণ** (**Cerebrals**)।

(৪) ত, থ, দ, ধ, ন—ইহাদের উচ্চারণের সময় জিহ্বা ও দন্ত স্পর্শ হয় বলিয়া ইহাদের নাম **দন্ত্যবর্ণ** (**Dentals**)।

(৫) প, ফ, ব, ভ, ম—ইহাদের উচ্চারণে ওষ্ঠের সহিত অধরের স্পর্শ হয় বলিয়া ইহাদের নাম **ওষ্ঠ্যবর্ণ** (**Labials**)।

(৬) অন্তঃস্থ ব-কারের উচ্চারণস্থান দন্ত ও ওষ্ঠ ; সেইজন্য ইহার নাম **দন্ত্যোষ্ঠ্য বর্ণ** (**Dento-Labial**) বলে।

অঘোষবর্ণ : প্রত্যেক বর্গের প্রথম দুইটি বর্ণের উচ্চারণ মৃদু ও গাম্ভীর্যের পরিমাণ অল্প বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় **শ্বাসবর্ণ** বা **অঘোষবর্ণ** (**Unvoised letters**)।

ঘোষবৎবর্ণ : বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণের উচ্চাবণে ধ্বনির গাম্ভীর্যের প্রাচুর্য আছে বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় **ঘোষবৎবর্ণ** বা **নাদবর্ণ** (**Voiced letters**)। যথা—ঘ, ধ, ভ ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণবর্ণ : বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর মৃদুতা অল্প লাগে বলিয়া এই বর্ণগুলিকে বলা হয় **অল্পপ্রাণবর্ণ** (**Unaspirated**) যথা—ক্, গ্, ত্ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণবর্ণ : বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ বা শ্বাসবায়ু বেশী লাগে বলিয়া এই বর্ণগুলিকে বলা হয় **মহাপ্রাণবর্ণ** (**Aspirated**)। যথা—খ্ =ক্‌হ); ঘ্ (=গ্‌হ); ধ্ (=দ্‌হ) ইত্যাদি।

নাসিক্য বা **অনুনাসিক বর্ণ :** যে সকল ধ্বনির উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস বায়ু যুগপৎ মুখ ও নাসাপথে নির্গত হয়, তাহাদিগকে **নাসিক্য** বা **অনুনাসিকবর্ণ** (**Nasals**) বলা হয়। যথা—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম ইত্যাদি।

অন্তঃস্থবর্ণ : য, র, ল, ব এই চারিটি বর্ণ স্পর্শ এবং উষ্মবর্ণের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া এই বর্ণগুলিকে **অন্তঃস্থবর্ণ*** (**Intermediates**) বলে।

উষ্মবর্ণ : শ, ষ, স, হ এই চারিটি বর্ণের উচ্চারণের সময় উষ্ম অর্থাৎ শ্বাস অনেকক্ষণ প্রলম্বিত হয় বলিয়া ইহাদের বলে **উষ্মবর্ণ** (**Spirant**)।

শ, ষ এবং স-কে শিশ ধ্বনিও বলা হইয়া থাকে। শিশ দেওয়ার সময় যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় অনেকটা সেইরকম হয় বলিয়া ইহাদের নাম **শিশ ধ্বনি** (**Sibilant**)।

যুক্তবর্ণ : একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে কোন স্বরবর্ণ না থাকিলে সেই ব্যঞ্জনবর্ণগুলি পরস্পর যুক্ত হয় এবং এই যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে **যুক্তবর্ণ** বলা হয়। যেমন—হ+ব=হ্ব (আহ্বান); ঙ+ম=ঙ্ম (বাঙ্ময়); ঞ+ছ=ঞ্ছ (বাঞ্ছা); ঞ+চ=ঞ্চ (অঞ্চল); জ+ঞ=জ্ঞ (যজ্ঞ); গ+ম=গ্ম (বাগ্মী) ইত্যাদি।

অনুস্বার (ং) ও **চন্দ্রবিন্দু** (ঁ) **:** এই বর্ণগুলিকে **অনুনাসিক** (**Nasals**) বর্ণ বলা যাইতে পারে। ইহারা স্বরবর্ণের পরে ও মস্তকে বসিয়া স্বরকে অনুনাসিক করিয়া তোলে।

বিসর্গ (ঃ) : ইহা **আশ্রয়স্থানভাগীবর্ণ**। যে বর্ণকে আশ্রয় করিয়া বিসর্গ (:) উচ্চারিত হয় ইহা সেই বর্ণেরই মত উচ্চারিত হয় অর্থাৎ মুখবিবরের বায়ুর ত্যাগই বিসর্গের (:) প্রধান লক্ষণ।

*অন্তঃস্থবর্ণ চারিটির মধ্যে য, ব এই দুইটিকে 'অর্ধস্বর' এবং র, ল এই দুইটিকে 'তরলস্বর' বলে।

স্বরসন্ধি

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া আ-কার হয়। যেমন—

অ+অ=আ—দেব+অসুর=দেবাসুর। আ+আ=আ—মহা+আশয়=মহাশয়।

অ+আ=আ—সিংহ+আসন=সিংহাসন। আ+অ=আ—যথা+অর্থ=যথার্থ।

২। ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া ঈ-কার হয়। যেমন—

ই+ই=ঈ—যতি+ইন্দ্র=যতীন্দ্র। ঈ+ই=ঈ—শচী+ইন্দ্র=শচীন্দ্র।

ই+ =ঈ—গিরি+ঈশ=গিরীশ। ঈ+ঈ=ঈ—শচী+ঈশ=শচীশ।

৩। উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া ঊ-কার হয়। যেমন—

উ+উ=ঊ—বিধু+উদয়=বিধূদয়। ঊ+উ=ঊ—বধূ+উৎসব=বধূৎসব।

উ+ঊ=ঊ—লঘু+ঊর্মি=লঘূর্মি। ঊ+ঊ=ঊ—ভূ+ঊর্ধ্ব=ভূর্ধ্ব।

৪। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া এ-কার হয়। যেমন—

অ+ই=এ—নর+ইন্দ্র=নরেন্দ্র। আ+ই=এ—মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র।

অ+ঈ=এ—পরম+ঈশ=পরমেশ। আ+ঈ=এ—রমা+ঈশ=রমেশ।

৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-থাকিলে উভয় মিলিয়া ও-কার হয়। যেমন—

অ+উ=ও—ভাগ্য+উদয়=ভাগ্যোদয়। অ+উ=ও—মহা+ উৎসব=মহোৎসব।

অ+ঊ=ও—এক+ঊন=একোন। আ+ঊ=ও—মহা+ঊর্মি=মহোর্মি।

৬। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া অর্‌ হয়। অর্‌-এর র্‌ রেফ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন—

অ+ঋ=অর্‌—দেব+ঋষি=দেবর্ষি। অ+ঋ=অর্‌—অধম+ঋণ=অধমর্ণ।

আ+ঋ=অর্‌—রাজা+ঋষি=রাজর্ষি। আ+ঋ=অর্‌—মহা+ঋষি=মহর্ষি।

৭। অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া ঐ-কার হয়। যেমন—

অ+এ=ঐ—এক+এক=একৈক। আ+এ=ঐ—তদা+এব=তদৈব।

অ+ঐ=ঐ—ধন+ঐশ্বর্য=ধনৈশ্বর্য। আ+ঐ=ঐ—মহা+ঐরাবত=মহৈরাবত।

ব্যতিক্রম—বার+এক=বারেক, তিল+এক=তিলেক, দিন+এক=দিনেক, ক্ষণ+এক=ক্ষণেক, অর্ধ+এক=অর্ধেক ইত্যাদি।

৮। **অ**-কার কিংবা **আ**-কারের পর **ও**-কার কিংবা **ঔ**-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া **ঔ**-কার হয়। যেমন—

অ+ও=ঔ—জল+ওকা=জলৌকা। আ+ঔ=ঔ—মহা+ওষধি=মহৌষধি।

অ+ঔ=ঔ—পরম+ঔষধ=পরমৌষধ। আ+ঔ=ঔ—মহা+ঔষধ=মহৌষধ।

৯। **ই, ঈ** ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকিলে **ই, ঈ,** স্থানে **য**্ হয়; যেমন—

ই+অ=য্—অতি+অন্ত=অত্যন্ত। ই+উ=য্—অভি+উদয়=অভ্যুদয়।

ই+এ=য্—প্রতি+এক=প্রত্যেক। ঈ+অ=য্—নদী+অম্বু=নদ্যম্বু।

১০। **উ, ঊ** ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকিলে **উ, ঊ** স্থানে **ব**্ (অন্তঃস্থ) হয়। যেমন—

উ+অ=ব্—মনু+অন্তর=মন্বন্তর। উ+এ=ব্—অনু+এষণ=অন্বেষণ।

উ+আ=ব্—সু+আগত=স্বাগত। ঊ+অ=ব্—সরযূ+অম্বু=সরয্বম্বু।

১১। **ঋ**-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে **ঋ** স্থানে **র**্ হয়; যেমন—

ঋ+অ (র+অ=র্) —পিতৃ+অনুমতি=পিত্রনুমতি।

ঋ+আ (র+আ=র্)—পিতৃ+আদেশ=পিত্রাদেশ।

১২। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে **এ** স্থানে **অয়্**, **ঐ** স্থানে **আয়্**, **ও** স্থানে **অব্** এবং **ঔ** স্থানে **আব্** হয়। যেমন—

এ স্থানে অয়্—শে+অন=শয়ন। ও স্থানে অব্—ভো+অন=ভবন।

ঐ স্থানে আয়্—গৈ+অক=গায়ক ঔ স্থানে আব্—নৌ+ইক=নাবিক।

১৩। কতকগুলি সন্ধি নিয়ম অনুসারে হয় না; এইজন্য এগুলিকে **নিপাতনে সিদ্ধ** বলা হয়। যেমন—

কুল+অটা=কুলটা। সার+অঙ্গ=সারঙ্গ।

প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ়। অক্ষ+উহিনী=অক্ষৌহিণী।

স্ব+ঈর=স্বৈর (স্ত্রীলিঙ্গে) স্বৈরিণী। মনস্+ঈষা=মনীষা।

সীম (ন্)+অন্ত=সীমন্ত। পত (ৎ)+অঞ্জলি=পতঞ্জলি।

অনুশীলনী

১। সূত্র উল্লেখপূর্বক সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

বনৌষধি, বোধোদয়, গবাক্ষ, মহর্ষি, অত্যন্ত, রাজর্ষি, মহোদয়, ধনৈশ্বর্য, প্রত্যেক, গবাক্ষ, স্বাগত, অন্বেষণ, ভাবুক, বৃহস্পতি, উড্ডীয়মান, মনোমোহন, অভ্যর্থনা, সমালোচনা, ষৎপরোনাস্তি, সমভিব্যাহার, চরণারবিন্দ।

২। কোন্ স্থলে সন্ধি নিষিদ্ধ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

ব্যঞ্জনসন্ধি

১। ত কিংবা দ-এর পর চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত ও দ্ স্থানে চ হয়। যেমন—

শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র। উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।

চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র। বিপদ্ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

২। ত কিংবা দ্-এর পর জ কিংবা ঝ থাকিলে ত ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যেমন—

তৎ + জন্য = তজ্জন্য। বৃহৎ + ঝটিকা = বৃহজ্ঝটিকা।

বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল। বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক।

৩। ত কিংবা দ-এর পর ল্ থাকিলে ত ও দ স্থানে ল্ হয়। যেমন—

বৃহৎ + লাঙ্গুল = বৃহল্লাঙ্গুল। তৎ + লেখনী = তল্লেখনী।

উৎ + লেখ = উল্লেখ উৎ + লিখিত = উল্লিখিত।

৪। ত কিংবা দ্-এর পর শ থাকিলে ত ও দ্ স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ্ হয় যেমন—

উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল। উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি। উৎ + শ্বসিত = উচ্ছ্বসিত।

৫। পদের অন্তঃস্থিত ত কিংবা দ্-এর পর হ থাকিলে ত স্থানে দ্ ও হ্ স্থানে ধ হয়। যেমন—

উৎ + হার = উদ্ধার। উৎ + হত = উদ্ধত।

তদ্ + হিত = তদ্ধিত। বিপদ্ + হেতু = বিপদ্ধেতু।

৬। স্বরবর্ণের পরে ছ থাকিলে ছ স্থানে চ্ছ হয়। যেমন—

বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া। বি + ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন।

পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ। আ + ছাদন = আচ্ছাদন।

৭। 'উৎ' উপসর্গের পরে স্থা ও স্তম্ভ ধাতুর স-এর লোপ হয়। যেমন—

উৎ + স্থান = উত্থান। উৎ + স্তৃতি = উত্তৃতি।

উৎ + স্থাপন = উত্থাপন। উৎ + স্থিত = উত্থিত।

উৎ + স্তৃত = উত্তৃত। উৎ + স্তম্ভ = উত্তম্ভ।

৮। যদি স্বরবর্ণ অথবা বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকে, তবে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়; অর্থাৎ ক স্থানে গ; চ স্থানে জ; ট স্থানে ড; ত স্থানে ব হয়। যেমন—

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত। বাক্ + দান = বাগদান।

ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত। ষট্ + আনন = ষড়ানন।

৯। ঙ্ কিংবা ম্ পরে থাকিলে পদের অন্তঃস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন—

দিক্ + নাগ = দিঙ্‌নাগ। বাক্ + ময় = বাঙ্‌ময়।

ষট্ + নবতি = ষণ্ণবতি। মৃৎ + ময় = মৃন্ময়।

১০। যদি অন্তঃস্থবর্ণ (য, র, ল, ব) বা উষ্মবর্ণ শ, ষ, স, হ পরে থাকে, তবে পদের অন্তঃস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন—

সম্ + যম = সংযম। সম্ + জাত = সংজাত।

সম্ + শয় = সংশয়। সম্ + সার = সংসার।

১১। যদি স্পর্শবর্ণ (ক হইতে ম) পরে থাকে, তবে পদের অন্তঃস্থিত ম স্থানে অনুস্বার (ং) হয়, অথবা যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন—

সম্ + গীত = সংগীত ; সঙ্গীত। সম্ + কীর্ণ = সঙ্কীর্ণ।

সম্ + গতি = সঙ্গতি। সম্ + কল্প = সংকল্প ; সঙ্কল্প।

কিন্তু সম্ শব্দের পর 'রাজ' শব্দ থাকিলে ম্ স্থানে অনুস্বার হয় না। যেমন—

সম্ + রাজ = সম্রাজ্।

১২। সম্ ও পরি উপসর্গের পর কৃ ধাতু থাকিলে উপসর্গের পর 'স' বা 'ষ' আগম হয়। যেমন—

সম্ + কৃত = সংস্কৃত। পরি + কৃত = পরিষ্কৃত।

১৩। উপসর্গস্থিত 'ত'-এর পর 'ন' কিংবা 'ম' থাকিলে, ঐ 'ত' স্থানে নিত্য 'ন' হয়। যেমন—

উৎ + নয়ন = উন্নয়ন। উৎ + মত্ত = উন্মত্ত।

উৎ + নত = উন্নত। উৎ + মীলন = উন্মীলন।

সমীকরণ : দুইটি ব্যঞ্জনসন্ধি পরস্পর নিকটবর্তী হইলে উচ্চারণে যে সমস্যা ঘটে, তাহাকে সমীকরণ বলে। যথা—গল্প—গপ্‌প, বদ্‌জাত—বজ্জাত, নাতজামাই—নাজ্‌জামাই, উৎসন্ন—উচ্ছন্ন, কুৎসিত—কুচ্ছিত, বড়ঠাকুর—বট্‌ঠাকুর ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। ব্যঞ্জনসন্ধি কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। সূত্র নির্দেশ করিয়া সন্ধি কর : জগৎ + বিখ্যাত, চলৎ + শক্তি, ষট্ + মাত্র, রবি + ছবি, উৎ + হার, উৎ + লেখ, আ + ছাদন, দিক + বধূ, উৎ + যোগী, সম্ + বাদ, উৎ + চারণ।

৩। সূত্র নির্দেশ করিয়া সন্ধি বিচ্ছেদ কর : চলচ্চিত্র, বিপজ্জনক, উল্লাস, উদ্ধার, ষড়ানন, উদ্ধত, সংস্কৃত, জগজ্জ্যোতি, উল্লঙ্ঘন, অণুচ্ছেদ, ষড়্‌ঋতু।

৪। সমীকরণ কাহাকে বলে ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

বিসর্গসন্ধি

বিসর্গ দুই প্রকার—**র্-জাত** ও **স্-জাত**।

সংস্কৃতে পদের অন্তঃস্থিত 'র' স্থানে যে বিসর্গ হয়, তাহাকে র্-জাত বিসর্গ **বলে।** যেমন—প্রাতর্=প্রাতঃ, পুনর্=পুনঃ, নির্=নিঃ, দুর্=দুঃ ইত্যাদি।

সংস্কৃতে পদের অন্তঃস্থিত 'স' স্থানে যে বিসর্গ হয়, তাহাকে স্-জাত বিসর্গ **বলে।** যেমন—আয়ুস্=আয়ুঃ, বহিস্=বহিঃ, মনস্=মনঃ, তপস্=তপঃ ইত্যাদি।

১। বিসর্গের পর **চ্** কিংবা **ছ্** থাকিলে বিসর্গ স্থানে **শ্**; **ট্** কিংবা **ঠ্** **পরে** থাকিলে বিসর্গ স্থানে **ষ্**; এবং **ত্** কিংবা **থ্** পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে **স্** হয়। **যেমন**—

নিঃ+চয়=নিশ্চয়। শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ।

ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার। ইতঃ+ততঃ=ইতস্ততঃ।

এইরূপ—নিষ্ঠুর, নিস্তেজ, দুস্তর, অধস্তন, মনস্তাপ, নিশ্চল ইত্যাদি।

২। **ক্**, **খ্**, **প্**, **ফ্** পরে থাকিলে **অ**-কার ও **আ**-কারের পরবর্তী **বিসর্গ স্থানে** **স্** এবং **অ, আ** ভিন্ন স্বরবর্ণের পরবর্তী **বিসর্গ** স্থানে **ষ্** হয়। যেমন—

নমঃ+কার=নমস্কার। দুঃ+প্রাপ্য=দুষ্প্রাপ্য।

ভাঃ+কর=ভাস্কর। নিঃ+ফল=নিষ্ফল।

মনে রাখিবে, মনঃকষ্ট, শিরঃপীড়া, অতঃপর, অন্তঃকরণ, অধঃপাত, নিঃশেষ প্রভৃতি **শব্দে** বিসর্গ স্থানে **স্** হয় না।

৩। যদি **অ**-কারের পর বিসর্গ থাকে এবং **অ**-কার পরে থাকে, **তাহা হইলে** **পূর্ব** পদের **অ**-কার ও **বিসর্গ** উভয় মিলিয়া **ও**-কার হয়; **ও**-কার পূর্ববর্ণে **যুক্ত হয়** ও পরপদের **অ**-কারের লোপ হয়। যেমন—

মনঃ+অভীষ্ট=মনোভীষ্ট। মনঃ+অভিলাষ=মনোভিলাষ।

ততঃ+ধিক=ততোধিক। পয়ঃ+অমৃত=পয়োমৃত।

এইরূপ—যশোঽভিলাষ, বয়োঽধিক ইত্যাদি।

[**দ্রষ্টব্য**ঃ লুপ্ত অ-কারে (ঽ) এইরূপ একটি চিহ্ন থাকে, কিন্তু বাঙলায় **ইহার** ব্যবহার নাই। যথা—মনঃ+অভিলাষ=মনোঽভিলাষ]।

৪। **অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের** **লোপ** হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যেমন—

অতঃ+এব=অতএব। শিরঃ+উপরি=শিরউপরি।

বয়ঃ+আধিক্য=বয়আধিক্য। যশঃ+ইচ্ছা=যশইচ্ছা।

৫। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্, পরে থাকিলে **অ**-কার ও পরবর্তী **বিসর্গ** উভয় মিলিয়া **ও**-কার হয়। **ও** কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন—

অধঃ + মুখ = অধোমুখ। সরঃ + বর = সরোবর।

পয়ঃ + ধর = পয়োধর। অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র।

মনঃ + গত = মনোগত। মনঃ + যোগ = মনোযোগ।

৬। স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্, পরে থাকিলে **পূর্ববর্তী অ**-কার ও **আ**-কার ভিন্ন স্বরের পরবর্তী **বিসর্গ** স্থানে র্ হয়। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে র্ পরবর্তী স্বরের সহিত যুক্ত হয় এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে র্ রেফ্ হইয়া উহার মস্তকে বসে। যেমন—

নিঃ + অতিশয় = নিরতিশয়। নিঃ + আকার = নিরাকার।

দুঃ + ভাবনা = দুর্ভাবনা। বহিঃ + গত = বহির্গত।

নিঃ + লোভ = নির্লোভ। দুঃ + আকাঙ্ক্ষা = দুরাকাঙ্ক্ষা।

৭। স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্, র্, ল্, ব্, হ্, পরে থাকিলে পূর্ববর্তী **অ**-কারের পরস্থিত **র্**-জাত বিসর্গ স্থানে **র্** হয়। যেমন—

পুনঃ + আগত = পুনরাগত। অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান।

পুনঃ + ভব = পুনর্ভব। অন্তঃ + যামী = অন্তর্যামী।

৮। **র্** পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যে **র্** হয়, তাহার লোপ হয় এবং বিসর্গের **পূর্বস্বর দীর্ঘ** হয়। যেমন—

নিঃ + রোগ = নীরোগ নিঃ + রস = নীরস।

নিঃ + রব = নীরব। চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ।

[**দ্রষ্টব্য ঃ** ক, খ, প, ফ, শ, ষ, স পরে থাকিলে সাধারণতঃ বিসর্গসন্ধি হয় না। **যথা—মনঃ + কষ্ট** = মনঃকষ্ট, নিঃ + শেষ = নিঃশেষ ইত্যাদি]।

৯। নিম্নোক্ত যৌগিক শব্দগুলি সন্ধির মত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাদিগকে **সন্ধি** বলা যায় না। এইরূপ বর্ণাগম ও বর্ণ পরিবর্তন কোন বিশেষ নিয়মের অধীন নয় বলিয়া ইহাদিগকে **নিপাতনে সিদ্ধ** বলা হয়। যেমন—

হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র। বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি।

পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি। গো + পদ = গোষ্পদ।

আ + চর্য = আশ্চর্য। তৎ + কর = তস্কর।

আ + পদ = আস্পদ। বন + পতি = বনস্পতি।

ষট্ + দশ = ষোড়শ। দিব্ + লোক = দ্যুলোক।

সন্ধি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

১। বাঙলায় তদ্ভব, অর্ধতৎসম কিংবা বিদেশী শব্দসমূহের পূর্বে উল্লেখিত সন্ধির নিয়ম সর্বত্র খাটে না।

২। খাঁটি বাঙলা শব্দের সহিত খাঁটি বাঙলা শব্দের সন্ধি প্রায়ই হয় না। যেমন—আমা অপেক্ষার স্থলে আমাপেক্ষা হয় না।

৩। বাঙলা ক্রিয়াপদের সহিতও সন্ধি হয় না। যেমন—আমি+আসিয়াছি= আম্যাসিয়াছি এরূপ হয় না।

৪। খাঁটি বাঙলা শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সন্ধি হয় না। যেমন—লাঠি+আঘাত=লাঠ্যাঘাত হয় না।

কিন্তু, আপনাপন, আমাপেক্ষা, চায়াবাদ, ইংরেজাধিকৃত, আইনানুসারে, দিল্লীশ্বর, ঢাকেশ্বরী ও গ্যাসালোক এরূপ সন্ধি দেখা যায়।

৫। তৎসম (সংস্কৃত) সমস্তপদের অংশবিশেষ অনেক সময় অর্থের প্রাধান্য ও ছন্দের লালিত্যের জন্য সন্ধি করা হয় না। গদ্যেরও ছন্দ আছে। অনেক সময় সেখানেও মাধুর্যের জন্য সন্ধি করা হয় না। যেমন—'কনক আসনে বসে দশানন বলী'—(মাইকেল)

অনুশীলনী

১। উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও : বিসর্গসন্ধি (স্কুল ফাইনাল, ১৯৫৪)।

২। যে কোন চারিটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর : রাজর্ষি, উদ্ধৃত, নিজস্ব, গোষ্পদ, প্রাতরাশ (প্রাতর্+আশ), পুরোহিত, স্বস্তি, (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২); নিশ্চয়, তপোধিক, মনোহর, নমস্কার, বনস্পতি, মনোরম, হরিশ্চন্দ্র, স্বাগত, সরোবর, পুনরাগত।

৩। সূত্র উল্লেখপূর্বক সন্ধি কর : মনঃ+অভিলাষ, প্রাতঃ+ভ্রমণ, শিরঃ+পীড়া, পুনঃ+ভব, দুঃ+তর, ভাঃ+কর, দুঃ+আকাঙ্ক্ষা, নিঃ+কৃতি।

৪। সন্ধি বিশ্লেষ কর : স্বাগত, উচ্ছ্বাস, ধনুষ্টঙ্কার, নীরক্ত, অন্বেষণ, বয়আধিক্য, নিরতিশয়, উল্লেখ, উচ্ছন্ন। (স্কুল ফাইনাল, ১৯৫৮)।

৫। সূত্র নির্দেশ করিয়া যে কোন চারিটির সন্ধিবিচ্ছেদ কর : শীতার্ত, যদ্যপি, অধমর্ণ, তদ্ধিত, ত্র্যহস্পর্শ, বুৎপত্তি, বহিশ্চর, বাঙ্‌নিষ্পত্তি (স্কুল ফাইনাল ১৯৬২)।

৬। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিসর্গ-সন্ধি হয় না। উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৭। র-জাত বিসর্গের লোপ হয় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়—উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৮। বাঙলা সন্ধির নিজস্ব কোন নিয়ম থাকিলে তাহা উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা কর (কলিকাতা, মাধ্যমিক ১৯৪৬)।

তৃতীয় অধ্যায়

ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান

বাঙলা ভাষায় যদিও 'ণ' ও 'ন' এবং 'ষ' ও 'স' এর উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই, তবুও লিখিবার সময় তৎসম শব্দগুলির বর্ণশুদ্ধির জন্য ণত্ব ও ষত্ব সম্বন্ধে নিয়মগুলি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিজস্ব সম্পদ। অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙলা ভাষায় প্রয়োগ হয় বলিয়া ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধানের আলোচনা বাঙলায় বিশেষ প্রয়োজন।

ণত্ব-বিধান

বাঙলায় মূর্ধন্য 'ণ'-এর উচ্চারণ করা হয় না, কিন্তু সংস্কৃত শব্দের মূর্ধন্য 'ণ' অবিকৃতই থাকে। এইরূপ শব্দে সংস্কৃত ণত্ব-বিধান প্রযোজ্য। এই বিষয়ের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নিম্নে দেওয়া হইল:

১। **ঋ, র্, ষ্**—এই তিন বর্ণের পরস্থিত পদমধ্যবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য **'ণ'** হয়। যেমন—পূর্ণ, কর্ণ, ঋণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, ভূষণ, সহিষ্ণু ইত্যাদি।

২। **ঋ, র্, ষ** এই তিন বর্ণের কোন একটির পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ, বা ং (অনুস্বার) ব্যবধান থাকিয়া পরে দন্ত্য 'ন' থাকিলেও উহা মূর্ধন্য **'ণ'** হয়। যথা—মরণ, শরণ, শ্রবণ, দর্পণ, গ্রহণ, রুক্মিণী, অর্পণ, ম্রিয়মাণ, প্রয়াণ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

৩। এক পদে ঋ, র্, ষ ও অন্য পদে দন্ত্য 'ন' থাকিলে মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যথা—হরিনাম, অর্জুন, দুর্নাম, চারুনেত্রা, ত্রিনয়না, নরনাথ, সর্বনাম ইত্যাদি।

[**দ্রষ্টব্য:** শূর্প+নখা (নখ+আ)=শূর্পণখা; এস্থলে ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া **শব্দটি** একপদরূপে বিবেচিত হইয়াছে। সেইজন্য এখানে 'ণ' হইল। কিন্তু তাম্রনখ বলিলে **'ন'** হইবে। কারণ, ইহা একপদ নহে]।

কয়েকটি বিশেষ শব্দের বানান লক্ষণীয়। যেমন—রামায়ণ, উত্তরায়ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ, পরিণয়, অগ্রহায়ণ, প্রয়াণ, অগ্রণী, নারায়ণ প্রভৃতি।

৪। **ঋ**, র ও ষ এর পর **ত বর্গ** সংযুক্ত দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন—বৃন্ত, গ্রন্থি, ভ্রান্ত, রন্ধন, বন্ধন, ক্রন্দন ইত্যাদি।

৫। শব্দের শেষের হসন্ত দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন—শ্রীমান্, বর্মন্, শর্মন্, গরীয়ান্, সারবান্ ইত্যাদি।

৬। **'ট'** বর্গযুক্ত দন্ত'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—কণ্টক, লুণ্ঠন, ভণ্ড ইত্যাদি।

৭। সংস্কৃত শব্দ হইতে যে সমস্ত শব্দ গঠিত হয় তাহাদের বেলায় বিকল্পে ণত্ব-বিধান করা হয়। যথা—কান—কাণ, চুন—চুণ, পান—পাণ, পুরান—পুরাণ, রানী—রাণী ইত্যাদি। বাঙলা ক্রিয়াপদের শেষে মূর্ধন্য 'ণ' বসে না। যেমন—ধরেন, পড়েন, করেন ইত্যাদি।

৮। কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃ মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—

বীণা, বাণী, বেণু, বেণী, গণক, লবণ।
ফণী, মণি, অণু, গুণ, বণিক, গণন ॥
শণ, পণ, ঘ্রাণ, বাণ, কল্যাণ, নিপুণ।
নিক্কণ, চিক্কণ, তূণ, গণিকা, মৎকুণ ॥
শোণিত, কণাদ, স্থাণু, কফোণি, কঙ্কণ।
কণিকা, লাবণ্য, ভাণ, বিপণি, আপণ ॥

[**দ্রষ্টব্য ঃ** তদ্‌ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে বাঙলায় দন্ত্য 'ন' লেখা বর্তমানে প্রচলিত। যেমন—সোনা, কান, ট্রেন, ইরান, রানী, কোরান, পুরান ইত্যাদি। সাধারণতঃ এইসব বানানে ণত্ব-বিধানের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। কারণ অসংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য 'ণ' ব্যবহার না করিলেও তাহাতে ভুল হয় না।]।

ষত্ব-বিধান

যে সমস্ত **সংস্কৃত** শব্দে **'ষ'** অবিকৃত থাকে সাধারণতঃ বাঙলায় প্রচলিত এইরূপ শব্দের **ষত্ব-বিধানের** কতকগুলি নিয়ম নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১। অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ এবং র্ এই সকল বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যথা—জিগীষা, শুশ্রূষা, চিকীর্ষা, বুভুক্ষা, ভবিষ্যৎ, পরিষ্কার, শ্রীচরণেষু, মুমূর্ষু ইত্যাদি।

কিন্তু সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয় না। যথা—অগ্নিসাৎ, আত্মসাৎ, ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভস্মসাৎ, ইত্যাদি।

২। সমাস হইলে মাতৃ ও পিতৃ শব্দের পরস্থিত স্বসা শব্দের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যথা—মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা ইত্যাদি।

৩। সদ্, সিচ, স্থা প্রভৃতি ধাতুর দন্ত্য 'স' ইকারান্ত বা উকারান্ত উপসর্গের পরে থাকিলে সাধারণতঃ মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যথা—দুর্বিষহ, পরিষদ্, অভিষেক, প্রতিষেধক, অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৪। ঋ-কারের পর সর্বদাই মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যথা—ঋষি, বৃষ, তৃষ্ণা, কৃষ্ণা, ঋষভ, কৃষক ইত্যাদি।

৫। সংজ্ঞা বুঝাইলে অ, আ ভিন্ন স্বরের পরবর্তী 'সেন' শব্দের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যথা—মধুষেণ, হরিষেণ ইত্যাদি।

৬। দুর্, বি এবং সু এই তিনটি উপসর্গের পরবর্তী 'সম' শব্দের দন্ত্য 'স, মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যথা—দুষম, বিষম, সুষম ইত্যাদি।

৭। দুইটি পদ সমাসযুক্ত হইয়া একটি শব্দ গঠন করিলে প্রথম পদের শেষে ই, উ, ঋ, ও থাকিলে পরবর্তী আস্ত দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যথা—যুধিষ্ঠির, গোষ্ঠ, বিষম, সুষেণ, সুষমা ইত্যাদি।

৮। কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃই মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন—

কষায়, আষাঢ়, উষা পাষাণ বিষাণ, ভূষা
ওষধি, দূষণ।
আমিষ, উষর, রোষ তুষার, মহিষ, শোষ
বর্ষ, হর্ষ, তোষণ, ভূষণ ॥
ঔষধ, ঈষৎ, দ্বেষ কলুষ, মূষিক, শ্লেষ
কৃষি, বৃষ, সর্ষপ, কুষ্মাণ্ড।
বিষয়, বিশেষ্য, পৌষ তোষণ, কর্ষণ, ভীষ্ম
ষণ্ড, শষ্প, পুরুষ, পাষণ্ড ॥

বাঙলা শব্দে শ, ষ বা স

(১) মূল সংস্কৃত শব্দ অনুযায়ী তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে। যেমন—আঁশ, পোষা, শাঁস ইত্যাদি।

(২) বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুযায়ী S-এর স্থানে স, Sh-এর স্থানে শ এবং কখনও ষ ব্যবহৃত হয়। যথা—সবুজ, মসলা, শহর, শার্ট ইত্যাদি।

পূর্বে বাঙলা হরফের স্ট = স + ট যুক্তাক্ষর ছিল না, সেই কারণ উহার স্থলে ষ্ট = (ষ + ট) লেখা হইত। এখন 'স্ট' লেখাই উচিত। যেমন—ষ্টেশন > স্টেশন, ষ্ট্যাম্প > স্ট্যাম্প, মাষ্টার > মাস্টার ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। ণত্ব ও ষত্ব বিধির প্রধান প্রধান সূত্রগুলি উদাহরণসহ নির্দেশ কর।

২। কোন্ বানানটি ঠিক এবং কেন?

অপরাহ্ণ—অপরাহ্ন; ম্রিয়মাণ—ম্রিয়মান; শূর্পনখা—শূর্পণখা; ভাষণ—ভাসন; অঙ্গন—অঙ্গণ ইত্যাদি।

৩। দন্ত্য 'ন' কখন মূর্ধন্য 'ণ' হয় দেখাও।

৪। দন্ত্য 'স' কখন মূর্ধন্য 'ষ' হয় উদাহরণ দিয়া দেখাও।

৫। স্বাভাবিক ণত্ব ও ষত্বযুক্ত কতকগুলি শব্দ বল।

৬। ণত্ব-বিধির বা ষত্ব-বিধির প্রয়োগ বুঝাইয়া দাও:

ম্রিয়মাণ, কণ্টক, কীর্তন, দুর্নাম, করকমলেষু, সুচরিতাসু, বুভুক্ষা, ভূমিসাৎ (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)।

চতুর্থ অধ্যায়

পদ-প্রকরণ

[১]এক বা একাধিক বর্ণের সমষ্টিতে গঠিত হয় শব্দ কিন্তু বর্ণসমষ্টি মাত্রই শব্দ নয়। যেমন—লমক; যদিও ইহা কতকগুলি বর্ণসমষ্টি তথাপি অর্থবোধক নয় বলিয়া ইহা শব্দ নহে। কিন্তু কমল; ইহা বর্ণসমষ্টি এবং অর্থবোধকও বটে। অতএব ইহা শব্দ।

শব্দের সহিত প্রত্যয় যোগ করিয়া অথবা ধাতুর সহিত প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দসমষ্টি গঠিত হয়। যেমন—চাষ (শব্দ)+আ (প্রত্যয়)=চাষা (তদ্ধিতান্ত শব্দ); পুনরায় বাজ্ (ধাতু)+না (প্রত্যয়)=বাজনা (কৃদন্ত শব্দ)।

বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে **পদ** বলে। পদ হইলেই বাক্যে ব্যবহৃত হয়। পদ ভিন্ন বাক্য গঠিত হইতে পারে না। সংস্কৃতে আছে, **নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত**। স্পষ্টরূপে মনের ভাব প্রকাশক পদ-সমষ্টিকে লইয়াই বাক্য গঠিত হয়। শব্দগুলির একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ নিরূপণের জন্য বিভক্তি-যোগ করিয়া পদ গঠনের প্রয়োজন হয়। নতুবা কেবলমাত্র শব্দের মাধ্যমে স্পষ্ট অর্থ প্রকাশক বাক্য গঠন সম্ভব হইত না। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক্। যেমন—বালক মাঠ ফুটবল খেলা, ইহা কতকগুলি শব্দ-সমষ্টি, কিন্তু সুস্পষ্ট অর্থবোধক না হওয়ার জন্য বাক্য নয়। বালকের সহিত মাঠ, ফুটবল অথবা খেলার সম্পর্ক কোথায় তাহা কিছুই বুঝা যায় না। কিন্তু যদি বলা যায় 'বালকেরা মাঠে ফুটবল লইয়া 'খেলে', তাহা হইলে ইহাতে একটি বোধগম্য অর্থ প্রকাশিত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়, তাহাকে **বাক্য** বলে।

এখন দেখা যাক্ প্রথমোক্ত শব্দ-সমষ্টি হইতে দ্বিতীয়টিতে এমন কি পরিবর্তন ঘটিল যাহা দ্বারা দ্বিতীয়টিকে বাক্য-পর্যায়ভুক্ত করিতে পারিলাম। 'বালক' এই শব্দের সহিত যুক্ত হইয়াছে 'রা' এই বিভক্তি। এইভাবে মাঠের সহিত 'এ', ফুটবলের সহিত 'এ'। এই সকল বিভক্তি যুক্ত হইয়া প্রথমোক্ত শব্দ-সমষ্টিকে একটি বোধ্য বাক্যে পরিণত করিয়াছে। আগেই বলিয়াছি শব্দের সহিত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। অতএব দেখা গেল যে পদ ভিন্ন কোন বাক্য গঠন করাই সম্ভব নহে।

বালকেরা তাহাদের সবুজ মাঠে প্রতিদিন খেলে। এখানে 'বালকেরা' নামবাচক শব্দ; অতএব ইহা **বিশেষ্য**। 'তাহাদের' পদটি 'বালকেরা' এই নামবাচক শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে; অতএব ইহা **সর্বনাম**। 'সবুজ' এই শব্দটি 'মাঠ' এই

নামবাচক শব্দের গুণ প্রকাশ করিতেছে। অতএব ইহা **বিশেষণ**। মাঠ—**বিশেষ্য**। ‘প্রতি’ একটি **অব্যয় পদ**। কেননা উহার কোন ব্যয় নাই। ‘প্রতিদিন’ এই পদটি **‘খেলে’** এই ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। খেল্ এই ধাতুর সহিত **‘এ’** বিভক্তি যুক্ত করিয়া হইয়াছে ‘খেলে’ **ক্রিয়াপদটি**।

পদের প্রকারভেদ

উৎপত্তি-স্থল-ভেদে বাঙলা ভাষার পদকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) নামপদ ও (২) ক্রিয়াপদ।

(১) **নামপদ**ঃ শব্দ হইতে শব্দবিভক্তি যোগে যে পদ উৎপন্ন হয়, তাহাকে **নামপদ** বলে। যথা—ছেলেরা, শিশুকে, নদীতে, পাঠশালা ইত্যাদি।

(২) **ক্রিয়াপদ**ঃ ধাতু হইতে ধাতু বিভক্তি যোগে যে পদ উৎপন্ন হয়, তাহাকে **ক্রিয়াপদ** বলে। যথা—করে, যাইবে, পড়িত, বলিয়াছিল ইত্যাদি।

নামপদকে অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার অনুসারে চারিভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) **বিশেষ্য**, (২) **বিশেষণ**, (৩) **সর্বনাম** ও (৪) **অব্যয়**। এই চারি-প্রকার নামপদ এবং **ক্রিয়াপদ** মিলিয়া পদ মোট **পাঁচ প্রকার**।

(১ বিশেষ্যপদ

যে পদ ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, ক্রিয়া, সমষ্টি বা অবস্থা বুঝায়, তাহাকে **বিশেষ্যপদ** বলে। বিশেষ্যপদকে নিম্নলিখিত আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) **সংজ্ঞাবাচক-বিশেষ্য**ঃ যাহা দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান অথবা কোন কিছুর সংজ্ঞা বুঝায়, তাহাকে সংজ্ঞাবাচক-বিশেষ্য বলে।

প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক ভেদে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) **প্রাণিবাচক**—রবীন্দ্রনাথ, জহরলাল, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি ; (২) **অপ্রাণি-বাচক**—কলিকাতা, দিল্লী, জ্যৈষ্ঠ, হিমালয়, রামায়ণ, গীতাঞ্জলী ইত্যাদি।

(খ) **বস্তুবাচক-বিশেষ্য**ঃ যাহা দ্বারা কোন বস্তু বা দ্রব্য বুঝায়, তাহাকে বস্তুবাচক-বিশেষ্য বলে। যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, জল, বায়ু ইত্যাদি।

(গ) **জাতিবাচক-বিশেষ্য**ঃ যাহা দ্বারা কোন জাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়-বিশেষকে বুঝায়, তাহাকে জাতিবাচক-বিশেষ্য বলে। যথা—মানুষ, গরু, হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়, পর্বত, পক্ষী ইত্যাদি।

(ঘ) **গুণবাচক-বিশেষ্য**ঃ যাহা দ্বারা বিশেষ্যের কোন গুণ বা ধর্ম বুঝায়, তাহাকে গুণবাচক-বিশেষ্য বলে। যথা—দয়া, মায়া, মমতা, বিদ্যা, সৌন্দর্য, বিনয় ইত্যাদি।

(ঙ) **ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক-বিশেষ্য ঃ** যাহা দ্বারা কোন ক্রিয়ার নাম বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা—শয়ন, অধ্যয়ন, ভোজন, শ্রবণ, গমন, আসা, যাওয়া, দেখা, শুনা ইত্যাদি।

(চ) **সমষ্টিবাচক-বিশেষ্য ঃ** যাহা দ্বারা একজাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির একত্র সমাবেশ বুঝায়, তাহাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যথা—মণ্ডলী, শ্রেণী, সভা, সমিতি, গোছা, সঙ্ঘ, ঝাঁক, দল, গুবক্ক, সমাজ, জনতা ইত্যাদি।

(ছ) **সময়বাচক বিশেষ্য ঃ** সন্ধ্যা, প্রভাত, দিবস, নিশীথ ইত্যাদি। উদাহরণ—'মেঘের অন্ধকারে 'সন্ধ্যা' বলিয়া ভ্রম হইতেছে।' (রবীন্দ্রনাথ)

(জ) **অবস্থাবাচক বিশেষ্য ঃ** সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, উদ্বেগ, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি। উদাহরণ—'ভাষা নাহি খুঁজে পাই, ভাব যায় হারাইয়া শোকে।' (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

(২) বিশেষণপদ

যে পদ বিশেষ্য বা অন্য পদের বিশেষ অবস্থা, গুণ, প্রকৃতি, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি বুঝায়, তাহাকে **বিশেষণপদ** বলে। যথা—অনিল 'দুষ্ট' ছেলে, অমল 'সাধু' ব্যক্তি; কবিতা 'খুব' বুদ্ধিমতী মেয়ে ইত্যাদি।

[**দ্রষ্টব্য ঃ** বাঙলায় সংস্কৃতের মত বিশেষণের সহিত সর্বত্র বিভক্তি যুক্ত হয় না]।

বিশেষণপদকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) **বিশেষ্যের বিশেষণ ঃ** যে পদ বিশেষ্যপদের দোষ, গুণ, অবস্থা ও পরিমাণ প্রকাশ করিয়া বিশেষভাবে নির্দেশ করে, তাহাকে বিশেষ্যের বিশেষণ বলে। যথা—'তিনি দক্ষের 'আদরিণী' কন্যা।' (দীনেশ সেন); 'একটি 'ছোট' মেয়ে তাহার 'ছোট' ভাইকে সঙ্গে করিয়া ঘাটে আসিল' (রবীন্দ্রনাথ)।

(খ) **বিশেষণের বিশেষণ ঃ** যে বিশেষণপদ অন্য কোন বিশেষণপদের গুণ, দোষ, অবস্থা আরও বিশেষভাবে প্রকাশ করে, তাহাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে। যথা—'কিন্তু নাহি শুনি—'হেন' মধুমাখা কথা এ জগতে' (মধুসূদন)।

(গ) **ক্রিয়ার বিশেষণ ঃ** কোন একটি কার্য হইলে তাহা কখন হইয়াছিল, কিরূপে হইয়াছিল এবং কোথায় হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয় বলা অনাবশ্যক হয় অথবা যে সকল বিশেষণ পদ দ্বারা ক্রিয়ার ঐ রূপ ভাব প্রকাশ করা যায় সেইগুলিকে ক্রিয়ার বিশেষণ বলে। যথা—'ঝরনা ঝরে কল্‌কলিয়ে' আঁকাবাঁকা ভঙ্গীতে'। (রবীন্দ্রনাথ); 'ভরত 'উচ্চৈঃস্বরে' ডাকিলেন,—"আয়, আয়, আয়" (শরৎচন্দ্র)।

সেইরূপ—'ফিরিব না, 'আমরণ রহিব হেথায়।' 'সহসা' হেরিনু তারে আপন অন্তরে।' 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা 'বিষাদে' (মাইকেল মধুসূদন)।

[**দ্রষ্টব্য :** মনে রাখিও, নাম বিশেষণের মত ক্রিয়ার বিশেষণও ক্রিয়া বা বিশেষণপদের পূর্বে বসে।

(ঘ) **সর্বনামের বিশেষণ :** আমি তুমি শব্দ ভিন্ন যাবতীয় সর্বনামপদকে সর্বনামের বিশেষণ বলে। যথা—তুমি 'কোন্' স্কুলে পড়ছ? এখানে 'কোন্' পদটি সর্বনাম হইলেও, 'স্কুল' এই বিশেষ্যপদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা সর্বনামের বিশেষণ।

(ঙ) **অব্যয় বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ কোন অব্যয়পদের গুণ প্রকাশ করে, তাহাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা—সে 'প্রায়' তোমার ন্যায়ই গরীব। এই বাক্যে 'প্রায়' পদটি 'ন্যায়' এই অব্যয়পদটির অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং ইহা অব্যয়ের বিশেষণ।

(চ) **বিধেয় বিশেষণ :** বিশেষণ পদ সাধারণতঃ বিশেষ্যের পূর্বে বসে, কিন্তু কখনও কখনও পরেও বসিয়া থাকে। যখন পরে বসে তখন তাহাকে বিধেয় বিশেষণ বলে। যথা—মানবের মন **এত** কি **অসার**? (কামিনী রায়)

(ছ) **ভাব বিশেষণ :** যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ব্যতীত অন্যপদকে বিশেষ করে, অথবা বাক্যকে বিশেষ করে, তাহাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ প্রধানতঃ চারি প্রকার। যথা—ক্রিয়াবিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ ও বাক্যের বিশেষণ ইহাদের সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

অর্থ ও প্রয়োগভেদে বিশেষণকে আরও তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) একপদীয় বিশেষণ, (২) যৌগিক বিশেষণ ও (৩) পদময় বিশেষণ।

(১) **একপদীয় বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদে মাত্র একটি শব্দ থাকে তাহাকে একপদীয় বিশেষণ বলে। যথা—'বড়' লোক, 'বন্য' হস্তী, 'ঘুমন্ত' শিশু, 'গেঁয়ো' যোগী, 'দাতব্য' চিকিৎসালয় ইত্যাদি।

(২) **যৌগিক বিশেষণ :** একের অধিক পদ মিলিত হইয়া এক পদ হইলে, উহা কখন কখন বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রকার বিশেষণকে যৌগিক বিশেষণ বলে। যেমন—'তুমুখো' সাপ, 'পুঁথিগত' বিদ্যা, 'অস্তগামী' সূর্য, 'দিল্‌দরিয়া' মেজাজ ইত্যাদি।

(৩) **পদময় বিশেষণ :** অনেক সময় তুই বা ততোধিক পদসমষ্টি বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়, ইহাই পদময় বিশেষণ। যেমন—'নাস্তানাবুদ' অবস্থা, 'দাঁত বের করা' হাসি, 'নাম না-জানা' সাপ ইত্যাদি।

বিশেষণের তারতম্য

বিশেষণপদ নামপদ অথবা সর্বনাম পদের অবস্থা, গুণ অথবা পরিমাণ প্রকাশ করে। এই সকল অবস্থা, গুণ ও পরিমাণের সহিত অন্যের অবস্থা, গুণ বা পরিমাণের তুলনা করা হয়। কোন বিশেষণপদের সাধারণ অবস্থায় 'তর' বা 'ঈয়স্' যোগ করিলে দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝায়। আর বহুব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা বুঝাইলে 'তম' বা 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। বিশেষণের এই তুলনা করাকেই **বিশেষণের তারতম্য** (**Comparison of Adjectives**) বলে।

বাঙলায় সাধারণতঃ 'অপেক্ষা' 'হইতে', 'থেকে', 'সর্বাপেক্ষা', 'কম', 'বেশী' প্রভৃতি তুলনাবাচক **অনুসর্গযোগে** বিশেষণের তারতম্য করা হয়। যেমন—ধন 'অপেক্ষা' মান বড়; তোমা 'হইতে' গৌরী বড়; গোরু 'থেকে' মহিষ বড় ইত্যাদি। দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের আধিক্য বুঝাইতে বিশেষণের পূর্বে 'অধিক', 'অনেক', 'খুব', 'বেশী' প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ বসে। যেমন—রাম শ্যামের চেয়ে 'অধিক' বলবান।

বাঙলায় 'তর এবং 'তম' প্রত্যয় যোগ করিলে মূল বিশেষণপদের কোন রূপান্তর হয় না। কিন্তু 'ঈয়স' এবং 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যোগ করিলে কোন কোন শব্দের রূপ বদলায়। নিম্নে কয়েকটি বিশেষণপদের তারতম্য দেওয়া হইল:

মূল বিশেষণপদ	তর বা ঈয়স্ যোগে	তম বা ইষ্ঠ যোগে
লঘু	লঘুতর লঘীয়স্ (লঘীয়ান্)	লঘুতম লঘিষ্ঠ
গুরু	গুরুতর গরীয়স্ (গরীয়ান্)	গুরুতম গরিষ্ঠ
উন্নত	উন্নততর	উন্নততম
উচ্চ	উচ্চতর	উচ্চতম
অন্তর	অন্তরতর	অন্তরতম
প্রিয়	প্রিয়তর প্রেয়স্ (প্রেয়ান্)	প্রিয়তম প্রেষ্ঠ
স্থূল	স্থূলতর	স্থূলতম
নব	নবতর	নবতম
মহৎ	মহত্তর মহীয়স্ (মহীয়ান্)	মহত্তম মহিষ্ঠ
বৃদ্ধ	বর্ষীয়স্ (বর্ষীয়ান্) জ্যায়স্ (জ্যায়ান্)	বর্ষিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ

(৩) সর্বনামপদ

বিশেষ্যপদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ না করিয়া উহার পরিবর্তে যে পদের ব্যবহার করা হয়, তাহাকে **সর্বনাম** বলে। যেমন—সমীর বড় ভাল ছেলে; সমীর প্রত্যহ স্কুলে যায়; সমীরকে সকলে ভালবাসে। উক্ত বাক্যগুলিতে 'সমীর' এই ব্যক্তিবাচক নামপদটির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করাতে ভাষার সৌষ্ঠব বা সৌন্দর্যবর্ধিত হয় নাই।

প্রত্যেক বাক্যে 'সমীর' পুনঃ পুনঃ ব্যবহার না করিয়া যদি বলি 'সমীর' বড় ভাল ছেলে; 'সে' প্রত্যহ স্কুলে যায়; 'তাহাকে' সকলে ভালবাসে। তাহা হইলে 'সে' ও 'তাহাকে' ব্যবহার করাতে ভাষার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যবর্ধিত হয়। সুতরাং এখানে 'সে' এবং 'তাহাকে' সর্বনামপদ। এইরূপ—আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের; তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাদের; সে, তিনি, তাহারা, তাহাকে, তাঁহার, তাহাদের এবং ইহা, যিনি, যে, কে, প্রভৃতি সর্বনামপদ।

সর্বনামপদ নিম্নলিখিত সাত প্রকারের :

(ক) **পুরুষবাচক** (Personal) : তুমি, আমি, আপনি, সে প্রভৃতি।

(খ) **নির্দেশসূচক** (Demonstrative) : এ, ইহা, ইনি, উনি প্রভৃতি।

(গ) **প্রশ্নবাচক** (Interrogative) : কে, কি, কারা, কোন্ প্রভৃতি।

(ঘ) **সম্বন্ধবাচক** (Relative) : যে, যাহা, যিনি, তাহা, তাহারা প্রভৃতি।

(ঙ) **অনির্দেশক** (Indefinite) : কেহ, কেউ, কিছু প্রভৃতি।

(চ) **আত্মবাচক** (Reflexive) : স্ব, স্বয়ং, নিজে, আপনি প্রভৃতি।

(ছ) **সাকল্যবাচক** (Inclusive) : সর্ব, সকল, উভয় প্রভৃতি।

(৪) অব্যয়পদ

বাঙলায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা বিভিন্ন লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তিতে ব্যবহৃত হইলে তাহাদের আকারের কোন পরিবর্তন ঘটে না। শব্দগুলির এইরূপ ব্যবহারে উহাদের কোন প্রকার ব্যয় অর্থাৎ রূপান্তর হয় না বলিয়া উহাদিগকে **অব্যয়** বলে। সুতরাং যে সমস্ত শব্দের লিঙ্গ, বচন ও কারক ভেদে আকারের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না, তাহাদিগকে **অব্যয়পদ** বলে। যেমন—রাম 'ও' মহিম যাইতেছে; মরি 'কিংবা' মারি অরি; কাজ কর, 'নতুবা' কে খাইতে দিবে? এই বাক্যগুলির মধ্যে যথাক্রমে 'ও', 'কিংবা', 'নতুবা' এই শব্দ তিনটি অব্যয়পদ।

অব্যয়পদ নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। পরপৃষ্ঠায় ইহাদের কতকগুলির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(ক) সমুচ্চয়ী বা **বাক্যান্বয়ী অব্যয় (Conjunction) :** যে সকল অব্যয় বিভিন্ন পদ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে, তাহাদিগকে **সমুচ্চয়ী অব্যয়** বলে।

এই শ্রেণীর অব্যয়কে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারে ভাগ করা যায় :

(১) **সংযোজক :** ও, এবং, আর, আরও, তবু, তথাপি ইত্যাদি।

(২) **বিয়োজক :** বা, অথবা, কিংবা, নহিলে, নতুবা, হয়, নয় ইত্যাদি।

(৩) **সঙ্কোচক :** বরং, কিন্তু, তথাপি, তবে ইত্যাদি।

(৪) **হেতুবোধক :** অতএব, সুতরাং, বাস্তবিক, যেহেতু, কারণ ইত্যাদি।

(৫) **নিত্যসম্বন্ধী :** যদিও—তথাপি, হইতে পারি—কিন্তু, বরং—তবু, যখন—তখন, যেমন—তেমন, যত—তত ইত্যাদি।

[**দ্রষ্টব্য :** দুইটি সমুচ্চয়ী অব্যয় একসঙ্গে ব্যবহৃত হইলে তাহাদিগকে **নিত্যসম্বন্ধী** অব্যয় বলে। যেমন—বরং অনাহারী থাকিব, তথাপি পাপীর অন্ন গ্রহণ করিব না। 'যেমন মা, তেমন ছেলে হবে ত !' ইত্যাদি]। (শরৎচন্দ্র)

(খ) পদান্বয়ী অব্যয় বা **অনুসর্গ (Preposition) :** কতকগুলি অব্যয়যোগে শব্দের বিশেষ বিশেষ বিভক্তি হয়; সেই সেই বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত তাহাদের অন্বয় হয়। এইজন্য এগুলিকে **পদান্বয়ী অব্যয়** বলে। যথা—জন্য, সহিত, বিনা, ছাড়া, প্রায়, নিমিত্ত, দ্বারা, থেকে ইত্যাদি। এই অব্যয়গুলি আবার বিভক্তির স্থলে বসে বলিয়া ইহাদের **অনুসর্গ** (Preposition) বলা হয়।

(গ) অনন্বয়ী অব্যয় (Interjection) : হর্ষ, প্রশ্ন, বিস্ময়, মনের ভাব ও সম্বোধন ইত্যাদি বুঝাইতে যে অব্যয়গুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে **অনন্বয়ী অব্যয়** বলে। অনন্বয়ী অব্যয় নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত :

(১) **বিস্ময়াদি বা ভাবসূচক অব্যয় :** ইহারা শোক, হর্ষ, ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা ও লজ্জা প্রভৃতি মানসিক অবস্থা বা ভাবপ্রকাশ করে বলিয়া ইহাদিগকে বিস্ময়াদি বা ভাবসূচক অব্যয় বলা হয়। যেমন—'মরি মরি' কি রূপ! 'আহা' লোকটা কি কষ্টটাই না পাচ্ছে! 'আঃ', কি আরাম! 'ওঃ' কি ভীষণ লোক! 'ছি ছি' মরি লাজে—কে সাজালে মোরে মিছে সাজে।' (রবীন্দ্রনাথ)।

আহা, উহু, ছি, ধিক, বাহবা, সাবাস, উঃ, আঃ, বাঃ, মরিমরি, বাবারে বাবা! ওরে বাবা! ইত্যাদি শব্দগুলি এই শ্রেণীর অব্যয়।

(২) **সম্বোধনসূচক অব্যয় :** কাহাকেও সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে হইলে এই শ্রেণীর অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন—'**ওগো** তুমি আমার দেবতা, তিনি তোমার চেয়েও বড় যে'! (শরৎচন্দ্র)।

'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে **হে** প্রবল প্রাণ' (রবীন্দ্রনাথ) '**ওরে** গৃহবাসী খোল্ দ্বার খোল্।' (রবীন্দ্রনাথ) '**ওহে** নবীন অতিথি, তুমি নূতন কি চিরন্তন।' (রবীন্দ্রনাথ)।

হে, রে, অয়ি, লো, গো, হ্যাঁরে, ওহে, হ্যাঁগো ইত্যাদি শব্দগুলি এই শ্রেণীর অব্যয়।

(৩) **প্রশ্নসূচক অব্যয়ঃ** কাহাকে কিছু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে এই শ্রেণীর অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা—আকাশে 'কি' মেঘ আছে? সে 'না' কলিকাতা গিয়াছিল? হরি 'নাকি' পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে? ইত্যাদি।

কি, কেন, না, নাকি, তো, যে ইত্যাদি শব্দগুলি এই শ্রেণীর অব্যয়।

(৭) **বাক্যালঙ্কার** বা **অনর্থক অব্যয়ঃ** বাক্যের সৌন্দর্যবর্ধন বা বিশিষ্টতা দানের জন্য কতকগুলি অব্যয় প্রয়োগ হয়; ইহাদিগকে বাক্যালঙ্কার বা অনর্থক অব্যয় বলে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর অব্যয়গুলি কোন অর্থ প্রকাশ করে না। যথা—মেয়ে 'তো' নয় 'যেন' মূর্তিমতী লক্ষ্মী। আমার কথাটা 'যেন' তোমার মনে থাকে; তুমি 'যে' দিনদিনই শুকাইয়া যাইতেছ?

আর, যেন, কি, বড়, তো, না, যে ইত্যাদি শব্দগুলি এই শ্রেণীর অব্যয়।

অন্যান্য অব্যয়

(ক) **অনুকার*** বা **ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ঃ** কতকগুলি অব্যয়পদ ভাবের অনুকরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যথা—'অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া 'টপ্ টপ্' করিয়া জল পড়িতে লাগিল।' (শরৎচন্দ্র)। 'কুড়িদের বাড়ীতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল।' (রবীন্দ্রনাথ) 'কড়কড়াকড' 'কড়াৎ' 'কড়াৎ' ডাকবে যখন ঝনঝনে' ইত্যাদি (গিরীশ ঘোষ)।

ধূ ধূ, খাঁ খাঁ, ঝন্ ঝন্, কন্ কন্, শম্ শম্, শোঁ শোঁ, খিল্ খিল্, ঢং ঢং, হন্ হন্, তর্ তর্, কচ্ কচ্, খক্ খক্ প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অনুকার নামে পরিচিত। ইহারা ক্রিয়া-বিশেষণ ও নাম-বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়।

(খ) **বিশেষণ অব্যয়ঃ** সহসা, ন্যায়তঃ, আদৌ, অতি ইত্যাদি শব্দগুলি এই শ্রেণীর অব্যয়।

(গ) **বিভক্তিসূচক অব্যয়ঃ** এই শ্রেণীর অব্যয় দ্বারা বিভক্তি সূচিত হয়। ইহাদের প্রয়োগে কখনও কখনও শব্দের উত্তরে বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—মন 'দিয়া' কর সবে বিদ্যা উপার্জন; কবিগণের 'মধ্যে' কালিদাস শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

(ঘ) **উপসর্গ অব্যয়ঃ** ইহারা সংখ্যায় কুড়িটি। যথা—প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির্, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ ইত্যাদি। ইহারা ধাতুর সহিত একযোগে ব্যবহৃত হয়। চতুর্দশ অধ্যায়ে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

---

*অনুকার শব্দমাত্রই ধ্বন্যাত্মক, অন্য শব্দের অনুকরণে করা হয় তাই এই নাম। কিন্তু তাই বলিয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দমাত্রই অনুকার নহে।

(ঙ) ক্রিয়াপদ

ভাষার মধ্যে যে পদের দ্বারা কোন কিছু হওয়া, করা, যাওয়া প্রভৃতি বুঝায়, তাহার নাম **ক্রিয়া**। ক্রিয়াপদের মূল অংশকে ধাতু বলে। ধাতুর উত্তরে ক্রিয়াবিভক্তি যোগে **ক্রিয়াপদ** গঠিত হয়। ক্রিয়ার মূল ধাতু তিন প্রকার। যথা—(ক) সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু, (খ) সংযোগাত্মক বা যৌগিক ধাতু ও (গ) সাধিত ধাতু।

(ক) **সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু :** যে সকল ধাতুকে বিশ্লেষণ করা যায় না, অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ তাহাকে **সিদ্ধ** বা **মৌলিক ধাতু** (**Primary Roots**) বলে। এই মৌলিক ধাতুগুলির কতক বাঙলার নিজস্ব ধাতু, কতক সংস্কৃত তৎসম ধাতু এবং কতক বা প্রকৃত ধাতু। যথা—চল্, কর্, লিখ্, খেল্, পড়্, বল্, জান্, দে, ধা, কিন্ ইত্যাদি।

(খ) **সংযোগাত্মক বা যৌগিক ধাতু :** বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সহিত মৌলিক ধাতুর সংযোগে যে সকল ধাতু গঠিত হয়, তাহাদিগকে **সংযোগাত্মক** বা **যৌগিক ধাতু** (**Compound Roots**) বলে। প্রযোজক, ধ্বন্যাত্মক ও নামধাতু যৌগিক ধাতু। যথা—প্রমাণ কর্ (প্রণাম + কর্), খেলা কর্ (খেলা + কর্), মার খা (মার + খা), আছাড় খা (আছাড় + খা) ইত্যাদি।

(গ) **সাধিত ধাতু :** যে সকল ধাতুকে বিশ্লেষণ করিলে সিদ্ধধাতু, বিশেষ্য বা বিশেষণের সহিত প্রত্যয় এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ পাওয়া যায়, তাহাকে **সাধিত ধাতু** (**Derivative Roots**) বলে। যথা—করা=(কর্ + আ), পড়া=(পড়্ + আ), চরায়=(চর্ + আ + য়), দেখায়=(দেখ্ + আ + য়) ইত্যাদি।

সাধিত ধাতু তিনপ্রকার। যথা—**প্রযোজক** বা **ণিজন্ত ধাতু, নাম ধাতু** এবং **সনন্ত ধাতু**।

[**দ্রষ্টব্য :** অষ্টম অধ্যায়ে ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে]।

অনুশীলনী

১। পদ কাহাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। বিশেষ্যপদ কাহাকে বলে এবং কয়প্রকার? বিশেষণপদ কাহাকে বলে? প্রত্যেকের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ঈয়স্ ও ইষ্ঠ প্রত্যয় যোগ করিয়া বাক্য রচনা কর: প্রিয়, লঘু, মহৎ, দীর্ঘ, বহু, পাপ।

৪। অনুকার অব্যয়গুলির যথাযথ প্রয়োগ দেখাও (যে কোন চারিটির): কিন্‌কিন্, খিল্‌খিল্, গম্‌গম্, গল্‌গল্, ছম্‌ছম্, ঝম্‌ঝম্, ঝল্‌মল্।

(ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) ১৯৫৫)

পঞ্চম অধ্যায়

লিঙ্গ ও বচন

লিঙ্গ

পার্থিব জীব এবং বস্তুকে লিঙ্গ ভেদে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। **স্ত্রী, পুরুষ** এবং **ক্লীব** বা নপুংসক। ব্যাকরণেও এই ভাগ অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা—**স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ** ও **ক্লীবলিঙ্গ**। স্বভাবতই পুরুষজাতি বুঝাইতে **পুংলিঙ্গ** (নর), স্ত্রী জাতি বুঝাইতে **স্ত্রীলিঙ্গ** (নারী) এবং স্ত্রী পুরুষ কিছুই বুঝায় না, তাহাকে **ক্লীবলিঙ্গ** বলে। সাধারণতঃ অপ্রাণিবাচক শব্দগুলিকে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া মনে করা হয়। যেমন—জল, বন, পাহাড় ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত কোন কোন শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়কেই বুঝায় এইরূপ শব্দকে **উভয় লিঙ্গ** বলে। যথা—শিশু, সন্তান, বন্ধু, লোক ইত্যাদি। পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য ইহাদের সঙ্গে একটি করিয়া পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ যুক্ত হয়। যথা—পুরুষ সন্তান—স্ত্রী সন্তান ; পুরুষ লোক—স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

লিঙ্গ শব্দের অর্থ লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা আমরা কোন্ শব্দটি কোন্ লিঙ্গ তাহা নির্ণয় করিতে পারি। অবশ্য অর্থ ও প্রয়োগ দ্বারাও লিঙ্গ নির্ণয় করা যায়। সংস্কৃতে 'দার' শব্দটি স্ত্রীবোধক হইলেও পুংলিঙ্গ এবং 'কলত্র' স্ত্রীবোধক হইলেও ক্লীবলিঙ্গ।

সংস্কৃতে প্রত্যয়জাত শব্দগঠন দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ভেদাভেদ নির্ণীত হয়। যেমন—শ্রীমান্ পুংলিঙ্গ শব্দ, শ্রীমতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। সংস্কৃতে বিশেষ্যের যে লিঙ্গ হয়, বিশেষণেরও সেই অনুযায়ী লিঙ্গান্তর হয়। যেমন—সুন্দরঃ বালকঃ কিন্তু সুন্দরী বালিকা।

বাঙলায় উভয়ক্ষেত্রেই 'সুন্দর' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে কোনরূপে বাধা নাই। অর্থাৎ বিশেষ্যের লিঙ্গান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলায় বিশেষণেরও লিঙ্গান্তরের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যেমন—

'তোমরা দেখিয়া চুপি চুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া **অধীর** হও।' (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে অধীর স্থলে অধীরা হয় নাই। তবে শ্রুতি-মধুরতার জন্য বিশেষতঃ তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বিশেষণের লিঙ্গান্তর ঘটিয়া থাকে। যেমন—

'আমার কপালে বিপরীত ফল
চপলা লক্ষ্মী মোরে অপচল
ভারতী না থাকে থির একপল।
এত করি তার সেবা।' (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে চপল লক্ষ্মী বলিলে শ্রুতিমধুর হইত না।

আধুনিক বাঙলা ভাষায় বিশেষণের লিঙ্গ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে; তবে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য প্রকাশ করিতে তৎসম শব্দের এবং বিশেষ্য অনুযায়ী লিঙ্গের রূপ ধারণ করে।

লিঙ্গান্তর—সাধারণতঃ পুংলিঙ্গ শব্দকে নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করা যায়। যথা—(ক) প্রত্যয়যোগে, (খ) সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দদ্বারা এবং (গ) শব্দের পূর্বে বা পরে স্ত্রী-বোধক শব্দযোগে।

(ক) প্রত্যয়যোগে লিঙ্গ পরিবর্তন

(১) **আ-প্রত্যয়যোগে :** অশ্ব—অশ্বা; বৃদ্ধ—বৃদ্ধা; কৃশ—কৃশা; শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠা; দীন—দীনা; নবীন—নবীনা; প্রিয়—প্রিয়া; প্রথম—প্রথমা; চতুর—চতুরা মলিন—মলিনা; মহাশয়—মহাশয়া; কল্যাণীয়—কল্যাণীয়া; কোকিল—কোকিলা; শিক্ষক—শিক্ষিকা; মনোরম—মনোরমা; চপল—চপলা; নিন্দিত—নিন্দিতা সর্বংসহ—সর্বংসহা; মাননীয়—মাননীয়া ইত্যাদি।

পুংলিঙ্গ অক-প্রত্যয়ান্ত (গায়ক, নায়ক, লেখক প্রভৃতি) শব্দের উত্তরে সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গে আ-প্রত্যয় হয়। আ-প্রত্যয় হইলে 'অক' স্থানে 'ইক'+আ হয়। যথা—সেবক—সেবিকা; নায়ক—নায়িকা; অধ্যাপক—অধ্যাপিকা; বাহক—বাহিকা; সম্পাদক—সম্পাদিকা; পাঠক—পাঠিকা; অভিভাবক—অভিভাবিকা; গায়ক—গায়িকা ইত্যাদি।

(২) **ঈ প্রত্যয়যোগে :** নর—নারী; ছাত্র—ছাত্রী; গৌর—গৌরী; খোকা—খুকী; বিড়াল—বিড়ালী; ঘটক—ঘটকী; সাময়িক—সাময়িকী ষোড়শ—ষোড়শী; নেতা—নেত্রী; একাদশ—একাদশী; দেব—দেবী; কুমার—কুমারী; সিংহ—সিংহী; নদ—নদী; গোপ—গোপী; চতুর্থ—চতুর্থী; পিতামহ—পিতামহী; ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী; কিশোর—কিশোরী; শ্রীমান্—শ্রীমতী; রজক—রজকী (চণ্ডীদাসের প্রয়োগে 'রজকিনী') বিহঙ্গ—বিহঙ্গী; খ্যাতনামা—খ্যাতনাম্নী ইত্যাদি।

(৩) কতকগুলি শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে **ঈ-প্রত্যয়** হইলে 'য' কারের (্য) লোপ হয়। যথা—মৎস—মৎসী; মনুষ্য—মনুষী ইত্যাদি।

(৪) **ইনী, নী আনী প্রত্যয় (আন্+ঈ) যোগে :** বিদেশী—বিদেশিনী; ওজস্বী—ওজস্বিনী; মালী—মালিনী; অনাথ—অনাথিনী; গোপ—গোপিনী; চাতক—চাতকিনী; জেলে—জেলেনী; ডাক্তার—ডাক্তারনী; মেছো—মেছোনি; মাষ্টার—মাষ্টারণী; গয়লা—গয়লানী; চাকর—চাকরাণী; চৌধুরী—চৌধুরাণী; ঠাকুর—ঠাকুরাণী; ধনী—ধনিনী; যোগী—যোগিনী; অনুরাগী—অনুরাগিনী ইত্যাদি।

(খ) সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দদ্বারা

বাবা, পিতা—মা ; বর—কনে, বধূ ; স্বামী—স্ত্রী ; কর্তা—গিন্নী, গৃহিণী ; ভাশুর—বড় জা ; ভাই—ভাবি, ভাইবৌ ; ননদাই—ননদ, ননদিনী ; শুক—সারী ; বলদ—গাভী ; দেবর—ছোট-জা ; সাহেব—বিবি, মেম, মেমসাহেব ; বাদশাহ্, নবাব—বেগম ; বান্দা, গোলাম—বাঁদী ; লর্ড, লাট—লেডী ; খানসামা—আয়া ; চাকর—দাসী, ঝি ; দাদাবাবু—দিদিমণি ; জামাই—মেয়ে ; ঠাকুর-পো—ঠাকুর-ঝি ; রাজা—রানী ; বিপত্নীক—বিধবা ; পুরুষ—মহিলা, নারী ; শ্যালক—শালাজ, শালী ; জনক—জননী ; নাত জামাই—নাতনী ; নাতি—নাত-বৌ, নাতিনী ; ঠাকুরদাদা—ঠাকুর-মা, ঠান্‌দি ; ভাগীন জামাই—ভাগিনী ; ভাগনে—ভাগনে-বৌ ; সম্রাট—সম্রাজ্ঞী ; শ্বশুর—শাশুড়ী, শ্বশ্রূ ; সভাপতি—সভানেত্রী ইত্যাদি।

(গ) শব্দের পূর্বে বা পরে স্ত্রীবোধক শব্দযোগে

বেটাছেলে—মেয়েছেলে ; খেলোয়াড়—মেয়েখেলোয়াড় ; প্রভু—প্রভুপত্নী ; কবি—মহিলাকবি ; জমিদার—জমিদারগিন্নী ; কর্মী—মহিলাকর্মী ; শিল্পী—মহিলাশিল্পী ; এঁড়ে বাছুর—বকনাবাছুর ; বলদ গোরু—গাইগোরু ; হুলো বিড়াল—মেয়েবিড়াল ; পুরুষ মানুষ—মেয়েমানুষ, মুখুজ্যে—মুখুজ্জেগিন্নী ; ডাক্তার—লেডীডাক্তার ; গয়লা—গয়লাবৌ, ঔপন্যাসিক—মহিলা ঔপন্যাসিক; ঘোষ—ঘোষজায়া ; মদ্দাহাতী—মাদিহাতী ; প্রতিনিধি—মেয়েপ্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি ; সভ্য—মহিলা সভ্য (সভ্যা) ইত্যাদি।

কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ভিন্নরূপ : আচার্য—আচার্যানী (পত্নী), আচার্য্যা (lady teacher) ; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ানী, (ক্ষত্রিয় বংশজা) ক্ষত্রিয়ী, (ক্ষত্রিয়ের পত্নী) ; শূদ্র—শূদ্রা (শূদ্রবংশজা), শূদ্রী, শূদ্রানী (শূদ্রের স্ত্রী) ; চণ্ড—চণ্ডা (অতি কোপনা), চণ্ডী (দেবী) ; উপাধ্যায়—উপাধ্যায়ানী, উপধ্যায়ী (পত্নী), উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী (শিক্ষয়িত্রী) ইত্যাদি।

কতকগুলি তৎসম স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দের অর্থবিশিষ্ট লক্ষণীয় : যথা—নাটক—নাটিকা (ক্ষুদ্র নাটক) ; হিম—হিমানী (জমাট বরফ) ; কোষা—কুষি (ক্ষুদ্রার্থে) ; অরণ্য—অরণ্যানী (মহারণ্য) ; ঘট—ঘটী (ক্ষুদ্রঘট) ; পুস্তক—পুস্তিকা (ক্ষুদ্রার্থে) ইত্যাদি।

কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের আধারের উপর প্রস্তুত হইয়াছে। যথা—বোনাই—ভগিনীপতি ; পিসা—পিউসা<পিউসী বা পিসী ; মেসো—মাসুয়া<মাউসা<মাসী বা মাউসী ইত্যাদি।

নিত্যপুংলিঙ্গ ও নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

বাঙলায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহারা সর্বদাই পুংলিঙ্গ। ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। তাই ইহাদিগকে নিত্যপুংলিঙ্গ বলা হয়। যেমন—কৃতদার, অকৃতদার, মৃতদার, বিপত্নীক, ঢাকী, ঢুলী, বাজনদার ইত্যাদি।

আবার এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহারা সর্বদাই স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাদের পুংলিঙ্গ হয় না। এইজন্য ইহাদিগকে নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন—বর্ষা, সিকতা, সেনা, মমতা, সজনী, রূপসী, জ্যোৎস্না, সৎমা, কমলা, ললনা, সপত্নী, বিধবা, পৃথিবী, ধরণী ইত্যাদি।

বচন

যাহা দ্বারা নামবাচক পদের অর্থাৎ বিশেষ্যের এবং সর্বনামের এক বা একাধিক সংখ্যা বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে বাঙলায় **বচন** (**Number**) বলে। বাঙলা ভাষায় বচন প্রধানতঃ দুই প্রকার। যথা—**একবচন** ও **বহুবচন**।

একবচন ঃ যাহা দ্বারা কেবলমাত্র 'এক' এই সংখ্যা সূচিত হয়, তাহা একবচন। যথা—একটি বালক, পাখী, নক্ষত্র ইত্যাদি।

বহুবচন ঃ যাহা দ্বারা একের অধিক সংখ্যা সূচিত হয়, তাহা বহুবচন। যথা—দুইটি বালক, পাখীসব, নক্ষত্রগুলি ইত্যাদি।

সংস্কৃত 'বচন' হইতে বাঙলা 'বচনের' বহুলাংশে পার্থক্য রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে তাহার কয়েকটি দেওয়া হইল ঃ

(১) সংস্কৃতে ক্রিয়াপদের ও বিশেষ্যের সহিত বচনান্তর হয়। যথা—অহম্ গচ্ছামি কিন্তু বয়ম্ গচ্ছামঃ। বাঙলায় বিশেষ্যের বচনান্তরের সঙ্গে ক্রিয়াপদের বচনান্তর হয় না। যেমন—আমি যাই, আমরা যাই। এখানে 'যাই' এই ক্রিয়ার রূপ একই রহিয়াছে।

(২) সংস্কৃতে বিশেষণপদের ও বিশেষ্যপদের বচনান্তরের সঙ্গে পরিবর্তন হয়। যেমন—সুন্দরঃ বালকঃ, কিন্তু সুন্দরাঃ বালকাঃ। বাঙলায় বিশেষ্যের বচনান্তরের সময়ে বিশেষণের পরিবর্তন হয় না। যেমন—'সুন্দর' বালক, 'সুন্দর' বালকগণ। বিশেষণ 'সুন্দর' ইহার কোন পরিবর্তন হয় নাই।

(৩) সংস্কৃত ভাষায় বচন তিন প্রকার। যথা—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। সংস্কৃতের 'দ্বিবচন' বাঙলায় নাই।

(৪) বাঙলাতে অনেক সময় বিশেষ্যের রূপান্তর না ঘটিয়া **বহুত্ববাচক শব্দ** যোগ করিয়া বচনান্তর ঘটিয়া থাকে। যেমন—বহু কাঁচা আম। এখানে বিশেষ্যপদ 'আম', আমগুলি হয় নাই। তথাপি 'বহু' এই পদযোগে 'আম' শব্দটি বহুবচনে রূপান্তরিত হইয়াছে।

নানা উপায়ে একবচনের ভাব সূচিত হয়। যেমন—

(১) কেবলমাত্র শব্দ উল্লেখ করিয়া—বই, ছেলে, ছাতা, পেন্সিল ইত্যাদি। সর্বনামগুলির মধ্যে—আমি, তুমি, সে, ইহা, তাহা, এ, ঐ, ও ইত্যাদি।

(২) বিশেষ্যপদের পূর্বে 'এক' এই শব্দটি ব্যবহার করিলে একবচনের অর্থ প্রকাশ করে। যথা—এক রাজা, এক ঘণ্টার পথ ইত্যাদি

(৩) একবচনের বিভক্তি—এ, কে, এর, য়, তে প্রভৃতি বিভক্তি যোগ করিলে একবচনের অর্থ প্রকাশ করে। যথা—'পাগলে' কিনা বলে, 'ছাগলে' কি না খায়। 'আমার' বই নাই, 'কলসীতে' জলভরা ইত্যাদি।

(৪) একবচন বুঝায় এমন কোন প্রত্যয় বাঙলা ভাষায় নাই, তবে বিশেষ্যের পরে নির্দেশক টি, টা, খানি, খানা, গাছা, গাছি, প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিলে একবচনের অর্থ প্রকাশ করে। যথা—'ছেলেটি' ভাল ; বই 'খানা' কোথায় ? 'দশটা' বেজে গেল ইত্যাদি।

(৫) পূরণবাচক শব্দ যদি বিশেষ্যপদের পূর্বে প্রয়োগ করা যায় তাহাতেও একবচনের অর্থ প্রকাশ করে। যথা—'প্রথম' শ্রেণী, 'দ্বিতীয়া' সংখ্যা, 'তৃতীয়' স্থান 'সপ্তম' দিবস, 'দশম' পরিচ্ছেদ, 'বিংশ' শতাব্দী ইত্যাদি।

বাঙলা ভাষায় একবচনান্ত শব্দকে বহুবচনে পরিবর্তন করিবার সাধারণ নিয়মগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) একবচনান্ত শব্দের পরে বহুবচনের প্রত্যয় 'রা', 'এরা' যোগ করিলে বহুবচন হয়। এই প্রত্যয়গুলি সাধারণতঃ প্রাণিবাচক শব্দের পরেই ব্যবহার করা হয়। যেমন—'ছেলেরা' গেল কোথায় ? 'মেয়েরা' আজ স্কুলে আসে নাই। সেইরূপ 'দিগ' প্রত্যয় যোগেও বহুবচনের ভাব বুঝানো হয়। যেমন—'বালকদিগ'কে একটি করিয়া সন্দেশ দাও ; এই গ্রামে 'বালিকাদিগে'র কোন বিদ্যালয় নাই ইত্যাদি।

অপ্রাণিবাচক শব্দে সাধারণতঃ 'গুলি' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—পুস্তক—'পুস্তকগুলি', কলম—'কলমগুলি', বই—'বইগুলি'। কিন্তু প্রাণিবাচক শব্দেও 'গুলি' প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—'ছেলেগুলি' কি দুষ্টু ; 'মেয়েগুলির' পড়ার দিকে মন নাই ইত্যাদি।

অপ্রাণিবাচক শব্দকে প্রাণিবাচক শব্দের ন্যায় কল্পনা করা হইলে তাহাকে 'রা' প্রত্যয় যোগ করিয়া বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যেমন—'মেঘেরা' দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে ?' ফুল ফুটিলে 'গাছেরা' বড় আনন্দ অনুভব করে ইত্যাদি।

(২) বিশেষ্যের পূর্বে বহুত্ববোধক সর্বনাম 'অনেক', 'সকল' এবং সংখ্যাবোধক বিশেষণ 'তিন', 'চার' প্রভৃতি যোগ করিলে বহুবচনের অর্থপ্রকাশ পায়। যেমন—অনেক বই, সকল প্রাণী, বার ভুঁইয়া, তিনটি আম ইত্যাদি।

● একাধিক সংখ্যাবোধক বিশেষণের সহিত 'খান', 'খানা', 'টা', 'গাছ', 'গাছি' ইত্যাদি যোগ করিয়া এবং 'অনেক' ঢের; 'বিস্তর' 'বহু' প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ বসাইয়াও বহুবচনের ভাব প্রকাশ পায়। যেমন—'ছয়খানা' বই; 'জন 'সাতেক' লোক; এইবার লইয়া 'বার পাঁচেক' সে এখানে আসিল; 'খান চারেক' রুটি; 'তিন গাছা' লাঠি অনেক বই, বিস্তর টাকা ইত্যাদি।

(৩) সংস্কৃতে এবং বাঙলায় বহুত্ববোধক কতকগুলি পদ আছে। বিশেষ্যের শেষে সেগুলি যোগ করিয়া বহুবচন করা হয়। যেমন—

আবলী—গ্রন্থাবলী, রত্নাবলী
কুল—অলিকুল, শৈলকুল
জাল—জলদজাল
দল—বণিকদল, ছাত্রদল
নিচয়—পুষ্পনিচয়
বর্গ—নেতৃবর্গ, শ্রোতৃবর্গ
বৃন্দ—ছাত্রবৃন্দ, যুবকবৃন্দ
মহল—বন্ধুমহল
মালা—মেঘমালা, পর্বতমালা
গণ—মানবগণ, দেবগণ
চয়—'বহে চঞ্চল তটিনীচয়।'
মণ্ডল—মেঘমণ্ডল
যূথ—হস্তিযূথ
রাশি—পুষ্পরাশি
রাজি—নক্ষত্ররাজি, বনরাজি
সমূহ—বৃক্ষসমূহ, গৃহসমূহ
সব—ভাইসব
সকল—ভাইসকল

(৪) বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় এবং অসমাপিকা ক্রিয়া প্রভৃতি পদের দ্বিত্ব করিলেও বহুবচনের ভাব প্রকাশিত হয়। যেমন—

(ক) বিশেষ্যের দ্বিরুক্তি :

'দেশ' 'দশ' নন্দিত করি' (রবীন্দ্রনাথ)
'গ্রামে গ্রামে' সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।'

(খ) বিশেষণের দ্বিরুক্তি :

'বাছা বাছা' ফল। 'সুন্দর সুন্দর' ছবি।
'আঁটি আঁটি' ধান। 'কচি কচি' ঘাস।
'লাল লাল' ফুল। 'বড় বড়' গাছ।

(গ) সর্বনামের দ্বিরুক্তি :

তুমি 'কি কি' বই চাও? 'কে কে' স্কুলে আসিয়াছে?
'যে যে' স্কুলে আসিবে, 'সে সে' পুরস্কার পাইবে।

(ঘ) অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিরুক্তি :

'ভেবে ভেবে' হলাম সারা
কোথা আমার হারা তারা।'
'শুনতে শুনতে' অধীর হয়ে গেছি।

(ঙ) অব্যয়পদের দ্বিরুক্তি :

'গুড়ুম গুড়ুম' আওয়াজ হইল।
'মাছি 'ভন ভন' করে জ্বালাচ্ছেন।'
'আর আর' মানুষ কোথায় গেল।

অনুশীলনী

১। লিঙ্গ কয় প্রকার? নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক প্রকারের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। বাঙলা শব্দকে পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তনের যে নিয়মগুলি আছে, যথোপযুক্ত উদাহরণসহ তাহার যে কোন পাঁচটি নিয়মের উল্লেখ কর।

(স্কুল ফাইনাল ১৯৫৩)

৩। বাঙলায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগঠনের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ কর।

(উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৪)

৪। লিঙ্গ পরিবর্তন কর : অনুগামিনী, নিরপরাধ, কর্তা, গায়ক, ভগবান, চাকর, বিদ্বান ও ঘোড়া। (স্কুল ফাইনাল ১৯৫৭)

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির লিঙ্গ পরিবর্তন কর এবং বাক্য রচনা করিয়া উদাহরণ দাও :

পাচক, মহৎ, বিদ্বান, সাধু, গরীয়ান, সম্রাট, মাতুল, কর্তা, কবি, কাপুরুষ।

(ঢা. বি. মাধ্যমিক ১৯৫৩)

৬। নিত্যপুংলিঙ্গ, নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ ও উভয় লিঙ্গের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৭। বচন কাহাকে বলে? প্রত্যেক প্রকার বচনের উদাহরণ দাও।

৮। একবচনের ভাবপ্রকাশ করিবার নিয়ম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক প্রকার নিয়মের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৯। দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুবচন প্রকাশ কর। (ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) ১৯৫৩)।

১০। বহুবচন করিবার বেলায় নিম্নলিখিত প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দাবলীর প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ কর :

রা, দের, গুলি, গুলা, গণ, মণ্ডলী, মালা, মহল, রাজি, বৃন্দ, নিচয়, রাশি, সব, আবলী, বর্গ, সমূহ, মণ্ডল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরুষ

বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য বা সর্বানামপদগুলির সবই একরূপ নয়। লিঙ্গ, বচন প্রভৃতির ন্যায় আরও একটি বিষয়ে উহাদের পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্য উহাদের স্বরূপগত। 'শ্যাম' বাড়ী যায়, 'আমি' বিদ্যালয়ে যাইব, 'তুমি' বাড়ী আসিও—এই বাক্যগুলির মধ্যে ব্যবহৃত শ্যাম, আমি, তুমি প্রভৃতি বিশেষ্য ও সর্বনামপদগুলির স্বরূপগত স্বতন্ত্রতা আছে। বিশেষ্য ও সর্বনামের স্বরূপগত স্বাতন্ত্র্যকে **পুরুষ** (Person) বলে।

বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদ কর্তার অধীন ; সুতরাং কর্তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াপদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। তখন আমরা বলি—আমি বাড়ী 'যাই', তুমি বাড়ী 'যাও' এবং সে বাড়ী 'যায়' ইত্যাদি।

প্রত্যেক কালের তিনটি করিয়া পুরুষ আছে : (১) **প্রথম পুরুষ**, (২) **মধ্যমপুরুষ** এবং (৩) **উত্তমপুরুষ**।

(১) **প্রথমপুরুষ** (Third Person) ঃ 'সে' পড়ে ; 'শ্যাম' স্কুলে যায় ; 'তিনি' রোজ এখানে আসেন ; 'পাখী' উড়িয়া বেড়ায় ; এই সকল উদাহরণে যিনি বক্তা তিনি কোন অনুপস্থিত প্রাণী বা বস্তু সম্বন্ধে উক্তি করিতেছেন। সুতরাং অনুপস্থিত যাহার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাহা প্রথমপুরুষ। উপরের উদাহরণে সে, শ্যাম, তিনি, পাখী প্রভৃতি প্রথমপুরুষ।

তিনি, যিনি, ইনি, উনি প্রভৃতি সম্ভ্রম-বাচক এবং প্রশ্নবোধক সর্বনাম 'কে' ব্যতীত প্রথমপুরুষের একবচনের সমস্ত সর্বনাম পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে 'কে'>'কোন' এবং 'কেহ' স্থলে>কোনও হয়। যথা—তুমি 'কোন্' বই চাও? 'কোনও' ছাত্রের মুখে আমি অবগত হইয়াছি ইত্যাদি।

(২) **মধ্যমপুরুষ** (Second person) **:** 'তুমি' আস ; 'আপনি' বসুন ; 'তুই' ওখানে কেন? প্রভৃতি বাক্যের তুমি, আপনি, তুই প্রভৃতি বক্তার কাছেই উপস্থিত। সুতরাং বক্তা ভিন্ন উপস্থিত ব্যক্তি বা বস্তুবাচক বিশেষ্যের পরিবর্তে যে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়, তাহা মধ্যমপুরুষ।

সামান্যতা, গৌরব ও তুচ্ছতাভেদে মধ্যমপুরুষ নিম্নলিখিত তিন প্রকার :

(ক) **সামান্য মধ্যমপুরুষ :** 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে?' বন্ধু, তুমি কথা শোন। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর ইত্যাদি

(খ) **গৌরববোধক মধ্যমপুরুষ :** সম্মান, গৌরব এবং ভদ্রতাসূচক সম্বোধনে

গৌরববোধক মধ্যমপুরুষ হয়। ইহাতে 'আপনি', 'আপনারা,' 'আপনাকে' প্রভৃতি সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন—সে কহিল, মহারাজ 'আপনি' অতি দয়ালু আমাকে ভিক্ষা দিন।

(গ) **তুচ্ছ মধ্যমপুরুষঃ** (১) সাধারণতঃ অনাদর, অবজ্ঞা, বা ঘনিষ্ঠতা বুঝাইতে তুচ্ছ মধ্যমপুরুষ সর্বনাম তুই, তোরা, তোদিগকে প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন—নরাধাম আজ 'তোকে' শাস্তি দেব। (২) খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝাইতে সম্ভ্রমের পাত্রের উদ্দেশ্যও তুচ্ছ মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ হয় হয়। যেমন—

'বঙ্গ আমার ! জননী আমার ! ধাত্রী আমার ! আমার দেশ !
কেন গো মা 'তোর' মলিন বসন, কেন গো মা 'তোর' রুক্ষ কেশ ?'

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

(৩) **উত্তমপুরুষ (First person) ঃ** যখন বক্তা নিজেই নিজের সম্পর্কে কিছু জ্ঞাপন করে তখন উত্তমপুরুষ ব্যবহৃত হয়। যেমন—'পল্লীদুলাল, যাব 'আমি'—যাব 'আমি' তোমার দেশে।' 'আমি', 'আমরা', 'আমাকে,' 'আমাদিগকে' ইত্যাদি উত্তমপুরুষ সর্বনামের রূপ।

প্রাচীন বাঙলায় উত্তম পুরুষের রূপ হিসাবে আহ্মে, আহ্মি, মুঞি, মুই প্রভৃতির প্রয়োগ ছিল। এখনও গ্রামাঞ্চলের কথ্য ভাষায় 'মুই' ব্যবহৃত হয় ; যেমন—'মুই নেমোক-হারামি কত্তি পারবো না।' (দীনবন্ধু মিত্র)

অনুশীলনী

১। পুরুষ বলিতে কি বুঝায় ? পুরুষ কয় প্রকার ? উদাহরণ দাও।

২। উদাহরণ দাওঃ ঘনিষ্ঠতা বুঝাইতে গুরু মধ্যমপুরুষ স্থলে সামান্য মধ্যমপুরুষ এবং তুচ্ছ মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ ; গৌরব বুঝাইতে তুচ্ছ মধ্যমপুরুষের স্থলে সামান্য মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ ; অপরিচিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গুরু মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ।

৩। নিম্নোক্ত বাক্যগুলির মধ্যে যে সমস্ত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ আছে তাহাদের পুরুষ নির্ণয় কর :

(ক) আমি যে বইখানা তোমাকে গতকল্য পড়িতে দিয়াছিলাম তাহা তুমি আমাকে আজও ফেরত দাও নাই।

(খ) তুমি স্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে সম্মত আছি।

(গ) আপনি এমন মহাশয় ব্যক্তি কিন্তু আপনার পুত্রটি এমন অমানুষ কেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না।

(ঘ) তিনি যে শুধু একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা নয়, তাহার ভিতর মাধুর্য ও ঔদার্যও কম ছিল না।

সপ্তম অধ্যায়

কারক ও বিভক্তি

কারক

বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্য অথবা সর্বনামপদের যাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে, তাহাকেই **কারক-পদ (Case)** বলে। উদাহরণস্বরূপ :

'নৃপতির ধন রাজ-রানী স্বহস্ত দ্বারা প্রজাগণকে রাজকোষাগার হইতে তাহাদের ছিন্ন ঝুলিতে ভিক্ষা দান করেন।'

উক্ত বাক্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় 'দান করেন' এই ক্রিয়াপদের সহিত বাক্যান্তর্গত অন্যান্য পদের নানারূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। যেমন—'নৃপতির' এই পদের সহিত 'ধন' এই পদের সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে 'করেন' এই ক্রিয়াপদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব ইহা কারক নয়। ষষ্ঠী বিভক্তি 'র' যোগে ইহা একটি সম্বন্ধপদ এবং 'ধন' এই পদের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি তাহাই নির্ণীত হইয়াছে। এখন 'দান করেন' এই ক্রিয়াপদের সহিত 'রাজ-রানী' কর্তৃকারক। ঐরূপ যদি পর পর প্রশ্ন করা যায় তাহা হইলে নিম্নলিখিত মত কারক নির্ধারিত হইতে পারে।

প্রশ্ন—'কি দিয়াছেন ?'—ভিক্ষা। এস্থলে ভিক্ষার সহিত ক্রিয়ার কর্ম-সম্বন্ধ। অতএব 'ভিক্ষা' কর্মকারক।

এইভাবে 'স্বহস্ত দ্বারা' এই পদের সহিত ক্রিয়ার করণ-সম্বন্ধ; 'দরিদ্র প্রজাগণকে' এই পদের সহিত ক্রিয়ার সম্প্রদান-সম্বন্ধ, 'রাজকোষাগার' হইতে ইহার সহিত অপাদান-সম্বন্ধ এবং 'ছিন্ন ঝুলিতে' পদের সহিত যথাক্রমে অধিকরণ-সম্বন্ধ। ক্রিয়ার সহিত পদের নানারূপ সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া কারকের ছয়টি প্রকার নির্দেশ করা যায়। যথা—

(১) কর্তৃকারক, (২) কর্মকারক, (৩) করণকারক, (৪) সম্প্রদান-কারক, (৫) অপাদানকারক, ও (৬) অধিকরণকারক।

কর্তৃকারকে **প্রথমা** বিভক্তি, কর্মে **দ্বিতীয়া,** করণে **তৃতীয়া,** সম্প্রদানে **চতুর্থী,** অপাদানে **পঞ্চমী** এবং অধিকরণে **সপ্তমী** বিভক্তি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া এক কারকের বিভক্তি অন্য কারকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। উদাহরণের সাহায্যে তাহা যথাসময়ে আলোচিত হইবে। সম্বন্ধপদে **ষষ্ঠী** বিভক্তি ও সম্বোধনপদে **প্রথমা** বিভক্তি হয়। সম্বন্ধপদ এবং সম্বোধনপদ কারক নহে, কেন না ক্রিয়ার সহিত ইহাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই।

(১) কর্তৃকারক

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে সে **কর্তা**। তাই ক্রিয়ার সহিত কর্তৃসম্বন্ধযুক্ত পদকে বলা হয় **কর্তৃকারক**। যেমন—মেঘ উঠিল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; 'হৃদয় আমার নাচেরে' (রবীন্দ্রনাথ) ইত্যাদি। এখানে 'উঠিল', 'পড়িতে লাগিল' ও 'নাচেরে' ক্রিয়াপদগুলির নিষ্পাদক হিসাবে যথাক্রমে 'মেঘ, 'বৃষ্টি' ও 'হৃদয়' কর্তৃকারক।

পুরাতন বাঙলাতে বিভক্তি-হীন রূপের, এবং বিকল্পে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হইত। আধুনিক বাঙলা ভাষায় এই '-এ' কারের প্রয়োগ কম হইয়া আসিতেছে। যথা—আধুনিক বাঙলায় 'মা বলেন'; কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় ও অধুনিক কথ্য ভাষায়—'মায়ে বলে।'

কখনও কখনও কর্তৃকারকে 'কে', 'র', 'কর্তৃক', 'অ', 'তে', 'য়' প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন—

কে—'আমাকে' আজ যাইতে হইবে; 'তোমাকে আজ বড় ভাল দেখাইতেছে।

র—'আমার' না গেলে নয়; 'তোমার' কথা প্রায়ই বলা হয়।

কর্তৃক—শিক্ষক 'কর্তৃক' ছাত্র দণ্ডিত হইল; দস্যু 'কর্তৃক' ধন অপহৃত হইল।

অ—'রাম' নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে।

এ—'বিড়ালে' ইন্দুর ধরে; 'মানুষে' অনেক কথাই বলে।

তে—'পাখীতে' গাছে বাসা করিয়াছে; 'বুলবুলিতে' ধান খেয়েছে।

য়—'পোকায়' বইগুলি কাটিয়া ফেলিয়াছে; 'বোকায়' কি না বলে। কর্তৃকারকে—বহুবচনে 'রা' 'এরা' 'গুলি' যুক্ত হয়। যথা—

রা—'বালকেরা' স্কুলে যায়; 'শিশুরা' খেলা করিতে ভালবাসে।

'গুলি, 'গুলা'—'ছেলেগুলি' পলাইল; 'পাখীগুলি' উড়িয়া গেল।

কর্তৃকারকে—কোথাও কোথাও বিভক্তির 'চিহ্ন' নাও থাকিতে পারে। যথা—'শিক্ষক ছাত্রকে অযথা শাসন করেন না; 'রাত্রি' হইল আকাশে 'চাঁদ' উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে 'অন্ধকার' দূরীভূত হইল; 'তুমি' ভাল মনে করিলে আসিতে পার কিন্তু 'আমি' যাইতে পারিব না।

প্রযোজক কর্তা : যে অপরকে কোন কাজ করিতে প্রবর্তিত করে তাহাকেও কর্তৃকারক বলে। অপরকে কার্য করিতে বলে বলিয়া এই কর্তাকে **প্রযোজক কর্তা** বলে যথা—**বাঙলা শিক্ষক** আমাদিগকে বাঙলা ব্যাকরণ পড়ান। এ স্থলে বাঙলা শিক্ষক আমাদিগের দ্বারা পড়া কাজ করাইয়া লন। সুতরাং 'বাঙলা শিক্ষক'প্রযোজক কর্তা।

সমধাতুজ কর্তা (Cognate Subject) **:** একই ধাতু হইতে কর্তা ও ক্রিয়া সৃষ্টি হইলে কর্তাকে সমধাতুজ কর্তা বলে। যেমন—'মরা' আর কি মরিবে?

[**দ্রষ্টব্য :** বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের পূর্বে 'কে' অথবা' 'কি' (অর্থাৎ কোন্ বস্তু) প্রভৃতি এইরূপ প্রশ্ন করিলে যে পদ পাওয়া যায়, তাহাই কর্তৃকারক]।

(২) কর্মকারক

কর্তা যাহা দেখে, শুনে বা করে তাহা 'কর্ম'। এক কথায় যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাই **কর্মকারক**। যেমন—'খালেদ আবার ধরিয়াছে অসি' (নজরুল); আশিস্ আমার 'কথা' শুনিল। এখানে 'ধরিয়াছে' ও 'শুনিল' প্রভৃতি ক্রিয়া যথাক্রমে 'অসি' ও 'কথা'র উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছে, সুতরাং ইহারা কর্মকারক।

কর্মকারকের একবচনে 'কে', 'এ', 'য়', 'রে' প্রভৃতি এবং বহুবচনে 'দের', দিগকে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। কোথাও কোথাও কর্মে কোন বিভক্তি চিহ্নই থাকে না।

কে—'রামকে' ডাকিলে 'হরিকে' ডাকা উচিত। 'তোমাকে' চিনি।

এ—'কেমনে বলহ তুমি বধিলে 'রাবণে'। 'পাপে' ঘৃণা কর।

য়—'আমায়' কেন ডাকিলে ? 'তোমায়' ধরিয়া টানিব।

রে—'যে ধনে হইয়া ধনী 'মানীরে' মান না মানী।'

এরে—বিপদে এ 'দাসেরে' মনে করিবেন। 'রেখ মা 'দাসেরে' মনে।' (মাইকেল)

দের—'পুত্রদের' ধ'রে, দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে'।

বিভক্তি চিহ্ন ব্যতীত—'ধর্ম' দাও 'অর্থ' দাও। দাও 'পরমায়ু'।

মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম : কোন কোন সকর্মক ক্রিয়ার দুইটি করিয়া কর্ম থাকে, উহাদের মধ্যে বস্তুবাচক কর্মটিকে মুখ্যকর্ম বা প্রধান কর্ম এবং প্রাণিবাচক কর্মটিকে অপ্রধান কর্ম বা গৌণকর্ম বলে। সাধারণতঃ মুখ্যকর্মে কোন বিভক্তি থাকে না, গৌণকর্মেই বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—শিক্ষক মহাশয় ছাত্রটিকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এখানে কর্ম দুইটি 'ছাত্রটিকে' ও 'প্রশ্ন'; 'প্রশ্ন' **মুখ্যকর্ম** এবং 'ছাত্রটিকে' **গৌণকর্ম**।

সমধাতুজ বা **ধাত্বর্থক কর্ম (Cognate Object) :** ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ যদি একই ধাতু হইতে সৃষ্ট হয় এবং অকর্মক ক্রিয়া যদি সকর্মক হয়, তাহা হইলে সেই কর্মকে সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম বলে। যথা—'আর 'মায়াকান্না' কাঁদতে হবে না।' (শরৎচন্দ্র)

উদ্দেশ্য কর্ম ও **বিধেয় কর্ম :** কতকগুলি সকর্মক ক্রিয়ার মাত্র একটি কর্মের দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়। এইরূপ প্রথম কর্মটিকে **উদ্দেশ্য কর্ম** এবং দ্বিতীয় কর্মটিকে **বিধেয় কর্ম** বলে। উদ্দেশ্য কর্মে 'কে' বিভক্তি যুক্ত থাকে। বিধেয় কর্মে কোন বিভক্তি চিহ্ন থাকে না। যথা—রজ্জুকে 'সর্প' বলিয়া মনে করিলাম। একমুষ্টি ধূলাকে 'সোনা' করিতে পারি। 'দূরকে' করিলে নিকট 'বন্ধু'। (রবীন্দ্রনাথ)

[**দ্রষ্টব্য :** ক্রিয়াপদের উত্তরে 'কি' বা 'কাহাকে' এইরূপ প্রশ্ন করিলে উত্তরে কর্মকারক পাওয়া যায়]।

(৩) করণকারক

কর্তা যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহার নাম করণকারক। করণকারকে সাধারণতঃ তৃতীয়া 'দ্বারা,' 'দিয়া' ইত্যাদি বিভক্তিচিহ্ন থাকে। যথা—'কলম' দ্বারা লিখিতেছে, 'মন' দিয়া লেখা পড়া কর। এখানে 'কলম' ও 'মন' কার্য সম্পাদনের সহায় বলিয়া ইহারা করণকারক।

করণকারকে অন্যান্য বিভক্তির প্রয়োগও প্রচলিত। যথা—এই 'পুত্র হইতে' দুঃখ দূর হইবে না; 'নবীন ধানের 'আঘ্রাণে' আজ অঘ্রাণ হ'ল মাৎ।' (নজরুল)

কখন কখন করণকারকে 'য়', 'এ', 'তে' প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—

য়—'পানায়' পুকুর ভরিয়া গিয়াছে; 'টাকায়' সর্ব হয়।

এ—"কানে' শুনি, 'চোখে' দেখি, 'মুখে' কই কথা।"

তে—'ছুরিতে' হাত কাটিয়াছে। 'দস্যুতে' গ্রাম পূর্ণ হইয়াছে।

ক্রিয়ার্থক ধাতুর প্রয়োগে করণকারকে বিভক্তি চিহ্ন লুপ্ত হয়। যেমন—ছেলেরা 'ফুটবল' খেলে। বৃদ্ধেরা খেলেন 'পাশা' বা 'তাস' ইত্যাদি। স্থল-বিশেষে করণকারকে 'বিকল্পে' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—ছেলেটাকে 'বেত' মারিও না। এস্থলে 'বেত' করণকারক।

সমধাতুজ করণ (**Cognate Instrumental**) : আলমারিটা 'ঝাড়নে' ঝড়; 'কি বাঁধনে হায় বেঁধেছে হৃদয়' ইত্যাদি।

[**দ্রষ্টব্য** : 'কিসে', 'কিসের সাহায্যে,' 'কাহার সাহায্যে' প্রভৃতি প্রশ্ন করিলে উত্তরে করণকারক পাওয়া যায়।

(৪) সম্প্রদানকারক

স্বত্বত্যাগপূর্বক যাহাকে কিছু দান করা যায় তাহাকে **সম্প্রদানকারক** বলে। যথা—'ব্রাহ্মণকে' দক্ষিণা দাও। সম্প্রদানকারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। বাঙলায় চতুর্থী বিভক্তির পৃথক কোন চিহ্ন নাই; সেই কারণে বাঙলায় সম্প্রদানকারকের জন্য দ্বিতীয়া বিভক্তি-চিহ্নই ব্যবহৃত হয়। কাহারও কাহারও মতে বাঙলায় সম্প্রদানকারকের অস্তিত্ব নাই, ইহা কর্মকারক মাত্র।

ষষ্ঠী : বাঙলায় নিমিত্ত বুঝাইলে নিমিত্তবাচক শব্দের উত্তরে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন—'সুখের' লাগিয়া এঘর বাঁধিনু।' (জ্ঞানদাস)

নিমিত্তবাচক শব্দে দ্বিতীয়া : যেমন—'বেলা যে পড়ে এলো, 'জলকে' চল।' (রবীন্দ্রনাথ)

সম্প্রদানে সপ্তমী : যেমন—'অন্ধজনে' দেহ আলো, 'মৃতজনে' দেহ প্রাণ।' (রবীন্দ্রনাথ)

[**দ্রষ্টব্য** : 'কাহাকে', 'কাহার তরে', 'কাহার জন্য' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রদান-কারক পাওয়া যায়।]

সম্প্রদান অর্থাৎ স্বত্বত্যাগপূর্বক কোন বস্তু দান না বুঝাইলে অর্থাৎ যে বস্তু দেওয়া যায় তাহা ফিরিয়া লইবার ইচ্ছা থাকিলে এবং দেয় বস্তু কাহাকেও দান করিলে, তাহার সম্প্রদানকারক হয় না। যথা—

'রাজাকে' রাজস্ব দাও। 'চাকরকে' বেতন দাও। 'রজককে' কাপড়গুলি দাও। এস্থলে রাজার প্রাপ্য কর তাঁহাকে ও চাকরের প্রাপ্য বস্তু তাহাকে দেওয়া বুঝাইতেছে; আর ধোপাকে কাপড় ধোয়াইয়া পরে ফেরত লইবার উদ্দেশ্যে দেওয়া বুঝাইতেছে। রাজা, চাকর ও ধোপা দানের পাত্র নহে, কারণ স্বত্বত্যাগপূর্বক রাজাকেও দান করা বুঝাইতেছে না। সুতরাং রাজাকে, চাকরকে, ধোপাকে কর্মকারক, সম্প্রদানকারক নহে। কিন্তু 'বস্ত্রহীনে বস্ত্র দাও' এই বাক্যে 'বস্ত্রহীনে' সম্প্রদানকারক।

[**দ্রষ্টব্য ঃ** বাঙলায় সম্প্রদানকারকের রূপের দিক দিয়া পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা কর্মকারকের সহিত অভিন্ন।]

(৫) অপাদানকারক

যাহা হইতে কোন কিছুর 'চলন', 'পতন', 'গ্রহণ', 'ভয়', 'উৎপত্তি', 'অন্তর্ধান', 'আরাম' ও 'বিরাম' প্রভৃতি বুঝায়, তাহাতে **অপাদানকারক** হয়। অপাদানকারকে 'হইতে', 'থেকে', 'এ', 'তে' প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত থাকে। যথা—

হইতে—'আকাশ হইতে' পড়িলে? অপূর্ব 'ব্যাঘ্র হইতে' ভয় পাইয়াছে।

থেকে—'বাড়ি থেকে' আসছি। 'মেঘ থেকে' জল পড়ে।

এ—'দুধে' ঘি হয়। 'বিপদে' মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।' (রবীন্দ্রনাথ) আমি তোমার 'মুখে' একথা শুনিয়াছি।

তে—'দধিতে' পোকা জন্মিয়াছে। ভাল নেয়ের 'নদীতে' ভয় নাই।

কখন কখন অপাদানকারকে 'কে', 'দিয়া', 'র', 'য়' প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হইতে দেখা যায়। যেমন—

কে—'তোমাকে' যেমন ভয় করি, 'বাঘকে'ও তেমন ভয় করি না।

দিয়া—'মুখ দিয়া'* কথা সরিল না। ছেলেটির 'কান দিয়া' পুঁজ পড়ে।

র—'মৃত্যুর' ভয় করি না। **য়**—'টাকায়' টাকা হয়।

[**দ্রষ্টব্য ঃ** 'কাহা হইতে,' 'কোথা হইতে', 'কি হইতে,' 'কিসের থেকে' প্রভৃতি প্রশ্ন করিলে অপাদানকারক পাওয়া যায়।]

* এখানে দিয়া তৃতীয়ার সূচক নহে, হইতে এরই রূপান্তর মাত্র। মুখ হইতে কথার এবং কান হইতে পুঁজের বিশ্লেষণ বুঝাইবার জন্য অপাদানকারক।

(৬) অধিকরণকারক

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণকারক বলে। আধার বলিতে যে স্থানে, যে কালে বা যে বিষয়ে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বুঝায়।

বাঙলায় অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি অর্থাৎ 'তে', 'য়', 'এ' প্রভৃতি চিহ্ন যুক্ত হয়। যথা—'বনে' ব্যাঘ্র আছে (স্থান); 'বসন্তে' কোকিল ডাকে; 'বর্ষায়' নদী জলপূর্ণ হয় (কাল); রামের ছেলেটি 'অঙ্কে' কাঁচা; তিনি 'সংসারে' উদাসীন (বিষয়)।

অধিকরণকারক তিন প্রকার। যথা—

(১) **আধারাধিকরণ,** (২) **কালাধিকরণ,** এবং (৩) **ভাবাধিকরণ।**

(১) **আধারাধিকরণ ঃ** ইহা আবার নিম্নলিখিত তিন প্রকার। যথা—

(ক) **ঐকদেশিক ঃ** 'আকাশে' সূর্য উঠিয়াছে, 'বনে' বাঘ থাকে ইত্যাদি। আকাশের একদেশে বা অংশে সূর্য উঠিয়াছে এবং বনের এক অংশে বাঘ থাকে। তাই 'আকাশে' ও 'বনে' ঐকদেশিক আধার।

(খ) **অভিব্যাপক ঃ** 'তিলে' তৈল আছে; 'জ্যোৎস্নায়' মাধুর্য আছে ইত্যাদি। সমস্ত তিল ব্যাপিয়া তৈল থাকে। সারা জ্যোৎস্নাতেই মাধুর্য থাকে অর্থাৎ তিলের কোন এক স্থানে তৈল থাকে না বা জ্যোৎস্নার কোন এক বিশেষ অংশে মাধুর্য থাকে না।

(গ) **বৈষয়িক ঃ** তাঁহোর 'ধর্মে' (ধর্মবিষয়ে) মতি আছে।

(২) **কালাধিকরণ ঃ** ইহা নিম্নলিখিত দুই প্রকার। যথা—

(ক) **ক্ষণবাচক ঃ** 'কাল' আমি যাইব (আগামীকল্য কোন এক মুহূর্তে)।

(খ) **ব্যাপ্তিবাচক ঃ** 'শীতকালে' প্রকৃতি রুক্ষভাব ধারণ করে। 'বসন্তকালে' গাছ-পালা নবপত্রে শোভিত হয় ইত্যাদি। (সারা শীত ও বসন্ত ব্যাপিয়া)।

(৩) **ভাবাধিকরণ ঃ** এক ক্রিয়া দ্বারা যখন অন্য কোন ক্রিয়ার কাল নির্ণীত হয়, তখন সেখানে ভাবাধিকরণ হয়। যথা—'সূর্যোদয়ে' পক্ষিগণ কলরব করে; 'সূর্যাস্তে' পৃথিবী অন্ধকারাবৃত হইল। এখানে পক্ষিগণ সূর্যোদয়ের উপর নির্ভর করে এবং পৃথিবী অন্ধকারাবৃত সূর্যাস্তের উপর নির্ভর করে। অতএব সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে ভাবাধিকরণ।

সম্বন্ধপদ

বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে, পূর্বের বিশেষ্য ও সর্বনামপদকে **সম্বন্ধপদ** বলে। ক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই বলিয়া সম্বন্ধপদ কারক পর্যায়ভুক্ত নয়। সম্বন্ধপদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—'হায়রে, ভুলিবি কত'আশার' কুহক-ছলে' (মাইকেল)। 'ঐ ডাইনী 'বুড়ীর' রান্না আমি খাব না' (শরৎচন্দ্র)। অবশ্য সম্বন্ধপদের স্বত্ব ষষ্ঠী বিভক্তি ও অন্যান্য কারক অপহরণ করিয়া থাকে। যেমন—তুমি 'তাহাদের' এই কথা বলিও। এখানে 'তাহাদের' নিঃসন্দেহে কর্মকারক।

সম্বন্ধপদ নানাপ্রকার হইতে পারে। যথা—

(১) **প্রভুত্ব-সম্বন্ধে :** 'তাইতো তুমি 'রাজার রাজা' হয়ে…' (রবীন্দ্রনাথ)

(২) **বস্তু-সম্বন্ধে :** 'সোনার হাতে 'সোনার চুড়ি' কে কার অলংকার' (মোহিতলাল)

(৩) **কার্যকারণ-সম্বন্ধে :** 'সুখ হাসি আরো হবে উজ্জ্বল সুন্দর হবে 'নয়নের জল' (রবীন্দ্রনাথ)

(৪) **অভেদ-সম্বন্ধে :** 'যেন এই 'গাঙুরের ঢেউয়ের আঘ্রাণ' লেগে থাকে চোখে মুখে' (জীবনানন্দ)

(৫) **উপমিত-সম্বন্ধে :** 'সমরবন্যা হবে অবসান 'সোনার ভারত' বিপুল শ্মশান' (রবীন্দ্রনাথ)

(৬) **অঙ্গ-সম্বন্ধে :** 'শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত 'মানুষের হাড়' (সুকান্ত ভট্টাচার্য)

(৭) **উপলক্ষ্য-সম্বন্ধে :** 'আজ্‌কে আমার ছুটি আমার শনিবারের ছুটি' (রবীন্দ্রনাথ)

(৮) **জন্য-জনক-সম্বন্ধে :** 'মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা সহজ 'কুলের বালা' (চণ্ডীদাস)

(৯) **ক্রম-সম্বন্ধে :** 'তুমি শুয়ে রবে 'তেতালার পরে' আমরা রহিব নীচে অথচ তোমারে দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে' (নজরুল)

(১০) **আত্মীয়তা-সম্বন্ধে :** 'আমি কবি যতো 'কামারের' আর 'ছুতোরের' 'মুটে মজুরের' আমি কবি যত ইতরের।' (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

(১১) **কর্তৃ-সম্বন্ধে :** 'গুরুর আদেশ' পাইয়া শিষ্য সবেগে ছুটিল মঠে।

(১২) **কর্ম-সম্বন্ধে :** 'অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে 'বিশ্বের' ভার।' (রবীন্দ্রনাথ)

(১৩) **করণ-সম্বন্ধে :** 'চোখের দেখায়' শুধু তৃষ্ণা মিটে না।

(১৪) **সম্প্রদান-সম্বন্ধে :** 'খেলার মাঠে' ভিড় জমেছে।

(১৫) **অপাদান-সম্বন্ধে :** 'মুখের কথা' ; 'বাঘের ভয়' ; 'ভূতের ভয়' সবাই করে

(১৬) **অধিকরণ-সম্বন্ধে :** 'বনের পাখী' কহে 'খাঁচার পাখীটিরে।'

সম্বোধনপদ

যাহাকে সম্বোধন বা আহ্বান করা যায়, তাহাই **সম্বোধনপদ**। সম্বোধনপদে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন—'সাত ভাই চম্পা' জাগরে ; 'হে 'দারিদ্র্য', তুমি মোরে করেছ মহান্।' (নজরুল)। '**হে সখা,** মম হৃদয়ে রহো।' (রবীন্দ্রনাথ)

খাঁটি বাঙলায় সম্বোধন পদের মূল শব্দের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন—'**ইন্দিরা!** বল দেখি আমি তোমার কে?' (বঙ্কিমচন্দ্র)

তৎসম শব্দ সাধুভাষায় সম্বোধনপদে অনেক স্থলে সংস্কৃতরূপের নিয়মানুসারে পরিবর্তন করা যায়। যথা—'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে **সুন্দরি**।' (রবীন্দ্রনাথ)

[**মন্তব্য ঃ** কোন কোন ব্যাকরণে দেখা যায় কে, রে, এ, য়, তে প্রভৃতিকে বিভক্তি না বলিয়া অত্যন্ত আলগাভাবে 'প্রত্যয়' বলিয়া থাকে, এরূপ বলা অযৌক্তিক। 'বিভক্তি' এবং 'প্রত্যয়' একার্থক নয়, ভিন্নার্থক।]

বিভক্তি

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে শব্দের উত্তরে অথবা ধাতুর উত্তরে বিভক্তি যুক্ত হইলে পদ গঠিত হয়। যাহা দ্বারা বিভিন্ন কারক ও সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়, তাহাকেই **বিভক্তি** বলে।

বিভক্তি নিম্নলিখিত সাতপ্রকার। যথা—

প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং **সপ্তমী**।

সংস্কৃতে প্রত্যেক বিভক্তির স্ব স্ব রূপ বর্তমান। বাঙলাতে বিভক্তির সংখ্যা অল্প সেই কারণে একের বিভক্তি অন্যে ধার করিয়া চালাইয়া থাকে। যেমন—'**আমা হতে** নাহি হবে একার্য সাধন। এখানে 'হতে' পঞ্চমী বিভক্তিব রূপ, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তির কাজ করিবার জন্য তাহার উপস্থিতি। 'আমা হতে' অর্থাৎ 'আমা দ্বাবা'।

বিভক্তি বিভাগ ঃ পূর্বেই বলিয়াছি বাঙলায় বিভক্তির সংখ্যা অল্প। 'কে', 'রে', 'এ', 'তে', 'য়' প্রকৃতপক্ষে এই পাঁচটি মাত্র বিভক্তি বাঙলায় আছে। ইহাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করা যাইতে পারে। যথা—

প্রথমা—এ, তে শূন্য বিভক্তি। দ্বিতীয়া—কে, রে, এ শূন্য বিভক্তি। তৃতীয়া—এ, তে শূন্য বিভক্তি। চতুর্থী—কে, রে, এ। পঞ্চমী—এ, হইতে। ষষ্ঠী—র। সপ্তমী—তে, এ, শূন্য বিভক্তি। ষষ্ঠী ভিন্ন আর সকল স্থানেই 'এ' বিভক্তির ব্যবহার চলে।

অনুসর্গ

বিভক্তি ভিন্ন আরও কতকগুলি শব্দের মাধ্যমে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি বাচক পদ সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ এইগুলি শব্দের পশ্চাতে থাকিয়া পদ সৃষ্টি করে সেই কারণে ইহাদের নাম **অনুসর্গ**।

[সংস্কৃত ব্যাকরণে 'কর্মপ্রবচনীয়ের' স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয় না—সেইজন্য কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা এখানে ব্যবহার করা হইল না।]

অনুসর্গ-বিভাগ ঃ—দ্বিতীয়া—বিনা, বই, পানে, প্রতি, ব্যতীত, ছাড়া, অপেক্ষা, নিকটে, নিমিত্ত, ধন্যবাদ ইত্যাদি। যেমন—

'তুমি হাস শুধু
মুখপানে চেয়ে কথা না বলে'… (রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয়া—দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি। যেমন—

'সর্বাঙ্গে সহস্রবার **দিয়া** তারেস্নেহময় চুমা'… (রবীন্দ্রনাথ)

চতুর্থী—কারণ, জন্য, হেতু, নিমিত্ত, তরে ইত্যাদি। যেমন—

'ক্ষুধিতের অন্নদান **তরে**
তোমরা লইবে ভার বল কেবা' (রবীন্দ্রনাথ)

পঞ্চমী—থেকে, নিকট, হইতে, চেয়ে ইত্যাদি। যেমন—

'ইহার **চেয়ে** হতেম যদি আরব বেদুইন' (রবীন্দ্রনাথ)

সপ্তমী—কাছে, মধ্যে, মাঝে, নিকটে ইত্যাদি। যেমন—

'তারি **মাঝে** বসি এ নীরব হাসি হাসিছ কেন ? (রবীন্দ্রনাথ)

কারক-বিভক্তি ও অন্যপ্রকার বিভক্তি

প্রথমা

(ক) **অভিধেয় বা নাম অর্থেঃ** জগদীশ, পাহাড়, মানুষ, গরু ইত্যাদি।

(খ) **অব্যয় যোগেঃ** ইতি, নামে, বিনা, ছাড়া, বলিয়া ইত্যাদি।

(গ) **সম্বোধনেঃ** 'ওগো সন্ন্যাসী' তুমি কোথায় ?' (রবীন্দ্রনাথ)
'ছোট বাবু' ভাল চাও ত আর হাঙ্গামা ক'রো না' (শরৎচন্দ্র)

দ্বিতীয়া

(ক) **ব্যাপ্ত্যর্থেঃ** স্কুল এখন 'পনর দিন' বন্ধ থাকিবে; বড় বড় শহরে পাঁচদিন' পূজার উৎসব চলিয়া থাকে।

(খ) **ক্রিয়াবিশেষণেঃ** সে 'দ্রুত' লিখিতে পারে; 'তাড়াতাড়ি' চল।

(গ) **অব্যয় যোগেঃ** 'পাপীকে' ধিক, তাহাকে বিনা চলা শক্ত।

(ঘ) **ভাববিশেষ্যের কর্মেঃ** তুমিত মানুষ, 'তোমাকে' আমার ভয় কি ?

[**দ্রষ্টব্যঃ** বিশেষ্যপদ ভাববিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইলে উহার উত্তরে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং উক্ত বিভক্তির লোপ হয়। যথা—জ্বর তিন 'ডিগ্রী' উঠিয়াছে।]

পঞ্চমী

(ক) **স্থান ও পরিমাণার্থেঃ** 'কলিকাতা হইতে' বর্ধমান পঞ্চাশ মাইল। 'স্কুল হইতে' বাজার এক মাইল।

(খ) **অপেক্ষার্থে ঃ** 'ধন অপেক্ষা' বিদ্যা বড় ; জননী ও জন্মভূমি 'স্বর্গ হইতেও' শ্রেষ্ঠ ; মাখন 'দুগ্ধ অপেক্ষা' পুষ্টিকর।

(গ) **অব্যয় যোগে ঃ** 'তিল হইতে' তৈল হয়।

[**দ্রষ্টব্য ঃ** ইংরাজীতে দুইয়ের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে 'than' এবং বহুর মধ্যে 'of' এই পদান্বয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে সর্বদাই পঞ্চমী বিভক্তি হয়।]

ষষ্ঠী

(ক) **সহার্থক শব্দে ঃ** 'অসতের সহিত' মিশিবে না।

(খ) **নির্ধারণে ঃ** আধুনিক 'কবিগণের মধ্যে' রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ।

(গ) **তুল্যার্থে ঃ** 'বিদ্যার তুল্য' বন্ধু নাই ; 'বিনয়ের' সদৃশ গুণ নাই।

সপ্তমী

(ক) **সহার্থে ঃ** 'সুরদলে' সুরপতি গেলা সুরপুরে' (মেঘনাদ-বধ)
কি ফুলে তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে' (হেমচন্দ্র)

(খ) **প্রয়োজনার্থে ঃ** 'ধনে' আমার কোন প্রয়োজন নাই। (বিদ্যাসাগর)

(গ) **নির্ধারণে ঃ** 'মানুষে' নাপিত ধূর্ত, 'পক্ষীতে' বায়স। (প্রবাদ)

(ঘ) **ভেদ বা লক্ষণ ঃ** তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ।

অনুশীলনী

১। কারক কাহাকে বলে ? কারক কয় প্রকার এবং কি কি ?

২। সম্বন্ধপদ ও সম্বোধনপদকে কারক বলা সঙ্গত নয় কেন ?

৩। মোটা অক্ষরগুলির কারক নির্ণয় কর : **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে। ছোট মুখে **বড় কথা** ভাল শোনায় না। **অন্ধজনে** দেহ আলো। **হালে** পানি পাওয়া যাচ্ছে না। **ঘর** পালিয়ে কোথায় গেছিলে ? চরকার **ঘর্ ঘর্** বস্তির ঘর্ঘর্।
(স্কুল ফাইনাল ১৯৫২)

৪। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর : প্রযোজক কর্তা, গৌণকর্ম ও কালাধিকরণ। প্রযোজ্য কর্তা (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৪)।

৫। ব্যাখ্যাসহ উদাহরণ দাও : অপাদান কারক, অধিকরণকারক।
(ঢা. বি. মাধ্যমিক ১৯৪৭)

৬। বিভিন্ন অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ উদাহরণ সমেত প্রদর্শন কর :—
(ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) ১৯৫৭)

৭। উদাহরণ দাও :—ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া ; জন্য-জনক সম্বন্ধ ; উপমিত সম্বন্ধ ; অভিব্যাপক-আধারাধিকরণ ; পরিমাণার্থে পঞ্চমী ; নির্ধারণে ষষ্ঠী।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রিয়াপদ—ধাতু ও প্রত্যয়

ক্রিয়াপদ

বাক্যের দুইটি অংশ আছে। **উদ্দেশ্য** ও **বিধেয়**। যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলা হয় তাহাই **উদ্দেশ্য** (Subject) এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহা **বিধেয়** (**Predicate**)। বাক্যের বিধেয়াংশে **ক্রিয়াপদ** থাকে। যেমন—অভিজিৎ স্কুলে যায়। এখানে 'অভিজিৎ' উদ্দেশ্য এবং 'স্কুলে যায়' বিধেয়। ক্রিয়া ব্যতীত কোন বাক্যই সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত হইতে পারে না। অভিজিৎ স্কুল—এখানে যথাক্রমে দুইটি বিশেষ্যপদ রহিয়াছে। তথাপি 'যায়' ক্রিয়াপদ না থাকিলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কাজেই **বাক্যে ক্রিয়াপদের প্রাধান্য সকলের অপেক্ষা বেশী।**

পূর্বেই বলা হইয়াছে ধাতুর উত্তরে প্রত্যয় যোগ করিয়া ক্রিয়াবাচক শব্দ গঠিত হয়। আবার ধাতুর সহিত বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হইয়া যে কার্যপ্রকাশক পদ গঠিত হয়, তাহাই **ক্রিয়াপদ**। যেমন—চল্ (ধাতু) + আ (কৃৎ প্রত্যয়) = চলা (ক্রিয়াবাচক শব্দ বা কৃদন্ত শব্দ)। তাহার সহিত 'র' বিভক্তি যুক্ত করিলে হইল 'চলার' ক্রিয়াপদে। যেমন—পথে **চলার** সময় দেখিয়া চলিও।

ধাতু ও প্রত্যয়

শব্দের মূলকে প্রাতিপদিক বলে। ক্রিয়াপদের মূল অংশকে **ধাতু** বলে। যাহা ধাতু ও প্রাতিপদিকে যুক্ত হয় তাহাকে **প্রত্যয়** বলে। প্রত্যয় পাঁচ প্রকার—**বিভক্তি, কৃৎ, তদ্ধিত, স্ত্রী-প্রত্যয়** এবং **ধাত্ববয়ব**।

ধাতুর উত্তর কৃৎ (তব্য, অনীয় প্রভৃতি) এবং ধাত্ববয়ব (ণিচ্, সন্ প্রভৃতি) এই দুই প্রকার প্রত্যয় হয়।

প্রকৃতি ও গঠন প্রণালীর দিক হইতে বিচার করিলে ধাতুগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু, (২) সংযোগমূলক ধাতু ও (৩) সাধিত ধাতু।

(১) **সিদ্ধ** বা **মৌলিক ধাতু**ঃ যে সকল ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ যাহাদিগকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, সেগুলিকে **সিদ্ধ** বা **মৌলিক ধাতু** (**Primary**) (**Roots**) বলে। যথা—যা, খা, কর্, পড়্, দেখ্, কাঁদ্, হাস্, থাক্, ধর্, শুন্, মাত্, খেল্, বল্, জান্ ইত্যাদি।

(২) **সংযোগমূলক ধাতু**ঃ যে সকল ধাতুর বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সহিত কর্, দে, পা, হ প্রভৃতি ধাতুর সংযোগে সৃষ্ট হয়, সেগুলিকে

সংযোগমূলক ধাতু (**Compound Roots**) বলে। যথা—'কর্' ধাতুযোগে—গান কর্, খেলা কর্, আদর কর্, পাঠ কর্ ইত্যাদি। 'দে' ধাতুযোগে—ডুব্ দে, লাফ্ দে, দৌড় দে, ইত্যাদি। 'পা' ধাতুযোগে—টের পা, ব্যথা পা, লজ্জা পা ইত্যাদি। 'হ' ধাতুযোগে—রাজী হ, সুখী হ ইতাদি।

(৩) **সাধিত ধাতু** : যে সকল ধাতুকে বিশ্লেষণ করিলে একটি মূল ধাতু বিশেষণের সহিত প্রত্যয় এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ পাওয়া যায়, তাহাকে **সাধিত ধাতু** (**Derivative Roots**) বলে। যথা—কর্+আ=করা; পড়্+আ=পড়া; শুন্+আ=শুনা; মচ্মচ্+আ=মচমচা ইত্যাদি।

সাধিত ধাতু আবার নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত। যথা—

(ক) **প্রযোজক** বা **ণিজন্ত ধাতু**—করা, খাওয়া, দেখা ইত্যাদি।

(খ) **কর্মবাচ্যের ধাতু**—শুনা, শোনা ইত্যাদি।

(গ) **নামধাতু**—বেতা, লাঠা, ধমকা ইত্যাদি।

(ঘ) **ধ্বন্যাত্মক ধাতু**—টল্টলা, ঝন্ঝনা, চক্চকা ইত্যাদি।

(ক) **প্রযোজক** বা **ণিজন্ত ধাতু** : যে ক্রিয়ার কার্য একজনের প্রযোজনায় বা প্রেরণায় সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝাইতে ধাতুর প্রয়োগ হয়; ইহার সহিত বিভক্তি সংযুক্ত করিলে **প্রযোজক ক্রিয়া** গঠিত হয়। যথা—বালক বই 'পড়িতেছে'; শিক্ষক বালককে বই 'পড়াইতেছেন' ইত্যাদি। এখানে 'পড়' এর সহিত 'আ' সংযুক্ত হইয়া 'পড়া' ধাতু পাওয়া গেল। সংস্কৃতে ণিচ্ বা প্রেরণার্থ প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াকে ণিজন্ত ক্রিয়া এবং উহার মূলকে **ণিজন্ত ধাতু** বলে। যথা—কর্+আ=করা, খা—খাআ>খাওয়া (ব শ্রুতির আগম); দে=দেআ<দেওয়া; যা=যাআ<যাওয়া প্রভৃতি ণিজন্ত ধাতু।

(খ) **কর্মবাচ্যের ধাতু** : ধাতুর উত্তর আ-প্রত্যয় যোগ করিয়া **কর্মবাচ্যের ধাতুও** গঠন করা যায়। যথা—শুন্+আ=শোনা>শুনা উদাহরণ—তোমার মুখে এ কথা বলা ভাল শুনায় (শোনায়) না।

(গ) **নাম ধাতু** : যে ধাতু নামপদ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে **নামধাতু** বলে। যথা—ঠক্+আ=ঠকা+য়=ঠকায়; কাম+আ=কামা (কামায়—উপার্জন করে)।

সংস্কৃত নামধাতুর বাঙলায় ব্যবহার কম, তবে প্রত্যয়ান্তরূপে তাহাদের ব্যবহার বাঙলা ভাষায় পাওয়া যায়। যথা—দণ্ডায়মান, শব্দায়ন ইত্যাদি।

(ঘ) **ধ্বন্যাত্মক ধাতু** : ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইলে **ধ্বন্যাত্মক ধাতু** হয় এবং ইহার সহিত বিভক্তি যুক্ত করিলে ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া বা অনুকার ক্রিয়া গঠিত হয়। যথা—ছল্ছলা, ঝির্ঝির্, কন্কনা, টল্টলা, কল্কলা, মচ্মচা ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের শ্রেণীবিভাগ

গঠনভঙ্গী অনুসারে ক্রিয়াপদকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) **সিদ্ধ** বা **মৌলিক ক্রিয়া ঃ** মৌলিক ধাতু দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদকে সিদ্ধ বা মৌলিক ক্রিয়া বলে। যেমন—দেখে, দেখিতেছে, আসিল, আসিবে, আসিব ইত্যাদি।

(২) **প্রযোজক** বা **ণিজন্ত ক্রিয়া ঃ** যে ক্রিয়ার কার্য একজনের নির্দেশে অন্যজন কর্তৃক সংগঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া বলে। যথা— 'মা' ছেলেকে চাঁদ দেখাইতেছেন; 'শিক্ষক' ছাত্রকে ব্যাকরণ পড়াইতেছেন ইত্যাদি।

(৩) **সমাপিকা ক্রিয়া ঃ** যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া (Finite Verb) বলে যথা—সে 'খায়'; বালকেরা স্কুলে 'যায়' ইত্যাদি।

(৪) **যৌগিক** বা **মিলিত ক্রিয়া ঃ** একটি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সমাপিকা ক্রিয়া মিলিত হইয়া যদি একটিমাত্র ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে যৌগিক বা মিলিত ক্রিয়া (Compound Verb) বলে। যেমন—'পাওনাদারের কথা শুনিয়া সে একেবারে **বসিয়া পড়িল**।'

(৫) **অসমাপিকা ক্রিয়া ঃ** যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না এবং বাক্যকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য অন্য একটি সমাপিকা ক্রিয়া পদের প্রয়োজন হয়, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া (Infinite Verb) বলে। যেমন—

'আজি 'জাগিয়া' 'উঠিয়া' পরাণ আমার
বসিয়া আছে, বুকের কাছে' (রবীন্দ্রনাথ)

সাধারণতঃ 'ইয়া', 'ইলে', 'ইতে' প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। সাধারণতঃ কাব্যে 'ইয়া' প্রত্যয় যোগে গঠিত ক্রিয়াপদে অনেক সময় প্রত্যয়ের 'য়া' অংশ লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন—

'লতাপাতা চাঁদ মেঘের সহিত এক হয়ে ছিলে 'মিশি' (রবীন্দ্রনাথ)

ক্রিয়ায় আদেশ, অনুরোধ, ইচ্ছা প্রভৃতি বুঝাইতেও 'ইতে' প্রত্যয়যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন—

'উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত শুনেও শুনে না কানে।' (রবীন্দ্রনাথ)

অর্থভেদে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া নিম্নলিখিত দুই প্রকার। যথা—

(ক) সকর্মক ও (খ) অকর্মক।

(ক) **সকর্মক ক্রিয়া ঃ** যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাহাকে সকর্মক ক্রিয়া (Transitive Varb) বলে। যেমন—সে বই পড়ে। এখানে 'বই' কর্ম থাকায় 'পড়ে' সকর্মক ক্রিয়া।

(৫) **অকর্মক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়া কেবলমাত্র কর্তাকে অবলম্বন করিয়া ঘটে অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কর্ম নাই , তাহাকে অকর্মক ক্রিয়া (Intransitive Verb) বলে। যেমন—সে 'পড়ে' ; ছেলেটি' 'হাসে' ইত্যাদি ।

(৬) **ধাত্বর্থক** বা **সমধাতুজ ক্রিয়া** এবং **কর্ম** : একই ধাতু হইতে যথাক্রমে ক্রিয়া এবং কর্মের উৎপত্তি হইলে ক্রিয়াটিকে সমধাতুজ ক্রিয়া এবং কর্মটিকে সমধাতুজ কর্ম বলা হয়। যেমন—সে রবীন্দ্রনাথের **গান গাহিল**। এখানে 'গান' ধাত্বর্থক বা সমধাতুজ কর্ম এবং 'গাহিল' ধাত্বর্থক বা সমধাতুজ ক্রিয়া।

এইরূপ—'তোমার বড় বাড বাড়িয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ); রতন বেঁচে থাকতে তার চাকরের **ভবনা** ভাবতে হবে না।' (শরৎচন্দ্র)

(৭) **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** : যে সকর্মক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম বর্তমান থাকে, তাহাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। দুইটি কর্মের মধ্যে যে কর্মটিকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়ার কার্য ঘটিয়া থাকে তাহাকে **মুখ্য কর্ম** (Direct object) বলে। আর যে কর্মটিকে উদ্দেশ্য করিয়া ক্রিয়ার কার্য হইয়া থাকে, তাহাকে **গৌণ কর্ম** (Indirect object) বলে। যেমন—পিতা পুত্রকে সংস্কৃত পড়াইতেছেন। এখানে 'পুত্রকে' অবলম্বন করিয়া ক্রিয়ার কার্য সংঘটিত হইতেছে। অতএব 'পুত্রকে' **মুখ্য কর্ম**। পুনরায় 'সংস্কৃত'কে উদ্দেশ্য করিয়া ক্রিয়া কার্য হইতেছে অতএব 'সংস্কৃত' **গৌণ কর্ম**। এই দুই কর্ম থাকার জন্য 'পড়াইতেছেন' **দ্বিকর্মক ক্রিয়া**।

(৮) **অপূর্ণরূপ** বা **পঙ্গুক্রিয়া** (Defective Verb) : সব ভাষাতেই এমন কতকগুলি ধাতু আছে যাহাদের সম্পূর্ণ রূপ সব কালে ও ভাবে পাওয়া যায় না এইগুলিকে অপূর্ণরূপ বা পঙ্গুক্রিয়া বলা হয়। সংস্কৃতে "দৃশ্" ধাতুর রূপ বর্তমান কালে নাই। "ব্রূ" ধাতুর প্রয়োগ বর্তমান কাল ব্যতীত অন্যান্য কালে নাই বাঙলায় "গম্" ধাতুর ব্যবহার শুধু অতীত কালে ও অসমাপিকায় আছে। চলিত ভাষায় 'যা' ধাতুর রূপ শুধু অতীত কালেই ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

১। ধাতুর শ্রেণী বিভাগ কর। প্রত্যেক প্রকার ধাতুর একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখ :—

(ক) প্রযোজক ক্রিয়া, নাম ধাতু (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৪) ; (খ) অসমাপিকা ক্রিয়া, ; (গ) সকর্মক ক্রিয়া ; (ঘ) সমধাতুজ ক্রিয়া ; (ঙ) সংযোগমূলক ধাতু।

৩। নিম্নলিখিত প্রত্যেক ধাতুদ্বারা দুইটি যৌগিক ক্রিয়া গঠন কর :—

খা, দে, ফেল্, পড়, আন্, লহ্, কর্, বল্।

নবম অধ্যায়

ক্রিয়ার প্রকার ও ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়ার প্রকার

ক্রিয়াপদকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে ; ক্রিয়াপদের এই বিশিষ্ট রীতিকে **ক্রিয়ার প্রকার (Mood)** বলে। ক্রিয়ার প্রকার নিম্নলিখিত তিন প্রকার। যথা—(১) নির্দেশক, (২) অনুজ্ঞা এবং (৩) সম্ভাবক।

(১) **নির্দেশক ভাব :** সাধারণভাবে কোন কিছু নির্দেশ করিলে, নির্দেশক ভাব (**Indicative Mood**) হয়। যথা—ছেলেরা অত্যন্ত খেলা 'ভালবাসে'।

(২) **অনুজ্ঞা :** প্রার্থনা, আবাহন, আহ্বান, আদেশ, অনুরোধ, অভিশাপ, আশীর্বাদ, মঙ্গল-কামনা ইত্যাদি বুঝাইতে ও ভবিষ্যৎকালে অনুজ্ঞার প্রয়োগ হয়। যথা—

প্রার্থনা : 'বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি।' (রবীন্দ্রনাথ)

আবাহন : 'এসো গন্ধে বরণে' এসো গানে।' (রবীন্দ্রনাথ)

আহ্বান : 'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়।' (নজরুল)

আদেশ : এখান থেকে বেরিয়ে যাও বলছি।

অনুরোধ : আমার ছেলেকে আপনার উপরই ছেড়ে দিয়েছি।

অভিশাপ : তারও যেন আমারই মতো জীবন কাটাতে হয়।

আশীর্বাদ : করি আশীর্বাদ—ভদ্র 'হও'। ধন্য 'হও', ভারত-মাতার 'হও' উপযুক্ত পুত্র। (যোগীন্দ্র বসু)

মঙ্গল-কামনা : তোরা যেখানেই থাক না কেন, তোদের মঙ্গল হোক্।

(৩) **সম্ভাবক ভাব :** একটি অনিশ্চয়াত্মক ও একটি সম্ভাব্যতা-সূচক ক্রিয়ার সংযোগে সম্ভাবক ভাব (Subjunctive Mood) হয়। যথা—যদি তিনি বলেন, তবে আমি যাইতে পারি। এখানে বলার উপর যাওয়া নির্ভর করিতেছে। সম্ভাবক ভাবের ক্রিয়াপদের পৃথক কোন রূপ নাই।

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়ার ঘটনা সময়কে কাল বলে। সাধারণ অর্থে কালকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিয়াছি। যথা—(১) **অতীত,** (২) **বর্তমান** ও (৩) **ভবিষ্যৎ**।

যে ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে তাহাই অতীত কাল ; যে ঘটনা এখন হয় বা হইতেছে তাহাই বর্তমান কাল এবং যে ঘটনা পরে ঘটিবে তাহা ভবিষ্যৎ কাল। সূক্ষ্ম অর্থে বিচার করিতে গেলে অবশ্য বর্তমান বলিয়া কিছুই নাই। যাহাকে এখন বর্তমান ভাবিলাম মুহূর্ত পরেই তাহা আমার নিকট অতীত হইয়া গেল। এইভাবে মুহূর্তের পর

মুহূর্ত ক্ষণিকের বর্তমানকে অতীতের কোলে টানিয়া লইতেছে এবং ক্ষণিকের বর্তমানের পরে যাহা আসিতেছে তাহা ভবিষ্যৎ।

এই সূক্ষ্ম অর্থে ব্যাকরণে কালবিচার সম্ভব নয়। মুহূর্ত বা ক্ষণিক সময়ের বিচার করিয়াই ব্যাকরণে কাল বিভাগ করা হয় নাই। ব্যাপক সময়েই কাল বিভাগের স্বীকৃতি জানানো হইয়াছে। সূক্ষ্ম অর্থের Point of time কাল বিভাগের মাধ্যম নয়; স্থূল অর্থের Period of time ধরিয়াই কাল বিভাগ করা হইয়াছে। যেমন—অঞ্জলি গান করিতেছে। এই বাক্যে অঞ্জলি যখন গান আরম্ভ করিয়াছিল তাহা অতীতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং পরে আরও যাহা গাহিবে তাহা ভবিষ্যতে রহিয়াছে, কেবলমাত্র এই বিশেষ মুহূর্তে অঞ্জলি যাহা গাহিল তাহাই বর্তমান। এই অর্থে বিচার করিতে গেলে উক্ত বাক্যটিকে একই সঙ্গে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ারূপ বলিতে হয়।

ব্যাকরণের বিধি অনুসারে ক্রিয়ার কাল প্রধানতঃ তিন পর্যায়ে বিভক্ত। যাহা শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা **অতীত**, যাহা এখনও শেষ হয় নাই অথবা এই মুহূর্তে শেষ হইল তাহা **বর্তমান** এবং যাহা পরে শেষ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা **ভবিষ্যৎ**। যেমন—সে যায়—বর্তমান, সে গিয়াছিল—অতীত এবং সে যাইবে—ভবিষ্যৎ।

অর্থভেদে এই তিনটি কালকে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন—

(ক) **বর্তমান কাল**: (১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান
(২) ঘটমান বর্তমান } (নির্দেশক ভাব)

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান
(৪) বর্তমান অনুজ্ঞা } (অনুজ্ঞা ভাব)

(খ) **অতীত কাল**: (১) সাধারণ বা নিত্য অতীত
(২) ঘটমান অতীত
(৩) পুরাঘটিত-অতীত
(৪) নিত্যবৃত্ত অতীত } (নির্দেশক ভাব)

(গ) **ভবিষ্যৎ কাল**: (১) নিত্য বা সাধারণ ভবিষ্যৎ (নির্দেশক ভাব)
(২) ঘটমান ভবিষ্যৎ
(৩) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (অনুজ্ঞা ভাব)
(৪) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

বর্তমান কাল

(১) **সাধারণ** বা **নিত্য বর্তমান :** আমাদের চেতনা এবং জ্ঞানের মাধ্যমে যে সমস্ত ঘটনাকে আমরা নিত্যই উপলব্ধি করি অর্থাৎ যাহা সর্বদাই ঘটে বা সকল সময় বর্তমান থাকে, তাহাই **সাধারণ** বা **নিত্য বর্তমান** (**Simple Present** বা **Present Indefinite**) বলে। যথা—সে 'যায়'; তাহারা 'হাসে' ইত্যাদি।

(২) **ঘটমান বর্তমান :** যে ক্রিয়া বর্তমানে চলিতেছে এইরূপ বুঝাইলে **ঘটমান বর্তমান** (**Present Cotinuous**) হয়। ক্রিয়ার সহিত ইতেছ, ইতেছি, ইতেছে প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—সে 'যাইতেছে' বা আমি 'যাইতেছি' ইত্যাদি। 'দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ'। (নজরুল)

(৩) **পুরাঘটিত বর্তমান :** যে ক্রিয়া অতীত ও বর্তমানের মাঝামাঝি অর্থাৎ কাজটি আরম্ভ হইয়াছে এখনও তাহার ফল বর্তমান, তাহাকে **পুরাঘটিত বর্তমান** (**Present Perfect**) বলে। যেমন—'আর আছে ? আর নাই, দিয়াছি ভরে' (রবীন্দ্রনাথ)

(৪) **বর্তমান অনুজ্ঞা :** যে ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কালে আদেশ, উপদেশ, প্রার্থনা, অনুরোধ, আশীর্বাদ প্রভৃতি বুঝায়, তাহাই **বর্তমান অনুজ্ঞা** (**Present Imperative Mood**)। যেমন—বইখানা ধর; 'শুধু 'থাক্' এক বিন্দু নয়নের জল কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল'। (রবীন্দ্রনাথ)

(৫) **ঐতিহাসিক বর্তমান :** অনেক সময় অতীতের ঘটনা বর্তমানের ক্রিয়ারূপ দিয়া গঠিত হয়, তাহাকে **ঐতিহাসিক বর্তমান** (**Historic Present**) বলে। যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'সাজাহান' কবিতায়—'তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে চির মৌন-জাল দিয়ে **বেঁধে দিলে** কঠিন বন্ধনে।' তব অর্থাৎ সাজাহানের (যে ইতিহাস আশ্রিত অতীতের ব্যক্তি) ক্রিয়ারূপ 'বেঁধে দিলে' বর্তমান।

অতীত কাল

(১) **সাধারণ** বা **নিত্য অতীত :** **(ক)** এইমাত্র যে কাজটির ক্রিয়া সমাপ্তি হইল এইরূপ বুঝাইলে, তাহাকে **সাধারণ** বা **নিত্য অতীত** (**Past Indefinite**) বলে। সাধারণতঃ ইল, ইলে, ইলাম প্রভৃতি এই কালের বিভক্তি। যেমন—সে এখন 'গেল'; তুমি তাহার কি 'করিলে'; আমি 'আসিলাম' ইত্যাদি।

(খ) কোন অতীত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় সাধারণতঃ অতীত বিভক্তিরই ব্যবহার হয়। যথা—"সেই সময়ে রামের নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে 'লাগিল'। 'লক্ষ্মণ' 'কহিলেন' আর্যে !" (সীতার বনবাস)

(২) **ঘটমান অতীত :** যে ক্রিয়া অতীত কালে চলিতেছিল এখনও সম্পন্ন হয় নাই এইরূপ বুঝাইলে তাহাকে **ঘটমান অতীত** (**Past Continuous**) বলে। সাধারণ রূপের সহিত ক্রিয়ার ইতেছিলে, ইতেছিল, ইতেছিলেন প্রভৃতি বিভক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন—সে 'যাইতেছিল' ; বা আমি 'যাইতেছিলাম' ইত্যাদি।

প্রয়োগ : 'তখন **গাহিতেছিল** তরুশাখা প'রে
সুললিত স্বরে পাপিয়া' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

(৩) **পুরাঘটিত অতীত :** যে ক্রিয়া পূর্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহার বর্তমান ফল নাই, তাহার কালকে **পুরাঘটিত অতীত** (**Past Perfect**) বলে। ইয়াছিল, ইয়াছিলে, ইয়াছিলাম ইত্যাদি এই কালের বিভক্তি। যেমন—'এই স্থানে আর্যপুত্র একান্ত বিকলচিত্ত 'হইয়াছিলেন'।' (সীতার বনবাস)

(৪) **নিত্যবৃত্ত অতীত :** যে ক্রিয়ার কাজ পূর্বে নিয়মিতভাবে অথবা কিছুকাল ধরিয়া ঘটিত, তাহাকে **নিত্যবৃত্ত অতীত** (**Habitual Past**) বলে। যেমন—অতিথি **আসিত** নিত্য করভ-করভী' (মধুসূদন)

প্রয়োগ : কুরঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে 'নাচিতাম' বনে
'গাইতাম' গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।
কভু বা প্রভুর সহ 'ভ্রমিতাম' সুখে। (মেঘনাদ-বধ)

ভবিষ্যৎ কাল

(১) **নিত্য** বা **সাধারণ ভবিষ্যৎ :** (ক) যে ক্রিয়া বর্তমানের পরে ঘটিবে তাহা **নিত্য** বা **সাধারণ ভবিষ্যৎ** (**Simple Future**) বলে। যেমন—'আঁধার রজনী 'আসিবে' এখনি মেলিয়া পাখা' (রবীন্দ্রনাথ)

(খ) অনেক সময় অতীতকালের ক্রিয়ায়ও সাধারণ ভবিষ্যৎ বিভক্তি হয়। যথা—কপাল খারাপ, নইলে এত পড়িয়াও ফেল 'হইব' কেন ?

(২) **ঘটমান ভবিষ্যৎ :** যে ক্রিয়া পরে হইতে থাকিবে তাহার **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল** (**Future Continuous Tense**) হয়। যেমন—সে গান 'করিতে থাকিবে'। এই আরব্ধ কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত 'চলিতে থাকিবে' ইত্যাদি।

(৩) **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ :** এই কালের রূপটি সম্পর্কে বিতর্ক ও সমস্যা বিদ্যমান। অতীতের ঘটনার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হইলে তাহাকে **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল** (**Future Perfect Tense**) বলে। যেমন—সে ইহা দেখিয়া থাকিবে'।

এখানে 'থাকবে' ক্রিয়ার রূপ ভবিষ্যতের মতো কিন্তু ঘটনাটি অতীতের এবং উক্ত ঘটনার প্রতি বক্তার সন্দেহজনক উক্তি। তাই অনেকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎকে **সন্দিগ্ধ অতীত** বলিবার পক্ষপাতী।

(৪) **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা** : ভবিষ্যতে পালন করিবার নিমিত্ত আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ বা প্রার্থনা বুঝাইতে হইলে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (Future Imperative Tense) হয়। যেমন—সদা সত্য কথা 'বলিবে'। আপনি দয়া করিয়া আমাদের বাড়ী 'আসিবেন'। 'ধর' দ্রুত প্রাণপণে ইত্যাদি।

ক্রিয়ার বিভক্তি

ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, সেগুলিকে **ক্রিয়ার বিভক্তি** বলে। ক্রিয়ার বিভক্তি দুই প্রকার। যথা—(১) **পুরুষবাচক** ও (২) **কাল-বাচক**। ক্রিয়ার কাল, কর্তার পুরুষ ও পাত্র (গুরু সামান্য ও তুচ্ছ) ভেদে ধাতুর বিভক্তি-গুলির প্রভেদ দেখা যায়।

সাধুভাষায় ক্রিয়ার বিভক্তির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু চলিত-ভাষায় ক্রিয়ার রূপ অত্যন্ত জটিল, আঞ্চলিক ভাষা-বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। নিম্নে সাধু ও চলিত ভাষায় ধাতুর বিভক্তিগুলি দেওয়া হইল :

সাধু ভাষার বিভক্তি

বর্ত্তমান

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
সাধারণ	এ, এন	অ, ইস, এন	ই
ঘটমান	ইতেছে, ইতেছেন	ইতেছ, ইতেছিস্, ইতেছেন	ইতেছি
পুরাঘটিত	ইয়াছে, ইয়াছেন	ইয়াছ, ইয়াছিস্ ইয়াছেন	ইয়াছি
অনুজ্ঞা	উক, উন	অ, ×, উন	ই

অতীত

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
সাধারণ	ইল, ইলেন	ইলে, ইলি, ইলেন	ইলাম
ঘটমান	ইতেছিল, ইতেছিলেন	ইতেছিলে, ইতেছিলি, ইতেছিলেন	ইতেছিলাম
পুরাঘটিত	ইয়াছিল, ইয়াছিলেন	ইয়াছিলে, ইয়াছিলি, ইয়াছিলেন	ইয়াছিলাম

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
নিত্যবৃত্ত	ইত, ইতেন	ইতে, ইতিস্, ইতেন	ইতাম

ভবিষ্যৎ

সাধারণ	ইবে, ইবেন	ইবে, ইবি, ইবেন	ইব
ঘটমান	ইতে থাকিবে, ইতে থাকিবেন	ইতে থাকিবে, ইতে থাকিবি, ইতে থাকিবেন	ইতে থাকিব
পুরাঘটিত	ইয়া থাকিবে, ইয়া থকিবেন	ইয়া থাকিবে, ইয়া থাকিবি, ইয়া থাকিবেন	ইয়া থাকিব
অনুজ্ঞা	ইবে, ইবেন	ইবি, ইও, ইস্, ইবেন	ইব

চলিত ভাষার বিভক্তি

বর্তমান

সাধারণ	এ, এন	এ, ইস্, এন	ই
ঘটমান	ছে, ছেন	ছ, ছিস্, ছেন	ছি
পুরাঘটিত	এছে, এছেন	এছ, এছিস, এছেন	এছি
অনুজ্ঞা	উক, উন	অ, ×, উন	ই

অতীত

সাধারণ	ল, লে, লেন	লে, লি, লেন	লাম, লেম, লুম
ঘটমান	ছিল, ছিলেন	ছিলে, ছিলি, ছিলেন	ছিলাম, ছিলেম, ছিলুম
পুরাঘটিত	এছিল, এছিলেন	এছিলে, এছিলি, এছিলেন	এছিলাম, এছিলেম, এছিলুম
নিত্যবৃত্ত	ত, তেন	তে, তিস্, তেন	তাম, তম, তুম

ভবিষ্যৎ

সাধারণ	বে, বেন	বে, বি, বেন	ব
ঘটমান	তে থাকবে, তে থাকবেন	তে থাকবে, তে থাকবি, তে থাকবেন	তে থাকব
পুরাঘটিত	এ থাকবে, এ থাকবেন	এ থাকবে, এ থাকবি, এ থাকবেন	এ থাকব
অনুজ্ঞা	বে, বেন	বে, ও, ইস্, বেন	ব

ক্রিয়ারূপ

কর্ ধাতু (সাধু)

বর্তমান কাল ঃ

		সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	অনুজ্ঞা
প্রথমপুরুষ	একবচন	করে, করেন	করিতেছে, করিতেছেন	করিয়াছে, করিয়াছেন	করুক, করুন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মধ্যমপুরুষ	একবচন	কর, করিস্, করেন	করিতেছ, করিতেছিস্, করিতেছেন	করিয়াছ, করিয়াছিস্ করিয়াছেন	কর, করুন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
উত্তমপুরুষ	একবচন	করি	করিতেছি	করিয়াছি	করি
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অতীত কাল ঃ

		সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	নিত্যবৃত্ত
প্রথমপুরুষ	একবচন	করিল, করিলেন	করিতেছিল, করিতেছিলেন	করিয়াছিল, করিয়াছিলেন	করিত, করিতেন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মধ্যমপুরুষ	একবচন	করিলে, করিলি, করিলেন	করিতেছিলে, করিতেছিলি, করিতেছিলেন	করিয়াছিলে, করিয়াছিলি, করিয়াছিলেন	করিতে, করিতেন, করিতিস্
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
উত্তমপুরুষ	একবচন	করি	করিতেছিলাম	করিয়াছিলাম	করিতাম
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

ভবিষ্যৎ কাল :

		সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	অনুজ্ঞা
প্রথমপুরুষ	একবচন	করিবে, করিবেন	করিতে থাকিবে, করিতে থাকিবেন	করিয়া থাকিবে করিয়া থাকিবেন	করিবে করিবেন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মধ্যমপুরুষ	একবচন	করিবে, করিবি, করিবেন	করিতে থাকিবে, করিতে থাকিবি, করিতে থাকিবেন	করিয়া থাকিবে, করিয়া থাকিবি, করিয়া থাকিবেন	করিবে, করিও, করিবি, করিস্, করিবেন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
উত্তমপুরুষ	একবচন	করিব	করিতে থাকিব	করিয়া থাকিব	করিব
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

কর্ ধাতু (চলিত)

বর্তমান কাল :

		সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	অনুজ্ঞা
প্রথমপুরুষ	একবচন	করে, করেন	করছে, করছেন	করেছে, করেছেন	করুক, করুন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মধ্যমপুরুষ	একবচন	কর, করিস্, করেন	করছ, করছিস্, করছেন	করেছ, করেছিস্, করেছেন	কর, কর্, করুন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
উত্তমপুরুষ	একবচন	করি	করছি	করেছি	করি
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অতীত কাল ঃ

		সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	নিত্যবৃত্ত
প্রথমপুরুষ	একবচন	করল, করলেন	করছিল, করছিলেন	করেছিল, করেছিলেন	করতে, করতেন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মধ্যমপুরুষ	একবচন	করলে, করলি, করলেন	করছিলে, করছিলি, করছিলেন	করেছিলে, করেছিলি, করেছিলেন	করতে, করতিস্, করতেন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
উত্তমপুরুষ	একবচন	করলাম, করলেম, করলুম	করছিলাম, করছিলেম, করছিলুম	করেছিলাম, করেছি-লেম, করেছিলুম	করতাম করতেম, করতুম
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

ভবিষ্যৎ কাল ঃ

		সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	অনুজ্ঞা
প্রথমপুরুষ	একবচন	করবে, করবেন	করতে থাকবে, করতে থাকবেন	ক'রে থাকবে, ক'রে থাকবেন	করবে, করবেন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মধ্যমপুরুষ	একবচন	করবে, করবি, করবেন	করতে থাকবে, করতে থাকবি, করতে থাকবেন	ক'রে থাকবে, ক'রে থাকবি, ক'রে থাকবেন	করবে, ক'রো, করবি, করিস্, করবেন
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
উত্তমপুরুষ	একবচন	করব	করতে থাকব	ক'রে থাকব	করব
	বহুবচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

ধাতুর স্বরধ্বনি—আ

[১] খা ধাতু (সাধু)

বর্তমান

সামান্য ঃ খায়, খান, খাও, খাস্, খাই

ঘটমান ঃ খাইতেছে, খাইতেছেন, খাইতেছ, খাইতেছিস্, খাইতেছি

পুরাঘটিত ঃ খাইয়াছে, খাইয়াছেন, খাইয়াছ, খাইয়াছিস্, খাইয়াছি,

অনুজ্ঞা ঃ খাক, খান, খাও, খা, খাই

অতীত

সামান্য ঃ খাইল, খাইলেন, খাইলে, খাইলি, খাইলাম

ঘটমান ঃ খাইতেছিল, খাইতেছিলেন, খাইতেছিলে, খাইতেছিলি, খাইতেছিলাম

পুরাঘটিত ঃ খাইয়াছিল, খাইয়াছিলেন খাইয়াছিলে, খাইয়াছিলি, খাইয়াছিলাম

অনুজ্ঞা ঃ খাইত, খাইতেন, খাইতে, খাইতিস্, খাইতাম

ভবিষ্যৎ

সামান্য ঃ খাইবে, খাইবেন, খাইবে, খাইবি, খাইব

ঘটমান ঃ খাইতে থাকিবে, খাইতে থাকিবেন, খাইয়া থাকিবে, খাইতে থাকিবি, খাইতে থাকিবি

পুরাঘটিত ঃ খাইয়া থাকিবে, খাইয়া থাকিবেন, খাইতে থাকিবে, খাইয়া থাকিবি, খাইয়া থাকিব

অনুজ্ঞা ঃ খাইবে, খাইবেন, খাইও, খাইবি, খাইব

[১ক] খা ধাতু (চলিত)

বর্তমান

সামান্য ঃ খায়, খান, খাও, খাস্, খাই

ঘটমান ঃ খাচ্ছে, খাচ্ছেন, খাচ্ছ, , খাচ্ছিস্, খাচ্ছি

পুরাঘটিত ঃ খেয়েছে, খেয়েছেন, খেয়েছ, খেয়েছিস্, খেয়েছি

অনুজ্ঞা ঃ খাক, খান, খাও, খা, খাই

অতীত

সামান্য ঃ খেল, খেলেন, খেলে, খেলি, খেলাম, খেলেম, খেলুম।

ঘটমান ঃ খাচ্ছিল, খাচ্ছিলেন, খাচ্ছিলে, খাচ্ছিলি, খাচ্ছিলাম, খাচ্ছিলেম, খাচ্ছিলুম,

পুরাঘটিত ঃ খেয়েছিল, খেয়েছিলেন, খেয়েছিলি, খেয়েছিলি, খেয়েছিলাম, খেয়েছিলেম, খেয়েছিলুম

অনুজ্ঞা ঃ খেত, খেতেন, খেতে, খেতিস্, খেতাম, খেতেম, খেতুম

ভবিষ্যৎ

সামান্য ঃ খাবি, খাবেন, খাবে, খাবি, খাব

ঘটমান ঃ খেতে থাকবে, খেতে থাকবেন, খেতে থাকবি, খেতে থাকব

পুরাঘটিত ঃ খেয়ে থাকবে, খেয়ে থাকবেন, খেয়ে থাকবি, খেয়ে থাকব

অনুজ্ঞা ঃ খাবে, খাবেন, খাবে, খেয়ো, খাবি, খাস্, খাব

অনুরূপ ধাতু ঃ যা, পা, গা (<গাহ্), চা (<চাহ) ইত্যাদি।

ধাতুর স্বরধ্বনি—এ

[২] দেখ্ ধাতু (সাধু)

বর্তমান

সামান্য ঃ দেখে, দেখেন, দেখ, দেখিস্, দেখি

ঘটমান ঃ দেখিতেছে, দেখিতেছেন, দেখিতেছ, দেখিতেছিস্, দেখিতেছি

পুরাঘটিত ঃ দেখিয়াছে, দেখিয়াছেন, দেখিয়াছ, দেখিয়াছিস্, দেখিয়াছি

অনুজ্ঞা ঃ দেখুক, দেখুন, দেখ, দেখ্ (গ্যাখ্), দেখি

অতীত

সামান্য ঃ দেখিল, দেখিলেন, দেখিলে, দেখিলি, দেখিলাম

ঘটমান ঃ দেখিতেছিল, দেখিতেছিলেন, দেখিতেছিলে, দেখিতেছিলি, দেখিতেছিলাম

পুরাঘটিত ঃ দেখিয়াছিল, দেখিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলে, দেখিয়াছিলি, দেখিয়াছিলাম

অনুজ্ঞা ঃ দেখিত, দেখিতেন, দেখিতে, দেখিতিস্, দেখিতাম

ভবিষ্যৎ

সামান্য ঃ দেখিবে, দেখিবেন, দেখিবে, দেখিবি, দেখিব

ঘটমান ঃ দেখিতে থাকিবি, দেখিতে থাকিবেন, দেখিতে থাকিবে, দেখিতে থাকিবি, দেখিতে থাকিব

পুরাঘটিত ঃ দেখিয়া থাকিবে, দেখিয়া থাকিবেন, দেখিয়া থাকিবে, দেখিয়া থাকিবি, দেখিয়া থাকিব

অনুজ্ঞা ঃ দেখিবে, দেখিবেন, দেখিবে, দেখিও, দেখিবি, দেখিস্, দেখিব

[২ক] দেখ্ ধাতু (চলিত)

বর্তমান

সামান্য : দেখে, দেখেন, দেখ, দেখিস্, দেখি

ঘটমান : দেখছে, দেখেছেন, দেখছ, দেখছিস্, দেখছি

পুরাঘটিত : দেখেছে, দেখেছেন, দেখেছ, দেখছিস্, দেখেছি

অনুজ্ঞা : দেখুক, দেখুন, দেখ, দেখ্ (দ্যাখ্), দেখি

অতীত

সামান্য : দেখল, দেখলেন, দেখলে, দেখলি, দেখলাম, দেখলেম, দেখলুম

ঘটমান : দেখছিল, দেখছিলেন, দেখছিলে, দেখছিলি, দেখছিলাম, দেখছিলেম, দেখছিলুম

পুরাঘটিত : দেখেছিল, দেখেছিলেন, দেখেছিলে, দেখেছিলি, দেখেছিলাম, দেখেছিলেম, দেখেছিলুম

অনুজ্ঞা : দেখত, দেখতেন, দেখতে, দেখতিস, দেখতাম-তেম-তুম

ভবিষ্যৎ

সামান্য : দেখবে, দেখবেন, দেখবে, দেখবি, দেখব

ঘটমান : দেখতে থাকবে, দেখতে থাকবেন, দেখতে থাকব, দেখতে থাকবি

পুরাঘটিত : দেখে থাকবে, দেখে থাকবেন, দেখে থাকব, দেখে থাকবি

অনুজ্ঞা : দেখবে, দেখবেন, দেখবে, দেখো, দেখবি, দেখিস্, দেখব।

অনুরূপ ধাতু : বের্, মেল্, খেল্, ফেল্, বেড়্, ঠেল্ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। ব্যাকরণে 'কাল' বলিতে কি বুঝায়? বাঙলা বিভিন্ন কালের নাম লিখ এবং উহাদের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। (ঢা. বি. মাধ্যমিক ১৯৫৭)

২। উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখ : (ক) বর্তমান অনুজ্ঞা, (খ) নিত্যবৃত্ত অতীত, (গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (উঃ মাঃ ১৯৬০), (ঘ) ঘটমান অতীত (উঃ মাঃ ১৯৬২)।

৩। 'আমি এই কথা 'বলিয়া থাকিব'; 'তাহার চিঠি সময় মত পাইলে আমি 'যাইতাম'—এই দুইটি বাক্যে ক্রিয়ার কাল নির্ণয় কর। (ক. বি. ১৯৫০)

৪। ঐতিহাসিক বর্তমান, ঘটমান বর্তমান ও পুরাঘটিত বর্তমানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও। (ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) ১৯৫০)

দশম অধ্যায়

সমাস

পরস্পরের সহিত অর্থের সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তাহার বেশী পদকে একপদে পরিণত করাকেই বলা হয় **সমাস**। যেমন—

"**ধুলিপতিত** (ধূলি + পতিত) দুর্বল চিত করহ জাগরূক।" (রবীন্দ্রনাথ)

"**কান্নাহাসির**" (কান্না + হাসি) **দোল-দোলানো** (দোল + দোলানো) **পৌষ-ফাগুনের** (পৌষ + ফাগুন) পালা।" (রবীন্দ্রনাথ)।

"**কুয়াশাচ্ছন্ন** (কুয়াশা + আচ্ছন্ন) **তিমিরলিপ্ত** (তিমির + লিপ্ত) রাত্রে **তীরতট** (তীর + তট) কিছু দেখা যায় না"। (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

আগের পদকে বলা হয় পূর্বপদ এবং পরের পদকে বলা হয় পরপদ বা উত্তরপদ। সমাস-ভেদে কোথাও বা পূর্বপদের প্রাধান্য হয়, কোথাও বা পরপদের প্রাধান্য হয়, কোথাও বা উভয় পদেরই প্রাধান্য হয়, কোথাও বা উভয় পদেরই বাহিরে অন্য পদের প্রাধান্য হয়; আবার কোথাও বা অব্যয়পদ সমাসে আসিয়া জুড়িয়া বসে। সমাসনিষ্পন্ন পদ বাক্য এবং ভাষার প্রগতি মাধুর্য, গাম্ভীর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সমাসনিষ্পন্ন পদকে **সমাসনিষ্পন্ন পদ** বা **সমস্ত পদ** বলে এবং যে যে পদে সমাস হয় সেই সকল পদকে বলা হয় **সমস্যমান পদ**।

সমস্তপদকে যখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হয় যে কি করিয়া সমাসে পরিণত হইল, তখন সেই বিশ্লেষণ-বাক্যকে বলা হয় **ব্যাসবাক্য**। ব্যাসবাক্যকে কেহ কেহ **বিগ্রহ-বাক্য** বা **সমাসবাক্যও** বলিয়া থাকেন। যেমন—বিদ্যা ও বুদ্ধি = বিদ্যাবুদ্ধি; এখানে বিদ্যাবুদ্ধি—সমস্তপদ, বিদ্যা ও বুদ্ধি—ব্যাসবাক্য এবং বিদ্যা, বুদ্ধি—সমস্যমান পদ।

হয় একসঙ্গে, না-হয় হাইফেন, দ্বারা, সমাসবদ্ধ পদ লিখিতে হয়। যেমন—কান্নাহাসি বা কান্না-হাসি। যেখানে সন্ধির প্রয়োজন থাকে, সেখানে সন্ধি করাই সমীচীন। যেমন—কুয়াশাচ্ছন্ন। এখানে, কুয়াশা-আচ্ছন্ন লেখা অসঙ্গত। আধুনিক বাঙলায় সাধারণতঃ দীর্ঘ-সমাস ব্যবহৃত হয় না, হওয়া উচিতও নহে। তবে, কবিতার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। কারণ, সেখানে ছন্দ ও শব্দ সৌকর্যের জন্য অনেক সময় দীর্ঘ-সমাস ব্যবহার করিতে হয়। যেমন—'**জনগণমন-অধিনায়ক** জয় হে **ভারতভাগ্যবিধাতা**', '**সবার-পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে**'; **জীবন-উদ্যানে** তোর **যৌবনকুসুমভাতি** '**অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল, শুভ্র-তুষার- কিরীটিনী**' প্রভৃতি।

সমাস মূলতঃ চারি প্রকার। যথা—(১) দ্বন্দ্ব, (২) তৎপুরুষ, (৩) অব্যয়ীভাব ও (৪) **বহুব্রীহি। কর্মধারয় ও দ্বিগু** তৎপুরুষের অন্তর্গত।

(১) দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে দুই বা ততোধিক বিশেষ্যপদ মিলিয়া একপদ হয় এবং প্রত্যেক পদেরই অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়* তাহাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলে।

ও, এবং, আর প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে এই সমাসের ব্যাসবাক্য গঠিত হয়। যেমন—রাম ও লক্ষ্মণ=রামলক্ষ্মণ, কুকুর এবং বিড়াল=কুকুরবিড়াল, দুধ আর কলা=দুধকলা, ভীম ও অর্জুন=ভীমার্জুন ইত্যাদি।

এইরূপ—ইহকালপরকাল, সুখদুঃখ, মাতাপিতা, সুখশান্তি, হরপার্বতী, শীতবসন্ত, অগ্রপশ্চাৎ, কায়মনোবাক্য, ববধূ, পাপপুণ্য, বিকিকিনি, যুবকযুবতী, বাচবিচার, শাঁখাসিন্দুর, রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ ইত্যাদি।

চলিত ভাষার উদাহরণ: লাভলোকসান, হাতিঘোড়া, উকীলব্যারিস্টার, কেনাবেচা, মামাভাগ্নে, মশামাছি, মেয়েজামাই ইত্যাদি।

প্রয়োগ: ১। 'তুমি নিজে **ভালমন্দ**ও বোঝ না'? (শরৎচন্দ্র)

২। 'এ রান্না **ভূতপ্রেতে** খেতে পারে না।' (বঙ্কিমচন্দ্র)

সমাহার দ্বন্দ্ব: কোন কোন দ্বন্দ্ব সমাস পূর্বপদ ও পরপদের প্রাধান্য না হইয়া তাহার সমষ্টিগত অর্থ প্রকাশ করে। সেগুলিকে বলা হয় **সমাহার দ্বন্দ্ব**। যেমন—ডাল ও ভাত=ডালভাত (সামান্য খাদ্য অর্থে), ডাল ও রুটি=ডালরুটি (খাদ্য অর্থে), উনিশ ও বিশ=উনিশবিশ (আন্দাজ বা পার্থক্য অর্থে) ইত্যাদি।

সংস্কৃত 'ঋ'-কারান্ত পদ বাঙ্‌লা দ্বন্দ্বসমাসে 'ঋ' স্থানে 'আ' হয়। যেমন—মাতা সংস্কৃতে 'মাতৃ' শব্দ হইতে উৎপন্ন। অতএব পিতার সহিত তাহার সমাস হওয়া উচিত 'মাতৃ পিতা'। কিন্তু তাহা না হইয়া 'মাতাপিতা' হয়।

অর্থের সম্প্রসারণ করিবার জন্য সমজাতীয় বা সমার্থক পদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস হয় যেমন—রাজা-বাদশা, ডাক্তার-বৈদ্য, চালাক-চতুর, বনে-জঙ্গলে, চিঠিপত্র ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের যে ব্যাসবাক্য গঠিত হয় তাহাতে ইহাদের সম্বন্ধপদের যে বিশিষ্ট অর্থ আছে তাহা প্রকাশিত হয় না। যেমন—রাজা ও বাদশা=রাজা-বাদশা। বাক্যে আমরা যদি উক্ত সমাসের এইরূপ প্রয়োগ করি 'ওদের সঙ্গে তুলনা করো না ওরা **রাজা-বাদশা** লোক'; এখানে রাজা-বাদশা ধনী অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহারা যুগপৎ রাজা অথবা বাদশা নহে। এই সকল সমাসে সমজাতীয় পরপদ যোগে উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য লাভ করিয়া অর্থ আরও সম্প্রসারিত হয়।

* দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলির প্রত্যেকটি প্রথমান্ত হয়।

দ্বন্দ্ব সমাসের মাধ্যমে অর্থ সম্প্রসারিত করিবার জন্য অনেক সময় **শব্দদ্বৈত প্রয়োগ** দেখা যায়। সাধারণতঃ পূর্বপদের সহিত পরপদে একটি পরাধীন শব্দের দ্বারা **অনুপ্রাস** করিয়া এই সমাসগুলি গঠিত হয়। যেমন—চাকর-বাকর, হাঁড়ী-কুঁড়ী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, ওষুধ-বিষুধ, ঘর-টর ইত্যাদি। 'বাকর' একটি পরাধীন শব্দ, কেন না স্বতন্ত্রভাবে উহার কোন অর্থ নাই। চাকরের সহিত যুক্ত হইলে তবেই ইহার অর্থ প্রকাশিত হইল। যেমন—'চাকর-বাকররা সব গেল কোথায়!' 'এইসব শিশি কৌটা **ওষুধ-বিষুধ**' ইত্যাদি। (রবীন্দ্রনাথ)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** দুইটি বিশেষণ একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয় না, উহা তখন কর্মধারয় সমাস হয়। যথা— চালাকচতুর, কাঁচামিঠে, অম্লমধুর, সতীসাধ্বী, সাদা-সিদা, ওতপ্রোত, মিঠেকড়া ইত্যাদি।]

অলুক্ দ্বন্দ্ব ঃ যে দ্বন্দ্ব সমাসের বিভক্তিযুক্ত পদের লুপ্ত হয় না তাহাকে **অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন—হাটে-মাঠে, দক্ষিণে-বামে, মায়ে-ঝিয়ে, বুকে-পিঠে, পথে-প্রবাসে, পিতারে-মাতারে, আলয়ে-কুলায়ে, ঝোপে-ঝাড়ে ইত্যাদি।

প্রয়োগ

১। '**দক্ষিণে-বামে** পিছনে সম্মুখে লাগিল পাওা যত'। (রবীন্দ্রনাথ)

২। 'ডেকে আনে **পিতারে মাতারে**'। (রবীন্দ্রনাথ)

৩। '**মায়ে-ঝিয়ে**' করব ঝগড়া জামাই বলে মানব না'। (রামপ্রসাদ)

(২) তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসের পূর্বপদের **দ্বিতীয়া** বিভক্তির লোপ হয় এবং প্রায়ই **পরপদের অর্থ** প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলে।

পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার। যথা—দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ, তৃতীয়া-তৎপুরুষ, চতুর্থী-তৎপুরুষ, পঞ্চমী-তৎপুরুষ, ষষ্ঠী-তৎপুরুষ, সপ্তমী-তৎপুরুষ।

ইহা ছাড়া উপপদ-তৎপুরুষ, নঞ্-তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসগুলিও তৎপুরুষের অন্তর্গত।

দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ

পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থপ্রাধান্য হইলে **দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ সমাস** হয়। যেমন—চরণকে আশ্রিত = চরণাশ্রিত।

এইরূপ—**বিপদাপন্ন, শরণাগত, রথদেখা, কলাবেচা, পকেটমারা, ভাতরাঁধা, বাসন-মাজা, কাপড়কাচা, জলতোলা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তরীবাওয়া, বিস্ময়াপন্ন, গঙ্গাপ্রাপ্তি, বধূবরণ,** সংখ্যাতীত, **ঘনসন্নিবিষ্ট,** মতিচ্ছন্ন ইত্যাদি।

(১) ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত **দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয়।** যথা—চিরকাল ব্যাপিয়া সুখ=চিরসুখ, চিরদিন শত্রু=চিরশত্রু, ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী=ক্ষণস্থায়ী ইত্যাদি।

(২) গত, আশ্রিত, অতীত, প্রাপ্ত, আপন্ন প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ **সমাস হয়।** যথা—ব্যক্তিকে গত=ব্যক্তিগত, চরণকে আশ্রিত=চরণাশ্রিত, স্মরণকে অতীত=স্মরণাতীত ইত্যাদি।

প্রয়োগ : ১। **শরণাপন্নকে** সর্বতোভাবে রক্ষা করিবে।
২। '**চিরস্থির** করে নীর, হায়রে জীবন-নদে'। (মাইকেল)
৩। 'কূলে কূলে কানন লক্ষ্মী দিল **আঁচলনাড়া**'। (রবীন্দ্রনাথ)

তৃতীয়া-তৎপুরুষ

পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে **তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন—মধুদ্বারা মাখা=মধুমাখা, প্রেমে ঘন=প্রেমঘন, শোকের দ্বারা আকুলা=শোকাকুলা ইত্যাদি।

ঊনার্থক ও যুক্তার্থক শব্দের সহিত তৃতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। (ঊনার্থ) যথা—বিদ্যাদ্বারা হীন=বিদ্যাহীন, শ্রীদ্বারা হীন=শ্রীহীন, বজ্রদ্বারা আহত=বজ্রাহত, সর্পকর্তৃক দষ্ট=সর্পদষ্ট (যুক্তার্থ), শ্রীদ্বারা যুক্ত=শ্রীযুক্ত ইত্যাদি।

এইরূপ—স্নেহাতুর, বাগদত্তা, যন্ত্রচালিত, নক্ষত্রখচিত, ঈশ্বরসৃষ্ট, বরাহূত, কীটদষ্ট, মধুময়, শ্রমলব্ধ, লক্ষ্মীছাড়া, মধুমাখা, ভারাক্রান্ত ইত্যাদি।

চলিত ভাষার উদাহরণ : মনগড়া, দাকাটা, কিস্তিবন্দী, ঢেঁকিছাটা, চোখইশারা, যাঁতাভাঙ্গা, লোহাপিটা, কুমড়োবোঝাই, শিউলি-ছোপান ইত্যাদি।

প্রয়োগ :
১। 'ভরতের চিত্ত **ভারাক্রান্ত**, মুখখানি **শ্রীহীন**।' (দীনেশ সেন)
২। 'একাকিনী **শোকাকুলা** অশোক-কাননে' (মধুসূদন)
৩। 'এ সংসারে এনে মাগো করলি আমায় **লোহাপেটা**'। (রামপ্রসাদ)

চতুর্থী-তৎপুরুষ

পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে **চতুর্থী-তৎপুরুষ সমাস*** বলে। বাঙলায় কিন্তু চতুর্থী বিভক্তি অত্যন্ত দীন, তাই

* খাঁটি চতুর্থী-তৎপুরুষের উদাহরণ একরূপ নাই বলিলেই চলে।

দ্বিতীয়ার 'কে' বিভক্তি ধার করিয়া সম্প্রদানকারককে কেবলমাত্র দান বুঝাইতে চতুর্থী বিভক্তি আপন কাজ চালাইয়া থাকে। দান ব্যতীত অন্য কাজে সে নাই, এত বড় দাতা সে; অথচ নিজের বিভক্তি ঝুলিশূন্য। কাজেই এই সমাস সংস্কৃতের অনুসরণে বাঙলায় করা সম্ভব নয়। নিমিত্ত, হিত বা সম্প্রদান এইসব অর্থ পাইলেই বাঙলায় তাহাকে আমরা চতুর্থী-তৎপুরুষ সমাস বলি। যেমন—দেবকে দত্ত= দেবদত্ত, কুণ্ডলের নিমিত্ত হিরণ্য=কুণ্ডলহিরণ্য ইত্যাদি।

এইরূপ—লোকহিত, বালিকাবিদ্যালয়, আরোগ্যনিকেতন, পাগ্‌লাগারদ, শিবমন্দির, অনাথআশ্রম, মালঘর, বিয়েপাগ্‌লা, স্মৃতিমন্দির, রান্নাঘর ইত্যাদি।

প্রয়োগ :

১। জনহিতব্রতে **আত্মনিয়োগ** করিবে।

২। 'দেখতুম ও বাড়ির **নাচঘর** আলোয় আলোময়।' (রবীন্দ্রনাথ)

পঞ্চমী-তৎপুরুষ

পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে **পঞ্চমী-তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন—পাঠশালা হইতে পলায়ন=পাঠশালাপলায়ন, শহর হইতে ফেরতা=শহরফেরতা ইত্যাদি।

এইরূপ—ঋণমুক্ত, বিদেশাগত, মৃত্যুভয়, ব্যাঘ্রভয়, দূরাগত, মেঘমুক্ত, হাতছাড়া, স্বর্গভ্রষ্ট, দলছাড়া, বৃন্তচ্যুত, বন্ধনমুক্ত, শাপমুক্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট, দুগ্ধজাত ইত্যাদি।

প্রয়োগ : ১। 'আমি **স্কুল-পালানো** ছেলে।' (রবীন্দ্রনাথ)

২। 'সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর **পাঠশালা-পলায়ন**।' (রবীন্দ্রনাথ)

৩। 'আমরা **বিলাত-ফেরতা ক'** ভাই।' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

ষষ্ঠী-তৎপুরুষ

পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহার নাম **ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস**। যেমন—বিশ্বের ভারতী=বিশ্ব-ভারতী ইত্যাদি।

এইরূপ—গণতন্ত্র, গঙ্গাতীর, স্বর্ণভাণ্ডার রাজকন্যা, লঙ্কেশ্বর, ধানক্ষেত, বনফুল, মৌচাক, ভাই-ঝি, অতিথিসেবা, ভোটাধিকার, দূতাবাস প্রজাতন্ত্র, একনায়কত্ব, যুবসংঘ, সমসাময়িক, কবিগুরু, রাজসভা, রাজপথ ইত্যাদি।

চলিত ভাষার উদাহরণ : ছবিঘর, শহরতলী, রাজ্যপাল, আইনসচিব, শিক্ষামন্ত্রী, পৌরসভা, রাজপুরী, ডালিমগাছ ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ ১। '**গঙ্গাতীরের** মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে।' (রবীন্দ্রনাথ)
২। 'ক্ষণিকের তরে আলস্য ভুলি' 'চলো **রাজসভা** মাঝে।' (রবীন্দ্রনাথ)

সপ্তমী তৎপুরুষ

পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্য হইলে **সপ্তমী-তৎপুরুষ সমাস** হয়। যেমন—কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ=কবিশ্রেষ্ঠ ; পুরুষদের মধ্যে উত্তম=পুরুষোত্তম, শিরে ধার্য=শিরোধার্য ইত্যাদি।

এইরূপ—রণনিপুণ, বাটাভরা, আকাশপ্রদীপ, শাখামূল, শ্রীঘরবাস, নিদ্রাগমন, জলমগ্ন, সাহিত্যানুরাগ, পরিহাসপটু, নরাধম ইত্যাদি।

চলিত ভাষার উদাহরণ ঃ গাছপাকা, সংখ্যালঘু, সত্যাগ্রহ, পুঁথিগত, ঘরপাতা, রাতকানা, গালভরা, বাক্সবন্দী, তালকানা, পাড়াবেড়ানী,বস্তাপচা ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ

১। 'ধরাতলে **নরাধম** খল আছে যত।' (ঈশ্বর গুপ্ত)
২। 'শিক্ষাকে **জীবনযাত্রার** সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত।' (রবীন্দ্রনাথ)
৩। 'করেছিলে তুমি **রণপণ্ডিত** চাণক্য-সম পণ।' (করুণানিধান)

অলুক্-তৎপুরুষ

যে তৎপুরুষ সমাসের কোন কোন স্থলে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ (লুক্) হয় না, তাহাকে **অলুক্-তৎপুরুষ সমাস** বলে। যথা—যুধি (যুদ্ধে) স্থির=যুধিষ্ঠির। কোন কোন স্থলে বিকল্পে অলুক্ সমাস হয়। যেমন—ঘিয়ে (দ্বারা) ভাজা, ঘিভাজা, সরসিজ, সরোজ, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র ইত্যাদি।

এইরূপ—পায়েচলা, কানেকালা, চিনিরবলদ, ঘোড়ারডিম, আগের-মা, গায়ে-পড়া, আলুরচপ, কলেজেপড়া, চোখেরবালি, জলেভাসা (সাবান), অন্তেস্থিত ইত্যাদি।

[**দ্রষ্টব্য ঃ** অলুক্ সমাস কোন স্বতন্ত্র সমাস নহে। যে কোন শ্রেণীর সমাস অলুক্ হইতে পারে]।

প্রয়োগ ঃ

১। 'শুধু **পেটের ভাত** পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়।' (রবীন্দ্রনাথ)
২। '**বাহিরে সরল বাঁশী অন্তরে গরল**'। (চণ্ডীদাস)
৩। 'পাঁচ বছরের **ভ্রাতুষ্পুত্র** তখনও কাঠিগুলা ধরিয়া বসিয়াছিল' (শরৎচন্দ্র)
৪ 'কুমোরপাড়ায় **গোরুর-গাড়ি**, বোঝাই করা কলসী হাঁড়ি।' (রবীন্দ্রনাথ)

উপপদ-তৎপুরুষ

কৃদন্ত পদের সহিত উপপদের* যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে **উপপদ-তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন—জলে চরে যে=জলচর (জল—চর্+ট); দিবা করে যে দিবাকর; এখানে দিবা উপপদ; তাহার সহিত কৃদন্ত পদ অর্থাৎ কৃ (ধাতু)+অ (খট্)—কৃৎপ্রত্যয়=কর সমাস হইয়া দিবাকর হইয়াছে।

এইরূপ—চিত্রকর, মালাকার, প্রভাকর, বাস্তহারা, দুঃখজীবীরা, কুম্ভকার, কর্মকার, চর্মকার, ভাস্কর, অসূর্যম্পশ্যা, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ ইত্যাদি।

চলতি ভাষার উদাহরণ ঃ পকেটমার, ছেলেধরা, নবেলপড়া, সিনেমা-দেখা, গাঁটকাটা, ননীচোরা, ঘুমপাড়ানি, [illegible]চোরা, সর্বহারা, মুখপোড়া, ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ

১। মনে করিল, 'দেবী বুঝি **হরবোল**।' (বঙ্কিমচন্দ্র)

২। '...স্বচ্ছ সরোবরে করে কেলি রাজহংস, **পঙ্কজ** কাননে।' (মধুসূদন)

৩। '**নবেল-পড়া** রুচি, **সিনেমা-দেখা** চোখ।' (রবীন্দ্রনাথ)

নঞ্-তৎপুরুষ

যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে আদিতে নঞ্ (না, নাই, নয়) এই নিষেধার্থক অব্যয় থাকে, তাহাকে **নঞ্-তৎপুরুষ সমাস** বলে। এই সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে নঞ্ স্থলে 'অন্' এবং ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে নঞ্ স্থলে 'অ' হয়। যেমন—ন বিচার=অবিচার, ন অশন=অনশন ইত্যাদি।

খাঁটি বাঙলায় নঞ্ স্থলে আ, বে, গর, না, নি ইত্যাদি শব্দযোগে এই সমাস হয়। যেমন—ন সিদ্ধ=আসিদ্ধ। এইরূপ—আকাল, আলতো, আভাঙ্গা; ন মিল=বেমিল, বেহিসেব, বেপরোয়া; ন হাজির=গরহাজির ইত্যাদি।

এইরূপ—গরমিল, গররাজী, ন রাজী=নারাজ, নিঃসম্বল, নাতিশীতোষ্ণ, অসাম্য, অকিঞ্চিৎকর, অসহযোগ, অনাচার, না-মঞ্জুর, অসীম ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ

১। 'গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে **না-জানা** মাঠের গাছতলায়।' (রবীন্দ্রনাথ)

২। '**না-বলা** কথার আভাসের মত নীলাম্বরের প্রান্ত।' (রবীন্দ্রনাথ)

৩। 'মঙ্গল করো **নিরলস** নিঃসংশয় করো হে'? (রবীন্দ্রনাথ)

---

* যে সকল পদের পরবর্তী ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হয় তাহার নাম উপপদ। যথা—জলে চরে যে এই অর্থে জল পদের পরস্থিত 'চর' ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় করিয়া জলচর শব্দ হইয়াছে। এস্থলে 'জল' উপপদ এবং 'চর' কৃদন্তপদ।

কর্মধারয় সমাস

বিশেষণপদের সহিত বিশেষ্যপদের সমাস হইয়া যদি বিশেষ্যের অর্থটি প্রধান প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সেই সমাসকে **কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন—সুন্দর যে পুরুষ = সুপুরুষ, সৎ যে লোক = সৎলোক ইত্যাদি।

কখনো কখনো দুই বিশেষ্যপদের মধ্যেও কর্মধারয় সমাস হয়; তবে সেখানে একপদ অপর পদের বিশেষণরূপেই কাজ করে। দুই বিশেষণপদের মধ্যেও কর্মধারয় সমাস হয়। কর্মধারয় সমাসে উভয় পদে বিভক্তিরূপ একই হয়। অধিকাংশ কর্মধারয় সমাসেই পূর্ব-পদটি বিশেষণ হয়।

আগে পরে বুঝাইতে পৌর্বাপর্য বুঝাইতে বা সমকালীনতা বুঝাইতে দুই বিশেষণপদের মধ্যেও কর্মধারয় সমাস হইতে পারে। যথা—'আধখোলা' চোখ 'আধফোটা ফুল পায়া' (সতেন্দ্রনাথ)

কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্য করিবার সময় 'যে' 'অথচ' 'ই' প্রভৃতি শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া হইল:

পূর্বপদ বিশেষণ—নীল এমন যে উৎপল = নীলোৎপল; এখানে নীল বিশেষণ উৎপল বিশেষ্য। এইরূপ, মহান্ যে জন = মহাজন ইত্যাদি।

চলিতভাষার উদাহরণ: কাঁচকলা, নীলশাড়ী, হরিণচোখ, রক্তাশোক, ডুরেশাড়ী, মহামানব, মহর্ষি, পাকাগিন্নী, শুভবিবাহ, কড়াপাক, লালফুল, নির্জনআকাশ, সাদাশাঁখা, বাঁকাচাঁদ, ধানীশাড়ী, নীলসন্ধ্যা, কালসাপ, আধাইংরাজ, ইত্যাদি।

প্রয়োগ:

১। 'চলে **নীলশাড়ী** নিঙাড়ি নিঙাড়ি।' (চণ্ডীদাস)

২। 'দেখেছি তার **কালো হরিণচোখ**।' (রবীন্দ্রনাথ)

৩। '**সাদা-শাখা** ধূসর বাতাসে শঙ্খের মত কাঁদে।' (জীবনানন্দ)

৪। 'কমলার পাশে বসেছে একজন **আধা-ইংরাজ**'। (রবীন্দ্রনাথ)

কর্মধারয় সমাস নিম্নলিখিত তিন প্রকার হইতে পারে:

(১) **পরপদ বিশেষণ**—কতকগুলি দিন = দিনকতক। দিন বিশেষ্যপদ এবং কতক বিশেষণ। এইরূপ—ঘনশ্যাম, মৃতহিম, বিঘেদুই, রাতনীল, আলুভাজা ইত্যাদি।

প্রয়োগ: ১। শুধু **বিঘে দুই** ছিল মোর ভুঁই' (রবীন্দ্রনাথ)

(২) **বিশেষ্যে বিশেষ্যে**—পণ্ডিত যে লোক = পণ্ডিতলোক। এইরূপ—ছেলে-মানুষ, ডাক্তারসাহেব, বাবুমশাই, জামাইবাবু, সর্দারপড়ো, ঠাকুরদাদা, চাঁপাফুল ভারততীর্থ, গঙ্গানদী, ধানসিঁড়ি ইত্যাদি।

প্রয়োগ : ১। **সর্দার পড়ো** ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে।' (রবীন্দ্রনাথ)
২। 'আবার আসিব ফিরে **ধান সিঁড়িটির** তীরে'। (জীবনানন্দ)

(৩) **বিশেষণে**—নীল যে নির্জন = নীলনির্জন। এস্থানে উভয় পদই বিশেষণ। এইরূপ—কান্তকোমল, কাঁচামিঠে মিঠেকড়া, সুপ্তোত্থিত (আগে সুপ্ত পরে উত্থিত), ধোয়ামোছা, শান্তশিষ্ট, পরমাসুন্দরী, অতিভাল, নরমব্যাকুল, পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

প্রয়োগ : ১। 'তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে **নরম-ব্যাকুল**।' (জীবনানন্দ)
২। '**কানাকড়ি** হ'য়ে বেঁচে আছি' (কালিদাস রায়)'।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদের লোপ হয়, তাহাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন—সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, হস্ত দ্বারা চালিত শিল্প = হস্তশিল্প, প্রীতি-উপলক্ষে ভোজ = প্রীতিভোজ ইত্যাদি।

এইরূপ—পলান্ন, হাতপাখা, ঘরজামাই, আলোকচিত্র, ছায়াতরু, আত্মজীবনী, পাল্কীগাড়ী, বরযাত্রী, সমাধিমন্দির ইত্যাদি।

প্রয়োগ : ১। 'তব **সিংহাসনের** আসন হ'তে এলে তুমি নেমে।' (রবীন্দ্রনাথ)
২। 'ইচ্ছা ছিল **বরণমালা** পরাই তোমার গলে।' (রবীন্দ্রনাথ)

উপমান কর্মধারয়

যাহার সহিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা করা হয়, তাহাকে বলা হয়, **উপমান** এবং যাহার বর্ণনা করিতে তুলনার আশ্রয় লইতে হয়, তাহাকে বলা হয় **উপমেয়** বা **উপমিত**। যেমন—মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র। এখানে চন্দ্র উপমান এবং মুখ উপমেয়।

তুলনা চলিতে পারে এইরকম কতকগুলি সাধারণ-সাদৃশ্য উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে থাকে। এই সাদৃশ্য বাক্যে বিশেষণগুলিকে বলা হয় **সাধারণ ধর্ম**।

যে সমাসে উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম থাকে ও সেই সাধারণ ধর্ম-বাচক শব্দের সঙ্গে উপমানপদের সমাস হয়, তাহাকে **উপমমান কর্মধায়র সমাস** বলে। যেমন—তুষারের ন্যায় শীতল = তুষারশীতল। এখানে তুষার উপমান এবং শীতল তাহার একটি সাধারণ ধর্ম। যদি বলা হইত তুষার শীতল-মন; তাহা হইলে মন অর্থাৎ যে মনে তুষারের ন্যায় শীতলতার একটি সাধারণ ধর্ম আছে বুঝাইত। তখন মন হইতে উপমেয়।

এইরূপ—কুসুমকোমল, বজ্রকঠোর, বকধার্মিক, রক্তলাল, বিড়ালতপস্বী, অরুণরাঙা, শশব্যস্ত, দুর্বাদলশ্যাম, তুষারশুভ্র, বজ্রকঠিন, পুষ্পপল্লব, ঘনশ্যাম, ভ্রমরকৃষ্ণ ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ ১। 'মাথায় একমাথা **ভ্রমরকৃষ্ণ** কোঁকড়ান চুল।' (সীতাদেবী)
২। 'মালী তাহাকে **শশব্যস্ত** হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল' (স্বাদেশিকতা)

উপমিত কর্মধারয়

যে সমাসে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না, কেবলমাত্র উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে সমাস হয়, তাহাকে **উপমিত কর্মধারয় সমাস** বলে। উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমিত পদ সমাসের পূর্বাংশে থাকে এবং শ্রেষ্ঠার্থবাচক (সিংহাদি) উপমান পদের সহিত উহার সমাস হয়। সমাসে সাধারণ ধর্মের প্রয়োগ হয় না। যেমন—পুরুষ সিংহের ন্যায় তেজস্বী = পুরুষসিংহ ; ফুলের মত বাতাস = ফুলবাতাস ইত্যাদি।

এইরূপ—পুরুষব্যাঘ্র (আশুতোষ), পাদপদ্ম, পাদপীঠ, করপল্লব, কথামৃত, নয়নকমল, চাঁদবদন, সোনামুখ, অগ্নিদৃষ্টি, নরশার্দূল, বীরকেশরী, অধরপল্লব, ফটিকজল, নয়নবান, কবিকুঞ্জর, বাহুবল্লরী, রাজসিংহ ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ ১। 'সিংহগড়ের দুর্গচূড়ায় **পুরুষসিংহ** উঠিল ত্বরায়।' (যতীন্দ্র বাগচী)
২। 'ধন্য হইল ধরণী তোমার **চরণকমল** করিয়া স্পর্শ।' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

রূপক কর্মধারয়

উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে যখন অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন তাহাকে **রূপক কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন—শোক রূপ অনল = শোকানল।

এইরূপ—আনন্দসাগর, মনমাঝি, জ্ঞানালোক, জীবনপ্রবাহ, জীবননদ, আকাশগাঙ্, সংসার-সমরাঙ্গন, নভআঁখি, স্নেহসুধা, পরাণপাখী, শোকসিন্ধু, সভ্যতানাগিনী, ভবনদী, সুখসাগর, শান্তিবারি ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ ১। '**মনমাঝি** তোর বৈঠা নেরে' (পল্লীকবি)
২। '**আনন্দেরই সাগর** থেকে এসেছে, আজ বান' (রবীন্দ্রনাথ)
৩। 'শঙ্খ-ধবল **আকাশগাঙে** স্বচ্ছমেঘের পাল্‌টি মেলে' (যতীন্দ্রবাগ্‌চী)

দ্বিগু সমাস

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকিলে যদি সমাসবদ্ধ পদে সমাহার (সমষ্টি) অর্থ বুঝায়, তবে তাহাকে **দ্বিগু সমাস** বলে। এই সমাসের ব্যাসবাক্য 'সমাহার' শব্দ দিয়া বিশ্লেষিত হয়। যেমন--পঞ্চ প্রদীপের সমাহার—পঞ্চপ্রদীপ, চারি মাথার সমাহার = চৌমাথা ইত্যাদি।

দ্বিগু সমাসে কোন কোন অ-কারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। যেমন—পঞ্চ বটের সমাহার =পঞ্চবটী, ত্রি-লোকের সমাহার=ত্রিলোকী ইত্যাদি।

এইরূপ—সপ্তাহ, পঞ্চনদ, দশআনী, ত্রিভুবন, নবরত্ন, সাতঘাট, অষ্টবসু, সেতার, তেমাথা, চৌরাস্তা, শতাব্দী, সাতসমুদ্র, তেরনদী ইত্যাদি।

• **প্রয়োগ**ঃ ১। '**সপ্তাহ** পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর' (যতীন্দ্রমোহন)
২। '**পঞ্চ-নদীর** ঘিরি দশ তীর এসেছে সে একদিন' (রবীন্দ্রনাথ)

অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয় এবং পরপদ অব্যয় না হইলেও অব্যয়ভাব ধারণ করে এবং সমস্তপদে অব্যয়টির অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **অব্যয়ীভাব সমাস** বলে।

এই সমাসে অব্যয়পদটি সাদৃশ্য, সামীপ্য, বীপ্সা, যোগ্যতা, অভাব, অনতিক্রম, পর্যন্ত ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যথা—

সাদৃশ্যঃ দ্বীপের সদৃশ=উপদ্বীপ, গুরুর সদৃশ=উপগুরু, বনের সদৃশ=উপবন। এইরূপ—প্রতিমূর্তি, উপনেত্র, উপভাষা ইত্যাদি।

সমীপ্যঃ কূলের সমীপে=উপকূল, গৃহের সমীপে=উপগৃহ। এইরূপ—উপনগরী উপকণ্ঠ, সমক্ষ, উপগিরি ইত্যাদি।

বীপ্সাঃ বছর বছর=প্রতিবছর, ক্ষণে ক্ষণে=প্রতিক্ষণ। এইরূপ—অনুক্ষণ, হররোজ, প্রতিগৃহে, প্রত্যহ, প্রতিজেলায় ইত্যাদি।

যোগ্যতাঃ রূপের যোগ্য=অনুরূপ। এইরূপ—অনুকূল।

অভাবঃ ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ, বন্দোবস্তের অভাব=বেবন্দোবস্ত ইত্যাদি।

অনতিক্রমঃ শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া=যথাশক্তি। এইরূপ—যথাবিধি, যথাসাধ্য, যথারীতি, যথারুচি, যথাজ্ঞান ইত্যাদি।

পর্যন্তঃ মৃত্যু পর্যন্ত=আমৃত্যু, জন্ম অবধি=আজন্ম। এইরূপ—আজীবন, আকৈশোর, আসমুদ্র, আমরণ ইত্যাদি।

অন্যান্য উদাহরণঃ প্রতিদিন, অনুক্ষণ, হররোজ, অনুকূল, বেবন্দোবস্ত, যথাযোগ্য, যথারীতি, আশৈশব, আপাদমস্তক, আবালবৃদ্ধবণিতা, আসমুদ্রহিমাচল ইত্যাদি।

প্রয়োগঃ ১। 'গাছটাকে **প্রতিদিনই** দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো।' (রবীন্দ্রনাথ)
২। 'আকুল ক'রেছে শ্যাম-সমারোহে হৃদয়-সাগর **উপকূল**।' (রবীন্দ্রনাথ)
৩। 'সেই জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো **আসমুদ্রহিমাচল**,
বেরিয়ে পড়লো **আবালবৃদ্ধবণিতা**' (প্রবোধ সান্যাল)

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির কোনটির অর্থ না বুঝাইয়া সমাসনিষ্পন্ন পদটিতে অপর কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রধানরূপে বুঝায়, তাহাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে। যেমন—পীত অম্বর যাহার=পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ); এখানে সমস্যমান পদের পীত এবং অম্বরের কোনই প্রাধান্য নাই ; পরন্তু পীত অম্বর পরিধান করে এমন কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতে ঐ সমস্যমান পদসমূহের আয়োজন। এইভাবে পূর্বপদ ও পরপদ এই উভয়পদেরই প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া অন্য অর্থবাচক পদের সমাস গঠিত হয়। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ববর্তী 'মহৎ' শব্দস্থানে 'মহা' আদেশ হয় এবং 'সহ' শব্দ স্থানে বিকল্পে 'স' হয়। বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন পদ সাধারণতঃ বিশেষণ হয়। এই সমাসের ব্যাসবাক্যে 'যে', 'যাহারা', 'যাহাকে', 'যাহাতে' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

বহুব্রীহি সমাসকে আট শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—(১) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, (২) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, (৩) ব্যতীহার বহুব্রীহি, (৪) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, (৫) অলুক্ বহুব্রীহি, (৬) নিষেধার্থক বহুব্রীহি, (৭) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি ও (৮) তুল্যযোগে বহুব্রীহি।

(১) **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ঃ** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ এবং উত্তরপদ বিভিন্ন বিভক্তি দ্বারা গঠিত হয়, তাহাকে **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি** বলা হয়। যেমন—চন্দ্রশেখর যাহার=চন্দ্রশেখর, চক্র পাণিতে যাহার=চক্রপাণি ইত্যাদি।

এইরূপ—ধর্মপ্রাণ, দেশপ্রাণ, পদ্মনাভ, চন্দ্রচূড়, বীণাপাণি, ধর্মবুদ্ধি, শূলপাণি, ঊর্ণনাভ (মাকড়সা), পাতাবাহার, অশ্রুমুখী, রত্নগর্ভা, নদীমাতৃক ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ ১। '**চন্দ্রচূড়** জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী' (মধুসূদন)
২। 'কুন্দবরণ সুন্দর হাসি, বীণা হাতে **বীণাপাণি**' (রবীন্দ্রনাথ)

(২) **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ঃ** যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ বিশেষণ এবং উত্তরপদ বিশেষ্য হয়, তাহাকে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি** বলা হয়। যেমন—নীলকণ্ঠ যাহার=নীলকণ্ঠ ; সদাশয়, পক্ককেশ ইত্যাদি।

এইরূপ—লালপাগড়ী, অনন্তযৌবনা, পীতাম্বর, প্রসন্নসলিলা, সুনয়নী, হতভাগা, রক্তআঁখি, লব্ধপ্রতিষ্ঠা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ ১। 'হে **অনন্তযৌবনা** উর্বশী' (রবীন্দ্রনাথ)
২। '**লাল-পাগড়ী** বাঁধি মাথে রাজা হ'লে মথুরাতে' (তারাশঙ্কর)

(৩) **ব্যতীহার বহুব্রীহি ঃ** পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়ার কার্য করা বুঝাইলে

একই শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাহাকে **ব্যতীহার বহুব্রীহি** বলে। এই সমাসের পূর্বপদের শেষে 'আ' এবং পরপদের শেষে 'ই' যুক্ত হয়। যেমন—লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ=লাঠালাঠি।

এইরূপ—চোখাচোখি, কানাকানি, কেশাকেশি, হাতাহাতি, মারামারি, কাড়াকাড়ি, কামড়াকামড়ি, হাসাহাসি, কাঁদাকাঁদি, কোলাকুলি, মাখামাখি, দেখাদেখি, দলাদলি, রক্তারক্তি, ঢলাঢলি, ফাটাফাটি, চেনাচিনি, জানাজানি ইত্যাদি।

প্রয়োগ : ১। 'হাঁরে মধু, দু'বেলা **চোখাচোখি**' (শরৎচন্দ্র)

২। 'সকল লোকের ঠাঁই **কানাকানি** শুনি এই কথা' (চণ্ডীদাস)

৩। 'মাল **চেনাচেনি,** দর **জানাজানি,**…' (যতীন্দ্রনাথ)

(৪) **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে মধ্যপদের লোপ হইলে, তাহাকে **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** বলে। এই সমাসগুলির পূর্বপদ উপমান হওয়ায় ইহাদিগকে উপমান বহুব্রীহি সমাসও বলা হইয়া থাকে। যেমন—মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার=মৃগনয়নী।

এইরূপ—চন্দ্রমুখী, খঞ্জননয়নী, পটলচেরা, দিলদরিয়া, চিরুণদাঁতী, বিড়ালচোখী, বিড়ালাক্ষী ইত্যাদি ('বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী'—ঈশ্বর গুপ্ত)

প্রয়োগ : ১। 'কে হরিল আমার **চন্দ্রমুখী** সীতা!' (মধুসূদন)

২। 'ওগো তোরা কে গো **খঞ্জননয়নী**' (জগন্নাথ দাস)

(৫) **অলুক্ বহুব্রীহি :** কোথাও কোথাও বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লুপ্ত হয় না; ইহারা **অলুক্ বহুব্রীহি**। যেমন—হাতে ছড়ি যাহার=হাতে ছড়ি বা ছড়ি হাতে। এইরূপ—পায়ে-বেড়ী, গায়ে-হলুদ, গলায়মালা, মুখেভাত, মুখেপান, হাতে-খড়ি, মাথায়পাগড়ি ইত্যাদি।

(৬) **নিষেধার্থক বহুব্রীহি :** না বাচক (নঞ্ অর্থক) 'নির' বা 'নি' পূর্বপদ হইলে **নিষেধার্থক বহুব্রীহি** হয়। যেমন—নিঃ সম্বল যাহার=নিঃসম্বল। এইরূপ—নাছোড়বান্দা, অজ্ঞান, নিখরচে, নিষ্কলঙ্ক, নির্জলা, নিশ্চিন্ত, আনাড়ী, অবুঝ, বেইমানী, বেকার, নিখুঁত, বেতার ইত্যাদি।

(৭) **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** সংখ্যাবাচক পদের দ্বারা নিষ্পন্ন বহুব্রীহি সমাসকে **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি** বলা চলিতে পারে। যেমন—পঞ্চ মুখ যাহার=পঞ্চমুখ, দশটি আনন যাহার=দশানন ইত্যাদি। সমাহার বুঝাইতে ইহাদের সমাস হয় নাই, সংখ্যাবাচক কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাইতে সমাস গঠিত হইয়াছে। দ্বিগু সমাস হইতে ইহাদের পার্থক্য লক্ষণীয়।

এইরূপ—চারমুখী, চারকোনা, আটচালা, দোনালা, একচোখা, ষড়ানন, দশভূজা, সাতভরি, তিনদাঁড়, ন-কাঠা ইত্যাদি।

(৮) **তুল্যযোগে বহুব্রীহি:** 'সহ'বাচক অব্যয়যোগে দুইটি কর্তার সমাসে রূপান্তরীকরণের নাম **তুল্যযোগে বহুব্রীহি**। যেমন—স্ত্রীর সহিত=স-স্ত্রীক। এইরূপ—সশিষ্য, সপুত্র, সদলবল ইত্যাদি।

নিত্যসমাস।

যে সকল সমাস নিত্যই সমাসবদ্ধ পদরূপে ব্যবহৃত হয় এবং যাহাদের ব্যাসবাক্য বিশ্লেষণ করিবার জন্য অন্য পদের প্রয়োজন হয়, তাঁহাদিগকে **নিত্যসমাস** বলে। যেমন—অন্য জন্ম=জন্মান্তর। এইরূপ—দেশান্তর, গ্রামান্তর, জন্মমাত্র, শ্রবণমাত্র, আরক্ত ইত্যাদি।

নিত্যসমাস ভিন্ন অন্যান্য সকল সমাসকেই অনিত্য সমাস বলা যাইতে পারে। বক্তা বা লেখক নিজের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য সমাস গঠন করিতে পারেন, আবার না-ও পারেন।

[**দ্রষ্টব্য:** বোর্ডের সিলেবাসে "স্বপদবিগ্রহ", "অস্বপদবিগ্রহ" প্রাদি, কু-তৎপুরুষ, সুপ্‌সুপা সমাস বর্জনীয়, সেই কারণ উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল না।]

অনুশীলনী

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ: স্বাধীনতাদিবস (উঃ মাঃ ১৯৬০), রাঙামুলো, লাঠিখেলা, আগুসার, ছায়াতরু, ডাক্তারসাহেব, গরমিল, বরযাত্রী, স্মৃতিমন্দির।

২। ব্যাসবাক্যসহ যে কোন পাঁচটি সমাসের নাম কর: দা-কাটা, তেলেভাজা, রান্নাঘর, গোলাভরা, সুধী, হতভাগা, মতিচ্ছন্ন, নদীমাতৃক, সুপ্তোত্থিত। (উঃ মাঃ ১৯৬৪)

৩। উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর: বহুব্রীহি, দ্বন্দ্ব (ক. বি. ১৯৪৩), সমাহার দ্বন্দ্ব, নিত্যসমাস (ক.বি. ১৯৪৪), রূপক সমাস (ক. বি. ১৯৪৫) অলুক্ সমাস (উঃ মাঃ ১৯৬৪)।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের মধ্যে সমস্তপদ বাহির কর এবং ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ: (ক) 'চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে'। (মাইকেল) (খ) 'ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ'। (দ্বিজেন্দ্রলাল) (গ) 'ধন-দৌলত আদর-আহ্লাদ সকলেই পায়।' (শরৎচন্দ্র) (ঘ) 'মধুহীন কোরো না গো তব মনঃ-কোকনদে।' (মাইকেল)

৫। যে কোনও চারিটির সমাস বল: দেশান্তর, কাঁচামিঠে, শরণাপন্ন, সরসিজ, শোকানল, বিয়েপাগলা, বিপত্নীক (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২)।

একাদশ অধ্যায়

শব্দ-প্রকরণ

শব্দ ও পদের পার্থক্য : জীবকণ্ঠ যাহা কিছু উচ্চারণ করে তাহাই শব্দ। এক বা একাধিক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি অর্থপূর্ণ হইলে তাহাকে **শব্দ** বলা যায়। নিরর্থক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি শব্দ নয়। যেমন—এক ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দ—মা, ঐ, খা (খেয়েন)। একাধিক ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দ—ঘর, পাথ্না, উঠ্তি, দাতব্য, পূজনীয়, বাবু আনা, বাবুয়ানা, ঠাকুর আলি, ঠাকুরালি ইত্যাদি।

সার্থক শব্দ তিন প্রকার। যেমন—(১) ধাতু, (২) প্রাতিপদিক ও (৩) প্রত্যয়।

(১) **ধাতু :** ক্রিয়াপদের মূল অংশকে **ধাতু** বলে। সত্ত্ব, অবস্থা বা কার্যবাচক প্রকৃতিকে বলা হয় ধাতু। যেমন—'খেল্' একটি ধাতু তাহার সহিত 'এ' বিভক্তি যুক্ত হইলে হয় 'খেলে' ক্রিয়াপদ। এইরূপ—পড়্, চল্, দেখ্ ইত্যাদি।

(২) **প্রাতিপদিক :** ধাতু, বিভক্তি ব্যতীত অর্থপূর্ণ শব্দ, যাহা কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্তও হইতে পারে, তাহাকে **প্রাতিপদিক** বলে। যেমন—কৃদন্ত—নাচন, হাসা, কাঁদা, পারানি ইত্যাদি। তদ্ধিতান্ত—চাকরি, শহরে, কাঠুরে, মানস, শৈব ইত্যাদি।

যে সকল শব্দের সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া তদ্ধিতান্ত শব্দ গঠিত হয়, সেগুলিকেও প্রাতিপদিক বলা হয়। যেমন—চোর (শব্দ)+আ (তদ্ধিত প্রত্যয়)=চোরা, এই তদ্ধিতান্ত শব্দ প্রাতিপদিক তো বটেই এবং ঐ 'চোর' শব্দও প্রাতিপদিক।

প্রকৃতি ধাতু : ধাতু ও প্রাতিপদিকের একত্রে মিলিত নাম **প্রকৃতি ধাতু**। ইহা ক্রিয়াপদের স্রষ্টিকর্তা এবং প্রাতিপদিক নামপদের স্রষ্টিকর্তা।

(৩) **প্রত্যয় :** যে শব্দ ধাতুর পরে বসিয়া নূতন ধাতু, প্রাতিপদিক বা ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করে এবং প্রাতিপদিকের পরে বসিয়া নূতন প্রাতিপদিক অথবা নামপদ সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহাকে **প্রত্যয়** বলে।

প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা—(ক) কৃৎ-প্রত্যয় ও (খ) তদ্ধিত-প্রত্যয়।

কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয় সম্পর্কে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রাতিপদিক এবং ধাতুর উত্তরে বিভক্তি যুক্ত হইলে যথাক্রমে **নামপদ এবং ক্রিয়াপদ** হইয়া থাকে।

গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে শব্দকে আমরা নিম্নলিখিত দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। যথা—(১) মৌলিক শব্দ ও (২) সাধিত শব্দ।

(১) **মৌলিক শব্দ :** যে শব্দকে ভাঙ্গা সম্ভব নয় সেই অর্থপূর্ণ শব্দকে বলা হয় **মৌলিক শব্দ**। যেমন—নদী, গাছ, হাত, পা, ভাই ইত্যাদি।

(২) **সাধিত শব্দ :** প্রত্যয় যোগে অথবা সমাসনিষ্পন্ন হইলে যে শব্দ পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় **সাধিত শব্দ**। যেমন—মন্তব্য (মন্+তব্য প্রত্যয়), তবলচি (তবল্+চি প্রত্যয়), এইরূপ—রাজরানী, বিদ্যালয় ইত্যাদি।

এই দুই প্রকার শব্দ ভিন্ন **অব্যয়**ও একপ্রকার শব্দ। অব্যয় সম্বন্ধে আমরা পূর্বে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি।

শব্দের শ্রেণীবিভাগ

অর্থানুসারে শব্দকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—(১) রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ, (২) যৌগিক শব্দ ও (৩) যোগরূঢ় শব্দ।

(১) **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ :** যে শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়লভ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য একটি প্রসিদ্ধ অর্থ বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ** বলে। যেমন—হৃ ধাতু (হরণ করা অর্থে) ইন্ প্রত্যয়—হরিণ (বনজ পশু অর্থে)। প্রকৃতি-প্রত্যয় অর্থের সহিত এখানে শব্দার্থের কোন সম্পর্ক নাই।

(২) **যৌগিক শব্দ :** যে শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়লভ্য অর্থের বোধ জন্মাইয়া দেয় অর্থাৎ সাধিত শব্দের অংশগুলির মিলিত অংশ যদি প্রকাশ করে, তবে তাহাকে **যৌগিক শব্দ** বলে। যেমন—গিন্নী+পনা=গিন্নীপনা। অর্থাৎ গিন্নীর মতো ব্যবহার। প্রকৃতি-প্রত্যয় গঠিত শব্দে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ বিকৃত না হইয়া তাহাদের মিলিত শব্দার্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) **যোগরূঢ় শব্দ :** যে শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়লভ্য অর্থ বুঝাইয়া দিয়া উহার সাধিত কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, অর্থাৎ যে শব্দে একাধারে যৌগিক শব্দের এবং রূঢ় শব্দেরও ধর্ম বজায় থাকে, তাহাকে **যোগরূঢ় শব্দ** বলা হয়। যেমন—পঙ্ক+জন্+ড=পঙ্কজ অর্থাৎ পাঁকে জন্মে যাহা। পদ্ম পাঁকে জন্মে; আবার শেওলা, শামুক ইত্যাদিও পাঁকে জন্মে। কিন্তু তাহাদের অর্থে পঙ্কজ আপন শব্দ মহিমা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়; কেবলমাত্র পদ্মফুলের অর্থ প্রকাশ করিয়াই সে নিজেকে সম্মানিত মনে করে। অতএব পঙ্কজ যোগরূঢ় শব্দ। এইরূপ—রাজপুত, জলদ যোগরূঢ় শব্দ।

অনুশীলনী

১। শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য কি? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। সংজ্ঞা নির্দেশ কর ও উদাহরণ দাও :

যোগরূঢ় শব্দ (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৪), রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ ও যৌগিক শব্দ।

দ্বাদশ অধ্যায়

কৃৎ-প্রত্যয়

ধাতুর উত্তর বিভিন্ন অর্থে যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহাদিগকে **কৃৎ-প্রত্যয়** বলে। বাঙলা ভাষায় কৃৎ-প্রত্যয়গুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— **বাঙলা প্রত্যয়** এবং **সংস্কৃত প্রত্যয়**। তদনুসারে কৃৎ-প্রত্যয়ও দুইভাগে বিভক্ত। যথা—**বাঙলা-কৃৎ-প্রত্যয়** ও **সংস্কৃত-কৃৎপ্রত্যয়**। আ, আনি, অন্ত, তি প্রভৃতি বাঙলা প্রত্যয়। ক্ত, ক্তি, তব্য, অনীয়, অনট্, ঘঞ্, তৃচ্ ইত্যাদি সংস্কৃত প্রত্যয়। কৃৎ-প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দকে **কৃদন্ত শব্দ** বলে।

বাঙলা কৃৎ-প্রত্যয়

অ

অ-অধিকাংশ স্থলে উচ্চারণ হয় না, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার উচ্চারণ দেখা যায়। যখন অ-এর উচ্চারণ হয় না, তখন তাহাকে শূন্য প্রত্যয় বলা হয়। যথা—ধার্ + অ = ধার্; পড়্ + অ = পড়্; চির্ + অ = চির্; জিত্ + অ = জিত্ ইত্যাদি।

যখন অ-এর উচ্চারণ হয়, তখন উহার উচ্চারণ ও-এর মতো হয় এবং শব্দটি দ্বিত্ব হইয়া যায়। যেমন—ধর্ + অ = ধর ধর (ধরো ধরো); পড্ + অ = পড় (পড়ো পড়ো); নিব + অ = নিব নিব (নিবো নিবো—নিবুনিবু—স্বরসঙ্গতি) ডুব্ + অ = ডুবডুব (ডুবুডুবু—স্বরসঙ্গতি) ইত্যাদি।

অন, (ওন) অনা > না

নাচ্ + অন = নাচন; বাচ্ + অন = বাচন; কাঁদ্ + অন = কাঁদন; রাধ + অনা = রান্না; খেল্ + অনা = খেলনা; পাখ্ + অনা = পাখনা; কুট্ + অনা = কুটনা; ঢাক্ + না = ঢাকনা; বাজ্ + না = বাজনা ইত্যাদি। প্রেরণার্থক ও নামধাতুর ক্ষেত্রেঃ বলা + অন = বলান; মাতা + অন = মাতান; জুতা + অন = জুতান ইত্যাদি।

অত > অতা, তি, অতি

বস্ + অত = বসত (বসতবাটি); মান্ + অত = মানত; ফির্ + তা = ফেরতা; ধর্ + তা = ধর্তা; কাট্ + তি = কাটতি; বস্ + তি = বস্তি; উঠ্ + তি = উঠ্তি ইত্যাদি।

নি, না, নী (উনি উনী)

লাফা + নি = লাফানি; ছাঁক + নি = ছাঁকনি; ঠেক্ + না = ঠেকনা; নাচ্ + উনি = নাচুনি; ঝাক্ + উনি, উনী = ঝাকুনি, ঝাকুনী; বক্ + উনি, উনী = বকুনি, বকুনী; চাল + উনি = চালুনি; ছা + উনি = ছাউনি ইত্যাদি।

অন্ত

সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়স্থলে বাঙলায় অন্ত-প্রত্যয় হয়। যেমন—বাড়্ + অন্ত = বাড়ন্ত (বয়স) ; ফল্ + অন্ত = ফলন্ত (বৃক্ষ) ; পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত (বেলা) ; ফুট্ + অন্ত = ফুটন্ত (ফুল) ; ঘুম্ + অন্ত = ঘুমন্ত (শিশু) ; ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত ইত্যাদি।

আ

ভাববাচ্যে ও কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তরে 'আ' প্রত্যয় হয়। যথা চল্ + আ = চলা ; পড়্ + আ = পড়া ; হাস্ + আ = হাসা ; কাচ্ + আ = কাচা ; যা + আ = যাওয়া ; বাঁধ + আ = বাঁধা ; আস্ + আ = আসা ; ধু + আ = ধুয়া, ধোওয়া ; নাচ্ + আ = নাচা ; ছাড়্ + আ = ছাড়া ইত্যাদি।

ই

বস্তুবাচক বিশেষ্যপদ গঠন করিতে ধাতুর সাথে ই-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা—ফির্ + ই = ফিরি ; ভাজ্ + ই = ভাজি ; বাড + ই = বাড়ি > বাড় ; হাস্ + ই = হাসি ; ঝাঁপ + ই = ঝাঁপি (রাজকন্যার ঝাঁপি) ; মার্ + ই = মারি > মার ; হার্ + ই = হারি > হার ; ডুব + ই = ডুবি (নৌকাডুবি) ; ফাঁস্ + ই = ফাঁসি (ফাঁসির আসামী) ইত্যাদি।

আই > আইত > আও

ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তরে : চড়্ + আই = চড়াই ; ঢাল্ + আই = ঢালাই ; খোদ্ + আই = খোদাই ; লড়্ + আই = লড়াই ; যাচ্ + আই = যাচাই ; ডাক্ + আইত = ডাকাইত > ডাকাত ; ভর্ + ইত = ভরিত ; চল্ + ইত = চলিত ; কর্ + ইত = করিত ; লাগ্ + আও = লাগাও ; ঘের্ + আও = ঘেরাও ; পাকড়্ + আও = পাকড়াও ; ফল্ + আও = ফলাও ; বন্ + আও = বনাও (বনিবনাও) ইত্যাদি।

আন, আনো

প্রযোজক ও অন্যান্য ধাতুর উত্তর আন্, আনো-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা—জান্ + আন = জানান ; খেদ্ + আন = খেদান ; চাল্ + আন = চালান ; জানা + আনো = জানানো ; বাঁধা + আনো = বাঁধানো > (বই) ; নিবা + আনো = নিবানো > (দীপ) ; লাগা + আনো = লাগানো > (কথা) ; লুকা + আনো = লুকানো > (ধন) ইত্যাদি।

আনি (স্ত্রীলিঙ্গ) আনী

ভাববাচ্যে ও কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর : শুন্ + আনি = শুনানি ; পার্ + আনি = পারানি ; ঝলক্ + আনি = ঝলকানি ; ভুল্ + আনি = ভুলানি ; বেড়্ + আনি = বেড়ানি ; তড় + পানি = তড়পানি ; নিড়্ + আনী = নিড়ানী ; রাঙ্ + আনী = রাঙানী ইত্যাদি।

অল, আল>আলি

ভাব বা গুণ প্রকাশের জন্য শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা—ফাট্+অল=ফাটল; মিশ্+আল=মিশাল>(মিশাল দুধ); কোট্+আল=কোটাল; ঘুর্+আল=ঘোরাল; মিশ্+আলি=মিশালি>মিশিলি (পাঁচমিশিলি) ইত্যাদি।

ব্যতিহার বা পারস্পরিক ক্রিয়া বুঝাইতে

ই-প্রত্যয়ের প্রয়োগ

কাট্—কাটাকাটি; দেখ্—দেখাদেখি; ধর্—ধরাধরি; কাড়্—কাড়াকাড়ি; হাস্—হাসাহাসি; কাঁদ্—কাঁদাকাঁদি; জান্—জানাজানি ইত্যাদি।

ইয়ে

সাধারণতঃ নিপুণ অর্থে ইয়ে প্রত্যয় হয়। যথা—খেল্+ইয়ে=খেলিয়ে; বল্+ইয়ে=বলিয়ে, খাট্+ইয়ে=খাটিয়ে; লিখ্+ইয়ে=লিখিয়ে ইত্যাদি।

ইয়া, ইতে, ইবার

কর্+ইয়া=করিয়া>করে (অভিশ্রুতি); খা+ইয়া=খাইয়া>খেয়ে; দেখ্+ইয়া=দেখিয়া>দেখে; শুন্+ইতে=শুনিতে>শুনতে; চল্+ইতে=চলিতে>চলতে; পড়্+ইবার=পড়িবার; ধর্+ইবার=ধরিবার ইত্যাদি।

উ, উয়া

কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর অনেক সময় এই প্রত্যয় যুক্ত হয়: ডুব+উ=ডুবু (ডুবুজল) ডুবুডুবু; চাল্+উ=চালু (চালু দোকান); পড়্+উয়া=পড়ুয়া>পড়ো (ছাত্র); উড়্+উয়া=উড়ুয়া>উড়ো; মাঠ+উয়া=মাঠুয়া (অভিশ্রুতিতে) মেঠো ইত্যাদি।

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

সংস্কৃত কৃত-প্রত্যয়গুলির মধ্যে তব্য, অনীয়, ক্যপ্, ণ্যৎ এবং যৎ এই পাঁচটি প্রত্যয়ের নাম **কৃত্য-প্রত্যয়**। বাঙলায় ইহাদের প্রয়োগ দেওয়া হইল।

কৃত্য-প্রত্যয়

তব্য

তব্য—যোগ্য অর্থে: দা+তব্য=দাতব্য; কৃ+তব্য=কর্তব্য; জ্ঞা+তব্য=জ্ঞাতব্য; দৃশ্+তব্য=দ্রষ্টব্য; ভূ+তব্য=ভবিতব্য; বচ্+তব্য=বক্তব্য; শ্রু+তব্য=শ্রোতব্য; মন্+তব্য=মন্তব্য ইত্যাদি।

অনীয়

অনীয়—যোগ্য অর্থে: কৃ+অনীয়=করণীয়; পা+অনীয়=পানীয়; স্মর্+অনীয়=স্মরণীয়; দৃশ্+অনীয়=দর্শনীয়; পূজ্+অনীয়=পূজনীয়; গ্রহ+অনীয়=গ্রহণীয়;

শিক্ষ+অনীয়=শিক্ষণীয়; গুপ্‌+অনীয়=গোপনীয়; রম্‌+অনীয়=রমণীয়; পঠ্‌+অনীয়=পঠনীয়; অর্চ+অনীয়=অর্চনীয় ইত্যাদি।

ক্যপ্‌

ক্যপ্‌ (ক্‌ প্‌ ইৎ) য থাকে: ভৃ+ক্যপ্‌=ভৃত্য; কৃ+ক্যপ্‌=কৃত্য; শাস্‌+ক্যপ্‌=শিষ্য; হন্‌+ক্যপ=হত্যা; ভৃ—ণ্যৎ+আপ্‌=ভার্যা ইত্যাদি।

ণ্যৎ, যৎ

ণ্যৎ ও যৎ (য থাকে): কৃ+ণ্যৎ=কার্য; ধৃ+ণ্যৎ=ধার্য, বহ্‌+ণ্যৎ=বাহ্য বচ্‌+ণ্যৎ=বাচ্য ইত্যাদি। দা+যৎ=দেয়; পা+যৎ=পেয়; হা+যৎ=হেয়; লভ্‌+যৎ=লভ্য; নম+যৎ=নম্য ইত্যাদি।

অন্যান্য সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

শতৃ

বর্তমান কালে কর্তৃবাচ্যে 'শতৃ' প্রত্যয় হয়। শতৃ (অৎ থাকে): যথা—অস্‌+শতৃ=সৎ; চল্‌+শতৃ=চলৎ (ক্লীবলিঙ্গ), পুংলিঙ্গে চলন্‌; স্ত্রীলিঙ্গে চলন্তী; কৃ+শতৃ=কুর্বৎ ইত্যাদি।

শানচ্‌

বর্তমান অর্থে: বৃধ্‌+শানচ্‌=বর্ধমান; বৃৎ+শানচ্‌=বর্তমান; দীপ্‌+শানচ্‌=দীপ্যমান; আস্‌+শানচ্‌=আসীন; মৃ+শানচ্‌=ম্রিয়মাণ; বিদ্‌+শানচ্‌=বিদ্যমান; শী+শানচ্‌=শয়ান; সেব্‌+শানচ্‌=সেবমান ইত্যাদি।

ক্ত (ত)

অতীত কালের সকর্মক ও অকর্মক ধাতুর সহিত 'ক্ত' প্রত্যয় হয়। যথা—দৃশ্‌+ক্ত=দৃষ্ট; মন্‌+ক্ত=মত; ভুজ্‌+ক্ত=ভুক্ত; গৈ+ক্ত=গীত; সৃজ্‌+ক্ত=সৃষ্ট; বচ্‌+ক্ত=উক্ত; বপ্‌+ক্ত=উপ্ত; শৄ+ক্ত=শীর্ণ; উৎ—নম্‌+ক্ত=উন্নত ইত্যাদি।

ক্তি (তি)

ক্রিয়ার সহিত 'ক্তি' (তি) প্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষ্য করা হয়। যথা—মন্‌+ক্তি=মতি; গম্‌+ক্তি=গতি; বুধ্‌+ক্তি=বুদ্ধি; গৈ+ক্তি=গীতি; উপ—লভ্‌+ক্তি উপলব্ধি; মুচ্‌+ক্তি=মুক্তি; স্তু+ক্তি=স্তুতি; গ্লৈ+ক্তি=গ্লানি; বৃষ+ক্তি=বৃষ্টি; শ্রু+ক্তি=শ্রুতি ইত্যাদি।

ণক, ষক

কর্তৃবাচ্যে যে করে: কৃ+ণক=কারক; গৈ+ণক=গায়ক; কৃষ্‌+ণক=কৃষক;

পৃ+ণক=পাবক ; হন্+ণক=ঘাতক; নী+ণক=নায়ক ; রন্জ+ষক=রজক ; নৃৎ+ষক=নর্তক ; খন্+ষক=খনক ইত্যাদি।

অনট্

কার্য ও বস্তু বুঝাইতে : গৈ+অনট্=গান ; ভুজ্+অনট্=ভোজন ; শী+অনট্=শয়ন ; স্মৃ+অনট্=স্মরণ ; প্র—যুজ্+অনট্=প্রয়োজন ; কৃ+অনট্=করণ ; দৃশ্+অনট্=দর্শন ; গম্+অনট্=গমন ; আ—রুহ্+অনট্=আরোহণ ইত্যাদি।

অন, অন

ভীষ+অন=ভীষণ ; অর্চ+অন (স্ত্রীং আপ্)=অর্চনা ; কৃপ্+অন=(স্ত্রীং আপ্) কল্পনা; বন্দ+অন (স্ত্রীং আপ্)=বন্দনা; প্র—ঈর্+অন (স্ত্রীং আপ্)=প্রেরণা ইত্যাদি।

অল্

ভাববাচ্য ও কর্তৃবাচ্য ভিন্ন কারকবাচ্যে অল্ হয় : ভূ+অল্=ভব ; হৃষ্+অল্=হর্ষ ; ভিদ+অল্=ভেদ ; লী+অল্=লয় ; ভী+অল্=ভয় ; জি+অল্=জয় ; সম্—চি+অল্=সঞ্চয় ; মুহ+অল্=মোহ ইত্যাদি।

ঘঞ্

ভাববাচ্য ও কার্য অর্থে : শুচ্+ঘঞ্=শোক ; রুজ+ঘঞ্=রাগ ; লভ্+ঘঞ্=লাভ ; ভন্জ+ঘঞ্=ভঙ্গ ; ভজ্=ঘঞ্=ভাগ ; সন্জ্+ঘঞ্=সঙ্গ ; সম্—তপ্+ঘঞ্=সন্তাপ ; বি—হৃ+ঘঞ্=বিহার ; প্র—সদ্+ঘঞ্=প্রসাদ ; আ—হৃ+ঘঞ্=আহার ; অনু—তপ্+ঘঞ্=অনুতাপ ইত্যাদি।

তৃচ্, তৃণ্

সম্পাদক বা কর্তা অর্থে : দা+তৃচ্=দাতৃ>দাতা ; নী+তৃচ্=নেতৃ>নেতা ; পা+তৃচ্=পিতৃ>পিতা ; দুহ্+তৃচ্=দুহিতা (স্ত্রীং আপ্) ; শ্রু+তৃণ্=শ্রোতা ; ভৃ+তৃচ =ভর্তা ; হন্+তৃচ্=হন্তা ; যুধ্+তৃচ্=যোদ্ধা ; নী+তৃচ্=নেতা ; দৃশ+তৃচ্=দ্রষ্টা ; বুধ+তৃণ্=বোদ্ধা ইত্যাদি।

ণিন্

ভূ+ণিন্=ভাবী ; গম+ণিন্+গামী ; স্থা+ণিন্=স্থায়ী ; প্র-বস্+ণিন্=প্রবাসী ; অপ্—হৃ+ণিন্=অপহারী ; উপহার+ণিন্=উপহারী ; উপ—কৃ+ণিন=উপকারী ; অধি—বস্+ণিন্=অধিবাসী ; সম্—যম্+ণিন্=সংযমী ইত্যাদি।

অণ্ (অ)

করে যে এই অর্থে : কর্ম-কৃ+অণ্=কর্মকার ; কর্ণ-ধৃ+অণ্=কর্ণধার ; সূত্র ধৃ+অণ্=সূত্রধর, শাস্ত্র-কৃ+অণ্=শাস্ত্রকার ; গ্রন্থ-কৃ+অণ্=গ্রন্থকার ; কুম্ভ-কৃ+অণ্=কুম্ভকার ; মালা-কৃ+অণ্=মালাকার ইত্যাদি।

ট (অ)

করে যে এই অর্থেঃ ভাস্-কৃ+ট=ভাস্কর; যশস্-কৃ+ট=যশস্কর; দিবা-কৃ+ট=দিবাকর; খে-চর্+ট=খেচর, অগ্র-সৃ+ট=অগ্রসর; কিম্-কৃ+ট=কিঙ্কর; উভ-চর্+ট=উভচর; শত্রু-হন্+ট=শত্রুঘ্ন ইত্যাদি।

খচ্ (অ)

যে করে এই অর্থে খচ্ প্রত্যয়ঃ ভুজ—গম্+খচ্=ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম; তুর—গম্+খচ্=তুরঙ্গ>তুরঙ্গম; বিহায়স্—গম্+খচ্=বিহঙ্গ>বিহঙ্গম; পতং—গম্+খচ্=পতঙ্গ>পতঙ্গম; বসু—ধৃ+খচ্ (স্ত্রীং আপ্)=বসুন্ধরা; প্রিয়—বদ্+খচ্ প্রিয়ংবদ; পর—তপ্+খচ্=পরন্তপ ইত্যাদি।

অচ্

সৃপ্+অচ্=সর্প; সরী—সৃপ্+অচ্=সরীসৃপ; শোক+হৃ+অচ্=শোকহর; বংশ—ধৃ+অচ্=বংশধর; ভিক্ষ+অচ্ (স্ত্রীং আপ্)=ভিক্ষা ইত্যাদি।

ইষ্ণু

ধর্ম অর্থেঃ সহ্+ইষ্ণু=সহিষ্ণু; বৃধ+ইষ্ণু=বর্ধিষ্ণু ইত্যাদি।

আলু

কর্তৃবাচ্যে স্বভাব অর্থেঃ কৃপা+আলু=কৃপালু; নিদ্রা+আলু=নিদ্রালু; দয়া+আলু=দয়ালু; তন্দ্রা+আলু=তন্দ্রালু ইত্যাদি।

ইত্র

খন্+ইত্র=খনিত্র; পূ+ইত্র=পবিত্র; চর+ইত্র=চরিত্র; বহ+ইত্র=বহিত্র (নৌকা) ইত্যাদি।

উ

মৃ (সন্)+উ=মুমূর্ষু; ভিক্ষ+উ=ভিক্ষু; জ্ঞা (সন্)+উ=জিজ্ঞাসু; পা (সন্)+উ=পিপাসু; ভুজ্ (সন্)+উ=বুভুক্ষু ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। কৃৎ-প্রত্যয় কাহাকে বলে? উদাহরণসহ চারিটি বাঙলা কৃৎ-প্রত্যয়ের উল্লেখ কর। (স্কুল ফাইনাল ১৯৫৮)

২। অর্থ ও ব্যুৎপত্তি লিখ:—

অফুরন্ত, শোনা, দিবাকর, মধুসূদন, যাযাবর, নিয়ন্তা, নাচন, চরিত্র, গ্রন্থকার, ব্যবসায়, অসূর্যম্পশ্যা, যোদ্ধা, ভক্তি, দুর্গ। (ক. বি. ১৯৪২)

৩। তব্য, অনীয়, ক্ত, ক্তি, অনট্, তৃচ্, ণ্যৎ প্রভৃতি প্রত্যয়গুলির সাহায্যে এক-একটি কৃদন্ত-শব্দ গঠন করিয়া বাক্য রচনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তদ্ধিত-প্রত্যয়

বাঙলা তদ্ধিত-প্রত্যয়

শব্দের উত্তর বিভিন্ন অর্থে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহাদিগকে **তদ্ধিত-প্রত্যয়** বলে। তদ্ধিত-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন শব্দকে **তদ্ধিতান্ত শব্দ** বলে। তদ্ধিত-প্রত্যয় দুই প্রকার—বাঙলা তদ্ধিত-প্রত্যয় ও সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়।

অ

অ-প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের হসন্ত উচ্চারণ হয়: যেমন—কাল-সাপ (কাল্ সাপ্); কাল-পেঁচা (কাল্ পেঁচা); এইরূপ—কটমট, কালনাগিনী, কালশিরা ইত্যাদি।

আ, আই

আগত, উৎপন্ন, স্বার্থ, আদর, ভাব ও কার্য অর্থে: চাঁদ+আ=চাঁদা; চোর+আ=চোরা; বামন+আ=বামনা; পশ্চিম+আ=পশ্চিমা; চাষ+আ=চাষা; জল+আ=জলা; বড+আই=বড়াই; পুষ্ট+আই=পোষ্টাই, ঢাকা+আই=ঢাকাই; বল+আই=বলাই (বলদেব); কেষ্ট+আ=কেষ্টা; '**কেষ্টা** বেটাই চোর' (রবীন্দ্রনাথ) বলদ+আ=বলদা; পাগল্+আ=পাগলা ইত্যাদি।

'বাইশ **বলদা** তের **ছাগলা**
বলে গিয়েছে বরা **পাগলা**' (ডাকের বচন)

আন, আইত

ক্রিয়া বুঝাইতে শব্দের উত্তরে আন: জমা+আন=জমান; জুতা+আন=জুতান; যোগ+আন=যোগান; সেবা+আইত=সেবাইত; ডাকা+আইত=ডাকাইত ইত্যাদি।

আনা, আনী, আম, আমি, মি

কার্য বা আচরণ অর্থে: বাবু+আনা=বাবুয়ানা; মুন্সী+আনী=মুন্সীয়ানী; কাঠ+আম=কাঠাম; ঠক+আম=ঠকাম, ঠকামি; জ্যাঠা+আম=জ্যাঠাম, জ্যাঠামি; দুষ্ট+আমি=দুষ্টামি; ছেলে+মি=ছেলেমি; নেকা+মি=নেকামি; কুঁড়ে+মি=কুঁড়েমি ইত্যাদি।

আরি, আরী, আর, আচি, আরু, আল

বৃত্ত্যর্থে, অস্ত্যর্থে, ভাবার্থে: মাঝ্+আরি=মাঝারি; ভাঁড়্+আরী=ভাঁড়ারী; ভাঁড়্+আর=ভাঁড়ার; বেঙ+আচি=বেঙাচি; ঘাম=ঘামাচি; বম+আরু=বোমারু;

ধার্‌+আল=ধারাল ; পাকা+আল=পাকাল ; জাঁক+আল=জাঁকাল ; ঠাকুর+আলি=ঠাকুরালি, ঠাকুর আলি ইত্যাদি।

ওয়ালা, আলি, আলী উলী, ওয়ান

স্বার্থ, উৎপন্ন ও অস্ত্যর্থে : বাড়ী+ওয়ালা=বাড়ীআলা, বাড়ীওয়ালা ; বাসন+ওয়ালা=বাসনওয়ালা ; গো+ওয়ালা=গোয়ালা, গয়লা ; নাগর+আলি=নাগরালি ; রূপা+লি=রূপালি ; মিতা+লী=মিতালী ; সোনা+লি=সোনালি, সোনালী ; মুড়ি+উলী=মুড়িউলী ; গাড়ী+ওয়ান=গাড়োয়ান ; সূতালি (সূতালী) ; সূতার ন্যায় সরু (বিশেষণ অর্থে) ইত্যাদি।

'নওরোজ বেলা হোল অবসান
আকাশে **সূতালি** চাঁদ।' (মোহিতলাল)

ই, ঈ

অস্ত্যর্থ, আগত, জাত, বৃত্তি ও স্বভাব অর্থে : চাকর+ই=চাকরি ; ঢাকা+ই=ঢাকাই ; জজ—অতি+ই=জজিয়তি ; উপর+ই=উপরি (পাওনা)। বাঙ্গাল+ঈ=বাঙ্গালী ; কাশ্মীর+ঈ=কাশ্মীরী ; নেপাল+ঈ=নেপালী ; মরম+ঈ=মরমী (কবি) (Mystic) রাঢ়+ঈ=রাঢ়ী ইত্যাদি।

ইয়া, ঈন

উৎপন্ন ও অস্ত্যর্থে : পাথর+ইয়া=পাথুরিয়া>পাথুরে ; হলুদ+ইয়া=হলুদিয়া>হলদে ; শহর+ইয়া=শহরিয়া>শহরে>শহুরে ; বাইগণ+ইয়া=বাইগণিয়া>বেগুণে ; দেউল+ইয়া=দেউলিয়া>দেউলে ; খরচ+ইয়া=খরচিয়া>খরুচে ; আধকপাল+ইয়া=আধকপালিয়া>আধকপালে ; অলক্ষণ+ইয়া=অলক্ষণিয়া>অলুক্ষণে , রঙ+ইন=রঙীন ; সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই অর্থে কুল+ঈন=কুলীন ইত্যাদি।

উ, উক, উয়া

আদর ও স্বার্থ অর্থে : খোকা+উ=খুকু ; বুড়্‌+উ=বুড়ু ; দুষ্ট+উ=দুষ্টু ; লাজ্‌+উক=লাজুক ; ঘর্‌+উয়া=ঘরুয়া>ঘরো ; মাছ্‌+উয়া=মাছুয়া>মেছো ; ধান+উয়া=ধানুয়া>ধেনো (মদ) ; ঝড়+উয়া=ঝড়ুয়া>ঝড়ো (হাওয়া) ; মাঠ্‌+উয়া=মাঠুয়া>মেঠো ইত্যাদি।

উড়িয়া>উড়ে, এল

সাপ্‌+উড়িয়া=সাপুড়িয়া>সাপুড়ে (সাপ খেলে যে) ; ভূত্‌+উড়িয়া=ভুতুড়িয়া>ভুতুড়ে (ভুতুড়ে বাড়ী) ; হাত+উড়িয়া=হাতুড়িয়া>হাতুড়ে (ডাক্তার) ;

কাঠ+উড়িয়া=কাঠুড়িয়া>কাঠুরিয়া<কাঠুরে ; হাটু+উরিয়া=হাটুরিয়া> হাটুরে (হাটুরের কাঁধে শাল) ; ফাঁস+উড়িয়া=ফাঁসুড়িয়া>ফাঁসুড়ে ; আঁটা+এল=এঁটেল (মাটি) ; সিঁদ্ধি+এল=সিঁধেল (চোর) ; ফুল+এল=ফুলেল (তেল) ইত্যাদি।

চি, চী, চা

আধার বা পাত্র অর্থেঃ খাতা+চি=খাতাঞ্চি>খাজাঞ্চি ; ডেক+চি=ডেকচি, তবলা+চি=তবলচি ; ধুনা+চি=ধুনচি ; চামিচা>চামচা>চামচে ; লাল রঙের মত এই অর্থে লাল+চা=লালচা>লালচে ইত্যাদি।

জা, জাত

ব্যক্তির পদবীর সহিত 'জা' প্রত্যয় (সংস্কৃত 'জাত' হইতে) হয়ঃ বসু+জা=বসুজা>বোসজা ; ঘোষ+জা=ঘোষজা (ঘোষ উপাধিধারী লোকের পুত্র বা ঘোষবংশীয় এই অর্থে) ; দত্ত+জা=দত্তজা ; মিত্র+জা=মিত্রজা ; গুদাম+জাত=গুদামজাত ; পকেট+জাত=পকেটজাত ; দোকান+জাত=দোকানজাত ইত্যাদি।

ট, টিয়া, টে

সাদৃশ্য অর্থেঃ তুল+ট=তুলট (কাগজ) ; মলা+ট=মলাট ; লিঙ্গ+ট=লেঙ্গট ; ভাড়া+টিয়া=ভাড়াটিয়া>ভাড়াটে, ধোঁয়া+টিয়া=ধোঁয়াটিয়া>ধোঁয়াটে ; পাঁশ+টে=পাঁশুটে ; ক্ষ্যাপা+টে=ক্ষ্যাপাটে ইত্যাদি।

তা, ত, তি

পত্রজাতীয় জিনিস বুঝাইতে শব্দের উত্তর তা, ত, তি প্রত্যয় হয়। যথা— নাম+তা=নামতা ; নুন+তা=নোনতা ; রাঙতা ; ঢলতা ; চড়তা ; বর্ষা+তি=বর্ষাতি ; বেণে+তি=বেণেতি (জিনিস); চাকতি ; থাকতি, ঘাটতি ইত্যাদি।

সংস্কৃত-তদ্ধিত

ষ্ণ (অ)

অপত্য, সম্বন্ধ ও উপাসনা অর্থেঃ মনু+ষ্ণ=মানব (মনুর সন্তান) ; পয়স্+ষ্ণ=পায়স ; পশুপতি+ষ্ণ=পাশুপত ; পৃথিবী+ষ্ণ=পার্থিব (সুখ) ; মনস্+ষ্ণ মানস (চিত্ত বা মন) ; শিব+ষ্ণ=শৈব (শৈব ধনু) ; ব্যাকরণ+ষ্ণ=বৈয়াকরণ (ব্যাকরণজ্ঞ) ; শিশু+ষ্ণ=শৈশব (শিশুর ভাব) ; রঘু+ষ্ণ=রাঘব ইত্যাদি।

ষ্ণ্য (য)

ভাব ও গুণার্থেঃ চণক+ষ্ণ্য=চাণক্য ; সুন্দর+ষ্ণ্য=সৌন্দর্য্য ; দূত=ষ্ণ্য+দৌত্য (দূতের কাজ) ; দিতি+ষ্ণ্য=দৈত্য ; মধুর+ষ্ণ্য+মাধুর্য্য; বিধবা+ষ্ণ্য=বৈধব্য ; চোর+ষ্ণ্য=চৌর্য্য (বৃত্তি) ; কবি+ষ্ণ্য=কাব্য ; বণিজ্+ষ্ণ্য=বাণিজ্য ইত্যাদি।

ষ্ণিও (ই)

অপত্যার্থেঃ শূর + ষ্ণি = শৌরি ; সুর + ষ্ণি = সৌরি ; রাবণ + ষ্ণি = রাবণি ; দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি ; সুমিত্রা + ষ্ণি = সৌমিত্রি ইত্যাদি।

ষ্ণিক (ইক্)

দক্ষতা অর্থেঃ মনস + ষ্ণিক = মানসিক ; ন্যায় + ষ্ণিক = নৈয়ায়িক ; সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক ; ধর্ম + ষ্ণিক = ধার্মিক ; ইহ + ষ্ণিক = ঐহিক, বসন্ত + ষ্ণিক = বাসন্তিক ; নৌ + ষ্ণিক = নাবিক ; তৈল + ষ্ণিক = তৈলিক ; ইতিহাস + ষ্ণিক = ঐতিহাসিক ; তাম্বুল + ষ্ণিক = তাম্বুলিক ; লোক + ষ্ণিক = লৌকিক (লোক সম্বন্ধীয়) ইত্যাদি।

ষ্ণেয় (এয়)

ভক্ত ও অপত্য অর্থেঃ পুরুষ + ষ্ণেয় = পৌরুষেয় ; অত্রি + ষ্ণেয় = আত্রেয় ; অতিথি + ষ্ণেয় = আতিথেয় (অতিথি-ভক্ত) ; বিমাতৃ + ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয় ; রাধা + ষ্ণেয় = রাধেয় (কর্ণ) ; অগ্নি + ষ্ণেয় = আগ্নেয় (অস্ত্র) ইত্যাদি।

ইমন্ (ইমা)

ভাব অর্থেঃ লঘু + ইমন্ = লঘিমা ; গুরু + ইমন্ = গরিমা ; কাল + ইমন্ = কালিমা নীল + ইমন্ = নীলিমা ; মহৎ + ইমন্ = মহিমা ইত্যাদি।

ইন্ (ঈ), বিন (বী)

আছে এই অর্থেঃ গুণ + ইন্ = গুণী ; কর + ইন্ = করী ; পুষ্কর + ইন্ = পুষ্করিণী (যেখানে পুষ্কর (পদ্ম) আছে) ; মায়া + বিন্ = মায়াবী ; তেজস্ + বিন্ = তেজস্বিন্ > তেজস্বী (তেজস্বিন্ শব্দ) ; যশস্ + বিন্ = যশস্বী ; দুঃখী ; ধনী ; জ্ঞানী ; কৃতী ; স্বদেশী ; মনস্বী ; মেধাবী ; ওজস্বী ইত্যাদি।

ঈয়, ঈন

ভাব ও সম্বন্ধ অর্থেঃ শাস্ত্র + ঈয় = শাস্ত্রীয় ; শরৎ + ঈয় = শারদীয় ; দেশ + ঈয় = দেশীয় ; জাতি + ঈয় = জাতীয় ; রাজন্ + ঈয় = রাজকীয়। তাহার পক্ষে হিতকর এই অর্থে—সর্বাঙ্গ + ঈন = সর্বাঙ্গীন ; সর্বজন + ঈন = সর্বজনীন ইত্যাদি।

ইত

জাতার্থেঃ পুষ্প + ইত = পুষ্পিত ; কুসুম + ইত = কুসুমিত ; ফল + ইত = ফলিত পীড়া + ইত = পীড়িত ; তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত ইত্যাদি।

তা, তর, তম, ইয়সু, ইষ্ঠ (বিশেষণ)

ভাব ও অতিশায়ন অর্থেঃ গুরু + তা = গুরুতা ; এক + তা = একতা ; মহৎ + তম = মহত্তম ; বহু + ঈয়সু (স্ত্রীং ঈপ্) = ভূয়সী ; লঘু + ঈয়স্ = লঘীয়ান্ ; প্রশস্য + ইষ্ঠ = শ্রেষ্ঠ ; বহু + ইষ্ঠ = ভূয়িষ্ঠ ইত্যাদি।

মতুপ্ (মৎ) বতুপ্ (বৎ)

অস্ত্যর্থেঃ 'শ্রী+মতুপ্=শ্রীমান্; বুদ্ধি+মতুপ্=বুদ্ধিমান; জ্ঞান+বতুপ্=জ্ঞানবান্; তেজস্+বতুপ্=তেজস্বান্; মূর্তিমান; ধীমান্; শ্রদ্ধাবান্ ইত্যাদি।

আল, ইল, ল

অস্ত্যর্থেঃ ধার+আল=ধারাল; রস+আল=রসাল; ফেন+ইল=ফেনিল; **প্রয়োগঃ** 'দক্ষিণে অনন্ত নীল **ফেনিল** সাগর' (নবীনচন্দ্র)। পঙ্ক+ইল=পঙ্কিল; পিচ্ছ+ইল=পিচ্ছিল; শ্রী+ইল=শ্রীল; মৃদু+ইল=মৃদুল; শ্যাম+ল=শ্যামল; শীত+ল=শীতল; জটা+ইল=জটিল ইত্যাদি।

প্রয়োগঃ 'লুটিয়ে পড়ে **জটিল** জটা
ঘনপাতায় গহন ঘটা' (রবীন্দ্রনাথ)

আলু, বৎ, চুঞ্চু

আছে ও দক্ষতা অর্থেঃ কৃপা+আলু=কৃপালু; তন্দ্রা+অলু=তন্দ্রালু; জল+বৎ=জলবৎ; পিতৃ+বৎ=পিতৃবৎ; বিদ্যা+চুঞ্চু=বিদ্যাচুঞ্চু ইত্যাদি।

মাত্র, ময়ট্, মিন্

পরিমাণ ও বিকার অর্থেঃ জল+মাত্র=জলমাত্র; বিন্দু+মাত্র=বিন্দুমাত্র; জল+ময়ট্=জলময়; দয়া+ময়ট্=দয়াময়; হিরণ্য+ময়ট্=হিরণ্ময়; স্ব+মিন্=স্বামী; বাচ্+মিন্=বাগ্মী ইত্যাদি।

দা, থাচ্, ধাচ্, উল, ব্য

কাল, প্রকার ও ভ্রাতা অর্থেঃ এক+দা=একদা; সর্ব+থাচ্=সর্বথা; তৎ+থাচ্=তথা; দ্বি+ধাচ্=দ্বিধা; শত+ধাচ্=শতধা; মাতৃ+উল=মাতুল; পিতৃ+ব্য=পিতৃব্য ইত্যাদি।

বিদেশী তদ্ধিত

আনা, আনি

ভাবার্থেঃ গরীব+আনা=গরীবানা; বাবু+আনা=বাবুয়ানা; বিবি+আনা=বিবিয়ানা; বাবু+আনি=বাবুআনি ইত্যাদি।

ওয়ান, ওয়ালা

অস্ত্যর্থে বা **বৃত্ত্যর্থেঃ** গাড়োয়ান; কোচোয়ান; কাবুলি+ওয়ালা=কাবুলিওয়ালা মাছ+ওয়ালা=মাছওয়ালা; রিক্‌শওয়ালা; ফলওয়ালা; দুধওয়ালা; কবিওয়ালা ইত্যাদি।

গর, (কর) গিরি

দক্ষতা অর্থেঃ বাজি+কর=বাজিকর; কারি+গর=কারিগর ইত্যাদি।

ভাবার্থেঃ দালালগিরি; পাণ্ডাগিরি; কেরাণীগিরি; বাবুগিরি; গোয়েন্দাগিরি; ডেপুটিগিরি; রানীগিরি ('রানীগিরির ঠাট'—দেবীচৌধুরাণী)।

দার, দান, দানি

অস্ত্যর্থেঃ পাত্র বা **আধার** অর্থে 'দার', 'দান', 'দানি' প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। যথা—খরিদ+দার=খরিদার; দোকান+দার=দোকানদার; ব্যবসা+দার=ব্যবসাদার; নস্য+দান=নস্যদান; পা+দান=পাদান; আতরদান; ফুল+দানি=ফুলদানি; পা+দানি=পাদানি; পিক+দানি=পিকদানি ইত্যাদি।

বাজ, বাজি

নিপুণ অর্থেঃ চাল+বাজ=চালবাজ; ধড়িবাজ; ধাপ্পাবাজ; চাল+বাজি=চালবাজি; মামলা+বাজি=মামলাবাজি; লাঠি+বাজ=লাঠিবাজ; লাঠি+বাজি লাঠিবাজি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। তদ্ধিত-প্রত্যয় ও তদ্ধিতান্ত শব্দ কাহাকে বলে? একটি সংস্কৃত, দুইটি বাঙলা ও একটি বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয় দ্বারা শব্দ গঠন করিয়া সেই শব্দ অবলম্বনে বাক্য রচনা কর। (ক. বি. ১৯৫০)

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে চারিটির প্রত্যয় নির্ধারণ-পূর্বক অর্থ কর:

মিঠাই, চড়াই, ভিখারী, মাঝারি, ক্ষ্যাপাটে, ভরাটে, আধুলি। (ক. বি. ১৯৪০)

৩। —আই, —আমি, —আল, —আরি, —আলি, —ইয়া —ও, —উ, —ষ্ণ, —ষ্ণেয়, —ষ্ণিক, —মতুপ্, —তর, —তম, —ইষ্ঠ, —খানা, —খোর, —গিরি, —বাজ প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বারা তিনটি করিয়া শব্দ গঠন কর।

৪। নিম্নলিখিত ধাতু ও প্রত্যয়গুলি যোগ করিয়া শব্দ গঠন কর: হন+ত, হন্+ঘঞ, স্থ+অনীয়, স্পৃ+ঘঞ্, বৃৎ+শানচ্, বুধ্+শানচ্, মুচ্+ক্তি, স্থ+তব্য।

৫। প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ কর: মিঠাই, বড়াই, ক্ষ্যাপাটে, মাঝারি, একলা, পাতড়া, ভিখারী, কানাই, চাঁদপানা, চণ্ডুখোর, বৈষ্ণব, বৈদেশিক, ক্ষণমাত্র, বুদ্ধিমান।

৬। তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দগুলি এবং উহারা কিরূপে গঠিত হইয়াছে লিখ:

(ক) বীর্যই সাধুত্ব—দুর্বলতাই মহাপাপ (বিবেকানন্দ)। (খ) স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধর্ম (মধুসূদন)। (গ) সীতার নির্বাসন সামান্য স্ত্রী-বিরোধ নহে (বঙ্কিমচন্দ্র)। (ঘ) আজ দুঃখ-দৈন্যেই আমরা মিলিত হবো, আর ধনের দ্বারা ধনী হবে বিচ্ছিন্ন (রবীন্দ্রনাথ)।

৭। নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির প্রয়োগ দেখাও ও অর্থ নির্দেশ কর: ইমন্, ত্ব, মৎ, গিরি, ওয়ালা, আমি, উয়া, অন্ত, আ (উঃ মাঃ ১৯৬৪)।

চতুর্দশ অধ্যায়

উপসর্গ

এমন কতগুলি অব্যয় আছে যাহারা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হইয়া অর্থকে বিশেষিত করে অথবা অন্য অর্থ প্রকাশ করে অথবা ধাতুকে অনুসরণ করিয়াই অর্থ প্রকাশ করে। সেই সকল অব্যয়কে **উপসর্গ (Preposition)** বলা হয়। বাঙলা শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গ তিন প্রকার। যথা—(ক) সংস্কৃত, (খ) বাঙলা ও (গ) বিদেশী।

সংস্কৃত ব্যাকরণে নিম্নলিখিত কুড়িটি উপসর্গের উল্লেখ আছে। যথা—**প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।**

কাহারও কাহারও মতে উপসর্গগুলি ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের নিজস্ব অর্থ প্রকাশ করে। আবার কাহারও কাহারও মতে উপসর্গগুলি ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া শব্দকে বিচিত্র এবং বিশেষিত করে। যেমন—'প্রহার' শব্দটি 'প্র' উপসর্গ যোগে 'হৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাই বলিয়া 'প্রহার' শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই প্রকৃষ্টভাবে হরণ করা নয়। 'হৃ' ধাতুর অর্থ 'হরণ করা' বা 'চুরি করা'। এইরূপ আহার—খাওয়া; বিহার—ভ্রমণ করা; নীহার—শিশির; সম্‌যোগে—সংহার; উৎ-যোগে—উদ্ধার ইত্যাদি।

খাঁটি বাঙলাতেও উপসর্গের ন্যায় কতকগুলি অব্যয় আছে। তবে এগুলি প্রায়ই ধাতুর সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না বলিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে উপসর্গ বলিতে নারাজ।* আবার কেহ কেহ এগুলিকে বাঙলা উপসর্গও বলিয়াছেন। যাহাই হউক, বাঙলাতে এই জাতীয় অব্যয় বা উপসর্গগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

উপসর্গের অর্থ ঃ প্র—(খ্যাতি, উৎকর্ষ, প্রগতি); পরা (আতিশয্য, বিপরীত); অপ (উল্টা, নিকৃষ্ট); সম্ (সম্যক, সহিত); অনু (বীপ্সা, সম্যক, পশ্চাৎ); উপ (নিকট, সামীপ্য, সাদৃশ্য); অতি (অতিক্রম, অতিশয়); অভি (চতুর্দিক, সর্বদা); অপি (আবরণ); অব (নীচে), আ (সীমা); উৎ (উপরে)।

(ক) সংস্কৃত উপসর্গের প্রয়োগ ঃ

প্র—প্রকার, প্রক্ষেপ, প্রশস্তি, প্রস্থান, প্রপাত। **পরা**—পরাভব, পরাক্রম, পরাজয়, পরামর্শ পরাস্ত। **অপ**—অপনীত, অপমান, অপহ্নুতি, অপলাপ। **সম্**—সংহার, সংসার, সংকট, সংশয়, সংস্কার। **নি**—নিপাত, নিধি, নিগ্রহ, নিধান, নিবাস। **অব**—অবজ্ঞা, অবধান, অবরোধ, অবস্থিত। **অনু**—অনুপাত, অনুরোধ, অনুনয়, অনুকম্পা, অনুগত। **নির্**—(নিঃ)—নির্ধন, নির্ভয়, নির্মাণ, নিরাশ,

---

* অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার 'সরল বাঙলা ব্যাকরণ'-এ বাঙলা উপসর্গগুলির নামকরণ করিয়াছেন 'প্রাক্-সংসর্গ'।

নির্ণয়। **দুর্** (দুঃ)—দুর্গম, দুর্লভ, দুর্নাম, দুর্দান্ত, দুর্দশা। **বি**—বিকার, বিলাপ, বিনয়, বিলয়, বিধান। **অধি**—অধিনেতা, অধিনায়ক, অধিকার, অধিষ্ঠান। **সু**—সুগম সুকর, সুলভ, সুকৃতি, সুকণ্ঠ। **উৎ**—উৎক্ষিপ্ত, উল্লাস, উত্থান, উদ্ধার, উদ্ধত। **পরি**—পরিবার, পরিণয়, পরিণাম, পরিমাণ, পরিহার। **প্রতি**—প্রতিশোধ, প্রতিবাদ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিমা, প্রতিজ্ঞা। **অভি**—অভিলাষ, অভিনয়, অভিবাদন, অভিমান। **অতি**—অতিশয়, অতিরিক্ত, অত্যাচার, অত্যন্ত। **অপি**—বাঙলা ভাষায় অপ্রচলিত। **উপ**—উপদেশ, উপকার, উপহার, উপহাস। **আ**—আবার, আকার, আহার, আকাশ, আচার, আগম, আকাঙ্ক্ষা, আকীর্ণ, আক্রোশ, আকৃষ্ট, আকুঞ্চিত, ইত্যাদি।

(খ) বাঙলা উপসর্গের প্রয়োগ ঃ

অ, আ, অনা—(অভাব, মন্দ, ইত্যাদি অর্থে)—অনামা, অবেলা, অখুসী, অহিসাবী ; আলুনী, আধোয়া, আকাঁটা ; অনামুখ, অনাসৃষ্টি ইত্যাদি।

নির্—(নাই অর্থে)—নিখোঁজ, নিখুঁত, নিলাম, নিটোল, নিখরচা ইত্যাদি।

ভর—(পূর্ণ অর্থে)—ভরপেট, ভরদিন, ভরগাঙ, ভরসাজ ইত্যাদি।

কু—কুচুটে, কু-অভ্যাস, কু-নজর, কু-ডাক, কু-লোক, কু-কথা ইত্যাদি।

সু—(ভাল অর্থে)—সুখবর, সুদিন, সুনজর, সুসময় ইত্যাদি।

হা—(নাই অর্থে)—হাঘরে, হা-ভাতে, হা-পুত, হা-হুতাশ ইত্যাদি।

(গ) বিদেশী উপসর্গের প্রয়োগ ঃ

[১] ফারসী

গর—(না ও বিপরীত অর্থে)—গরহজম, গরমিল, গরকবুল, গরহাজির ইত্যাদি।

ফি—(প্রত্যেক অর্থে)—ফি-বছর, ফি-দিন, ফি-সন ইত্যাদি।

বে—(অভাব অর্থে)—বে-আক্কেল, বে-আইন, বে-গতিক, বে-জোড়, বে-তালা, বে-সামাল, বে-ভাব, বে-আন্দাজ, বে-মালুম, বে-কায়দা, বে-হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

[২] ইংরেজী

হেড—(প্রধান অর্থে)—হেড-মাষ্টার, হেড-ক্লার্ক, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত ইত্যাদি।

হাফ—(অর্ধ অর্থে)—হাফ-নেতা, হাফ-আখড়াই, হাফ-ইস্কুল, হাফ-ডে ইত্যাদি।

সব—(অধীন অর্থে)—সব-ডিপুটি, সব-ইনস্পেক্টর ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। উপসর্গ কাহাকে বলে ? কয়েকটি সংস্কৃত, বাঙলা ও বিদেশী উপসর্গের উদাহরণ দাও।

২। বাঙলা ভাষায় খাটি বাঙলা উপসর্গের ব্যবহার আছে কি ? উদাহরণসহ আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৪৮)

৩। উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয় চারিটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাইয়া দাও। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৪)

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাক্য-প্রকরণ

বাক্য (Sentence)

আমরা কথা বলিবার সময় কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করি। ইহারা একত্র হইয়া আমাদের একটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে। সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশকারী এইরূপ পদসমূহকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে **বাক্য (Sentence)** বলে। বাক্য ভাষায় ব্যবহৃত হইবার পূর্বে তাহার ভাবটি আমাদের মনের মধ্যে একটা রূপ পরিগ্রহ করে। সেই রূপটিকে আমরা ভাষার অবরণে প্রকাশ করি মাত্র।

বাঙলা ভাষায় পদগুলিকে নানাভাবে সাজাইয়া ভাষা নির্ভুলভাবে লিখিতে হইলে বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। যথা—**আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা** ও **আসত্তি**। এই তিনটি অপরিহার্য লক্ষণের কোনটিরই অভাব হইলে পূর্ণাঙ্গ বাক্য হয় না।

আকাঙ্ক্ষা (Expectancy) : বাক্য মাত্রেই একটি সমগ্র অর্থপ্রকাশ করে। এই অর্থ সমগ্ররূপে বুঝিবার জন্য বাক্যের একটি বা একাধিক শব্দ শুনিয়া অন্য শব্দটি শুনিবার জন্য মনে ইচ্ছা জাগে, তাহার নাম **আকাঙ্ক্ষা**। যদি বলি—'তবে এখন' তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না, অন্য পদটির আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু যখনই বলি—'তবে এখন আসি' তাহা হইলে আর কিছু শুনিবার ইচ্ছা থাকে না—বাক্যটি সম্পূর্ণ হইল।

যোগ্যতা (Compatibility) : বাক্য যে সমস্ত পদনিচয় লইয়া গঠিত উহারা পরস্পরের সহায়তায় বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থটি প্রকাশ করে। সুতরাং বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিতে পদসমূহের যে ক্ষমতা তাহাই **যোগ্যতা** নামে অভিহিত। বাক্যের অন্যতম এবং প্রধানতম লক্ষণ যোগ্যতা। বাক্যের অন্তর্গত অর্থযুক্ত পদসমূহ যথাযথ স্থানে বসাইলেও যোগ্যতার অভাবে বাক্য হইতে পারে না। যদি বলি—'গাভীগুলি উড়িতেছে', 'কুকুর কুহু কুহু করিয়া উঠিল' ; এই পদসমষ্টিগুলির কোনটিই বাক্য হয় নাই। কারণ প্রত্যেকটিতে যোগ্যতার অভাব রহিয়াছে। আবার যদি বলা যায় 'মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোলে শরীর দগ্ধ হইয়া গেল।' এখানেও মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোলের ক্ষেত্রে দহনশক্তি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হওয়ায় বাক্যের যোগ্যতা নষ্ট হইল। কিন্তু যদি বলি—'মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইল' তাহা হইলে, বাক্যের পদসমূহের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতা থাকার জন্য উহাকে একটি সুন্দর এবং পূর্ণাঙ্গ বাক্য বলা চলে।

আসত্তি (Juxta-position) : বাক্যার্থ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিবার জন্য বাক্যের অন্তর্গত পদগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে অর্থাৎ পরস্পর নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন করা প্রয়োজন। পদগুলির মধ্যে একটা সম্বন্ধ বর্তমান আছে, উহাদের যদি নৈকট্য অনুসারে

না সাজান হয় তাহা হইলে অর্থবোধে বিলম্ব ঘটে। সুতরাং পদগুলির নৈকট্যানুসারে সংস্থাপনের নামই **অসক্তি**। যদি বলি—'ভাত খাইয়া বিদ্যালয়ে যাও' তাহা হইলে অর্থ বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না বা অর্থ করিতে বিলম্বও হয় না। কিন্তু যদি বলি—'বিদ্যালয়ে খাইয়া ভাত যাও' তাহা হইলে ইহার কোনই অর্থ হয় না। কাজে কাজেই বাক্যে পদ প্রয়োগ করিবার সময় উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ দেখিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

বাক্যে-পদস্থাপনের সাধারণ নিয়ম

বাক্যে কর্তৃপদটি প্রথম ও সমাপিকা ক্রিয়াটি বাক্যের শেষে বসিবে; যদি ক্রিয়াটি সকর্মক হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাহা হইলে তাহা ক্রিয়া পদটির অব্যবহিত পূর্বেই বসিবে। যেমন—আমি তোমাকে একথা বলিয়াছি।

উক্ত বাক্যটির মধ্যে 'আমি' কর্তৃপদ বলিয়া উহা বাক্যের প্রথমেই বসিয়াছে। আবার 'বলিয়াছি' পদটি সমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া উহা বাক্যের শেষভাগে বসিয়াছে। উক্ত বাক্যটি সকর্মক ক্রিয়া বলিয়া উহার কর্ম 'কথা' এই বিশেষ্যপদটি সমাপিকা ক্রিয়াটির অব্যবহিত পূর্বেই বসিয়াছে। কিন্তু এই নিয়ম সর্বত্র খাটে না—নিম্নের বাক্যগুলি লক্ষ্য কর :

"দেখিতে দেখিতে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া আবির্ভূত হইল এক নারীমূর্তি।" "ঘরে কেউ নেই, দরজাটা খোলা খাঁ খাঁ করছে—কেবল বারান্দার এক কোণে শুয়ে রয়েছে একটা কুকুর।" উক্তক্ষেত্রে বাক্য দুইটিতে বাঁধাধরা নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

বাঙলা ভাষায় বাক্যের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য অনেক সময় ক্রিয়াপদটিকে উহ্য রাখা হয়। যেমন—পাড়াগাঁয়ের একটা দৃশ্য। ছোট্ট একখানি গ্রাম। গ্রামে কয়েক ঘর নীচ শ্রেণীর লোকের বাস। তারা অতি দরিদ্র—ক্ষেত খামারের অভাবে, দিন গুজরান দায় ইত্যাদি।

বাক্যে করণ, সম্প্রদানাদি পদের বসিবার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। উহারা কর্মপদের পূর্বে বা পরে কিংবা কখন কখন বাক্যের শেষেও ব্যবহৃত হয়। যেমন—'ছুরি দিয়া সে কলম কাটিতেছে'—ইহা যেমন বলা চলে, তেমন 'কলমটি কাটিতেছে' এ কথা বলিলেও বাক্যের অর্থবোধের কোন অসুবিধা হয় না।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ—**উদ্দেশ্য** ও **বিধেয়**। যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন কিছু বলা হয়, তাহাকে **উদ্দেশ্য** এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যহা বলা হয়, তাহাকে **বিধেয়** বলে। যথা—সরোজিনী সইয়ের বাড়ী আসিল। এই বাক্যের সরোজিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার সইয়ের বাড়ী আসিবার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং 'সরোজিনী' উদ্দেশ্য এবং 'সইয়ের

বাড়ী আসিল' বিধেয়। সেইরূপ—ছেলেটি স্কুলে যাইতেছে; শিক্ষক ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন প্রভৃতি বাক্যে 'ছেলেটি' ও 'শিক্ষক' উদ্দেশ্য এবং 'স্কুলে যাইতেছে' ও 'ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন' বিধেয়।

উদ্দেশ্য	বিধেয়	
'শ্যামলাল	চমকাইয়া উঠিলেন'	(শরৎচন্দ্র)
'সব ছেলে মেয়েরা	মেজখুড়ীমাকে ভালবাসিত'	(শরৎচন্দ্র)
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ	বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।	

আবার একটিমাত্র পদে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় লইয়াও বাক্য গঠিত হইতে পারে। যেমন—'মেয়েটি' 'নাচে'; 'কাক' 'ডাকিতেছে'। প্রয়োজন অনুসারে বাক্যকে প্রসারিত করিতে আমরা উদ্দেশ্য কিংবা বিধেয়কে সম্প্রসারণ করি। যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি উদ্দেশ্য বা বিধেয়কে সম্প্রসারণ করে তাহাকে বা তাহাদিগকে উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের সম্প্রসারক, প্রসারক বা বিবর্ধক বলে।

(১) উদ্দেশ্যের প্রসারবিধি:

(ক) **বিশেষণপদ যোগে:** শীত পড়িয়াছে—'ভীষণ' শীত পড়িয়াছে; রাম বনে গমন করিলেন—'পিতৃভক্ত' রাম বনে গমন করিলেন; ছেলেটি পড়াশুনা করে—'শান্ত' ছেলেটি পড়াশুনা করে; রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন—'প্রতিভাশালী' রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ইত্যাদি।

(খ) **বিশেষণস্থানীয় বাক্যযোগে:** 'ছোট ছোট ভাইবোনকে সঙ্গে লইয়া' শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবন্ত ও পাড়ার মিত্রদের শান্ত ছেলেটি পড়াশুনা করে।

(গ) **বিশেষণস্থানীয় পদসমষ্টি-যোগে:** 'বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'নানা শাস্ত্রে পারদর্শী' কলিকাতায় ঠাকুর বংশের সুসন্তান প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

(ঘ) **সম্বন্ধপদ-যোগে:** 'অযোধ্যার রাজা' দশরথের পুত্র পিতৃভক্ত রাম বনে গমন করিলেন। 'কলিকাতার' ঠাকুরবংশের সুসন্তান প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

(ঙ) **সমকারকপদ-যোগে:** 'দশরথের পুত্র' পিতৃভক্ত রাম বনে গমন করিলেন। 'ঠাকুর বংশের সুসন্তান' প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

(২) বিধেয়ের প্রসারবিধি:

(ক) **ক্রিয়াবিশেষণ-যোগে:** ছেলেটি 'উচ্চৈঃস্বরে' পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিভাবলে' নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

(খ) ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় বাক্যাংশ-যোগে: মিত্রদের ছেলেটি 'ভাইবোনের সহিত' একসঙ্গে বসিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে পড়াশুনা করে। রবীন্দ্রনাথ "পৃথিবীর কবিদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া' অসাধারণ প্রতিভাবলে সুপ্রসিদ্ধ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

(গ) বিশেষণের বিশেষণ-যোগে: রাম 'অত্যন্ত' প্রফুল্লচিত্তে বনে গমন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'অসাধারণ' প্রতিভাবলে 'সু-প্রসিদ্ধ' নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

(ঘ) সম্বন্ধপদ-যোগে: রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবিদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া অসাধারণ প্রতিভালে 'ইউরোপের' পুরস্কার বিতরণী সভা হইতে সুপ্রসিদ্ধ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

(ঙ) দ্বিরুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে: সে 'কাঁদিয়া কাঁদিয়া' বলিল ; আমি 'হাসিতে হাসিতে' কথাটা বলিয়াছি।

অনুশীলনী

১। বাক্য কাহাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। বাক্যের লক্ষণ কি কি?

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বিশ্লেষণ কর:

(ক) 'সময়ের কোনও পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনও অন্ত নাই।' (রবীন্দ্রনাথ)

(খ) 'নাইতে যাব, আর ফিরে আসব না।' (শরৎচন্দ্র)

৪। সংজ্ঞা নির্দেশ কর ও উদাহরণ দাও: যোগ্যতা, আসত্তি ও আকাঙ্ক্ষা।

৫। বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় কাহাকে বলে? নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যে-কোন দুইটির বিধেয় সম্প্রসারিত কর:

শরৎবাবু আজ বক্তৃতা করিবেন। 'দাও ফিরে সে অরণ্য'। কৃষক ধান কাটিতেছে। বর্ষামঙ্গল অভিনীত হইবে। রাজবাড়ীর মঠ বন্ধ হইয়াছে। (ক. বি. ১৯৪৮)

৬। উদ্দেশ্য সম্প্রসারণ কি? এক একটি বাক্য গঠন করিয়া উদ্দেশ্য সম্প্রসারণ কর।

৭। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ প্রভৃতি যোগে নিম্নলিখিত বাক্য দুইটিকে বর্ধিত কর।

(ক) ছেলেটি পড়াশুনা করে। (খ) কুসুম শোভা পাইতেছে।

৮। নিম্নলিখিত শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি বিধেয়ের প্রসারকরূপে ব্যবহার কর:
যেমন করিয়া পার ; স্বহস্তে ; ধীরে ধীরে ; অতিক্রম করিয়া; ধরিতে ধরিতে ; 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু।'

ষোড়শ অধ্যায়

বাক্যের প্রকার ভেদ

গঠন প্রণালীর দিক হইতে বাক্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—(১) সরল বাক্য, (২) যৌগিক বাক্য ও (৩) মিশ্র বা জটিল বাক্য।

(১) সরল বাক্যঃ যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য (কর্তা) ও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহাকে **সরল বাক্য** (Simple Sentence) বলে। যথা—বালকেরা খেলে; 'রাম আবার বৌদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল।' (শরৎচন্দ্র)

(২) যৌগিক বাক্যঃ যে বাক্য দুই বা ততোধিক নিরপেক্ষ বাক্য এবং সেই নিরপেক্ষ বাক্যগুলি 'ও', 'এবং', 'কিন্তু', 'সুতরাং', 'অতএব' প্রভৃতি অনপেক্ষসূচক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হয়, তাহাকে **যৌগিক বাক্য** (Compound Sentence) বলে। যথা—তুমি কষ্ট করিয়াছ সুতরাং পুরস্কার পাইবে। 'রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি কম ছিল না।' (শরৎচন্দ্র)। 'নারায়ণী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন এবং সংসার আবার পূর্বের মত চলিতে লাগিল।' (শরৎচন্দ্র)

(৩) মিশ্র বা জটিল বাক্যঃ যে বাক্যে একটি প্রধান এবং এক বা একাধিক অপ্রধান উপাদান বাক্য বা বাক্যাংশ থাকে, তাহাকে **মিশ্র** বা **জটিল বাক্য** (Complex Sentence) বলে। জটিল বাক্যের যে অংশে মূল বক্তব্য বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহাকে প্রধান বাক্য বলে। আর যে অংশ প্রধান বাক্যেরই অংশীভূত হয়, তাহাকে উপাদান বাক্য বলে। এই বাক্যে 'যে', 'যাহা', 'যদি', 'যেমন', 'যেহেতু' 'কারণ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—'যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার, তবে লইও।' (রবীন্দ্রনাথ)। 'সেদিন তোরা টের পাবি, যেদিন আমি আর ফিরিব না।' (শরৎচন্দ্র)

উপাদান বাক্যঃ যে বাক্যগুলি লইয়া একটি পূর্ণ যৌগিক এবং জটিল বাক্য গঠিত হয়, তাহাদিগকে **উপাদান বাক্য** (Clause) বলে।* উপাদান বাক্য দুই প্রকার—(১) নিরপেক্ষ উপাদান (Co-ordinate Clause) এবং (২) সাপেক্ষ বা অপ্রধান উপাদান (Sub-ordinate Clause) বাক্য। যৌগিক বাক্যের উপাদান বাক্যগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ থাকে; আর জটিল বাক্যের একটি প্রধান উপাদান বাক্য (Principal Clause) এবং এক বা একাধিক অপ্রধান উপাদান বাক্য থাকে।

---

* উপাদান বাক্যকে কেহ 'আনুষঙ্গিক' আবার কেহ কেহ বা 'অনুবন্ধি' বাক্যও বলিয়াছেন। এই উভয় শব্দেই Sub-ordinate Clause-এর ধ্বনি আসে।

অপ্রধান উপাদান বাক্যকে আবার নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) বিশেষ্যস্থানীয় উপাদান বাক্য, (২) বিশেষণস্থানীয় উপাদান বাক্য এবং (৩) ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় উপাদান বাক্য।

(১) **বিশেষ্যস্থানীয় উপাদানবাক্যঃ** যে উপাদান বাক্য বিশেষ্যপদের মত ব্যবহৃত হয় এবং প্রধান বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের সহিত অন্বিত হয়, তাহাকে **বিশেষ্যস্থানীয় উপাদান বাক্য (Noun Clause)** বলে। যথা—আমি জানি, তুমি আজ আসিবে। 'তুমি আজ আসিবে' উপাদান বাক্য বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত 'জানি' ক্রিয়ার কর্ম। এইরূপ—'কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। (রবীন্দ্রনাথ)

(২) **বিশেষণস্থানীয় উপাদান বাক্যঃ** যে উপাদান বাক্য বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যের অন্তর্গত কোন পদকে বিশেষিত করে, তাহাকে **বিশেষণ-স্থানীয় উপাদান বাক্য (Abjective Clause)** বলে। যথা—'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই।' এই বাক্যটিতে 'যাহা চাই' এই অংশটি 'তাহা' পদের বিশেষণ। 'যে এইরূপ, ভূমিখণ্ড নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাস ছিল।' (বঙ্কিমচন্দ্র)

(৩) **ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় উপাদান বাক্যঃ** যে উপাদান বাক্য ক্রিয়া-বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয় এবং প্রধান বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়ার প্রকার, হেতু, স্থান ও সময় বিশেষিত করে, তাহাকে **ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় উপাদান বাক্য (Adverbial Clause)** বলে। যথা—'যে যেমন কর্ম করে, তেমন সে ফল পায় তার।' (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার) এই বাক্যে 'তেমন সে ফল পায় তা'র' ক্রিয়ার বিশেষণ।

অনুশীলনী

১। গঠন প্রণালীর দিক হইতে বাক্যকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ?

২। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি কিরূপ বাক্য কারণসহ উল্লেখ কর :—

(ক) সত্য কথা বল তোমাকে কিছু বলিব না।

(খ) তিনি শিক্ষিত, কিন্তু বড়ই অহঙ্কারী।

(গ) "দেখ এই চরাচরে যে যেমন কর্ম করে
তেমন সে ফল পায় তা'র।" (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৩। অপ্রধান উপাদান বাক্য কয় প্রকার ?

৪। নিম্নের বাক্যগুলি কোন্‌টি কিরূপ উপাদান বাক্য নির্দেশ কর :—

(ক) "কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে" (রবীন্দ্রনাথ)

(খ) "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।" (রবীন্দ্রনাথ)

সপ্তদশ অধ্যায়
বাক্য-বিশ্লেষণ

বাক্যের অন্তর্গত উদ্দেশ্য ও বিধেয়মূলক বিভিন্ন অংশকে পৃথক পৃথক করিয়া বিচার করাকে **বাক্য-বিশ্লেষণ** (**Analysis of Sentences**) বলে। বাক্য-বিশ্লেষণ করিতে হইলে বাক্যটি সরল, মিশ্র, কি যৌগিক তাহা উল্লেখ করিতে হয়।

(১) সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

সরল বাক্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে—প্রথমতঃ, উহার উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক, বিধেয় ও বিধেয়ের সম্প্রসারক অংশের করিবে। মনে রাখিবে উদ্দেশ্য বলিতে কর্তৃপদ, কর্তৃপদের বিশেষণ, সম্বন্ধপদ এবং বিশেষণস্থানীয় পদসমষ্টি বুঝায় এবং বিধেয় বলিতে ক্রিয়াপদ, কর্মপদ, কর্মের বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ও বিধেয় বুঝায়। উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক বলিতে উদ্দেশ্যের অন্তর্গত কর্তৃপদ ভিন্ন সমস্ত অংশকে এবং বিধেয়ের সম্প্রসারক বলিতে বিধেয়ের অন্তর্গত সমাপিকা ক্রিয়া ব্যতীত অন্য যাবতীয় অংশকে বুঝায়। উদ্দেশ্যকে উদ্দেশ্যে স্থানে, উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক অংশগুলিকে উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক স্থানে মূল বিধেয় বা সমাপিকা ক্রিয়াকে বিধেয় স্থানে ও বিধেয়ের অংশগুলিকে বিধেয়ের সম্প্রসারক স্থানে স্থাপন করিতে হয়। নিম্নের উদাহরণগুলি লক্ষ্য কর:

(১) 'রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল।' (বঙ্কিমচন্দ্র)
(২) 'দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া জঙ্গলের মধ্যে ছুড়িয়া দিল।' (বিভূতিভূষণ)
(৩) 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।' (রবীন্দ্রনাথ)
(৪) 'সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল।' (শরৎচন্দ্র)

বাক্য	উদ্দেশ্য		বিধেয়			
	কর্তা	কর্তার প্রসারক	সমাপিকা ক্রিয়া	বিশেষণসহ কর্ম	বিশেষণসহ পরিপূরক	সমাপিকা ক্রিয়ার প্রসারক
১	বালিকা	রাধারাণী নামে এক	গিয়াছিল			(ক) মাহেশে (খ) রথ দেখতে
২	দুর্গা		ছুঁড়িয়া দিল	মালাটা খালি		(ক) জঙ্গলের মধ্য (খ) একটান মারিয়া
৩	মেঘ		গরজে			(ক) গগনে গগনে (খ) গুমরি গুমরি (গ) গুরু গুরু
৪	স্টেজটা	সমস্ত	দুলিয়া উঠিল			(ক) মড় মড় করিয়া (খ) কাঁপিয়া

(২) মিশ্র বাক্য-বিশ্লেষণ

মিশ্র বাক্যের মধ্যে একটি **প্রধান** বাক্য ও এক বা একাধিক **অপ্রধান** বাক্য থাকিতে পারে। এই অপ্রধান বাক্যগুলি **তিন** প্রকার। যথা—**বিশেষ্য-স্থানীয়, বিশেষণ-স্থানীয়** ও **বিশেষণের বিশেষণ** বা **ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয়**।

মিশ্র বাক্য-বিশ্লেষণের সময় নিম্নের নিয়মানুসারে বিশ্লেষণ করিতে হয়। যথা—

(ক) প্রধান বাক্যটি নির্দেশ করা।

(খ) অপ্রধান বাক্যগুলি পৃথক্ নির্দেশ করিয়া তাহাদের সহিত প্রধান বাক্যের সম্বন্ধ স্থির করা।

(গ) প্রধান ও অপ্রধান বাক্যের মধ্যে কোন সংযোজক পদ থাকিলে তাহার উল্লেখ করা।

উদাহরণ

(১) যাহারা পরশ্রীকাতর, তাহারা উন্নতি করিতে পারে না।

প্রধান বাক্য—তাহারা উন্নতি করিতে পারে না। কর্তা—'তাহারা'।

অপ্রধান বাক্য—যাহারা পরশ্রীকাতর। (বিশেষণ-স্থানীয়, 'তাহারা' এই পদের বিশেষণ কর্তা)।

সংযোজক পদ নাই।

(২) মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"না, যাইব না।" (রবীন্দ্রনাথ)

প্রধান বাক্য—মৃত্যুঞ্জয় কহিল।

অপ্রধান বাক্য—না, যাইব না। (বিশেষ্য-স্থানীয়, 'কহিল' ক্রিয়ার কর্ম। কর্তা 'আমি' লুপ্ত)।

সংযোজক পদ নাই।

(৩) হাতে ব্যথা হইয়াছে, এইজন্য আমি লিখিতে পারিব না।

প্রধান বাক্য—আমি লিখিতে পারিব না।

অপ্রধান বাক্য—হাতে ব্যথা হইয়াছে। (ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয়, 'লিখিতে পারিব না' এই ক্রিয়ার বিশেষণ)।

সংযোজক পদ—এইজন্য।

(৪) তুমি আমাকে যতটা হীন মনে কর, বাস্তবিক আমি ততটা হীন নহি।

প্রধান বাক্য—বাস্তবিক আমি ততটা হীন নহি।

অপ্রধান বাক্য—তুমি আমাকে যতটা হীন মনে কর। (বিশেষণের বিশেষণ-স্থানীয়, 'ততটা' এই বিশেষণের বিশেষণ)।

সংযোজক পদ—যতটা···ততটা।

(৩) যৌগিক বাক্য-বিশ্লেষণ

যৌগিক বাক্যে দুই বা ততোধিক নিরপেক্ষ বাক্য এবং এক বা একাধিক সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত বা বিযুক্ত থাকে।

যৌগিক বাক্য-বিশ্লেষণ করিতে হইলে নিম্নের নিয়মানুসারে করিতে হয়। যথা—

(ক) প্রত্যেক নিরপেক্ষ বাক্যকে পৃথকভাবে নির্দেশ করা।

(খ) বাক্যগুলির কর্তা বা ক্রিয়া উহ্য থাকিলে তাহা নির্দেশ করা।

(গ) সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়গুলি নির্দেশ করা।

উদাহরণ

"আচ্ছা আমি আর কিছু বলব না, কিন্তু ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে ?"

(শরৎচন্দ্র)

দুইটি নিরপেক্ষ বাক্য { (১) আচ্ছা আমি আর ব'ল্‌ব না। (২) ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে ?

বিয়োজক অব্যয়—কিন্তু।

বাক্য-পরিবর্তন

বাক্যের অর্থের কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীর বাক্যে পরিবর্তিত করার নাম **বাক্য-পরিবর্তন**। বাক্যের রূপান্তর সাধারণতঃ বাক্যাংশের পরিবর্ধন বা সংকোচনের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

(১) সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন

সরল বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ বা পদসমষ্টিকে আনুষঙ্গিক বাক্যে পরিণত করিলে বাক্যটি জটিল বাক্যে পরিণত হয়। যথা—

সরল বাক্য—সকলে বিদ্বান ব্যক্তির আদর করে।

জটিল বাক্য—যে ব্যক্তির বিদ্যা আছে, সকলে তাহার আদর করে।

সরল বাক্য—পুত্রকে নিরপরাধ দেখিতে পাইয়া পিতার চিন্তা দূর হইল।

জটিল বাক্য—যখন পুত্রকে নিরপরাধ দেখিলেন, তখন পিতার চিন্তা দূর হইল।

সরল বাক্য—"সুদূর অন্ধকার হইতে একটা সুদূর মঙ্গলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল।" (রবীন্দ্রনাথ)

জটিল বাক্য—সুদূর অন্ধকার হইতে এমন একটা বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল, যাহা সুদূরে মঙ্গলধারা বর্ষণ করিতেছিল।

সরল বাক্য—মাতা-পিতার আদেশ আমাদের পালন করা কর্তব্য।

জটিল বাক্য—মাতা-পিতা যাহা আদেশ করিবেন, তাহা আমাদের পালন করা কর্তব্য।

(২) জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

জটিল বাক্যের অন্তর্গত কোন এক অপ্রধান উপাদান বাক্যকে কোন একটি পদ বা বাক্যাংশে পরিবর্তিত করিয়া অথবা বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদে পরিবর্তিত করিয়া সরল বাক্যে পরিণত করা হয়। কোন কোন স্থলে 'বশতঃ', 'হেতু', 'নিবন্ধন' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়া অপেক্ষাসূচক পদগুলি তুলিয়া দিতে হয়। যথা—

জটিল বাক্য—যে ব্যক্তির বুদ্ধি আছে সে এমন কাজ করিবে না।

সরল বাক্য—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এমন কাজ করিবে না।

জটিল বাক্য—কেন বিস্মৃত হইলাম বুঝিতে পারিতেছি না।

সরল বাক্য—বিস্মৃতির কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।

জটিল বাক্য—যে বইখানি আমি কিনিয়াছি তাহা আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।
(ক. বি. ১৯৪৫)

সরল বাক্য—আমার কেনা বইখানি আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।

(৩) সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

সরল বাক্যের অন্তর্গত কোনও পদ বা পদসমষ্টিকে একটি নিরপেক্ষ উপাদান বাক্যে পরিণত করিয়া সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করা হয়। পরিবর্তিত বাক্যটিতে প্রয়োজন মত অপেক্ষাসূচক, সংযোজক, বিয়োজক বা নিমিত্তবোধক অব্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা—

সরল বাক্য—দুর্বলতাবশতঃ আমি সেখানে যাইতে পারি নাই।

যৌগিক বাক্য—আমি দুর্বল ছিলাম বলিয়া সেখানে যাইতে পারি নাই।

সরল বাক্য—বিদ্যালয়ে যাইলে তাহার সহিত দেখা করিও।

যৌগিক বাক্য—যদি বিদ্যালয়ে যাও তাহা হইলে তাহার সহিত দেখা করিও।

সরল বাক্য—উন্নতিলাভ করিতে হইলে পরিশ্রম করিতে অভ্যাস কর।

যৌগিক বাক্য—পরিশ্রম করিতে অভ্যাস কর উন্নতিলাভ করিবে।

সরল বাক্য—সৎকার্য করিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে।

যৌগিক বাক্য—সৎকার্য কর, আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে।

(৪) যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত সংযোজক অব্যয়গুলি তুলিয়া একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া রাখিয়া অন্যগুলিকে সমাপিকা ক্রিয়া বা ভাব-বিশেষ্যে পরিণত করিতে হয়। যথা—

যৌগিক বাক্য—তিনি ক্রুদ্ধ হন বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ ক্রোধ থাকে না। (ক. বি. ১৯৪৫)

সরল বাক্য—তিনি ক্রুদ্ধ হইলেও অধিকক্ষণ তাঁহার ক্রোধ থাকে না।

যৌগিক বাক্য—আমি অঙ্কটি কষিতে পারি নাই কিন্তু তুমি পারিবে।

সরল বাক্য—আমি অঙ্কটি কষিতে না পারিলেও তুমি পারিবে।

যৌগিক বাক্য—সে দোষ করে নাই, তথাপি তাহার শাস্তি হইল।

সরল বাক্য—বিনা দোষেই তাহার শাস্তি হইল।

সরল বাক্য—এই প্রস্তাব একজন ব্যতীত সকলেই সমর্থন করিল।

যৌগিক বাক্য—এই প্রস্তাব সকলে সমর্থন করিল, কিন্তু একজন করিল না।

(৫) জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করিতে হইলে জটিল বাক্যের অন্তর্গত একটি অপ্রধান বাক্যকে প্রধান উপাদান বাক্যে পরিণত করিয়া যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করা যায়। যথা—

জটিল বাক্য—যে লোকটি চলিয়া গিয়াছিল সে আবার আসিয়াছে।

যৌগিক বাক্য—লোকটি চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু আবার আসিয়াছে।

জটিল বাক্য—যদি তুমি স্কুলে না যাও তাহা হইলে শাস্তি পাইবে।

যৌগিক বাক্য—স্কুলে যাও নতুবা শাস্তি পাইবে।

জটিল বাক্য—যদি সুখী হইতে চাও, তবে মাতাপিতাকে ভক্তি কর।

যৌগিক বাক্য—মাতাপিতাকে ভক্তি কর সুখী হইবে।

জটিল বাক্য—আশুতোষ যে কর্মীপুরুষ ছিলেন, সকলেই এ কথা স্বীকার করেন।

যৌগিক বাক্য—আশুতোষ কর্মীপুরুষ ছিলেন সকলেই এ কথা স্বীকার করেন।

(৬) যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত প্রধান বাক্যগুলির মধ্যে একটি ব্যতীত অন্যগুলিকে অপ্রধান বাক্যে পরিণত করিলে উহা জটিল বাক্যে পরিবর্তিত হয়। যথা——

যৌগিক বাক্য—সে ধনী বটে কিন্তু তাহার অহঙ্কার নাই।

জটিল বাক্য—যদিও সে ধনী তবুও তাহার অহঙ্কার নাই।

যৌগিক বাক্য—সত্য কথা বল, তোমার ভয় থাকিবে না।

জটিল বাক্য—যদি সত্য কথা বল তাহা হইলে তোমার ভয় থাকিবে না।

যৌগিক বাক্য—তিনি বিদ্বান তাহার অহঙ্কার নাই।

জটিল বাক্য—যদিও তিনি বিদ্বান তথাপি তাঁহার অহঙ্কার নাই।

যৌগিক বাক্য—সেদিন আর নাই কিন্তু সে স্মৃতি আছে।

জটিল বাক্য—সেদিন যদিও আর নাই, তবু সে স্মৃতি আছে।

বিভিন্ন ধরণের বাক্য

অর্থানুসারে বাক্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(১) **অস্ত্যর্থক** (**Affirmative**)

(২) **নাস্ত্যর্থক** (**Negative**)

(৩) **প্রশ্নসূচক** (**Interrogative**)

(৪) **অনুজ্ঞাসূচক** (**Imperative**)

(৫) **ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক** (**Optative**)

(৬) **উচ্ছ্বাসাত্মক বা বিস্ময়াদিবোধক** (**Exclamatory**)

(১) **অস্ত্যর্থক বাক্য :** যে বাক্যে কোন কিছু নির্দেশ করে, তাহাকে অস্ত্যর্থক বাক্য বলে। যথা—'দা' ঠাকুরের হোটেলে একটা হরিসঙ্কীর্তনের দল ছিল ; তিনি পুণ্য-সঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে তথায় আসিয়া থাকিতেন' (শরৎচন্দ্র)

নাস্ত্যর্থক বাক্য : নঞর্থক পদ দ্বারা নাস্ত্যর্থক ব্রাক্য গঠিত হয়। যথা—এমন দিন চিরকাল যাইবে না ; এমন লোক নাই যে স্বদেশকে ভাল না বাসে ; 'রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না।' (শরৎচন্দ্র)

(৩) **প্রশ্নসূচক বাক্য :** যে বাক্যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা বুঝায়, তাহাকে প্রশ্ন-সূচক বাক্য বলে। যথা—তোমার কি এই কাজ করা উচিত হইয়াছে ? 'ওগো সন্ন্যাসী ঠাকুর আছ কি ?' (রবীন্দ্রনাথ)

(৪) **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য :** যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, উপদেশ প্রভৃতি বুঝায়, তাহাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যথা—'জয় হোক মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী, দীন ভৃত্যে করো দয়া'। (রবীন্দ্রনাথ)

(৫) **ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য :** যে বাক্যে বক্তা কোন কিছু প্রার্থনা করে অথবা স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করে, তাহাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যথা—পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন ; 'আমায় দে মা তবিলদারী'। (রামপ্রসাদ)

(৬) **উচ্ছ্বাসাত্মক বা বিস্ময়াদিবোধক বাক্য :** যে বাক্যে হর্ষ, বিস্ময়, ঘৃণা, দুঃখ, শোক, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি মনের ভাব ব্যক্ত হয়, তাহাকে উচ্ছ্বাসাত্মক বা বিস্ময়াদি-বোধক বাক্য বলে। যথা—

'কি বিচিত্র এই দেশ !' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

'হে মহান্ ! হে চির-বিরহী !
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার !' (নজরুল)

অর্থের গঠনভঙ্গীতে বাক্যান্তরীকরণ

নাস্ত্যর্থক বাক্য	অস্ত্যর্থক বাক্য
মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না	মিথ্যাবাদী সকলেরই অবিশ্বাসের পাত্র।
গতমাস হইতে সে কাজ করে না।	গতমাস হইতে সে কাজ ছাড়া।
অলস লোক হিমালয় আরোহণ করিতে কিছুতেই পারিবে না	অলস লোকের পক্ষে হিমালয় আরোহণ সাধ্যাতীত।
অনুজ্ঞাসূচক বাক্য	**অস্ত্যর্থক বাক্য**
বাজারে যাও	তোমাক বাজারে যাইতে বলা হইতেছে।
ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য	**অস্ত্যর্থক বাক্য**
জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।	জগদীশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।
তাহার যেন রোগ-মুক্ত হয়।	তাহার রোগ-মুক্তি কামনা করিতেছি।
ভাববাচক বাক্য	**অস্ত্যর্থক বাক্য**
আহা! কি সুন্দর এই উদ্যান!	এই উদ্যান অত্যন্ত সুন্দর।
ওহো! মৃত্যু কি মর্মস্পর্শী দৃশ্য!	মৃত্যু অত্যন্ত মর্মস্পর্শী দৃশ্য।
অনুজ্ঞাসূচক বাক্য	**নাস্ত্যর্থক বাক্য**
এখনই বিদ্যালয়ে যাও	এখনই বিদ্যালয়ে না গেলে চলিবে না।
ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য	**নাস্ত্যর্থক বাক্য**
আপনার ক্রম উন্নতি হউক।	আপনার ক্রম অবনতি না হইয়া ক্রম উন্নতি কামনা করিতেছি

[১] বাক্য-সংযোজন

অর্থের কোনরূপ ব্যতিক্রম না করিয়া দুই বা ততোধিক বাক্য লইয়া একটিমাত্র সরল, জটিল বা যৌগিক বাক্য রচনা করাকে **বাক্য-সংযোজন** (**Combination of Seutences**) বলে।

সাধারণতঃ একটি ব্যতীত অপর সকল বাক্যগুলির সমাপিকা ক্রিয়াকে সুবিধামত অসমাপিকা ক্রিয়া, ভাববিশেষ্য, বিশেষণস্থানীয় পদসমষ্টি, ক্রিয়াবিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় পদসমষ্টি বা একপদে পরিণত করিয়া বাক্য-সংযোজন করিতে হয়। নিম্নে বাক্য-সংযোজনের উদাহরণ দেওয়া হইল :

বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী : 'বাঙলা ভাষায় 'মেঘনাদবধ' একখানি মহাকাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার রচয়িতা। তিনি এই কাব্য লিখিয়া বাঙলা ভাষা-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছেন।

সংযুক্ত বাক্য : মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ' নামক মহাকাব্য রচনা করিয়া বাঙলা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছেন।

বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী : এখানে এক দিবস লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। ইহার কারণ অতিশয় গ্রীষ্ম। সেই গ্রীষ্ম দুঃখের সহিত সহ্য করা যায়। তখন সায়ংকাল। যমুনাতীরে উপবেশন করিলাম। লহরী-লীলা সুললিত ছিল।

সংযুক্তবাক্য : "এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয়প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্বক সুললিত লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম।" (অক্ষয়কুমার দত্ত)

[২] বাক্য-বিয়োজন

অর্থের কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্যকে, সরল ও ক্ষুদ্রতর বাক্য দ্বারা প্রকাশ করাকে **বাক্য-বিয়োজন (Resolution of Sentences)** বলে। যথা—

বিচ্ছিন্ন বাক্য : "এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি ; এই গিরির শিখরদেশ জলধরপটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত : অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বনপাদপ-সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

সরল বাক্যাবলী : এই সেই প্রস্রবণগিরি। ইহা জনস্থানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার চূড়ায় নিরন্তর নিবিড় মেঘসমূহে অলঙ্কৃত। কারণ জলধরপটল ইহার সহিত সংযুক্ত ; অধিত্যকা প্রদেশ নানাপ্রকার বন্য বৃক্ষে আচ্ছন্ন। সেই বৃক্ষসমূহ ঘনভাবে অবস্থিত। এইজন্য ঐ স্থানটি সকল সময়ই স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়। পাদদেশে গোদাবরী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার জল নির্মল। ইহার বেগ প্রবল। উহাতে ঢেউ উঠিয়াছে।

বিচ্ছিন্ন বাক্য : 'মানুষ যদি খাইতে না পায়, রোগজীর্ণ দুর্বল দেহ যদি স্বাস্থ্যের আনন্দ অনেক দিন ধরিয়া আস্বাদন না করে, তাহার মুখের হাসি যদি না ফুটিতেই মিলাইয়া যায়, তবে বিষাদক্লিষ্ট দেহভার সে আর কতদিন বহন করিতে পারিবে ?' (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র)

সরল বাক্যাবলী : মানুষ খাইতে না পারিলে দুর্বল হয়। তাহাদের দেহ রোগে জীর্ণ হয়। সে স্বাস্থ্যের আনন্দ ভোগ করিতে পারে না। তাহার মুখে হাসি না ফুটিতেই মিলাইয়া যায়। তাহার দেহ বিষাদে ক্লিষ্ট। তাহার নিকট উহা ভারস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। এরূপ অবস্থায় আর কতদিন উহা সে বহন করিতে পারিবে ?

অনুশীলনী

১। বাক্য-বিশ্লেষণ বলিতে যাহা বুঝায় দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। সরল ও জটিলবাক্য সংবলিত একটি যৌগিক বাক্য রচনা করিয়া তাহার অন্তর্গত সরল ও জটিল বাক্যের অংশগুলি দেখাও। এই ত্রিবিধ বাক্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২)

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বিশ্লেষণ কর :—

(১) 'জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে, নিস্তরঙ্গ।' (বঙ্কিমচন্দ্র) (২) 'মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না।' (রবীন্দ্রনাথ) (৩) 'এক্ষণে আজি নিজ বৃদ্ধ, কাজেই অধিকাংশ বৃদ্ধকেই সুন্দর দেখি।' (সঞ্জীবচন্দ্র) (৪) 'তাঁহার জননী অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের দুহিতা ছিলেন।' (দীনেশচন্দ্র সেন) (৬) 'দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার, তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো' (প্রভাত মুখোপাধ্যায়) (৭) 'যখন আমার পালামৌ যাওয়া স্থির হইল, তখন আমি ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম।' (সঞ্জীবচন্দ্র) (৮) 'মাষ্টারমশাই বলেছেন অশ্বত্থের ছাওয়া খুব ভাল। বেড়া দিতে হবে, নইলে গরু-বাছুরে চারা গাছকে খেয়ে ফেলবে।' (শরৎচন্দ্র)

৪। অস্ত্যর্থক, অনুজ্ঞাসূচক ও উচ্ছ্বাসাত্মক বাক্যের উদাহরণ দাও।

৫। বাক্য-সংযোজন কাহাকে বলে ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৬। নিম্নলিখিত প্রত্যেকটির অংশের বাক্যগুলিকে সংযুক্ত করিয়া এক-একটি বাক্যে পরিণত কর :—

(ক) বঙ্গদেশে কোন এক গ্রাম ছিল। তথায় এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তজ্জন্য যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর মৃতুকালে স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে যে সকল কথা বলিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। (ক. বি. ১৯৪১)

(খ) 'ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যামিতি শিখাইয়া, এত কোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত বিকাশ স্ব স্ব কার্যে দক্ষতা, কর্তব্যকার্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদের এমনি এইটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না; এবং রামমোহন রায় হইতে কটিকচাঁদ এস্কোয়ার পর্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজীনবীশ সে বিষয়ে কথা কহিয়াছেন।' (বঙ্কিমচন্দ্র)

(গ) তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহুদূরে; অন্ধকার বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কিনা, তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় সুখী হইল। (ক. বিঁ. ১৯৪০)

৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে যতগুলি সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে প্রকাশ কর :—

(ক) 'প্রথমে শ্যামলাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে একটু একটু করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হইয়া অর্ধভুক্ত অন্ন ফেলিয়া রাগিয়া উঠিয়া গেলেন।' (শরৎচন্দ্র)

(খ) 'তারপর চারণীর সামনে একবার পিদিম নেড়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে গোটাকতক প্রসাদী গাঁদাফুল চারপুত্রের মাথার পাগড়িতে গুঁজে দিয়ে বললেন "রাজকুমারেরা একটা ইতিহাস বলি শোন—পূর্বকালে উজ্জয়িনী নগরে একদিন মহারাজা বিক্রমাদিত্য রাজসভা ছেড়ে অন্দরে গিয়ে জলযোগ করতে বসবেন এমন সময় লক্ষ্মী-সরস্বতী বিরোধ করতে করতে সেখানে উপস্থিত! মহারাজা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে বললেন 'দেবি আপনাদের কি প্রয়োজনে আগমন, দাসকে বলুন।' দুইজনেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন 'বৎস বিক্রমাদিত্য তুমি তো রাজা বিচার কর দেখি আমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়?' (অবনীন্দ্রনাথ)

(গ) 'নবশ্যাম দূর্বাদলে ছেয়ে আছে ক্ষুদ্র নিরলঙ্কার সমাধি নির্মল নীল আকাশ থেকে প্রত্যহ নিশীথে সিঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ অরুণের প্রথম কিরণরেখা সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে গোধূলি-আলোকের সোনালী আভা' (যাযাবর—দৃষ্টিপাত)

অষ্টাদশ অধ্যায়

উক্তি-পরিবর্তন (Change of Narration)

বক্তার উক্তি যথাযথ উদ্ধৃত করা বা তাহার কথার ভাবটি প্রকাশকের নিজের কথায় বলিবার নামই **উক্তি**। বাক্যের উক্তি দুই প্রকার। যথা—(১) প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ উক্তি এবং (২) পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উক্তি।

(১) **প্রত্যক্ষ** বা **অপরোক্ষ উক্তি**: বক্তার উক্তিগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করাকে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ উক্তি (Direct Narratian) বলে। যেমন—তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছে?" (বঙ্কিমচন্দ্র)

(২) **পরোক্ষ** বা **অপ্রত্যক্ষ উক্তি**: বক্তার উক্তির মূল ভাবটুকু যদি অপরের নিজের ভাষায় প্রকাশিত হয়, তবে তাহাকে পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উক্তি (Indirect Narratian) বলে। যেমন—তিনি পথিককে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সে পথ হারাইয়াছে কিনা।

উক্তি-পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম

(১) প্রত্যক্ষ উক্তি উদ্ধরণ (" " বা ' ') চিহ্নের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করিতে হইলে উদ্ধরণ চিহ্ন উঠাইয়া দিয়া উদ্ধৃত বাক্যটির পূর্বে 'যে' প্রভৃতি সংযোগ অব্যয় ব্যবহার করিতে হয়।

(২) প্রত্যক্ষ উক্তিতে প্রথম ক্রিয়াপদটি যে কালের হইবে, পরোক্ষ উক্তিতে অনেক স্থলেই ক্রিয়াপদটিও সেই কালবাচক হয়।

(৩) প্রত্যক্ষ উক্তি প্রশ্নসূচক হইলে উক্তি-পরিবর্তনকালে প্রকাশকের অংশের ক্রিয়ার পরিবর্তে 'প্রশ্ন করিলেন', 'জানিতে চাহিলেন', 'জিজ্ঞাসা করিলেন' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।

(৪) বাক্যের অর্থ-অনুসারে পরোক্ষ উক্তিতে অনেক সময় নূতন শব্দ যোজনা করিতে হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাঙলা ভাষার ধর্ম ইংরেজী পরোক্ষ উক্তির ঠিক অনুকূল নয়।

[**দ্রষ্টব্য ঃ** অর্থ-অনুসারে প্রত্যক্ষ উক্তির কতকগুলি ক্রিয়া-বিশেষণজাতীয় পদের পরিবর্তন হয়। যথা—যখন—তখন, এবার—সেবার, এখানে—সেখানে, গতকল্য—পূর্বদিন ইত্যাদি]।

প্রত্যক্ষ উক্তি হইতে পরোক্ষ উক্তি

প্রত্যক্ষ—ফটিক বলিল, "আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি।" (রবীন্দ্রনাথ)

পরোক্ষ—ফটিক তাহার মাকে বলিল যে, তাহার ছুটি হইয়াছে, সে এখন বাড়ী যাইতেছে।

প্রত্যক্ষ—কাদম্বিনী বলিলেন, "মেজবউ, আমাদের ভাই-বোনের কথার মধ্যে তুমি থেকো না।" (শরৎচন্দ্র)

পরোক্ষ—কাদম্বিনী মেজবউকে তাহাদের ভাই-বোনের কথার মধ্যে থাকিতে নিষেধ করিলেন।

প্রত্যক্ষ—দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "ঝালা স্বামীধর্ম জানে, বিপৎকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না। (রমেশচন্দ্র দত্ত)

পরোক্ষ—দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন যে ঝালা স্বামীধর্ম জানে, বিপৎকালে মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে না।

প্রত্যক্ষ—রাম শ্যামকে বলিল, "তুমি কি নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছ ? তুমি রুগ্ন, এখনও অতি দুর্বল। নদীর ধারে এই সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইলে

ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার অসুখ বাড়িবে। তুমি আজিকার মত বাড়ী ফিরিয়া যাও।"

পরোক্ষ—রাম শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে কি না। সে রুগ্ন, তখনও অতি দুর্বল। নদীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ বাড়িবে। সে তাহাকে সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিল।

[**দ্রষ্টব্য :** বক্তার কথাগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করাই বাঙলা ভাষায় সাধারণ রীতি। তাই বর্তমান সাহিত্যিকগণের লেখায় পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার তেমন পাওয়া যায় না। তবে স্থলবিশেষে ইহার প্রয়োগ হইলেও তাহা ইংরেজীর অনুকরণমাত্র]।

অনুশীলনী

১। বাক্যের উক্তি কয়প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

২। উক্তি-পরিবর্তন বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও। উক্তি-পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলি উল্লেখ কর।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পরোক্ষ উক্তিতে প্রকাশ কর :—

(৩) 'নিরুপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, "বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুয়ে বল্‌লুম"।' (রবীন্দ্রনাথ)

(৪) 'রামসুন্দর বলিলেন', "ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তা হলে তোমার বাপের অপমান আর তোমারও অপমান"।' (রবীন্দ্রনাথ)

(৫) 'নারায়ণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে —তা জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়"।' (শরৎচন্দ্র)

(৬) 'হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া বসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিল "আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তার আগে নয়। আমি মা, আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার উপর ভগবান আছেন। এর বেশী আমি গুরুজনদের নামে নালিশ করতে চাই না। আমার অসুখ করেছে, আর আমাকে বকিও না, তুমি যাও"।' (শরৎচন্দ্র)

(৭) 'চাণক্য—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এ তোমার কন্যা? সত্য বল। ভিক্ষুক—আমার বৈকি! আর কার? চাণক্য—সত্য বল তোমায় প্রচুর অর্থ দিব, সত্য বল। ভিক্ষুক—না বাবা, এ আমার মেয়ে নয়। পথে এ মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি। চাণক্য—কোথায় পেলে? ভিক্ষুক—ভগবান্ দিয়েছেন। নইলে এ অন্ধ বুড়োকে কে হাত ধরে নিয়ে বেড়াত? কি পুণ্যে যাকে পেয়েছি জানি না। ডাকাতি ক'রে খেতাম, এখন সেই পাপে চক্ষু দু'টি হারিয়েছি। (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

উনবিংশ অধ্যায়

বাচ্য (Voice)

ক্রিয়ার যে রূপ-ভেদ দ্বারা বাক্যস্থিত ক্রিয়ার সহিত কর্তা ও কর্মের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অথবা ক্রিয়ার অর্থ প্রধানভাবে ব্যক্ত হয়, সেই রূপ-ভেদকে বলা হয় ক্রিয়ার **বাচ্য** (**Voice**)। বাচ্য সাধারণতঃ চারিপ্রকার। যথা—(১) **কর্তৃবাচ্য**, (২) **কর্মবাচ্য**, (৩) **ভাববাচ্য** ও (৪) **কর্ম-কর্তৃবাচ্য**।*

(১) **কর্তৃবাচ্য** : যে বাচ্যে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সহিত কর্তার সম্বন্ধ প্রধান-ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহাকে **কর্তৃবাচ্য (Active Voice)** বলে। এই বাচ্যে কর্তায় প্রথমা ও কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং কর্তায় যে পুরুষ, ক্রিয়াপদটিরও সেই পুরুষ হয়। যথা—রমেশ আমাকে প্রায়ই তিরস্কার করে; আমি তোমাকে তিরস্কার করি না ইত্যাদি।

(২) **কর্মবাচ্য** : যে বাচ্যে বাক্যস্থিত ক্রিয়ার সহিত কর্মের সম্বন্ধ প্রধানভাবে ব্যক্ত হয়, তাহাকে **কর্মবাচ্য (Passive Voice)** বলে। এই বাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া ও কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয় এবং কর্মে যে পুরুষ, ক্রিয়াপদটিতেও সেই পুরুষ হয়। যথা—**আমি** রমেশ কর্তৃক প্রায়ই তিরস্কৃত **হই**; **তুমি** আমা কর্তৃক তিরস্কৃত **হও না** ইত্যাদি।

কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার ধাতু কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়যোগে বিশেষণ বা 'আ' প্রত্যয়যোগে বিশেষ্য হয় এবং 'হ' ধাতুর ক্রিয়াপদগুলির প্রধান ক্রিয়া হইয়া থাকে।

(৩) **ভাববাচ্য** : যে বাচ্যে বাক্যস্থিত অকর্মক ক্রিয়ার অর্থই প্রধানভাবে ব্যক্ত হয়, তাহাকে **ভাববাচ্য (Nuture Voice)** বলে। ব্যাকরণে 'ভাব' কথাটির অর্থ 'ক্রিয়া'। এই বাচ্যে ক্রিয়াটি সর্বদাই প্রথম পুরুষের একবচন এবং কর্তায় দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—**দ্বিতীয়া**—তাহাকে যাইতে হইবে; আমাকে এখন স্নান করিতে হইবে ইত্যাদি। **ষষ্ঠী**—তাহার খাওয়া হইয়াছে; আমার নাওয়া-খাওয়া হয় নাই ইত্যাদি।

ভাববাচ্যে কর্তৃবাচ্যের প্রধান ক্রিয়ার ধাতু 'আ' প্রত্যয়যোগে ভাববিশেষ্য হয় এবং 'হ' ধাতুর ক্রিয়াপদগুলির প্রধান ক্রিয়া হইয়া থাকে।

(৪) **কর্ম-কর্তৃবাচ্য** : কখন কখন কর্তৃবাচ্যে কর্তার অভাবে বাক্যস্থিত ক্রিয়ার সহিত কর্মের সম্বন্ধই প্রধানভাবে ব্যক্ত হয় অর্থাৎ যে স্থানে কর্ম কর্তার সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহাকে **কর্ম-কর্তৃবাচ্য (Quasi-Passive Voice)** বলে। যথা—তোমার মত ছেলের মুখে এ **কথা** ভাল শোনায় না; ঠাকুর-বাড়ীতে প্রত্যহ পূজা ও আরতির সময় **ঘণ্টা** ও **শঙ্খ** বাজে ইত্যাদি।

---

*ব্যাকরণ অনুসারে আরও চারিটি বাচ্য আছে। যথা—কারণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ বাচ্য। ইহাদের সমাপিকা ক্রিয়া নাই, কেবল কৃৎ-প্রত্যয়ের সাহায্যেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কৃৎ-প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ যে বাচ্যের বিশেষণ, সেই বাচ্য বলিয়া কথিত হয়।

বাচ্য-পরিবর্তন (Change of Voice)

এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে পরিবর্তন করার নাম **বাচ্যান্তরীকরণ** বা **বাচ্য-পরিবর্তন (Change of Voice)**।

কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
ছেলেরা মাছ ধরিতেছে।	ছেলেদের দ্বারা মাছ ধরা হইতেছে।
আমি বইখানি পড়িলাম।	আমার দ্বারা বইখানি পড়া হইল।
সে অঙ্কগুলি কষিয়াছে।	তাহার দ্বারা অঙ্কগুলি কষা হইয়াছে।

কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
সে এখন কলিকাতায় থাকে।	তাহার এখন কলিকাতায় থাকা হয়।
তুমি কোথায় যাইতেছ?	তোমার কোথায় যাওয়া হইতেছে?

কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন

কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
অর্জুন কর্তৃক জয়দ্রথ হত হইয়াছিল।	অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করিয়াছিলেন।
জনৈক চোর কর্তৃক তাহার পুস্তকখানি অপহৃত হইয়াছে।	জনৈক চোর তাহার পুস্তকখানি অপহরণ করিয়াছে।

আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে এই জাতীয় কর্মবাচ্যের প্রয়োগ একরূপ নাই বলিলেই চলে। তবে ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্যের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন

ভাববাচ্য	কর্তৃবাচ্য
আমার আজ যাওয়া হইবে না।	আমি আজ যাইব না।
আপনার কোথায় থাকা হয়?	আপনি কোথায় থাকেন?

অনুশীলনী

১। বাচ্য কাহাকে বলে? বাঙলায় বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ম কি কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২। বিবিধ উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর: বাচ্য (উঃ মাঃ ১৯৬৪); কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য (স্কুল ফাইনাল ১৯৫৩), কর্ম-কর্তৃবাচ্য (স্কুল ফাইনাল, ১৯৫৮)।

৩। কর্তৃবাচ্যে একটি বাক্য রচনা করিয়া উহাকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত কর এবং এই বাক্যদ্বয়ের সাহায্যে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ভাববাচ্যের প্রয়োগটিও উদাহরণ যোগে বুঝাইয়া দাও। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২*)

বিংশ অধ্যায়

শব্দার্থ

[১] শব্দ-শক্তি

শব্দ অসীম শক্তির অধিকারী। একই শব্দ-প্রয়োগ-নৈপুণ্যে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তিতে বলীয়ান। শব্দবিদ্, ভাষাবিদ্, শব্দের আলংকারিক প্রয়োগে ভাষা তথা সাহিত্যে অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করিতে পারেন। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের যথাযথ ব্যবহার, দেশী ও বিদেশী শব্দের সামঞ্জস্যপূর্ণ সঞ্চয়ন, ভাষা সাহিত্যে অনবদ্য ঝংকার এবং রূপ-রস সঞ্চার করিয়া থাকে।

কথ্য ভাষায় বিভিন্ন শব্দের বিচিত্র প্রয়োগের দ্বারা মানুষের শব্দার্থ জ্ঞান হয়। ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি পাঠের ফলে ঐ শব্দার্থ জ্ঞান বিশেষভাবে বর্ধিত হয়। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ প্রভৃতি বঙ্গবাণীর সাধকবৃন্দ শব্দ প্রয়োগের অপূর্ব নৈপুণ্যে বঙ্গভাষায় তথা সাহিত্যে অশ্রুতপূর্ব ছন্দোঝংকারের এবং রূপ-রস সৃষ্টি করিয়াছেন।

আলংকারিকেরা শব্দ-শক্তির অর্থ প্রকাশের তিনটি ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছেন। যথা— (১) **মুখ্যার্থ**, (২) **লক্ষ্যার্থ** ও (৩) **ব্যঙ্গার্থ**। প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া এই তিন প্রকার শব্দ অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রাখে।

(১) মুখ্যার্থ : মৌলিক ও যৌগিক শব্দ এবং যোগরূঢ় শব্দ যে উপায়ে তাহাদের অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, শব্দের মুখ্যার্থেরও সেই উপায়ে অর্থ প্রকাশিত হয়। শব্দের প্রকৃত অর্থই শব্দের মুখ্যার্থ। বিভিন্ন শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে এই শব্দজ্ঞান সঞ্চয় হয়। ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি পাঠের ফলে এই জ্ঞান-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যেমন—অরণ্য শব্দের মুখ্যার্থ বন। অভিধান অথবা ব্যাকরণের পাঠক অরণ্য শব্দের অর্থ যে 'বন' তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

শব্দ যে শক্তিতে মুখ্যার্থের জ্ঞান জন্মায়, তাহাকে বলা হয় **অভিধা**। যেমন— বক্র, কাণা, হলদে, আলগা প্রভৃতি শব্দের মূল অর্থ যথাক্রমে বাঁকা, দৃষ্টিহীন, হলুদরঙা, শিথিল প্রভৃতি। এইরূপ অর্থ প্রতিটি শব্দের পাশাপাশি লেখা থাকে বলিয়া শব্দকোষের নাম **অভিধান**।

(২) লক্ষ্যার্থ : শব্দের আর এক প্রকার অর্থ প্রকাশক ক্ষমতার নাম **লক্ষণা**। এই লক্ষণা শব্দ-শক্তির মাধ্যমে **লক্ষ্যার্থ** জ্ঞান জন্মায়। শব্দ প্রয়োগ বৈচিত্র্যের ফলে অনেক সময় শব্দের মুখ্যার্থ প্রকাশিত না হইয়া পূর্ববর্ণিত পদ কিংবা পদের অর্থ

অথবা সমগ্র বাক্যটির অর্থ লক্ষ্য করিলে শব্দ-শক্তির লক্ষ্যার্থ দেখা যায়। যেমন—

'হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ—
ঝলিছে অমল শোভাতে।' (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে 'মা' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে 'মা' এর যাহা মুখ্যার্থ গর্ভধারিণী জননী তাহা প্রকাশিত না হইয়া 'মা' অর্থাৎ বাঙলা দেশ এই লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করিতেছে।

(৩) ব্যঙ্গার্থঃ শব্দ-শক্তির আরও এক প্রকার অর্থ প্রকাশকের ক্ষমতাকে আলংকারিক ভাষায় বলা হয় **ব্যঞ্জনা**। এই ব্যঞ্জনা শক্তির সাহায্যে শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে বলা হয় **ব্যঙ্গার্থ**।

প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ফলে শব্দ তাহার মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ অন্য অর্থের ইঙ্গিত দিয়া থাকে। যেমন—'অরণ্যে রোদন' এই শব্দদ্বয়ের মুখ্যার্থ বলা যায় 'বনের মধ্যে বসিয়া ক্রন্দন'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'অরণ্যে রোদন' অর্থাৎ 'নিষ্ফল প্রার্থনা' এই ব্যঙ্গার্থ-রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ—'বালির বাঁধ', 'শাঁখের করাত', 'পটলতোলা', 'পুকুর চুরি', 'চোখের বালি' ইত্যাদি।

[২] শব্দার্থের পরিবর্তন (Change of Words)

প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দার্থ পরিবর্তনশীল। শব্দের মৌলিক অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয় না। কোথাও বা শব্দ তাহার অর্থ সংকুচিত করিয়া ফেলে, কোথাও বা অর্থ সম্প্রসারিত হয়; আবার কোথাও বা শব্দ তাহার মৌলিক অর্থ হইতে দূরে সরিয়া নূতন অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন—'অন্ন' শব্দের অর্থ খাদ্য; কিন্তু বাঙলা ভাষাতে ইহা কেবলমাত্র 'ভাত' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দের অর্থ সংকুচিত হইয়াছে। এইরূপ—পঙ্কজ অর্থাৎ যাহা পাঁকে জন্মে। কিন্তু কেবলমাত্র 'পদ্ম' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

আবার প্রয়োগের ফলে শব্দার্থ এইরূপে সম্প্রসারিতও হইয়া থাকে। যেমন—'গাঙ' শব্দের উৎপত্তি 'গঙ্গা' শব্দ হইতে। বর্তমান 'গাঙ' শব্দ যে কোন নদীর নামরূপে ব্যবহৃত হয়।

এইরূপ 'তৈল' শব্দের উৎপত্তি 'তিল' শব্দ হইতে। অর্থাৎ তিল হইতে উৎপন্ন যাহা তাহাই তৈল। কিন্তু তৈল বলিলে সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, কেরাসিন তৈল প্রভৃতি সর্ববিধ তৈলকেই বুঝায়।

অনেক ক্ষেত্রে শব্দার্থের ভাবগত অবনতিও ঘটিয়া থাকে। যেমন 'ঝি' শব্দের অর্থ 'কন্যা'। অধুনা 'ঝি' বাড়ীর চাকরাণী অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বাড়ীর কন্যাকে

'ঝি' বলিয়া সম্বোধন করিলে অর্থগত অশুদ্ধি না ঘটিলেও সম্মানগত অশুদ্ধি বশতঃ মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা বর্তমান।

শব্দার্থের ভাবগত উন্নতিও আবার অনেক ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে। যেমন—'মন্দির' শব্দের অর্থ গৃহ। 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' (বিদ্যাপতি) মন্দির অর্থ এখানে গৃহরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কালক্রমে এই 'মন্দির' শব্দ 'গৃহ' হইতে 'দেবালয়' এই অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যেমন—মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌লো ঢং ঢং।' (রবীন্দ্রনাথ)

[৩] শব্দদ্বৈত (Reduplication of Words)

শব্দদ্বৈত অর্থকে বিশিষ্টান্বিত করিয়া তুলে। বাঙলা ভাষায় একই শব্দ বা পদের দ্বিত্ব বা দ্বৈতরূপক প্রয়োগের ফলে শব্দার্থ সম্প্রসারিত হইয়া নূতন অর্থ প্রতিষ্ঠা করে। যেমন—'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' (রবীন্দ্রনাথ)। এখানে 'নব' শব্দের অর্থ নূতন। কিন্তু 'নব' 'নব' নিত্য নূতন এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

এইরূপ, আকাশে কালো কালো মেঘ। 'কালো' শব্দের অর্থ কালো রঙ বিশিষ্ট। কিন্তু উক্ত উদাহরণে 'কালো কালো' শব্দের অর্থ অনেকটা 'কালো রঙের' মত দেখিতে মেঘগুলি এইরূপ অর্থও হইতে পারে। নিম্নে শব্দদ্বৈতের কতকগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

(১) পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে :

(ক) 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে
ডালে ডালে, ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায় রে
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।' (রবীন্দ্রনাথ).

(খ) 'ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা
আলোয় আলোয় চলে যাই।' (শ্যামাসঙ্গীত)

(গ) 'পান সুপারি পান সুপারি
এইখানেতে শঙ্কা ভারী।' (সত্যেন্দ্রনাথ)

(২) বহুলতা বুঝাইতে :

(ক) 'আসে 'দলে দলে' তব দ্বার তলে 'দিশি দিশি' হতে তরণী (রবীন্দ্রনাথ)

(খ) 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায়
আছে যার 'ভূরি ভূরি'।, (রবীন্দ্রনাথ)

(৩) সাদৃশ্য অথবা আসন্নতা অর্থে :

(ক) গাটা 'জ্বর জ্বর' লাগ্‌ছে (জ্বরের সাদৃশ্য অথবা জ্বর আসন্ন এই অর্থে)

(খ) 'হাসি হাসি' মুখ, 'শীত শীত' রাত্রি, 'চোর চোর' খেলা ইত্যাদি।

(গ) 'পূর্ব গগনে পূর্ণিমা চাঁদ করিতেছে উঠি উঠি' (রবীন্দ্রনাথ)

(ঘ) 'রশ্মি-রসে ডুবু ডুবু বন আবির্ভূতা বনে বনদেবী' (সত্যেন্দ্রনাথ)

(৪) অসমাপ্তি ব্যঞ্জক ক্রিয়াপদ ঃ

(ক) 'চলিতে চলিতে' গল্প বলিতে লাগিলাম।

(খ) 'জপিতে জপিতে' নাম অবশ করিল গো' (চণ্ডীদাস)

(৫) অব্যয়ের দ্বিত্বরূপ ঃ

(ক) 'সাধু'! 'সাধু'!—কহে 'সভার মাঝারে' (রবীন্দ্রনাথ)

(ক) 'আমি কহিলাম আরে 'রাম রাম' নিবারণ সাথে যাবে।' (রবীন্দ্রনাথ)

(৬) সমার্থক বা **অনুরূপ অর্থযুক্ত শব্দযোগ ঃ** শব্দের সঙ্গে অর্থ সম্প্রসারিত করিবার জন্য অনুচররূপে সমার্থক শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা—রান্নাবান্না ; 'চাকর-বাকর' ; 'কালেভদ্রে' ; 'জনমনিষ্যি' ; 'বাসন-কোসন' ; 'হাড়ি-কুড়ি' ইত্যাদি।

(৭) ট-যোগে সাধারণভাবে শব্দের প্রসার ঃ 'ট' শব্দের যোগে কথ্য' বাঙলায় অনেক ক্ষেত্রেই শব্দদ্বৈত হয়। যথা—বাজার টাজার যাবে না ; চল ভাত-টাত খাইগে ; তার খবর টবর পাওতো ? ইত্যাদি।

(৮) অনুকার ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দদ্বৈত ঃ যথা—বক্-বক্, কট্-কট্, ঝনাঝন, আঁকু-পাঁকু, শুখ্‌না-শাখ্‌না, আবুড়া-খাবুড়া (এবড়ো-খেবড়ো) ইত্যাদি। ধ্বনির অনুকরণে উদ্ভুত বলিয়া ইহাদিগকে **ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত** বলা যায়।

[৪] যুগ্মশব্দ

যুগ্মশব্দ প্রয়োগে শব্দার্থ সম্প্রসারিত হয়। বাক্য সংক্ষিপ্ত করিতেও যুগ্মশব্দ যথেষ্ট সাহায্য করে। সাধারণতঃ কথ্য ভাষায় যুগ্মশব্দের বহুল প্রচলন দেখা যায়। বাঙলা ভাষায় যুগ্মশব্দ নিম্নলিখিত তিন প্রকার। যথা—

(১) সমার্থক বিশিষ্ট যুগ্মশব্দ ঃ মাথা-মুণ্ডু, দয়া-মায়া, রীতি-নীতি, কাঙাল-গরীব, টাকা-পয়সা, চিঠি-পত্র, পাহাড়-পর্বত, চালাক-চতুর, মুটে-মজুর, বন-জঙ্গল, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, লজ্জা-সরম ইত্যাদি।

(২) বিভিন্নার্থক যুগ্মশব্দ ঃ ডাল-ভাত, অন্ন-বস্ত্র, জন্ম-মৃত্যু, ছেলে-মেয়ে, আইন-আদালত, আজ-কাল, জামা-কাপড় ইত্যাদি।

(৩) বিপরীতার্থক যুগ্মশব্দ ঃ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হিতাহিত, জীবন মরণ, আগাগোড়া, শিবদুর্গা, পাপপুণ্য ইত্যাদি।

[৫] ধ্বন্যাত্মক শব্দ (Onomatopoetic Words)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাঙলা ভাষার এক বিশিষ্ট সম্পদ। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের মাধ্যমে এত সুন্দর, এত স্পষ্টভাবে পার্থিব বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধ্বনির অর্থ প্রকাশিত হয় নাই। যেমন—ঝির্ ঝির্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এখানে বৃষ্টি পতনের শব্দ—ঝির্ ঝির্ শব্দের মধ্যে যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ঝংকার ভাষায় অশ্রুতপূর্ব মিঠে সুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল :

(১) **শারীরিক অনুভূতি বুঝাইতে :** কন্ কন্, ছল্ ছল্, টন্ টন্, ছট্ ফট্, ছম্ ছম্, থর্ থর্, গস্ গস্, ঝিন্ ঝিন্, ধুক্ ধুক্ ইত্যাদি।

(২) **হাসির বর্ণনা প্রকাশ করিতে :** খিল্ খিল্, হো হো, হা হা, হিহি, ফিক্ ফিক্, ফিক্ করিয়া অর্থাৎ মুচকিয়া হাসি।

(৩) **কাটা শব্দের বর্ণনা বুঝাইতে :** কচ্ কচ্, কুচ্ কুচ্, কটাস্ কটাস্, কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্, ঘঁ্যাচ্ ঘঁ্যাচ্ ইত্যাদি।

(৪) **রঙ-এর বৈচিত্র্য বুঝাইতে :** ঝিক্ ঝিক্, চিক্ চিক্, ধব্ ধবে, (সাদা) টুক্ টুকে, (লাল) মিশ্ মিশে (কালো), ফ্যাক্ফেকে ইত্যাদি।

(৫) **নিস্তব্ধতা বুঝাইতে :** খাঁ খাঁ, ঝাঁ ঝাঁ, ধূ ধূ, থৈ থৈ, হা হা, হু হু, থম্ থম্ ইত্যাদি।

(৬) **বিভিন্ন শব্দ প্রকাশ করিতে :** কল্ কল্, খট খট্, চপ্ চপ, ঝম্ ঝম্' ঢং ঢং, ভন্ ভন্, পত্ পত্, চট্ চট্, দুম্দাম্, টুপ্ টুপ্, বকবকম, সপাং সপাং, মচ্ মচ্, হুড়্ হুড়্, হুস্ হুস্, হু হু, দগ্ দগে, প্যান্পেনে, স্যাঁৎসেতে ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ : 'পদ্মা পূর্ববৎ **ছল্ ছল্ খল্ খল্** করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল।' (রবীন্দ্রনাথ)। **খট্ খট্ ঠক্ ঠক্** করিয়া বাঁশ কাটা সুরু হইয়া গেল।' (শরৎচন্দ্র)। 'পাড় ভাঙার অবিশ্রাম **ঝুপ্ ঝুপ্** শব্দে দশদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল।' (রবীন্দ্রনাথ)। 'এমন সময় দরজার শিকলটা **ঝম্ ঝম্** করিয়া উঠিল।' (শরৎচন্দ্র)। 'ঝিঁ ঝিঁ পোকার **ঝিঁ ঝিঁ** শব্দে গ্রাম শব্দায়মান হইতে লাগিল।' (টেকচাঁদ ঠাকুর)। 'তাহার গণ্ড বহিয়া **টপ্ টপ্** করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।' (শরৎচন্দ্র)। জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় **বজ্ বজ্** করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিতে লাগিল।' (শরৎচন্দ্র)। 'আম্রবনের মধ্যে পাতা **ঝর্ ঝর্** করিয়া বাতাস কেমন **হা-হা** করিয়া উঠিল।' (রবীন্দ্রনাথ)। 'প্রাঙ্গণ পরিষ্কার **তক্তক্** করিতেছে।' (রবীন্দ্রনাথ)। 'সর্পের অমূল্য মণিগুলি গৃহের সর্বত্র **ধক্ধক্** করিয়া জ্বলিতেছে।' (দীনেশচন্দ্র সেন)

অনুশীলনী

১। মুখ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া যে অর্থ প্রকাশ করে তাহা উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

২। শব্দদ্বৈত কাহাকে বলে ? ভাষায় ইহার সার্থকতা কি ?

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটির দ্বারা বাক্য গঠন কর :—

হাসিতে হাসিতে ; রাশি রাশি ; হাজার হাজার ; রাস্তায় রাস্তায় ; সপ্তাহে সপ্তাহে ; বুদ্ধি শুদ্ধি ; অসুখ বিসুখ ; আলু থালু ; আবোল তাবোল ; বিদেশ বিভুঁই ; হিসাব-নিকাশ ; সীমা পরিসীমা।

৪। বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :—

চিক্ চিক্ ; দুম্ দাম্ ; পত্‌পত্ ; জ্বল্‌জ্বল্ ; মিশ্‌মিশে ; কিচির মিচির ; সপাং সপাং ; ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ; ড্যাব্ ড্যাব্ ; ঝিম্ ঝিমে ; ফুট্‌ফুটে ; টুক্‌টুকে ; দুম্‌দাম্ ধিকিধিকি ; ফুরফুরে ; গড়গড়িয়ে ; টগবগিয়ে, ঢল্ ঢল্।

একবিংশ অধ্যায়

প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থবোধক শব্দ (Pronyms)

বাঙলা ভাষায় এমন অনেক শব্দযুগ্ম আছে, যাহাদের উচ্চারণ প্রায় একরূপ কিন্তু তাহাদের বানান ও অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাষায় এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিবার সময় বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। তোমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে এইরূপ কতকগুলি প্রায় সমোচ্চারিত শব্দযুগ্মের অর্থসহ উদাহরণ দেওয়া হইল :

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
অর্ঘ	মূল্য	অবিহিত	অনুচিত
অর্ঘ্য	পূজার উপচার	অভিহিত	কথিত
অনু	পশ্চাৎ	অনিল	বায়ু
অণু	ক্ষুদ্রতম অংশ	অনীল	যাহা নীল নয়
অজাগর	অনিদ্রা	অনুধাবন	বিবেচনা
অজগর	সাপ	অনুধ্যান	কল্যাণময় চিন্তা
অন্ত	অপর	অবগত	জ্ঞাত
অন্ত্য	নিকৃষ্ট	অপগত	বিদূরিত
অন্ন	ভাত	অবদ্য	অকথ্য
অন্য	অপর	অবধ্য	যে বধের অযোগ্য

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
অবিচার	অবিবেচনা	শসা	ফলবিশেষ
অভিচার	পরিহিংসা	শশা	শশক
অবিরাম	অনবরত	স্বসা	ভগিনী
অভিরাম	সুন্দর	ইতি	শেষ
অপচয়	ক্ষতি	ঈতি	ষড়বিধ শস্য বিঘ্ন
অবচয়	নয়ন	ইষ	আশ্বিন মাস
অঙ্ক	ক্রোড়	ঈশ	ঈশ্বর
অঙ্গ	গাত্র	ঈশ	লাঙলের ফলা
অন্যদা	অন্য সময়ে	উপাদান	উপকরণ
অন্নদা	অন্নপূর্ণা	উপাধান	বালিশ
অসক্ত	নির্লিপ্ত	করী	হাতী
অশক্ত	অসমর্থ	কবি	সম্পন্ন কবি
অবদান	পূজা বা অর্চনার্থ দান	কতক	কিছু
অবধান	মনোযোগসহ শ্রবণ	কথক	বক্তা
অঙ্কন	আঁকা	কৃত	সম্পন্ন
অঙ্গন	উঠান	ক্রীত	কেনা
অংশ	ভাগ	কৃতী	পণ্ডিত
অংস	স্কন্ধ	কৃতি	কার্য
আপন	নিজ	কূট	দুর্গ, পর্বত
আপণ	দোকান	কূট	জটিল, গিরিশৃঙ্গ
আসার	ধারা সম্পাত	কুল	বংশ
অসার	মিথ্যা	কূল	নদীতীর
আভাষ	ভূমিকা	কুজন	কু-লোক
আভাস	ইঙ্গিত, দীপ্তি	কূজন	কলরব
আকিঞ্চন	আকাঙ্ক্ষা	গিরীশ	হিমালয়
অকিঞ্চন	দরিদ্র	গিরিশ	মহাদেব
আবরণ	আচ্ছাদন	চতুর	চালাক
আভরণ	অলঙ্কার	চতুর	চারি
আস্তিক	ঈশ্বর বিশ্বাসী	চতুষ্পদ	চারি পা বিশিষ্ট জন্তু।
আস্তীক	মুনি বিশেষ	চতুষ্পথ	চৌমাথা

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
আহূতি	আহ্বান	চির	দীর্ঘকাল
আহুতি	হোম	চীর	ছিন্নবস্ত্র
জালা	বৃহৎ মৃৎপাত্র	দ্যূত	পাশাখেলা.
জ্বালা	যন্ত্রণা	দূত	চর
জাত	উৎপন্ন	ধরা	পৃথিবী
যাত	গত	ধড়া	কটিবাস্
জাম	ফল বিশেষ	নির্ঝর	ঝরণা
যাম	প্রহর	নির্জর	দেবতা
দোষ	অপরাধ	নিরস্ত	বিরত
দোস	বাহু	নিরস্ত্র	অস্ত্রহীন
দুকুল	দুই বংশ	নির্বন্ধ	অতিশয় অনুরোধ
দুকূল	দুইতীর	নিবন্ধ	প্রবন্ধ
দেশ	রাজ্য	নিশীথ	মধ্যরাত্রি
দ্বেষ	বৈর, হিংসা	নিশিত	শাণিত
দেবত্ব	দেবভাব	নিরশন	অনাহার
দেবত্র	দেবোদ্দেশে দত্ত সম্পত্তি	নিরসন	দূরীকরণ
দর্ভ	কুশ	নিবৃত্তি	বিরতি
দর্ব	রাক্ষস	নির্বৃতি	মুক্তি
দর্প	অহঙ্কার	পদ্য	ছন্দোবদ্ধ
দীপ	প্রদীপ	পদ্ম	পুষ্পবিশেষ
দ্বীপ	জলবেষ্টিত স্থলভাগ	পক্ষ	পাখা, পনর দিন
দ্বিপ	হস্তী	পক্ষ্ম	নেত্রলোম
দিন	দিবস	পরুষ	কঠোর
দীন	দরিদ্র	পুরুষ	নর
দারা	স্ত্রী	পরভৃৎ	কাক
দ্বারা	দিয়া, কর্তৃক	পরভৃত	কোকিল
ধ্বনি	শব্দ	প্রকার	বিবিধ
ধনী	ধনবান্	প্রাকার	প্রাচীর
প্রসাধনী	চিরুণী	মূক	বোবা
প্রসাধন	সাজগোজ	মুখ	বদন

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
প্রাসাদ	অট্টালিকা	সক্ত	অনুরক্ত
প্রসাদ	অনুগ্রহ	মেদ	চর্বি
বপন	বোনা	মেধ	যজ্ঞ
বপনী	মাকু	যতি	বিরামস্থল, মুনি
বান	বন্যা	যতী	সংযত,
বাণ	শর	জ্যোতি	প্রভা, দীপ্তি
বন্ধ	বাঁধ, রুদ্ধ	যজ্ঞ	বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড
বন্ধ্যা	নিষ্ফল, নিঃসন্তান	যোগ্য	উপযুক্ত
বসন	বস্ত্র	রিক্ত	শূন্য
ব্যসন	অত্যাসক্তি (বিলাসে)	রিক্থ	ঐশ্বর্য
বিশ	কুড়ি, বৈশ্য, মনুষ্য	রুক্ম	স্বর্ণ, কাঞ্চন
বিষ	গরল	রুক্ষ	কর্কশ
বিস	মৃণাল	লক্ষ	শত সহস্র
বানি	পারিশ্রমিক	লক্ষ্য	উদ্দেশ্য
বাণী	বাক্য	লক্ষণ	চিহ্ন
বলি	উপচার	লক্ষ্মণ	রামানুজ
বলী	বলবান	শরণ	আশ্রয়
বিস্মৃত	বিস্মরণযুক্ত	স্মরণ	স্মৃতি
বিস্মিত	চমৎকৃত	শঙ্কর	মহাদেব
বৃত্ত	গোলাকৃতি	সঙ্কর	মিশ্রণ
বিত্ত	সম্পত্তি	শারদ	শরৎকালীন, বর্ষ
বেধ	বিদ্ধকরণ	সারদ	শ্রেষ্ঠতাদায়ক
বেদ	শ্রুতি	শীত	কালবিশেষ
ভাণ	রূপকনাট্য বিশেষ	স্মিত	মৃদুহাস্য-যুক্ত
ভান	ছল, দীপ্তি	শিকার	মৃগয়া
ভাষণ	উক্তি	স্বীকার	অঙ্গীকার
ভাসন	দীপ্তি	শবল	নানাবর্ণযুক্ত, চিত্রিত
শারদা	দুর্গা	সবল	বলশালী
সারদা	সরস্বতী	শ্বশ্রূ	শাশুড়ি
শক্ত	সমর্থ	শ্মশ্রু	দাড়ি

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
শান্ত	ধীর	স্বার্থ	আত্মপ্রয়োজন
সান্ত	অন্তযুক্ত, সসীম	শয্যা	বিছানা
শম	শান্তি	সজ্জা	বেশভূষা
সম	তুল্য	শুচি	পবিত্র
শুক	পক্ষী বিশেষ	সূচী	সুঁচ, তালিকা
শূক	শস্যাদির সূক্ষ্মাগ্র	সর	ননী
শব	মৃতদেহ	সরঃ	সরোবর
সব	সমস্ত, যজ্ঞ	স্বর	আওয়াজ
শ্রবণ	কর্ণ	স্মর	কামদেব
স্রবণ	স্মরণ	সাক্ষর	অক্ষরজ্ঞানযুক্ত
শূর	বীর	স্বাক্ষর	দস্তখত
সুর	সূর্য	সত্য	যথার্থ
সুর	দেবতা	স্বত্ব	অধিকার
সর্গ	অধ্যায়	সত্ত্ব	গুণ বিশেষ
স্বর্গ	দেবলোক	হরিৎ	দিক্
সুত	পুত্র	হরিত	নীল-পীত মিশ্রিত বর্ণ
সূত	সারথি	হুতি	যজ্ঞ, হোম
সীতা	জানকী	হূতি	আহ্বান
সিতা	শর্করা	হৃতি	হরণ
সামি	অর্ধভাগ	রীতি	প্রথা
স্বামী	পতি, প্রভু	ঋতি	পথ
সার্থ	বণিকদল, সমূহ		

বাক্যে প্রয়োগ ঃ

অংস—স্কন্ধ ঃ ধনুর্বাণ দর্পভরে তুলি নিল 'অংস' পরে।

অংশ—ভাগ ঃ 'এক অংশে চারি 'অংশ' হৈল নারায়ণ।' (কৃত্তিবাস)

আপন—নিজের ঃ একলব্যের গুরুভক্তির নিদর্শন 'আপন' অঙ্গুলি কাটা।

আপণ—দোকান ঃ 'করি তুই আপন আপন, হারালি যা ছিল আপন, এবার তোর ভরা 'আপণ' বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।' (অতুলপ্রসাদ)

অসিত—কৃষ্ণবর্ণ ঃ 'পর্বতের মেঘরূপ 'অসিত' অজিন ধারারূপ যোগসূত্র অতি সমীচীন।' (রাজকৃষ্ণ রায়)

অশিত—ভুক্ত : 'অশিত' বস্তু জীর্ণ না হইলে অম্লরোগ আরম্ভ হয়।

আভাস—ইঙ্গিত : 'কেনালটার সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দিকে নানান্ রকমের গাছ,—অন্যদিকে ধূ ধূ করা মাঠ, শ্যামলতার 'আভাস' টুকুও নাই।' (অন্নদাশঙ্কর রায়)

আভাষ—আলাপ : দূর হইতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 'আভাষ' শুনা যাইতেছে।

কটি—কোমর : 'ক্ষীণ 'কটি' ঘেরি বাজে কিংকিণী।' (রবীন্দ্রনাথ)

কোটি—শতলক্ষ : 'তেত্রিশ 'কোটি' মোরা নহি কভু ক্ষীণ।' (অতুলপ্রসাদ)

কুজন—মন্দলোক : 'কুজনের' পরামর্শ নিও না।

কূজন—কলরব : 'আনন্দ বিহঙ্গ তুমি ও কালো কোকিল, বিজনে 'কূজনে' পূজা করিতেছ কার?' (দীনবন্ধু মিত্র)

গিরিশ—শিব : 'গোড়াইল 'গিরিশ' গৌরীর পিছু পিছু।' (শিবায়ণ)

গিরীশ—হিমালয় : 'যেখানে যা সাজে যত ভাঙ্গিয়া ভাণ্ডার।
'গিরীশ' গৌরীর গায়ে দিল অলংকার।' (শিবায়ণ)

জালা—জলাধার : 'জালায় নাহিক জল।' (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

জ্বালা—যন্ত্রণা : 'বালা হয়ে 'জ্বালা' সয়, কেমনে বাঁচিয়া রয়, কারো মনে নাহি হয় দয়া, একটুকু গো দয়া একটুকু।' (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

বর্ষা—বৃষ্টি : 'বর্ষা' এসো 'বর্ষা' এসো চাতক ডাকে ফটিক জল।' (কালিদাস)

বর্শা—সড়কি : 'প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ 'বর্শা' নিক্ষেপ করিলেন।'

শর—বাণ : 'পঞ্চ 'শরে' দগ্ধ ক'রে ক'রেছো একি সন্ন্যাসী!' (রবীন্দ্রনাথ)

সর—সরোবর : 'যাইতে মানস 'সরে' কার না মানস সরে?' (দ্বিজেন্দ্রনাথ)

অনুশীলনী

১। যে কোন তিনটি শব্দযুগল (অর্থাৎ ছয়টি শব্দ) বাছিয়া লও এবং প্রত্যেকটির অর্থ করিয়া এক-একটি বাক্য গঠন কর :

(ক) অংশ—অংস, অন্য—অন্ন, আভাষ—আভাস, চূত—চ্যুত, কূল—কুল, কোমল—কমল, আস্তিক—আস্তীক, বাধা—বাঁধা। (ঢাকা, বোর্ড ১৯৪৪)

(খ) আপন—আপণ, সরণ—স্মরণ, কতক—কথক, গিরিশ—গিরীশ, চির—চীর, তরিণী—তরুণী, দিন—দীন, নীর—নীড়, ধনী—ধ্বনী, সর্গ—স্বর্গ, শারদ—সারদ, সাক্ষর—স্বাক্ষর।

২। নিম্নলিখিত যে কোন তিনটি শব্দযুগ্মের অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া উপযুক্ত বাক্য রচনা কর :

অবদান, অবধান; নির্বন্ধ, নিবন্ধ; কূট, কুট; অবিচার, অভিচার; গিরীশ, গিরীশ; অসার, আসার। (গৌ. বি. মাধ্যমিক, ১৯৫১)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শব্দ ও বাক্যাংশের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ

[১] বিশিষ্টার্থক বিশেষ্যপদ :

কথা : (১) কথা যখন দিয়েছি তখন তা রাখবই (প্রতিশ্রুতি)। (২) পাকা মাথার কথায় চল্‌লেই বুদ্ধিমানের কাজ ক'রতে (পরামর্শ অনুসারে)। (৩) ও একটা কথার কথা (মূল্যহীন)। (৪) 'কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও' (স্তব্ধতা ভঙ্গ কর—রবীন্দ্রনাথ)। (৫) 'বৌঠান হক কথা কবে বলেন যে, আজ তোমাকে না-হক কথা বলেছেন।' (উচিত কথা—শরৎচন্দ্র)। (৬) গোপন কথা পেটেই রাখিও (বিষয়)। (৭) 'যোগমায়া কহিলেন, আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে কি কথার শ্রী' (কথা বলিবার ধরণ—রবীন্দ্রনাথ)। (৮) 'আমি আজ স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, তুমি আমাদের ভাই-বোনের কথায় থেকো না।' (আলোচনায় যোগ দেওয়া—শরৎচন্দ্র)।

কান : (১) অশ্রাব্য কথা শুনিয়ে কানে আঙুল দেওয়ালে দেখছি (শুনিতে না চাওয়া)। (২) সর্বজনবিদিত কথাটি নিয়া তাহারা সতর্কতার সহিত কানাকানি করিতেছিল (অত্যন্ত গোপনে কথা করিতেছিল)। (৩) কান খাড়া করিয়া অন্দরমহলের কথা সে শুনিতে লাগিল (উৎসুক্য সহকারে শোনা)। (৪) এ ঘরের কথা ও ঘরে নিয়া সে কান ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করিল (মনোমালিন্য সৃষ্টি করা)।

গা : (১) কাজে একটু গা লাগাও (মনযোগ)। (২) ট্রাম-বাসের ভিড় আমাদের গা সওয়া ব্যাপার হয়ে গেছে (অভ্যাস)। (৩) নদীর গায়েই ডাকবাংলো (তীরেই)। (৪) হঠাৎ কারও গায়ে হাত তোলা উচিত নয় (প্রহার)। (৫) গায়ের ঝাল মিটাতে ছেলেটাকে মারা উচিত হয় নাই (অন্তর্জ্বালা)। (৬) তোমার শরীর বড়ই দুর্বল, অন্ততঃ গা নাড়া দিও না, আবার জ্বরে পড়বে (অঙ্গ চালনা করা)। (৭) গা তোল পুরবাসি! রজনী পোহাইল (গাত্রোত্থান করা—ব্রহ্মসংগীত)।

চোখ : (১) অপরের ধন দেখিয়া চোখ টাটাইয়া লাভ নাই (ঈর্ষান্বিত হওয়া)। (২) তাহাকে সকল সময় চোখে চোখে রাখিও (সতর্ক দৃষ্টিতে)। (৩) 'কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে সে তো জানে না।' (চোখ খোলা—শরৎচন্দ্র)। (৪) তাহার রূপে চোখ দিও না (লোলুপদৃষ্টি ফেলা)। (৫) চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বললেই কী ভয় পাবো নাকি? (ভয় দেখানো)। (৬) 'তোমাদের কি চোখের চামড়া নাই?' (লজ্জা—শরৎচন্দ্র)।

নাম : (১) আমার নাম আচিন্ত্যকুমার গুপ্ত (নাম শব্দের মুখ্য অর্থে)। (২) ছেলেটা চৌধুরী বংশের নাম ডুবাবে দেখ্‌ছি (পরিচয়)। (৩) বিনা পরিশ্রমে নাম করা যায় না (খ্যাতি)। (৪) এখানে একটি নামমাত্র হাসপাতাল আছে (ছোটখাট)। (৫) 'জপিতে জপিতে নাম অবশ হইল গো' (নাম জপ করা অর্থে)। (৬) ব্যবসার নাম করে পয়সা নিয়ে স্ফূর্তি করতে লজ্জা করে না (ব্যবসার অজুহাতে)। (৭) 'কালিদাস তো নামেই আছেন, আমি আছি বেঁচে' (রবীন্দ্রনাথ —নামমাত্রে শব্দমাত্র)।

পেট : (১) পেটের জ্বালায় এত অস্থির হয়েই তো লোকে এত পরিশ্রম করে (ক্ষুধার জ্বালা)। (২) তোমার পেটে বোমা মারলেও তো কিছু বার হবে না; এসেছো আবার তর্ক করতে (মূর্খ)। (৩) বাইরে থেকে মনে হয় সরল, আসলে ওর পেটে অনেক বুদ্ধি (মনে মনে)। (৪) আমাদের প্রত্যেকেকেই এই পেটের জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে (প্রাণধারণের জন্য)। (৫) ভূতের গল্প শুন্‌লে ভয়ে আমার পেটের ভেতর হাত পা ঢুকে যায় (ভয় বাচক)।

বুক : (১) বুকের মধ্যে বিচ্ছেদের অনেক জ্বালা আছে (অন্তরে)। (২) বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেই হীন-মনা মানুষ পালাইতে বাধ্য (সাহস)। অনেক বুকের রক্ত দানে ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন (প্রাণ-দান)। (৪) তোমার ছেলের বুকে হাত দিয়া একথা তুমি বলিতে পার (বিবেক)? (৫) শোষণকারী চিরকাল মানুষের বুকের রক্ত চুষিয়া খায় (শোষণ করা)। (৬) 'বুকের মাঝে কয় সে (ঝরণা) কথা সোহাগঝরা সংগীতে' (অন্তর, হৃদয়—রবীন্দ্রনাথ)।

মন : (১) 'করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি' (ইচ্ছা—রবীন্দ্রনাথ)। (২) 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' (হৃদয়—রবীন্দ্রনাথ)। (৩) 'পাঠশালে হাই তোলে মতিলাল নন্দী, বলে পড়া হয় নাকো যত কেন মন দি' (মনযোগ—রবীন্দ্রনাথ)। (৪) 'সেই মনে পড়ে জৈষ্ঠ্যের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম' (স্মৃতিতে উদিত হয়—রবীন্দ্রনাথ)। (৫) 'মনে হয় সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে' (ধারণা—রবীন্দ্রনাথ)।

মাটি : (১) পাকিস্তানের সব সম্পত্তি মাটির দরে বেচে দিতে হোল (সস্তা)। (২) খেলার আনন্দ, বৃষ্টি এসে মাটি করে দিলে (নষ্ট)। (৩) 'যার লাঠি তার মাটি' (ভূ-সম্পত্তি)। (৪) তোমাদের ওখানকার মাটিতে আর পা দেব না। (উপস্থিত হব না)। (৫) সারাজীবন স্কুলের জন্য দেহ মাটি করেছি (নিপাত করা)।

মাথা : (১) ঘাড়ে তো আমার দু'টি মাথা নেই যে ওই খুনী লোকটির সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব (দুঃসাহস)। (২) ছেলেটির অঙ্কে মাথা আছে (ভাল)। (৩) ভালছেলে হলে সবাই তোমাকে মাথায় করে রাখ্‌বে (আদর)। (৪) 'আমার

মাথা খাও, আর্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল।' (দিব্যি দেওয়া—বিদ্যাসাগর)। (৫) সেই তো এখন দলের মাথা (নেতা)। (৬) ও 'আমার দেশের মাটি. তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।' (প্রণাম করা—রবীন্দ্রনাথ)। (৭) 'আমার পরিচয় দিও না লক্ষ্মীটি, মাথা খাও' (শপথ—রবীন্দ্রনাথ)। (৮) 'তারপর যতদিন থাকতাম ততদিন বাড়ীটাকে কি রকম মথায় করেই না রাখতাম' (নজরুল)। (৯) 'সোফিয়ার বিয়ের জন্য তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না' (চিন্তা-ভাবনা করা—নজরুল)।

মুখ ঃ (১) অজিতবাবুর পেটে এক, আর মুখে এক (কপট)। ফেল করেছে শুনে ছেলেটির মুখ চুন হয়ে গেল (ম্লানমুখ)। (৩) সকলের মুখে মুখে একই কথা (মুখে একই কথার উচ্চারণ)। (৪) মৌনী হয়েছ কেন? একবার মুখ খোল (কথাবল)। (৫) 'কাদম্বিনী মুখ ভেংচাইয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন—টের পেলেই বা।' (বিদ্রূপ অর্থে—শরৎচন্দ্র)। (৬) অধিনায়কের মুখের দিকে সকলে তাকিয়ে রইল (আদেশের প্রতীক্ষায়)। (৭) মনিব চাকরকে বললেন, মুখ সামলে কথা বলবি (সংযতভাবে)। (৮) 'একটু বুঝিয়ে বলতে গেলেই মুখটি চুন করে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ে।' (অতিশয় লজ্জা—নজরুল)। (৯) এই বইয়ের মুখবন্ধটা সত্যই অত্যন্ত ভাল হয়েছে (ভূমিকা)।

হাত ঃ (১) তুমি একটা হাতাহাতি বাধাবেই দেখ্‌ছি (মারামারি)। (২) বিধান-সভার সদস্যরা সকলেই মন্ত্রীর প্রস্তাবে হাত তুলিলেন (সমর্থন করা)। (৩) এ ব্যাপারে লোকটার হাতযশ আছে (সুনাম)। (৪) এবার ওকে হাতে টেনে নিতে হবে (দলে)। (৫) ওর একটু হাতটান আছে (চুরির অভ্যাস)। (৬) 'একবার তাদের হাতে পেলে তো আর রক্ষা থাকত না।' (আপন অধিকারের মধ্যে পাওয়া—শরৎচন্দ্র)। (৭) 'বাঙালীর ছেলে আমেরিকায় গিয়ে হাতে কলমে এঞ্জিন গড়ল।' (কার্যকরী করা—রবীন্দ্রনাথ)। (৮) ছেলেটির হাতে খড়ি দিলাম (প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা)।

[২] বিশিষ্টার্থক ক্রিয়াপদ ঃ

আসা ঃ (১) 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' (উপস্থিত হয়—রবীন্দ্রনাথ)। (২) রুক্ষ প্রবন্ধ শুনতে গেলে আমার ঘুম আসে (আক্রান্ত)। (৩) উত্তর দিবার মতো আর কোন কথা আসিল না (উচ্চারিত)। (৪) তাহার কথায় কিছু আসে যায় না (লাভ-ক্ষতি হয় না)। (৫) 'এলো সে এলো আমার প্রাণের কুলে খোলা দ্বার দিয়ে' (প্রবেশ করিল—রবীন্দ্রনাথ)। (৬) 'আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে, (পুনরাগমন—জীবনানন্দ)। (৭) 'হুজুর, আপনার সেতার বাজনা আসে' (পটুতা থাকা—রবীন্দ্রনাথ)। (৮) 'চারিদিক হইতেই একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল।' (গোচর হওয়া—শ্রীকান্ত—শরৎচন্দ্র)।

উঠা : (১) 'ওঠ হে ওঠ রবি আমারে তুলে লও' (উদিত হও—রবীন্দ্রনাথ)। (২) বাজারে বেশ ভাল ন্যাঙড়া আম উঠেছে (আমদানি)। (৩) এবার ধীরেনবাবু ছেলের বিয়ে দিয়ে জাতে উঠেছেন (পূর্ব মর্যাদা লাভ করা)। (৪) দিনের পর দিন রোগীর জ্বর উঠ্‌ছে (বাড়িতেছে)। (৫) আজকাল এক রব উঠেছে অধিক খাদ্য ফলাও (প্রচলিত)। (৬) 'উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত শুনেও শোনে না কানে' (সকল সময়—রবীন্দ্রনাথ)। (৭) গাছে উঠিয়ে মই কেড়ে নেবে নাকি? (তুলিয়া)। (৮) বন্যার্ত তহবিলে এক হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে (সংগৃহীত)।

করা : (১) সর্বদা নাম কীর্তন কর, মনে শান্তি পাবে (উচ্চারণ)। (২) একটা কিছু বুদ্ধি তোমায় করতেই হবে (উপায় উদ্ভাবন)। (৩) 'যাহা হউক, আমার মেয়েটির সঙ্গতি করিয়া গেলাম।' (সৎপাত্রেদান করা—রবীন্দ্রনাথ)। (৪) বাঃ! মণ্ডপটিতো সুন্দর করেছো (নির্মাণ)। (৫) প্রাচীনকালে চতুর্দোলায় চড়িয়া কন্যারা স্বামীর ঘর করিতে যাইত। (সংসার পরিচালনা)। (৬) 'এই করেছ ভাল নিঠুর এই করেছ ভালো।' (সম্পাদন—রবীন্দ্রনাথ)। (৭) 'মেঘের উপর মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ।' (সঞ্চারিত হওয়া—রবীন্দ্রনাথ)। (৮) অমল বিমলকে বেশ হাত করেছে (বশীভূত করা)।

কাটা : (১) দুধটা কেটে গেছে দেখছি। (নষ্ট হওয়া)। (২) রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা' বাজারে বেশ ভালোই কেটেছে (বিক্রীত)। (৩) বৈষ্ণবেরা নাকে রস-কলি কাটেন (আঁকেন)। (৪) 'সকাল বেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়' (অতিবাহিত—রবীন্দ্রনাথ)। (৫) রসিদ কেটে দিলেই টাকা পেয়ে যাবে (লেখা)। (৬) জিভ কাটিয়া সে কথাটা অস্বীকার করিল (লজ্জিত হইয়া খণ্ডন প্রচেষ্টা)। (৭) এমন মায়ের পেটে জন্মে কখনো চিরকাল এভাবে কাটাতে পারবে না।' (যাপিত হওয়া—শরৎচন্দ্র)। (৮) 'কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।' (দূর হওয়া—দ্বিজেন্দ্রলাল)।

খাওয়া : লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছ দেখ্‌ছি (লজ্জা গোপন করা)। (২) কাজটা করে দিলেই কিছু খাইয়ে দেব (ঘুষ)। (৩) কিল খেয়ে কিল চুরি করার মতো ক্ষমতা তার আছে (সহ্য করা)। (৪) দু'দিন অনুপস্থিতির অজুহাতে বড়বাবু আমার চাকুরি খেলেন (বরখাস্ত)। (৫) ঘুষ খায় অথচ বক-ধার্মিক সেজে বসে আছে (গ্রহণ করে)। (৬) 'পোড়ারমুখী, চোখের মাথা খেয়েছে।' (দেখিতে না পাওয়া—বঙ্কিমচন্দ্র)। (৭) চাঁদার টাকা খেয়ে ভালো ভালো জামা-কাপড় করেছে (আত্মসাৎ)।

ছাড়া : (১) ওস্তাদ যখন গলা ছাড়িয়া গান গাহিতেছিল তখন শুনিবার জন্য কেহই উপস্থিত ছিল না (উচ্চ-স্বরে)। (২) গরমের দেশ ছাড়িয়া এবার একটু শীতের দেশ ঘুরে আসি (পরিবর্তন করিয়া)। (৩) মিথ্যে কথা ছাড়তে ওর মতো ওস্তাদ আর নেই

(বলতে)। (৪) কালকের চিঠিগুলি সব ছেড়ে দিয়েছি (ডাকে দিয়েছি)। (৫) রমেনের জ্বর এখন একটু ছেড়েছে (কমেছে)।

তোলা : (১) আসাম দুর্গতি তহবিলে চাঁদা নেহাত কম তোলা হয়নি (সংগৃহীত)। (২) 'আমি বাঁধি তুলে পাল' (পাল খাটান—রবীন্দ্রনাথ)। (৩) চাকুরীর প্রস্তাবটা এ সুযোগে তুলতেই হবে (উত্থাপন করা)। (৪) এ কথা শিকায় তুলে রাখতে পার (অব্যবহার্য)। (৫) তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম (আরোহণ করান)।

থাকা : (১) এ কথা আমার মনে থাকিবে (জাগরূক)। (২) পিতা থাকতে ছেলের যাওয়া উচিত নয় (বর্তমান)। (৩) বিষয়টা এখন থাকুক—পরে সময় বুঝে শোনা যাবে (স্থগিত)। (৪) তোমার সন্তানেরা ভাল ভাত খেয়েই থাকবে (সাধারণ ভাবে বাঁচবে)। (৫) দেশে থাকতেই ম্যালেরিয়ায় ধরেছে (অবস্থান করা)। (৬) মান থাকলেই অপমান লাগে (অনুভব)।

দেখা : (১) তোমার ওসব লোক দেখান কাজ আমরা বেশ ভালই বুঝি (ভণ্ডামি)। (২) পত্রটা একটু দেখুন (পড়ুন)। (৩) রুগ্ন ছেলেটাকে দেখার জন্য একজন ধাত্রী দরকার (সেবা করার জন্য)। (৪) সময় থাকতে নিজের পথ নিজেই দেখ (অবলম্বন কর)। (৫) নাড়ী দেখিয়াই ডাক্তার রোগীর খবর জিজ্ঞাসা করিলেন (পরীক্ষা)।

ধরা : (১) ওকে ধরলেই কাজটা হয়ে যায় (অনুরোধ)। (২) 'ধর যদি পাও-ই, তোমার লাভটা কি হবে ?' (কল্পনা করা Suppose—সীতা দেবী)। (৩) দেশী পোষাক ত্যাগ করে সাহেবী সাজ ধরেছ দেখছি (পরিধান)। (৪) ওর ধরন-ধারণ মোটেই ভাল না (স্বভাব)। (৫) সেই গানটা আর একবার ধরতো (আরম্ভ কর)। (৬) ঠাণ্ডায় আমার গলাটা বেশ ধরেছে (স্বর-কষ্ট)। (৭) 'এ পাগলের কথা ধর, এখনো সরে পড়' (গ্রাহ্য কর—মুকুন্দ দাস)। (৮) 'আমি তাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা, এ যাত্রা আমায় ক্ষমা কর' (অনুনয় বিনয় করা—রবীন্দ্রনাথ)। (৯) 'পঞ্চাননকে ধরল এসে জমে' (মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া—রবীন্দ্রনাথ)।

লাগা : (১) 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে' (স্পর্শ করেছে—রবীন্দ্রনাথ)। (২) এ মাস থেকেই নূতন কাজে লেগে যাব (যোগদান করা)। (৩) জলের রাত্রে যত ঠাণ্ডা লেগেছে (অসুখ)। (৪) ওর হাতে মার খেলে বড্ড লাগে (যন্ত্রণা)। (৫) বোকা ছেলের পেছনে লাগতে সকলেই সচেষ্ট (উৎপাত করা)। (৬) 'অদ্ভুত লাগে তার শুনিঞা বচনে' (অনুভূতি হওয়া—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। (৭) 'কোন্ দেমাগী অহঙ্কারী গরব ক'রে যায়। দেখিস যেন চ'লে যেতে জল না লাগে গায়।' (স্পর্শ করা—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)। (৮) 'পারিজাতের কুঞ্জবনে স্বর্গপুরীতে। মৌমাছিরা লেগেছিল মধুচরিতে ॥' (নিবিষ্ট হওয়া—রবীন্দ্রনাথ)।

হওয়া ঃ (১) অনেক দিন হোল সরমার জ্বর হয়েছে (ব্যাধি হওয়া)। (২) গ্রীষ্মে আমাদের বাগানে অনেক আম হয় (ফলে)। (৩) চেষ্টা করলেই চাকরী হবে (জুটবে)। (৪) ফকির ছিল ; ভোটে জিতে এম, এল, এ হয়েছে (পদোন্নতি)। (৫) টাকা হয়েছে বলে দেমাকে আর মাটিতে পা পড়ে না (জমিয়াছে)। (৬) 'পুত্র হৈল দ্বিজবংশী মনসার বরে' (জন্মগ্রহণ করা—চন্দ্রাবতী)।

[৩] বিশিষ্টার্থক বিশেষণপদ ঃ

কাঁচা ঃ (১) কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকায় করে ট্যাঁস্ ট্যাঁস্ (নরম—প্রবচন)। (২) 'ওরে নবীন, ওরে কাঁচা' (তরুণ—রবীন্দ্রনাথ)। (৩) কাঁচা পয়সার মোহ অনেকেই ত্যাগ করিতে পারে না (সহজলভ্য)। (৪) ছেলেটি কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছে তাই এত কাঁদছে (সদ্য)। (৫) কাঁচা হাতের লেখা দেখলেই বুঝতে পারা যায় (অনিপুণ)। (৬) লোকটাকে চেনা নেই অথচ তার হাতে এতগুলি টাকা ছেড়ে দিয়ে বড় কাঁচা কাজ করেছ (দায়িত্বহীন)। (৭) কোন কোন অসভ্য জাতির লোকেরা কাঁচা মাংস খায় (আরাঁধা)। (৮) ছেলেটির মন এত কাঁচা যে, তাহাকে কোন কথা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না (কোমল)। (৯) 'বড় বোনের পাকা হাত, ছোট বোনের কাঁচা হাত' (অদক্ষ—রবীন্দ্রনাথ)। (১০) 'কাঁচা কাঠ জ্বলে ওঠে—নীল ধোঁয়া নরম মলিন (অশুষ্ক—জীবনানন্দ)।

খারাপ ঃ (১) অফিসের বড়বাবুর নিকট এরূপ খারাপ ব্যবহার পাব তাহা স্বপ্নেও ভাবিনি (অভদ্র)। (২) এইরূপ খারাপ কাপড় পরে স্কুলে যাওয়া যায় না (নিকৃষ্ট)। (৩) খারাপ সময়ে তথাকথিত বন্ধুর দল আসবে না (দুর্দিন)। (৪) সেদিন তোমাদের বাড়ীতে খেয়ে এসে পেট খারাপ করেছে (অজীর্ণ রোগ)। (৫) সমীর বাবুর নূতন গাড়ীখানা একেবারেই খারাপ হয়ে গ্যাছে (বিকল)। (৬) মন খারাপ করে লাভ কি এবার একটু কষ্ট করে পড়লেই পাশ করবে (দুঃখিত হওয়া)।

পাকা ঃ (১) 'ব্যাটা সাধু বেশে পাকা চোর অতিশয়' (নিপুণ—রবীন্দ্রনাথ)। (২) 'তাতে কিছু হয়তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরেনি' (পরিণতি—রবীন্দ্রনাথ)। (৩) কাল লিলির পাকা দেখা তোমাকে আসতেই হবে (আশীর্বাদ)। (৪) আমি এ বিষয়ে পাকা কথা দিয়েছি (চূড়ান্ত)। (৫) নিজের বুদ্ধিতে কাঁচা কাজ না করে পাকা মাথার বুদ্ধি নিও (প্রবীণ ব্যক্তি)। (৬) আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি ? (সর্বনাশ করা)। (৭) তোমার বয়স কম হলে কি হবে—তুমি একটি পাকা ছেলে (অকালপক্ব)। (৮) পাকা বাড়ীতে বাস করে বস্তির লোকেদের দুঃখ বোঝা যায় না (ইষ্টক নির্মিত)। (৯) পাকা চুলে সিঁদুর পরো এই আশীর্ব্বাদ করি (বৃদ্ধবয়সে)।

ফাঁক ও ফাঁকা ঃ (১) 'সে বছর ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি'

(উপরি পাওয়া—রবীন্দ্রনাথ)। (২) 'যথোচিত পরিমাণে ভুলতে করো সুরু যাতে ফাঁক পড়ে সময়ের মাঝে' (বিরতি—রবীন্দ্রনাথ)। (৩) 'তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই নতুন বসন্তের হাওয়া আসে' (ছিদ্র—রবীন্দ্রনাথ)। (৪) ফাঁকা বুলিতে দেশনেতারা আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছেন (মূল্যহীন-উক্তি)। (৫) ফাঁকা মাঠের হাওয়ায় বসে রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশী (উন্মুক্ত মাঠ)। (৬) ছেলেটি কথায় বেশ চালাক-চতুর, ভেতর কিন্তু ফাঁকা (মূর্খ)।

ভাঙা ঃ (১) মাতার মৃত্যুতে সমর মন ভাঙা হয়েছে (নিরাকার বিষণ্ণ)। (২) মেজবউ সংসারে আসিয়াই ঘরে ভাঙন ধরাইতে আরম্ভ করিয়াছে। (মনোমালিন্য সৃষ্টি করা)। (৩) হাড-ভাঙা খাটুনি খেটেও কোন কিছু সুবিধা হলো না (কঠোর পরিশ্রম)। (৪) সন্ধ্যার পরই গাঁয়ের হাট ভাঙিয়া গেছে (শেষ)। (৫) শিশুদের প্রথম ভাঙা ভাঙা কথা বেশ শ্রুতিমধুর (অস্পষ্ট কথা)। (৬) ভাঙা টাকা আনা ছিল খরচ হয়েছে (খুচরো টাকা)। (৭) 'মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে ?' (ধ্বংস করা—রবীন্দ্রনাথ)। (৮) একটা কাচের বাসন ভাঙলেও লোকে 'আহা' করে, কিন্তু বুক ভাঙলে জেনেও কেউ জানতে চায় না' (নজরুল)।

সাদা ঃ (১) দুই চতুর লোকের সঙ্গে এত সাদা মন নিয়ে কাজ করো না (সরলতা)। (২) সাদা কথায় কাজ হবে না ; কিছু উত্তম মধ্যম দেওয়া দরকার (সহজ উপায়ে)। (৩) এত ভণিতা রেখে বিষয়টা সাদা করেই বল (স্পষ্টভাবে)। (৪) সাদা কাগজের বুকে কালো কালির আঁচড় কেটে যাই (অলিখিত)।

[৪] সর্বনাম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ ঃ

কি ঃ (১) 'কি আর কহিব তোরে' (কিছু বলার নাই—চণ্ডীদাস)। (২) কি কন্যা, কি পুত্র, কি স্ত্রী, কি স্বামী, সংসারে সকলেরই দায়িত্ব আছে (অথবা অর্থে)। (৩) স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাহার কি যেন হইয়াছে (সাধারণ হইতে অন্যরকম)। (৪) কি কথা বলতে কি কথা বলে ফেলে (সর্বনাশ)। (৫) 'সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি কি কহিছে স্বর্গ জানে' (সর্বনাম—রবীন্দ্রনাথ)। (৬) 'তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি, বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে' (সর্বনাম—রবীন্দ্রনাথ)।

কোন্ ঃ (১) কোন্ দিন ঝড় এসে তোমার কাচা ঘর ভেঙে দিয়ে যাবে (অনির্দিষ্ট দিনে)। (২) ওরা ঝগড়া করেছে বলে শাস্তি পেয়েছে ; কিন্তু তুমিই বা কোন্ সাধু ব্যক্তি (বিশেষণের বিশেষণ)। (৩) কোন্টা ন্যায়, কোন্টা অন্যায় সে জ্ঞান আমাদের আছে, তোমাকে বুঝিয়ে না দিলেও চল্তো (দুইয়ের মধ্যে এক)।

ঐ—(অই, ওই) ঃ (১) 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' (সর্বনাম প্রয়োগ) (২) ঐ লোকটার জন্যই আজ সর্বনাশ হয়ে গেল (বিশেষণ)। (৩) ঐ যা বি[illegible]

বলিতে গেলাম আর কি কথা বলিয়া ফেলিলাম (অব্যয় প্রয়োগ)। (৪) 'ঐ গো ঐ বাজে বাঁশী' (গিরিশচন্দ্র)।

এঃ (১) 'এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর' (অব্যয়—বিদ্যাপতি)। (৩) 'আমার এ পথ' (বিশেষণ—রবীন্দ্রনাথ)। একে দিয়ে এ কাজ—চালানো যেতে পারে (সর্বনাম প্রয়োগ)।

এই : (১) 'এই করেছ ভালো নিঠুর এই করেছ ভালো' (সর্বনাম প্রয়োগ)। (২) এই নদী এই গ্রাম যেন রূপ-কাহিনীর স্বপ্ন দিয়ে গড়া (বিশেষণ প্রয়োগ)। (৩) এই রে এই সেরেছে, মাস্টারমশাই এই দিকেই অসেছেন। এখন দেখছি সব কাজ মাটি হয়ে গেল (অব্যয়)।

যে : (১) সে একজন যে সে লোক নয়—তার কথায় অনেকেই উঠে বসে (অসমান্য)। গতকাল যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে তাতে বড় কারখানাটা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে (বিশেষণ প্রয়োগ)। (৩) কি যে হবে কে জানে (সংশয়ার্থে)। (৪) এ প্রশ্নের উত্তর যে সে বলতে পারে (সাধরণে)। (৫) 'যে যায় সে চলে যাক্, নাম তার যাক্ মুছে দিয়ে' (সর্বনাম) (রবীন্দ্রনাথ)।

সে : (১) আজ অনেক দিন হোল সে বাড়ী যায় না (সর্বনাম)। (২) সেইত আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ (অব্যয়)। (৩) যেইমাত্র সে আসিল সেইমাত্র সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিল (সঙ্গে সঙ্গে)। (৪) 'সেদিন নদীর নিকষে আঁকিল প্রথম সোনার লেখা' (রবীন্দ্রনাথ)।

সব : (১) সব গ্রামেই পুকুর আছে, মাঠ আছে, আর আছে প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য (বিশেষণ)। (২) তাহার সবই আছে নাই কেবল অন্তঃকরণ (বিশেষ্য)। (৩) তাহার সব খবরই আমার জানা (সর্বনাম)।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদগুলি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :

আগুনে জল পড়া ; ডান হাতের ব্যাপার ; আপনার বেলা আঁটি সাঁটি ; মুখে ফুল চন্দন পড়া।

২। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির অর্থের বিভিন্নতা বুঝাইয়া বাক্য রচনা কর :

চরকা কাটা ; পটল তোলা ; ডুবে ডুবে জল খাওয়া ; বিষম লাগা ; ভাতে মারা।

৩। 'কাঁচা ও 'মুখ' এই দুইটি শব্দের প্রত্যেকটির চারিটি বিশিষ্ট বা রীতিসিদ্ধ (Idiomatic) প্রয়োগ অবলম্বন করিয়া সর্বসমেত আটটি বাক্য রচনা কর।

(ক. প্র. ১৯৫০)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রবচন-বাক্য ও বাগ্‌ধারা

(Idioms and Proverbs)

বাগ্‌ধারা সকল দেশের ভাষার ঐশ্বর্য। বাক্যের অন্যতম প্রধান ভাষা বাঙলাতেও তাহার বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি রহিয়াছে। কোনো ভাষার বাগ্‌ধারা এবং তাহাদের শুদ্ধ প্রয়োগ যে না শিখিয়াছে, সে ভাষায় তাহার অধিকার হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। সুনিপুণ প্রয়োগেই বাগ্‌ধারা শিক্ষার সার্থকতা। বাক্য এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যে শুনিবামাত্রই যেন বাক্যের মধ্যবর্তী বাগ্‌ধারার সূক্ষ্ম ও সুন্দর অর্থটি পরিস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

নিম্নে কতকগুলি প্রবচন বাক্য ও বাগ্‌ধারার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :

[১] **অকাল-কুষ্মাণ্ড** (অপদার্থ)—ভদ্রলোকের বড় ছেলেটির উপর অনেক আশা ছিল ; কিন্তু কুপথে গিয়ে সে একটি 'অকাল-কুষ্মাণ্ড' হয়েছে।

[২] **অমাবস্যার চাঁদ** (অদৃশ্য)—টাকা নিয়ে যদি চলে গিয়ে থাকে তবে বাকী জীবনটা সে তোমার কাছে 'অমাবস্যার চাঁদ' হয়ে থাকবে।

[৩] **অরণ্যে রোদন** (নিষ্ফল আবেদন)—লাখপতি বলে কি হবে, কৃপণের দলে সে একজন নেতা বল্‌তে পার ; তার কাছে বন্যার্তদের জন্য চাঁদা চাওয়া 'অরণ্যে রোদনের' সামিল।

[৪] **অহি-নকুল সম্বন্ধ** (সর্বদা বিবাদমান)—এমন ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ আর দেখা যায় না ; ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বড় ভাইয়ের যেন 'অহি-নকুল সম্বন্ধ'।

[৫] **অর্ধচন্দ্র দেওয়া** (গলা ধাক্কা)—বড় বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম যাতে বরখাস্ত না করেন, কিন্তু দারোয়ানই 'অর্ধচন্দ্র' দিয়ে দিল।

[৬] **অষ্ট-রম্ভা** (অ-কাজের)—কাজের বেলায় 'অষ্ট-রম্ভা', অথচ মুখে বড় বড় কথা।

[৭] **অন্তর-টিপুনী** (মর্মপীড়াদায়ক)—তাহার 'অন্তর-টিপুনী' কথা সহ্য করিতে না পারায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

[৮] **অনুরোধে ঢেঁকি গেলা**—(অসঙ্গত কাজ করা)—কাজটা ভালো হয়নি, তবু প্রধান শিক্ষককে বল্‌লে ক্ষমা করবেনই—'অনুরোধে মানুষ ঢেঁকিও গেলে'।

[৯] **অকূলে কূল পাওয়া** (অসহায় অবস্থায় সাহায্য পাওয়া)—দুর্দিনে বহুদিন পূর্বের পাওনা টাকা পাইয়া তিনি 'অকূলে কূল' পাইলেন।

[১০] **অন্ধের নড়ি** (নিঃস্বের একমাত্র সম্বল)—'আমার মেয়েটি কে'ড়ে নিয়ো না বাবা—এ আমার 'অন্ধের নড়ি', খেতে পাবো না।' (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

[১১] **আকাশ কুসুম** (অলীক্ কল্পনা)—'আমি, কেবলই আপন করেছি বপন বাতাসে। তাই 'আকাশ কুসুম' করিনু চয়ন হতাশে' (রবীন্দ্রনাথ)

[১২] **আক্কেল সেলামী** (বোকামির শাস্তি)—পরের কথায় মোকদ্দমা লাগিয়ে এখন পাঁচশো টাকা 'আক্কেল সেলামী' দিতে হোল।

[১৩] **আগাগোড়া** (আদ্যোপান্ত)—রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা', নজরুলের 'সঞ্চিতা' আমি 'আগা-গোড়া' পড়েছি।

[১৪] **আঙুল ফুলে কলাগাছ** (দরিদ্রের ধনীতে রূপান্তর)—সামান্য কেরানীগিরি করতো, লটারীর টাকা পেয়ে' তাহার এখন 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হয়েছে।

[১৫] **আদাজল খেয়ে লাগা** (শপথবদ্ধ হইয়া কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ)—যথাক্রমে তৃতীয়বার নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবার পর চতুর্থবাবেব জন্য সে 'আদাজল খাইয়া' লাগিয়াছে।

[১৬] **আদায় কাঁচকলায়** (পরস্পর বিরোধী)—'আমাদের ভাব কেমন জামাই-শ্বশুরে ? যেমন পাখী আর সাতনলায়, যেমন 'আদায় আর কাঁচকলায়' (দাশরথি রায়)।

[১৭] **আষাঢ়ে গল্প** (অবিশ্বাস্য গল্প)—তুমি তো দেখ্‌ছি তালপাতার সিপাই, তুমি জেগে উঠ্‌তেই ডাকাতেরা ছুট্ দিল !—এটা সত্য না 'আষাঢ়ে গল্প' ?

[১৮] **আমড়া কাঠের ঢেঁকি** (অপদার্থ)—ছেলেটা আগে বেশ কাজকর্ম করতে পারত ; এখন দিন দিন 'আমড়া কাঠেব ঢেঁকি' হয়ে উঠ্‌ছে।

[১৯] **আঠার মাসে বছর** (আলস্যতা)—ওর কাছে দিয়েছে তুমি দু'মাসে বই লিখে শেষ করে দিতে ; ওর তো 'আঠার মাসে বছর'।

[২০] **আকাশ ভাঙিয়া পড়া** (আকস্মিকভাবে দারুণ অনর্থ ঘটা)—ভারতীয় সেনার আক্রমণে গোয়ায় সৈন্যবাহিনীর মাথায় 'আকাশ ভাঙিয়া পড়িল'।

[২১] **ইঁচড়ে পাঁকা** (অকালপক)—অল্প বয়সেই লম্বা কথা বলে ছেলেটা ধরাকে সরা জ্ঞান করে—একেবারে 'ইঁচড়ে পেকে' গেছে।

[২২] **ঈদের চাঁদ** (বিরল-দৃষ্ট)—তোমাকে এখন দেখাই ভার আজকাল একেবারে 'ঈদের চাঁদ' হয়েছ দেখছি।

[২৩] **উত্তম মধ্যম** (প্রহার)—'দস্যুতস্কর ধরা পড়িলে গ্রামবাসীরাই 'উত্তম মধ্যম' দিয়া সংক্ষেপে বিচার কর্ম সমাধা করিয়া ফেলিত।'

(অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)

[২৪] **উলুবনে মুক্তা ছড়ানো** (অপাত্রে উপদেশ)—ওকে তুমি গীতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছ! এতো তোমার 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' হচ্ছে।

[২৫] **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে** (একের দোষ বা দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া)—ঘড়ি চুরি করেছে একজন, পুলিশ ধরলে আর একজনকে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপিয়ে দিলে।

[২৬] **এক হাতে তালি বাজে না** (একজনের পক্ষে আর ঝগড়া সম্ভব নয়) তুমি এমন বলছ যেন ঝগড়ার সব দোষই তার, কিন্তু 'এক হাতে তো তালি বাজে না' ভাই।

[২৭] **একাদশে বৃহস্পতি** (অত্যন্ত সুসময়)—সে এখন যে দিকে হাত দিচ্ছে সে দিকেই কৃতকার্য হচ্ছে—তার এখন 'একাদশে বৃহস্পতি' যোগ।

[২৮] **একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ** (মন্দের উপর আরো মন্দ)—কোন রকমে দিন এনে দিন খাচ্ছিলাম, ঝড় এসে আবার চালের খড় উড়িয়ে নিল। 'একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ' লেগেছে।

[২৯] **এক মাঘে শীত যায় না** (সব সময়েই দুঃসময় থাকে না) গরীব পেয়ে পাঁচকথা শুনিয়ে দিলে; কিন্তু জেনো 'এক মাঘে শীত' যায় না!

[৩০] **এক হাত লওয়া** (প্রতিশোধ)—অনেক কষ্ট সহ্য করার পর এবার বাগে পাইয়া তাহাকে 'এক হাত লইয়াছি'।

[৩১] **একচোখা** (পক্ষপাতিত্ব)—সব সময়েই ওর পক্ষ টেনে কথা বল্‌বে—তোমার মতো 'একচোখা' লোক দেখিনি।

[৩২] **ওজন বুঝে চলা** (নিজ শক্তি বুঝে চলা)—নিজের 'ওজন বুঝে চল্‌লে' সকল কাজেই কৃতকার্য হওয়া যায়।

[৩৩] **ঔষধ ধরা** (ফল ফলিতে আরম্ভ করা)—কিছু দিন উত্তম মধ্যম দেওয়ার পর দুরন্ত ছেলে শান্ত হয়েছে—'ঔষধ ধরেছে' দেখছি।

[৩৪] **কলুর বলদ** (পরাধীনভাবে যে অবিরাম খাটে) আমরা যেন সব 'কলুর বলদ'; মুখবুজে দিনরাত উপরওয়ালার হুকুম তামিল ক'রেই চলেছি।

[৩৫] **কলির সন্ধ্যা** (দুঃসময়ে সূত্রপাত)—বিয়ে করেই বল্‌ছো পয়সার অভাব। এই তো সবে 'কলির সন্ধ্যা'।

[৩৬] **কপাল ফেরা** (সৌভাগ্যের উদয় হওয়া)—অনেকবার যথারীতি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার পর তার 'কপাল ফিরেছে'। এবার সে পাশ করেছে।

[৩৭] **কত ধানে কত চাল** (অভিজ্ঞতা অর্জন)—পরীক্ষার জন্য এখনো প্রস্তুত হচ্ছ না। পরে যখন পরীক্ষা এসে যাবে তখন বুঝবে 'কত ধানে কত চাল'।

[৩৮] **কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরের পিসী** (যে দুই পক্ষেই যোগ দেয়)—গ্রামের বিন্দীঠাকরুণ হলেন 'কনের ঘরের মাসী, আর বরের ঘরের পিসী'। তিনি এর কথা ওকে শোনান, ওর কথা তাকে বলেন; ফলে ঘরে ঘরে ঝগড়া লেগেই আছে।

[৩৯] **কাঠের পুতুল** (জড়বৎ নিষ্ক্রীয়)—'কাঠের পুতুলে'র মতো বসে না থেকে অন্ন জোগাড়ের চেষ্টা কর।

[৪০] **কুরুক্ষেত্র ব্যাপার** (তুমুল বিবাদ)—সামান্য কথা থেকে শেষকালে একটা 'কুরুক্ষেত্র ব্যাপাব' ঘটে গেল।

[৪১] **কাটাঘায়ে নুনের ছিটে** (কষ্টের উপর কষ্ট)—একে আমার অন্নাভাব; তার উপর তুমি টাকা ধার চেয়ে 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' দিলে।

[৪২] **কিল খেয়ে কিল চুরি** (অপমান গোপন করা)—সেদিন এত অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও সে পুনরায় ক্লাবে আসতে শুরু করেছে। 'কিল খেয়ে কিল চুরি'র ক্ষমতা আছে বলতে হবে।

[৪৩] **কাঁঠালের আমসত্ত্ব** (অসম্ভব বস্তু)—তোমার মত কৃপণ লোক দেবে বন্যা তহবিলে পাচশো টাকা চাঁদা! 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' দেবে দেখছি।

[৪৪] **কান ভাঙ্গানো**—(কাহারও বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দেওয়া)—স্ত্রীর 'কান ভাঙ্গানি'তে বিবক্ত হইয়া লোকটি তাহার ছোট ভাইকে পৃথক করিয়া দিলেন।

[৪৫] **কানে তুলো দেওয়া** (কিছু না শোনা)—তাহার অশ্লীল কথায় 'কানে তুলো' দিতে বাধ্য হইলাম।

[৪৬] **কেঁচে গণ্ডুষ করা** (নূতন করে আরম্ভ করা)—বহু চেষ্টার পর অঙ্কটা না হওয়া সত্ত্বেও আবার 'কেঁচে গণ্ডুষ' করতে হচ্ছে।

[৪৭] **কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুলো** (সামান্য ব্যাপার হইতে গুরুতর পরিস্থিতি)—ভণ্ডুল মামাকে আবার ঘাটতে আরম্ভ করেছ; দেখো, 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' না বেরিয়ে আসে।

[৪৮] **কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা** (দুর্বৃত্তকে দুবৃত্ত দিয়া দমন করা)—গুণ্ডা ছেলেটির পেছনে এবার হাবু গুণ্ডাকে লাগিয়ে দাও, দেখবে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা' হবে।

[৪৯] **কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা** (অসময়ে নষ্ট হওয়া)—সাইকেলটা কিনতে না কিনতেই খারাপ হয়ে গেল ; 'কাঁচা বাঁশেই ঘুণ' ধরলো দেখছি।

[৫০] **খয়ের খাঁ** (তোষামদকারী)—তৎকালীন অনেক ধনীব্যক্তিই ইংরেজেদের 'খয়ের খাঁ' ছিলেন।

[৫১] **খাল কেটে কুমীর আনা** (ইচ্ছাপূর্বক শত্রু আনা)—এত বিবাদের পরেও আবার তাকে ঘরে স্থান দিয়েছ ? নিজেই দেখছি 'খাল কেটে কুমীর' আনলে।

[৫২] **গ'লে যাওয়া** (আত্মহারা হওয়া)—'ভাইতো! এক ফোঁটা চোখের জলে 'গ'লে গেল' খাঁ সাহেব!' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

[৫৩] **গোকুলের ষাঁড়** (অপদার্থ)—বড়লোকের ছেলে সে, খাওয়া-পরার চিন্তা নেই ; দিনরাত 'গোকুলের ষাঁড়ে'র মতো সহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়।

[৫৪] **গোবর-গণেশ** (নির্বোধ)—ছেলেটি একেবারে 'গোবর-গণেশ' অঙ্ক তার মাথায় মোটেই ঢোকে না।

[৫৫] **গণেশ উল্টানো** (তুলিয়া দেওয়া)—দু'মাস যেতে না যেতেই ব্যবসায় 'গণেশ উল্টে' বসে আছ ?

[৫৬] **গৌরচন্দ্রিকা** (ভূমিকা)—এত 'গৌরচন্দ্রিকা' রেখে এখন আসল কথাটা খুলে বল।

[৫৭] **গায়ে পড়া** (অযাচিতভাবে)—'গায়ে পড়ে' ঝগড়া করা এক ধরণের মানুষের বদ্ অভ্যাস।

[৫৮] **গলায় গলায়** (অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা)—শৈলেন ও বিনয়ের মধ্যে 'গলায় গলায়' ভাব, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

[৫৯] **গলা-খাটো** (নিম্ন-স্বর)—'বেণী একটু সরিয়া আসিয়া 'গলা খাটো' করিয়া বলিল।' (শরৎচন্দ্র)

[৬০] **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল** (হবার আগেই হয়ে গেছে বলে ভাবা)—অজিত-বাবু আসবেন তবে তুমি টাকা পাবে ; আগেই লাফাচ্ছো ? যেন 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'।

[৬১] **গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না** (স্থানীয় লোকের সম্মান নাই)—অচিন্ত্যবাবু এতবড় কবি, তবু স্থানীয় লোকেরা তাঁকে মোটেই আদর করে না ; 'গেঁয়ো যোগী' বলে তার ভিক্ষে নেই।

[৬২] **ঘোড়ার ডিম** (কিছুই না)—কাজতো করবে 'ঘোড়ার ডিম' কেবল টাকার জন্য ফাঁকা কথা বলছে।

[৬৩] **ঘরের ঢেঁকি কুমীর** (অজানা গৃহ-শত্রু)—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে অনেক 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর' ছিল।

[৬৪] **ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া** (প্রকৃত পথ অবলম্বন না করা)—বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে না জানিয়ে সোজাসুজি সম্পাদককে জানানোটা 'ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া' হয়েছে।

[৬৫] **ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়** (নির্যাতিত ব্যক্তি সামান্য কিছু দেখিয়াই ভীত হয়)—রামবাবু জীবনে অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন; এখন সামান্য বালকটিকেই ভয় পাচ্ছেন, 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়'।

[৬৬] **ঘরে ছুঁচোর কীর্তন বাইরে কোঁচার পত্তন** (ঘরে অভাব অথচ বাইরে ঠাক্-ঠমক্)—দু'বেলা রীতিমত অন্ন জুটেনা অথচ পোষাকের বাহারে চোখ ঝলসে যায়; 'ঘরে ছুঁচোর কীর্তন বাইরে কোঁচার পত্তন'।

[৬৭] **চক্ষুঃশূল** (যাহা চোখে দেখলে অন্তর বিষিয়ে ওঠে)—সবচেয়ে সুন্দর দেখায় গঙ্গার উপরে নৌকাগুলি যার কলরব প্রত্যক্ষ হ'য়েও 'চক্ষুঃশূল, হচ্ছে না।' (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[৬৮] **চিনির বলদ** (ভারবাহী, ফলভোগী নয়)—ডাক-হরকরা হচ্ছে 'চিনির বলদ' পিঠে তার টাকার বোঝা অথচ সে টাকা ছুঁয়ার অধিকার তার নেই।

[৬৯] **চোখের বালি** (যাহাকে সহ্য করা যায় না)—সতীনের মেয়েটি নূতন বউয়ের 'চোখের বালি' হয়েছে।

[৭০] **চোখের চামড়া** (লজ্জা-সংকোচ)—'তোদের কি 'চোখের চামড়া' পর্যন্ত নেই ?' (শরৎচন্দ্র)

[৭১] **চুলোয় যাওয়া** (ধ্বংস হওয়া)—'রাধা 'চুলোয় যাক্' তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না' (বঙ্কিমচন্দ্র)

[৭২] **চক্ষু চড়ক গাছ** (অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হওয়া)—উপেনদা মারা গেছেন শুনে তো আমার 'চক্ষু চড়ক গাছ' হয়ে উঠল।

[৭৩] **চক্ষুদান করা** (চুরি করা)—কোন মহাত্মা ব্যক্তি আমার কব্জি ঘড়িটিকে 'চক্ষুদান করেছেন'।

[৭৪] **চোখের মাথা খাওয়া** (অসতর্ক হইয়া দেখিতে না পাওয়া)—হাতের কাছে বইটা দেখতে পাচ্ছ না; 'চোখের মাথা খেয়ছ' নাকি ?

[৭৫] **চোখে সরষের ফুল দেখা** (বিপদে নিরুপায় মনে হওয়া)—আগে থেকে ভাল করে পড়াশুনা না করলে পরীক্ষায় সময় 'চোখে সরষের ফুল' দেখতে হয়।

[৭৬] **চোখে ধুলো দেওয়া** (ফাঁকি দেওয়া)—আমার 'চোখে ধুলো দিয়ে' সে কখন বাইরে চলে গেছে।

[৭৭] **ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো** (সামন্য কাজের জিনিস)—আমরা যে সব 'ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো' ঐ সব তুচ্ছ কাজের জন্যই আমাদের ডাক পড়ে।

[৭৮] **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ** (সামান্য বিষয়ে বদনাম করা) দশ টাকা ঘুষ খেয়ে তুমি 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ' করো না।

[৭৯] **ছাই চাপা আগুন** (প্রচ্ছন্ন প্রতিভা)—দেশের অনেক অপরিচিত কবি-সাহিত্যিক 'ছাই চাপা আগুনের' মতো নিজেদের অপ্রকাশিত করে রাখেন।

[৮০] **ছেলের হাতে মোয়া** (সামান্য জিনিস)—একি 'ছেলের হাতের মোয়া' পেয়েছ যে, দুমাস পড়েই পরীক্ষায় পাশ করে ফেলবে।

[৮১] **জিলিপীর প্যাঁচ** (কুটিল বুদ্ধি)—সরল লোক ভেবে ওকে বিশ্বাস করো না যেন ; ওর পেটে কিন্তু 'জিলিপীর প্যাঁচ'।

[৮২] **ঝোপ বুঝে কোপ মারা** (সুযোগ বুঝিয়া কাজ হাসিল করা)—যথাসময়ে 'ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছ' বলেই চাকুরীটা তোমার হোল।

[৮৩] **ঝিঙের ফুল ফোটা** (জীবনের অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসা)—

'আর বেলা নাই 'ফুটলো ঝিঙের ফুল'
তোর প'ড়লো দাঁত আর পাকলো চুল ॥' (নীলকণ্ঠ)

[৮৪] **ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো** (একজনকে শাস্তি দিয়া অপরকে শিক্ষা দেওয়া) – ঝগড়ার জন্য বটকৃষ্ণবাবু নিজের ছেলেকে মেরে ও বাড়ীর আজতকে শিক্ষা দিলেন—এ যেন 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো'।

[৮৫] **টাকার গরম** (ধনের অহংকার)—মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরে ঘুরে, ভালো ভালো জামা কাপড় পরে 'টাকার গরম' দেখাচ্ছ নাকি ?

[৮৬] **টনক নড়া** (জ্ঞান হওয়া)—অভাবে তার 'টনক নড়েছে' যে, না খাটলে এই দুনিয়ায় পয়সা নেই।

[৮৭] **ঠোঁটকাটা** (স্পষ্টবাদী)—জমিদারের মুখের উপর এভাবে কথা বল্‌লো যে জমিদার একেবারে হা হয়ে গেলেন—'ঠোঁটকাটা' লোক বলেই বল্‌তে সাহস করলো।

[৮৮] **ডুব-মারা** (নিখোঁজ হওয়া)—এতগুলি টাকা নিয়ে সে এখন কোথায় 'ডুব মেরেছে' কে জানে।

[৮৯] **ঢিমে তেতালা** (অত্যন্ত মন্দগতি)—অমন করে 'ঢিমে তেতালা'য় চললে আজ আর ট্রেন ধরতে হবে না।

[৯০] **ডুবে ডুবে জল খাওয়া** (অন্যের অগোচরে কোন গোপন কাজ করা)—"কেমন দেখ্‌তে বল দেখি'——'খুব কালো আর রোগা'—তাহ'লে বুঝলাম খুব ফর্সা আর মোটা—এই যে বললি দেখিস্‌নি ? 'ডুবে ডুবে জল খাস' দিদি ?" (মনোজ বসু)

[৯১] **তেলে বেগুনে জ্বলা** (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া)—প্রশান্তর কথা শুনে হেডমাষ্টার মহাশয় একেবারে 'তেলে বেগুনে জ্ব'লে' উঠলেন।

[৯২] **তিলকে তাল করা** (ছোটকে বড় করা)—সামান্য বিষয়টিকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বিরাট করে তুলেছে—'তিলকে তাল করা' আর কি।

[৯৩] **দক্ষযজ্ঞ** (বিশৃঙ্খলা)—আসামের ব্যাপারে লোকসভায় সেদিন 'দক্ষযজ্ঞে'র ব্যাপার ঘটে গেল, কোন কিছুই হলো না। শুধু হৈ চৈ।

[৯৪] **দাঁও মারা** (বড় রকমের লাভ করা)—শেয়ারের বাজারে এবার সে একটা বড় রকমের 'দাঁও মেরেছে'।

[৯৫] **দিনকে রাত করা** (সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য করা)—"বলবি, ছোটবাবু চড়াও হ'য়ে তোকে মেরেচে। তোবা! তোবা! 'দিনকে রাত কর্‌তি' বলো ; বড়বাবু! (শরৎচন্দ্র)

[৯৬] **ধামা ধরা** (খোসামোদ করা)—বড়লোকের 'ধামা ধরে' যদি অন্নের সংস্থান করতে হয়, ধিক্‌ তার জীবনকে।

[৯৭] **ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির** (মিথ্যাবাদীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তি)—আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াই অভ্যাস, আজ এখানে শপথ করে বলছেন যে, তিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেন না—'ধর্ম পুত্র যুধিষ্ঠির' সেজেছেন।

[৯৮] **ননীর পুতুল** (অল্প শ্রমেই কাতর)—এমন 'ননীর পুতুল' হলে এই নিষ্ঠুর সংসারে টিক্‌তে পারবে না, আরও শক্ত হতে হবে।

[৯৯] **পটল তোলা** (মারা যাওয়া)—হাড়-জ্বালানো লোকটা 'পটল তোলাতে' অনেকেই স্বস্তি পাইল।

[১০০] **পোয়া বারো** (খুব সুবিধা)—ম্যানেজার শ্রীমন্তের ভগিনীপতি হওয়ায় তার হয়েছে 'পোয়া বারো'—যখন খুশী অফিসে যায় আসে।

[১০১] **পরকাল ঝরঝরে** (ভবিষ্যৎ নষ্ট)—অসৎ সঙ্গে মিশে 'পরকাল ঝরঝরে' করে তুল্‌ছো, সময় থাক্‌তে ঐ সঙ্গ ছাড়।

[১০২] **প্রহারেণ ধনঞ্জয়** (নাছোড়বান্দাকে প্রহার দিলে তবে ছাড়িয়া যায়)—মিষ্টি কথায় সে এখান থেকে যাবে না ; একে তাড়াবার পথ হচ্ছে একমাত্র 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'।

[১০৩] **ফাটল ধরানো** (বিভেদ সৃষ্টি করা)—'বাঙালী হ'য়ে বাঙলা ভাষার মধ্যেও 'ফাটল ধরাবার' চেষ্টা সম্ভবপর হয়েছে।' (রবীন্দ্রনাথ)

[১০৪] **বক-ধার্মিক বা বিড়াল তপস্বী** (কপট)—মুখে হরিনাম করেন অথচ সুদের এক পয়সাও ছাড়তে রাজী নন; এমন 'বক-ধার্মিক' (বিড়াল তপস্বী) কে তুমি ভেবেছ বৈষ্ণব ?

[১০৫] **ব্যাঙের সর্দি** (অসম্ভব ব্যাপার)—যে পকেট মেরে মাসে মাসে জেলে যায় তাকে দেখাচ্ছো জেলের ভয়—'ব্যাঙের আবার সর্দি'।

[১০৬] **বর্ণচোরা আম** (ছদ্মবেশ)—ওকে দেখ্‌লে বা ওর কথা শুন্‌লে বুঝতে পারবে না যে উনি একজন কবি—এমন 'বর্ণচোরা আম'।

[১০৭] **বিনা মেঘে বজ্রপাত** (অকস্মাৎ দুর্যোগ)—ভালো ছেলে বিলেত গেল সেদিন, সে নাকি মারা গেছে। এ যে দেখছি 'বিনা মেঘে বজ্রপাত'।

১০৮] **বুকেরপাটা** (সাহস)—'বাঙলার গত দুই হাজার বৎসরের প্রকৃত ইতিহাস প্রচার প্রয়োজন এবং নির্ভয়ে সত্য কথা বলিবার 'বুকের পাটার'ও প্রয়োজন।' (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়)

[১০৯] **ভিজে বিড়াল** (বাহিরে নিরীহ অথচ ভিতরে দুষ্ট ও চতুর)—সাধন সেন একজন 'ভিজে বিড়াল' জানে সবই অথচ ভাব দেখায় কিছুই জানে না।

[১১০] **মাটির মানুষ** (নরীহ)—নিষ্ঠুর সংসারে 'মাটির মানুষ' হইলে জীবনে তার অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হয়।

[১১১] **মাথা হেঁট করা** (অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করা)—'বাঙালীর ছেলেকে 'মাথা হেঁট ক'রতে হয় শুধু কেবল বাঙলা ভাষা জানি বলতে।' (রবীন্দ্রনাথ)

[১১২] **ম্যাও ধরা** (ঝুঁকি লওয়া)—দিন দিন শরীরের উপর যা অত্যাচার করেছ, অসুখ হলে 'ম্যাও ধরবে কে' ?

[১১৩] **মিছরীর ছুরি** (মুখে মিষ্টি, হৃদয়ে বিষ)—ওকে চেনোনা তাই ওর সঙ্গে মিশ্‌ছো। ও যখন 'মিছরীর ছুরি মারবে' তখন বুঝতে পারবে।

[১১৪] **মুখোস পরা**—(মহত্ত্বের আবরণে ক্রূর হীনতাকে ঢাকিয়া রাখা)—"কে স্বার্থত্যাগের 'মুখোস প'রে' বৃদ্ধ পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে, স্নেহের 'মুখোস প'রে' ভাইকে বন্দী করে, ধর্মের 'মুখোস প'রে' সিংহাসন অধিকার করে—সে সম্রাট ?" (দ্বিজেন্দ্রলাল)

[১১৫] **যকের ধন** (কৃপণের ধন)—কৃপণ ব্যক্তি না খেয়ে টাকা জমিয়ে 'যকের ধনের' মতো তা আগ্‌লে রেখেছেন।

[১১৬] **রগচটা** (বদ মেজাজী)—এমন 'রগচটা' লোকের সঙ্গে কথাবার্তা, চলাফেরা, কাজকর্ম কিছুই সম্ভব নয়।

[১১৭] **রাজা উজীর মারা** (মুখে বড় বড় কথা বলা)—একটা ব্যাঙ দেখ্‌লেই ভয় পায়, অথচ মুখে 'রাজা উজীর মারছে'।

[১১৮] **লম্বা দেওয়া** (পলায়ন করা)—পেছন হইতে বর্শা হাতে তাড়া করিতেছে দেখিয়া রামপদ ক্ষেতের মধ্য দিয়াই 'লম্বা দিল'।

[১১৯] **লেফাফা দুরস্ত** (ভিতরে শূন্য অথচ বাইরে জাঁকজমক)—অজিতবাবু ধুতি পাঞ্জাবী পরে সর্বদা এমন 'লেফাফা দুরস্ত' থাকেন, যে তা দেখে বোঝার উপায় নেই বাড়ীতে অন্নাভাব।

[১২০] **শাঁখের করাত** (উভয় সংকট)—গেলে পাওনা টাকা চাইবে অথচ না গেলে বইটাও আন্‌তে পারছি না। আমার অবস্থাটা হয়েছে যেন 'শাঁখের করাত'।

[১২১] **শিবরাত্রির সল্‌তে** (একমাত্র অবলম্বন)—বিধবার এই একমাত্র ছেলেটিই তার 'শিবরাত্রির সল্‌তে'। এটিকে হারালে তার বংশে বাতি দিতে আর কেউই থাকবে না।

[১২২] **সুখের পায়রা** (সুসময়ের তথাকথিত বন্ধু)—এরা সব 'সুখের পায়রা' তোমার সুদিনে এরা মশগুল হয়ে আছে, আবার যখন দুর্দিন দেখ্‌বে তখন কে কোথায় পালিয়ে যাবে তার খোঁজও পাবে না।

[১২৩] **সোনায় সোহাগা** (অপূর্ব মিলন)—একটি ছিল চোর ; তার এক বন্ধু জুটেছে ডাকাত একেবারে 'সোনায় সোহাগা' হয়েছে।

[১২৪] **সাত সতেরো** (অনেক রকম)—বিশু লটারীর এত টাকা দিয়ে কি করবে, তাই নিয়ে 'সাত সতেরো' ভাবতে লাগল।

[১২৫] **সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে** (উভয় দিক রক্ষা করা)—গুরুজনও যাতে না দেখে অথচ কদমতলাতেও যাওয়া যায় ; শ্রীরাধা এইরূপ 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে' উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইল।

[১২৬] **হ, য, ব, র, ল** (বিশৃঙ্খলা)—লিখেছ সবই কিন্তু 'হ, য, ব, র, ল' হয়ে গেছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

[১২৭] **হাতের পাঁচ** (শেষ সম্বল)—'হাতের পাঁচ' ছিল শুধু ঐ একটিমাত্র বাড়ী, দেনার দায়ে তাও আজ আমাকে বেচতে হোল।

[১২৮] **হাত পাকানো** (অভ্যাসে দক্ষ)—চেষ্টা করতে করতে অবশেষে ছেলেটার ছবি আঁকতে 'হাত পেকে' গেছে।

[১২৯] **হাড় জুড়ান** (শান্তি পাওয়া)—এই ম্যানেজারটা বদলী হয়ে যাওয়ায় কেরানীকুলের 'হাড় জুড়িয়েছে'।

[১৩০] **হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা** (গোপন কলঙ্ক সাধারণ্যে প্রকাশ করা)—আমায় বেশি আর ঘাঁটিয়ো না বলছি, যখন 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে' দেব, তখন আর মুখ দেখাতে পারবে না সমাজে।

[১৩১] **হেস্তনেস্ত করা** (শেষ করা)—আজই এই ব্যাপারের একটা 'হেস্তনেস্ত' করতে হবে, এত অশান্তি আর আমি সহ্য করতে পারি না।

[১৩২ **হিতে বিপরীত** (ভালো করতে গিয়া মন্দ)—তার ভালোর জন্যেই আমি কথাটা বলতে গেলাম, সে গেল রেগে—'হিতে বিপরীত' হলো।

অনুশীলনী

১। নিম্নের বাক্যাংশগুলির বিশিষ্ট অর্থ নির্দেশ করিয়া বাক্য রচনা কর :—

(ক) নরম গরম শোনান, পাকা খেলোয়াড় ; ধিড় মুখ ; বাঁশ বনে শেয়াল রাজা ; বিপদের কাণ্ডারী ; বয়সের গাছ পাথর ; জিভ কাটা ; কেতা দুরস্ত ; সাত ঘাটের জল ; রাবণের চিতা ; দাঁতে কুটো কাটা ; ফাঁকা আওয়াজ ; বুদ্ধির ঢেঁকি ; চোখের চামড়া ; চোখের পর্দা ; ধর্মের ঢাক আপনি বাজে ; একূল ওকূল দু'কূল খাওয়া।

(খ) সাত সতের, বড়মুখ, ঠোঁটকাটা, চিনির বলদ, পোয়াবারো, ডুমুরের ফুল।

(ক. বি. ১৯৪৭)

[গ) পায়াভারি, আক্কেলসেলামি, অমাবস্যার চাঁদ, পুকুরচুরি, টাক-পড়া।

(ক. বি. ১৯৪৪)

(ঘ) নবমীর পাঁঠা, চোখের মাথা, সোনায় সোহাগা, মিছরির ছুরি, হাড় হাবাতে, কানপাতলা।

২। অর্থ নির্দেশপূর্বক বাক্য রচনা কর :—

শাঁখের করাত, অরণ্যে রোদন গৌরচন্দ্রিকা, যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন, 'গয়ং গচ্ছ', সোনায় সোহাগা, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া, সপ্তরথী ঘিরে বধ, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন', কাকের মাংস কাকে খায় না, কালীঘাটের কাঙালী, ডুবে ডুবে জল খাওয়া, মনিকাঞ্চন-সংযোগ, আঠারো মাসে বছর, উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ, কনের ঘরে মাসী, বরের ঘরে পিসী, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, সাপ হয়ে কামড়ানো রোজা হয়ে ঝাড়া, শ্মশান-বৈরাগ্য, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা, সোনার কাঠি রূপোর কাঠি, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা, ধান ভানতে শিবের গীত, বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নানার্থ শব্দ (Homonyms)

বাঙলা ভাষায় অনেক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। যমক, শ্লেষ প্রভৃতি অলংকারে নানার্থ শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য নিম্নে এইরূপ কতকগুলি নানার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল :

অঙ্ক : (১) নাটকের পঞ্চম 'অঙ্ক' আরম্ভ হইয়াছে।

(২) ক্রোড়—'মাতৃ 'অঙ্কে' বসে শিশু করে স্তন্যপান।'

(৩) গণিত—ছেলেটি 'অঙ্কে' অত্যন্ত কাঁচা।

(৪) রেখা চিহ্ন—সন্ন্যাসী খড়ি দিয়া 'অঙ্কপাত' করিয়া ছেলেটির ভাগ্য পরীক্ষা করিতেছেন।

অর্থ : (১) ধন—'অর্থই শেষটায় অনর্থ ঘটাইল।'

(২) তাৎপর্য—কবিতাটির 'অর্থ' ঠিক বুঝিলাম না।

(৩) উদ্দেশ্য—তোমার ইহা বলিবার 'অর্থ' কি ?

(৪) প্রয়োজন—'এমন অবেলায় সেখানে যাবার কোন 'অর্থ' নাই।

উত্তর : (১) জবাব—'ওহে বিল, আমার কথার 'উত্তর' দিতেছ না কেন ?

(২) দিগ্‌বিশেষ—ভারতের 'উত্তরে' হিমালয় পর্বত অবস্থিত।

(৩) পরবর্তী—'উত্তরাধিকারসূত্রে' তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন।

(৪) ভাবী—'উত্তরকালে' সেই বালক অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া সমগ্র নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করিলেন।'

(৫) বিরাট-রাজপুত্র—'উত্তরকে' রথদণ্ডে বন্ধনপূর্বক বৃহন্নলা স্বয়ংই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কথা : (১) প্রসঙ্গ—সবার মুখেই চাল, তেলের 'কথা'।

(২) প্রতিশ্রুতি—যখন 'কথা' দিয়াছি তখন অবশ্যই করিব।

(৩) অনুরোধ—'যোড় হাত কচ্ছি, 'কথা' রাখ।'

(৪) বাক্য—তোমার সঙ্গে 'কথায়' পারা ভার।

(৫) পরামর্শ—একটু ভিতরে এস, একটা জরুরী 'কথা' আছে।

কর : (১) কিরণ—'আজি এ প্রভাতে রবির 'কর'
কেমনে পশিল প্রাণের পর।'

(২) খাজনা—রাজ 'কর' যোগান কঠিন।

(৩) হস্ত—'তব 'কর' স্পর্শে হের, জিয়াল তনয়।'

গোত্র : (১) পর্বত—মৈনাক গোত্রভিদ্ ইন্দ্রের ভয়ে সিন্ধুগর্ভে আশ্রয় লইল।
(২) বংশ—'গোত্রের প্রধান' পিতা মুখ্যবংশ জাত।'

গুণ : (১) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত।
(২) সাধারণ ধর্ম—মাধুর্য দুগ্ধের 'গুণ'।
(৩) উৎকর্ষ—'কোন 'গুণ' নাই তার কপালে আগুন'।
(৪) রজ্জু—এসেছি বড় ভাল, কতক পথ হেঁটে কতক পথ 'গুণ' টেনে।
(৫) জ্যা—ধনুতে 'গুণ' পরাইয়া টঙ্কার দিতেই ধনুখানি ভাঙ্গিয়া গেল।

চক্র : (১) চাক্‌লা—নায়েবের অধীনে এই 'চক্রে' পঁচিশখানা গ্রাম আছে।
(২) গোলাকার অস্ত্রবিশেষ—তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সুদর্শন 'চক্র' লইয়া ভীষ্মকে নিধন করিতে উদ্যত হইলেন।
(৩) সাপের ফণা—'বিষ নাই কুলোপনা 'চক্র'।'
(৪) কুম্ভকারের চাক—'চাকা' ঘোরে হাতের জোরে।'
(৫) ষড়যন্ত্র—'তোমাদের এ ভৈরবী 'চক্রে' দেখছি এখন অনেকেই আছেন।'

ঘন : (১) অনবরত—'ঘন ঘন' সিংহনাদ শুনা গেল।
(২) নিবিড়—'ঘন' বনের মধ্য দিয়া সামান্য মাত্র রাস্তা।
(৩) মেঘ—সহসা আকাশমণ্ডল 'ঘন' ঘটাচ্ছন্ন হইল।
(৪) দৈর্ঘ, প্রস্থ উচ্চতার ঘনফল—স্তম্ভটির 'ঘনফল' বাহির কর।

জাল : (১) ফাঁদ—'কিহে প্রবীর! বেশ 'জাল' ফেলেছ, ক'টা মাছি প'ড়লো?
(২) মেকি নকল—'জাল' নোটের ব্যাপারে কিছুই জানি না।
(৩) ছল, জাল—'মায়াবীর 'মায়াজাল' কে ছিঁড়িবে বল।'

দল : (১) 'অরুণ প্রাতের তরুণ 'দল' চল্‌রে চল্‌রে চল্।'
(২) সমূহ—'যাত্রি 'দল' ফিরে এল, সাঙ্গ হ'ল মেলা।'
(৩) পাপ্‌ড়ি—'ফুল 'দল' দিয়া কাটিলা কি বিধি শাল্মলী তরুবরে?'

ধর্ম : (১) বিধি—সমাজ 'ধর্ম' প্রত্যেক সামাজিক লোককেই মানা উচিত।
(২) গুণ—শীতের 'ধর্ম' শৈত্য।
(৩) যম—'ধর্ম'রাজ সকলকে সমান চক্ষে দেখেন।
(৪) কর্তব্য কর্ম—ছাত্রদের 'ধর্ম' অধ্যয়ন।

পক্ষ : (১) পাখীর ডানা—'আর আমি ইহার 'পক্ষ' ভেদ করিয়াছি।'
(২) মাসার্ধ—একমাসে দুই পক্ষ—'শুক্লপক্ষ' ও 'কৃষ্ণপক্ষ'
(৩) বিবাহ—ভদ্রলোকের দুইটি 'পক্ষ'।
(৪) দল—অবশেষে উভয় 'পক্ষে' হাতাহাতি আরম্ভ হইল।

বাস : (১) গন্ধ, সুবাস—'কুসুমের 'বাস' ছাড়ি, কুসুমের বাস।'

(২) বসতি করা—'বায়ুভরে এসে করে নাসিকায় 'বাস'।'

(৩) বস্ত্র—'ছেঁড়া 'বাস' জোড়া দেয় শেলাই করিয়া।'

(৪) সন্ধান—'ধনের পাইয়া 'বাস' আসিল বীরের পাশ।'

ভাব : (১) অভিপ্রায়—তোমার মনের 'ভাব' এখনও বুঝিলাম না।'

(২) সম্প্রীতি—দীপালীর সঙ্গে দীপ্তির এখন খুব 'ভাব'।

(৩) মর্ম, তাৎপর্য—কবিতাটির 'ভাবার্থ' নিজের কথায় লিখ।

(৪) চিত্তবৃত্তি—'ভাল জীবীর কাছে 'ভাব' শিখেছি। (রামপ্রসাদ)

মুখ : (১) মর্যাদা—'ছেলেটি চৌধুরী বংশের 'মুখ' রাখবে।'

(২) বদন—আভা 'মুখ'খানা ভার করিয়া বসিয়া আছে।

(৩) ভাষা—'মুখে' মধু অন্তরে গরল।

(৪) কবল—তিনি মৃত্যু 'মুখে' পতিত হইয়াছেন।

(৫) ক্ষমতা—যত বড় 'মুখ' না তত বড় কথা।

(৬) তিরস্কার—অনর্থক ছেলেটিকে 'মুখ' করিয়াছ কেন?

রস : (১) সার অংশ—প্রত্যহ একটু ফলের 'রস' খাইবে।

(২) শরীরের ধাতুবিশেষ—'রস' পরিপাক না হইলে জ্বর ছাড়িবে না।

(৩) পূঁয—ফোঁড়ার মুখ দিয়া 'রস' পড়িতেছে।

(৪) কাব্যের রস—কাব্যের 'রস'ই প্রধান বস্তু।

হাত : (১) হস্ত—তোমার 'হাতে' তাহাকে সমর্পণ করিলাম।

(২) নৈপুণ্য—স্বপনের তবলায় বেশ 'হাত' আছে দেখছি।

(৩) কর্তৃত্ব—এ বিষয়ে আমার কোন 'হাত' নেই।

(৪) নাড়ী—ডাক্তার রোগীর 'হাত' দেখিতে লাগিলেন।

(৫) কররেখা—'হাত' দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারা যায় না।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া বাক্য গঠন কর :—

বেলা, রাগ, ছল, অর্থ, ভাব, উত্তর, গুণ, পক্ষ, ছল, ভার, তাল, কলা, কড়া, ঘন, কাণ্ড, দণ্ড, কুল, মাথা।

২। উদ্ধরণ চিহ্নযুক্ত শব্দগুলির অর্থ বল :—

(ক) তিনি আমাকে 'পর' ভাবেন; কাপড় 'পর'। (খ) বিপদে 'তারা' রক্ষা করিবেন; 'তারা'গুলি জ্বলিতেছে। (গ) লোকে দেখে তোমার চরণতলে 'শব'; আমি দেখি তোমার চরণেতেই 'সব'। (ঘ) গঙ্গা নামে সত্য তার 'তরঙ্গ' এমনি; 'জীবন-স্বরূপা' সে স্বামীর শিরোমণি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms)

একটি শব্দ অন্য কোন শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিলে সেই শব্দ দুইটিকে পরস্পর **বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms)** বলে। রচনায় বলাধানের জন্য, অথবা ভাবের প্রকাশকে সরল ও সরস করিবার জন্য, ভাষায় বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োজন হয়।

বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা বলবান্ ভাবপ্রকাশের উদাহরণ :

"আমরা পূর্ব তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানবসভ্যতার সূতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান। আমরা উষা, তোমরা গোধূলি......আমাদের রং কালো তোমাদের রং সাদা। আমাদের বসন, সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি।........তোমরা দৈর্ঘ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম,—এত সূক্ষ্ম যে আছে কিনা বোঝা কঠিন; তোমাদের বুদ্ধি স্থূল, এত স্থূল যে কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন।......আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ্! তোমাদের সুখ ছটফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে। সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real।......আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। তোমরা চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ীর বাহিরে, আমাদের পুরুষের মরণ বাড়ির ভিতরে। তোমাদের পরলোক স্বর্গ, আমাদের ইহলোক নরক।......তোমাদের ভালো, আমাদের মন্দ; আমাদের ভালো তোমাদের মন্দ।" ['বীরবলের হালখাতা' হইতে]

নিম্নে আরও কতকগুলি বিপরীতার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল :

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
অবনত	উন্নত।	অধম	উত্তম।
অধিত্যকা	উপত্যকা।	অধিক	অল্প।
আগমন	প্রত্যাগমন।	অন্তর	বাহির।
আদি	অন্ত।	অনুরাগ	বিরাগ।
আদান	প্রদান।	অনুগ্রহ	নিগ্রহ।
আবাহন	বিসর্জন।	অনুকূল	প্রতিকূল।
আরম্ভ	শেষ।	অলস	পরিশ্রমী।
আকর্ষণ	বিকর্ষণ।	অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি।
অন্ধকার	আলোক।	কৃষ্ণ	শুক্লা।
অর্পণ	গ্রহণ।	গরল	অমৃত।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
অলীক	সত্য।	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ।
আবির্ভাব	তিরোভাব।	গুরু	লঘু।
আসল	নকল।	গোপন	প্রকাশ।
আস্তিক	নাস্তিক	গৃহী	সন্ন্যাসী।
আচার	অনাচার	ঘন	তরল।
আর্দ্র	শুষ্ক।	ঘাত	প্রতিঘাত।
ইতর	ভদ্র।	ঘৃণা	শ্রদ্ধা।
ইষ্ট	অনিষ্ট।	চল	স্থির।
ইহকাল	পরকাল।	জড়	চেতন।
ইহলোক	পরলোক।	জয়	পরাজয়
উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট, অপকৃষ্ট।	জন্ম	মৃত্যু।
উগ্র	সৌম।	জীবন	মরণ।
উৎকর্ষ	অপকর্ষ।	জ্ঞানী	মূর্খ।
উপচয়	অপচয়।	তরুণ	বৃদ্ধ।
উদয়	অস্ত।	তাপ	শৈত্য।
উষ্ণ	শীতল।	তস্কর	সাধু।
ঊর্দ্ধগ	নিম্নগ।	তিরস্কার	পুরস্কার।
ঋজু	বক্র।	দাতা	কৃপণ।
ঐক্য	অনৈক্য।	দীর্ঘ	হ্রস্ব।
কুটিল	সরল।	দুরন্ত	শান্ত।
কঠিন	কোমল।	দুর্লভ	সুলভ।
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ।	দূর	নিকট।
কুৎসা	প্রশংসা।	দৃঢ়	শিথিল।
কুৎসিত	সুন্দর।	দেনা	পাওনা।
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন।	ধনী	নির্ধন, দরিদ্র।
কৃত্রিম	স্বাভাবিক।	নিত্য	অনিত্য।
কৃশ	স্থূল।	নির্মল	মলিন।
নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট।	মিলন	বিচ্ছেদ।
নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস।	মিথ্যা	সত্য।
পর	আপন।	মুখ্য	গৌণ।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
পাপ	পুণ্য।	মূর্খ	পণ্ডিত।
প্রবল	দুর্বল।	যুক্ত	বিযুক্ত।
প্রবীন	নবীন।	রাজা	প্রজা।
প্রভু	ভৃত্য।	শত্রু	মিত্র।
প্রকৃতি	বিকৃতি।	শীত	গ্রীষ্ম।
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ।	শ্রদ্ধা	ঘৃণা।
প্রতিযোগী	সহযোগী।	শ্রম	বিশ্রাম।
প্রসন্ন	বিষণ্ণ।	সুখ্যাতি	অখ্যাতি।
পুরুষ	প্রকৃতি।	সুন্দর	কুৎসিত।
বদ্ধ	মুক্ত।	সুগম	দুর্গম।
বন্ধুর	মসৃণ।	সঞ্চয়	অপচয়।
বাদী	প্রতিবাদী।	সরস	নীরস।
বিষ	অমৃত।	সহযোগ	অসহযোগ।
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত।	স্বর্গ	নরক, মর্ত্য।
ভারী	হাল্‌কা।	সৃষ্টি	প্রলয়।
ভদ্র	ইতর।	হরণ	পূরণ।
ভূত	ভবিষ্যৎ	হ্রাস	বৃদ্ধি।

বাক্যে প্রয়োগঃ

অর্থ—অনর্থঃ 'অর্থ'ই সকল 'অনর্থে'র মূল।

আয়—ব্যয়ঃ নিজের 'আয়' অনুযায়ী 'ব্যয়' করাই উচিত।

উত্থান—পতনঃ 'উত্থান-পতন' জগতের নিয়ম।

অধম—উত্তমঃ 'তুমি 'অধম' তাই বলিয়া আমি 'উত্তম' না হইব কেন?'

দূর—নিকটঃ 'দূর'কে করিলে 'নিকট' বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।' (রবীন্দ্রনাথ)

দোষ—গুণঃ মানুষমাত্রই 'দোষ গুণ' থাকে।

স্থাবর—অস্থাবরঃ তাঁহার 'স্থাবর-অস্থাবর' সমস্ত সম্পত্তিই নীলাম হইবে।

পূর্ব—পশ্চিমঃ 'আমরা 'পূর্ব' তোমরা 'পশ্চিম'।' (রবীন্দ্রনাথ)

জন্ম—মৃত্যুঃ জীবমাত্রেরই 'জন্ম' 'মৃত্যু' আছে।

পাপ—পুণ্যঃ 'পাপে' 'পুণ্যে' দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।' (রবীন্দ্রনাথ)

আসা—যাওয়াঃ 'আসা যাওয়ার' পথ চলেছে উদয় হতে অস্তাচলে।' (রবীন্দ্রনাথ)

সত্য--মিথ্যা : 'সত্য মিথ্যা' জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।' (মধুসূদন)

ক্ষুদ্র—বৃহৎ : 'ক্ষুদ্রের মাঝে থাকো তুমি তাই 'বৃহতে'র সাথে হারো।' (নজরুল)

অহি—নকুল : 'মেকলে বলিয়াছেন সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা 'খাদ্য-খাদক' বা 'অহি-নকুল' সম্বন্ধ রহিয়াছে।' (রামেন্দ্রসুন্দর)

প্রশান্ত—অপ্রশান্ত : 'তুমি 'প্রশান্ত' চির 'নিশি-দিন' আমি 'অপ্রশান্ত' বিরামবিহীন।' (রবীন্দ্রনাথ)

আকাশ—পাতাল : শোনো শোনো উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী, ধ্বনিতেছে 'আকাশ' 'পাতাল', বিশ্বচরাচর গাহে কাহারে বাখানি' 'আদি-হীন 'অন্ত'-হীন কাল।' (রবীন্দ্রনাথ)

মিহি—মোটা : চাষী আজ 'মিহি' কাপড় খুঁজে 'মোটা' কাপড় আর পরিতে পারে না।' (প্রফুল্লচন্দ্র)

নিকৃষ্ট—উৎকৃষ্ট : 'ভক্তি ভিন্ন 'নিকৃষ্ট' কখনো 'উৎকৃষ্টের' অনুগামী হয় না।'

পরলোক—ইহলোক : 'বাস্তবিক, কেবল পুণ্যকর্ম কি 'পরলোক' কি 'ইহলোক' শুভপ্রদ হইতে পারে না।' (বঙ্কিমচন্দ্র)

স্তুতি—নিন্দা : 'যখনি মানুষ আসে 'স্তুতি' 'নিন্দা' লয়ে।' (রবীন্দ্রনাথ)

শুরু—সারা : 'তোমার হ'লো 'শুরু' আমার হলো 'সারা।' (রবীন্দ্রনাথ)

শূন্য—পূর্ণ : তোমার আসন 'শূন্য' আজি, হে বীর 'পূর্ণ' করো।' (রবীন্দ্রনাথ)

ঐহিক—পারত্রিক : 'ঐহিক' এবং 'পারত্রিক' শুভের মধ্যে বিভিন্নতা হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না।' (বঙ্কিমচন্দ্র)

শান্ত—দুরন্ত : বালক অত্যন্ত 'দুরন্ত' হইয়াও রাজার নিকট অত্যন্ত 'শান্ত'-স্বভাব হইল।' (বিদ্যাসাগর)

ব্যর্থ—সার্থক : 'ব্যর্থ' জীবনকে 'সার্থক' করিয়া তুলিতে হইলে সাধনা করিতে হইবে।

ঊর্ধ্বে—নীচে : 'ঊর্ধ্বে' হাসিছে ভগবান্' 'নীচে' কাঁপিতেছে শয়তান।' (নজরুল)

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ সাহায্যে বাক্য রচনা কর :—

জন্ম, যোগ, পতন, সাম্য, স্থাবর, সমাপ্ত, ঐহিক, আবাহন, উদার, চঞ্চল, কৃত্রিম, জীবন, নিরাকার, নীরস, সম্পদ, স্থূল, লঘু, পাপ। (ক. বি. ১৯৩৭)

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—

ঐহিক, গরিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, ধনী, বিরক্ত, মুখ্য, বিরল, স্থাবর, কৃত্রিম, আকর্ষণ। (ক. বি. ১৯৪৪)

ষড়্বিংশ অধ্যায়

সমার্থক শব্দ (Synonyms)

একই অর্থে যখন বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাদের প্রত্যেকটিকে **সমার্থক** বা **একার্থক শব্দ** বলা হয়। রচনাকে সরস ও শ্রুতিমধুর করিবার জন্য ভাষায় সমার্থক শব্দের প্রয়োজন হয়। নীচে কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হইল :

অগ্নি—অনল, আগুন, পাচক, বহ্নি, বিভাবসু, বৈশ্বানর, সর্বভুক, হুতাশন।

অতি—অত্যন্ত, নিতান্ত, পরম, অতিশয়।

অতিথি—আগন্তুক, অভ্যাগত, গৃহাগত।

অন্ধকার—আঁধার, তমঃ, তিমির, তমিস্রা।

অশ্ব—ঘোটক, ঘোড়া, তুরগ, তুরঙ্গম, বাজী, হয়।

আকাশ—অম্বর, অন্তরীক্ষ, গগন, দ্যুলোক, ব্যোম, বিমান, নভোমণ্ডল।

আনন্দ—আহ্লাদ, সন্তোষ, সুখ, হর্ষ।

ইচ্ছা—অভিপ্রায়, অভিরুচি, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, ঈপ্সা, কামনা, মনোরথ, বাসনা, বাঞ্ছা, লালসা, রুচি, সাধ।

ঈশ্বর—ঈশ, জগদীশ, জগদীশ্বর, জগৎপতি, ধাতা, বিধাতা, বিধি, বিভু।

উত্তম—শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, ভাল, উপাদেয়।

কন্যা—মেয়ে, নন্দিনী, দুহিতা, তনয়া।

কেশ—অলক, কুন্তল, চিকুর, চুল, শিরোরুহ, মূর্ধজ।

গঙ্গা—জাহ্নবী, জহ্নুকন্যা, ভাগীরথী, সুরধুনী, বিষ্ণুপদী।

গৃহ—আগার, আলয়, আবাস, কুটির, গেহ, ঘর, নিলয়, নিকেতন, বাড়ী, ভবন, শালা, সদন, মন্দির।

চন্দ্র—চাঁদ, চন্দ্রমা, ইন্দু, কুমুদিনী, কুমুদবন্ধু, নিশাকর, নিশানাথ, দ্বিজরাজ, তারাপতি, মৃগাঙ্ক, বিধু, শশধর, শশাঙ্ক, শীতাংশু, সুধাকর, সুধাংশু, সোম, হিমাংশু।

জল—অম্বু, উদক, তোয়, পানীয়, জীবন, নীর, বারি, সলিল।

তট—কূল, সৈকত, পুলিন, তীর।

তীর—তট, কূল, উপকূল, পুলিন, সৈকত।

ধন—অর্থ, টাকাকড়ি, বিধি, বিত্ত, বিভব, সম্পদ, সম্পত্তি।

নদী—তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, সরিৎ, স্রোতস্বিনী, সিন্ধু, স্রোতস্বতী।

পক্ষী—অণ্ডজ, খগ, খেচর, দ্বিজ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম।

পর্বত—গিরি, অচল, অদ্রি, গোত্র, নগ, ধরাধর, পাহাড়, ভূধর, শৈল।

পণ্ডিত—বিদ্বান, মনীষী, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সুধী, ধীমান, কোবিদ্।

পদ্ম—কমল, অব্জ, সুচনা, নীলপদ্ম, অরবিন্দ, উৎপল, কোকনদ (রক্তচন্দন), তামরস, নলিনী, পঙ্কজ, পুণ্ডরীক, (শ্বেত ও নীল পদ্ম) রাজীব, শতদল, শতপত্র, সরোজ, সরসিজ।

পৃথিবী—অবনী, ক্ষিতি, অনন্তা, জগৎ, পৃথ্বী, ধরা, মহী, মেদিনী, ভূ, ভূমি, ধরিত্রী, বসুমতী, বসুন্ধরা, বসুধা, ধরণী, সর্বংসহা।

ফুল—পুষ্প, কুসুম, প্রসূন।

বায়ু—অনিল, গন্ধবহ, পবন, প্রভঞ্জন, বাত, মরুৎ, বাতাস, সমীর, সমীরণ।

মেঘ—অভ্র, ঘন, কাদম্বিনী, অম্বুক, তোয়দ, জলজ, জলধর, জীমূত, বারিদ।

মাতা—মা, জননী, অম্বা, গর্ভধারিণী।

মৃত্যু—অন্ত, কাল, নাশ, বিনাশ, নিধন, মরণ, পতন, স্বর্গলাভ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, পরলোকগমন ইহলীলা, লোকান্তরপ্রাপ্তি, গঙ্গালাভ, বৈকুণ্ঠলাভ, মহাপ্রয়াণ।

রজনী—নিশা, রাত, রাত্রি, বিভাবরী, ক্ষণদা, ত্রিযামা, যামিনী সর্বরী।

রাজা—নৃপতি, নরপতি, নরেন্দ্র, নরেশ, নরনাথ, পৃথিবীপতি, মহীপতি।

সমুদ্র—অর্ণব, অব্ধি, উদধি, অম্বুধি, জলধি, সিন্ধু, পয়োধি, অম্বুনিধি, পয়োনিধি, রত্নাকর, পারাবার, পাথার, সাগর, সরিৎপতি।

সর্প—অহি, আশীবিষ, উরগ, ফণী, বিষধর, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, নাগ, সাপ।

সূর্য—অর্ক, অরুণ, অংশুমালী, আদিত্য, তপন, দিনকর, প্রভাকর, মিহির, মার্তণ্ড, ভানু, ভাস্কর, মরীচিমালী, সপ্তাশ্ববাহন।

হস্তী—করী, কুঞ্জর, গজ, দ্বীপ, দন্তী, দ্বিরদ, মাতঙ্গ, বারণ, হাতী।

হস্ত—বাহু, ভুজ, কর, হাতী।

একই শব্দের বিভিন্ন পদে প্রয়োগঃ

অতীত ঃ (বিশেষ্য)—'হে 'অতীত' তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।' (রবীন্দ্রনাথ)

(বিশেষণ)—'অতীত' ভারতবর্ষের ইতিহাস থাকা প্রয়োজন।

অন্ধ ঃ (বিশেষ্য)—তুমি আমার 'অন্ধের' নড়ি!

(বিশেষণ)—'অন্ধ'জনে দেহ আলো' (রবীন্দ্রনাথ)

অকূল ঃ (বিশেষ্য)—'অকূল' মাঝে ভাসিয়ে তরী যাচ্ছি অজানায়।' (রবীন্দ্রনাথ)

(বিশেষণ)—'অকূল' সাগর জলে ভাসে একাকিনী।' (মাইকেল)

অনন্ত ঃ (বিশেষ্য)—'সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেল এইখানে
অনন্তের কানে।' (রবীন্দ্রনাথ)

(বিশেষণ)—'শূন্যে 'অনন্ত' গগনে ধ্যানমগ্ন মহাশক্তি।' (রবীন্দ্রনাথ)

গুরু : (বিশেষ্য)—'গুরু কহিলেন মোরে—
'বৎস শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার ব্রহ্মবিদ্যালাভে।' (রবীন্দ্রনাথ)
(বিশেষণ)—গুরু গর্জনে তখন মেঘ ডাকিতে লাগিল।
(ক্রিয়াবিশেষণ)—'গুরু গুরু মেঘ গরজে গরজে গগনে গগনে।' (রবীন্দ্রনাথ)
[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২]

ঘন : (বিশেষ্য)—'গগনে গরজে 'ঘন' বহে খর সমীরণ।'
(বিশেষণ)—'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা ' (রবীন্দ্রনাথ)
(ক্রিয়াবিশেষণ)—'ঘন দেয়া গরজনি।' (জ্ঞানদাস)

তনু : (বিশেষ্য)—'জিতিল গৌর'তনু' লাবণি রে।' (গোবিন্দদাস)
(বিশেষণ)—'তনু'দেহ রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা।' (রবীন্দ্রনাথ)

পুণ্য : (বিশেষ্য)—'আমার এ পাপ ক'রে দাও লীন তোমার 'পুণ্য' মাঝে।'
(রবীন্দ্রনাথ)
(বিশেষণ)—'পুণ্য' শীতল সলিলে নাহিয়া'··· (রবীন্দ্রনাথ)

পাপ : (বিশেষ্য)—'পুণ্যপাপে পতনে উত্থানে।' (রবীন্দ্রনাথ)
(বিশেষণ)—এ 'পাপ' রাজ্যে আর বাস করা সম্ভব নয়।

বড় : (বিশেষ্য)—'বড়'র পিরীতি বালির বাঁধ।' (ভারতচন্দ্র)
(বিশেষণ)—'বড়' লোকেরা গরীবের দুঃখ কোনদিনই বুঝে না।
(ক্রিয়াবিশেষণ)—'কচি কচি গালভরা খিল খিল হাসি ;
আমি 'বড়'ই ভালবাসি।' (যোগীন্দ্র সরকার)

ভাল : (বিশেষ্য)—তোমার 'ভাল' তোমারই থাক।
(বিশেষণ)—'ভাল মানুষ নইরে মোরা, ভালো মানুষ নই।' (রবীন্দ্রনাথ)
(ক্রিয়াবিশেষণ)—'ভালই লাগত তাদের ছবি
কালিদাসের চোখে।' (রবীন্দ্রনাথ)

শেষ : (বিশেষ্য)—'শেষের মধ্যে অশেষ আছে।' (রবীন্দ্রনাথ)
(বিশেষণ)—এই আমি তোমাকে 'শেষ' কথা বলে দিচ্ছি।
(ক্রিয়াবিশেষণ)—'যা কিছু তার আছে দেবার
'শেষ' করে সব নিবি এবার।' (রবীন্দ্রনাথ)

গীতি : (বিশেষ্য)—নদীর তটভূমি বিহঙ্গ'গীতে' মুখরিত।
(বিশেষণ)—এখন 'রবীন্দ্র'গীত' সর্বত্রই 'গীত' হইতেছে।
(প্রথম গীত বিশেষ্য) [উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২]

চমৎকার : (বিশেষ্য)—'চমৎকার' সৃষ্টিই কাব্যের উদ্দেশ্য।

(বিশেষণ)—সমীর একটি 'চমৎকার গান গাহিয়াছে।

(ক্রিয়াবিশেষণ)—লোকটি 'চমৎকার' গান করে।

(অব্যয়)—'জাহানারা আবার বলি 'চমৎকার'! (দ্বিজেন্দ্রলাল)

কোন্ঃ (বিশেষ্য)—'কোন্' ধন হ'তে বিশ্বজগতে 'কোন্' জন করে বঞ্চিত।' (রবীন্দ্রনাথ)

(সর্বনাম)—কোন্‌টা তোমার—ছোটটা না বড়টা ?

কিঃ (সর্বনাম)—তখনি লেখনি আনি, 'কি' লিখি দিলা কি জানি, বালাজীরে কহিলা ডাকায়ে।' (রবীন্দ্রনাথ)

(বিশেষণের বিশেষণ)—'কি' সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ!'

(প্রশ্নবাচক অব্যয়)—'তোমার 'কি' জীবনের অভিলাষ নাই!' (রমেশচন্দ্র)

(সংযোজক অব্যয়)—'বসন্তে 'কি' শীতে, দিবসে, নিশীথে বিকশিত তব বিভব-গরিমা।' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

(ভাবপ্রকাশ অব্যয়)—জন্ম লভিবে 'কি' বিশাল প্রাণ।' (রবীন্দ্রনাথ)

দীনঃ ('দীনের' তিনি পিতামাতা।' (রবীন্দ্রনাথ)

(বিশেষণ)—'দিনের দিন সবে দীন।' (মনোমোহন)

ধীরঃ (বিশেষ্য)—'যদি তুমি ওহে 'ধীর' ব্যথিতের অশ্রুনীর নিজ করে না কর মোচন।' (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

(বিশেষণ)—মেয়েটি অতি 'ধীর' স্বভাবা।

রক্তঃ (বিশেষ্য)—'এও যে 'রক্তে'র মত রাঙা দু'টি জবাফুল' (রবীন্দ্রনাথ)

(বিশেষণ)—'ঔরঙ্গজেব তোমার 'রক্ত' চক্ষুর ভয় করে না।' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

সুখঃ (বিশেষ্য)—'সুখের' লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।' (চণ্ডীদাস)

(বিশেষণ)—প্রতাপ 'সুখ'শয্যায় বসিতে রাজি নয়।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির তিনটি করিয়া প্রতিশব্দ লিখ :—

বন, স্বর্ণ, স্ত্রী, রাজা, বিদ্যুৎ, বায়ু, মেঘ, নদী, মা, জল, পাপ, ধন, পদ্ম, অন্ধ, সুন্দর, গঙ্গা, চন্দ্র, ইচ্ছা, রজনী, পণ্ডিত, সমুদ্র।

২। মোটা অক্ষরে মুদ্রিত স্থলগুলিতে প্রতিশব্দ বসাইয়া প্রয়োজনমত বাক্যের পরিবর্তন সাধন কর :—

(ক) 'তেলামাথায় তেল দেওয়া **মনুষ্যজাতির রোগ**।' (বঙ্কিমচন্দ্র)

(খ) 'কলকল্লোলে লাজি দিল আজ **নারী** কণ্ঠের **কাকলি**।' (রবীন্দ্রনাথ)

(গ) '**অনাহারে** মরিয়া যাইবার জন্য এ **পৃথিবীতে** কেহ আসে নাই'। (বঙ্কিমচন্দ্র)

(ঘ) **গম্ভীর জলধি** কখনও অল্প কারণে **আকুলিত** হয় না'। (সীতার বনবাস)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বাক্য-সংকোচন

একটি বৃহৎ বাক্য বা বাক্যাংশকে কৃৎ-প্রত্যয়, তদ্ধিত-প্রত্যয় বা সমাস প্রভৃতির সাহায্যে এক কথায় প্রকাশ করাকে **বাক্য-সংকোচন** বলে। এই সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) **কৃৎ-প্রত্যয়ের সাহায্যে :** যাহা করা উচিত = কর্তব্য ; দান করেন যিনি = দাতা ; উড়িতেছে এমন = উড়ন্ত ; যাহার বুদ্ধি আছে = বুদ্ধিমান ; খাওয়ার অযোগ্য = অখাদ্য ইত্যাদি।

(২) **তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সাহায্যে :** গ্রামে প্রস্তুত = গ্রাম্য ; বন্ধুর ভাব = বন্ধুত্ব ; ঢাকায় তৈরী = ঢাকাই ; বুড়োর ভাব = বুড়োমি ইত্যাদি।

(৩) **সমাসনিষ্পন্ন পদের সাহায্যে :** পা হইতে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক ; গলায় গলায় ভাব = গলাগলি ; কানে কানে বলা = কানাকানি ; নদী মাতা যাহার = নদীমাতৃক ইত্যাদি।

বাক্য-সংকোচনের আরও কয়েকটি উদাহরণ :

যে সকল বস্তু ভক্ষণ করে—	সর্বভুক।
যেখানে যাওয়া যায় না—	অগম্য।
যেখানে যাওয়া সহজ নয়—	দুর্গম।
যিনি বিদেশে বাস করেন—	প্রবাসী।
যিনি আমিষ ভক্ষণ করেন না—	নিরামিষাশী।
যিনি ইন্দ্র জয় করিয়াছেন—	জিতেন্দ্রিয়।
যিনি শত্রুকে দমন করেন—	অরিন্দম্।
যিনি উপকার স্বীকার করেন—	কৃতজ্ঞ।
ফল পাকিলে যে উদ্ভিদ মারা যায়—	ওষধি।
যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়—	ভঙ্গুর।
যাহা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না—	অনন্যসাধারণ
প্রিয় কথা বলে যে নারী—	প্রিয়ংবদা।
যাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত—	মুমূর্ষু।
যাহা অবশ্য ঘটিবে—	অবশ্যম্ভাবী।
প্রথমে মধুর কিন্তু পরিণামে নয়—	আপাতমধুর।
কুন্তির পুত্র—	কৌন্তেয়।
অর্জুনের পুত্র—	আর্জুনি।

বিষ্ণুর যিনি উপাসক—	বৈষ্ণব।
সরোবরে জন্মে যাহা—	সরোজ।
যাহার অহংকার নাই—	নিরহংকার।
যে জমিতে দুই রকম ফসল জন্মে—	দোফসলা।
এ পর্যন্ত যাহার শত্রু জন্মে নাই—	অজাতশত্রু।
যে প্রবাসে বাস করে না—	অপ্রবাসী।
যাহাকে জয় করা যায় না—	অজেয়।
যিনি ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া কাজ করেন—	অবিবেচক।
যাহার অন্য গতি নাই—	অনন্যগতি।
যে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করে—	অবিমৃষ্যকারী।
যাহা কখনও ভাবা যায় না—	অভাবনীয়।
যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই—	অদৃষ্টপূর্ব।
যাহা উদিত হইতেছে—	উদীয়মান।
ইতিহাস লেখেন যে—	ঐতিহাসিক।
যে কর্তব্য স্থির করিতে পারে না—	কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
যে উপকারীর অনিষ্ট করে—	কৃতঘ্ন।
আকাশে চরে যে—	খেচর।
যাহা চোখে দেখা যায়—	চাক্ষুস।
যাহার চলিবার শক্তি নাই।	চলচ্ছক্তিহীন।
যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—	চিরন্তন।
যে বাঁচিয়া থাকে মরার মত—	জীবন্মৃত।
যাহা জ্বল জ্বল করিতেছে—	জাজ্বল্যমান।
তীর নিক্ষেপ করে যে—	তীরন্দাজ।
বিনাকষ্টে যাহা লাভ করা যায়—	অনায়াসলভ্য।
যে নারী কখনও সূর্য দেখে নাই—	অসূর্যম্পশ্যা।
যাহার তলদেশ স্পর্শ করা যায় না—	অতলস্পর্শ।
যাহাকে পরাজিত করা যায় না—	অপরাজেয়।
যাহার পরিমাণ করা যায় না—	অপরিমেয়।
যাহা বলা উচিত নয়—	অবক্তব্য।
কোন কিছু হইতে যাহার ভয় নাই—	অকুতোভয়।
ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে—	আস্তিক।

যার ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই—	নাস্তিকক. প্র. ১৯২১
পুনঃ পুনঃ দুলিতেছে যাহা—	দোদুল্যমান।
যাহা লঙ্ঘন করা উচিত নয়—	অলঙ্ঘ্য।
পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছে যে—	রোরুদ্যমান।
যাহার জন্য কর দিতে হয় না—	নিষ্কর।
যাহা খুব বেশী দীর্ঘ নয়—	নাতিদীর্ঘ।
যাহা খুব বেশী শীতলও নয় উষ্ণও নয়—	নাতিশীতোষ্ণ।
যে রমণীর সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে—	নবোঢ়া।
যাহার এখনও বালকত্ব কাটে নাই—	নাবালক।
যে পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে—	পরমুখাপেক্ষী
যে স্ত্রী স্বামীর অধীন নহে—	স্বাধীনভর্তৃকা।
যে পরের সৌভাগ্য দেখিয়া কাতর হয়—	পরশ্রীকাতর।
যে রমণীর স্বামী বিদেশে থাকে—	প্রোষিতভর্তৃকা।
যাহা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে—	প্রস্তরীভূত।
যাহার পত্নী মারা গিয়াছে—	বিপত্নীক, মৃতদার।
যাহার অনেক দেখাশুনা আছে—	বহুদর্শী।
যাহা কোথাও উঁচু কোথাও নীচু—	বন্ধুর।
যাহার অনুরাগ দূর হইয়াছে—	বীতরাগ।
যে বৃক্ষের ফুল না হইয়া ফল হয়—	বনস্পতি।
যাহা মর্মে আঘাত করে—	মর্মন্তুদ।
মুষ্টিদ্বারা যাহার পরিমাণ করা যায়—	মুষ্টিমেয়।
যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে বেড়াইয়া বেড়ায়—	যাযাবর।
যিনি শত্রুকে বধ করেন—	শত্রুঘ্ন।
শিক্ষা করে যে—	শিক্ষানবীশ।
মাথা পাতিয়া যাহা লওয়া যায়—	শিরোধার্য।
যাহার শুনিবামাত্র মনে থাকে—	শ্রুতিধর।
যে পরের শুভ অনুষ্ঠান করে—	শুভানুধ্যায়ী।
একই গুরুর শিষ্য যাহারা—	সতীর্থ।
যাহার ভাতের অভাব আছে—	হাভাতে।
যাহার সমস্ত চুরি গিয়াছে—	হৃতসর্বস্ব।
দুই হাতে সমান কাজ করে যে—	সব্যসাচী।

উপকার করিবার ইচ্ছা—	উপচিকীর্ষা।
অপকার করিবার ইচ্ছা—	অপচিকীর্ষা।
হনন করিবার ইচ্ছা—	জিঘাংসা।
গোপন করিবার ইচ্ছা—	জুগুপ্সা।
ভোজন করিবার ইচ্ছা—	বুভুক্ষা।
লাভ করিবার ইচ্ছা—	লিপ্সা।
অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা—	অনুসন্ধিৎসা।
ভৃগুর পুত্র—	ভার্গব।
পৃথার পুত্র—	পার্থ।
ব্যাকরণে পণ্ডিত—	বৈয়াকরণ।
ছন্দে জ্ঞান আছে যাহার—	ছান্দসিক।
পট আঁকে যে—	পটুয়া।
যাহাকে শাসন করা দুঃসাধ্য—	দুঃশাসন।
যুদ্ধে স্থির যিনি—	যুধিষ্ঠির।
সর্ব সম্বন্ধীয়—	সর্বজনীন।
বিশ্ব সম্বন্ধীয়—	বিশ্বজনীন।
যে কন্যার বিবাহ হয় নাই—	অনূঢ়া।
পতি-পুত্রহীনা নারী—	অবীরা।
সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত—	আসমুদ্রহিমাচল।
যে নারীর সন্তান হয় নাই—	বন্ধ্যা।
যে নারীর একটিমাত্র সন্তান—	কাকবন্ধ্যা।
পুরুষের উদ্দাম নৃত্য—	তাণ্ডব।
নারীর ললিত নৃত্য—	লাস্য।
অশ্বের ডাক—	হ্রেষা।
হাতির ডাক—	বৃংহিত।
হরিণের চামড়া—	অজিন।
নূপুরের ধ্বনি—	নিক্বণ।
পরিব্রাজকের ভিক্ষা—	মাধুকরী।
পূর্বকাল সম্বন্ধীয়—	প্রাক্তন।
যাহা লাফাইয়া চলে—	প্লবগ।
রব শুনিয়া যে উপস্থিত হয়—	রবাহুত।

বাঘের চামড়া— কৃত্তি।
ময়ূরের স্বর— কেকা।
পাখীর কলরব— কাকলী।
পা ধুইবার জল— পাদ্য।
যে নারীর হাসি শুভ্র— শুচিস্মিতা।
সোনা দিয়া তৈরী— হিরণ্ময়।
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনার সমাহার— চতুরঙ্গ।
যিনি স্মৃতিশাস্ত্র জানেন— স্মার্ত।
যাহার উপস্থিত বুদ্ধি আছে— প্রত্যুৎপন্নমতি।
দিবসের আলো ও সন্ধ্যার অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ— গোধূলি।

বাক্য সংকোচনের কতকগুলি অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত

যেখানে মৃত জীবজন্তু ফেলিয়া দেওয়া হয়—উপশল্য। বীর সন্তান প্রসব করে যে নারী—বীরপ্রসূ। বার মাসের বর্ণনা—বারমাস্যা। পূর্বে যিনি অধ্যাপক ছিলেন—অধ্যাপকচর। যেখানে মক্ষিকাও প্রবেশ করিতে পারে না—নির্মাক্ষিক। যাহা বেলাভূমি অতিক্রম করিয়াছে—উদ্বেল। সুন্দর দন্ত যে রমণীর—সুদতী। দুই মনুর শাসনের সন্ধিকাল—মন্বন্তর। অস্থায়ী বাসের স্থান—বাসা। পূর্বে কোন শিক্ষালাভ না করিয়াই যে-দক্ষতা অর্জন করিয়াছে—অশিক্ষিতপটুত্ব। যে হাতে-কলমে কাজ করিয়া দক্ষতা অর্জন করিয়াছে—করিৎকর্মা।

অনুশীলনী

১। বাক্য-সংকোচন কাহাকে বলে? কি কি উপায়ে বাক্যকে সংকুচিত করা যাইতে পারে? প্রত্যেকটি উপায়ের উদাহরণ দাও।

২। এক পদে পরিণত কর :—

(ক) যে নারী কখনও সূর্যকে দেখে নাই; পরলোকে যাহার বিশ্বাস নাই; এ পর্যন্ত যাহার শত্রু হয় নাই; যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। কি করিতে হইবে যে বুঝিতে পারে না; ব্যাকরণ যিনি ভাল জানেন। (ক. বি. ১৯৪৭)

(খ) যে গলায় কাপড় দিয়াছে; যে অগ্রে জন্মিয়াছে; যাহাতে মজা আছে; যে জীবিত থাকিয়া মৃত; যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে; যাহার ভাতের অভাব আছে; যাহা সহজে ভাঙে; যাহা পূর্বে কখন শোনা যায় না। (স্কুল ফাইনাল ১৯৫৮)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

পদ-পরিবর্তন

বিশেষণ হইতে বিশেষ্য এবং বিশেষ্য হইতে বিশেষণ ইত্যাদি পদ কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায়। নিম্নে এক পদ হইতে অন্য পদে পবিবর্তনের দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইল।

বিশেষণ হইতে বিশেষ্য

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
এক	ঐক্য, একতা, একত্ব	হৃষ্ট	হৃষ্টতা, হর্ষ
চতুর	চতুরতা, চাতুর্য, চাতুরি	শব	শূরত্ব
চঞ্চল	চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য	বিচিত্র	বিচিত্রতা, বৈচিত্র্য
উদার	উদারতা, ঔদার্য	দীন	দীনতা
অনুগত	আনুগত্য	নীল	নীলিমা
গুরু	গৌরব, গুরুতা, গুরুত্ব	সৎ	সত্তা
তরুণ	তরুণতা, তারুণ্য	চেতন	চৈতন্য
ক্ষীণ	ক্ষীণতা	স্তব্ধ	স্তব্ধতা
শিথিল	শিথিলতা, শৈথিল্য	সাদৃশ	সাদৃশ্য
দরিদ্র	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা	অনুকূল	আনুকূল্য
কঠিন	কাঠিন্য, কঠিনতা	বৃদ্ধ	বৃদ্ধত্ব
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমত্তা	পতিব্রতা	পাতিব্রত
শীত	শৈত্য	চালাক	চালাকি
মহাত্মা	মাহাত্ম্য	উৎসৃষ্ট	উৎসর্গ
উৎসুক	ঔৎসুক্য	অভিজাত	আভিজাত্য
প্রতীচ্য	প্রতীচী	বিদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য
নিকট	নৈকট্য	সুকুমার	সৌকুমার্য
প্রণীত	প্রণয়ন, প্রণেতা	উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ
পৃথক	পার্থক্য	তেজস্বী	তেজস্বিতা
নিরাশ	নৈরাশ্য	সমকক্ষ	সমকক্ষতা
অশুচি	অশৌচ	দুরন্ত	দুরন্তপনা
শয়তান	শয়তানি	পরাভূত	পরাভব
ঔপনিবেশিক	উপনিবেশ	সাহিত্যিক	সাহিত্য
মহৎ	মহত্ত্ব, মহিমা	সুরভি	সৌরভ

বিশেষ্য হইতে বিশেষণ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অরণ্য	আরণ্য, আরণ্যক	পঙ্ক	পঙ্কিল
বৎসর	বাৎসরিক	বপন	উপ্ত
আসন	আসীন	উদয়	উদীয়মান
অক্ষর	আক্ষরিক	উদ্বেগ	উদ্বিগ্ন
অধ্যয়ন	অধীত	জ্ঞান	জ্ঞেয়
অবসাদ	অবসন্ন	ভাত	ভেতো
অবধান	অবহিত	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
অংশ	আংশিক	সূর্য	সৌর
ঋষি	আর্য	লোক	লৌকিক
জটা	জটিল	পরত্র	পারত্রিক
হিম, হেম	হৈম	ইহ	ঐহিক
প্রমাণ	প্রামাণ্য	জাতি	জাতীয়
নগর	নাগরিক	নিশা	নৈশ
গ্রাম	গ্রাম্য, গ্রামীণ	অধিষ্ঠান	অধিষ্ঠিত
দিন	দৈনিক	আস্তরণ	আস্তৃত, আস্তীর্ণ
আত্ম	আত্মীয়	প্রাচী	প্রাচ্য
বিকিরণ	বিকীর্ণ	ফল	ফলবান, ফলিত, ফলন্ত
মাংস	মাংসল	গাঁ	গেঁয়ো
বায়ু	বায়বীয়	শ্রী	শ্রীমান
শরীর	শারীর, শারীরিক	স্ত্রী	স্ত্রৈণ
ফেন	ফেনিল	রোগ	রোগা
পুষ্প	পুষ্পিত	মুখ	মুখর, মৌখিক
আপনি	ভবদীয়	আমি	মদীয়
শ্যাম	শ্যামল	আঘাত	আহত
সেচন	সিক্ত	কুল	কুলীন
ইচ্ছা	ইষ্ট	বিধান	বিহিত
খনন	খাত	গ্রহণ	গৃহীত
মরণ	মৃত	মোহ	মুগ্ধ, মূঢ়
নিরীক্ষণ	নিরীক্ষিত	জন্ম	জাত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
বিদ্যা	বিদ্বান	স্পর্শ	স্পষ্ট
শান্তি	শান্ত	স্তোত্র	স্তুত
বিষাদ	বিষণ্ণ	ক্রোধ	ক্রুদ্ধ
হৃদয়	হৃদ্য	কল্পনা	কল্পিত, কাল্পনিক
আচ্ছাদন	আচ্ছাদিত	সর্বনাশ	সর্বনেশে
ভ্রংশ	ভ্রষ্ট	অবসর	অবসৃত
মাঠ	মেঠো	সাহেব	সাহেবি
রেশম	রেশমী	পাটনা	পাটনাই
ঢাক	ঢাকাই	সূতা	সূতী
লাজ	লাজুক	অগ্র	অগ্রিম
বেনারস	বেনারসী	বন	বন্য, বুনো
পশম	পশমী	ধার	ধারাল
বেগুন	বেগুনী	শহর	শহুরে
পেট	পেটুক	চোরা	চোরাই
রং	রংদার	পাহাড়	পাহাড়ী
পুষ্টি	পুষ্ট, পোষ্টাই	খেয়াল	খেয়ালী
হিংসা	হিংসুটে	পাথর	পাথুরে
অভিধা	অভিহিত	আহ্বান	আহূত
জল	জ'লো	ঝগড়া	ঝগড়াটে
আদর	আদুরে	মেয়ে	মেয়েলি (লী)

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি পদ-পরিবর্তন করিয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর :—

অনাদৃত ; পশুপতি ; পর্বত ; শ্রান্তি ; মাধুর্য ; দারিদ্র্য ; গৌরব ; আলস্য ; সত্তা ; গরিমা ; সৌন্দর্য ; সাহায্য ; বার্ধক্য ; মহৎ ; কায় ; বর্ষ ; সন্ধ্যা : শাস্ত্র ; ক্লেশ ; প্রসন্ন ; শক্তি ; লাজ ; ধূর্ত ; কৌমার্য ; বাস্তব ; পরাক্রান্ত ; বেনারস।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোন পাঁচটি শব্দ নির্ণয় করিয়া বিশেষ্যক্ষেত্রে বিশেষণ এবং বিশেষণ ক্ষেত্রে বিশেষ্যপদ গঠন কর :—

নিরস্ত, ক্ষীণ, উদ্বেগ, ভাত, মহৎ, শুদ্ধ, গাঁ, বিচিত্র (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২)।

৩। নিম্নের প্রতিটি শব্দের পদ-পরিবর্তন করিয়া উহাদের সাহায্যে বাক্য গঠন কর :

বস্তু ; ঝগড়া ; সন্ধ্যা ; কুলীন ; বোকা ; মহৎ ও গম্ভীর (স্কুল ফাইনাল ১৯৫৮)।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

অশুদ্ধি-সংশোধন

ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ বাঙলা ভাষায় বাক্য রচনা করিবার সময় প্রায়ই ভুল করিয়া থাকে। আবার অনেকস্থলে অসাবধানবশতঃ শব্দগুলি বিকৃত করিয়াও উচ্চারণ করে। উহা দূর করিবার জন্য নিম্নে সেইরূপ অশুদ্ধি-সংশোধনের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল :

(বানান ঘটিত) সাধারণ বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আমাবস্যা	অমাবস্যা	সুরধনী	সুরধুনী
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	আষাড়	আষাঢ়
বিভীসিকা	বিভীষিকা	শারিরীক	শারীরিক
অজাগর	অজগর	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
যাবদীয়	যাবতীয়	নীরিহ	নিরীহ
ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত	ব্যায়	ব্যয়
মধুসুদন	মধুসূদন	নিপিড়িত	নিপীড়িত
পিপিলিকা	পিপীলিকা	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
ব্যাবসায়	ব্যবসায়	ত্যাক্ত	ত্যক্ত
কুসাশন	কুশাসন	উচ্ছন্ন	উৎসন্ন
স্বরস্বতী	সরস্বতী	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
বাল্মিকী	বাল্মীকি	ইয়ত্বা	ইয়ত্তা
সুধিগণ	সুধীগণ	সান্তনা	সান্ত্বনা
ভাগিরথী	ভাগীরথী	উনবিংশতি	ঊনবিংশতি
বিদুষী	বিদুষী	আপত্যি	আপত্তি
সারথী	সারথি	মঞ্জুরী	মঞ্জরী
পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য	জাজ্জ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান
ঋষিকেশ	হৃষীকেশ	এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
সমীচিন	সমীচীন	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
আশীষ	আশিস্	স্বয়ম্ভু	স্বয়ম্ভূ
আরত্রিক	আরাত্রিক (আরতি)	পিচাশ	পিশাচ

ণত্ব-ষত্ব-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অভিসেক	অভিষেক	প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ
ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ	আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
কল্যান	কল্যাণ	তিরস্কার	তিরস্কার
দুর্ণাম	দুর্নাম	আবিস্কার	আবিষ্কার
ফাল্গুণ	ফাল্গুন	পরিস্কার	পরিষ্কার
বনিক	বণিক	সুসমা	সুষমা
মধ্যান্থ	মধ্যাহ্ন	মৃনাল	মৃণাল
বিসন্ন	বিষণ্ণ	সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ
অভিভাসন	অভিভাষণ	বিসাদ	বিষাদ
গগণ	গগন	দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
শোনিত	শোণিত	হিরন্ময়	হিরণ্ময়
অক্ষৌহিনী	অক্ষৌহিণী	অগ্রনী	অগ্রণী

সন্ধি-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আত্মাক্ষর	আত্মক্ষর	রক্ষরাজ	রক্ষোরাজ
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
অত্যাধিক	অত্যধিক	বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া	সম্বাদ	সংবাদ
যদ্যাপি	যদ্যপি	সম্মিলন	সম্মেলন
রক্তছবি	*রক্তচ্ছবি	জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	নিরোগ	নীরোগ
শিরোশোভা	শিরঃশোভা	অত্যান্ত	অত্যন্ত
পুনরাভিনয়	পুনরভিনয়	ততধিক	ততোধিক
শিরধার্য	শিরোধার্য	কটুক্তি	কটূক্তি
চক্ষুদয়	চক্ষুর্দ্বয়	মনচোর	মনশ্চোর
পশ্বাধাম	পশ্বাধম	ক্ষুদ্‌পিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা

* কিন্তু "নদীপারে রক্তছবি, দিনান্তের ক্লান্ত রবি"—রবীন্দ্রনাথ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শিরোপরি*	শিরউপরি	তড়িতাহত	তড়িৎআহত
অনুমত্যানুসারে	অনুমতানুসারে	কায়মনবাক্য	কায়মনোবাক্য
পিতৃঠাকুর	পিতাঠাকুর	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
জ্যোতিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র	চণ্ডিদাস	চণ্ডীদাস
পিতাহীন	পিতৃহীন	কালিমাতা	কালীমাতা
প্রাণীহত্যা	প্রাণিহত্যা	কালীদাস	কালিদাস
শিক্ষার্থীগণ	শিক্ষার্থিগণ	দুরাত্মাগণ	দুরাত্মগণ
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ	যোদ্ধাবৃন্দ	যোদ্ধৃবৃন্দ
মহিমাময়	মহিমময়	বারম্বার	বারংবার
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	পশ্চাদ্‌পদ	পশ্চাৎপদ

তদ্ভব (সংস্কৃত শব্দ হইতে উদ্ভূত) বা দেশী খাঁটি বাঙলা শব্দের সহিত তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের, তদ্ভব, তৎসম বা দেশীয় শব্দের সহিত অন্য দেশের ভাষা হইতে গৃহীত বিজাতীয় শব্দের, দুইটি দেশী বা তদ্ভব শব্দের এবং বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের সন্ধি হয় না। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গোলালু	গোল আলু	টাকোপার্জন	টাকা উপার্জন
ইংলণ্ডেশ্বরী	ইংলণ্ডের ঈশ্বরী	শহরাঞ্চল	শহর অঞ্চল
কলিকাতাভিমুখে	কলিকাতা অভিমুখে	আমাপেক্ষা	আমার অপেক্ষা
গ্যাসোলোক	গ্যাসের আলোক	বিলাতাগত	বিলাত হইতে আগত
আইনানুসারে	আইন অনুসারে	চিন্তিয়াছি	চিন্তিত আছি

লিঙ্গ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভয়ঙ্করী	ভয়ঙ্করা	উদাসিনী	উদাসীনা
অপ্সরী	অপ্সরা	সিংহিনী	সিংহী
অধিনী	অধীনা	চাতকিনী	চাতকী
অনাথিনী	অনাথা	চন্দ্রবদনী	চন্দ্রবদনা
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী	পিশাচিনী	পিশাচী
গায়কী †	গায়িকা	সুকেশিনী	সুকেশী, সুকেশা
অশ্বী	অশ্বা	ত্রিনয়নী	ত্রিনয়না
আধুনিকা	আধুনিকী	ননদিনী	ননদ

*"উহাদের শিরোপরি লোষ্ট্র নিক্ষেপণে"—সদ্ভাবশতক। †"সকরুণে গাহিছে গায়কী"—মাইকেল মধুসূদন।

সমাস-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সাবধানপূর্বক	অবধানপূর্বক	যোগ্যানুসারে	যোগ্যতানুসারে
সাদরপূর্বক	আদরপূর্বক	রাজপথিমধ্যে	রাজপথমধ্যে
সোৎসুকচিত্তে	উৎসুকচিত্তে	মহারাজা	মহারাজ
মহদুপকার	মহোপকার	নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার
আকণ্ঠপর্যন্ত	আকণ্ঠ, কণ্ঠপর্যন্ত	অভিনেতাগণ	অভিনেতৃগণ
দুর্বলবশতঃ	দুর্বলতাবশতঃ	অলসনিবন্ধন	আলস্যনিবন্ধন
ভগবানদত্ত	ভগবদ্দত্ত	নৈরাশ	নিরাশ
নিশ্চিন্তিত	নিশ্চিন্ত	অধিবাসীবর্গ	অধিবাসিবর্গ
তপস্বীবেশে	তপস্বিবেশে	পরমাত্মারূপে	পরমাত্মরূপে

প্রত্যয়-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আলস্যতা	আলস্য	মনান্তর	মতান্তর
প্রসারতা	প্রসার	সখ্যতা	সখ্য
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য	পৈত্রিক	পৈতৃক
বাহ্যিক	বাহ্য	সৌজন্যতা	সৌজন্য
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	ভাগ্যমন্ত	ভাগ্যবন্ত
একত্রিত	একত্র	স্বতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
এদেশীয়	এতদ্দেশীয়	ঘূর্ণয়মান	ঘূর্ণমান
সিক্তিত	সিক্ত	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত
প্রফুল্লিত	প্রফুল্ল	ভদ্রস্থতা	ভদ্রতা
অজানিত	অজ্ঞাত	মান্যনীয়, মান্য	মাননীয়
ব্যাকুকতা	ব্যাকুল	মৈত্রতা	মৈত্রী
অস্তমান	অস্তায়মান	নিঃশেষিত	নিঃশেষ
বাহুল্যতা	বাহুল্য	উদ্বেলিত	উদ্বেল

উচ্চারণ দোষ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অভ্যস্থ	অভ্যস্ত	অনাটন	অনটন
ব্যেক্তি	ব্যক্তি	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
জৈ্যষ্ট	জৈ্যষ্ঠ	সম্মুপ	সম্মুখ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
স্বাস্থ	স্বাস্থ্য	নেয্য	ন্যায্য
পিচাশ	পিশাচ	পরক্ষ	পরোক্ষ
গ্রস্থ	গ্রস্ত	ব্যেথিত	ব্যথিত

[দ্রষ্টব্য ঃ লিখিবার কালে 'ন্ম' ও 'ক্ষ', 'জ্ঞ' 'জ্ঞ' প্রভৃতি সংযুক্তবর্ণের প্রয়োগ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। কতকগুলি বাঙলা শব্দে 'জ' ও 'য' উভয়েই বিকল্পে ব্যবহৃত হয়। যথা—কাজ, কায, বিজোড়, বিযোড় ইত্যাদি।]

ব্যাকরণ দুষ্ট কিন্তু বহু প্রচলিত

শুদ্ধ	প্রচলিত	শুদ্ধ	প্রচলিত
অর্ধাঙ্গী	অর্ধাঙ্গিনী	পাশ্চাত্ত্য	পাশ্চাত্য
আহৃত	অহরিত	সেবকা	সেবিকা
ইতোমধ্যে	ইতিমধ্যে	রজকী	রজকিনী
ইতঃপূর্বে	ইতিপূর্বে	নীরোগ	নীরোগী
ইষ্ট	ইচ্ছিত	বহুরূপ	বহুরূপী
চাকচক্য	চাকচিক্য	সাধনাতীত	সাধ্যাতীত
মুখর	মুখরিত	খোত	খোদিত
নৈরাশ্য	নিরাশা	মৌন	মৌনতা
ক্ষোদিত	খোদিত	মৌনী	মৌন
সাধনা	সাধ্য	সম্ভবপর	সম্ভব (বিশেষণ)
উপরিউক্ত	উপরোক্ত	মহারথ	মহারথী
উদ্গার	উদ্গীরণ	চক্ষুঃস্থির	চক্ষুস্থির
চক্ষুর্দান	চক্ষুদান	কাতরভাবে	সকাতরে

ভ্রম-সংশোধন—দৃষ্টান্ত

[ভ্রম-সংশোধনের কারণ দিতে পারিলে ভাল হয়]

সংশোধন—১৯৫২ স্কুল ফাইনাল

সর্বাঙ্গীণ—রেফের পর ক বর্গের বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও ন ণ হয়।

পরিষ্কার—পরি উপসর্গের কৃ ধাতুর পূর্বে স-কার আগম হয় এবং ঐ স ষ হয়।

স্থায়িত্ব—স্থায়িন্+ত্ব, ন-এর লোপ হইয়া স্থায়িত্ব হয়।

মহত্ত্ব—মহৎ+ত্ব, অতএব ত-এর দ্বিত্ব হইবে।

এতদঞ্চল—এতদ্ + অঞ্চল ; দ-এ আকার হইবে না।

ঐকমত্য—একমত + ষ্ণ্য, মূল শব্দে কোন ঐক্য নাই।

নিঃস্বার্থ—নিঃ = নাই স্বার্থ যাহার সে, বহুব্রীহি সমাসে নিঃস্বার্থ।

বাগীশ্বরী—বাগ্ + ঈশ্বরী, সন্ধির নিয়মে বাগ্ + ঈশ্বরী = বাগীশ্বরী।

প্রজ্বলিত—প্র + জ্বল্ + ক্ত, ডবল জয়ের হেতু নাই।

রচনাপদ্ধতির অশুদ্ধি

কেবলমাত্র বানান-ঘটিত ও ব্যাকরণ-ঘটিত শুদ্ধি হইলেই বিশুদ্ধ রচনা হয় না। কোন বিষয় রচনা করিবার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। রচনায় সেই পদ্ধতি রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে রচনা শ্রুতিমধুর হয়, রচনায় সঙ্কররীতি (অর্থাৎ সাধু শব্দের সহিত গ্রাম্য বা চলিত শব্দ) বর্জিত হয় এবং বিশিষ্টার্থক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া রচনা হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। শ্রুতিকটু, নিরর্থক শব্দপ্রয়োগ ও সঙ্কররীতি দোষে দুষ্ট হইলে রচনায় যে দোষ ঘটে, তাহাকেই **রচনা পদ্ধতির অশুদ্ধি** বলে। নিম্নে এই প্রকার অশুদ্ধির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :

শ্রুতিকটুতা ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ—রাত্রিতে আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিকা উপেক্ষা ক'রে তাড়াতাড়ি গেলাম শয়ন করতে, ভাল নিদ্রা না হ'লে পাছে অসুখ-বিসুখ হ'তে পারে এই ভয়ে।

শুদ্ধ—পাছে রাত্রিতে ভাল নিদ্রা না হইলে অসুখ-বিসুখ হইতে পারে এই ভয়ে আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিকা উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন করিতে গেলাম।

অশুদ্ধ—সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে উছট খাইয়া পড়িয়া গেল আকস্মিকভাবে একটি খানার ভিতর। এই পতনের ফলে ভাঙ্গিয়া গেল একখানি তাহার পা এবং শয্যাশায়ী হইয়া রহিল উহাতে সে সাত মাস।

শুদ্ধ—সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে উছট খাইয়া অকস্মাৎ একটি খানার ভিতর পড়িয়া গেল। এই পতনের ফলে তাহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গেল এবং উহাতে সে সাত মাস শয্যাশায়ী হইয়া রহিল।

শিষ্টপ্রয়োগ ও সঙ্কররীতি দোষ জনিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ—সে উর্দ্ধে তাকাইয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নীরব হইল। মনে হইল একটি বীনা বাজিতে বাজিতে যেন থামিয়া গেল। তাহার করুণ বিলাপ কাহিনী শুনিয়া আমার মন জমাট হইয়া গেল। কিন্তু তাহাকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা বা সমর্থ ছিল না। সাতিশয় আমি মনে ব্যথা বোধ করিতে লাগিলাম।

(কলিকাতা প্রবেশিকা ১৯৩০)

শুদ্ধ—সে ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া নীরব হইল; মনে হইল যেন একটি বীণা বাজিতে বাজিতে থামিয়া গেল। তাহার করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমার মন দ্রবীভূত হইয়া গেল। কিন্তু তাহাকে সাহায্য করিবার মত শক্তি বা সামর্থ আমার ছিল না। সেইজন্য আমি মনে অতিশয় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম।

অশুদ্ধ—তখন আষাঢ় মাস, বাগানে কুন্দকুসুমগুলি ধীরে ধীরে সৌরভ বিকাশ করিতেছে, বৃষ্টিধারায় দলগুলি আর্দ্র হওয়াতে মনে হইতেছিল কোন সুন্দরী স্বীয় মুখখানি শীতল জলে ধুইয়া যেন উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আকাশের গায়ে মেঘগুলি কখনও পশুমুণ্ডের, কখনও পাহাড়খণ্ডের, কখনও বা শুভ্রমাল্যের ন্যায় ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে চালিত হইয়া উপবিষ্ট হইতেছিল। অদূরে গঙ্গার তরঙ্গ ঢেউ-সহকারে বেগে ছুটিতেছিল ও সান্ধ্য বায়ু দুলিতে দুলিতে পবনের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

(কলিকাতা প্রবেশিকা ১৯৩১)

শুদ্ধ—তখন আষাঢ় মাস, উদ্যানে কুন্দকুসুমগুলি ধীরে ধীরে সৌরভ বিস্তার করিতেছিল, বৃষ্টিধারায় দলগুলি সিক্ত হাওয়াতে মনে হইতেছিল যেন কোন সুন্দরী স্বীয় বদনমণ্ডল শীতল সলিলে ধৌত করিয়া উদ্যানে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আকাশ-গাত্রে মেঘরাশি সমীর-সঞ্চালিত হইয়া কখনও পশুমস্তকের ন্যায়, কখনও প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়, কখনও বা শুভ্র পুষ্পমাল্যের ন্যায় ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত হইতেছিল। অদূরে গঙ্গা তরঙ্গ তুলিয়া বেগে প্রবাহিত হইতেছিল ও সান্ধ্য পবন দুলিতে দুলিতে তরঙ্গের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

ইংরাজী ভাষার অনুকরণ

ইংরাজী-শিক্ষার ফলে অনেক লেখকের ভাষার রীতি ইংরেজী ভাষার রীতির অনুসরণ করিতেছে। রচনা বা অনুবাদ করিবার সময় ভাষার রীতি যাহাতে অন্য ভাষার রীতির অনুসরণ না করে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন—

তিনি আমার প্রস্তাবে **'শীতল জল নিক্ষেপ করিলেও'** আমি তাঁহাকে আমার **'উত্তপ্ত ধন্যবাদ'** জ্ঞাপন করিলাম।

[**মন্তব্য :** এথানে **'শীতল জল নিক্ষেপ করিলেও,' 'উত্তপ্ত ধন্যবাদ'** এগুলি ইংরেজী রীতির অনুকরণে লিখিত। ইংরাজী 'To throw cold water' প্রভৃতির অবিকল অনুবাদ করিলেও হাস্যজনক হইবে। এস্থলে 'তিনি আমার প্রস্তাবের প্রতিকূলতা করিলেও আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম'—ইত্যাদিরূপ লেখা উচিত।]

এইরূপ—Hot youth (তপ্ত যৌবন), Moon-struck (চন্দ্রাহত), Naked

truth (উলঙ্গ সত্য), Public spirit (সাধারণ আত্মা) ইত্যাদি idiom-গুলির বর্ণে বর্ণে অনুবাদ করিলে ভুল হইবে ; ভাব-অনুসারে প্রতিশব্দ দেওয়া উচিত। কিন্তু Golden opportunity (স্বর্ণ সুযোগ), Golden era (স্বর্ণ যুগ) প্রভৃতি আজকাল বহু প্রচলিত। নিম্নে আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া হইল :

He is *dead* to all sense of shame—তাহার মোটেই লজ্জাবোধ নাই। A *dead* calm—সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। At *dead* of night—গভীর মধ্যরাত্রে, নিশীথে। A *good* hot cup of tea—খুব আরামজনক এক পেয়ালা গরম চা। A *good* sound sleep—সুগভীর নিদ্রা। *High* time—উপযুক্ত সময়। *High* words—ক্রোধপূর্ণ বা উদ্বেগজনক কথা। A *cold* manner—উদাসীন ব্যবহার। The *golden* age—সত্যযুগ। A *golden* opportunity—উত্তম সুযোগ। A *golden* wedding—বিবাহের পঞ্চাশদ্-বার্ষিক উৎসব। *Crocodile* tears—কপট অশ্রু। An *iron* will—দুর্দম ইচ্ছা। An *iron* hand—নির্দয়তা, কঠোরতা। A *jail* bird—বহুবার কারাদণ্ডিত ব্যক্তি প্রভৃতি।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে ভুল থাকিলে শুদ্ধ করিয়া লিখ :—
বাগেশ্বরী, মাধুরিমা, মৃন্ময়, আহরিত, সখ্যতা, বিশুদ্ধিতা, আবশ্যকীয়, অজানিত, অসহনীয়, ব্যাকুলিত, সাধ্যাতিত, মহদুপকার, অভিসেক ও ভদ্রস্থতা।

২। অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

(ক) নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা মড়াদাহ দেখিতে লাগিলাম, চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত জায়গাটা সমাচ্ছন্ন হইয়া এইরূপ আঁধার ক'রে তুলেছিল যে আমাদের নিশ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল। আমরা নদীর শৈকতে দাঁড়াইয়া জীবনের নিশ্বর্থ ও ক্ষণভাঙ্গুর্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। (ক. বি. ১৯২৫)

(খ) তাহার জন্মবার্ষিক উপলক্ষে তিনি বহুব্যায়ে একটি সাংঘাতিক ভোজনের অয়োজন করিয়াছিলেন। সময় সংক্ষেপ বলিয়া আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও আমার যাইবার সাবকাশ হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাঁহার পার্শে ছুটিলাম। (ক. বি. ১৯৪৬)

(গ) তাহার সৌজন্যতা দর্শনে আমরা সানন্দিত হইলাম। মহারাজা আপনি নিরপরাধীকে দণ্ডদান করিবেন না। তিনি বিপন্নগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে সাহায্যদান আবশ্যকীয়। তোমার বাক্য আমার কর্ণে অমৃত সিঞ্চন করিল। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি যথেষ্ট আছে, চাতুর্যতা ও বুদ্ধিমানতার সহিত তিনি তাহা সংরক্ষণ করিতেছেন।

(ঘ) বিবিধ প্রকার পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াও যখন সেই বালককে সবশ করা গেল না, ধূর্থ দারোয়ান ক্রোধ-কশাইত [illegible] সকীয় প্রভুর নিকট ধাবমান হইল এবং চৌরাপরাধে তাহাকে অনুযুক্ত করিল। (ক. বি. ১৯৪০)

ত্রিংশ অধ্যায়

অলঙ্কার

বাক্যে বোধগম্য শব্দ এবং শব্দসমষ্টি লইয়া হয় ভাষা। ব্যাকরণ পর্যায়ে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি। মানুষের যেমন দেহ, শব্দ এবং শব্দসমষ্টিকে লইয়া তেমনি ভাষার দেহ বলা যাইতে পারে। রমণীর দেহ যখন নানা অলঙ্কারে ভূষিত হয় তখন তাহাতে অপূর্ব শ্রী ফুটিয়া উঠে। স্বর্ণকার এবং মণিকারেরা অঙ্গুলিয়ের সূক্ষ্ম রুচিসম্মত শিল্প-সৃষ্টি রমণীর অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্য সঞ্চার করে। যেমন মানুষের অঙ্গে, তেমনি ভাষার অঙ্গেও অলঙ্কারের সাজ পরাইয়া ভাষাকে মনোহর শিল্প-সুন্দর করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাওয়া হয়। কঙ্কন, কণ্ঠী, দুল ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত করাইয়া রমণীদেহ যেমন সৌন্দর্য সঞ্চার করা হয়, ভাষাকেও তেমনি উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন অলঙ্কারের দ্বারা সু-সজ্জিত করিয়া তোলা হয়।

সাহিত্যের গদ্যশিল্পকে যদি বলি পুরুষ তাহা হইলে কাব্যশিল্পকে হয়তো বলা চলে রমণী। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যকে রমণীরূপেই কল্পনা করিয়াছেন—("আজন্ম-সাধনধন সুন্দরী আমার কবিতা, কল্পনা-লতা"—"মানসসুন্দরী")।

কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ যত বেশী গদ্য সাহিত্যে তত নয়। নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা কাব্যঅঙ্গ সুষমা-মণ্ডিত হইয়া উঠে। এক সময় সংস্কৃত কাব্য সমালোচকগণ বলিয়াছেন, **কাব্যং গ্রাহ্যং অলঙ্কারাৎ**। অর্থাৎ ভাষা অলঙ্কারে ভূষিত হইলে তবেই তাহাকে কাব্য বলা হইবে। অবশ্য পরবর্তীকালে কাব্য সম্পর্কে এই সংজ্ঞাকেই চরম বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় নাই। তথাপি কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানতঃ দুই প্রকার। যথা—

(১) শব্দালঙ্কার ও (২) অর্থালঙ্কার।

[১] শব্দালঙ্কার

একই শব্দ অথবা একই ধ্বনি নির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়া উচ্চারিত হইয়া ভাষায় যে ঝংকার এবং মাধুর্য সৃষ্টি করে এবং পাঠক বা শ্রোতার মন বা কর্ণকে তৃপ্তি দান করে, তাহাই **শব্দালঙ্কার**।

বাঙলা সাহিত্যে শব্দালঙ্কারকে আবার নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—

(১) অনুপ্রাস, (২) যমক, (৩) শ্লেষ ও (৪) বক্রোক্তি।

(১) অনুপ্রাস (Alliteration) ঃ একই ব্যঞ্জনবর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যদি একত্রে অথবা পৃথকভাবে পুনঃপুনঃ ধ্বনিতে হয়, তবে তাহাকে বলা হয় অনুপ্রাস। যেমন—

"পঞ্চনদীর তীরে
ভক্তদেহের রক্ত লহরী মুক্ত হইল কি রে?" (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে 'র' এবং 'ক্ত' এই দুই ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃপুনঃ বিন্যাস হওয়ায় উহার অলঙ্কার অনুপ্রাস।

এইরূপ, "নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
বহে না চল মলয়ানিল লুটিয়া ফুল গন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ, ফুটে না বনে কুন্দ-নীপ
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া পিক চন্দনার।" (শ্রীকালিদাস রায়)

অনু শব্দের অর্থ পরে। প্র-অস্ (নিক্ষেপ অর্থে)। অনুপ্রাস শব্দের অর্থ পরে ফেলা বা পরপর সাজান। একই ধ্বনির পরপর আবৃত্তি হইলেই অনুপ্রাস হয়। স্বরধ্বনি পরপর আবৃত্তি হইলে ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না। তাই স্বরধ্বনির পুনরাবৃত্তি অনুপ্রাস অলঙ্কার নয়। কেবলমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলেই অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়।

[**দ্রষ্টব্য ঃ** ইংরেজী অলঙ্কারশাস্ত্রে যাহাকে Alliteration বলা হইয়াছে বাঙ্লায় তাহাকে অনুপ্রাস বলা চলে না। কারণ, ইংরেজী Alliteration Vowel এবং Consonant উভয়ই চলিতে পারে।]

বাঙ্লায় অনুপ্রাস অলঙ্কারকে আবার প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—

(১) অন্ত্যানুপ্রাস, (২) বৃত্ত-অনুপ্রাস ও (৩) ছেক-অনুপ্রাস।

ইহা ছাড়া শ্রুতি ও লাট অনুপ্রাস দুইটি আছে। এই দুইটি অনুপ্রাস অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না; সুতরাং এস্থলে প্রথম তিনটি অনুপ্রাসের বিষয়ই আলোচনা করা হইল।

(১) অন্ত্যানুপ্রাস ঃ দুইটি চরণের শেষে যে ছন্দোমিল থাকে, তাহাই অন্ত্যানুপ্রাস। কবিতায় ইহা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। যেমন—

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।"

(২) বৃত্ত-অনুপ্রাস ঃ একই ব্যঞ্জনবর্ণ যদি দুই বা দু'য়ের অধিকবার যুক্ত হয়, অথবা একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণের বহুবার বিন্যাস হয়, তবে তাহাকে বলে বৃত্ত-অনুপ্রাস। যেমন—

(ক) "তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি।" (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে 'ত' ও 'ম' এই দুই ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্র দুইবার বিন্যাস করা হইয়াছে।

(খ) "থাক তব ক্ষুদ্র মাপ
ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে।" (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে 'ক্ষ' ও 'দ্র' এই দুই ব্যঞ্জনবর্ণের তিনবার বিন্যাস করা হইয়াছে।

(গ) "চলচপলার চকিতচমকে
করিছ চরণ বিচরণ
কোথা চম্পক আভরণে।" (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে 'চ' ব্যঞ্জনবর্ণের সাতবার এবং 'র' ও 'ণ' এর তিনবার বিন্যাস করা হইয়াছে।

(৩) ছেক-অনুপ্রাস : দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনি সংযুক্তভাবে অথবা পৃথকভাবে ক্রমানুসারে যদি কেবলমাত্র দুইবার ধ্বনিত হয়, তবে তাহাকে ছেক-অনুপ্রাস বলে। যেমন—

"তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ ক'রো না পাখা" (রবীন্দ্রনাথ)

অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত-অনুপ্রাস ও ছেক অনুপ্রাসের অন্যান্য উদাহরণ :

(১) "জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।" (মুকুন্দরাম)

(২) "নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।" (গোবিন্দদাস)

(৩) "নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন শিয়রে।"

(৪) "লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেল অস্তাচলে" (মাইকেল মধুসূদন)

(৫) "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।" (দ্বিজেন্দ্রলাল)

(২) যমক (Analogue) : দুই বা ততোধিক বর্ণ দ্বারা গঠিত পদ অথবা পদের অংশ যদি পৃথক পৃথক অর্থে দুই বা ততোধিক স্থানে ধ্বনিত হয়, অথবা একটি পদাংশ নিরর্থক হইয়া পুনরাবৃত্তি হইলে যমক অলঙ্কার হয়। যেমন—

'**আনা** দরে **আনা** যায় কত **আনারস**'। (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

এখানে প্রথম 'আনা' একআনা অর্থে, দ্বিতীয় 'আনা' আনয়ন করা অর্থে—এবং তৃতীয় 'আনা' 'আনারস' এই পদের অংশরূপে পুনরাবৃত্তি হইয়াছে।

যমক অলঙ্কার নিম্নলিখিত তিন প্রকার। যথা—

(ক) আদ্যযমক, (খ) মধ্যযমক এবং (গ) অন্ত্যযমক।

(ক) আদ্যযমক—"**ভারত ভারত**খ্যাত আপনার গুণে।" (ভারতচন্দ্র)

এখানে প্রথম 'ভারত' ভারতচন্দ্র অর্থে এবং দ্বিতীয় 'ভারত' ভারতবর্ষ অর্থে।

(খ) মধ্যযমক—"কুসুমের **বাস** ছেড়ে কুসুমের **বাস**

বায়ুভরে করে এসে নাসিকায় **বাস**।" (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

(১) বাস=আশ্রয়, (২) বাস=সৌরভ, (৩) বাস=অবস্থান।

(গ) অন্ত্যযমক—"যত কাঁদে বাছা বলি **সর সর**

আমি অভাগিনী বলি **সর সর**।"

(১) সর=দুধের সর, (২) সর=সরিয়া যা।

গদ্যে যমকের দৃষ্টান্ত—"খ্যাতনামা লেখকদেরও বই বাজারে **কাটে** কম,

কাটে বেশি পোকায়।" (প্রমথ চৌধুরী—'বীরবল')

(৩) শ্লেষ (Paronomasia Pun): একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়। আবার একই শব্দের একবার ব্যবহারকে যদি দুই বা বহু অর্থে বুঝা যায়, তখন সেই শব্দকে বলে শ্লেষ। যেমন—

"কে বলে **ঈশ্বর গুপ্ত**? ব্যাপ্ত চরাচর।

যাঁহার **প্রভাবে প্রভা** পায় **প্রভাকর**।" (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

এখানে 'ঈশ্বর' শব্দ দুই অর্থবোধক। প্রথমতঃ 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ ভগবান, **দ্বিতীয়তঃ** কবি ঈশ্বরগুপ্ত। তেমনি 'প্রভাকর' শব্দের অর্থ—সূর্য, আবার 'প্রভাকর' অর্থাৎ **'সংবাদ** প্রভাকর'। (ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সাময়িক-পত্র)

এইরূপ—"অতি বড় **বৃদ্ধ** পতি **সিদ্ধিতে** নিপুণ

কোন **গুণ** নাই তার কপালে **আগুন**।" (ভারতচন্দ্র)

বৃদ্ধ—বুড়া, বৃদ্ধ—জ্ঞানী, সিদ্ধি—মুক্তি, সিদ্ধি—নেশার বস্তু; গুণ নাই—**গুণহীন,** গুণ নাই—নির্গুণ (ঈশ্বর); কপালে-আগুন—পোড়াকপাল, কপালে আগুন—**শিবের** ভালস্থিত অগ্নিনেত্র। (উক্ত উদাহরণটি ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারও বটে। নিন্দার **ছলে** স্তুতিকে বলা হয় ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার)

"কিশোর বয়সে **পক্ষধরের পক্ষশাতন** করি

বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এলো দেশে যশের মুকুট পরি।" (সত্যেন্দ্রনাথ)

এখানে 'পক্ষধর' অর্থে পাখী; 'পক্ষধর' অর্থে মিথিলার পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র। 'পক্ষশাতন' অর্থে পাখা কর্তন অর্থাৎ গর্ব খর্ব করিয়া আসিল বাঙালীর সন্তান রঘুনাথ শিরোমণি।

যমক এবং শ্লেষ অলঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য: যমকে এক আকৃতিবিশিষ্ট শব্দের একাধিকবার বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। যেমন—"কোথা হা হন্ত চির

বসন্ত আমি বসন্তে মরি।" এখানে বসন্ত শব্দ—দুই অর্থে বিশিষ্ট হইয়া দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্লেষে একবার প্রয়োগেই শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন—"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত? ব্যাপ্ত চরাচর।" এখানে 'ঈশ্বর' পদ একবার প্রয়োগেই দুই অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

আবার কোথাও কোথাও নিরর্থক ধ্বনিগত সাদৃশ্য যদি থাকে, তাহা হইলেও যমক অলঙ্কার হয়। যেমন—"আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়।"

এখানে প্রথমোক্ত 'রিণী' পদ যদিও নিরর্থক তথাপি পাশাপাশি 'রিণী' 'ঋণী' ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকায় যমক অলঙ্কার হইয়াছে। কিন্তু নিরর্থক ধ্বনি বা পদ্যাংশ দিয়া শ্লেষ অলঙ্কার হয় না। ধ্বনিসহ অর্থগত বৈচিত্র্য বা নিরর্থক ধ্বনি সাদৃশ আছে যমকে; শ্লেষে ধ্বনি বৈচিত্র্য তেমন নাই, শব্দের রূপ এখানে এক এবং আবশ্যক মতো তাহার অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

(৪) বক্রোক্তি (Epigram): কাহারও একার্থবোধক শব্দ যদি অপর কেহ শ্লেষ বা কাকু (স্বরভঙ্গী) দ্বারা অন্য অর্থ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে বক্রোক্তি অলঙ্কার বলে। যেমন—

প্রশ্ন। "সাধু হয়ে সুরা কেন করিছ সেবন।
উত্তর। সুরা না সেবিলে মুক্তি পায় কোন জন॥"

এখানে প্রশ্নকারী 'সুরা' শব্দের অর্থ মদ্য এবং 'সেবন' পান করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; উত্তরকারীর সাধু 'সুরা' দেবতা অর্থে এবং 'সেবিলে' পূজা করিলে এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছে। তাই প্রশ্নকারী সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মদ্য পান করিতেছ কেন?' উত্তরকারী বলিলেন—'দেবতার পূজা না করিলে কেহ মুক্তি পায় না।

এইরূপ—"গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী?" (মাইকেল মধুসূদন)

এখানে কাকু (স্বরভঙ্গী) দ্বারা 'গ্রহের দোষে অপরাধী ব্যক্তিকে কেহই নিন্দা করে না' এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে।

[২] অর্থালঙ্কার

শব্দের অর্থগত প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ভাষায় যে সৌন্দর্য সৃষ্টি, কল্পনা বিস্তার এবং ভাবের অভিনব ব্যঞ্জনা সূচিত হয়, তাহাকে **অর্থালঙ্কার**-বলে।

বাঙলা ভাষা-সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান কয়েকটি অর্থালঙ্কার:

(১) উপমা, (২) রূপক, (৩) উৎপ্রেক্ষা, (৪) ব্যতিরেক ও (৫) সমাসোক্তি।

(১) উপমা (Simile): সমান গুণ বা সমান ধর্ম বিশিষ্ট দুই ভিন্ন জাতীয়

বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পিত হইলে উপমা অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারে সাধারণতঃ যেমন, মত, যেরূপ, সদৃশ, তুল্য, সমান, সম, হেন, সেরূপ প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

উপমার চারিটি অঙ্গ—উপমান, উপমেয়, উহাদের সাধারণ ধর্ম এবং তুলনা-বাচক শব্দ। যাহার সহিত তুলনা করা যায় তাহাকে উপমান, যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয় এবং যে ভাব বা বস্তু তুলনা সম্ভব করে, তাহাকে সাধারণ ধর্ম বলে।

উপমা অলঙ্কারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :

(ক) **পূর্ণোপমা** : যেখানে উপমা অলঙ্কারের চারিটি গুণই বর্তমান থাকে অর্থাৎ উপমান, উপমেয়, উহাদের সাধারণ ধর্ম এবং তুলনা-বাচক শব্দ স্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকে, সেখানে পূর্ণোপমা হয়। যেমন—

"শুভ্রললাটে ইন্দু সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।" (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে 'শুভ্রললাট' উপমেয়, 'ইন্দু' উপমান, 'সমান' তুলনা-বাচক এবং 'স্নিগ্ধ শান্তি' সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ—এই চারিটি অঙ্গই বর্তমান ; সুতরাং ইহা পূর্ণোপমা।

এইরূপ—"ছিনু মোরা সুলোচনে। গোদাবরী তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।" (মাইকেল মধুসূদন)

(খ) **লুপ্তোপমা** : যেখানে উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম ও তুলনা-বাচক শব্দের মধ্যে কোন একটি বা একাধিক অঙ্গ লুপ্ত থাকে, সেখানে লুপ্তোপমা হয়। যেমন—

"তিলেক না দেখি ও **চাঁদবদন**
মরমে মরিয়া থাকি।" (চণ্ডীদাস)

এখানে সাধারণ ধর্ম ও তুলনা-বাচক শব্দ লুপ্ত।

(গ) **মালোপমা** : একটি উপমেয়ের একের অধিক উপমান থাকিলে, তাহাকে মালোপমা বলে। যেমন—

"মলিনবদনা **দেবী**, হায়রে যেমতি
খনির তমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) **সূর্যকান্তমণি**,
কিম্বা বিম্বাধরা **রমা অম্বুরাশি তলে**।" (মাইকেল মধুসূদন)

এখানে 'দেবী' শব্দ উপমেয় এবং 'দেবী' এই উপমেয়ের 'সূর্যকান্তমণি' ও 'রমা' এই দুইটি উপমান রহিয়াছে।

(২) রূপক (Metaphor) : উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা

করিয়া অর্থাৎ উপমেয়কে উপমানরূপে যখন অলঙ্কার গঠিত হয়, তখন তাহাকে রূপক অলঙ্কার বলে। যেমন—

"ঐ দেখ আইল গো তিমির **যামিনী**
কালভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে।" (মাইকেল মধুসূদন)

এখানে উপমেয় 'যামিনী' এবং উপমান 'কালভুজঙ্গিনী'র মধ্যে অভেদ কল্পনা করাতে রূপক অলঙ্কার হইয়াছে।

এইরূপ—"নমি আমি, কবিগুরু, তব **পদাম্বুজে**।" (মাইকেল মধুসূদন)

রূপক অলঙ্কারের অন্যান্য উদাহরণঃ

(১) "সেই হোমানলে হের আজি জলে **দুখের রক্তশিখা**" (রবীন্দ্রনাথ)
(২) "অবনীর এই **পদ্মবেদীতে** হরিলে ত্রিতাপ দুঃখ" (করুণানিধান)
(৩) "আমার আঁখির **দুখদীপ** নিয়া
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া।" (নজরুল)
(৪) "**জীবন-উদ্যানে** তোর **যৌবনকুসুমভাতি** কতদিন রবে ?" (মধুসূদন)

রূপক অলঙ্কারকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে:

(ক) **নিরঙ্গরূপকঃ** যেখানে অঙ্গবাচক অভেদ কল্পিত না হইয়া কেবলমাত্র একটি উপমান এবং একটি উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পিত হয়, সেখানে নিরঙ্গরূপক হয়। যেমন—

"মেলিতেছে **অঙ্কুরের** পাখা
লক্ষ লক্ষ **বীজের বলাকা**।" (রবীন্দ্রনাথ)

(খ) **সাঙ্গরূপকঃ** যে রূপক অলঙ্কারে উপমানের অভেদ নির্দেশে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অঙ্গেরও অভেদ নির্দেশিত করা হয়, তাহাকে সাঙ্গরূপক বলে। যেমন—

"নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়ে রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে।...
দিয়া হাস্য সুধাচার অঙ্গচ্ছটা আঠা তার
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।"

এখানে উপমানগুলির অভেদ নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অঙ্গেরও অভেদ নির্দেশিত হইয়াছে।

(গ) **পরম্পরিত রূপকঃ** একটি উপমান এবং উপমেয় যদি অপর একটি উপমান এবং উপমেয়ের প্রয়োগের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরম্পরিত রূপক বলে। যেমন—

"নয়ন-চকোর কানু-মুখ শশিবর
করিল অমিয় রস পান।"

এখানে 'নয়নের' সহিত 'চকোরের' অভেদ কল্পিত হওয়ায় 'কানুর মুখ' 'শশিবরের' সহিত অভেদ কল্পিত হওয়ার কারণ হইয়াছে। সুতরাং ইহা পরম্পরিত রূপক।

(৩) **উৎপ্রেক্ষা** (**Hypothetical Metaphor**): সাদৃশ্যের আধিক্য কল্পিত হইলে উপমেয়কে উপমানরূপে সংশয় বা বিতর্ক করিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। সাধারণতঃ এই অলঙ্কারে যেন, হেন, মনে হয়, বুঝি ইত্যাদি শব্দদ্বারা এইরূপ প্রকাশিত হয় অথবা বিতর্ক উপস্থাপিত হয়।

উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার—(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও (খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

(ক) **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা**: 'যেন', 'বুঝি', 'বোধ হয়', 'মনে হয়' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ হইয়া উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইলে তাহাকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলে। যেমন—

"সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলিমের
স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।" (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলিমের বাঁকা স্রোতখানি মলিন হওয়াতে খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারের সহিত তাহার প্রবল সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে এবং বাঁকা স্রোতখানি যাহা উপমেয় তাহাকেই উপমান বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা ছাড়া সংশয়বাচক 'যেন' এই পদ রহিয়াছে। অতএব ইহা বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(খ) **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা**: যেন, হেন, মনে হয়, বুঝি ইত্যাদি পদ প্রয়োগ না হইয়াই যেখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয় তখন তাহাকে বলা হয় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। যেমন—

"কজ্জল-কিরণে শোভা করিছে নয়ন।
মেঘের আবলি-মাঝে শোভে তারাগণ॥" (পদ্মিনী উপাখ্যান)

এখানে উপমান 'তারা' (নক্ষত্র) কে উপমেয় 'নয়ন' বলিয়া অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে; তুলনাবাচক 'যেন' শব্দটির এখানে উল্লেখ নাই।

(৪) **ব্যতিরেক** (**Excess of Object or Subject**): উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনা করিলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। যেমন—

উৎকর্ষ: "কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা?
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।" (ভারতচন্দ্র)

এখানে উপমান 'শশী' অপেক্ষা উপমেয় 'মুখ'-এর উৎকর্ষ বুঝাইতেছে।

অপকর্ষ ঃ "যৌবন বসন্ত সম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না যৌবন ॥"

এখানে উপমান 'বসন্ত' অপেক্ষা উপমেয় 'যৌবন'-এর অপকর্ষ বুঝাইতেছে।

(৫) সমাসোক্তি (Personification) ঃ উপমানের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় যদি উপমেয়ের প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে বোধ জন্মাইয়া দেয়, তাহা হইলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

"বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া,—আছে চাহি
দিগন্তের পানে।" (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে 'বসুন্ধরাকে' মানুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ; উপমানের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় 'বসুন্ধরা' প্রসঙ্গে বোধ জন্মাইয়া দিতেছে।

আবার অচেতন বা জড় পদার্থকে চেতনরূপে কল্পনা করিয়াও সমাসোক্তি অলঙ্কার গঠিত হয়। যেমন—

"ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী জপমালাধৃত প্রান্তর।" (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে 'ভূধর' অচেতন সুতরাং তাহার পক্ষে 'ধ্যানগম্ভীর' হওয়া সম্ভব নয়। **কিন্তু কল্পনায়** 'ভূধর' এখানে চেতন।

সমাসোক্তি অলঙ্কারের অন্যান্য উদাহরণ ঃ

(১) "বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূর-ব্যাপী শস্যক্ষেত্র জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া, স্থির নয়ন যুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।" (রবীন্দ্রনাথ)

(২) "দেখ গো হোথায় হাফর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি"
(যতীন্দ্রনাথ)

(৩) "সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হল কুটি কুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।" (রবীন্দ্রনাথ)

(৪) "ধন্য আশা কুহকিনি ! তোমার মায়ায়
অসার সংসার চক্র ঘোরে নিরবধি" (নবীনচন্দ্র)

(৫) "তব কনিষ্ঠা মেয়ে ধরণীরে দিলে দান ধূলামাটি
তাই দিয়ে তার ছেলেদের মুখে ধরে সে দুধের বাটি" (নজরুল)

অনুশীলনী

১। উদাহরণ সাহায্যে নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলি বুঝাইয়া দাও।—

(ক) যমক, (খ) শ্লেষ, (গ) উৎপ্রেক্ষা (উঃ মাঃ ১৯৬০), (ঘ) ব্যতিরেক, সমাসোক্তি (উঃ মঃ ১৯৬০) ও (ঙ) রূপক (উঃ মঃ ১৯৬১)।

২। অনুপ্রাস (উঃ মঃ ১৯৬৪) ও যমক, শ্লেষ, উপমা ও রূপকের পার্থক্য নির্ণয় কর (উঃ মঃ ১৯৬১)। পরম্পরিত রূপক কাহাকে বলে উদাহরণ সাহায্য নির্ণয় কর।

৩। শ্লেষ ও সমাসোক্তি অলঙ্কার যোগে ব্যাখ্যা কর। (উঃ মঃ ১৯৬৩)

৫। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতগুলির অলঙ্কার নির্ণয় কর :—

(১) "রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে।" (কবিগুরু বন্দনা)

(২) "অগ্রসরি শচীপতি সহস্রলোচন
তপোধনশিরঃ স্পর্শি সুকরকমলে,
কহিলা আকুল স্বরে।" (দধীচির তনুত্যাগ)

(৩) "বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজী সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।" (প্রতিনিধি)

(৪) "বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব উচ্ছ্বাসে।" (প্রাচীন ভারত)

(৫) "বঙ্গসিন্ধু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়,
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ, মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায়।" (বাঙালীর মা)

(৬) বনতোষিণী ! শাখাবাহুদ্বারা, আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর।" (শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা)

(৭) "তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌত প্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল।" (সাগরসঙ্গমে নবকুমার)

(৮) "অসংযত কবাট ও শ্রীহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে।" (ভরত)

(৯) "বাহিরে নব বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মুকুলিত রসের আকাশ আকুল করিয়া দিল।" (তোতা কাহিনী)

(১০) "শীতটা যেন ছুঁচের মতো গায়ে বিঁধিতেছিল।" (নতুনদা)

(১১) "মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মরকন্দ।" (ফুল্লরার বারমাস্যা)

(১২) "দুর্গম তুষার গিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায় অশ্রুত যে গান গায়,"
(ঐক্যতান)

(১৩) "ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে, বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত—অনল ছবি ধক্ ধক্ জ্বলে রবি,
কিরণ জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে।" (বিহারীলাল)

(১৪) "শিশির বিমল প্রভাতের ফল শত হাতে সহি পরখের ছল
বিকাল বেলায় বিদায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।" (হাট—যতীন্দ্রনাথ)

(১৫) "শুভ্রমুখী শুদ্ধ শরীরা—সুন্দরী নবমল্লিকা
সাহস করিতেছে" (বসন্তের কোকিল)

(১৬) "শ্রীজীব তখন যমুনার তীরে তমাল তরুর তল
আশ্রয় করি রহিলেন পড়ি ত্যজিয়া অন্নজল" (গাথাঞ্জলী)

(১৭) "বিরহিনী ব্রজবধূ যেন আহা হয়ে উন্মাদিনী" (বর্ষামঙ্গল)

(১৮) "শিয়রে শমন কত কথা বলে দমকে দামিনী বারেবার।" (কৃষ্ণা রজনী)

(১৯) "তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর
অবতারণ করিয়াছেন।" (বঙ্কিমচন্দ্র)

(২০) "এখানকার উৎসবগুলি ক্রমশঃই যেন আপিসী-ছাঁচে গঠিত হইয়া
উঠিতেছে।" (শুভ-উৎসব)

(২১) "অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক সমাপ্ত হতে চলল" (অভাগীর স্বর্গ)

(২২) "না ফুরাতে শরতের বিদায়-শেফালি,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল-দীপালি,
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা-ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহ্বান" (নজরুল

(২৩) "সুরু হয়ে গেছে গুরু গুরু রব—নাসা-গর্জন ঝঙ্কার!" (মোহিতলাল)

(২৪) "দুই দণ্ডেই হল দণ্ডিত পণ্ডিত দাম্ভিক,
শুনিতে পাইল জনতায় শুধু ধ্বনিতেছে ধিক্ ধিক্।" (কালিদাস রায়)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পত্রের ব্যাকরণ

পাঠ-সংকলন

(পঞ্চম সংস্করণ)

পদ্যাংশ (নবম শ্রেণী)

কবিগুরু বন্দনা (পৃঃ ১)

সন্ধি ঃ পদাম্বুজ—পদ + অম্বুজ। শিরশ্চূড়ামণি—শিরঃ + চূড়ামণি। কাব্যোদ্যান—কাব্য + উদ্যান। মনোহর—মনঃ + হর। রত্নাকর—রত্ন + আকর।

সমাস ঃ কবিগুরু—কবিকুলের গুরু (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। পদাম্বুজ—পদরূপ অম্বুজ (পদ্ম) (রূপক কর্মধারয়) অথবা পদ অম্বুজের ন্যায় (উপমিত কর্মধারয়)। শিরশ্চূড়ামণি—শিরের (শিরসের) চূড়ামণি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। চূড়ামণি—চূড়ান্বিত মণি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। রাজেন্দ্রসঙ্গমে—রাজাদের মধ্যে ইন্দ্র (সপ্তমীতৎপুরুষ), তাহার সঙ্গমে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ভবদম—ভবকে (সংসারকে) দমন করেন যিনি (উপপদতৎপুরুষ)। কৃত্তিবাস—কৃত্তি (বাঘের চর্ম)। বাস যাহার (বহুব্রীহি)। কাব্যোদ্যান—কাব্যরূপ উদ্যান (রূপক কর্মধারয়)। **অকিঞ্চন**—অ = (নাই) কিঞ্চন (কিঞ্চিৎ) যাহার (বহুব্রীহি); (সংস্কৃত কিম্ + চন) সংস্কৃতে তৎপুরুষ সমাস।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) তব অনুগামী দাস, **রাজেন্দ্রসঙ্গমে**—'এ' বিভক্তি-যোগে ভাবে সপ্তমী। (খ) দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-**দরশনে**—'এ' বিভক্তি যোগে নিমিত্তার্থে সম্প্রদানে সপ্তমী। (গ) তব **পদচিহ্ন** ধ্যান করি দিবানিশি—কর্মে প্রথমা ('শূন্য' বিভক্তি)। (ঘ) ইচ্ছা সাজাইতে বিবিধ **ভূষণে ভাষা**—করণে 'এ' বিভক্তি (ভূষণের দ্বারা); ভাষা—(ভাষাকে)—কর্মে 'শূন্য' বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) ঃ পদাম্বুজ—পদ + অম্বু—জন + ড (কর্তৃবাচ্যে)। অনুগামী—অনু + √গম্ + ণিন্ (কর্তৃবাচ্য)। দমন—√দম্ + অন। **দমনিয়া—দমন** (বিশেষ্য) + ইয়া = দমনিয়া কবিতায় ব্যবহৃত (নামধাতু)। গদ্যে 'দমন করিয়া'। **অলঙ্কার**—অলম + √কৃ + অ (ণ) (ভাববাচ্যে)। **সুমধুরভাষী**—সু-মধুর + ভাষ্ + ণিন্ (কর্তৃবাচ্যে); স্ত্রীলিঙ্গে '**সুমধুরভাষিণী**' উপপদ সমাস। **মনোহর**—মনস্ (:) √ + হৃ + অ (কর্তৃবাচ্যে)।

পদান্তর ঃ যশ (বিশেষ্য) **যশস্বী** (বিশেষণ)। ফুল (বিশেষ্য) ফুলেল (বিশেষণ)। ইচ্ছা (বিশেষ্য) ঈপ্সিত, ঐচ্ছিক (বিশেষণ)। দীন (বিশেষ্য) দৈন্য (বিশেষণ)।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ দরশনে—দর্শনে > দরশনে (বিপ্রকর্ষের উদাহরণ)। সযতনে—সযত্নে > সযতনে (বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ)।

অলঙ্কার ঃ তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে।—রূপক

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—
ধ্যান, দুরন্ত, দর্শনিয়া, অলঙ্কার, নমি, সুমধুরভাষী, অনুগামী।

২। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :—
পদচিহ্ন, দিবানিশি, সুমধুরভাষী, মুরারি-মুরলীধ্বনি-সদৃশ, কাব্যোত্থান।

৩। বড় হরফে মুদ্রিত পদগুলির ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ : **যশের** মন্দিরে, **কবিতারসের** সরে।

২। দধীচির তনুত্যাগ (পৃঃ ৫-৬)

সন্ধি ঃ তপোধন—তপঃ+ধন। শিরোরত্ন—শিরঃ+রত্ন। মহর্ষি—মহা+ঋষি। নিষ্কাম—নিঃ+কাম। নিশ্চল—নিঃ+চল। লক্ষণীয়; নিশ্বাস, নিস্পন্দ পদে কোন সন্ধি নাই। মুনীন্দ্র—মুনি+ইন্দ্র।

সমাস ঃ সহস্রলোচন—সহস্র লোচন যাহার (বহুব্রীহি)। হরষবিষাদ—হরষ মিশ্রিত বিষাদ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) অথবা হরষ ও বিষাদ (দ্বন্দ্ব)। সাধুশিরোরত্ন—শিরস্থিত রত্ন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), সাধুগণের শিরোরত্ন—(ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। চিরমোক্ষফলপ্রদ—মোক্ষরূপ ফল (রূপক কর্মধারয়) চির (সকল সময়) ব্যাপিয়া মোক্ষফল (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ), চিরকাল ব্যাপিয়া মোক্ষফল প্রদান করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। তারস্বরে—তার অর্থাৎ উচ্চ স্বর (কর্মধারয়) তাহাতে। চতুর্বেদগান—চারি বেদের সমাহার (দ্বিগু সমাস) তাহার গান (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) পুষ্পাসার বরসিল **মুনীন্দ্রে** আচ্ছাদি।—কর্মে দ্বিতীয়া 'এ' বিভক্তি। (খ) দধীচি ত্যজিলা তনু **দেবের মঙ্গলে**—দেবের নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী। মঙ্গলে নিমিত্তার্থে চতুর্থী।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : সাত্ত্বিক—সত্ত্ব+ষ্ণিক। কর্তব্য—কৃ+তব্য (কর্মবাচ্যে)। মুগ্ধ—√মুহ্+ত (কর্তৃবাচ্যে)। সাধন—√সাধ্+অনট্ (ভাববাচ্যে)। নেত্র—নী+ষ্ট্রণ (করণবাচ্যে)। পাঞ্চজন্য—পাঞ্চজন+ষ্ণ্য (জাত অর্থে)। উদ্‌যাপিলে—উদ্—যা+ণিচ্ (=যাপি)+ইলে। দ্বৈপায়ন—দ্বীপ+ষ্ণায়ন (জাত অর্থে)।

পদান্তর ঃ মুগ্ধ (বিশেষণ) মোহ (বিশেষ্য)। জীব (বিশেষ্য) জৈব (বিশেষণ)। ঋষি (বিশেষ্য) আর্য (বিশেষণ)। সাধন (বিশেষ্য) সাধ্য (বিশেষণ)। উল্লাস (বিশেষ্য) উল্লসিত (বিশেষণ)। ধ্যান (বিশেষ্য) ধ্যায়, ধ্যানী (বিশেষণ)।

বিপরীতার্থক শব্দ : সাত্ত্বিক—তামসিক। হর্ষ—বিষাদ। অগ্রসর—পশ্চাৎ। সুকীর্তি—কুকীর্তি। পাপ—পুণ্য। গুরু—শিষ্য। নিশ্চল—সচল।

অলঙ্কার : অগ্রসরি শচীপতি সহস্রলোচনে...কহিলা বাসব।—উপমা।

অনুশীলনী

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :—

সুরকমলে তপোধনশিরঃ, নিত্যহিতকর, জীবকুল, কল্যাণসাধন, স্বার্থপরিহার, বাষ্পাকুল, জ্যোতিঃপূর্ণ, হরিশঙ্খ, রোমাঞ্চতনু, চতুর্বেদগান।

২। বড় হরফে মুদ্রিত পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) এ সুকীর্তি তব প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে **নরকুলে**।

(খ) ধ্যানে মগ্ন ঋষি মুদিলা **নয়নদ্বয়** বিপুল উল্লাসে।

৩। মধ্যাহ্নে (পৃঃ ৯-১০)

সমাস : নদীকূলে—নদীর কূল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) তাহার নিকটে। কুলবধূ—কুলের বধূ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। মধ্যাহ্নকাল—মধ্যাহ্নই কাল (কর্মধারয়)। অলস-স্বপন-জাল—অলস যে স্বপন (কর্মধারয়) তাহার জাল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। আঁখিপাতা—আঁখির পাতা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ধরাধামে—ধরারূপ ধাম (রূপক কর্মধারয়) তাহাতে। নদীবাঁকে—নদীর বাঁকে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

সাধু গদ্যরূপ : হেলে—হেলিয়া। কাতরে—কাতরভাবে। লুকায়ে—লুকাইয়া। চমকিয়া—চমকিত হইয়া। রচিতেছে—রচনা করিতেছে। রয়েছি—রহিয়াছি। মুদে—মুদিয়া। পড়িছে—পড়িতেছে। খ'সে—খসিয়া।

দ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ : ঝুরু ঝুরু, কুব্ কুব্—অনুকরণ শব্দে দ্বিরুক্তি। গুটিগুটি—ক্রিয়াবিশেষণে আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া ধীরে গমন। সাদৃশ্যে দ্বিরুক্তি। ঢল ঢল—(বিশেষণ পদ দেশী শব্দ)। চাহি চাহি—চাহিয়া চাহিয়া, খ'সে খ'সে—খসিয়া খসিয়া, ছায়া ছায়া—ছায়ার মতো অস্পষ্ট (সাদৃশার্থে দ্বিরুক্তি)।

পদান্তর : জগৎ (বিশেষ্য) জাগতিক (বিশেষণ)। মাঠ (বিশেষ্য) মেঠো (বিশেষণ)। ঘর (বিশেষ্য) ঘরুয়া (বিশেষণ)। দ্রুত (বিশেষণ) দ্রুততা (বিশেষ্য)। জল (বিশেষ্য) জলীয় (বিশেষণ)। লাজ (বিশেষণ) লাজুক (বিশেষ্য)।

দেশী ও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ : ডিঙ্গা, নিঝুম, নদীবাঁকে আঁখিপাতা।

অপিনিহিত অভিশ্রুতি : মাঠ—মাঠুয়া>মেঠো; জালিয়া—জাইল্যা>জেলে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—

একেলা, জগৎ, স্বপন, শ্বাস, দ্রুত।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :—

এলায়ে পড়ে, গুটি গুটি, লাজে চমকিয়া, ছায়া ছায়া, নিঝুম, হেলে পড়া।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ভিন্নার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর : ভাঙ্গা, পথ, জল।

৪। প্রতিনিধি (১৩-১৭)

সন্ধি : রাজ্যেশ্বর—রাজ্য+ঈশ্বর। পদানত—পদ+আনত। চরাচর—চর+আচর। দিবসান্তে—দিবস+অন্তে। ভবেশ—ভব+ঈশ।

সমাস : প্রভাতকালে—প্রভাতরূপকাল (রূপক কর্মধারয়) তাহাতে। অন্নহীনে—অন্নদ্বারা হীন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। সর্বচরাচর—সব চর এবং অচর (কর্মধারয়), চরাচর—চর ও অচর (দ্বন্দ্ব), অচর—চর নয় যাহা (নঞ্‌ তৎপুরুষ)। হস্তগত—হস্তকে গত (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। পদানত—পদে আনত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। দ্বিপ্রহর—দ্বিতীয় প্রহর (কর্মধারয়)। অন্নপূর্ণা—অন্নদ্বারা পূর্ণা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। পাদপদ্ম—পাদরূপ পদ্ম (রূপক কর্মধারয়) অথবা পাদপদ্মের ন্যায় (উপমিত কর্মধারয়)। একতার—একটি মাত্র তার যাহার (বহুব্রীহি)। অনুরূপ—রূপের যোগ্য (অব্যয়ীভাব) পুরবাসী—পুরে বাস করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) জল ঢেলে ফুটা **পাত্রে**—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি ; (খ) বৃথা চেষ্টা **তৃষ্ণা** মিটিবারে—কর্মে শূন্য বিভক্তি। (গ) **নৃপে** হেরি ছেলেমেয়ে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। (ঘ) **তোমারে** করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি—'রে' বিভক্তি যোগে কর্মে দ্বিতীয়া।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **:** দৈন্য—দীন+য (ভাবে)। ভিক্ষা—ভিক্ষ্ $\sqrt{}$+অ+(ভাববাচ্যে) আ। ভিখারী—ভিক্ষা+আরী (বৃত্তি বুঝাইতে)। অনুচর—অনু+$\sqrt{}$চর্+অ (কর্তৃবাচ্যে)। সমাপন—সম্+$\sqrt{}$আপ্+(অন) (ভাববাচ্যে)। গুণী—গুণ্+ইন্।

পদান্তর : দৈন্য (বিশেষ্য) দীন (বিশেষণ)। ভয় (বিশেষ্য) ভীত (বিশেষণ)। ব্রত (বিশেষ্য) ব্রতী (বিশেষণ)। মহৎ (বিশেষণ) মহত্ত্ব (বিশেষ্য)। অভাব (বিশেষ্য) অভাবী (বিশেষণ)। প্রসাদ (বিশেষ্য) প্রসাদী (বিশেষণ)। বৈরাগী (বিশেষণ) বৈরাগ্য (বিশেষ্য)।

অলঙ্কার ঃ হে রাজা, রেখেছি আনি তোমার পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে।—উপমা।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ ডাকায়ে—ডাক্+আ+ইয়া=ডাকাইয়া, 'ডাকায়ে' আ-প্রত্যয়ান্ত বাঙলা প্রেরণার্থক ধাতু। **সঁপিতেছে**—সংস্কৃতের 'সম-অর্পি' ধাতু বাঙলায় 'সঁপ্' ধাতু হইয়াছে। এই 'সঁপ্' ধাতু হইতেই ক্রিয়াপদটির সৃষ্টি।

অনুশীলনী

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :—

দুর্গভাল, ভিক্ষাভাণ্ড, পদানত, অশ্বরথ, পাদপীঠ।

২। ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর : ভিক্ষা-আশে, ভিক্ষা-অন্ন।

মোটা হরফের মুদ্রিত পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্দেশ কর :—

(ক) **সবারে** দিয়েছ ঘর, **আমারে** দিয়েছ শুধু পথ। (খ) **হৃদয়ে হৃদয়ে** তবু ভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু, সবার **সর্বস্বধন** চাহি। (গ) **মোর নামে** মোর হয়ে রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।

৫। প্রাচীন ভারত (পৃঃ ১৭)

সন্ধি ঃ সংগীত—সম্+গীত। উচ্ছ্বাস—উৎ+শ্বাস। উল্লাস—উদ্+লাস। সংযত—সম্+যত। তপোবন—তপঃ+বন। শ্রুতিকটু এবং ছন্দের অনুরোধে 'অপাঙ্গ-ইঙ্গিত', 'উৎসব-উচ্ছ্বাস', বিজয়-উল্লাস' প্রভৃতির সন্ধি করা হয় নাই।

সমাস ঃ উদ্ধতললাট—উদ্ধত হইয়াছে ললাট যাহাদের (বহুব্রীহি)। **অম্বরতল—অম্বরের তল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। উৎসব-উচ্ছ্বাস—উৎসবের উচ্ছ্বাস (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। স্ফীতস্ফূর্ত—স্ফীত অথচ স্ফূর্ত (কর্মধারায়)।** মহামৌন—মহৎ মৌন যিনি (বহুব্রীহি), মৌন (**কর্মধারয়**)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) ঃ **সঙ্গীত—সম+√গৈ+ত (ভাববাচ্যে)। অপাঙ্গ—**অপ√অণচ্+ঘঞ্। **বন্দনা—√বন্দ্+অন (ভাববাচ্যে) স্ত্রীলিঙ্গে আ। ধ্মাত—ধ্মা+ক্ত (কর্মবাচ্যে)।** ধ্বনিত—√ধ্বন্+ই+ত (ভাববাচ্যে) বিশেষণ। **স্ফূর্ত—√স্ফুর্+ত (কর্তৃবাচ্যে) উচ্ছ্বাস—উৎ+√শ্বস্+অ (ভাববাচ্যে)। উল্লাস—উৎ√লস্+অ (ভাববাচ্যে)।**

পদান্তর ঃ প্রাচীন (বিশেষণ) **প্রাচীনত্ব (বিশেষ্য)। ঝংকার (বিশেষণ) ঝংকৃত (বিশেষ্য)। উচ্ছ্বাস (বিশেষ্য) উচ্ছ্বসিত (বিশেষণ)। উল্লাস (বিশেষণ) উল্লসিত (বিশেষ্য)। গম্ভীর (বিশেষণ) গাম্ভীর্য; গম্ভীরতা (বিশেষ্য)।**

অর্থগত পার্থক্য ঃ মন্দ্র—গম্ভীর ধ্বনি ; মন্ত্র—দেবোপসনার অনুকূল পদ বা বাক্য ; উন্নাদ—উচ্চ ধ্বনিবিশিষ্ট ; উন্মাদ—পাগল।

এক কথায় প্রকাশ ঃ তরবারির শব্দ—ঝঞ্ঝনা; ধনুকের শব্দ—টংকার; রথ চলার শব্দ—ঘর্ঘর ; নূপুরের ঝংকার কিঙ্কিণী।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ স্পর্ধিছে—সংস্কৃত 'স্পর্ধ' ধাতু+ইতেছে=স্পর্ধিতেছে, পদ্যে 'স্পর্ধিছে'। এইরূপ ক্রিয়া একমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **মৌন**—মুনির ভাব অর্থে বিশেষ্যপদ ; তবে অনেকেই বিশেষণরূপে ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

অনুশীলনী

১। পদান্তরপূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর ঃ গম্ভীর, শান্ত, উদার স্ফীত, মত্ত।

। এক কথায় প্রকাশ কর ঃ অশ্বের ডাক, হস্তীর ডাক, নূপুরের শব্দ।

৩। অলঙ্কার নির্ণয় কর ঃ দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট।

৬। প্রার্থনা (পৃঃ ১৮)

সন্ধি ঃ উচ্ছ্বসিয়া—উৎ+শ্বসিয়া। নির্বারিত—নিঃ+বারিত। স্রোতঃপথ—স্রোতঃ +পথ। নির্দয়—নিঃ+দয়।

সমাস ঃ ভয়শূন্য—ভয় হইতে শূন্য (পঞ্চমী তৎপুরুষ)। দিবসশর্বরী—দিবস ও শর্বরী (দ্বন্দ্ব)। উৎসমুখ—উৎসের মুখ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কর্মধারা—কর্মের ধারা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। মরুবালুরাশি—মরুরবালু (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) তাহার রাশি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। চরিতার্থতা—চরিত অর্থ যাহার (বহুব্রীহি) তাহা।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **ঃ** মুক্ত—মুচ্+ত (কর্মবাচ্যে)। উচ্ছ্বসিয়া—উৎ+√শ্বস (সংস্কৃত ধাতু)+ইয়া। চরিতার্থতা—চরিত+অর্থ+তা (ভাববাচ্যে)। বসুধা— √ধা+ক্বিপ্ বিশেষ্য। আচার—আ+√চর্+অ। আঘাত—আ+√হন্+অ। গ্রাসি—গ্রাস (বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু)+ইয়া। শতধা—√শো+অত (কর্তৃ) অব্য. ক্রি-বিণ ধা.। জাগরিত—√জাগ্+ত।

অলঙ্কার ঃ দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়। —অনুপ্রাস।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ উচ্ছ্বসিয়া—নামধাতুর অনুরূপ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা নামধাতু নয়, ইহা উৎ-শ্বস্ ধাতু হইতে অসমাপিকা ক্রিয়া। **গ্রাসি**—'গ্রাস' (বিশেষ্যপদ) হইতে এই ক্রিয়াটি সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহা নামধাতু।

অনুশীলনী

১। নিম্নের মোটা হরফে মুদ্রিত পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) আপন প্রাঙ্গণতলে **দিবসশর্বরী**। (খ) বিচারের **স্রোতঃপথ** ফেলে নাই গ্রাসি। (গ) **নিজ হস্তে** নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ। (ঘ) **ভারতেরে** সেই **স্বর্গে** করো জাগরিত।

২। পদান্তরপূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর : উচ্চ, মুক্ত, ক্ষুদ্র, চিন্তা, আঘাত।

৭। নন্দলাল (পৃঃ ২৩-২৫)

এই কবিতায় উল্লেখযোগ্য কোন সন্ধি নাই।

সমাস : অভাগ—নাই ভাগ (ভাগ্য) যাহার (বহুব্রীহি)। স্বদেশ—স্ব (নিজের) দেশ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। গলাটিপুনি—গলায় টিপুনি (সপ্তমী তৎপুরুষ)। ফি-সন—প্রত্যেক সন্ (অব্যয়ীভাব)। গাড়িচাপা-পড়া—গাড়ি দ্বারা চাপা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। তাহাতে পড়া (সপ্তমী তৎপুরুষ)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : উদ্ধার—উধ্√হৃ+অ (ভাববাচ্য)। বিদ্যা—√বিদ্ +য (করণবাচ্যে)+আ। ভীষণ—√ভী+ণিচ্+অন (কর্তৃবাচ্যে)। টিপুনি—টিপ +উনি।

বিদেশী শব্দ : জাহির —(আরবী), কলিশন—(ইংরেজী), কাগজ—(আরবী)।

আবেগসূচক অব্যয় : আ-হা-হা কর কী, কর কী নন্দলাল ? **বাহবা, বাহবা, বাহবা,** বেশ ! **হাঁ হাঁ হাঁ**, তা বটে ঠিক ! **ভ্যালারে** নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি লইয়া সার্থক বাক্য রচনা কর :—

দ্বিগুণ বুঝায়, বিদ্যা জাহির করা, খায় তার দশগুণ, ছাড়ো না ছাই, গলা টিপুনি, নাকে দিব খত, রেলে কলিশন, কষ্টে বাঁচিয়ে।

২। পদান্তর পূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর : ভীষণ, জীবন, বিদ্যা, সাহেব।

৩। অলঙ্কার নির্ণয় কর :—

গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।

৮। মা আমার (পৃঃ ২৫-২৬)

সমাস : হাসি অশ্রু—হাসি ও অশ্রু (দ্বন্দ্ব)। জনমভূমি—জনমের ভূমি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। হিয়া-মাঝে—হিয়ার মাঝে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। ছোটোখাটো—ছোট অথচ খাটো (বিশেষণে বিশেষণে কর্মধারয়)। সুখদুঃখ—সুখ ও দুঃখ (দ্বন্দ্ব)। অনিবার—নাই নিবার যাহার (বহুব্রীহি)। কলঙ্কভার—কলঙ্কের ভার (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

সাধু গদ্যরূপ : হিয়া-মাঝে—হৃদয়-মধ্যে। অপরেরে—অপরকে। নিয়োজিতে—নিয়োজিত করিতে বা নিযুক্ত করিতে। কহি—কহিয়া। যেই দিন—যেদিন। জপিব—জপ করিব। তোমারি তরে—তোমারই জন্য।

কারক ও বিভক্তি : (ক) 'ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন'—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি। (খ) 'অনল পুরিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে'—কর্মে শূন্য বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : ডালি—ডালা+ই (ক্ষুদ্র অর্থে)। বিসর্জন—বি+√সৃজ্+অন (ভাববাচ্যে)। অবসর—অব+√সৃ+অপ (ভাববাচ্যে)। নিয়োজিত—নি+√যুজ্+ণিচ্+ক্ত। (কর্মবাচ্যে)। বিষাদ—বি√+সদ্+অ (ভাববাচ্যে)। অতীত—অতি+√ই+ত্ (কর্তৃবাচ্যে)। বর্তমান—বৃৎ√শানচ্। বিষাদময়—বিষাদ+ময়ট্।

পদান্তর : বিসর্জন (বিশেষ্য) বিসর্জিত (বিশেষণ)। বিষাদ (বিশেষ্য) বিষণ্ণ (বিশেষণ)। কলঙ্ক (বিশেষ্য) কলঙ্কী, কলঙ্কিত (বিশেষণ)। হিসাব (বিশেষ্য) হিসাবী (বিশেষণ)।

অলঙ্কার : হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর।—অনুপ্রাস।

অনুশীলনী

১। নিম্নের বড় হরফে মুদ্রিত পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) মরিব **তোমারি কাজে,** বাঁচিব **তোমারি তরে।** (খ) সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব **তায়।** (গ) মরিব তোমারি **তরে** মা আমার, মা আমার!

২। এই কবিতা হইতে একটি সমধাতুজ ক্রিয়া এবং সমধাতুজ কর্মের উদাহরণ দাও।

৯। বাঙ্গালীর মা (পৃ: ২৬-২৭)

সন্ধি : হিমাদ্রি—হিম+অদ্রি। দামোদর—দাম+উদর। পাদোদক—পাদ+উদক। পদ্মাসন—পদ্ম+আসন।

সমাস : হিমাদ্রি—হিমেপূর্ণ অদ্রি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। শ্বেতছত্র—শ্বেত যে ছত্র (কর্মধারয়)। বঙ্গসিন্ধু—বঙ্গ সংলগ্ন সিন্ধু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। মুক্তবেণীসম—মুক্ত যে বেণী (কর্মধারয়), তাহার সম (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। হিরণ-হরিত—হিরণ ও হরিত (দ্বন্দ্ব)। আনন্দ-ভুবন—আনন্দে পূর্ণ ভুবন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। কিরণকমল—কিরণরূপ কমল (রূপক কর্মধারয়)। মৃদুপদে—মৃদুপদ যাহাতে (বহুব্রীহি)। জলসখা—জলের সখা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। মেঘধারাযন্ত্রে—মেঘরূপ ধারা (রূপক কর্মধারয়) তাহার যন্ত্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। নিখিলসাগর-অঙ্কে—নিখিল সাগর (কর্মধারয়), তাহার অঙ্কে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। পদ্মাসন—পদ্ম নির্মিত আসন অথবা পদ্মের ন্যায় আসন (মধ্যপদলোপী

কর্মধারয়)। পাদোদকসুধা—পাদস্পৃষ্ট উদক (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) তদ্রূপ সুধা (রূপক কর্মধারয়)।

সাধু গদ্যরূপ : ধ্বনিতেছে—ধ্বনিত হইতেছে। রঞ্জিতে—রঞ্জিত করিতে। ঝঙ্কাসনে—ঝঙ্কার সহিত। ক্ষুধিতে—ক্ষুধিতকে। হরিতেছ—হরণ করিতেছ। আশিসি—আশীর্বাদ করিয়া বা আশিস্ দিয়া। নমেন—নমস্কার করেন।

কারক ও বিভক্তি : (ক) আনন্দ-ভুবন তব আমোদিত **কলকলগীতে** (করণে 'এ' বিভক্তি)। (খ) কুঞ্জ দেয় **ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে** পরান অঞ্জলি (প্রথমটি করণে 'এ' এবং দ্বিতীয়টি সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি)। (গ) তব **মেঘধারাযন্ত্রে** ঝর্ ঝর্ ঝরিছে অমিয়—(অপাদানে 'এ' বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation): অজগর—অজ + √গৃ + অ (কর্তৃবাচ্যে)। আমোদিত (বিশেষণ)—আ + √মুদ্ + অ (কর্মবাচ্যে) বিশেষণ। জ্যোৎস্না—জ্যোতিস্ + ন + আপ্। রঞ্জিত (বিশেষণ)—√রঞ্জ + ণিচ + অন। বৈতালিক—বিতাল + ইক। অন্ন—√অদ্ + ত (কর্মবাচ্যে। ঋদ্ধি—√ঋধ্ + তি (কর্তৃবাচ্যে)। আরতি —আ + √রম্ + ক্তি (ভাববাচ্যে)। পুঞ্জীভূত (বিশেষণ)—পুঞ্জ + চ্বি (অভূততদ্ভাবে) + ভূ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) বিশেষ্যে পুঞ্জ।

অলঙ্কার : (১) বঙ্গসিন্ধু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ, মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায়—সমাসোক্তি।
(২) কুঞ্জ দেয় ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে পরান অঞ্জলি—অনুপ্রাস।
(৩) নিখিলসাগর-অঙ্কে তুমি যেন কমলে-কামিনী—উৎপ্রেক্ষা।

ব্যাকরণগত টীকা : ধ্বনিতেছে—সংস্কৃতে 'ধ্বন্' ধাতু হইতে সৃষ্ট বাঙলা ক্রিয়া, কেবলমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। **ফুলপুঞ্জে**—'ফুল' শব্দ অতৎসম এবং 'পুঞ্জ' তৎসম। অতৎসম এবং তৎসম শব্দের সমাস না করাই উচিত, তবে অনেকেই ইহা করেন। এক্ষেত্রে 'পুষ্পপুঞ্জে' দুইটি তৎসম। **আশিসি**—'আশিস্' নামশব্দটি বিনা প্রত্যয়েই ধাতু হইয়া ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং এটি নাম ধাতু।

অনুশীলনী

১। মোটা হরফে মুদ্রিত পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) চরে তব শ্যাম গোষ্ঠে **বেণুরবে** ধবলী শ্যামলী। (খ) কুঞ্জ দেয় **ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে** পরান অঞ্জলি। (গ) **কিরণের** ছড়া উষা দিয়ে যায় তব **আঙিনায়**। (ঘ) **তোমারে** আশিসি পুন নমেন আপনি ভগবান।

২। শব্দের শ্রেণী বিভাগ কর : ঝালর, চামর, ঝাঁপি, রাতুল, আঙিনা।

৩। ব্যাকরণগত টীকা লিখ: যতন, আশিসি, নমেন।

৪। সার্থক বাক্য রচনা কর: বৈতালিক, শ্বেতছত্র, পদযুগ, অটবী, কাঙ্কাসম, রঞ্জিত, বিজয়তূরী, মহাধ্যানে, হরিতেছ, পুঞ্জীভূত।

১০। জন্মভূমি (পৃঃ ২৯-৩১)

সন্ধি: দেবালয়—দেব+আলয়। সংকীর্তন—সম্+কীর্তন।

সমাস: জন্মভূমি—জন্মের ভূমি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কেয়াঝাড়—কেয়ার ঝাড় (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) তাহাতে। বিশ্বশোভা—বিশ্বের শোভা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। স্বর্গপুরী—স্বর্গ-রূপ পুরী (রূপককর্মধারয়)। ঝোপে-ঝাড়ে—ঝোপে ও ঝাড়ে (অলুক দ্বন্দ্ব)। পদ্মদিঘি—পদ্মেভরা দিঘি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। সৃষ্টি-ছাড়া—সৃষ্টি ছাড়া যে (উপপদ তৎপুরুষ)। মিলন-গীতি—মিলনের গীতি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। বাধা-বাঁধন-হারা—বাধা ও বাঁধন (দ্বন্দ্ব) তাহা হারাইয়াছে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। সাদাসিধে—সাদা যা সিধে তাই (কর্মধারয়)।

সাধু গদ্যরূপ: যাচ্ছে—যাইতেছে। দিয়ে—দিয়া। নুইয়ে—নুইয়া। গুঁড়োয়—গুঁড়ায়। শুকিয়ে—শুষ্ক করিয়া। সেথায়—সেখানে। এলে—আসিলে।

কারক ও বিভক্তি: (ক) ঐ যে **গাঁটি** যাচ্ছে দেখা—কর্মে প্রথমা। (খ) গোরুর গাড়ির **চাকায়** পথে শুকোয় নাকো কাদা—করণে সপ্তমী। (গ) **পানায়** মরা **ডোবায়** ভরা সিদ্ধি **গাছে** ছাওয়া—তিনটিতেই (করণে 'এ' বিভক্তি)

ব্যুৎপত্তি (Derivation): হৃদয়—√হৃ (+দ্)+অয় (কর্তৃবাচ্যে)। কমতি—কম্+তি (ভাববাচ্যে)। লজ্জা—√লস্জ+অ (ভাববাচ্যে)+আ। দারিদ্র্য—দরিদ্র+ষ (ভাববাচ্যে)। গীতি—√গৈ+তি (ভাববাচ্যে)। সান্ধ্য—সন্ধ্যা+অ। অন্ধকার—অন্ধ√+কৃ+অ (কর্তৃবাচ্যে) স্বাস্থ্য—সুস্থ+য (ভাববাচ্যে)। স্নেহ—√স্নিহ্+অ (ভাববাচ্যে)।

অলঙ্কার: সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাধা-বাধন-হারা,
আবাদ করে বিবাদ করে, সুবাদ করে তারা—অনুপ্রাস।

ব্যাকরণগত টীকা: নাইকো—'নাই' ক্রিয়াবাচক অব্যয়। এই 'নাই'-এর সহিত নিশ্চয়তাবাচক অব্যয় 'কো' যুক্ত হইয়াছে। **কমতি**—কম্ (নামধাতু)+তি। সাধারণতঃ এই শব্দটি বিশেষ্যরূপেই প্রয়োগ হইয়া থাকে, তবে এস্থলে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনুশীলনী

১°। নিম্নলিখিত প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া প্রত্যেকটি দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :—

গায়ে, গাঁয়ে ; কাদা ; কাঁদা ; সজ্জা, শয্যা ; আধার, আঁধার ; চুরি, চুড়ি ; পদ্ম, পদ্দ।

২। পদান্তর কর : আবাদ, শুকনো, হৃদয়, জঙ্গল, লজ্জা।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর :—

আইরি, সজনে, বিশ্বশোভা, স্বর্গপুরী, হৃদয়খানি, পদ্মদিঘি, মিলন-গীতি, বাধা-বাধন-হারা।

১১। ছোটর দাবী (পৃঃ ৩৪-৩৫)

সন্ধি : চন্দ্রানন—চন্দ্র + আনন। গিরীশ—গিরি + ঈশ।

সমাস : অট্টহাসি—অট্টকে হাসি (কর্মধারয়)। তরুবরে—তরুদের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ) (সপ্তমী তৎপুরুষ)। রাবণ রাজা—যিনি রাবণ তিনিই রাজা (কর্মধারয়) অথবা রাবণ-নামক রাজা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। কোশল-পৌরভবন—কোশলের পৌর (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) তাহাদের ভবন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। অশোক-কানন—অশোক নামক কানন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। বিদুর-ক্ষুদ—বিদুরের ক্ষুদ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। প্রেম-সখ্যে—প্রেম ও সখ্য (দ্বন্দ্ব) তাহাতে। বাদ্যঘটা—বাদ্যের ঘটা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। চন্দ্রানন —চন্দ্রের ন্যায় আনন যাহার (বহুব্রীহি) অথবা চন্দ্র তুল্য আনন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। গিরীশ—গিরির (পর্বতের) ঈশ (ঈশ্বর, শিব) (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) ভুলায় বড়োর **অট্টহাসি**—কর্মে শূন্য বিভক্তি। (খ) ছোটোর কথা নয়ন-জলে—করণে সপ্তমী। (গ) **তরুবরে** হয় না স্মরণ—কর্মে 'এ' বিভক্তি। (ঘ) ভুলতে নারি **অশোক-কানন**—কর্মে শূন্য বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : স্মরণ—√স্মৃ + অন (ভাববাচ্যে)। অনুরাগ—অনু + √রন্‌জ্ + অ (ভাববাচ্যে)। রাখী—রাখ + ঈ। পৌর—পুর + অ। দ্বারাবতী—দ্বার + ভচ্ + বতুম্ + ঈপ্। গৌরব—গুরু + অ (ভাববাচ্যে)। সখ্য—সখি + ষ্ণ্য। **পাণ্ডব**—পাণ্ডু + ষ্ণ (অপত্যার্থে)। কৌরব—কুরু + ষ্ণ (অপত্যার্থে)। সিংহ—√হিনস্ + অ (কর্তৃবাচ্যে)। **মানাক**—√মান + আ (কর্ম বা কর্ম-কর্তৃবাচ্য) + অনুজ্ঞা প্রথমপুরুষ।

অলঙ্কার : বড়োর দাবি দাবিয়ে চলে—অনুপ্রাস।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :—

মহামায়া, সিংহাসন, বিদুর-ক্ষুদ, চন্দ্রানন, অট্টহাসি।

২। লিঙ্গান্তরপূর্বক বাক্য রচনা কর : বন্দী, হংসী, সিংহ, ভ্রমর।

৩। অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :

রাখি, রাখী ; নারি, নারী ; গিরিশ, গরীশ ; লক্ষ, লক্ষ্য ; শিখি, শিখী ; শাখা, শাঁখা

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থকবোধক শব্দ দ্বারা বাক্য গঠন কর :—

তুচ্ছ, ম্লান, পূর্ণতা, কাতর, হিংসা, মিষ্ট, বিশাল, গিরীশ।

গদ্যাংশ (নবম শ্রেণী)

১। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা (পৃঃ ৪৭-৫১)

সন্ধি : মহর্ষি—মহা + ঋষি। শোকাবেশ—শোক + আবেশ। বহির্ভূত—বহিঃ + ভূত। গাত্রোত্থান—গাত্র + উত্থান। (উদ্ + স্থান = উত্থান)। নিরানন্দ—নিঃ + আনন্দ। নিরুদ্বেগ—নিঃ + উদ্বেগ। রক্ষণাবেক্ষণ—রক্ষণ + আবেক্ষণ। স্বেচ্ছা—স্ব + ইচ্ছা। পর্যন্ত—পরি + অন্ত। হৃৎকর্ম—হৃদ্ + কর্ম। প্রতিষ্ঠিত—প্রতি + স্থিত।

সমাস : অনসূয়া—নাই অসূয়া যাহার (বহুব্রীহি)। প্রিয়ংবদা—প্রিয় বাক্য বলে যে নারী (উপপদ তৎপুরুষ)। শোকাকুল—শোকের দ্বারা আকুল (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। ভূষণপ্রিয়—প্রিয় ভূষণ যাহার (অর্থাৎ যে নারীর) (বহুব্রীহি)। নিরানন্দ—নিঃ (= নাই) আনন্দ যাহার (বহুব্রীহি)। ঊর্ধ্বমুখ—ঊর্ধ্ব হইয়াছে মুখ যাহার (বহুব্রীহি)। শাখাবাহু—শাখারূপ বাহু (রূপক কর্মধারয়)। সহধর্মিণী—সহধর্ম যাহার (স্ত্রীলিঙ্গে বহুব্রীহি)। সপত্নীদিগের—সমান পতি যাহাদের (বহুব্রীহি)। অনুক্ষণ—ক্ষণে ক্ষণে (অব্যয়ীভাব)। সসাগরা—সাগরের সহিত বিদ্যমান (বহুব্রীহি)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) মধুকর মধুকরী **মধুপানে** বিরত হইয়াছে—অপাদানে সপ্তমী (মধুপানে মধুপান হইতে)। (খ) **রসাস্বাদে** বঞ্চিত হইয়াছে—বিষয়াধিকরণে সপ্তমী। (গ) শকুন্তলা **স্বেচ্ছাক্রমে** তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে—ক্রিয়া বিশেষণে তৃতীয়া।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : প্রস্থান—প্র + √স্থা + অন (ভাববাচ্যে) বিশেষণে প্রস্থিত। মধুকর—√মন্ + উ (করণবাচ্য) কৃ + অ (ট) (কর্তৃবাচ্য)। **সমভিব্যাহার**—সম্ + অভি + বিঁ + আ + √হৃ + অ (ভাববাচ্যে)। পরিপূরিত—পরি—পূর + ক্ত। পরিত্যাগ—পরি—ত্যজ্ + ঘঞ্। বিরত—বি + √রম্ + ত (কর্তৃবাচ্যে)। সম্ভাষণ—সম + ভাষ + অনট্ (ভাববাচ্যে)। সমর্পণ—সম + অর্পণ (ভাববাচ্যে)। শয়ন—শী + √অন্ (ভাববাচ্যে)। বৈক্লব্য—বিক্লব + য (ভাববাচ্যে)।

সন্নিহিত—সম্+নি+√ধা+ত। সন্নিবেশিত—সম্+ নি√বিশ্ (ণিচ্)+অ (কর্মবাচ্যে)।

পদান্তর: উৎকণ্ঠিত (বিশেষণ) উৎকণ্ঠা (বিশেষ্য)। পরিপূরিত (বিশেষণ) পরিপূরণ (বিশেষ্য)। বিরত (বিশেষণ) বিরতি (বিশেষ্য)। শয়ন (বিশেষ্য) শায়িত (বিশেষণ)। ক্ষত (বিশেষণ) ক্ষত (বিশেষ্য)। আঘাত (বিশেষণ) আহত (বিশেষ্য)। লৌকিক (বিশেষণ) লোক (বিশেষ্য)।

অনুশীলনী

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :—

বাষ্পবারি, অনর্থক, তপোবনতরু, আহার-বিহার, সিংহাসন, দৃষ্টিপথ, নিরুদ্বেগ।

২। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—

সমভিব্যাহার (উ. ম. ১৯৬০), ঈদৃশ, বাক্শক্তিরহিত, পরিপূরিত, পরাঙ্মুখ, শিষ্য, শুশ্রূষা, স্বেচ্ছাক্রমে, প্রতিপালন, সন্দেশ, সন্নিবেশিত, দণ্ডায়মান।

২। সাগরসঙ্গমে নবকুমার (পৃঃ ৫২-৫৭)

সন্ধি: প্রত্যাগমন—প্রতি+আগমন। দিঙ্নিরূপণ—দিক্+নিরূপণ। কুজ্ঝটিকা—কুৎ+ঝটিকা। দিগন্ত—দিক্+অন্ত। কথোপকথন—কথা+উপ-কথন। বারেক—বার+এক। (সূত্র অনুসারে বারৈক হয় কিন্তু শ্রুতিকটুতার জন্য বারেক, অর্ধেক এইরূপই বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়)। পরস্পর—পর+পর। দিগ্‌ভ্রম—দিক্+ভ্রম। সূর্যোদয়—সূর্য+উদয়। দিঙ্মণ্ডল—দিক্+মণ্ডল। জলোচ্ছ্বাস—জল+উচ্ছ্বাস। ইত্যবসরে—ইতি+অবসরে।

সমাস: নাবিক দস্যু—যে নাবিক সেই দস্যু (কর্মধারয়)। রাত্রিশেষে—রাত্রির শেষ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। জন্মজন্মান্তর—অন্য জন্ম জন্মান্তর (নিত্যসমাস); জন্ম (অর্থাৎ বর্তমান জন্ম) ও জন্মান্তর (দ্বন্দ্ব)। একতান-মনা—এক তানে মন যাহার (বহুব্রীহি)। ভয়কাতর—ভয়ে কাতর (সপ্তমী তৎপুরুষ)। সশঙ্কচিত্তে—শঙ্কার সহিত বর্তমান যে সে (বহুব্রীহি)। তরঙ্গান্দোলনকম্প—তরঙ্গের আন্দোলন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তরঙ্গ আন্দোলন জনিত কম্প (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত—রবির রশ্মি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); রবিরশ্মির মালা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); রবি-রশ্মি-মালা দ্বারা প্রদীপ্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে—প্রাতঃকালীন কৃত্য (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহার সম্পাদন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ। কলধৌত-প্রবাহবৎ—কলের সহিত ধৌত (তৃতীয়া তৎপুরুষ); কলধৌতের প্রবাহ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) তদ্বৎ।

কারক ও বিভক্তি: (ক) এ সংবাদ তিনি অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলন—

(অপাদানে সপ্তমী)। (খ) একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে **সন্তান** বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল—কর্মে (শূন্য বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation): নাবিক নৌ+ষ্ণিক (জীবিকা অর্থে)। জিজ্ঞাসা —সংস্কৃত√জ্ঞা+সন্ (ভাববাচ্যে)+আপ্। আগত—আ—গম+ক্ত। আবরণ— আ+√বৃ+অন। প্রতীক্ষা—প্রতি+√ঈক্ষ্+অ (ভাববাচ্যে)+আ। **কুজ্ঝটিকা** —কু+√ক্বিপ্=কুৎ; কুৎ+ঝট্+ই+কণ্+আপ্। উদ্বিগ্ন—উৎ+√বিজ্+ত (কর্মবাচ্যে)। সৈকত—সিকতা+অ। মন্দীভূত—মন্দ+ঈ (চি্ব) (অভূততদ্ভাবে) +√ভূ+ত (কর্মবাচ্যে)।

বিদেশী শব্দ: বহর, বিঘা, পোতুগীস, খারাবি, দরিয়া, পীর।

দেশী শব্দ: মাঝি, ভাঙ্গা, ডিঙ্গা।

বিপরীতার্থক শব্দ: প্রত্যাগমন—আগমন। প্রাচীন—নবীন। অবতরণ— আরোহণ। ধনী—দরিদ্র। সমাপ্ত—অসমাপ্ত।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ: 'তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে' অর্থাৎ বার্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে। 'কেনারায় পড' অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ কর।

উক্তি পরিবর্তন: প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আসব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে! এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থ দরশনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।" (প্রত্যক্ষ উক্তি)

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে সপ্রশ্ন করিলেন যে কেন তিনি আসিবেন না। তাহার তিন কাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে। তিনি এখন যদি পরকালের কর্ম না করেন তবে আর কবে করিবেন। যুবা কহিলেন যে তিনি যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহা হইলে সে আসিল কেন। (পরোক্ষ উক্তি)

ব্যাকরণগত টীকা: জাগ্রৎ—জাগৃ+শতৃ। কিন্তু আধুনিক বাঙলা ভাষায় এই শুদ্ধ শব্দটির পরিবর্তে অশুদ্ধ 'জাগ্রত' শব্দের প্রচলন বেশি। সম্বৎসর—সম্+বৎসর= সংবৎসর শুদ্ধ। কারণ, অন্তঃস্থবর্ণ (এস্থলে অন্তঃস্থ-ব) পরে থাকিলে 'ম্' অনুস্বার হইয়া যায়। তবে 'সম্বৎসর' কথাটি ভুল হইলেও বহুপ্রচলিত।

অনুশীলনী

১। পদান্তর পূর্বক বাক্য রচনা কর :—

দিন, নিরূপণ, তিরস্কার, বিপদ, ক্লেশ, অতিক্রম, উপহাস।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :

হিম-নিবারণ-জন্য, প্রহরাতীত, সকর্দম, নিকটস্থ, মন্দাগামী, তরঙ্গান্দোলন।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরিতার্থবোধক শব্দ লিখ :

উদ্‌বিগ্ন, সম্ভাব্য, বারদরিয়া, অগণিত, অবতরণ, বিস্তার।

উত্তর : নিরুদ্বেগ, অসম্ভাব্য, ভিতরদরিয়া, পরিমিত, আরোহণ, দৈর্ঘ্য।

৪। উক্তি পরিবর্তিত কর :—

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি তো আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন। 'আহা। কী দেখিলাম! জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না…।'

৩। মহাত্মা রামমোহন (পৃঃ ৬৭-৭১)

সন্ধি : মানবাত্মা—মানব+আত্মা। মর্মাহত—মর্ম+আহত। উড্ডীন—উৎ ডীন। স্বোপার্জিত—স্ব+উপার্জিত। উন্মোচন—উৎ+মোচন। অন্তর্নিহিত—অন্তঃ +নিহিত। নিরুদ্যম—নিঃ+উদ্যম। প্রতিজ্ঞারূঢ়—প্রতিজ্ঞা+আরূঢ়।

সমাস : মানবাত্মা—মানবমধ্যস্থ আত্মা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। বজ্রমুষ্টি—বজ্র সদৃশ মুষ্টি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। বিধিবদ্ধ—বিধি দ্বারা বদ্ধ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। জাতিচ্যুত—জাতি হইতে চ্যুত (পঞ্চমী তৎপুরুষ)। মুদ্রাযন্ত্র—মুদ্রার যন্ত্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) আত্মমর্যাদাজ্ঞানের—আত্মার মর্যাদা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহার জ্ঞান (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। শয্যাস্থ—শয্যায় থাকে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। পশ্চাৎপদ—পশ্চাৎ পদ যাহার (বহুব্রীহি), সে। গৃহতাড়িত—গৃহ হইতে তাড়িত (পঞ্চমী তৎপুরুষ)। শরণাপন্ন শরণকে আপন্ন (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পবিত্র **চক্ষে** দেখিতেন—করণে 'এ' বিভক্তি। (খ) তখন সেই **সংবাদে** রামমোহন রায় কলিকাতাতে শয্যাস্থ হইলেন—কর্মে পঞ্চমী অথবা (সংবাদ হেতু এই অর্থে)। (গ) মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : অঙ্গীভূত—অঙ্গ+ঈ (চ্বি)+√ভূ+ত (কর্মবাচ্য)। সামাজিক—সমাজ+ষ্ণিক। উড্ডীন—উৎ+√ডী+ত (কর্তৃবাচ্য)। ঊর্ধ্বতন—ঊর্ধ্ব= উৎ+√হা+অ (+ব) (কর্তৃবাচ্য) তন (বিণ)। উৎসাহিত—উৎসাহ=উৎ

+√সহ্+অ (ভাববাচ্যে) বিশেষণ উৎসাহিত। পরাজয়—পরা+√জিঅ (ভাববাচ্য)। প্রলোভন—প্র+√লুভ্+ণিচ্+অন। বিঘ্ন—বি√হন্+অ। বিপ্লব—বি—প্লু+অল্ (ভাববাচ্যে)।

পদান্তর: বৈচিত্র্য (বিশেষ্য) বিচিত্র (বিশেষণ)। কঠিন (বিশেষণ) কাঠিন্য (বিশেষ্য)। উদ্যম (বিশেষ্য) উদ্যত (বিশেষণ)। ঘৃণা (বিশেষ্য) ঘৃণিত বা ঘৃণ্য (বিশেষণ)। বিপ্লব (বিশেষ্য) (বিপ্লবী, বৈপ্লবিক (বিশেষণ)।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর:—

জয়ধ্বনি, শরণাপন্ন, মানবাত্মা, পিছ্‌পা, অপরাজিত।

২। পদ-পরিবর্তন কর: প্রতিপক্ষ, বৈষয়িক, সমুদয়, আহ্বান, পরিদর্শন।

৩। লিঙ্গান্তরিত কর: কর্মচারী, পাচক, উদ্যোগী, বন্ধু, ছাত্র, ব্রাহ্মণ।

৪। এক কথায় প্রকাশ কর: পাঠ কবা উচিত; আরও বড়ো অন্তরের সহিত।

৪। সমুদ্রপথে (পৃঃ ৭১-৭৬)

সমাস: কাজকর্ম—কাজ ও কর্ম (দ্বন্দ্ব)। গৃহস্থ—গৃহে থাকে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। লাভালাভ—লাভ ও অলাভ (দ্বন্দ্ব)। ইষ্টদেবতা—ইষ্ট যে দেবতা (কর্মধারয়)। দাঁতকপাটি—দাঁতের কপাটি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। যথাসর্বস্ব—সর্বস্বকে অতিক্রম না করিয়া (অব্যয়ীভাব)। দ্রুতগতি—দ্রুত যাহার গতি (বহুব্রীহি)।

কারক ও বিভক্তি: (ক) **আজ** বড় সুবিধা নয়—অধিকরণে সপ্তমী। (খ) **ঝড়ে** আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation): সংস্কার—সম+√কৃ+অ (ভাববাচ্যে)। গুটানো—√গুটা+আনো। দ্বীপ—দ্বী+অপ্+অ (সমাসান্ত)। আদর—আ+√দৃ+অল্ (ভাববাচ্যে)। খেলুড়ি—খেল+উড়ি। চড়নদার—চড়ন+দার। প্রমাদ—প্র+√মদ্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে। ঘোলাটে—ঘোলা+টে।

পদান্তর: হিসাব (বিশেষ্য) হিসাবী (বিশেষণ)। কারবার (বিশেষ্য) কারবারী (বিশেষণ)। মেয়ে (বিশেষ্য) মেয়েলী (বিশেষণ)। মেঘ (বিশেষ্য) মেঘময় (বিশেষণ) বা মেঘলা। ফেনা (বিশেষ্য) ফেনিল (বিশেষণ)। ঝড় (বিশেষ্য) ঝোড়ো (বিশেষণ)। পূজা (বিশেষ্য) পূজ্য বা পূজনীয় (বিশেষণ)। প্রসাদ (বিশেষ্য প্রমত্ত (বিশেষণ)। ঠিকানা (বিশেষ্য) ঠিক (বিশেষণ)। তুলা (বিশেষ্য) তুলট বিশেষণ)। ঝগড়া (বিশেষ্য) ঝগ্‌ড়াটে (বিশেষণ)।

দেশী ও বিদেশী শব্দ : ঝাপটা, পিঁজা, মোচা, ডিঙা, গুটানো, হিসাব, বহাল, বরখাস্ত, মেরামত, দৌলত, কারবার, বন্যা।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :

কাজকর্ম, গৃহস্থ, সুস্থ ভাব, নৌকারক্ষা।

২। নিম্নলিখিত দ্বৈতশব্দগুলি লইয়া বাক্য রচনা কর :

দ্বীপে দ্বীপে, বস্তা বস্তা, রাশি রাশি, বমি বমি, বার বার, দূরে দূরে।

৫। সাক্ষী (পৃঃ ৮৯-৯৩)

সন্ধি : মুখাগ্নি—মুখ+অগ্নি। উত্তরাধিকারী—উত্তর+অধিকারী। সর্বাপেক্ষা—সর্ব+অপেক্ষা। পিতৃনাশ-আশঙ্কায়—শ্রুতিকটুতার জন্য সন্ধি করা হয় নাই। সদ্যোমৃত—সদ্য+মৃত। কারারুদ্ধ—কারা+অবরুদ্ধ।

সমাস : কর্মনাশা—কর্ম নাশ করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। অস্থাবর—স্থাবর নহে এমন (নঞ্ তৎপুরুষ)। পৃথগন্ন—পৃথক অন্ন যাহাদের (বহুব্রীহি)। নির্জীব—নাই জীবন যাহার (বহুব্রীহি)। যথাসময়ে—সময়কে অতিক্রম না করিয়া (অব্যয়ীভাব)। হাড়জ্বালানী—হাড় জ্বালায় যে (উপপদ তৎপুরুষ) স্ত্রীলিঙ্গে। অশ্রুবিসর্জন—অশ্রুর বিসর্জন (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কাঠগড়া—কাঠের গড়া (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) (Witness box)।

কারক ও বিভক্তি : পিতৃনাশ-আশঙ্কায়—হেত্বর্থে তৃতীয়া। তাড়নায়—করণে সপ্তমী। গুরুচরণ নিৰ্জীব হস্তে সই করিলেন—করণে 'এ' বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : স্থাবর—√স্থা+বর (কর্তৃবাচ্যে)। দুঃসাধ্য—দুর্ √সাধ্+ণ্যৎ (কর্মবাচ্যে)। বক্তব্য—√বচ্+তব্য (কর্তৃবাচ্যে)। স্থানান্তরিত—স্থানান্তর (বিশেষ্য)+ণিচ্ (নামধাতু)+ক্ত। কর্মনাশা—কর্ম+√নাশ্+আ (কর্তৃবাচ্যে)। পরিশোধ—পরি+√শুধ্+অল (ভাববাচ্যে)। গাড়োয়ান—গাড়ি+ওয়ান। অভিযোগ—অভি+√যুজ্+অ (ভাববাচ্যে)। প্রসঙ্গ—প্র+সনজ্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)।

পদান্তর : চাকর (বিশেষ্য) চাকুরে (বিশেষণ)। কম্পিত (বিশেষণ) কম্পন (বিশেষ্য)। বৃদ্ধ (বিশেষ্য) বার্ধক্য (বিশেষণ)। নাশ (বিশেষ্য) নষ্ট (বিশেষণ)। সময় (বিশেষ্য) সাময়িক (বিশেষণ)। অপরাধ (বিশেষ্য) অপরাধী (বিশেষণ)। ধৈর্য (বিশেষ্য) ধীর (বিশেষণ)। মৃত্যু (বিশেষ্য) মৃত (বিশেষণ)। অভিযোগ (বিশেষ্য) অভিযুক্ত (বিশেষণ)। প্রলোভন (বিশেষ্য) প্রলুব্ধ (বিশেষণ)।

বিদেশী শব্দ : ডাক্তার (Doctor)—ইংরেজী। জবাব—আরবী। উইল

(Will)—ইংরেজী। কাগজ—ফারসী। সাহেব—আরবী। ক্রীশ্চান (Christian) ইংরেজী। মকদ্দমা—আরবী।

বিশিষ্ট বাগভঙ্গী : জবাব দিয়া যাওয়া, চক্ষু স্থির হওয়া, শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করা (চলিত বাঙলায় শত্রুর মুখে ছাই ফেলা), জিভ কাটা, ললাটে করাঘাত করা, পিণ্ড মেলে না, সোনার চাঁদ।

অনুশীলনী

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : উত্তরাধিকারী, যুক্তিযুক্ত, গৃহপোষ্য।

২। লিঙ্গান্তরপূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর : রোগী, উত্তরাধিকারী, মৃত, বুদ্ধিমতী।

৩। বিশিষ্টার্থক শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য রচনা কর : কলম সরিতেছিল না, চক্ষু স্থির হওয়া, গোমাংস, সোনার চাঁদ, পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায়, কাল হওয়া, পেট চলিয়া যায়।

৬। ভারত (পৃঃ ১০৪-১১২)

সন্ধি : উল্লেখ—উৎ+লেখ। দ্ব্যর্থব্যঞ্জক—দ্বি+অর্থব্যঞ্জক। বাসোপলক্ষে—বাস+উপলক্ষে। রামাভিষেক—রাম+অভিষেক। প্রমোদোদ্যান—প্রমোদ+উদ্যান। চিরাগত—চির+আগত। সদ্যোবিধবা—সদ্য+বিধবা। কটূক্তি—কটু+উক্তি। উচ্ছ্বসিত—উৎ+শ্বসিত। শিরোদেশ—শিরঃ+দেশ।

সমাস : ধর্মপ্রাণ—ধর্মই প্রাণ যাহার (বহুব্রীহি)। ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি—তিন লোকের সমাহার ত্রিলোক (দ্বিগু); ত্রিলোক বিশ্রুত (সপ্তমী তৎপুরুষ) সেইরূপ কীর্তি যাহার (বহুব্রীহি), তিনি। ত্যাজ্যপুত্র—ত্যাজ্য যে পুত্র (কর্মধারয়)। প্রমোদোদ্যানসমূহে—প্রমোদের জন্য উদ্যান (চতুর্থী তৎপুরুষ); তাহাদের সমূহ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। পাদোত্তোলনোদ্যত—পাদের উত্তোলন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে উদ্যত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। অযোধ্যাবাসী—অযোধ্যায় বাস করে যাহারা (উপপদ তৎপুরুষ)। উত্তরীয়-প্রক্ষিপ্ত—উত্তরীয় হইতে প্রক্ষিপ্ত (পঞ্চমী তৎপুরুষ)। দেবোপম—দেব উপমা যাহার (বহুব্রীহি), তিনি। কাঞ্চনভিত্তিসমূহ—কাঞ্চননির্মিত ভিত্তি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাদের সমূহ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। শুষ্কপুষ্পকর্ণিকারতরুর—শুষ্ক হইয়াছে পুষ্প যাহার (বহুব্রীহি); কর্ণিকার নামক তরু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। শুষ্কপুষ্প কর্ণিকার তরু (কর্মধারয়), তাহার। অঙ্গরাগবিরহিত অঙ্গের রাগ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহার দ্বারা বিরহিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। কৃতাঞ্জলি—কৃত হইয়াছে অঞ্জলি যাহার দ্বারা (বহুব্রীহি), তিনি। ফলমূলাহারী—ফল এবং মূল (দ্বন্দ্ব), তাহা আহার করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। অনশনকৃশ—নয় অশন (নঞ তৎপুরুষ), তাহার দ্বারা কৃশ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

সমস্তপদ-গঠন : প্রশ্ন—'অগ্রজ' শব্দটির অনুকরণে 'জ' শেষে থাকে এমন কয়েকটি শব্দ গঠন কর।

উত্তর—মনোজ, সরোজ, বনজ, জলজ, আত্মজ সহজ, পঙ্কজ ইত্যাদি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : কৈকেয়ী—কেকয়+অ (অপত্যার্থে)+ঈপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)। অভিষেক—অভি+√সিচ্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। পতিঘাতিনী—√পা+অতি+হিন্+ঈপ্। হৃষ্টতা—√হৃষ্+ক্ত+আপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)। ভিখারী—ভিখ+আরী। **মুহ্যমান**—√মুহ্ (সংস্কৃত ধাতু)+য+মান (বাঙলা কৃৎ মোহি ধাতু হইতে উৎপন্ন: অতএব হওয়া উচিত 'মোহ্যমান'। কিন্তু বাঙলাতে 'মুহ্যমান-ই প্রয়োগ হয়)। মর্জিত—√মার্জ+ণিচ্+ত (কর্তৃবাচ্যে)। প্রত্যাগত—প্রতি+আ√গম্+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)।

পদান্তর : উল্লেখ (বিশেষ্য) উল্লিখিত (বিশেষণ)। ঐর্ধ্বদৈহিক (বিশেষণ) ঊর্ধ্বদেহ (বিশেষ্য)। ঋদ্ধি (বিশেষ্য) ঋদ্ধ (বিশেষণ)। মৌন (বিশেষ্য) মৌনা (বিশেষণ)। হৃষ্ট (বিশেষণ) হর্ষ (বিশেষ্য)। সর্প (বিশেষ্য) সর্পিল (বিশেষণ)। প্রসন্ন (বিশেষণ) প্রসাদ (বিশেষ্য)। ত্যাগী (বিশেষণ) ত্যাগ (বিশেষ্য)।

এক কথায় প্রকাশ : বন্যবৃক্ষের ন্যায়—বন্যবৃক্ষবৎ। আরাধনার বস্তু—আরাধ্য। মুকুটের স্থানীয়—মুকুট স্থানীয়। স্বপ্নের ন্যায়—স্বপ্নবৎ।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : (ক) ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না (সরল)—যে সকল পুরুষ ঋদ্ধিযুক্ত, তাহারা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না (জটিল)। (খ) নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? (কর্তৃবাচ্য)—নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শোনা যাইতেছে না কেন? (ভাববাচ্য)। (গ) তুমি আমার ধর্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ (কর্তৃবাচ্য)—তোমা কর্তৃক আমার ধর্মবৎসল পিতা বিনষ্ট হইয়াছেন (কর্মবাচ্য)।

অনুশীলনী

১। স্থূলাক্ষরে লিখিত শব্দগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) **ব্যগ্রকণ্ঠে** ভরত দূতগণকে অযোধ্যার প্রত্যেকের **কুশল** জিজ্ঞাসা করিলেন।

(খ) সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী **আনন্দে** ফুল্লা।

২। লিঙ্গান্তর পূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর : মহারাজ, পাগলিনী, হৃষ্টা, বন্ধু।

৩। বিশিষ্টার্থে প্রকাশ পূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর :

চাঁদের হাট, বিন্দুবিসর্গ, লক্ষ্মীশ্রী, অত্যন্ত ক্লেশবোধ হইতেছিল।

৪। ব্যাকরণগত টীকা লিখ : মুহ্যমান, পাতিঘাতিনী, পাগলিনী, প্রত্যাগত।

৭। লুইপাস্তুর (পৃঃ ১৭৪-১৮৮)

সন্ধি ঃ জলাতঙ্ক—জল+আতঙ্ক। পরীক্ষাগারে—পরীক্ষা+আগারে। জীবাণু—জীবে+অণু। পুনরুজ্জীবিত—পুনঃ+জীবিত। গবেষণা—গো+এষণা।

সমাস ঃ জলাতঙ্ক—জল হইতে আতঙ্ক (পঞ্চমী তৎপুরুষ)। জীবাণুশূন্য—জীবের অণু (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহা দ্বারা শূন্য (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। প্রাণিতত্ত্ব-বিশারদেরা—প্রাণি বিষয়ক তত্ত্ব (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহাতে বিশারদ (সপ্তমী তৎপুরুষ)। লোকারণ্য—লোকের অরণ্য (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) বা লোকেরা অরণ্যের ন্যায় (উপমিত কর্মধারয়)) হর্ষধ্বনি—হর্ষসূচক ধ্বনি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।

সমস্তপদ গঠন ঃ জীবের উৎপত্তি=জীবোৎপত্তি; বিজ্ঞানের ইতিহাসে=বিজ্ঞানেতিহাস; প্রতিকারের উপায়=প্রতিকারোপায়।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : প্রতিষেধক—প্রতি+√সিধ্+ণক্। ফুটন্ত—√ফুট্+অন্ত। মৌলিক—মূল+ষ্ণিক। আহ্বান—আ+√হ্বে+অনট্ (ভাববাচ্যে)। উৎপত্তি—উৎ+√পদ্+ক্তি (ভাববাচ্যে)। সমবেত—সম+অব+√ই+ক্ত। অভিনন্দন—অভি+√নন্দ্+অনট্ (ভাববাচ্যে)। প্রশ্ন—√প্রচ্ছ্+নঙ্ (ভাববাচ্যে। দূরীকরণ—দূর+চি্ব (অভূততদ্ভাবে)+√কৃ+লুট্ (অন)।

অর্থগত পার্থক্য ঃ পাত্রস্থিত—পাত্রে অবস্থিত; পাত্রস্থ—পাত্রে অবস্থিত, যোগ্যবরে প্রদত্ত (কন্যা পাত্রস্থ করা)। মড়ক—সংক্রামক রোগে অনেক প্রাণী বা মানুষের মৃত্যু; মোড়ক—পুরিয়া। জীবাণু—অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী যাহারা সাধারণতঃ রোগ জন্মায়; বীজাণু—অত্যন্ত ক্ষুদ্র বীজ যাহা হইতে উদ্ভিদের জন্ম হয়।

অনুশীলনী

১। পদান্তর পূর্বক বাক্য রচনা কর : দেহ, আবিষ্কার, রেশম, দেশ, ভ্রম।

২। **টিকা ও টীকা** শব্দদ্বয়ের অর্থ পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর।

৮। ভারতবর্ষ (পৃঃ ১৬১-১৬৪)

সন্ধি ঃ উজ্জ্বল—উদ+জ্বল। তন্ময়—তৎ+ময়।

সমাস ঃ বিপুলকায়—বিপুল কায় (দেহ) যাহার (বহুব্রীহি)। সাপখেলানো—সাপ খেলায় যাহা দ্বারা (বহুব্রীহি), তাহা। শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য—শ্মশ্রু ও গুম্ফ (দ্বন্দ্ব) তাহা দ্বারা শূন্য (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। খালিগায়ে—খালি গা (কর্মধারয়), তাহাতে। ক্রিয়াকাণ্ড—ক্রিয়া ও তাহার কাণ্ড (দ্বন্দ্ব অথবা ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। অবশ্যম্ভাবী—অবশ্য হইবে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ)। মধ্যবয়স্ক—মধ্য বয়স যাহার (বহুব্রীহি)। মায়া-মন্ত্রবলে—মায়া-

জনক মন্ত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার বলে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। আপাদমস্তক—পদ (পা) হইতে মস্তক পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব)। দিব্যচক্ষু—দিব্য যে চক্ষু (কর্মধারয়)। কৃত্তিবাস—কৃত্তি বাস যাহার (বহুব্রীহি)।

বু্যৎপত্তি (Derivation) : মুদিখানা—মুদি + খানা (বিদেশী প্রত্যয়)। অতীত—অতি + √ই + ক্ত। সাজানো—সাজ + আনো। অস্তিত্ব—√অস্ (সংস্কৃত ক্রিয়া) + তি (লট্) + ত্ব। উপভোগ—উপ + √ভুজ্ + ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। উৎসাহ—উৎ + √সহ্ + ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। অভিবাদন—অভি + √বদ্ + ণিচ্ + ল্যুট্ (অন) ভাববাচ্যে। পরিবর্তন—পরি + √বৃৎ + অনট্ (ভাববাচ্যে)।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য : মিটমিট ক'রে—ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের অনুকরণে গঠিত-অ-ধ্বনিবাচক ক্রিয়া প্রয়োগে 'জলন্ত' ক্রিয়ার বিশেষণ। স্বর্গীয়—'স্বর্গে জাত' এই অর্থে স্বর্গ + ই (= ঈয়) = স্বর্গীয়। কিন্তু 'পিতা' মহাশয় তো স্বর্গ জাত হইতে পারেন না, সুতরাং পদটির শুদ্ধরূপ হইল 'স্বর্গত' বা 'স্বর্গগত'। বাঙলা ভাষায় 'স্বর্গগত' এই অর্থে 'স্বর্গীয়' শব্দের প্রচলন বেশী।

সম্বন্ধপদের প্রকার : পরিবর্তনের স্রোত—রূপক-সম্বন্ধ। আমার পিতামহাশয়—জন্য-জনক-সম্বন্ধ। গ্যাসের বাতি—কারণ-কার্য-সম্বন্ধ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ—কৃতি-কারক সম্বন্ধ।

চলিত ভাষা হইতে সাধু ভাষায় রূপান্তর :

চলিত ভাষা : পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলিকাতায় এসেছিলাম। তখন আমার বয়স দশ-এগারো বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটে ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া-আসা করতে হ'ত। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ খেলানো সুরে কী পড়ত।

সাধুভাষা : পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স দশ এগার বৎসর হইবে। আমাদের বাসার নিকটে একটি মুদিখানা ছিল। তাহার পাশ দিয়া আমাদের যাতায়াত করিতে হইত। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসিয়া বিপুলকায় একটি বই লইয়া সাপ খেলাইবার সুরে কি পড়িত।

অনুশীলনী

১। এক কথায় প্রকাশ কর : যাহার মুখে দাড়ি ও গোঁফ নাই; শান্ত জীবনের ছবিটি; যাহা অবশ্যই হইবে; পা হইতে মাথা পর্যন্ত।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :

বিপুলকায়, শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য, অতগত, মিটমাট, খপেখপে, দৈবক্রমে, দেখা-শুনা, ঘর-কন্না, মায়া-মন্ত্রবলে, দিব্যচক্ষু, আপাদমস্তক।

৮। রুপো কাকা (পৃঃ ১৬৪-১৭২)

সন্ধি ঃ নিরাশ্রয়—নিঃ+আশ্রয়। কান্না—কাদ+না। যথেষ্ট—যথা+ইষ্ট।

সমাস ঃ চণ্ডীমণ্ডপ—চণ্ডীর (পূজার নিমিত্ত) মণ্ডপ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। রাজপুৎতুর—রাজার পুৎতুর (পুত্র) (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। খাতকপত্র—খাতক ও পত্র (দ্বন্দ্ব)। বিষয়-সম্পত্তি—বিষয় ও সম্পত্তি (দ্বন্দ্ব)। রুপো-বাঁধানো—রুপো দিয়ে বাঁধানো (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। তেলেবেগুনে—তেলে ও বেগুনে (অলুক্ দ্বন্দ্ব)। জুয়োচুরি—জুয়োর সাহায্যে চুরি (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) সবার **মুখেতে** শুনে এসেছি—অপাদানে 'তে' বিভক্তি। (খ) বাবা **বাড়ী** থাকতেও কি রুপো কাকা **আমাদের** চোখ রাঙাবে? বাড়ী—অধিকরণে শূন্য বিভক্তি; আমাদের—কর্মে ষষ্ঠী। (গ) একথা বাবার **মুখে** শুনে এসেছি—অপাদানে 'এ' বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) ঃ আত্মীয়—আত্মন্+ঈয় (সম্বন্ধ অর্থে)। চাকরি—চাকর+ই। চৌকিদার—চৌকি+দার। কৃষাণগিরি—কৃষাণ+গিরি। বিশ্বস্ত—বি+√শ্বস্+ক্ত। গুণবন্ত—গুণ+বন্ত (বাঙলা তদ্ধিত)। মহাজনী—মহাজন+ঈ।

বিদেশী-শব্দ ঃ চৌকিদার, খাতক, খাজনা, চাকরি, হিসাব, খারাপ, মাইনে, গোমস্তা বাজার, কর্জ।

অর্থগত পার্থক্য ঃ চৌকিদার—চৌকিদারের কার্য, চৌকিদারী—চৌকিদারের ব্যবহার্য। খাতক—যে ঋণ গ্রহণ করে; খাদক—যে খায়; মহাজনী—মহাজনদের ব্যবহার্য; মহাজনি—মহাজনের কার্য অর্থাৎ সুদে ঋণ দেওয়া ও আদায়।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ রাজপুৎতুর—তৎসম 'রাজপুত্র' শব্দের উচ্চারণ বিকৃতির ফল বলিয়া অর্ধতৎসম শব্দ। ইহা ছাড়া পুত্র>পুৎতুর—উ কার আগমের ফলে ইহা স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ষও বটে। একদিন একটা **ঘটনা** ঘটল—এই বাক্যটিতে ক্রিয়া 'ঘটল' এবং তাহার কর্তা 'ঘটনা' একই ঘট্ ধাতু হইতে জাত বলিয়া 'ঘটনা' সমধাতুজ কর্তার উদাহরণ।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য রচনা কর :—

হাতীর পাঁচ-পা দেখা; চোখ রাঙানো; পায়ে পায়ে; তেলে বেগুনে জ্বলা।

২। পদান্তরিত কর : সময়, গ্রাম, আত্মীয়, আশ্রয়, মলিন।

৩। নিম্নলিখিত চলিত শব্দগুলির সাধুরূপ দেখাও :—

রাজপুৎতুর, নিশ্চিন্দি, বামুন, জিগ্যেস, চষতি, সন্ন্যেসী, কোলেপিঠে, চাবিছড়া, ঘুমুলি, রাত জাগতি, সংসারডা।

পদ্যাংশ (দশম শ্রেণী)

১। কাশীরামদাস (পৃষ্ঠা ২)

সমাস : চন্দ্রচূড়জটাজালে—চন্দ্র চূড়াতে যাহার (বহুব্রীহি); চন্দ্রচূড়—চন্দ্রচূড়ের জটা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহার জাল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। সংস্কৃত-হ্রদ—সংস্কৃতরূপ হ্রদ (রূপক কর্মধারয়)। ভারতরস—ভারতরূপ রস (রূপক কর্মধারয়)। নরকুলধন—নরের কুল (সমূহ) (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহাদের ধন (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); (ব্যাসবাক্য—নরকুলের ধন = নরকুল শ্রেষ্ঠ)। ভাষাপথ—ভাষারূপ পথ (রূপক কর্মধারয়)। অমৃত-সমান—অমৃতের সমান (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। কবীশদলে—কবিদের মধ্যে ঈশ (সপ্তমী তৎপুরুষ); তাহাদের দল (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) **তৃষ্ণায়** আকুল বঙ্গ করিত রোদন।—হেতু অর্থে তৃতীয়া 'য়' বিভক্তি। (খ) সেইরূপে ভাষাপথ খননি **স্ববলে**—করণকারকে সপ্তমী। (গ) জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল **জলে**—করণকারকে 'এ' বিভক্তি'। মহাভারতের কথা **অমৃত-সমান**—'কথা'র বিশেষণ।

পদান্তর : চন্দ্র (বিশেষ্য) চান্দ্র (বিশেষণ; ঋষি (বিশেষ্য) আর্ষ (বিশেষণ)। রোদন (বিশেষ্য) রুদিত (বিশেষণ)। তৃষ্ণা (বিশেষ্য) তৃষ্ণিত (বিশেষণ)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : জাহ্নবী—জহ্নু + ষ্ণ (অপত্যার্থে + ঈপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)। দ্বৈপায়ন—দ্বীপ + ষ্ণায়ন। তাপস—তাপস্ + অণ্। ব্রতী—√বৃ + অত + ইন্ (অস্ত্যর্থে)। পবিত্রিলা—পু + ইত্র = পবিত্র; পবিত্র + ইলা (নামধাতু)। পুণ্যবান্—√পুণ্ + য + মতুপ্ (অস্ত্যর্থে)।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য : (ক) **যেমতি** জাহ্নবী, ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন—কেবলমাত্র কাব্যেই যেমতি ব্যবহার করা হয়। (খ) সগরবংশের যথা সাধিলা **মুকতি**। মুক্তি > ম + উ + ক্ + ত + ই > ম + উ + ক + অ + ত + ই > মুকতি স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের উদাহরণ। কেবলমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। (গ) **পবিত্রিলা** আনি মায়ে এবং ভাষা পথ **খননি** স্ববলে—এই দুইটিই নামধাতুর উদাহরণ। (ঘ) **নারিবে** শোধিতে ধার—'পারিবে না' এই শব্দের ছন্দের প্রয়োজনে কাব্যরূপ 'নারিবে'।

অলঙ্কার : চন্দ্রচূড়জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি সংস্কৃতহ্রদে রাখিলা তেমতি—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।—রূপক

অনুশীলনী

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :

চন্দ্রচূড়জটাজাল, সংস্কৃতহ্রদ, ভারতরস, নরকুলধন, ভাষাপথ, অমৃত-সমান।

২। নিম্নের মোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) **তৃষ্ণায়** আকুল বঙ্গ করিত রোদন। (খ) সেইরূপে **ভাষাপথ** খননি স্ববলে। (গ) জুড়াতে গৌড়ের **তৃষা** সে বিমল **জলে**।

৩। বাক্যবিশ্লেষণ কর : তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিতে রোদন; মহাভারতের কথা অমৃতসমান; জাহ্নবী ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন।

৪। নিম্নের মোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর :—

(ক) সংস্কৃতহ্রদ **রাখিলা** তেমতি। (খ) কঠোর গঙ্গায় **পূজি** ভগীরথ ব্রতী। (গ) **পবিত্রিলা** আনি মায়ে এ তিন ভুবন। (ঘ) **ভারতরসের** স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি।

২। আত্মবিলাপ (পৃঃ ৩-৫)

সন্ধি : যশোলাভ—যশঃ+লাভ। পাবক—পৌ+অক।

সমাস : জীবনপ্রবাহ—জীবনরূপ প্রবাহ (রূপক কর্মধারয়)। কালসিন্ধুপানে—কালরূপ সিন্ধু (রূপক কর্মধারয়); তাহার পানে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। যৌবনকুসুমভাতি—যৌবনরূপ কুসুম (রূপক কর্মধারয়); তাহার ভাতি অর্থাৎ দীপ্তি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ক্ষণপ্রভা—ক্ষণকাল প্রভা যাহার (বহুব্রীহি)। পাবক-শিখালোভে—পাবকের শিখা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। মাৎসর্য-বিষদশন—মাৎসর্যরূপ বিষ (রূপক কর্মধারয়); মাৎসর্যবিষযুক্ত দশন (দন্ত) (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। অনুক্ষণ—ক্ষণে ক্ষণে (বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব)। শতমুক্তাধিক—শতমুক্তার সমাহার (দ্বিগু), তাহা হইতে অধিক (পঞ্চমীতৎপুরুষ)। কালসিন্ধুজলতলে—কালরূপ সিন্ধু (রূপক কর্মধারয়); কালসিন্ধুর জল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); কালসিন্ধু জলের তল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কাল-ফাঁদে—কাল (ভয়ঙ্কর) যে ফাঁদ (কর্মধারয়); তাহাতে।

কারক ও বিভক্তি : (ক) আশার **ছলনে** ভুলি কী ফল লভিনু হায়,—করণকারকে 'এ' বিভক্তি। (খ) **পথিকে** ধাঁধিতে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। জলন্ত **পাবকশিখা**—হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি। (গ) বাকি কী রাখিলি তুই বৃথা **অর্থ-অন্বেষণে**—অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি।

সাধু গদ্যরূপ : লভিনু—লাভ করিলাম। মম—আমার। **ধাঁধিতে** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—ধাঁধাইতে বা, দৃষ্টিভ্রম জন্মাইতে। নিগড—লৌহশৃঙ্খল। সাধিতে—সাধন করিতে। **নারিলি** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—পারিলি না। হরিতে

—হরণ করিতে। ব্যয়িলি—ব্যয় করিলি। কামড়ে (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—কামড়ায়। মুকুতাফল—মুক্তাফল।

ব্যুৎপত্তি (Derivation): প্রমত্ত—প্র√মদ্+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। ক্লেশ—√ক্লিশ্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। জলন্ত—জ্বল্ (সংস্কৃত ধাতু)+ অন্ত (বাঙালা কৃৎ)। পতঙ্গ—পত+√গম্+অ। অন্বেষণ—অনু+√ইষ্+অনট্ (ভাববাচ্যে)। ব্যয়িলি—বি+অয়্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইলি; অথবা ব্যয় (বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু)+ইলি।

পদান্তর: ফল (বিশেষ্য) ফলিত (বিশেষণ)। হীনতা (বিশেষ্য)। হীন (বিশেষণ)। প্রমত্ত (বিশেষণ) প্রমাদ (বিশেষ্য)। সিন্ধু (বিশেষ্য) সৈন্ধব (বিশেষণ)। নিশা (বিশেষ্য) নৈশ (বিশেষণ)। যশঃ (বিশেষ্য) যশস্বী (বিশেষণ)। অবোধ (বিশেষণ) অবোধতা (বিশেষ্য)।

অলঙ্কার: (ক) কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি—অনুপ্রাস। (খ) ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার—যমক। (গ) পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়—অনুপ্রাস। (ঘ) সুগন্ধ কুসুমগন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়—অনুপ্রাস।

ব্যাকরণগত টীকা: ধাঁধিতে—ধাঁধা নাম শব্দ; এই ধাঁধা শব্দটি বিনা প্রত্যয়ে অথবা আ প্রত্যয়যোগে ধাতুতে পরিবর্তিত হইয়া ক্রিয়াপদ (ধাঁধাইতে<ধাঁধিতে) সৃষ্টি করিয়াছে, সুতরাং এটা নামধাতু। দংশিল—সংস্কৃত দনশ্ ধাতু+ইল। এইরূপ ক্রিয়া একমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। লভিল—বাক্যের ক্রিয়া লভিলি এবং কর্ম লাভ একই লভ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া 'লাভ' সমধাতুজ কর্ম।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর:—

হীনবল, নীরবিন্দু, যৌবনকুসুমভাতি, ক্ষণপ্রভা, পাবকশিখা, কালসিন্ধু, জলতল, যশোলাভ-লোভে, সদ্যঃপাতি, মৃণালকণ্টকগণে।

২। সাধুভাষায় প্রকাশ কর:—

(১) 'ছুটিল না,' (২) 'পোহাইবে', (৩) 'ধাঁধিতে' (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) (৪) 'উড়িয়া পড়িলি', (৫) 'ফাঁদ'; (৬) 'ফেলিস্'।

উত্তর—(১) দূরীভূত হইল না, (২) প্রভাত হইবে, (৩) দৃষ্টিভ্রম জন্মাইতে, (৪) উড্ডীন হইয়া পতিত হইলি, (৫) কৌশল, চক্রান্ত, (৬) বিসর্জন করিস।

৪। নিম্নের স্থূলাক্ষর শব্দগুলির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর:—

(ক) **প্রেমের** নিগড় গড়ি পড়িলি চরণে সাধে। (খ) **এবে রে পরাণ**

কাঁদে। (গ) **নারিলি** হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী। (ঘ) যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে **ব্যয়িলি** হায়।

৩। আশা

সন্ধি ঃ মনোমন্দির—মনঃ+মন্দির। নিরবধি—নিঃ+অবধি। **দুর্গন্ধ—দুঃ+গন্ধ।** অন্বেষণ—অনু+এষণ। কল্পনালোক—কল্পনা+আলোক।

সমাস ঃ ত্রিভুবন—তিন ভুবনের সমাহার (সমাহার দ্বিগু)। মানবমনোমন্দির—মানবের মন (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); মানব মনোরূপ মন্দির (রূপক কর্মধারয়)। মনোমন্দিরশোভা—মনোরূপ মন্দির (রূপককর্মধারয়), তাহার শোভা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। সংসারচক্র—সংসাররূপ চক্র (রূপক কর্মধারয়)। জীবনযুদ্ধ—জীবন রূপ যুদ্ধ (রূপক কর্মধারয়)। ইন্দ্রজাল—ইন্দ্রের জাল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। মূঢ়মতি—মূঢ় মতি যাহার (বহুব্রীহি), সে। মাতৃভাষা-কম-কলেবরে—মাতার ভাষা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); কম অর্থাৎ কোমল বা কমনীয় কলেবর (কর্মধারয়)। বঙ্গ-ইতিহাস—বঙ্গের ইতিহাস (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); বরবপুঃ—বর (বরণীয়) যে বপু (কর্মধারয়)।

সাধু গদ্যরূপ ঃ সৃজিত—সৃষ্টি করিত। বিরাজিতে—বিরাজ করিতে। নাশিত—নষ্ট করিত। যুঝিছে—যুঝিতেছে। তেমতি—তেমন। আলোকে—আলোকিত করে। উজলে—উজ্জ্বল করে। রঞ্জিছ—রঞ্জিত করিতেছ।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) ধন্য, আশা কুহকিনি—সম্বোধনে প্রথমা। (খ) নাচায় পুতুল যথা দক্ষ **বাজিকরে**—কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। (গ) কী **মন্ত্র** কহিলে তুমি অভাগার কানে—কর্মে শূন্য বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **ঃ** কুহকিনি—√কুহ্+অক+ইন্+ই (স্ত্রীলিঙ্গে)। মুগ্ধ—√মুহ্+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। সৃজিত—√সৃজ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইত (কর্মবাচ্যে)। বিরাজিতে—বি+√রাজ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইতে। **নাশিত**—নাশ (বিশেষ্য, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু)+ইত। অচিন্ত্য—নঞ্‌√চিন্ত+যৎ। **প্রবেশি**—প্র√বিশ্+ঘঞ্=প্রবেশ (বিশেষ্য), প্রবেশ (বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু)+ইয়া=প্রবেশিয়া, পদ্যে **প্রবেশি**। ভুলাইব—ভুল্+আ (প্রেরণার্থে)+ইব। উন্মত্ততা—উৎ+মদ্+ক্ত+তা (ভাবার্থে)। অর্বাচীন—অর্বাচ+ঈন্। নির্বাপিত—নির্+√বা+ণিচ্+ক্ত।

পদান্তর ঃ মুগ্ধ (বিশেষণ) (মোহ বিশেষ্য)। উন্মত্ততা (বিশেষ্য) উন্মত্ত (বিশেষণ)। সংসার (বিশেষ্য) সংসারী (বিশেষণ)। চক্র (বিশেষ্য) চক্রী (বিশেষণ)। দক্ষ (বিশেষণ) দক্ষতা (বিশেষ্য)। আলোক (বিশেষ্য) আলোকিত (বিশেষণ)।

অলঙ্কার: (ক) তোমার মায়ায় মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।—অনুপ্রাস।
(খ) নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে।—উপমা

ব্যাকরণগত টীকা: ঘুরাতে—ঘুর+আ+ইতে (বাঙলা প্রেরণার্থক) ক্রিয়ার উদাহরণ। **পদছায়া**—পদ+ছায়া সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে পদচ্ছায়া। বাংলা ভাষায় এইরূপ নিয়ম প্রায়ই মানা হয় না। **রঞ্জিত**—রঞ্জ্+ণিচ্+(সংস্কৃত ধাতু) ইতেছ। সংস্কৃত ধাতুজাত বাঙলা ক্রিয়া ইহা কেবল পদ্যেই প্রয়োগ হয়।

অনুশীলনী

১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: উন্মত্ততা, নিরবধি, অর্বাচীন, অসম্ভব, নির্বাপিত।

২। নিম্নের মোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর:—

(ক) তোমার **মায়ায়** মুগ্ধ মানবের মন। (খ) কী মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার **কানে**। (গ) চলিল অভাগা পুনঃ **ভিক্ষার** সন্ধানে।

৪। ভারততীর্থ (পৃঃ ১০-১২)

সন্ধি: পরমানন্দে—পরম+আনন্দে। হোমনল—হোম+অনল।

সমাস: মহামানব—মহান মানব (কর্মধারয়)। সাগরতীরে—সাগরের তীরে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। নরদেবতারে—নররূপী দেবতা (রূপক কর্মধারয়), তাহাকে। ধ্যানগম্ভীর—ধ্যানের দ্বারা গম্ভীর (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। নদীজপমালাধৃত—জপের জন্য মালা (চতুর্থী তৎপুরুষ); নদীরূপ জপমালা (রূপক কর্মধারয়); ধৃত হইয়াছে নদীজপমালা যাহার দ্বারা (বহুব্রীহি), সে (প্রান্তর পদের বিশেষণ)। রুদ্রবীণা—রুদ্র যে বীণা (কর্মধারয়)। হৃদয়তন্ত্র—হৃদয়রূপ তন্ত্র (রূপক কর্মধারয়)। তপস্যাবলে—তপস্যার বলে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। আনতশিরে—আনত হইয়াছে শির যাহাতে (বহুব্রীহি)। তীর্থনীরে—তীর্থের নীরে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

সাধু গদ্য রূপ: বিরাজ —বিরাজ করে। নাশিবে— নষ্ট হইবে। **রনরনি** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—রনরন করিয়া অথবা রনিত হইয়া। দহিতে—দগ্ধ বা দহন করিতে। সবাকার—সকলের। ত্বরা—সত্বর। হেথায়—এখানে।

কারক ও বিভক্তি: (ক) হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি **নরদেবতারে**—কর্মে দ্বিতীয়া। (খ) সবার-**পরশে**-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—করণে সপ্তমী।

ব্যুৎপত্তি (Derivation): পুণ্য—√পুণ্+যৎ (কর্তৃবাচ্যে)। বন্ধন—√বন্ধ্+অনট্ (ভাববাচ্যে)। ধ্যান—ধৈ+অনট্ (ভাববাচ্যে)। গম্ভীর—√গম্+ঈর। (কর্তৃবাচ্যে। মানব—মনু+ষ্ণ (অপত্যার্থে)। উপহার—উপ+√হৃ+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)।

বিরাম—বি+রম+ঘঞ্। তপস্যা—তপস্+ষ্য= (তপস্য) নামধাতু+অ (ভাববাচ্য) +আপ্। বিভেদ—বি+ভিদ্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)।

পদান্তর : পুণ্য (বিশেষ্য) পুণ্যবান (বিশেষণ)। ধীর (বিশেষণ) ধৈর্য (বিশেষ্য)। মানব (বিশেষ্য) মানবিক (বিশেষণ। উদার (বিশেষণ) ঔদার্য (বিশেষ্য। ধ্যান (বিশেষ্য) ধ্যাত (বিশেষণ)। গম্ভীর (বিশেষণ) গাম্ভীর্য (বিশেষ্য)। পবিত্র (বিশেষণ) পবিত্রতা (বিশেষ্য)। উন্মাদ (বিশেষণ) উন্মাদনা (বিশেষ্য)। বিচিত্র (বিশেষণ) বৈচিত্র্য (বিশেষ্য)। জয় (বিশেষ্য) জয়ী (বিশেষণ)। ঘৃণা (বিশেষ্য) ঘৃণিত (বিশেষণ)। লাজ (বিশেষ্য) লাজুক (বিশেষণ)।

অলঙ্কার : (ক) এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে—রূপক।

(খ) হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে—অনুপ্রাস।

অনুশীলনী

১। বাচ্যান্তর কর : উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে।

২। নিম্নের অনুক্ত শব্দগুলির স্থান পূরণ কর :—

হেথা একদিন——মহাওঙ্কারধ্বনি——একের——উঠেছিল——।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : সাগরতীরে, দুবাহু, উদার ছন্দে, পরমানন্দে, রক্তশিখা, লাজ-ভয়, সবার-পরশে-পবিত্র করা।

৪। পদান্তর পূর্বক বাক্যরচনা কর : লীন, বিভেদ, রক্ত, বিপুল, অভিষেক।

৫। প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর : সুর, স্বর, শুর, শূর। ধ্বনি, ধনী, ধনি।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত টীকা নির্ণয় কর :

নদীজপমালাধৃত (উ. ম. ১৯৬০) ; গিরিপর্বত, ধ্বনিতে, পোহায়, সবাকার।

৫। ধূলামন্দির (পৃষ্ঠা ১৯)

সন্ধি : দেবালয়—দেব+আলয়।

সমাস : রুদ্ধদ্বার—রুদ্ধ দ্বার যাহার (বহুব্রীহি)। দেবালয়—দেবের আলয় (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। রৌদ্রজলে—রৌদ্র ও জলে (দ্বন্দ্ব)। সৃষ্টিবাঁধন—সৃষ্টির বাঁধন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)—(তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সমাস)। ধূলাবালি—ধূলা ও বালি (দ্বন্দ্ব)। কর্মযোগে—কর্মের যোগ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

সাধু গদ্যরূপ : পূজিস—পূজা করিস্। চেয়ে—চাহিয়া। প'রে—উপরে।

কারক ও বিভক্তি : (ক) কাহারে তুই পূজিস্ সংগোপনে ?—কর্মে 'এ'

বিভক্তি। (খ) তিনি গেছেন যেথায় **মাটি** ভেঙে করছে চাষা চাষ—কর্মে শূন্য বিভক্তি (গ) ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক **ধূলাবালি**—কর্তায় প্রথমা।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : ভজন—√ভজ্ + অনট্ (ভাববাচ্যে)। পূজন—√পূজ্ + অনট্ (ভাববাচ্যে)। সাধন—√সাধ্ + অনট্ (ভাববাচ্যে)। রুদ্ধ—√রুধ্ + ক্ত(কর্মবাচ্যে)। মুক্তি—√মুচ্ + ক্তি (ভাববাচ্যে)।

পদান্তর : ভজন (বিশেষ্য) ভজনীয় অথবা ভক্ত (বিশেষণ)। পূজন—(বিশেষ্য) পূজনীয় অথবা পূজ্য (বিশেষণ। সাধন (বিশেষ্য) সাধিত (বিশেষণ)। পাথর (বিশেষ্য) পাথুরে (বিশেষণ)।

অনুশীলনী

১। নিম্নের মোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) **পাথর** ভেঙে কাটছে যেথায় পথ। (খ) **কর্মযোগে** তাঁর সাথে এক হয়ে।

২। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ : অন্ধকার, দেবতা, রৌদ্র, শুনি, মুক্তি, সৃষ্টি।

৩। ভিন্নার্থক অর্থে নিম্নলিখিত শব্দগুলি বাক্যে সার্থক প্রয়োগ কর : অন্ধকারে, শুচি, হাত, ধূলা-মাটি, জপ, কর্মযোগে।

৪। অলঙ্কার নির্ণয় কর : কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

৬। শুচি (পৃঃ ২০-২৩)

সন্ধি : সর্বাঙ্গে—সর্ব + অঙ্গে। পাদোদক—পদ্ + উদক। অহংকার—অহম্ + কার। অপেক্ষা—অপ + ঈক্ষা। নীরব—নিঃ + রব।

সমাস : জপেতপে—জপে ও তপে (দ্বন্দ্ব)। নানাচিহ্নধারী—নানা চিহ্ন (সুপ্‌-সুপা সমাস) ; নানারকম চিহ্ন ধারণ করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। সর্বাঙ্গে—সর্ব অঙ্গ (কর্মধারয়), তাহাতে। পাদোদক—পাদস্পৃষ্ট উদক (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। প্রাণপ্রবাহিণী—প্রাণরূপ প্রবাহিণী (রূপক কর্মধারয়)। বিশ্বলোকে—বিশ্বই লোক (কর্মধারয়), তাহাতে। ধ্যানমগ্ন—ধ্যানে মগ্ন (সপ্তমী তৎপুরুষ)। শুকতারা—শুক নামক তারা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। হাতজোড়—যোড় অর্থাৎ যুক্ত হাত (কর্মধারয়, বিশেষণের পরনিপাত)। শুচিবস্ত্র—শুচি যে বস্ত্র (কর্মধারয়)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) সারাদিন তাঁর কাটে **জপে তপে** অধিকরণে (সপ্তমী)। (খ) আমাদের **অধিকারে** সীমা দিতে চাও (কর্মে সপ্তমী)। (গ) দেব আমার **অহংকার** দূর করে তোমার বিশ্বলোকে (কর্মে শূন্য বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : ভোজ্য—√ভুজ্ + ণ্যৎ (য)। উপবাস—উপ—√বস্ + ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। শুষ্ক—শুষ্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। প্রবেশ—প্র + √বিশ্ +

ঘঞ্। সৃষ্টি—সৃজ্+ক্তি। ব্যাপৃত—বি+আ+ক্ত। অপরাধী—অপরাধ্+ইন্। সংকার—সং—কৃ+ঘঞ্। শিষ্য—শাস+ক্যপ্ (য)। (কর্মবাচ্যে)।

পদান্তর ঃ ভোজ্য (বিশেষণ) ভোজন (বিশেষ্য)। উপবাস (বিশেষ্য) উপবাসী (বিশেষণ)। ভক্ত (বিশেষণ) ভজন (বিশেষ্য)। প্রসাদ (বিশেষ্য) প্রসন্ন (বিশেষণ)। স্নান (বিশেষ্য) স্নাত (বিশেষণ)। আহার (বিশেষ্য) আহার্য (বিশেষণ)। স্পর্শ (বিশেষ্য) স্পৃষ্ট (বিশেষণ)। দীপ্ত (বিশেষণ) দীপ্তি (বিশেষ্য)। স্পর্ধা (বিশেষ্য) স্পর্ধিত (বিশেষণ)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে প্রশ্নবোধক? আমার বাস কেবল বৈকুণ্ঠেই নয় (প্রশ্ন পরিহার)।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:

ভোজ্য, প্রবেশ, স্পর্শ, অধিকার, অবসান, অচেতন, নীচ, নগ্ন, মলিন।

২। উক্তি পরিবর্তন কর:—

(ক) রামানন্দ বললেন, "প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে,
দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।"

(খ) ঠাকুর বললেন, "প্রভাত কি রাত্রির অবসানে?
যখন চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রতপালনে।"

৭। জীবন-ভিক্ষা (পৃঃ ২৮-২৯)

সন্ধি ঃ বিয়োগ-উৎস-সরিৎ—প্রথম দুইটি পদের সন্ধি করা উচিত ছিল, কিন্তু ছন্দের অনুরোধে করা হয় নাই। তপোবন—তপঃ+বন।

সমাস ঃ বিয়োগ-উৎস-সরিৎ—বিয়োগরূপ উৎস (রূপক কর্মধারয়); তাহার সরিৎ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। রসনা-প্রসূন—রসনারূপ (জিহ্বা) প্রসূন (রূপক কর্মধারয়)। মুখচম্পক—মুখরূপ চম্পক (রূপক কর্মধারয়)। অধর-কমলপর্ণ—অধররূপ কমল (রূপক কর্মধারয়); তাহার পর্ণ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। বৃন্তছিন্ন—বৃন্ত হইতে ছিন্ন (পঞ্চমী তৎপুরুষ) পদ্মবেদী—পদ্ম নির্মিত বেদী (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) অথবা পদ্মের ন্যায় বেদী (উপমিত কর্মধারয়)। ত্রিতাপ-দুঃখ—ত্রি তাপের সমাহার (দ্বিগু); ত্রিতাপাত্মক দুঃখ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। অশোকনিলয়—অশোক যে নিলয় (কর্মধারয়)। পরাণ-মৃণাল—পরাণরূপ মৃণাল (রূপক কর্মধারয়)। বিরহ-আঁধার—বিরহরূপ আঁধার (রূপক কর্মধারয়)।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) **ভিখ্** মাগি আনো সর্বপচয়। ভিখ্ 'মাগি' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্মে প্রথমা বিভক্তির লোপ। (খ) **জীয়াতে** চাহি না **তনয়ে আমার** (কর্মে এ বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) ঃ বিয়োগ—বি + √যুজ্ ঘঞ্ (ভাববাচ্যে। বিগলিত বি—গল্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। তিক্ত—তিজ্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। **পরিষিক্ত—** পরি + √সিচ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। নির্বাণ—নির—বা + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। **ভিন্ন—** ভিদ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। **যুবতী—**√যু + শতৃ = যুবৎ + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)। (কিন্তু **'যুবতী'** = যুব (ন্) তি (স্ত্রীলিঙ্গে)। **কহেন**—ঐতিহাসিক বর্তমানকালের ক্রিয়া (বাঙলা) কবিতায় ব্যবহৃত হয়)। **মগ্ন**—√মসজ্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। লগ্ন—**লগ্** + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। ভগ্ন—ভঞ্জ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে।

পদান্তর ঃ বিয়োগ (বিশেষ্য) বিযুক্ত (বিশেষণ)। আহত (বিশেষণ) আঘাত (বিশেষ্য) পরিষিক্ত (বিশেষণ) পরিষেক (বিশেষ্য)। পাষাণ (**বিশেষ্য**) **পাষাণী** (বিশেষণ)। সূক্ষ্ম (বিশেষণ) সূক্ষ্মতা (বিশেষ্য)। নীরব (বিশেষ্য) নীরবতা, (বিশেষণ)। সুন্দর (বিশেষণ) সৌন্দর্য (বিশেষ্য)। বিরহ (বিশেষ্য) বিরহী (বিশেষণ)।

সাধু গদ্যরূপ ঃ আগলি—আগলাইয়া। পাণি—হস্ত। হরযে—**হর্ষে, আনন্দে।** হরিল—হরণ করিল। নিবেদিল—নিবেদন করিল। জীয়াতে—বাঁচাইতে। **তনয়—** সন্তান, পুত্র।

কয়েকটি শব্দের মূল শব্দরূপ ঃ দেউল = দেবমন্দির (সংস্কৃত দেবকুল হইতে)। আগল = খিল (সংস্কৃত অর্গল হইতে)। আঁচল = শাড়ীর প্রান্ত (সংস্কৃত অঞ্চল)। বিহগী = পক্ষিণী (সংস্কৃত বিহঙ্গী)। বাছা = পুত্র (সংস্কৃত বৎস)। পুতুল = পুতুল (সংস্কৃত পুত্তলী)। ভিখ (সংস্কৃত ভিক্ষা)। আঁধার (সংস্কৃত অন্ধকার)।

স্বরভক্তি বা **বিপ্রকর্ষজাত শব্দ** ঃ পরসাদ > প্রসাদ ; পরশে > স্পর্শে ; হরষে > হর্ষে ; দুরগম > দুর্গম ; পরাণ > প্রাণ।

অলঙ্কার ঃ স্তনক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত ?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ-মধুরসে পরিষিক্ত ?—অনুপ্রাস।
মুখচম্পকে মরুর বর্ণ, শুষ্ক অধরকমলপূর্ণ—
কী পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযূষবিন্দুরিক্ত ?—রূপক।

অনুশীলনী

১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ঃ বিয়োগ, তিক্ত, পাপ, দুরগম, গুরু।

২। লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ অভাগা, বিহগী, যুবতী, তনয়।

৩। বাক্য বিশ্লেষণ কর : (১) কোন্ পাষাণের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন? (২) যাত্রা করেছ দুরগম পথ ক্ষুরধারসম সূক্ষ্ম।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বুৎপত্তি নির্ণয় কর : বিগলিত, তিক্ত, ছিন্ন, ভগ্ন।

৫। গদ্যের ভাষায় প্রতিশব্দ লিখ : আগলি', পরশে', পুতলি, দুরগম।

৮। আমরা (পৃঃ ৩১-৩৪)

সন্ধি : চতুরঙ্গ—চতু+অঙ্গ। সংস্কৃত—সম্+কৃত। মন্বন্তর—মনু+অন্তর। সন্ন্যাসী—সম্+ন্যাসী। আশীর্বাদ—আশী+বাদ।

সমাস : মুক্তবেণীর—মুক্ত হইয়াছে বেণীর যাহার (বহুব্রীহি)। বরদ—বর দান করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। মধুকমালা—মধুকের মালা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কাঞ্চ-শৃঙ্গমুকুট—কঞ্চন শৃঙ্গরূপ মুকুট (কর্মধারয়); কাঞ্চনশৃঙ্গ মুকুট যাহার (বহুব্রীহি)। কোল-ভরা—কোলে ভরা (সপ্তমী তৎপুরুষ)। কনকধান্য—কনকের ন্যায় ধা (রূপক কর্মধারয়)। বুক-ভরা—বুক ভরিয়াছে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ)। **চতুরঙ্গ**—চতুর্ (সংস্কৃত) চার অঙ্গের সমাহার (সমাহার দ্বিগু) [হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিযুক্ত (সেন) এই চারিটি সমর-অঙ্গ একত্রে বুঝাইতে] **দশাননজয়ী**—দশ আনন যাহার (বহুব্রীহি); দশাননের জয়ী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। হীরকহার—হীরক নির্মিত হার (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। কাঞ্চনকোকনদে—কাঞ্চনময় কোকনদ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **বাঙালীর হিয়া-অমিয়**—বাঙালীর হিয়া (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); বাঙালীর হিয়ারূপ অমিয় (রূপক কর্মধারয়)। গরমিল—মিলের অভাব (অব্যয়ীভাব)। মহামিলন—মহান্ মিলন যে (কর্মধারয়)। **পঞ্চবটী** (রামায়ণোক্ত বন)—পঞ্চবটের সমাহার (সমাহার দ্বিগু)। **বৃক্ষ সামান্যে বট শব্দের প্রয়োগ**—অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকি, অশোক এই পাঁচ বৃক্ষের বন। বাহুবল—বাহুর বল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস)

সাধু গদ্যরূপ : বিতরে—বিতরন করে। রচে—রচনা করে। লঙ্ঘিল—লঙ্ঘন করিল। **হিয়া অমিয়** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—হৃদয়ামৃত।

কারক ও বিভক্তি : (ক) তপের **প্রভাবে** বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে। **সাড়া**—প্রভাবে (হেত্বর্থে করণে 'এ' বিভক্তি)। সাড়া (কর্মে শূন্য বিভক্তি)। (খ) বিধাতার বরে ভরবে ভুবন বাঙালীর **গৌরবে**—(হেত্বর্থে করণে 'এ' বিভক্তি)

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : বরদ—√বৃ+অ=বর+দা+ক (কর্তৃবাচ্যে)। ভূষিত—√ভূষ্+অ=ভূষণ+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। শৌর্য—শূর+য (ষ্ণ্য) ভাবার্থে (শূরের ভাব)। নিধান—নি+√ধা+অনট্ (অধিকরণে)। ধীমান—ধী+মতুপ্ (অস্ত্যর্থে)। অবিনশ্বর—নঞ্—বি√নশ্+বরপ (কর্তৃবাচ্যে)। পটুয়া—(পটো) চিত্রকর—

পট+উয়া=পটুয়া (তুল্য : পড়ুয়া>পোড়ো)। মারী—√মৃ+ণিচ্+ঈ (ভাববাচ্যে)। গৌরব —গুরু+অণ্ (ভাবার্থে)। দীক্ষিত—√দীক্ষ+ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

পদান্তর : গঙ্গা (বিশেষ্য) গাঙ্গেয় (বিশেষণ)। দেহ (বিশেষ্য) দৈহিক (বিশেষণ)। বাঞ্ছিত (বিশেষণ) বাঞ্ছা (বিশেষ্য)। সজ্জিত (বিশেষণ) সজ্জা (বিশেষ্য)। কোমল (বিশেষণ) কোমলতা (বিশেষ্য)। মূর্তি (বিশেষ্য) মূর্ত (বিশেষণ)। প্রভাব (বিশেষ্য) প্রভাবী, প্রভু (বিশেষণ)। বিফল (বিশেষণ) বৈফল্য, বিফলতা (বিশেষ্য)। গৌরব (বিশেষ্য) গুরু (বিশেষণ)। দীক্ষিত (বিশেষণ) দীক্ষা (বিশেষ্য)।

বাচ্য পরিবর্তন : আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে—কর্তৃবাচ্য। —বাঙালী আমাদের বাস করা হয় সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে। —ভাববাচ্যে।

ব্যাকরণগত টীকা : বিতরে—বি-তৃ (সংস্কৃত ধাতু)+এ ; সংস্কৃত ধাতু হইতে সৃষ্ট বলিয়া ক্রিয়াপদ, একমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। **ধেয়ান**—ধ্যান>ধেয়ান—স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। **পঞ্চবটী** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) পঞ্চবটের সমাহার। (সমাহার দ্বিগু) এই সমাসে সমস্ত পদটি সাধারণতঃ ক্লীবলিঙ্গ হয়, তবে কোন কোন স্থলে আবার ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গও হয়। এস্থলে সেইরূপই হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত স্থূলাক্ষর শব্দগুলির কারক নির্দেশপূর্বক বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) ......রামচন্দ্রের **প্রপিতামহের** সঙ্গে। (খ) **সিংহল নামে**...... **শৌর্যের পরিচয়** (গ) আমাদের এই নবীন **শবসাধনার বাড়া**

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থগত পার্থক্য নির্ণয় কর :

(১) ভাস্কর, ভাস্বর ; (২) মারী, মারি ; (৩) টিকা, টীকা ; (৪) সাড়া, সারা।

৯। হাট (পৃঃ ৩৬-৩৭)

সন্ধি : নির্জন—নিঃ+জন। নীরব—নিঃ+রব। (আর কোন সন্ধি নাই)।

সমাস : বেচাকেনা—বেচা ও কেনা (দ্বন্দ্ব সমাস)। শ্রেণীহারা—শ্রেণীকে হারাইয়াছে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। পাকুড়-শাখে—পাকুড়ের শাখা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। বিদ্রূপ-বাঁশি—বিদ্রূপসূচক বাঁশি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। মাল-চেনাচেনি—মালের চেনা চেনি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। *নির্জন—নির্ (=নাই) জন যেখানে (বহুব্রীহি)*। চেনা-অচেনা—চেনা ও অচেনা (দ্বন্দ্ব সমাস)। *শিশির-বিমল—বিগত মল যাহা হইতে* (বহুব্রীহি) তাহা বিমল ; শিশিরের ন্যায় বিমল (উপমান কর্মধারয়)।

সাধু গদ্যরূপ : পাখে—পাখায়। শাখে—শাখায়। নয়ান—নয়ন। নিয়ে—লইয়া। বাঁধে—বাঁধিয়া। সহি—সহ্য করি।

কারক ও বিভক্তিঃ (ক) দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার **ভিড়ে** (অধিকরণে সপ্তমী)। (খ) **বিকেল বেলায়** বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব **ব্যথা**। বিকাল বেলায়—(অধিকরণে সপ্তমী); ব্যথা—(কর্মে প্রথমা)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation): সন্ধ্যা—সম্ + √ধৈ + অ (অধিকরণে) + আপ্। আলোক—আ + √লোক্ + অ (ভাববাচ্যে)। ক্লান্ত—√ক্লম্ + ত (কর্তৃবাচ্যে)। ছিন্ন—√ছিদ্ + ক্ত। ক্রেতা—√ক্রী + তৃ (কর্তৃবাচ্যে)।

ব্যাকরণগত টীকাঃ নয়ান—মূল শব্দ 'নয়ন'; এখানে আহ্বানের সঙ্গে মিল রাখিবার জন্য 'নয়ান' করা হইয়াছে। অনেক স্থলে কবিরা শ্রুতিমধুরতার জন্য 'নয়ন'-স্থলে 'নয়ান' প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তুলনীয়ঃ "আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ান আকুল নয়ান রে" (রবীন্দ্রনাথ)। **চেনাচেনি**—পরস্পর চেনা অর্থে একই ক্রিয়ার দ্বিত্ব। এরূপ ক্ষেত্রে অনেকেই ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলিলেও প্রকৃতপক্ষে এখানে তাহা হয় নাই, কেননা একই বিশেষ্য পদের দ্বিত্ব হয় নাই।

অনুশীলনী

১। স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর:—

(ক) বকের **পাখায়** আলোক লুকায় ছাড়িয়া পূবের মাঠ। (খ) **দিবসেতে** সেথা কত কোলাহল চেনা-অচেনার ভিড়ে। (গ) ওপারের লোক **নামালে** পসরা ছুটে এপারের ক্রেতা।

১০। কাল-বৈশাখী (পৃঃ ৩৭-৪০)

সন্ধিঃ বনস্পতি—বন + পতি (স-কারের আগম হইয়াছে; বনপতি শব্দে অর্থ বনের মালিক)। নিস্পন্দ—নিঃ + স্পন্দ। নির্ঘোষ—নিঃ + ঘোষ। দ্যুলোক—দিব্ + লোক। নিঃশঙ্ক—নিঃ + শঙ্ক। নিশ্চিহ্ন—নিঃ + চিহ্ন। উচ্ছ্বাস—উৎ + শ্বাস। উল্লাস—উৎ + লাস। দুর্ধর্ষ—দুঃ + ধর্ষ।

সমাসঃ কানন-আনন—কাননের আনন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। **জলস্থলের—জল ও স্থল (দ্বন্দ্ব সমাস), তাহার।** বনস্পতি—বনের পতি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। বজ্রঘোষণ—বজ্র ঘোষণা করে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ)। আকাশ-কটাহে—আকাশরূপ কটাহ (রূপক কর্মধারয়), তাহাতে। ভীমকুণ্ডল—ভীমরূপ কুণ্ডল যাহা (বহুব্রীহি), তাহা। ধূলিধূসরিত—ধূলির দ্বারা ধূসরিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ) দিগ্-বারণেরা—দিকে অধিষ্ঠিত বারণ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহারা। রণদুন্দুভি—রণব্যবহৃত দুন্দুভি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) বেণীবন্ধন—বেণীর বন্ধন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। বিজয়শঙ্খ—বিজয়সূচক শঙ্খ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। আলো ঝলমল—আলোদ্বারা ঝলমল (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

পুণ্যবাসর—পুণ্য যে বাসর (কর্মধারয়)। কাল-বৈশাখী—কালরূপ বৈশাখী (রূপক কর্মধারয়)। তৃণ অঙ্কুরে—তৃণ (দিগের) অঙ্কুর (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। **নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ**—নীল অঞ্জন (কর্মধারয়, সন্ধি বর্জন করিয়া); তাহার দ্বারা রচিত গিরি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); নীল-অঞ্জন-গিরির তুল্য (নিত্যসমাস)।

• **সাধু গদ্যরূপ** : ব্যাকুল—ব্যাকুল করিয়া। পশিয়ছে—প্রবেশ করিয়াছে। সঞ্চারি—সঞ্চারিত করিয়া। এতখনে—এতক্ষণে। উথলিছে—উথলিয়া উঠিতেছে। **বিদারিছে** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—বিদীর্ণ করিতেছে। মৃত্তির—মৃত্তিকার, মাটির। **সঞ্চারি**—সঞ্চারিত করিয়া। হেরি—দর্শন করি।

কারক ও বিভক্তি : (ক) ধক্কিমনীল অসির ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন ?—করণে তৃতীয়া 'এ' বিভক্তি। (খ) তৃণ-**অঙ্কুরে** সঞ্চারি রস, মধু ভরি বুকে মৃত্তির—অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : ঘ্রাণ—√ঘ্রা + অন (করণবাচ্য)। ধূম্র—ধুম + √র + অ (কর্তৃবাচ্য)। ধূসরিত—ধূসর (বিশেষণ) + ণিচ্ (নামধাতু) + ক্ত। নির্ঘোষ—নিস্ (নির্) + √ঘুষ্ + অ। ম্লান—√ম্লৈ + ক্ত (কর্তৃবাচ্য) ছিন্ন—√ছিদ্ ক্ত (কর্মবাচ্য)। ধৌত—√ধাব্ + ত (কর্মবাচ্য)। উচ্ছ্বাস—উদ্—শ্বাস্ + ঘঞ্ (ভাববাচ্য)। সঞ্চারি—সম + √চর্ + ণিচ্ (সংস্কৃত ধাতু) + ইয়া। দুর্ধর্ষ—দুস্ (দুর) + √ধৃষ্ + খল্ (কর্মবাচ্য)।

পদান্তর : রক্ত (বিশেষ্য) রক্তাক্ত (বিশেষণ)। তন্দ্রা (বিশেষ্য) তন্দ্রালু (বিশেষণ)। ব্যাকুল (বিশেষ্য) ব্যাকুলিত (বিশেষণ) ধূম্র (বিশেষ্য) ধূম্রায়িত (বিশেষণ)। উন্মাদ (বিশেষণ) উন্মাদনা (বিশেষ্য)। আলোক (বিশেষ্য) আলোকিত (বিশেষণ)। উচ্ছ্বাস (বিশেষ্য) উচ্ছ্বসিত (বিশেষণ)।

অলঙ্কার : আলয়ে কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে !—অনুপ্রাস।

ব্যাকরণগত টীকা : **গ্রাসিতে**—বিশেষ্যপদ 'গ্রাস', বিনা প্রত্যয়ে নাম ধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, 'গ্রাসিতে' কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। **মৃত্তির**—'মৃত্তিকা'র কথাটিকে ছন্দের অনুরোধে সংক্ষিপ্ত করিয়া 'মৃত্তির' রূপ দেওয়া হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। লিঙ্গান্তরপূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর :—

নদী, অধীর, ভীষণ, উন্মাদ, উচ্ছ্বাস, উল্লাস, ব্যাকুল, সঞ্চার, নির্ঘোষ, দুর্ধর্ষ।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বাচ্য পরিবর্তন কর :

ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিড়িয়া রশ্মিছটা।

৩। ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর :—

(ক) আজিকে যতেক **বনস্পতির** ভাগ্য দেখি যে মন্দ। (খ) নেমে আসে যেন **বাঁধ-ভাঙা** জল। (গ) শুরু হয়ে গেছে **গুরু-গুরু** রব।

১১। ত্রিরত্ন (পৃঃ ৪০-৪৪)

সন্ধি ঃ দিগ্‌জয়ী—দিক্‌+জয়ী। দিগ্‌গজ—দিক্‌+গজ। চতুর্দোলা—চতুঃ+দোলা। প্রেমাবেশ—প্রেম+আবেশ। পরমাগ্রহে—পরম+আগ্রহে। চরণাশ্রিত—চরণ+আশ্রিত। গোষ্পদ—গো+পদ।

সমাস ঃ দিগ্‌জয়ী—দিকসমূহ জয় করিয়াছেন (উপপদ তৎপুরুষ)। বীরপণ্ডিত—বীর যে পণ্ডিত সে (কর্মধারয়)। রণমদে—রণের মদ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। বিজয়মাল্য—বিজয়ের মাল্য (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। জয়নাদ—জয়সূচক নাদ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। সাধনভজন-রত—সাধন এবং ভজন (দ্বন্দ্ব); তাহাতে রত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। বিচার-মল্ল—বিচারে মল্ল (সপ্তমী তৎপুরুষ)। বিজয়-পত্রী—বিজয়ের পত্রী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। ভয়ে-বিস্ময়ে—ভয় এবং বিস্ময় (অলুক্‌ দ্বন্দ্ব)। জ্ঞানসাগর—জ্ঞানরূপ সাগর (রূপক কর্মধারয়)। রণে-আহ্বান-বাণী—রণে অর্থাৎ রণার্থ আহ্বান (চতুর্থী তৎপুরুষ); তাহার বাণী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। গোষ্পদ—গো (গোরু) য়ের পদ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। পুরবাসী—পুরে বাস করে যে, বা যাঁহারা (উপপদ তৎপুরুষ)। প্রশ্নবাণ—প্রশ্নরূপ বাণ (রূপক কর্মধারয়)। অবনতশির—অবনত শির যাহার (বহুব্রীহি), সে। যশ-প্রতিষ্ঠ—যশের প্রতিষ্ঠা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। মুখদর্শন—মুখকে দর্শন (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। তমাল-তরু—তমাল নামক তরু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। বৈষ্ণবগুরু—বৈষ্ণবের গুরু (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) বা, যে বৈষ্ণব সেই গুরু (কর্মধারয়)। কুসুমকোমল—কুসুমের ন্যায় কোমল (উপমান কর্মধারয়)। কঙ্কালসার—কঙ্কাল সার যাহার (বহুব্রীহি), তাহা।

সাধু গদ্যরূপ ঃ দোঁহে (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) দুইজনে। রহে—রহিয়া। ধ্বনিতেছে—ধ্বনি করিতেছে। ত্যাজিয়া—ত্যাগ করিয়া। চুমিয়া—চুম্বন করিয়া। **তিতিল**—(উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) সিক্ত হইল, ভিজিল। পরশে—স্পর্শে।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) ভয়ে সবে **পুঁথিপত্র** গুটায় (কর্মে শূণ্য বিভক্তি)। (খ) **মোরে** জিনি তবে **জয়গৌরবে** ব্রজ থেকে যাবে চলি (মোরে—কর্মে 'এ' বিভক্তি, জয়গৌরবে—ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **ঃ** মদ—√মদ্‌+অ (ভাববাচ্যে)। পঙ্কজ—√পনচ্‌+জন্‌+ড (কর্তৃবাচ্যে)। অনুচর অনু+√চর্‌+অ (কর্তৃবাচ্যে)। পাণ্ডিত্য—পণ্ডিত+ষ্ণ্য (ভাববাচ্যে)। সমাদর—সম্‌+আ+√দৃ+অ (ভাববাচ্যে)। আস্ফালন—আ

—স্ফল+ণিচ্+অনট্ (ভাববাচ্যে)। বৈষ্ণব—বিষ্ণু+অণ্। গৌরব—গুরু+ষ্ণ (ভাবার্থে)। খণ্ডিত—খন্ড্+ত (কর্মবাচ্যে)। সিক্ত—√সিচ্+ত (কর্তৃবাচ্যে)। শাণিত—√শাণ্+ণিচ্+ত (কর্মবাচ্যে)।

পদান্তর: দন্তী (বিশেষণ) দন্ত (বিশেষ্য)। পণ্ডিত (বিশেষণ) পাণ্ডিত্য (বিশেষ্য) বিজয় (বিশেষ্য) বিজয়ী (বিশেষণ)। জয় (বিশেষ্য) জয়ী (বিশেষণ)। সূর্য (বিশেষ্য) সৌর (বিশেষণ)। বিস্ময় (বিশেষ্য) বিস্মিত (বিশেষণ)। ধৈর্য্য (বিশেষ্য) ধীর (বিশেষণ)। অভিমানী (বিশেষণ) অভিমান (বিশেষ্য)।

ব্যাকরণগত টীকা: **আগায়** সংস্কৃত অগ্র>আগ; এই 'আগ' আ-প্রত্যয়যোগে নামধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদটি সৃষ্টি করিয়াছে। **তিষ্ঠ**—সংস্কৃত স্থা (ধাতু)+লোট্ হি=তিষ্ঠ। এই তিষ্ঠ বাঙলায় মূল সংস্কৃতের অর্থেও যেরূপ চলে, তেমনি বাঙলা ধাতুরূপেও চলে। **উদাহরণ**—ঘরে আর মন 'তিষ্ঠিতে' (থাকিতে) (তিষ্ঠ্+ইতে) চায় না।

অনুশীলনী

১ লিঙ্গান্তর কর: পণ্ডিত, ভিখারী, শিষ্য, তরুণ, বৈষ্ণব।

২। কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর: (ক) **বিজয়-পত্রী** লিখিয়া দিলেন **জয়**-ভিখারীর করে। (খ) সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জীব শুনিয়া **আস্ফালন**।

৩। নিম্নের মোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ:

(ক) **অট্ট-হাস্য হাসিয়া** উঠিল পণ্ডিত অভিমানী। (খ) শুনি সনাতন **মৃদু** হেসে ক'ন, **জিনিবারে অভিমান**।

১২। কাণ্ডারী হুঁশিয়ার (পৃ: ৪৫-৪৬)

সন্ধি: দুর্গম—দুঃ+গম। দুস্তর—দুঃ+তর। যুগান্ত—যুগ+অন্ত। পুনর্বার—পুনঃ+বার। পরীক্ষা—পরি+ঈক্ষা।

সমাস: রাত্রি-নিশীথে—রাত্রির নিশীথে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। তিমির-রাত্রি—তিমির যে রাত্রি (কর্মধারয়) অথবা তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। যুগযুগান্তসঞ্চিত—যুগ ও যুগান্ত (দ্বন্দ্ব), যুগান্ত—যুগের অন্ত (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); যুগ হইতে যুগান্ত (বিনা অব্যয়ে অব্যয়ীভাব); তাহা ব্যাপিয়া সঞ্চিত (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। অসহায়—সহায় নাই যাহার (বহুব্রীহি)। মাতৃ-মুক্তিপণ—মাতৃর (মাতার) মুক্তি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার পণ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। গিরিসংকট—গিরির সংকট (অর্থাৎ দুর্গম অঞ্চল) (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। পশ্চাৎ-পথযাত্রী—পশ্চাৎস্থিত পথ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার যাত্রী (তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠীতৎপুরুষ।

সাধু গদ্যরূপ: লঙ্ঘিতে—লঙ্ঘন করিতে। গরজায়—গর্জন করে। ত্যজিবে—

ত্যাগ করিবে। উদিবে—উদিত হইবে। **রাঙিয়া** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—রাঙা হইয়া। জিজ্ঞাসে—জিজ্ঞাসা করে।

কারক ও বিভক্তি : (ক) ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত **বুকে** (অধিকরণে সপ্তমী)। (খ) অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না **সন্তরণ** (কর্মে শূন্য বিভক্তি)। (গ) **ঐ গঙ্গায়** ডুবিয়াছে হায় (অধিকরণে 'য়' বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : দুর্গম—দুর্+√গম্+অ (কর্মবাচ্যে)। ফেনাইয়া—ফেন+আ (নামধাতু)+ইয়া। পুঞ্জিত—পুঞ্জ+ইতচ্ (জাতার্থে)। সন্দেহ—সম্+√দিহ্+অ (ভাববাচ্যে)। ত্যজিবে—√ত্যজ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইবে। আগুয়ান—আগু+আন (কর্তৃবাচ্যে)। সঞ্চিত—সম্-চি+ক্ত। জাতি—√জন্+তি (কর্তৃবাচ্যে)। উদিবে—উৎ-ই (সংস্কৃত ধাতু)+ইবে।

পদান্তর : দুর্গম (বিশেষণ) দুর্গমতা (বিশেষ্য)। জল (বিশেষ্য) জলো (বিশেষণ)। পথ (বিশেষ্য) পথিক (বিশেষণ)। মন্ত্রী (বিশেষণ) মন্ত্রণা (বিশেষ্য)। মুক্তি (বিশেষ্য) মুক্ত (বিশেষণ)। খুন (বিশেষ্য) খুনী (বিশেষণ)। পরীক্ষা (বিশেষ্য) পরীক্ষার্থী অথবা পরীক্ষক (বিশেষণ)।

বিদেশী শব্দ : হুঁশিয়ার—ফরাসী। হিম্মত—আরবী। জোয়ান—ফারসী 'জবান' শব্দ হইতে জাত। তুফান—আরবী, চীনদেশীয় 'তাই-ফুঙ'। সান্ত্রী—ইংরেজী (Sentry)। খুন—ফারসী।

অলঙ্কার : তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী, সান্ত্রীরা, সাবধান—অনুপ্রাস।

ব্যাকরণগত টীকা : লঙ্ঘিতে—লঙ্ঘ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইতে ; একমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। **জিজ্ঞাসে**—জ্ঞ+সন্=জিজ্ঞাস্ (ধাতু)। জিজ্ঞাস্+এ='জিজ্ঞাসে' সনন্ত ক্রিয়াপদ। একমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। **গরজায়**—গর্জ (বিশেষ্য)>গরজ (স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের উদাহরণ); গরজ+আ (নামধাতু)+এ।

অনুশীলনী

১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ : দুর্গম, জোয়ান, অসহায়, আগুয়ান, তিমির।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির শ্রেণীবিভাগ কর : কান্তার, মাঝি, হিম্মৎ, কাণ্ডারী, বাজ, আজ, প্রান্তর, খুন, ফাঁসি।

৩। নিম্নের মোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :

(ক) **ফেনাইয়া উঠে** বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান।

(খ) বাঙালীর **খুনে** লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।

(গ) **উদিবে** সে রবি আমাদেরই খুনে **রাঙিয়া** পুনর্বার।

(ঘ) জাতির অথবা **জাতের** করিবে ত্রাণ।

গদ্যাংশ (দশম শ্রেণী)

*১। বসন্তের কোকিল (পৃঃ ৫২-৬৩)

সন্ধি : পরান্ন—পর+অন্ন। উপর্যুপরি—উপরি+উপরি। স্নিগ্ধোজ্জ্বল—স্নিগ্ধ +উজ্জ্বল। নীলাম্বর—নীল+অম্বর।

সমাস : শীত-বর্ষা—শীত ও বর্ষা (দ্বন্দ্ব সমাস)। মানুষ-কোকিল—মানুষরূপ কোকিল (রূপক কর্মধারয় সমাস)। পারাবতকাকলীসংকুল—পারাবতদের কাকলী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহার দ্বারা সংকুল (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। পরান্ন-প্রতিপালিত—পরের অন্ন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহার দ্বারা প্রতিপালিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। উপর্যুপরি-বিন্যস্ত—উপরি উপরি (দুই অব্যয়ের অব্যয়ীভাব); উপর্যুপরী (সুপ্-সুপা সমাস)। পুষ্পস্তবক—পুষ্পের স্তবক (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। স্নিগ্ধোজ্জ্বল—যাহা স্নিগ্ধ তাহাই উজ্জ্বল (কর্মধারয়)। মধুরশ্যামল—যাহা মধুর তাহা শ্যামল (কর্মধারয়)। শুভ্রমুখী—শুভ্র মুখ যাহার (বহুব্রীহি) (স্ত্রীলিঙ্গ)। সন্ধ্যাশিশিরসিক্ত—সন্ধ্যার শিশির (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহার দ্বারা সিক্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। নীলচন্দ্রাতপ-মণ্ডিত—নীল যে চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া) (কর্মধারয়); তাহার দ্বারা মণ্ডিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। প্রভাতনিদ্রাকে—প্রকৃষ্টরূপে ভাত প্রভাত (প্রাদি তৎপুরুষ); প্রভাত-কালীন নিদ্রা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। সর্বশব্দগ্রাহী—সর্ব শব্দ (কর্মধারয়); তাহা গ্রহণ করে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ)। নীলাম্বর-মধ্যে—নীল অম্বর (কর্মধারয়); তাহার মধ্যে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) আয় ভাই, একবার মিলে মিশে দুই জনে পঞ্চমস্বরে ডাকি—(কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি)। (খ) কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না—(কর্মে শূন্য বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : মুখরিত—মুখর+ণিচ্ (নামধাতু)+ক্ত। অভিভূত—অভি+√ভূ+ত (কর্তৃবাচ্যে)। জলন্ত—জ্বল্ (সংস্কৃত ধাতু)+অন্ত (বাঙলা কৃৎ-প্রত্যয়)। প্রতিপালিত—প্রতি-পালি+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। বিস্মিত—বি+√স্মি+ত (কর্তৃবাচ্যে)। আশ্চর্য—আ+√চর্+ঘ্যণ্ (য)=(যাহা সচরাচর ঘটে না)। পুষ্পময়—পুষ্প+ময়ট্ (প্রাচুর্যে)। শ্রোতা—√শ্রু+তৃ (কর্তৃবাচ্যে)।

পদান্তর : সুখ (বিশেষ্য) সুখী (বিশেষণ)। বসন্ত (বিশেষ্য) বাসন্তী (বিশেষণ)। বিন্যস্ত (বিশেষণ) বিন্যাস (বিশেষ্য)। কুসুম (বিশেষ্য)। কুসুমিত (বিশেষণ)। শাসিত (বিশেষণ) শাসন (বিশেষ্য)। নক্ষত্র (বিশেষ্য) নাক্ষত্রিক (বিশেষণ)।

*স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের জন্য নহে।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : আমার সুখের প্রভাতনিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না।—(নিষেধসূচক)—আমার সুখের প্রভাতনিদ্রাকে কু বলিলে আমি অস্বীকার করিব (নির্দেশাত্মক)। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি (জটিল)—আমার ডাকের শ্রোতাকেই ডাকি (সরল)। কমলাকান্তের মনের কথা এজন্মে আর বলা হইল না—কমলাকান্তের মনের কথা এজন্মে অকথিতই রহিয়া গেল ('না' বর্জন করিয়া)। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)।

বিপরীতার্থক শব্দ : শীত—গ্রীষ্ম, আঁধার—আলো; নিদ্রা—জাগরণ; সুন্দর—কুৎসিত; ঘন—বিরল; বিষ—অমৃত।

ব্যাকরণগত টীকা : বল, ডাক—বল্, ডাক্+অ (উচ্চারণে এই 'অ' লুপ্ত থাকে। **গলাবাজি** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—গলা+বাজ=গলাবাজ; গলাবাজ+ই =গলাবাজি এই শব্দটিতে পর পর দুইটি তদ্ধিত প্রত্যয় আছে। ইহার একটি বিদেশী 'বাজ', শব্দ এবং অপরটি বাঙলা 'ই' প্রত্যয়। এইরূপ একই শব্দে একাধিক তদ্ধিত বিভিন্ন অর্থে যুক্ত হইতে পারে।

অনুশীলনী

১। সাধুভাষায় প্রতিশব্দ লিখ : পুঁজিপাটা, ডেলা, কুকড়া, রাঙা, গলাবাজি, খাজনা, টেড়ি, বেড়াল, আমার হ'য়ে।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির চলিত ভাষায় প্রতিশব্দ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :

পুষ্পস্তবক, প্রভাত-নিদ্রা, সৌধ, পরান্ন-প্রতিপালিত, চন্দ্রাতপ, মুখরিত, স্বরে স্বরে, শীতল।

৩। নিম্নলিখিত অনুক্ত শব্দগুলির স্থান পূরণ কর :

গলাবাজিতে সংসার—হয় বটে, কিন্তু কেবল—হয় না; যদি শব্দমন্ত্রে—জয় করিবে, তবে যেন তোমার—পঞ্চম লাগে।

উত্তর : শাসিত, চেঁচাইলে, সংসার, স্বরে।

২। মোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ :

(ক) **তোতে আমাতে** মিলে মিশে **পঞ্চম** গাই। (খ) তোমার **চক্ষে** সকলেই কু। (গ) তুমি **গলাবাজিতে** জিতিয়া গেলে। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) (ঘ) তোর **পুঁজিপাটা** ঐ গলা। (ঘ) **সিংহাসন** হইতে......কাঁপিয়া উঠুক।

২। প্রতিভা (পৃঃ ৬৩-৬৭)

সন্ধি : প্রথমোক্ত—প্রথম+উক্ত। তদনুরূপ—তদ্+অনুরূপ। অন্যাবিষ্কৃত—অন্য+আবিষ্কৃত। অন্যোদ্ভাবিত—অন্য+উদ্ভাবিত। আদ্যন্ত—আদি+অন্ত। উদ্ধৃত—

উৎ+ধৃত। দেবানুগৃহীত—দেব+অনুগৃহীত। প্রত্যাগমন—প্রতি+আগমন। মনস্তুষ্টি—মনঃ+তুষ্টি। ব্যতিরেকে বি+অতিরেকে। ব্যুৎপত্তি—বি+উৎপত্তি। পর্যাপ্ত—পরি+আপ্ত। অল্পায়াসাধ্য—অল্প+অয়াসসাধ্য। পুরাতনাতিরিক্ত—পুরাতন+অতিরিক্ত। মনোযোগ—মনঃ+যোগ। পুনরুদ্ধার—পুনঃ+উদ্ধার।

সমাস ঃ অন্যনির্দিষ্ট—অন্য দ্বারা নির্দিষ্ট (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। অন্যোদ্ভাবিত—অন্য দ্বারা উদ্ভাবিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। পালনশক্তি—পালনের শক্তি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। **শিক্ষানিরপেক্ষ**—নিঃ (=নাই) অপেক্ষা যাহাতে (বহুব্রীহি) ; শিক্ষায় (শিক্ষা বিষয়ে) (উ. মা. ১৯৬০) অথবা **শিক্ষাতে নিরপেক্ষ** (সপ্তমীতৎপুরুষ)। দেবদত্ত—দেবের দত্ত (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। শকুন্তলাপ্রণেতা—শকুন্তলার প্রণেতা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। সর্ববিদ্যা-বিশারদ—সর্ব বিদ্যা (কর্মধারয়) ; সর্ব বিদ্যায় বিশারদ (সপ্তমী তৎপুরুষ)। পণ্ডিতচূড়া-মণি—চূড়ার মণি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) পণ্ডিতের চূড়ামণি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। সঙ্গীতরসাস্বাদ বিহীন—সঙ্গীতের রস (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) ; তাহার আস্বাদ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার দ্বারা বিহীন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। বল্লরীপল্লববিভূষিত—বল্লরী এবং পল্লব (দ্বন্দ্ব সমাস) ; তাহার দ্বারা বিভূষিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন—লৌকিক নহে (নঞ তৎপুরুষ) ; অলৌকিক শক্তি (কর্মধারয়) ; তাহার দ্বারা সম্পন্ন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। অল্পায়াসসাধ্য—অল্প যে আয়াস (কর্মধারয়) ; তাহা দ্বারা সাধ্য (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। অভিনবতত্ত্বমন্দিরে—তত্ত্বরূপ মন্দির (রূপক কর্মধারয়) ; অভিনব তত্ত্ব (কর্মধারয়) ; তাহার মন্দির (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) কিন্তু বিধাতার **সৃষ্টিশক্তিতে** বঞ্চিত রহিয়াছেন। (তৃতীয়া 'তে' বিভক্তি)। (খ) যত্নশীলই **রত্নলাভে** অধিকারী (অধিকরণে সপ্তমী)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **ঃ** প্রাধান্য—প্রধান+ষ্যঞ (য) (ভাবার্থে)। পণ্ডিত—পণ্ডা+ইতচ্ (জাতার্থে)। আকস্মিক—অকস্মাৎ+ঠক্ (ইক)। মোহিত—মোহ+ইতচ্ (জাতার্থে) বা√মুহ+ণিচ্ (প্রেরণার্থক)+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। প্রসিদ্ধ—প্র+√সিধ্ +ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। ভেদ—ভিদ+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। পক্ষপাতী—পক্ষ—√পত্+ণিন্ (কর্তৃবাচ্যে)। সন্তুষ্ট—সম্√তুষ্+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। গ্রাহ্য—√গ্রহ+ণ্যৎ (য) (কর্মবাচ্যে)।

পদান্তর (সাধ্য) বিশেষণ (সাধন) বিশেষ্য। আবিষ্কার (বিশেষ্য) আবিষ্কৃত (বিশেষণ)। সৃষ্টি (বিশেষ্য) সৃষ্ট (বিশেষণ)। উৎপত্তি (বিশেষ্য) উৎপন্ন (বিশেষণ)। সরস্বতী (বিশেষণ) সারস্বত (বিশেষণ)। স্বাভাবিক (বিশেষণ) স্বভাব (বিশেষ্য)। অধ্যয়ন (বিশেষ্য) অধীত (বিশেষণ)। বৈয়াকরণ (বিশেষণ) ব্যাকরণ (বিশেষ্য)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ প্রতিভা যে দেবদত্ত এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় (নেতিবাচক)—প্রতিভা যে দেবদত্ত এ কথা আংশিকভাবে সত্য (অস্তিবাচক)। আমরা এরূপ বলি না যে, ইহা শিক্ষানিরপেক্ষ—আমরা এরূপ বলি না যে, ইহা শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না ('শিক্ষানিরপেক্ষ'-এর সমাস ভাঙিয়া ব্যবহার)। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :—

বিভক্ত, গ্রাহ্য, পণ্ডিত, নিরপেক্ষ, তুষ্টিসাধন, সন্দেহ, আকস্মিক, প্রাধান্য, পর্যাপ্ত, অভ্যস্ত।

২। সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখ :—

(ক) শিক্ষার উপর যাহা নির্ভর করে না; (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০), (খ) যিনি ব্যাকরণ জানেন; (গ) অল্প চেষ্টায় যাহা করিতে পারা যায়; (ঘ) আগে থেকে যার সঙ্গে পরিচয় আছে।

৩। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে (পৃঃ ৭৬-৮২)

সন্ধি ঃ চিরাভ্যস্ত—চির+অভ্যস্ত। চিতানলে—চিতা+অনলে। কূর্মাচল—কূর্ম +অচল। নভোমণ্ডল—নভঃ+মণ্ডল। অর্ধোন্মীলিত—অর্ধ+উন্মীলিত। **শিরোপরি** —শিরঃ+উপরি (বাঙলা সন্ধি; সংস্কৃত মতে ভুল—শুদ্ধরূপ 'শির উপরি')। চন্দ্রাতপে —চন্দ্র+আতপে। প্রত্যাবর্তন—প্রতি+আবর্তন। মহাযজ্ঞোত্থিত—মহাযজ্ঞ+উত্থিত। অগ্ন্যুদ্গার—অগ্নি+উদ্গার। উত্তুঙ্গ—উৎ+তুঙ্গ। উড্ডীন—উৎ+ডীন।

সমাস ঃ কূলপ্লাবন—কূলের প্লাবন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। প্রতিদিন—দিন দিন (অব্যয়ীভাব)। চিতানল—চিতার অনল (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) আজন্মপরিচিত—জন্ম হইতে আজন্ম (অব্যয়ীভাব); আজন্ম পরিচিত (সুপ্‌সুপা)। অভ্রভেদী—অভ্র (মেঘ) ভেদ করা স্বভাব যাহার (উপপদ তৎপুরুষ)। হতচেতন—হত হইয়াছে চেতনা যাহার (বহুব্রীহি); হত চেতনার মতো (নিত্যসমাস)। শিখরতুষারনিঃসৃত—শিখরস্থ তুষার (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহা হইতে নিঃসৃত (পঞ্চমী তৎপুরুষ)। অস্থিচূর্ণ-সংযোগ —চূর্ণ অস্থি (কর্মধারয় বিশেষণের পরনিপাত); তাহার সহিত সংযোগ (তৃতীয়া তৎপুরুষ), তাহাতে। মরুভূমি-প্রায়—মরুভূমির মতো (নিত্যসমাস)। মহাযজ্ঞোত্থিত—মহান্ যজ্ঞ (কর্মধারয়); তাহা হইতে উত্থিত (পঞ্চমী তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি ঃ প্রবেশ করিয়া **মহাবিক্রমে** উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। (অধিকরণে সপ্তমী)। কঠিন পর্বতের **দেহাবশেষ**-দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যাম দেহ নির্মিত হইল। (করণে তৃতীয়া বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **:** প্রবাহিত—প্র+√বহ্+ণিচ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। অজ্ঞাত—নয় জ্ঞাত, ন+√জ্ঞা+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। ভস্মভূত—ভস্ম+চ্বি (অভূততদ্ভাবে) +ভূ+ক্তি। অবণ্যানী—√ঋ+অন্য=অবণ্য+আনীপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)। অজ্ঞেয়—√জ্ঞা+যৎ (কর্মবাচ্যে)। উৎপত্তি—উৎ+√পদ্+ক্তি (ভাববাচ্যে)। প্রস্তরীভূত—প্র +√স্তৃ+অ=প্রস্তর+চ্বি (অভূততদ্ভাবে)+ভূ+ক্ত। দণ্ডায়মান—দণ্ড+ক্য+শানচ্ (কর্তৃবাচ্যে)। উত্থিত—উৎ+√স্থা-ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। ঐন্দ্রজালিক—ইন্দ্রজাল +ইক। পরিণত—পরি+√নম্+ক্ত। দুর্নিরীক্ষ্য—দুর্+নির্+ঈক্ষ+য (কর্মবাচ্যে)।

পদান্তর : সখ্য (বিশেষণ) সখা (বিশেষ্য)। শ্রান্ত (বিশেষণ) শ্রান্তি (বিশেষ্য)। পার্থিব (বিশেষণ)। পৃথিবী (বিশেষ্য)। উর্বরতা (বিশেষ্য) উর্বর (বিশেষণ)। তরল (বিশেষণ) তারল্য (বিশেষ্য)।

বাক্যের আকার পরিবর্তন : একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম।—সরল বাক্য।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইলাম এবং বসিয়া পড়িলাম।—যৌগিক বাক্য।

অলঙ্কার : ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলকুল গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত।—সমাসোক্তি।

ব্যাকরণগত টীকা : **পথপ্রদর্শক**—পথিন্+প্রদর্শক=পথিপ্রদর্শক (সংস্কৃত সমাসের নিয়মে) তবে বাঙলায় 'পথ' পদটিই প্রাতিপদিকরূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সমাসবদ্ধ পদটিকে শুদ্ধ বলা যাইতে পারে। **নিমজ্জিত**—নি√—মস্জ্+ক্ত—নিমগ্ন, এই শব্দটি ভুল হইলেও 'নিমগ্ন' অর্থে 'নিমজ্জিত' কথাটি বাঙলায় প্রচলিত।

অনুশীলনী

১। নিম্নের উদ্ধৃত অংশটুকু চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :

'শিখরতুষারনিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে। তুষার নদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তর-স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।' (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির দ্বারা তদ্ধিতান্ত বা কৃদন্ত শব্দ গঠন কর :

রজতসূত্রের ন্যায়; শঙ্খধ্বনির ন্যায়; সৃষ্টিকর্তা তুষারে পরিণত।

৪। স্বাদেশিকতা (পৃঃ ৮২-৮৮)

সন্ধি : বয়সোচিত—বয়স+উচিত। উদ্যোগ—উদ্+যোগ। হাস্যোচ্ছ্বাস—হাস্য+উচ্ছ্বাস (উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস)।

সমাস : স্বদেশপ্রেম—স্বদেশ (কর্মধারয়) বা স্বদেশের জন্য প্রেম (চতুর্থী তৎপুরুষ)। কর্মকর্তারূপে—কর্ম ও কর্তা (দ্বন্দ্ব সমাস); তাহাদের রূপ যাহাতে (বহুব্রীহি)। শশব্যস্ত—শশের ন্যায় ব্যস্ত (উপমান কর্মধারয়)। রবাহূত—রব (শব্দ) দ্বারা অহূত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। অনাহূত—নয় আহূত (নঞ্ তৎপুরুষ)। বউঠাকুরানী—বউ অথচ ঠাকুরানী (কর্মধারয়)। জ্ঞানবৃক্ষ—জ্ঞানরূপ বৃক্ষ (রূপক কর্মধারয়)। তেজঃ-প্রদীপ্ত—তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি : সেই সভায় বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসন-মাত্র অভিনয় করিতেছিল তাহা কঠোর **ট্রাজেডিতে** পরিণত হইতে পারিত। (অধিকরণে সপ্তমী)। **দেশের প্রতি** জলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের **জ্বলন-শীলতা** বাড়াইতে পারিত তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।—দেশের প্রতি (অনুসর্গযোগে ষষ্ঠী) জ্বলনশীলতা (কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **:** আত্মীয়—আত্মন+ঈয় (সম্বন্ধ অর্থে)। পুরস্কৃত—পুরস্+√কৃ+অ (কর্মবাচ্যে)। উত্তেজনা—উৎ+√তিজ্+ণিচ্+অন্ (ভাববাচ্যে) আপ্। স্বাদেশিক—স্বদেশ+ইক। পোড়ো—√পড়্+উয়া=পড়ুয়া>পোড়ো (স্বর-ভক্তি)। রাশিকৃত—রাশি+চ্বি (অভূততদ্ভাবে)+কৃ+ক্ত। সন্দিগ্ধতা—সম+√দিহ্+ক্ত (ভাবার্থে)। বৈপরীত্য—বিপরীত+ষ্ণ্য (ভাবার্থে)।

পদান্তর : শ্রদ্ধা (বিশেষ্য) শ্রদ্ধেয় (বিশেষণ)। স্বদেশ (বিশেষ্য) স্বাদেশিক, স্বদেশী (বিশেষণ)। পাণ্ডিত্য (বিশেষ্য) পণ্ডিত (বিশেষণ)। সহজ (বিশেষণ) সহজতা (বিশেষ্য)। নিবেদন (বিশেষ্য) নিবেদিত (বিশেষণ)। অনভ্যাস (বিশেষ্য) অনভ্যস্ত (বিশেষণ)।

বিশিষ্টার্থ বাগ-ভঙ্গি : মালী তাঁহাকে **শশব্যস্ত** হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মুঠমুঠা আগুনের **হরির লুট** ছড়াইতেছে। আমাদিগকে **জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন** এবং স্বর্গলোক ভাঙ্গিয়া গেল।

অলঙ্কার : এই সভায় আমরা এমন একটি খাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম।—উৎপ্রেক্ষা।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখিয়া বাক্য রচনা কর :
অর্বাচীন, নিবিড়, মূল্যবান, নিঃশব্দ, প্রহসন, নবীনতা, বৈপরীত্য, অপমান।

২। নির্দেশানুসারে বাক্য বিশ্লেষণ কর :

(ক) আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। (খ) সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি। (উচ্চতর মধ্যমিক ১৯৬০)। (গ) মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ :

অন্তঃশীলা (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০), হিন্দুমেলা, স্বাদেশিকদের সভা; আগুনের 'হরির লুঠ'; জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া।

* ৫। তোতা-কাহিনী (পৃঃ ৯৩-৯৮)

সমাস : কাযদাকানুন—কায়দা এবং কানুন (দ্বন্দ্ব সমাস)। রাজহাটে—রাজারহাটে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। খড়কুটা—খড় ও কুটা (দ্বন্দ্ব সমাস)। পুঁথি-লিখক—পুঁথির লিখক (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। পর্বতপ্রমাণ—পর্বত প্রমাণ যাহার (বহুব্রীহি)। তদারক-নবিশ—তদারকে নবিশ (সপ্তমী তৎপুরুষ)। স্বভাবদোষে—স্বভাবের দোষে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। কান-মলা-সর্দার—কান মলে যাহারা (উপপদ তৎপুরুষ); তাহাদের সর্দার (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) সোনাদানা—সোনা ও দানা (দ্বন্দ্ব সমাস)। আশাজনক—আশা জন্মায় যাহা (উপপদ তৎপুরুষ)। দীর্ঘ-নিশ্বাসে—দীর্ঘনিশ্বাস (কর্মধারয়), তাহাতে।

কারক ও বিভক্তি : মনে তো ছিল না। **পাখিটাকে** দেখা হয় নাই (কর্মে দ্বিতীয়া)। তবু **স্বভাবদোষে** সকাল বেলায় আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্ করে। (হেত্বর্থে 'এ'-বিভক্তি সপ্তমী)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : শিক্ষা—√শিক্ষ্ + অঙ্ (ভাববাচ্যে) + আপ্। কান-মলা-সর্দার—কান√মল্ + আ (কর্তৃবাচ্যে)। **নিন্দুক**—নিন্দ্ (সংস্কৃত ধাতু) + উক (বাঙলা কৃৎ; সংস্কৃতে 'নিন্দক' হয় 'নিন্দুক' হয় না)। অমাত্য—অমা + ত্যপ্। পিটানি—পিট + আনি (ভাববাচ্যে)। বেয়াদবি—বেয়াদব + ই ভাবার্থে)। মুকুলিত—মুকুল + ইতচ্ (জাতার্থে)।

পদান্তর : বিদ্যা (বিশেষ্য) বিদ্বান্ (বিশেষণ)। খবরদারি (বিশেষণ) খবরদার (বিশেষ্য)। নিন্দুক (বিশেষণ) নিন্দা (বিশেষ্য)। অভাব (বিশেষ্য) অভাবী (বিশেষণ) কৃতজ্ঞতা (বিশেষ্য) কৃতজ্ঞ (বিশেষণ)। সোনা (বিশেষ্য) সোনালী (বিশেষণ)।

বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি : (ক) মুখ হাঁড়ি করিয়া—এখানে 'হাঁড়ি' কথাটির সার্থক অর্থ

* স্কুল ফাইনাল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নয়।

হইল 'ভার'; (খ) 'খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক **ঝুঁকিয়া** পড়িল—এখানে 'ঝুঁকিয়া' কথাটির অর্থ 'দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। (গ) কোন্ কালে যে, কেউ তা **ঠাহর** করিতে পারে নাই। এখানে 'ঠাহর' কথাটির অর্থ হইল 'নির্ণয়'।

বিদেশী শব্দ: হদ্দমুদ্দ—আরবী কথা। তলব—আরবী। সাবাস—ফারসী কথা। খবরদারি—ফারসী। তন্‌খা—বেতন—ফারসী। বালাখানা—ফারসী। ওদারক—আরবী। দস্তুর—ফারসী। কোতোয়াল—ফারসী। হুঁশিয়ারী—ফারসী।

অলঙ্কার: বাহিরে নব-বসন্তের দক্ষিণ-হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।—সমাসোক্তি'।

ব্যাকরণগত টীকা : টানাটানি—'পরস্পর টানা' এই অর্থে টানাটানি' কথাটি বিশেষ্য। তবে এখানে ইহার বিশেষ অর্থ হইতেছে 'অভাব'। **সম্বন্ধীরা**—সম্বন্ধ+ইন্= **সম্বন্ধী,** অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে এই অর্থে; কিন্তু বাঙলায় কেবলমাত্র শ্যালক' এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ।

অনুশীলনী

১। নিম্নের উদ্ধৃত অংশটির উক্তি পরিবর্তন:

রাজা ভাগিনাকে বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি" (প্রত্যক্ষ উক্তি)। রাজা ভাগিনাকে বলিলেন পাখিটাকে একবার আনিতে, তিনি দেখিবেন (পরোক্ষ উক্তি)। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ:

শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ; সোনার হার পারল; কান-মলা সর্দার।

৩। বিশিষ্টার্থ প্রদর্শনপূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর:

'মুখ হাঁড়ি করা' 'তলব করা', 'গলাছাড়া', 'ঠাহরকরা'।

৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (পৃঃ ৯৮-১০৪)

সন্ধি: চতুপার্শ্বস্থ—চতুঃ+পার্শ্বস্থ। আবির্ভাব—আবিঃ+ভাব। নিষ্প্রভ—নিঃ+প্রভ। পুরুষানুক্রমে—পুরুষ+অনুক্রমে। কারণানুসন্ধানে—কারণ+অনুসন্ধানে। বক্ষঃ-স্থল—বক্ষ (স্) স্থল বিকল্পে 'বক্ষস্থল'। নিষ্করণ—নিঃ+করণ।

সমাস: অণুবীক্ষণ—অণুবীক্ষণ করা হয় অর্থাৎ লক্ষ্য করা হয় ইহার দ্বারা (উপপদ তৎপুরুষ)। বিদ্যাসাগরের—বিদ্যার সাগর (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাঁহার। যন্ত্র-স্বরূপ—যন্ত্রই স্বরূপ যাহার (বহুব্রীহি)। অহোরাত্র—অহঃ ও রাত্রি (দ্বন্দ্ব সমাস)। আত্মনির্ভরশক্তির—আত্মাতে নির্ভর (সপ্তমী তৎপুরুষ); তাহাই শক্তি (কর্মধারয় সমাস)।

তাহার। কঠোর-কঙ্কালবিশিষ্ট—কঠোর কঙ্কাল (কর্মধারয়); তাহার দ্বারা বিশিষ্ট (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা—প্রাণিবিষয়ক তত্ত্ব (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহা জানে যাঁহারা (উপপদ তৎপুরুষ), তাঁহারা। পাশ্চাত্ত্যজাতিসুলভ—পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি (কর্মধারয়); তাহাতে সুলভ (সপ্তমী তৎপুরুষ)। চরিত্রগঠন—চরিত্রের গঠন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। পুরুষানুক্রমে—পুরুষের অনুক্রম (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। উপলক্ষমাত্র—উপলক্ষই মাত্র (নিত্যসমাস)। বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে—বিধবাদের বিবাহ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহাই ব্যাপার (কর্মধারয়), তাহাতে। রোদন-প্রবণতা—রোদনে প্রবণতা। (সপ্তমী তৎপুরুষ)। মনুষ্যচরিত্র—মনুষ্যের চরিত্র—(ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। করুণামন্দাকিনী—করুণারূপ মন্দাকিনী (রূপক কর্মধারয়)। ঋণগ্রস্ত—ঋণের দ্বারা গ্রস্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) কিন্তু পিতা পিতামহ হইতে তাঁহার **ধাতুতে মজ্জাতে ও শোণিতে** এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন……দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (অধিকরণে সপ্তমী)। (খ) **ইহার জন্য তাঁহাকে** কখনও ঋণ স্বীকার করিতে হয় নাই। ইহার জন্য (শব্দযোগে ষষ্ঠী); তাঁহাকে (কর্তায় প্রথমা)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) ঃ অব্যাহত—নঞ্—বি√হন্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। দণ্ডায়মান—দণ্ড+ষঙ্ (নামধাতু)+শানচ্। বর্তমান—বৃৎ+শানচ্ (কর্তৃবাচ্যে)। আনুকূল্য—অনুকূল+ষ্ণ্য (ভাবার্থে)। সাদৃশ্য—সদৃশ+ষ্ণ্য (ভাবার্থে) আত্যন্তিক—অত্যন্ত+ইক (স্বার্থে প্রত্যয়)। বহমানা—√বহ্+শানচ্ (কর্তৃবাচ্যে) +আ। নমিত—√নম্+ণিচ্+ত (কর্মবাচ্যে)।

পদান্তর ঃ ক্ষুদ্র (বিশেষণ) ক্ষুদ্রতা (বিশেষ্য)। অতিক্রম (বিশেষ্য) অতিক্রান্ত (বিশেষণ)। সমাবেশ (বিশেষ্য) সমাবিষ্ট (বিশেষণ)। অভিমান (বিশেষ্য) অভিমানী (বিশেষণ)। বৈপরীত্য (বিশেষ্য) বিপরীত (বিশেষণ)।

অলঙ্কার ঃ এই চতুপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।—উপমা।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ অণুবীক্ষণ (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) অণুবীক্ষণ করা হয় অর্থাৎ লক্ষ্য করা হয় ইহার দ্বারা উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যে উপপদ তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে সাধারণতঃ শেষ পদটি 'যে' বা 'যাহা' (ক্ষেত্রবিশেষে বহুবচনও হইতে পারে) অর্থাৎ প্রথমান্ত হইলেও, এস্থলে শেষ পদ তৃতীয়ান্ত 'ইহার দ্বারা'।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পদান্তর পূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর :—

নির্মিত, পরিচিত, অভিভূত, অতিক্রম, অভিমান, দর্প, সমাবেশ, বিস্তার, বৈপরীত্য, প্রতীয়মান বিস্তার, ক্ষুদ্র, সাদৃশ্য।

২। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ : কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্য ; সীতার বনবাস, বিধবা বিবাহ। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :—

অহোরাত্র, অব্যাহত, নিষ্প্রভ, পুরুষ, আনুকূল্য, অনুরাগ, কুলশীল, বৈরাগ্য, বিগলিত, অগোচর, বহমানা, দণ্ডায়মান, বর্তমান, রোদন-প্রবণতা।

৭। মন্ত্রশক্তি (পৃঃ ১১৩-১১৮)

সন্ধি : জোড়াসন—জোড + আসন। বিদ্যুদ্‌বেগে—বিদ্যুৎ + বেগে। দীর্ঘাকৃতি—দীর্ঘ + আকৃতি। সর্বাঙ্গে—সব + অঙ্গে। দিগ্বিজয়ী—দিক্ + বিজয়ী।

সমাস : মন্ত্রশক্তি—মন্ত্ররূপ শক্তি (রূপক কর্মধারয়)। চণ্ডীমণ্ডপ—চণ্ডীর (দুর্গাপূজার) মণ্ডপ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। সৈন্যসামন্ত—সৈন্য ও সামন্ত (দ্বন্দ্বসমাস) সবসেরা—সবের সেরা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) অথবা সবের মধ্যে সেরা (সপ্তমী তৎপুরুষ)। লাঠিখেলা—লাঠি দিয়া খেলা (তৃতীয়া তৎপুরুষ) বিশ পঁচিশ—বিশ বা পঁচিশ (বহুব্রীহি)। দিনেদুপুরে—দিনে ও দুপুরে (অলুক দ্বন্দ্ব সমাস)। ছেলেখেলা—ছেলেদের খেলা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। জোড়াসন—জোড় আসন যাহাতে (বহুব্রীহি)। দীর্ঘাকৃতি—দীর্ঘ হইয়াছে আকৃতি যাহার (বহুব্রীহি)। নাড়ীভুঁড়ি—নাড়ী ও ভুঁড়ি (দ্বন্দ্ব সমাস) লাঠিবৃষ্টি—লাঠির বৃষ্টি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। **মন্তর-তন্তর** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)। —মন্ত্র এবং তন্ত্র (সমজাতীয় শব্দে দ্বন্দ্ব সমাস)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) এমন সময় নায়েববাবু আমাকে **কানে কানে** বললেন—(অধিকরণে সপ্তমী)। (খ) একদিন এরা **রাতদুপুরে** আমার বাড়ী চড়াও হয়ে—(অধিকরণে সপ্তমী)। (গ) তারা **পরস্পর** পরামর্শ করে বললে, (পরস্পর—ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **:** ব্যবস্থা—বি + অব + √স্থা + অঙ্ (ভাববাচ্যে) + আপ্। প্রজা—প্র + জন্ + অ (কর্তৃবাচ্যে) + আপ্। আদেশ—আ + √দিশ্ + অ (ভাববাচ্যে)। অক্ষত—নঞ্—√ক্ষণ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

পদান্তর : লেঠেল (বিশেষণ) লেঠেলি (বিশেষ্য)। বিশেষ (বিশেষ্য) বিশিষ্ট

(বিশেষণ)। খুনে (বিশেষণ) খুন (বিশেষ্য)। পরামর্শ (বিশেষ্য) পরামৃষ্ট (বিশেষণ)। সর্দার (বিশেষ্য) সর্দারী (বিশেষণ)। সিঁদুর (বিশেষ্য) সিঁদুরে (বিশেষণ)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : সে 'হাঁ' 'না' কিছুই উত্তর করলে না (নেতিবাচক)—সে সম্পূর্ণ নিরুত্তর রহিল (অস্তিবাচক)। ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞাসা করলেই টের পাবেন—কর্তৃবাচ্য। ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞাসা করলেই টের পাওয়া যাবে।—কর্মবাচ্য।

ব্যাকরণগত টীকা : মন্তর-তন্তর (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—মন্ত্র-তন্ত্র> মন্তর-তন্তর—স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের উদাহরণ। **সুমুখ**= সম্মুখ<সুমুখ—অর্ধতৎসম শব্দ। **এগোয়, পিছোয়**—দুইটিই নাম ধাতুর উদাহরণ।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টির দ্বারা বাক্য রচনা কর :

এক হাত খেলা, বাড়ি চড়াও হওয়া, রেগে আগুন হওয়া, মাথায় খুন চড়ে যাওয়া, সে কথা ভাঙি কী করে, ঘা মারা।

২। সাধু ভাষায় লিখ :

'হুজুর জানতুম ছোকরা-বয়সে। তারপর আজ বিশ-পঁচিশ বছর লাঠিও ধরি নি, লকড়িও ধরি নি, সড়কিও ধরি নি ; তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি-সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কী করে ? হুজুরের হুকুম হলে আমি না বলতে পারি নে, তবে—হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।'

৩। পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরিত কর :

(ক) সে উত্তর করলে হুজুর···করবেন না (পৃঃ ১১৪)

৮। * ভাগ্যবিচার (পৃঃ ১১৯-১২৭)

সন্ধি : নমস্কার—নমঃ+কার। সিংহাসন—সিংহ+আসন। বীরাসনে—বীর+ আসনে। সূর্যোদয়—সূর্য+উদয়। নির্বাসন—নিঃ+বাসন। নির্বোধ—নিঃ+বোধ। নির্ভয়—নি+ভয়। রাজ্যেশ্বর—রাজ্য+ঈশ্বর। দুর্বল—দুঃ+বল।

সমাস : চারণীমন্দিরের—চারণীর মন্দির (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। সিদ্ধিকরী—সিদ্ধি করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। সন্ধ্যাপূজা—সন্ধ্যাকালীন পূজা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। ভরসন্ধ্যে—ভর (পরিপূর্ণ) যে সন্ধ্যা (কর্মধারয়)। সিংহাসন—সিংহ চিহ্নিত-আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। বাঘছাল—বাঘের ছাল (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

*স্কুল ফাইনাল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নহে।

বীরাসন—বীরের আসন (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কাঁচামাটির—কাঁচা যে মাটি (কর্মধারয়), তাহার। দেওয়াল-ঘেরা—দেওয়াল দিয়া ঘেরা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। অন্দর মহল—অন্দরস্থিত মহল (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। ক্ষতবিক্ষত—ক্ষত এবং বিক্ষত (কর্মধারয়)। প্রতিজ্ঞাপত্র—প্রতিজ্ঞাসূচক পত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। শয়নঘর—শয়নের জন্য ঘর (চতুর্থী তৎপুরুষ)। চিতোর-মুখো—চিতোরের মুখো (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটা উঠোনের মাঝে **তেঁতুলতলায়** দাঁড়িয়ে খানিক শুকনো ঘাস চিবোচ্ছে আরামে—(অধিকরণে সপ্তমী)। পৃথ্বীরাজ নিজের **তলোয়ার** ছুঁয়ে শপথ করলেন—(কর্মে শূন্য বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : সিদ্ধিকরী—সিদ্ধি√কৃ+ট+ঈ। যোগিনী—যোগ+ইন্+ঈ। ছেঁড়া—(ছিড়)+আ। গণনা—গন্+অনট্ (ভাববাচ্যে)+আপ্। স্বপ্ন—√স্বপ্+নঙ্ (ভাববাচ্যে)। আক্রমণ—আ+√ক্রম্+অনট্ (ভাববাচ্যে)। অদৃশ্য—নঞ্√দৃশ্+ক্যপ(কর্মবাচ্যে)। ব্যাপার—বি+আ+√পৃ+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)।

পদান্তর : নমস্কার (বিশেষ্য) নমস্কৃত (বিশেষণ)। আক্রমণ (বিশেষ্য) আক্রান্ত (বিশেষণ)। বিশ্রাম (বিশেষ্য) বিশ্রান্ত (বিশেষণ)। প্রতিজ্ঞা (বিশেষ্য) প্রতিজ্ঞ (বিশেষণ)। আশ্রয় (বিশেষ্য) আশ্রিত (বিশেষণ)। বিদ্রোহী (বিশেষণ) বিদ্রোহ (বিশেষ্য)। বীরত্ব (বিশেষ্য) বীর (বিশেষণ)।

বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টি : ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে (অর্থাৎ নিতান্ত দরিদ্র হইয়াও)। চোখ বুজলেই=মরিলেই। গায়ে হাত তোলে=প্রহার করে।

ব্যাকরণগত টীকা : ঘনিয়ে—ঘন (বিশেষণ)+আ অর্থাৎ ঘনা নামধাতু); ঘনা+ইয়া=ঘনাইয়া (সাধুভাষায়), চলিত ভাষায় ঘনিয়ে। ইহা নামধাতুজাত ক্রিয়ার উদাহরণ। **বেরিয়েছে**—বাহির-এর চলিতরূপ 'বের'; বিনা প্রত্যয়ে নামধাতুতে পরিণত হইয়া ইহা ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছে।

অনুশীলনী

১। উক্তি পরিবর্তন কর :

(ক) বিন্দা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রাজপুত্রকে দেখেই বলে উঠলেন, "একি এমন দশা আপনার কে করলে ?" (খ) পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধরে খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে বললেন, "ভয় নেই, কেমন আছ তাই জানতে এলাম।"

২। সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

পৃথ্বীরাজ তখন অনেক দূরে কমলমীরে......এসে পড়লেন। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ পৃঃ ১২৪-১২৫)।

৩। মোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণসংক্রান্ত টীকা লিখ :

(ক) তিনি যে মাটিতে বসেছিলেন সেই মাটিতে **সাষ্টাঙ্গ** হয়ে প্রণাম করলেন।

(খ) একদিন তারাবাঈকেও দেখলেন—ঘোড়ায় চড়ে ধনুর্বাণ হাতে শিকারে চলেছেন—যেন **দেবী দুর্গা**!

৯। **নতুন-দা** (পৃঃ ১২৮-১৩৮)

সন্ধি : নিরুৎসাহ—নিঃ+উৎসাহ। অসজ্জন—অসৎ+জন। মনোগত—মনঃ+গত। নিরর্থক—নিঃ+অর্থক। প্রত্যুৎত্তর—প্রতি+উত্তর।

সমাস : আগাগোড়া—আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব)। স্বার্থপর—স্বার্থ-ই পর (বহুব্রীহি)। অতলস্পর্শী—তলস্পর্শ করে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ) ; নয় তলস্পর্শী (নঞ্ তৎপুরুষ)। অপ্রতিভ—ন (=নাই) প্রতিভা যাহার (বহুব্রীহি)। জনশূন্য—জনদ্বারা শূন্য (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। কন্যাদায়গ্রস্ত—কন্যাই দায় (কর্মধারয়) ; তাহার দ্বারা গ্রস্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। আকণ্ঠ নিমজ্জিত—কণ্ঠ পর্যন্ত=আকণ্ঠ (অব্যয়ীভাব) ; আকণ্ঠ নিমজ্জিত (কর্মধারয়)। তুষারশীতল—তুষারের—ন্যায় শীতল (উপমান কর্মধারয়)। ব্যাঘ্রকবলিত—ব্যাঘ্র দ্বারা কবলিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি : আমাদের সাধের **ডিঙিটাকে** তিনি 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া, ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া, আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক **সাবধানে** নৌকার **মাঝখানে** জাঁকিয়া বসিলেন। ডিঙিটাকে—কর্মে দ্বিতীয়া ; সাবধানে—ক্রিয়া বিশেষণে 'এ' বিভক্তি ; মাঝখানে—অধিকরণে সপ্তমী।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল—ইন্দ্রের নিজেরও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে লজ্জা ও ক্ষোভ হইয়াছিল ('ইন্দ্র'কে সম্বন্ধপদরূপে ব্যবহার করিয়া)। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)। বালির উপর দৌড়ানো যায় না—বালির উপর কেহ দৌড়াইতে পারে না (বাচ্যান্তর)। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **:** প্রশস্ত—প্র+√শন্স্+য (কর্মবাচ্যে। বিস্তৃতি—বি+√স্তৃ+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। নিযুক্ত—নি+√যুজ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। আকর্ষণ—আ+√কৃষ্+অনট্ (ভাববাচ্যে)। ব্যাপকতা—বি+√আপ্+ণক্ (কর্তৃবাচ্যে) +তা (ভাববাচ্যে)। চীৎকার—চীৎ (চী)+√কৃ+অ (ভাববাচ্যে)।

পদান্তর : গঙ্গা (বিশেষ্য) গাঙ্গেয় (বিশেষণ)। সতর্কতা (বিশেষ্য) সতর্ক (বিশেষণ)। ব্যাকুল (বিশেষণ) ব্যাকুলতা (বিশেষ্য)। স্বার্থপর (বিশেষণ) স্বার্থপরতা (বিশেষ্য)। প্রসঙ্গ (বিশেষ্য) প্রাসঙ্গিক (বিশেষণ)। উপদ্রব (বিশেষ্য) উপদ্রুত (বিশেষণ)। পরিণত (বিশেষণ) পরিণতি, পরিণাম (বিশেষ্য)।

শব্দ-প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য : (সিল্কের **মোজা** চকচকে **পাম্প-শু** আগাগোড়া **ওভারকোটে** মোড়া, গলায় গলবন্ধ, হাতে **দস্তানা** মাথায় টুপি। (খ) তা হ'লে ছোটোলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাই নে। (গ) দর্জিপাড়ার বাবু হাত-তালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন—"**ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা**—"

ব্যাকরণগত টীকা : যাচ্চেতাই (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—যা+ইচ্ছা তাই (বাঙলা স্বরসন্ধি)। লক্ষণীয় 'যা ইচ্ছে তাই' এবং 'যাচ্ছেতাই' অর্থের দিক হইতে প্রকৃতপক্ষে এক নয় ; 'যা ইচ্ছে তাই' এর অর্থ হইতেছে 'যা খুশি তাহা, আর 'যাচ্ছেতাই' শব্দের অর্থ হইল কদর্য বা নিকৃষ্ট।

অলঙ্কার : শীতটা যেন ছুঁচের মতো গায়ে বিঁধিতেছিল—উপেক্ষা।

অনুশীলনী

১। নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলিকে পরিবর্তিত কর :

(ক) ভাগ্যে এমন-সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে (কদাচিত শব্দ প্রয়োগ না করিয়া নেতিবাচক কর। (উচ্চতর মাধ্যমিক্ষ ১৯৬০)।

উত্তর—ভাগ্যে এমন সব নমুনা সর্বদা চোখে পড়ে না।

২। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টি দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :

'বিগড়াইয়া যাওয়া', 'গন্ধে ভূত পালায়' 'ঠায় বসিয়া থাকা', 'জলের মতো চোখে পড়া', 'নিমোনিয়া করা' 'বাতাস পড়িয়া গেলে'।

১০। কৌরবসভায় কৃষ্ণ (পৃঃ ১৩৮-১৪৩)

সন্ধি : নিদাঘান্তে—নিদাঘ+অন্তে। নিরপরাধ—নিঃ+অপরাধ। সদবংশীয় সৎ+বংশীয়। দুরাত্মা—দুঃ+আত্মা। সর্বাগুণান্বিত—সর্বগুণ+অনু+ইত। প্রত্যাখ্যান—প্রতি+আখ্যান। আনন্দাশ্রু—আনন্দ+অশ্রু।

সমাস : গভীরকণ্ঠে—গভীরকণ্ঠ যাহাতে (বহুব্রীহি)। প্রকৃতিস্থ—প্রকৃত থাকেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। ধর্মসংগত—ধর্মকে সংগত (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। নিরপরাধ—নির্ (=নাই) অপরাধ যাহার (বহুব্রীহি)। পুরুষশ্রেষ্ঠ—পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (সপ্তমীতৎপুরুষ)। নষ্টকীর্তি—নষ্ট হইয়াছে কীর্তি যাহা দ্বারা (বহুব্রীহি সমাস)। মহাপ্রাজ্ঞ—মহান্ যে প্রাজ্ঞ (কর্মধারয় সমাস)। ঐশ্বর্যভ্রষ্ট—ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট (পঞ্চমী-তৎপুরুষ)। দূরদর্শিনী—দূরের বস্তু দর্শন করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। স্নেহসম্বন্ধ—স্নেহের সম্বন্ধ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। অনাদর—নাই আদর (নঞ্ তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) তুমিই **ওই দুর্বুদ্ধিকে** বোঝাবার চেষ্টা কর—(ওই—বিশেষণ, দুর্বুদ্ধিকে—কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি)। (খ) তোমরা **কেবল আমাকেই** দোষ দাও, পাণ্ডবদের দেখ না (কেবল—ক্রিয়া বিশেষণে শূন্য বিভক্তি); (আমাকেই—গৌণ সম্প্রদানে দ্বিতীয়া বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : কৌরব—কুরু+ষ্ণ (অপত্যার্থে)। যত্নবান—যত্ন +মতুপ্ (=বতুপ্) প্রত্যয় (অস্ত্যর্থে)। নিগ্রহ—নি√গ্রহ+অপ্ (ভাববাচ্যে) আশ্চর্য—আ+√চর্+য। প্রত্যাখ্যান—প্রতি+আ+√খ্যা+অনট্ (ভাববাচ্যে)। পরাস্ত—পরা+√অস্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

পদান্তর : সম্বোধন (বিশেষ্য) সম্বোধিত (বিশেষণ)। ব্যবহার (বিশেষ্য) ব্যবহৃত, ব্যবহার্য (বিশেষণ)। যত্নবান (বিশেষণ) যত্ন (বিশেষ্য)। শোক (বিশেষ্য) শোকার্ত (বিশেষণ)। ঈর্ষান্বিত (বিশেষণ। ঈর্ষা (বিশেষ্য। নির্যাতন (বিশেষ্য) নির্যাতিত (বিশেষণ)। অনুগত (বিশেষণ) আনুগত্য (বিশেষ্য)। দূরদর্শি (বিশেষণ) দূরদর্শিতা (বিশেষ্য)। ধর্মনাশক (বিশেষণ) ধর্মনাশ (বিশেষ্য)। কুসঙ্গী (বিশেষণ) কুসঙ্গ (বিশেষ্য)।

অলঙ্কার : পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত দেখে এই রাজরা সকলে আনন্দাশ্রু মোচন করুন।—রূপক।

অনুশীলনী

১। উক্তি পরিবর্তন কর :

'দুঃশাসন দুর্যোধনকে বলিলেন, রাজা, আপনি যদি সন্ধি না করেন, তবে ভীষ্ম, দ্রোণ ও পিতা আপনাকে আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন ক'রে পাণ্ডবদের হাতে দেবেন।'

২। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর : নিষ্ঠুর, রক্ষক, ধর্মজ্ঞ, হিতকর, মহিপাল, পরিমাণ।

৩। অলঙ্কার নির্ণয় কর :

নিদাঘান্তে মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীরকণ্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন ক'রে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না হয় তারজন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি।

৪। ব্যাকরণসংক্রান্ত টীকা-টিপ্পনী লিখ :

ভরতনন্দন, জতুগৃহ দাহ (স্কুল ফাইনাল ১৯৫৯); কপট দূত (স্কুল ফাইনাল কমপার্ট ১৯৫৯-৬০); ইন্দ্রপ্রস্থ (স্কুল ফাইনাল কমপার্ট ১৯৫৯)।

১১। স্বাধীনতালাভের পরে (পৃঃ ১৪৯-১৬১)

সন্ধি : নিশ্চিন্ত—নিঃ+চিন্ত। যুধিষ্ঠির—যুধি+স্থির। শরদভ্রচ্ছায়া—শরদ্ (ত) +অভ্র+ছায়া। ফলাফল—ফল+অফল। ভেদাত্মিকা—ভেদ+আত্মিকা। বিপজ্জনক —বিপদ্+জনক। ব্যত্যয়—বি+অতি+অয়। পৌরুষাভিমান—পৌরুষ+অভিমান। বিপৎসঙ্কুল—বিপদ্+সঙ্কুল।

সমাস ঃ দেশনেতারা—দেশের নেতারা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। বহুপ্রাণহানিজনিত—বহুপ্রাণ (কর্মধারয়)। বহুর প্রাণ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহাদিগের হানি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহা দ্বারা জনিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। অবসাদগ্রস্ত—অবসাদ দ্বারা গ্রস্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। শরদভ্রচ্ছায়া—শরতের অভ্র (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার ছায়া (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। গণতন্ত্রবিরোধী—গণতন্ত্রের বিরোধী (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ; গণ-নিয়ন্ত্রিততন্ত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)। বিদ্যানুশীলন—বিদ্যার অনুশীলন (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। মানবজমিন—মানবরূপ জমিন (রূপক কর্মধারয় সমাস)।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ সব্যসাচী নেতগণ এক **হাতে** জাতিগঠন অন্য হাতে জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম,করিতেছিলেন (হাতে—অধিকরণে সপ্তমী)। (খ) সময়নিষ্ঠার অভাবে আমরা 'হায়' 'হায়' **ধ্বনি** শুনিতে পাই (ধ্বনি—কর্মে শূন্য বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **ঃ** অঙ্গীভূত—অঙ্গ + চ্বি (= অঙ্গী) অঙ্গী√ + ভূ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। সংস্থাপিত—সম + √স্থা + ণিচ্ + ক্ত)। শৈথিল্য—শিথিল + য (ভাববাচ্যে)। ইদানীন্তন—ইদম্ + দানীম্ = ইদানীম্ + তন। মূঢ়তা—√মুহ্ + ক্ত = মূঢ় + তা (ভাববাচ্যে)। ব্যাধি—বি + আ + √ধা + ই (কর্তৃবাচ্যে)। সার্বজনীন—সর্বজন + ঘঞ্ (= ঈন ; সম্বন্ধ অর্থে)। আস্ফালন—আ + √স্ফল্ + ণিচ্ + অনট্ (ভাববাচ্যে)। উৎসাহ—উৎ + √সহ্ + অ (ভাববাচ্যে)।

পদান্তর ঃ অবসান (বিশেষ্য) অবসিত (বিশেষণ)। শৈথিল্য (বিশেষ্য) শিথিল (বিশেষণ)। নির্বাচিত (বিশেষণ) নির্বাচন (বিশেষ্য)। আতিশয্য (বিশেষ্য) অতিশয় (বিশেষণ)। উপদ্রব (বিশেষ্য) উপদ্রুত (বিশেষণ)। স্বাতন্ত্র্য (বিশেষ্য) স্বতন্ত্র (বিশেষণ)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ জাতিগঠনের ব্রত অসমাপ্ত হইয়া আছে (অস্ত্যর্থক)—জাতি গঠনের ব্রত সমাপ্ত হয় নাই (নঞর্থক)। সমাজের বা জাতির যাহাতে মঙ্গল হয় এমন সকল কাজে বিবিধ বিরোধী দলের সহযোগিতাই বাঞ্ছনীয় (সরল বাক্য)। কেবল রাষ্ট্রগত স্বাধীনতাই পূরা স্বাধীনতা নয় (নঞর্থক)—রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা আংশিক স্বাধীনতা মাত্র (অস্ত্যর্থক)।

অনুশীলনী

১। লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ বয়স্ক, দেশপ্রেমিক, আরোহী, বিরোধী।

২। পদান্তরে পরিবর্তিত কর ঃ অবসান, চরিত্র, মূঢ়, উদ্‌বর্তন, বশ্যতা, সমকক্ষ, সামরিক, সাংঘাতিক, বিরোধী, বশ্যতা।

৩। ব্যাকরণগত টীকা-টিপ্পনী লিখ ঃ ঘটনাচক্রের উদ্‌বর্তনে ; 'মানুষের প্রাণের ঠাকুর' ; পাদুকায়ুধ গৃহস্থেরা ; যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ। পৌরুষ-চৈতন্য ; মানবজমিন।

INTERMEDIATE BENGALI SELECTION

পদ্যাংশ (একাদশ শ্রেণী)

১। ফুল্লরার বারমাস্যা (পৃঃ ৪-৮)

সন্ধি ঃ নিরামিষ—নির্+আমিষ। সিতাসিত—সিত+অসিত।

সমাস ঃ দুঃখবাণী—দুঃখের বাণী (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। নিরামিষ—নির্ (=নাই) আমিষ যাহার (বহুব্রীহি)। নবমেঘে—নব যে মেঘ (কর্মধারয়), তাহাতে। গৃহস্থ—গৃহে থাকে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। তনূনপাৎ—তনুকে পতিত করে না যাহা (উপপদ তৎপুরুষ)। দিবসরজনী—দিবস ও রজনী (দ্বন্দ্ব সমাস)। সিতাসিত—সিত ও অসিত (দ্বন্দ্ব সমাস)। বন্ধুজন—বন্ধুই জন (কর্মধারয়)। বনিতাজনম—বনিতার জনম (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কর্মফল—কর্মের ফল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

সাধু গদ্যরূপ ঃ এড়িয়া—ছাড়িয়া, রাখিয়া। নারি—পারি না। করয়ে—করে। বরিষে—বর্ষা। নিরমিল—নির্মাণ করিল। পিয়ে—পান করে। আদরে—আদর। সবাকার—সকলের।

কারক ও বিভক্তি ঃ বৃষ্টি হইলে **কুঁড়্যায়** ভাসিয়া যায় বান। (অধিকরণে সপ্তমী)। **ধূলিভয়ে** নাহি মেলে শয়নে **নয়ন**। (ধূলিভয়ে—হেতু অর্থে 'এ' বিভক্তি) (নয়ন—কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি Derivation) **ঃ** অবধান—অব+√ধা+অনট্ (ভাববাচ্যে)। নিযুক্ত—নি+√যুজ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। বিপাক—বি+√পচ্+ঘঙ্ (ভাববাচ্যে)। উপবাস—উপ√+বস্+অ (ভাববাচ্যে)। মধুকর—√মন্+উ (করণবাচ্যে)= মধু; মধু কৃ+ট (কর্তৃবাচ্যে)। অবধান—অব+√ধা+অন (ভাববাচ্যে) **বিদ্যমান**—বিদ্ (দিবাদিগণীয় সংস্কৃত ধাতু)+শানচ্ (কর্তৃবাচ্যে)।

পদান্তর ঃ সর্বলোক (বিশেষ্য) সার্বলৌকিক (বিশেষণ)। উপবাস (বিশেষ্য) উপবাসী, উপোসিত (বিশেষণ)। অবধান (বিশেষ্য) অবহিত (বিশেষণ)। দুর্গতি (বিশেষ্য) দুর্গত (বিশেষণ)। লোক (বিশেষ্য) লৌকিক (বিশেষণ)।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ **আদরে**—বিশেষ্য 'আদর' বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু হইয়া ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া ইহা নামধাতুজ ক্রিয়ার উদাহরণ। **ব্যাধিনী**—'ব্যাধ' ইহার শুদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গরূপ হইল 'ব্যাধী'; কিন্তু বাঙলায় 'ইনী' প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করার একটা ঝোঁক থাকায় 'ব্যাধিনী' করা হইয়াছে।

অলঙ্কার ঃ (ক) বৈশাখে অনল-সম বসন্তের খর। (খ) মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ। তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।—উপমা (গ) মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।—অনুপ্রাস।

বাক্য-রচনা ঃ বনিতা—অলঙ্কার না থাকিলে বনিতার সুন্দর মুখখানিও সুন্দর দেখায় না। বিপাক—কর্মের বিপাকে কেহ দুঃখ ভোগ করে আবার কেহ বা সুখ পাইয়া থাকে।

অনুশীলনী

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :—

নিরামিষ ; সিতাসিত ; কিরাতনগর ; বনিতাজনম ; মাটিয়া-পাথর ; জানু-ভানু কৃশানু।

২। বাক্য বিশ্লেষণ কর : (ক) কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়। (খ) কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী।

২। বৃত্রাসুর ও রুদ্রপীড় (পৃঃ ৬০-৬১)

সন্ধি ঃ আচ্ছাদিয়া—আ+ছাদিয়া। অস্তোদয়—অস্ত+উদয়। অহরহঃ—অহঃ+অহঃ। বহির্দেশ—বহিঃ+দেশ। যশোদীপ—যশঃ+দীপ। যশোলিপ্সা—যশঃ+লিপ্সা। দনুজেশ্বর—দনুজ+ঈশ্বর। যশোরাশ্মি—যশঃ+রশ্মি। প্রজ্জ্বল—প্র+উজ্জ্বল। যশোবিমণ্ডিত—যশঃ+বিমণ্ডিত।

সমাস ঃ দেব-অনীকিনী—দেবের অনীকিনী (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। অস্তোদয়—অস্ত ও উদয় (দ্বন্দ্ব সমাস)। সমরবহ্নি—সমররূপ বহ্নি (রূপক কর্মধারয়)। সুদৃঢ়সঙ্কল্প—সুদৃঢ় সঙ্কল্প (কর্মধারয়)। স্বর্গবহির্দেশে—স্বর্গের বহির্দেশ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহাতে। মত্তমাতঙ্গ—মত্ত যে মাতঙ্গ (কর্মধারয়)। চিররণজয়ী—চিরকাল ব্যাপিয়া রণ (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ) ; তাহা জয় করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। বসুন্ধরাবাসিগণে—বসুন্ধরায় বাস করে যে (উপপদ তৎপুরুষ) ; তাহাদের গণ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। যশোলিপ্সা—যশের জন্য লিপ্সা (চতুর্থী তৎপুরুষ)। যশোবিমণ্ডিত—যশের দ্বারা বিমণ্ডিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। সন্দেশবহ—সন্দেশ (সংবাদ) বহন করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। তড়িৎগমনা—তড়িতের ন্যায় দ্রুত গমন যাহার (উপমান-গর্ভ বহুব্রীহি), তাহা (স্ত্রীলিঙ্গে)। ক্ষুণ্ণমতি—ক্ষুণ্ণমতি যাহার (বহুব্রীহি)।

কারক ও বিভক্তি ঃ সসাগরা **বসুন্ধরা** যুদ্ধে করি জয় ; (কর্মে শূন্য বিভক্তি)। **সুখ চিত্তে** মন হায় রে উত্থিত। যথাক্রমে (সুখ—কর্তায় প্রথমা), চিত্তে—অধিকরণে সপ্তমী বিধেয় বিশেষণ)।

সাধু গদ্যরূপ : আচ্ছাদিয়া—আচ্ছাদন (বা আচ্ছাদিত) করিয়া। বিদারি—বিদীর্ণ করিয়া। সম্ভাষি—সম্ভাষণ করিয়া। জিনিয়া—জয় করিয়া। দানিলা—দান করিলেন। নিবেদি—নিবেদন করি। দেহ—দাও। মণ্ডিবেন—মণ্ডিত করিবেন। শিরসে—শিরে। বিন্যাসিয়া—বিন্যাস করিয়া। নারি—পারি না। পশি—প্রবেশ করি। নারিলা—পারিল না। নিরখিয়া—নিরীক্ষণ করিয়া। প্রবেশিতে—প্রবেশ করিতে। চিতে—চিত্তে।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : সন্নিহিত—সম্+নিহিত (কর্মবাচ্যে)। প্রভা—প্র+√ভা+অঙ্ (ভাববাচ্যে)। দৈত্য—দিতি+ষ্ণ্য। আকুল—আ+√কুল্+অ (কর্তৃবাচ্যে)। দনুজ—দনু+√জন্+অ। বিধারিত—বি√ধা+ক্ত। (কর্মবাচ্যে)। আঘাত—আ+√হন্+অঞ্ (ভাববাচ্যে)। পরাক্রম—পরা+√ক্রম্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। নিবেদি—নি+√বেদ্+ণিচ্। মহাদম্ভী—মহাদম্ভ+ইন্ (আছে অর্থে)। শঙ্কিত—√শনক্+অ (ভাববাচ্যে)+আ=শঙ্কা+ইতচ্ (জাতার্থে)।

পদান্তর : প্রদীপ (বিশেষণ) প্রদীপ্ত (বিশেষ্য)। অনিশ্চয় (বিশেষ্য) অনিশ্চিত (বিশেষণ)। আঘাত (বিশেষ্য) আহত (বিশেষণ)। পরাক্রম (বিশেষ্য) পরাক্রান্ত (বিশেষণ)। বিধাবিত (বিশেষণ) বিধাবন (বিশেষ্য)। প্রসারিত (বিশেষণ) প্রসারণ (বিশেষ্য)। জটিল (বিশেষণ) জটিলতা (বিশেষ্য)। বিচিত্র (বিশেষণ) বৈচিত্র্য (বিশেষ্য)। বৃংহতি (বিশেষণ) বৃংহন (বিশেষ্য)। সন্নিহিত (বিশেষণ) সন্নিধান (বিশেষ্য)।

ব্যারণগত টীকা : **কলঙ্কিয়া**—কলঙ্ক বিশেষ্য, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু। **উজলিয়া**—উজল>উজ্জ্বল বিশেষণ, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু। **বিন্যাসিয়া**—বিন্যাস বিশেষ্য, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতুজ ক্রিয়া ; ইহারা একমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হয়।

অলঙ্কার : (ক) জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ—রূপক। (খ) খেদাইলা দেববৃন্দে পাতাল পুরীতে শশকবৃন্দের মত—উপমা।

বাক্য-রচনা : চিরস্মরণীয় : কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে চিরস্মরণীয়। জলবিম্ববৎ : মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে যৌবন জলবিম্ববৎ অস্থায়ী। অচিরাৎ : তাহার কৃতকর্মের জন্য অচিরাৎ ফলভোগ করিতে হইবে।

অনুশীলনী

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :

ভীষণদর্শন, সভাসীন, শ্বাপদ, দৈত্যকুলেশ্বর, সমর-বিরতি-চিহ্ন, পুরী-প্রান্তভাগে।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ :

বেষ্টিয়াছে, আচ্ছাদিয়া, জাগ্রত, বরষায়, শিরসে, প্রফুল্লিত।

৩। ঐক্যতান (পৃঃ ১২০-১২৩)

সন্ধি: দুর্গম—দুঃ+গম। সংকীর্ণ—সম+কীর্ণ। নিরানন্দ—নিঃ+আনন্দ। নমস্কার—নমঃ+কার। মহা-একতান—(ছন্দের অনুরোধে সন্ধি করা হয় নাই)।

সমাস: ভ্রমণবৃত্তান্ত—ভ্রমণের বৃত্তান্ত (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। ভিক্ষালব্ধ—ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। মহাজনশূন্যতায়—মহৎ জন (কর্মধারয়); তাহার দ্বারা শূন্য (তৃতীয়া তৎপুরুষ), তাহার ভাব এই অর্থে 'তা' তাহাতে। গীত-ভারতী—গীতরূপ ভারতী (রূপক কর্মধারয়)। বহুদূর প্রসারিত—বহু দূর (প্রাদিতৎপুরুষ; বহু প্রসারিত (সপ্তমীতৎপুরুষ)। প্রাণহীন—প্রাণ দ্বারা হীন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। নতশির—নতশির যাহার (বহুব্রীহি)। চিরনির্বাসনে—চির অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নির্বাসন (দ্বিতীয়াতৎপুরুষ), তাহাতে।

সাধু শব্দরূপ: পড়ি—পড়িয়া। যাহে—যাহাতে। সবাকার—সকলের। বাণী লাগি'—বাণীর জন্য। উদ্ধারি'—উদ্ধার করিয়া।

কারক ও বিভক্তি: (ক) এই **সুরসাধনায়** পৌঁছিল না বহুতর ডাক—(অধিকরণে সপ্তমী)। (খ) নানা কবি ঢালে **গান** নানাদিক হ'তে' (কর্মকারকে লুপ্ত (বিভক্তি)। (গ) গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী (অধিকরণে সপ্তমী)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation): কীর্তি—√কৃত্+তি (ভাববাচ্যে)। ক্ষোভ—ক্ষুভ্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। সাধনা—সাধ্+ণিচ্+অন্ (ভাববাচ্যে) আপ্। যোগ—যুজ+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। প্রসাদ—প্র+√সদ্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। পরিচয়—পরি+√চি+অ (ভাববাচ্যে)। প্রবেশ—প্র+√বিশ্+অ (ভাববাচ্যে)।

পদান্তর: পৃথিবী (বিশেষ্য) পার্থিব (বিশেষণ)। জীব (বিশেষ্য) জৈব (বিশেষণ)। জ্ঞান (বিশেষ্য) জ্ঞানী (বিশেষণ)। নিমন্ত্রণ (বিশেষ্য) নিমন্ত্রিত (বিশেষণ)। পরিচয় (বিশেষ্য) পরিচিত (বিশেষণ)। প্রসারিত (বিশেষণ) প্রসারণ (বিশেষ্য)। নির্বাসন (বিশেষ্য) নির্বাসিত (বিশেষণ)। অপূর্ণতা (বিশেষ্য) অপূর্ণ (বিশেষণ)। মজুর (বিশেষ্য)। মজুরি (বিশেষণ)।

বিপরীতার্থ শব্দ: বিশাল—ক্ষুদ্র; অসীম—সসীম; নিঃশব্দ—সশব্দ; আলোক—অন্ধকার; দুর্গম—সুগম; নিন্দা—খ্যাতি; নির্বাক—সবাক; নিরানন্দ—সানন্দ।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন: বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি (প্রশ্ন-বোধক)—বিপুলা এ পৃথিবীর অতি অল্প অংশই জানি (প্রশ্ন পরিহার)। ভিতরে প্রবেশ করি' সে শক্তি ছিল না একেবারে (জটিল)—ভিতরে প্রবেশ করিবার মতো শক্তি একেবারে ছিল না (সরল)। ভিতরে প্রবেশ করিবার মত শক্তির একান্ত অভাব ছিল (প্রশ্ন পরিহার)।

বাক্য রচনা : জীবনযাত্রা : বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে সাধারণ লোকের **জীবনযাত্রা** একরূপ অচল হইয়া পড়িয়াছে। কৃত্রিম : রাশিয়া কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িয়া পৃথিবীতে বিজ্ঞানের এক নবযুগ আনিয়াছে।

ব্যাকরণগত টীকা : সবাকার—সব (ষষ্ঠীবিভক্তির চিহ্ন)+কার। **উদ্ধারি**—উদ্ধার+ইযা=উদ্ধারিয়া, পদ্যে ব্যবহৃত "উদ্ধারি"। উদ্ধার কথাটি বিশেষ্য ; ইহা বিনা প্রত্যয়ে নামধাতুতে পরিণত হইয়া এখানে ক্রিয়াপদ হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বাক্য গঠন কর :

চিত্রময়ী, বিপুলা, প্রচণ্ড, ডেপুটি, লজ্জিত, হতভাগা, অন্তরময়।

২। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর : নীলিমা, নিস্তব্ধ, অজানা, গহন, জাতি, সংকীর্ণ।

৩। মোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ :

(ক) দুর্গম **তুষারগিরি** ...পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।

(খ) সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ **বাতায়নে**।

৪। বর্ষামঙ্গল (পৃঃ ১২৭-১২৯)

সন্ধি : শ্যামাঙ্গিনী—শ্যাম+অঙ্গিনী। সঞ্চিত—সম্+চিত। মনোমোহিনী—মনঃ+মোহিনী। গৌরাঙ্গিনী—গৌর+অঙ্গিনী। স্নিগ্ধোজ্জ্বল—স্নিগ্ধ+উজ্জ্বল।

সমাস : সুধাপরশা—সুধার ন্যায় পরশ যাহার (বহুব্রীহি)। **পুষ্পবৃষ্টি**—পুষ্পের বৃষ্টি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কুন্তলজল—কুন্তলের জল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। অমৃতমদিরা—অমৃত রূপ মদিরা (রূপক কর্মধারয়)। লাবণ্যজোয়ার—লাবণ্যের জোয়ার (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। অশোকগুচ্ছ—অশোকের গুচ্ছ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কম-কণ্ঠ—কম যে কণ্ঠ (কর্মধারয়)। ঝুমুকা-অপরাজিতা—ঝুমুকা ও অপরাজিতা (দ্বন্দ্ব সমাস)। আনন্দ-উল্লাস—আনন্দের উল্লাস (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহাতে। স্নিগ্ধোজ্জ্বল—স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল (দ্বন্দ্ব সমাস)। আর্দ্রকেশে—আর্দ্র কেশ যাহাতে (বহুব্রীহি)।

সাধু গদ্যরূপ : ঝঙ্কারিছে—ঝঙ্কারিত করিতেছে। চুম্বি'—চুম্বন করিয়া। প্লাবিয়াছ—প্লাবিত করিয়াছ। **তিতি'** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) সিক্ত হইয়া, ভিজিয়া। **জিনি** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) জয়ী (জয় করিয়া লেখা উচিত নয়)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) হে **বরষা**! হে সুধাপরশা! (সম্বোধনে প্রথমা)। (খ) তোমারে বকুলফুলে, তোমার ও **রজনীগন্ধায়** (অধিকরণে সপ্তমী)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : বিগলিত—বি-গল্+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। **ঝঙ্কারিছে**

—ঝঙ্কার (বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু)+ইতেছে>ইছে। বসুধরা—√বস্+উ=বসু-ধৃ+ণিচ্+খচ্ (কর্তৃবাচ্যে) আপ্। সঞ্চিত—সম্+√চি+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। সম্ভার—সম+√ভৃ+অ (ভাববাচ্যে)। **রঞ্জিয়াছ**—রন্জ্+ণিচ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইয়াছ। শারদীয়া—শরদ্+ঈয় (ভাবার্থে)। আমোদিত—আমোদ+ইতচ্ (জাতার্থে)। উল্লাস—উৎ+লস্+ঘঞ্ (ভাবে)। শোভে—শুভ (সংস্কৃত ধাতু)+এ।

পদান্তর ঃ বিরহিণী (বিশেষণ) বিরহি (বিশেষ্য) সঞ্চিত (বিশেষণ) সঞ্চয় (বিশেষ্য)। মেদুর (বিশেষণ) মেদুরত্ব (বিশেষ্য। আনন্দ (বিশেষ্য) আনন্দিত (বিশেষণ)। সুরভিত (বিশেষণ) সুরভি (বিশেষ্য)।

বিদেশী শব্দ ঃ বসোরা-গোলাপ; গুল-আনার; হাস্না-হানা।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ ধনি—ধনি শব্দটি সুন্দরী নারী অর্থে, (ধনবান অর্থে নয়) নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ। ইহারই সম্বোধনরূপ 'ই' কার হইয়াছে। **ঝঙ্কারিছে**—ঝঙ্কার নামধাতু+ইতেছে>ইছে; নামধাতুর ক্রিয়া কেবলমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। **চাতকিনী, গৌরাঙ্গিণী** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০), শুদ্ধ স্ত্রী-প্রত্যয় ঈপ্ কে বর্জন করিয়া 'ইনী' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠনের দৃষ্টান্ত। তবে 'গৌরাঙ্গ-এর স্ত্রীলিঙ্গরূপ 'গৌরাঙ্গী'ও হয়। **সুরভিত**—'সুগন্ধ' অর্থে 'সুরভি' শব্দটি বিশেষণ পদ, ইহাকেই বিশেষ্য মনে করিয়া বিনা প্রত্যয়ে নাম ধাতু করিয়া পরে ক্ত-প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। 'সুরভি'ও বিশেষ্য হয়, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। 'সুরভি' বিশেষণ; বিশেষ্যরূপ 'সৌরভ'।

বাক্য রচনা ঃ সোহাগ—'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।' **রুচির**—তোমার রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অলঙ্কার ঃ বিরহিণী ব্রজবধূ যেন আহা হ'য়ে উন্মাদিনী।—উৎপ্রেক্ষা

অনুশীলনী

১। **লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বাক্য রচনা কর ঃ**
করুণারূপিণি, উন্মাদিনী, গৌরাঙ্গিণী, শ্যামাঙ্গিনী, অধীরা, শিখিনী, মহাগৌরবিণী।

২। **পদ পরিচয় নির্ণয় কর ঃ** ঝঙ্কারিছে বীণা।

৩। **নিম্নলিখিত-স্থূল পদগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ ঃ**
হউক বসন্তরাণী **গৌরাঙ্গিণী**—হে শ্যামা বরষা (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০); **চুম্বি**; **শোভা**।

৫। কৃষ্ণা রজনী (পৃঃ ১৪৬-১৪৭)

সন্ধি ঃ দিনো—দিন+ও (বাঙলা সন্ধি) এমনি—এমন+ই (বাঙলা সন্ধি)।

সমাস ঃ প্রখর-ঝটিকামুখর—প্রখর (প্রচণ্ড) যে ঝটিকা (কর্মধারয়); তাহার দ্বারা মুখর (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। গুরু গর্জন—গুরু যে গর্জন (কর্মধারয়)। মৃতপতি-দেহ—মৃত যে পতি (কর্মধারয়); তাহার দেহ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ধূলিলুণ্ঠিতা—ধূলি দ্বারা লুণ্ঠিতা (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। চণ্ডালবেশী—চণ্ডালের ন্যায় বেশ আছে যাহার (বহুব্রীহি), সে। বনমাঝ—বনের মাঝে (মধ্যে) (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। বদনশতদল—শত দল আছে যাহার তাহা শতদল (বহুব্রীহি) ; বদনরূপ শতদল (রূপক কর্মধারয়)।

সাধু গদ্যরূপ ঃ আবরি'—আবৃত করিয়া। **নেহারে** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) দেখে (বা দেখেন)। বনমাঝ—বনমধ্যে। তব সনে—তোমার সঙ্গে। মিশি—মিশিয়া।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) **মৃতপতি-দেহ** আবরি' বেহুলা—(কর্মে দ্বিতীয়া)। (খ) বুঝি সে দিনো এমনি ধাঁধায় বিজলি **দু'নয়ন**—(কর্মে দ্বিতীয়া)। (গ) **বন-মর্মরে** ত্রস্ত চকিত মৃগদল—(করণে 'এ' বিভক্তি)। (ঘ) **তব** সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার—('তব সনে' শব্দের যোগে ষষ্ঠী)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) ঃ গর্জন—গর্জ+অনট্ (ভাববাচ্যে)। দেহ—√দিহ্+অ (কর্মবাচ্যে)। ত্রস্ত—(ভীত)√ত্রস্+ত (কর্তৃবাচ্যে)। লুণ্ঠিতা—লুণ্ঠ+ক্ত (কর্মবাচ্যে) স্ত্রীং আপ্। কালিমা—কাল+ইমন্ (ভাববাচ্যে। **জ্বলেছে—জ্বল্** (সংস্কৃত ধাতু)+ইয়াছে>এছে (চলিতরূপ)।

পদান্তর ঃ প্রখর (বিশেষণ) প্রখরতা (বিশেষ্য)। মৃত (বিশেষণ) মৃত্যু (বিশেষ্য। নিশা (বিশেষ্য) নৈশ বিশেষণ)। কাতর (বিশেষ্য) কাতরতা বিশেষণ)। মলিন (বিশেষণ) মলিনতা (বিশেষ্য)।

বাক্য-পরিবর্তন ঃ শিয়রে শমন কত কথা বলে (কর্তৃবাচ্য)—শিয়রে শমন কর্তৃক কত কথা বলা হয়।—(কর্মবাচ্যে)।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ সজনি—'সজনী' শব্দের সম্বোধন-রূপ। সজনী শব্দটি নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ, ইহার পুংলিঙ্গ হয় না। **অনাথিনী**—পুংলিঙ্গ 'অনাথ' শব্দের শুদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গরূপ 'অনাথা' ; তবে বাঙলায় 'ইনী' প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ সৃষ্টি করিয়া সম্ভবতঃ মধুর ঝংকার সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য।

অলঙ্কার ঃ 'শিয়রে শমন কত কথা বলে,
দমকে দামিনী বারেবার।'—অনুপ্রাস।

অনুশীলনী

১। **লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়া সার্থক বাক্য গঠন কর:** একাকিনী, লুণ্ঠিতা, চণ্ডালবেশী, রাজবধূ, অনাথিনী, অসহায়, পতি, সতী।

২। মোটা হরফে লিখিত পদগুলির ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ:

(ক) ঝরে **নিশিদিন** আঁখি জল, (খ) দমকে দামিনী **বারেবার**; (গ) **বনমর্মরে** ত্রস্ত চকিত মৃগদল; (ঘ) **নিভিছে জ্বলেছে** অনিবার।

৬। ফরিয়াদ (পৃঃ ১৭৮-১৮১)

সন্ধি: সৃষ্টি—সৃজ্ + ক্তি। উত্থান—উৎ + স্থান। স্বাধীন—স্ব + অধীন।

সমাস: ধূলিমাখা—ধূলি দ্বারা মাখা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। আদি-পিতা—আদি যে পিতা (কর্মধারয়)। দুখ-দীপ—দুঃখরূপ দীপ (রূপক কর্মধারয়)। সৃষ্টি-শিয়রে—সৃষ্টির শিয়র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। প্রভাত-সন্ধ্যা—প্রভাত ও সন্ধ্যা (দ্বন্দ্ব সমাস)। কাটাকাটি—পরস্পরকে কাটিয়া যে যুদ্ধে প্রবৃত্তি হয় (ব্যতিহার বহুব্রীহি। জোঁকসম—জোঁকের সম (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। মহামহীয়ান—মহান্ মহীয়ান (কর্মধারয়। সৃজন-দিন—সৃজনের দিন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। বৃষ্টি-ধারা—বৃষ্টির ধারা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। মুক্তকণ্ঠে—মুক্তকণ্ঠ যাহাত (বহুব্রীহি)।

সাধু গদ্যরূপ: মাগে—চায়। নিয়া—লইয়া। হেরি—দেখি। সৃজিলে—সৃষ্টি করিলে। পালে—পালন করে। রুধিয়াছে—রোধ করিয়াছে। পূরে'—পূর্ণ করিয়া। রচিয়ে—রচনা করিতেছে। স'য়ে—সহিয়া।

কারক ও বিভক্তি: (ক) **সৃষ্টি-শিয়রে** ব'সে কাঁদ **তবু** জননীর মত ভীতা—সৃষ্টি শিয়রে অধিকরণে সপ্তমী; তবু—সংযোজক অব্যয়। (খ) সকলের **এতে সম** অধিকার—এতে—অধিকরণে সপ্তমী, সর্বনাম পদ; সম—অধিকার পদের বিশেষণ। (গ) জোগাইবে আলো রবি-শশি-**দীপে**—করণে 'এ' বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation): প্রতিকার—প্রতি + √কৃ + অ (ভাববাচ্যে)। সৃষ্টি—সৃজ্ + ক্তি (ভাববাচ্যে)। বিস্ময়ে—বি + √স্মি + অ (ভাববাচ্যে) বীজন—বিজ্ + অনট্ (ভাববাচ্যে)। অধিকার—অধি + √কৃ + ঘঞ্ ভাববাচ্যে। অপরাধ—অপ + √রাধ্ + অ (ভাববাচ্যে)। **মরিয়া**—বেপরোয়া (desperate) মর্ + ইয়া।

পদান্তর: বিস্ময় (বিশেষ্য) বিস্মিত (বিশেষণ)। মহৎ (বিশেষণ) মহত্ত্ব (বিশেষ্য)। উৎসুক (বিশেষণ) ঔৎসুক্য (বিশেষ্য)। অধিকার (বিশেষ্য) অধিকৃত (বিশেষণ)। অসম্মান (বিশেষ্য) অসম্মানিত (বিশেষণ)। পীড়িত (বিশেষণ)

পীড়া (বিশেষ্য)। রক্ত (বিশেষ্য) রক্তিম (বিশেষণ)। ক্ষুধা (বিশেষ্য) ক্ষুধিত (বিশেষণ)। স্বাধীন (বিশেষ্য) স্বাধীনতা (বিশেষণ)।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ঃ ফুলায় বেহায়া ছাতি—এস্থলে 'ছাতি ফুলায়' অর্থাৎ গর্ব প্রকাশ করে।

• **বিদেশী শব্দ ঃ** ফরমান্, সাহারা, গোবী, গোরস্থান, ধড়িবাজ, কসাই, ডাকু, বেলুন, গোলাগুলি, কামান, আইন, গর্দান্, বান্দা।

বাক্য রচনা ঃ কলাপ (অর্থে ময়ূর পুচ্ছ) মেঘগর্জনে ময়ূর কলাপ মেলিয়া নৃত্য করে। মহারথী ঃ বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সভায় সাহিত্যকদের অনেক মহারথীকেই দেখিতে পাওয়া গেল।

ঢিবিতে ঃ আমরা অনেক দূরে একটা উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়াইয়া অপরিসীম আগ্রহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখিতে লাগিলাম।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ সৃজিলে—সৃজ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইলে ; ইহা বাঙলা ক্রিয়া ; কেবলমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। **রুধিয়াছে**—রুধ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইয়াছে বাঙলা ক্রিয়াপদ ; একমাত্র পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। **সোয়াস্তি**—স্বস্তি>সোয়াস্তি অর্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ। **সৃজন**—সংস্কৃত সৃজ্+লুট্ (অন) অর্থাৎ 'সর্জন' ; বাঙলায় 'সর্জন' শব্দ প্রচলিত নয়, ভুল হইলেও তাহার স্থলে 'সৃজনই' প্রচলিত।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ ঃ আদি-পিতা, প্রভাত সন্ধ্যা, বাসে-ভরা, বেহায়া, মহামহীয়ান্, মুক্তকণ্ঠে।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর ঃ মহীয়ান্, কনিষ্ঠা, বলবান্, বান্দা, নিপীড়িত, ভীত, ময়ূর, ভগবান।

৩। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ প্রতিকার, বিস্ময়, বীজন, অধিকার, আনন্দ।

৪। অলঙ্কার নির্ণয় কর ঃ

আমার আঁখির দুখ-দীপ নিয়া
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া

গদ্যাংশ (একাদশ শ্রেণী)

১। ললিতগিরি (পৃঃ ৩০-৩৩)

সন্ধি ঃ স্বচ্ছ—সু+অচ্ছ। সমুদ্রাভিমুখে—সমুদ্র+অভিমুখে। মনোমোহিনী—মনঃ+মোহিনী। ভগ্নগৃহাবশিষ্ট—ভগ্নগৃহ+অবশিষ্ট। হরিদ্বর্ণ—হরিৎ+বর্ণ। পুষ্প-

মাল্যাভরণ—পুষ্পমাল্য+আভরণ। দুর্ভাগ্য—দুঃ+ভাগ্য। সংস্কৃত—সম্+কৃত। নিরীক্ষণ—নিঃ+ঈক্ষণ। ত্রিংশাংশগত—ত্রিংশ+অংশগত। বৃহস্পতি—বৃহৎ+পতি। পুরুষোত্তম—পুরুষ+উত্তম। সময়ান্তরে—সময়+অন্তরে।

সমাস ঃ স্বচ্ছসলিলা—স্বচ্ছ সলিল যাহার (বহুব্রীহি) তাহা, সলিল (স্ত্রীলিঙ্গে সলিলা)। সমুদ্রাভিমুখে—সমুদ্রের অভিমুখে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। ভগ্নগৃহাবশিষ্ট—ভগ্নগৃহ (কর্মধারয় সমাস); তাহার অবশিষ্ট (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। হরিদ্বর্ণ—হরিৎ বর্ণ যাহার (বহুব্রীহি)। পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত—মাল্য ও আভরণ (দ্বন্দ্ব সমাস); পুষ্প নির্মিত মাল্যাভরণ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার আভরণ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহার দ্বারা ভূষিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। গাত্রোত্থানপূর্বক—গাত্রের উত্থান (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহা পূর্বক যাহাতে (বহুব্রীহি সমাস)। প্রাণহন্ত্রী—প্রাণ হত্যা করে যে নারী (উপপদ তৎপুরুষ)। পাপদৃষ্ট—পাপের দ্বারা দৃষ্ট (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস)। ধ্যানস্থ—ধ্যানে থাকে যে (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। সময়ান্তরে—অন্য সময় (নিত্যসমাস) তাহাতে।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) তখন মনে করিলাম, **হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া** জন্ম সার্থক করিয়াছি। (হিন্দুকুলে—অধিকরণে সপ্তমী; জন্মগ্রহণ করিয়া—কর্মকারক)। (খ) সর্বস্বই লোপ পাইয়াছে, **গুহাটার** জন্য **দুঃখে** কাজ কি? (গুহাটার 'জন্য' শব্দযোগে ষষ্ঠী; দুঃখে—প্রয়োজনার্থে তৃতীয়া 'এ' বিভক্তি)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **ঃ** বর্তমান—বৃৎ+শানচ্। শোভাময়—শোভা+ময়ট্ প্রাচুর্য অর্থে)। যোজন—(স্থান) √যুজ্+অনট্। মূর্তিমান—√মূর্ছ্+তি=মূর্তি+মতুপ্ (অস্ত্যর্থে)। আধুনিক—অধুনা+ষ্ণিক (ভাবার্থে)। সম্পূর্ণ—সম+√পূর্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। **সমভিব্যাহার** (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)সম+অভি+বি+আ—হৃ+ঘঞ্। [লক্ষণীয় যে এই শব্দটিতে চারিটি উপসর্গ রহিয়াছে। সংস্কৃতে এতগুলি উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ আর নাই]। উপস্থিত—উপ+√স্থা+ত (কর্তৃবাচ্যে)। প্রত্যাগত—প্রতি+আ+√গম্+ত (কর্তৃবাচ্যে)। অতিশয়—অতি—শী+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে)। অঙ্কিত—√অনক্+ত (কর্মবাচ্যে)। সন্দর্শন—সম্+দশ্+অনট্ (ভাববাচ্যে)। ধ্যানস্থ—ধ্যৈ+অন=ধ্যান+√স্থা+ক (কর্তৃবাচ্যে)। নির্দেশ—নির্+√দিশ্+অল্ (ভাববাচ্যে)।

পদান্তর ঃ আরোহণ (বিশেষ্য) আরূঢ় (বিশেষণ)। শোভিত (বিশেষণ), শোভা (বিশেষ্য)। পৃথিবী (বিশেষ্য) পার্থিব (বিশেষণ)। পরিপূর্ণ (বিশেষণ) পরিপূর্ণতা (বিশেষ্য)। সুকোমল (বিশেষণ) সুকোমলতা (বিশেষ্য)। রমণীয় (বিশেষণ) রমণীয়তা (বিশেষ্য)। নিমগ্ন (বিশেষণ) নিমগ্নতা (বিশেষ্য)। নির্দেশ (বিশেষ্য) নির্দিষ্ট (বিশেষণ)।

লিঙ্গান্তর ঃ স্বচ্ছসলিলা (স্ত্রীলিঙ্গ) স্বচ্ছসলিল (পুংলিঙ্গ)। মনোমোহিনী (স্ত্রীলিঙ্গ) মনোমোহন (পুংলিঙ্গ)। পীতাম্বরী (স্ত্রীলিঙ্গ) পীতাম্বর (পুংলিঙ্গ)। শোভাময় (পুংলিঙ্গ) শোভাময়ী (স্ত্রীলিঙ্গ)। মহীয়সী (স্ত্রীলিঙ্গ) মহীয়ান্ পুংলিঙ্গ)। মূর্তিমান (পুংলিঙ্গ) মূর্তিমতী (স্ত্রীলিঙ্গ)। রমণীয় (পুংলিঙ্গ) রমণীয়া—(স্ত্রীলিঙ্গ)। 'আধুনিক (পুংলিঙ্গ) আধুনিকা, আধুনিকী (স্ত্রীলিঙ্গ)। সন্ন্যাসিনী (স্ত্রীলিঙ্গ) সন্ন্যাসী পুংলিঙ্গ)। প্রাণহন্ত্রী (স্ত্রীলিঙ্গ) প্রাণহন্তা (পুংলিঙ্গ)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন, বাঙ্গালায় বলিতেছি (জটিল বাক্য) পাঠকের জ্ঞাতব্য কথা কয়টা বাঙ্গালায় বলিতেছি (সরল বাক্য)।

তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই (নেতিবাচক)—তাহার সময় উপস্থিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে। (অস্তিবাচক)।

অলঙ্কার ঃ এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে।—সমাসোক্তি।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত অংশটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর ঃ—

এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধমন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ আর মৃত্তিকা-প্রোথিত ভগ্নগৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্তিরাশি।

২; নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ সানুদেশ; সুকোমল; মূর্তিমান; সমভিব্যাহারে; প্রত্যাগত; প্রাণহন্ত্রী; সন্দর্শনে; বহির্গত।

৩। নিম্নের মোটা হরফে লিখিত পদগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ ঃ—

(ক) শিশু যেমন মা'র কোলে উঠিলে মা'কে **সর্বাঙ্গসুন্দরী** দেখে।

(খ) সন্ন্যাসিনী শ্রীকে **সমভিব্যাহারে** লইয়া আসিলেন। (উ. মা. ১৯৬০)।

২। বঙ্কিমচন্দ্র (পৃঃ ৯৩-১০২)

সন্ধি ঃ আবির্ভূত—আবিঃ+ভূত। সূর্যোদয়—সূর্য+উদয়। মহোৎসব—মহা +উৎসব। আত্মাভিমান—আত্ম+অভিমান। শাস্ত্রালোচনা—শাস্ত্র+আলোচনা। সারোদ্ধার—সার+উৎ+হার। বিদ্বজ্জন—বিদ্বৎ+জন। স্বদেশানুরাগ—স্বদেশ+ অনুরাগ। সমুজ্জ্বল—সম্+উৎ+জ্বল। শোকোচ্ছ্বাস—শোক+উচ্ছ্বাস। অস্তমিত— অস্তম্+ইত।

সমাস : সুধাভাণ্ড—সুধার ভাণ্ড (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) সৌভাগ্যক্রমে—সৌভাগ্যের ক্রম যাহাতে (বহুব্রীহি)। উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল—উদয়কালীন রবি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার রশ্মি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা সমুজ্জ্বল (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। অনভ্যস্ত—অভ্যস্ত নহে (নঞ্‌তৎপুরুষ)। অভিলষিতদর্শন—অভিলষিত দর্শন যাহার (বহুব্রীহি), তিনি। বয়ঃসন্ধিকাল—বয়সের সন্ধি (ষষ্ঠী-তৎপুরুষ); তাহার কাল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। হৃৎপদ্ম—হৃৎ অর্থাৎ হৃদয়রূপ পদ্ম (রূপক কর্মধারয়)। শস্যশ্যামলা—শস্যদ্বারা শ্যামলা (তৃতীয়াতৎপুরুষ) শ্রদ্ধাসহকারে—শ্রদ্ধার সহকার যাহাতে (বহুব্রীহি)। শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ—শিক্ষিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (সপ্তমী তৎপুরুষ)। প্রতিভাহীন—প্রতিভা দ্বারা হীন (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। অনাদর-মলিন—আদর নহে (নঞ্‌তৎপুরুষ); অনাদর দ্বারা মলিন (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রদগ্ধ—মধ্যাহ্নের রৌদ্র (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা দগ্ধ (তৃতীয়াতৎপুরুষ); পুণ্যস্রোতঃস্পর্শে—পুণ্য স্রোতঃ (কর্মধারয়); তাহার স্পর্শ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ : বাংলা গ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা—এস্থলে 'দন্তস্ফুট করা' (=দাঁত ফোটানো) অর্থাৎ কঠিন বিষয় বুঝিতে পারা।

কারক ও বিভক্তি : (ক) বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে **যৌবনে** উপনীত হইল। (অধিকরণে সপ্তমী)। (খ) যখন **নবশিক্ষাভিমানে** স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা,—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। (গ) তিনি আপনার **শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার** প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।—শিক্ষাগর্বে হেত্বর্থে তৃতীয়া; বঙ্গভাষার—ষষ্ঠী।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : অভ্যর্থনা—অভি+√অর্থ+অন (ভাববাচ্যে) +আপ্। বিস্তর—বি+√স্তৃ+অপ্ (ভাবে)। বিচ্ছিন্ন—বি+√ছিদ্+ত (কর্ম-বাচ্যে)। প্রবাহ—প্র+√বহ্+অ্। (ভাববাচ্যে)। অপরিচিত—নঞ্—পরি√চি +ক্ত (কর্মবাচ্যে)। অনুভব—অনু+√ভূ+অ (ভাববাচ্যে)। কীর্তি—√কৃত+তি (ভাবে)। হিল্লোলিত—হিল্লোল+ইতর (জাতার্থে)। উপস্থিত—উপ+√স্থা+ত (কর্তৃবাচ্যে)। অপরিমেয়—নঞ্—পরি—মা+যৎ (কর্মবাচ্যে)। আবর্তিত—আ—বর্তি+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। পরিপুষ্ট—পরি+√পুষ্+ক্ত (কর্ম-বাচ্যে)। পরিম্লান—পরি+√ম্লৈ+ক্ত। আবিষ্কার—আবিস্—কৃ+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। প্রসাদ—প্র +√সদ্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)।

পদান্তর : বিস্তর (বিশেষণ) বিস্তরত্ব (বিশেষ্য)। বিচ্ছিন্ন (বিশেষণ) বিচ্ছেদ (বিশেষ্য)। অনভ্যস্ত (বিশেষণ) অনভ্যস্ত (বিশেষ্য)। অনুভব (বিশেষ্য)

অনুভূত (বিশেষণ)। সমালোচনা (বিশেষ্য) সমালোচিত (বিশেষণ)। নৈরাশ্য (বিশেষ্য) নিরাশ (বিশেষণ)। অতিক্রম (বিশেষ্য) অতিক্রান্ত (বিশেষণ)। আন্দোলন (বিশেষ্য) আন্দোলিত (বিশেষণ)।

অলঙ্কার : তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাব-মন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন।—উপমা এবং রূপক।

ব্যাকরণগত টীকা : জাগ্রত—জাগৃ + ক্ত = জাগরিত; অবশ্য অশুদ্ধ হইলেও 'জাগ্রত' কথাটি 'জাগরিত' অর্থে বাঙলায় বহুল প্রচলিত। **মুখরিত**—মুখর + ণিচ্ (নামধাতুজ বিশেষণ) + ক্ত। যে স্থলে বিশেষণ 'মুখর' প্রয়োগ করা চলে, সে স্থলের ঝংকারসৃষ্টির জন্য বাঙলায় অনেকেই মুখরিত প্রয়োগ করেন। **প্রশংসিত**—প্র—শংস্ + ক্ত = প্রশস্ত ('প্রশংসিত' নয়) প্রশংসা শব্দের সহিত জাতার্থে 'ইতচ্ প্রত্যয়' (তদ্ধিত) করিলে প্রশংসিত হয়, তবে কথাটি যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে তাহাকে বুঝায় না।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর :—
গৌরবশালিনী; সুতীব্র; সর্বব্যাপী; আধুনিক; প্রৌঢ়; মুখরিত; জাগ্রত।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—
প্রবাহ; উপনীত; উপস্থিত; অপরিমেয়; কৃতজ্ঞতা; আবর্তিত।

৩। বাক্য বিশ্লেষণ কর :—
ইংরেজী সমুদ্রে তাঁহারা যে···তাঁহাদের ছিল না (পৃঃ ৯৬)

৪। বিপরীতার্থক শব্দযোগে সার্থক বাক্য গঠন কর :—
আবির্ভূত; বিচ্ছিন্ন; কঠোর; মহিমা; নিষ্ক্রমণ; আত্মীয়; সঞ্জীবিত।

৫। বাক্য রচনা কর; (১) সব্যসাচী (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) (২) প্রগল্ভ (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) (৩) বদ্ধমূল, অনভ্যস্ত, বিস্মৃতপ্রায়, অস্তমিত।

উত্তর—(১) সব্যসাচী বাঙালী এক হাতে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে, অন্য হাতে মগ দস্যুদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে; (২) প্রগল্ভ বালক কাহাকে কি বলা উচিৎ সে শিক্ষা এখনও পায় নাই।

৩। শুভ উৎসব (পৃঃ ১৭৩-১৭৭)

সন্ধি : মর্যাদানুসারে—মর্যাদা + অনুসারে। উৎসবাঙ্গে—উৎসব + অঙ্গে। মনোহারিণী—মনঃ + হারিণী। মাসেক—মাস + এক (বাঙলা সন্ধি)। ভোজনান্তে—

ভোজন+অন্তে। শুভানুষ্ঠান—শুভ+অনুষ্ঠান। গোষ্ঠাষ্টমী—গোষ্ঠ+অষ্টমী। স্নেহাস্পদ—স্নেহ+অস্পদ। যজ্ঞোপবীত—যজ্ঞ+উপবীত। বাহ্বাড়ম্বর—বাহ্+আড়ম্বর।

সমাস : উৎসবকলা—উৎসবরূপ কলা (রূপক কর্মধারয়)। দেনাপাওনা—দেনা ও পাওনা (দ্বন্দ্ব সমাস)। ফলাহার—ফলের আহার (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। মর্যাদানুসারে—মর্যাদার অনুসার (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) তাহাতে। ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে—ক্রিয়া ও কর্ম (দ্বন্দ্ব সমাস)। তাহার উপলক্ষে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কাংস্য-পিত্তল-বিক্রেতা—কাংস্য ও পিত্তল (দ্বন্দ্ব সমাস); তাহার বিক্রেতা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। নীলাম্বরী—নীল অম্বর যে স্ত্রীর (বহুব্রীহি)। বিচিত্রপাড়—বিচিত্র পাড় যাহাদের (বহুব্রীহি) তাহারা। মধ্যাহ্নভোজনান্তে—মধ্যাহ্নকালীন ভোজন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। তাহার অন্তে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। স্বহস্তকর্তিত—স্বীয়হস্ত (কর্মধারয়); তাহার দ্বারা কর্তিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস)। বিধিব্যবস্থা-নির্ধারণ—বিধি ও ব্যবস্থা (দ্বন্দ্ব সমাস); তাহার নির্ধারণ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। বেতনভুক—বেতন ভোগ করে যাহারা (উপপদতৎপুরুষ)। যজ্ঞোপবীত—যজ্ঞের উপবীত (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। হাস্যপরিহাস—হাস্য ও পরিহাস (দ্বন্দ্ব সমাস)

কারক ও বিভক্তি : (ক) ব্রাহ্মণ **ফলাহারের** পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ী ফিরিতেন না—(ফলাহারের কর্মে ষষ্ঠী)। (খ) কিন্তু এখন ইংরাজী পণ্যশালার **অনুগ্রহে যান্ত্রিকভাবেই** অনেক কার্য **নিঃশব্দে** সমাধা হইয়া উঠে।—(অনুগ্রহে)—হেত্বর্থে তৃতীয়া 'এ' বিভক্তি (যান্ত্রিকভাবে—করণে তৃতীয়া) নিঃশব্দে—ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **:** উৎসব—উৎ+√সু+অল্ (ভাববাচ্যে)। নানান্—নানা+ন (উচ্চারণে ন্)। কুম্ভকার—কুম্ভ+কৃ+অণ (কর্তৃবাচ্যে)। সমালোচনা—সম্+আ+√লোচ্+অন্ (ভাববাচ্যে) আপ্। বর্ষীয়সী—বৃদ্ধ+ঈয়সুন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। উন্মুক্ত—উৎ+√মুচ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। পরিণত—পরি+√নম্+ত (কর্তৃবাচ্যে)। **নির্ধারণ**—নির্+√ধৃ+অনট্ (ভাববাচ্যে)।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ : এক কলমের আঁচড়ে—এ স্থলে 'কলমের আঁচড়' অর্থাৎ সামান্য দুইছত্র লেখা।

পদান্তর : সংঘর্ষ (বিশেষ্য) সংঘৃষ্ট (বিশেষণ)। সংস্পর্শ (বিশেষ্য) সংস্পৃষ্ট (বিশেষণ)। নিগূঢ় (বিশেষণ) নিগূঢ়ত্ব (বিশেষ্য)। কাশ্মীরী (বিশেষণ) কাশ্মীর (বিশেষ্য) আশ্রিত (বিশেষণ) আশ্রয় (বিশেষ্য)। কমনীয়তা (বিশেষ্য) কমনীয় (বিশেষণ)। শুচিতা (বিশেষ্য) শুচি (বিশেষণ)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ উৎসব-প্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুন্ন হয় (জটিলবাক্য)—উৎসব প্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও ম্লানমুখে ফিরিয়া গেলে শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুন্ন হয় (সরলবাক্য)।

অলঙ্কার ঃ এখনকার উৎসবগুলি ক্রমশই যেন আপিসী ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিতেছে—ইহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গামা যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই।—উৎপ্রেক্ষা।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ যোগাইত—যোগ (বিশেষ্য)+আ=যোগা (নামধাতু) যোগা+ইত='যোগাইত'। অতএব ইহা নামধাতু জাত ক্রিয়ার উদাহরণ। **আদৌ**—ইহা বাঙলায় অব্যয়রূপে ব্যবহার হইলেও প্রকৃত বিভক্ত্যন্ত সংস্কৃত শব্দ (বিশেষ্য)। **এইরূপ** আরও অনেক শব্দ আছে। যথা—হঠাৎ, অকস্মাৎ, দৈবাৎ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :—

ফলাহার, মর্যাদানুসারে, নিগূঢ়, জড়-বিনিময়, পদপল্লবে, স্বহস্তকর্তিত, অবিচ্ছেদ্য অধীশ্বরত্ব, চ্যূতপল্লবগুচ্ছ, সমারোহ, সহকারে, যজ্ঞোপবিত, বাহ্যাড়ম্বর।

২। লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বাক্য রচনা কর :—

আর্থিক, কুম্ভকারপত্নী, দিদিঠাকুরাণী, আশ্রয়দাতা, মালিনী।

৩। অনুক্ত শব্দগুলির স্থান পূরণ কর :

বিধাতা আমাকে যে সৌভাগ্যসুখ—ইহা সকলের সহিত—করিয়া না—ইহার—কোথায়? উৎসব—। আমাদের—এই—প্রথম—।

৪। অভাগীর স্বর্গ (পৃঃ ১৯৯-২১০)

সন্ধি ঃ মুখোপাধ্যায়—মুখ+উপাধ্যায়। আচ্ছাদিত—আ+ছাদিত। শোকার্ত—শোক+ঋত। স্বর্গারোহণ—স্বর্গ+আরোহণ। নিরীক্ষণ—নিঃ+ঈক্ষণ।

সমাস ঃ সঙ্গতিপন্ন—সঙ্গতিদ্বারা পন্ন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—অন্ত্য ইষ্টি (কর্মধারয়); তাহাই ক্রিয়া (কর্মধারয়)। চন্দনচর্চিত—চন্দন দ্বারা চর্চিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। বহুমূল্য—বহুমূল্য যাহার (বহুব্রীহি)। শান্তমুখে—শান্ত মুখ যাহাতে (বহুব্রীহি)। নামকরণকালে—নামের করণ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার কাল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। ভুক্তাবশেষ—ভুক্তের অবশেষ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। শশব্যস্ত—শশের ন্যায় ব্যস্ত (সমান কর্মধারয়)। আকাশজোড়া—আকাশকে জুড়ে অর্থাৎ ব্যাপ্ত

করে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ)। ভগ্নকণ্ঠে—ভগ্নকণ্ঠ যাহাতে (বহুব্রীহি)। অশন-বসন —অশন ও বসন (দ্বন্দ্ব সমাস)। সন্ধ্যাহ্নিক—সন্ধ্যাকালীন আহ্নিক (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। জীবন-নাট্যের—জীবনরূপ নাট্য (রূপক কর্মধারয়)। ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে—ঊর্ধ্ব দৃষ্টি যাহাতে (বহুব্রীহি)।

কারক ও বিভক্তি : (ক) র'হল তাহার **হাটে** যাওয়া—(অধিকরণে সপ্তমী)। (খ) **মুখের** পরে **মরণের** ছায়া পড়িয়াছে।—(মুখের—'পরে' শব্দ যোগে ষষ্ঠী); মরণের (সম্বন্ধে ষষ্ঠী)। মায়ের **বুক** ঘেঁষিয়া—(কর্মে লুপ্ত বিভক্তি)

ব্যুৎপত্তি (Derivation) : আচ্ছাদিত—আ + √ছদ্ + ণিচ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। উপস্থিত—উপ + √স্থা + ত (কর্তৃবাচ্যে)। আলোড়িত—আ + √লুড্ + ণিচ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। সংযোজিত—সম্ + ণিজন্ত + √যুজ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। প্রসন্ন—প্র + √সদ্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। সঞ্চিত—সম + √চি + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। প্রতিবাদ—প্রতি + √বদ্ + অ (ভাববাচ্যে)। সন্দেহ—সম্ + √দিহ্ + অল্ (ভাববাচ্যে)।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ : সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল—এস্থলে 'গ্রাম' অর্থাৎ গ্রাম-বাসী (লক্ষণা)। বেলা গড়িয়ে গেছে—এস্থলে 'গড়ানো' অর্থাৎ শেষ হইয়া আসা।

পদান্তর : অতিশয় (বিশেষণ) আতিশয্য (বিশেষ্য)। আচ্ছাদিত (বিশেষণ) আচ্ছাদন (বিশেষ্য)। উৎসুক (বিশেষণ) ঔৎসুক্য (বিশেষ্য)। সৌভাগ্য (বিশেষ্য) সুভগ (বিশেষণ)। আরোহণ (বিশেষ্য) আরূঢ় (বিশেষণ)। প্রস্তাব (বিশেষ্য) প্রস্তুত (বিশেষণ)। বিস্মিত (বিশেষণ) বিস্ময় (বিশেষ্য। স্বর্গ (বিশেষ্য) স্বর্গীয় (বিশেষণ। উপদেশ (বিশেষ্য) উপদিষ্ট (বিশেষণ)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : মা আর প্রতিবাদ করিল না (নেতিবাচক) —মা বিনা প্রতিবাদেই রহিল (অস্তিবাচক)। কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল (অস্তিবাচক)—কাঙালীর মা কোন কথা বলিল না (নেতিবাচক)। তিনি আসিলেন না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন (যৌগিক)—তিনি না আসিয়া গোটা চারেক বড়ি দিলেন (সরল)। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয় (জটিল)—সে লোকের মুখে মুখে পিয়াদাদের ঘুষ লইবার কথা শুনিয়াছিল (সরল)।

লিঙ্গ পরিবর্তন : বর্ষীয়সী (স্ত্রীলিঙ্গ) বর্ষীয়ান্ (পুংলিঙ্গ)। অভাগী (স্ত্রীলিঙ্গ) অভাগা (পুংলিঙ্গ)। শাশুড়ী (স্ত্রীলিঙ্গ) শ্বশুর (পুংলিঙ্গ)। ভাগ্যিমানী (স্ত্রীলিঙ্গ) ভাগ্যবান্ (পুংলিঙ্গ)। শোকার্ত (পুংলিঙ্গ) শোকার্তা (স্ত্রীলিঙ্গ)।

অলঙ্কার : অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক সমাপ্ত হইতে চলিল—রূপক।

ব্যাকরণগত টীকা : জিজ্ঞেস—তৎসম 'জিজ্ঞাসা'র উচ্চারণ বিকৃতির ফলে ভগ্ন-

তৎসম বা অর্ধতৎসম রূপ। **পুত্তুর**—পুত্র>পুত্তুর—ইহা স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের উদাহরণ। **সক্কলে**—সকলে>সক্কলে; অর্থকে জোরালো করিবার জন্য শব্দের ব্যঞ্জন-বর্ণবিশেষের দ্বিত্ব; ইহাকে বর্ণদ্বিত্বও বলা হয়। অন্যান্য উদাহরণ (বড়>বড্ড) ছোট> ছোট্ট; সকালবেলা>সক্কালবেলা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। নিম্নোক্ত অংশকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর:—

এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখেরই উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি?

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বাক্যে প্রয়োগ কর:—

শোকার্ত; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; সদ্যঃপ্রজ্বলিত; অব্যাহতি; পরিসমাপ্ত; পলকহীন; সজ্ঞোমাতৃহীন; অশনবসন (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)।

৩। বাচ্য পরিবর্তন কর: (ক) বামুন মার মতো আমিও সগ্যে যেতে পারি। (খ) নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইল।

৫। অব্যক্ত জীবন (পৃঃ ২১৪-২২০)

সন্ধি: শবাধার—শব+আধার। মুণ্ডচ্ছেদ—মুণ্ড+ছেদ। বহিরাবরণ—বহিঃ+আবরণ। বর্ণচ্ছত্র—বর্ণ+ছত্র। নিশ্চলতা—নিঃ+চলতা।

সমাস: সংজ্ঞাহীন—সংজ্ঞাদ্বারা হীন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ—শরীর অর্থাৎ শরীর বিষয়কতত্ত্ব (কর্মধারয়); তাহা জানেন যাঁহারা (উপপদ তৎপুরুষ); তাহাদের গণ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। আদান-প্রদান—আদান ও প্রদান (দ্বন্দ্ব সমাস)। পাকযন্ত্রাদির—পাকের জন্য যন্ত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহা আদিতে যাহার (বহুব্রীহি), তাহার। দেহযন্ত্র—দেহরূপ যন্ত্র (রূপক কর্মধারয়)। উষ্ণশোণিত-যুক্ত—উষ্ণ যে শোণিত (কর্মধারয়); তাহার দ্বারা যুক্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। বায়ু-রোগগ্রস্ত—বায়ুজনিত রোগ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার দ্বারা গ্রস্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। শ্বাসযন্ত্র—শ্বাসরূপ যন্ত্র (রূপক কর্মধারয়)।

কারক ও বিভক্তি: বালিকাটি সজীব হইয়া **স্বহস্তে** শবাধারের ডালা ভাঙিয়া সকলকে চমকিত করিল। স্বহস্তে—(করণে 'এ' বিভক্তি)। **ইঁহারা** বলেন—(ইঁহারা কর্তৃকারক)। প্রাণ নামক কোন জিনিষ দেহের কোন বিশেষ **অংশে** নাই—(অংশে অধিকরণে সপ্তমী)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation): ক্রিয়া—√কৃ+আ (ভাববাচ্যে)+আপ্।

জিজ্ঞাসা—√জ্ঞা+সন্ (ইচ্ছার্থে)+অ (ভাববাচ্যে)+আপ্। আহরণ—আ+√হৃ +অনট্ (ভাববাচ্যে)। বিবরণ—বি+√বৃ+অনট্ (ভাববাচ্যে)। ব্যভিচার—ব্যতিক্রম, বি+অভি+√চর্+অ। পরীক্ষা—পরি+√ঈক্ষ্+অ (ভাবে)+আপ্। অবস্থা—অব+√স্থা+অ (ভাববাচ্যে)। মৌলিক—মূল+ইক্ (মূল সম্বন্ধীয়)। আণবিক—অণু+ইক (অণু সম্বন্ধীয়)।

পদান্তর: শীতলতা (বিশেষ্য) শীতল (বিশেষণ)। সংজ্ঞাহীনতা (বিশেষ্য) সংজ্ঞাহীন (বিশেষণ)। শরীর (বিশেষ্য) শারীরিক (বিশেষণ)। সজীব (বিশেষণ) সজীবতা (বিশেষ্য)। সন্দিহান (বিশেষণ) সন্দেহ (বিশেষ্য)। আলোচনা (বিশেষ্য) আলোচনীয়, আলোচিত (বিশেষণ)। আধিপত্য (বিশেষণ) অধিপতি (বিশেষ্য)। আচ্ছাদিত (বিশেষণ) আচ্ছাদন (বিশেষ্য)। চঞ্চল (বিশেষণ) চাঞ্চল্য (বিশেষ্য)।

বিপরীতার্থক শব্দ: শীতলতা—উষ্ণতা; উন্নত—অবনত; সজীব—নির্জীব; নিশ্চিত—অনিশ্চিত, সন্দিগ্ধ; সুলভ—দুর্লভ; নিষ্ক্রিয়—সক্রিয়; নিশ্চেষ্ট—সচেষ্ট।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন: যে সকল প্রাণীর রক্ত শীতল তাহাদিগের মধ্যে অব্যক্ত জীবন বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায় (জটিল)—শীতল শোণিতযুক্ত প্রাণীদিগের মধ্যে অব্যক্ত জীবন বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায় (সরল)।

এই ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই (সরল)—এই ঘটনা যে সত্য তাহাতে সন্দিহান হইবার কারণ নাই (জটিল)। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)

ব্যাকরণগত টীকা: কমাইয়া—কম্ (বিশেষণ হইতে বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু) +আ (প্রেরণা বুঝাইতে)+ইয়া=কমাইয়া; সুতরাং পদটি বাঙলা প্রেরণার্থক (তথাকথিত ণিজন্ত) ক্রিয়ার উদাহরণ।

অনুশীলনা

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ:—

শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ; মুণ্ডচ্ছেদ; জড়পদার্থ; বায়ুরোগগ্রস্ত; উষ্ণশোণিতযুক্ত।

২। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর: প্রদান; বিবরণ; অপনীত; মূর্তিমান; ব্যভিচার।

৩। বাক্য বিশ্লেষণ কর:—

দেহের সজীব কোষগুলির সমবেত জীবনীশক্তি যে প্রাণী বা উদ্ভিদে অধিক সেই জীবকেই আমরা খুব সপ্রাণ দেখি। [অনু ৯, পৃ: ২১৮]।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর:—

সংজ্ঞাহীনতা; সজীব; অনুমান; আচ্ছাদিত; আধিপত্য; শীতলতা; শারীরিক; সন্দিহান; লক্ষিত; চাঞ্চল্য।

৫। নিম্নলিখিতগুলিকে সংক্ষেপে প্রকাশ কর :—

যাহার জীবন আছে ; যার চেষ্টা মোটেই নাই ; যাহা লেখাতে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে ; যাঁহারা জীবের তত্ত্ব জানেন ; যাহা খাইবার যোগ্য।

৬। **সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত—আল্-বেরুনী** (পৃঃ ২৪৮-২৫৬)

সন্ধি ঃ সংস্কৃতি—সম্ + কৃতি। সমন্বয়—সম্ + অন্বয়। মনোভাব—মনঃ + ভাব। নিরপেক্ষ—নিঃ + অপেক্ষ। গবেষণা—গো + এষণা। জ্ঞানানুসারে—জ্ঞান + অনুসারে। সর্বোচ্চ—সর্ব + উচ্চ। বিজ্ঞানালোচনার—বিজ্ঞান + আলোচনার। বিদ্যার্জন—বিদ্যা + অর্জন। দুর্লভ—দুঃ (দুর্) + লভ। শৃঙ্খলাবদ্ধ—শৃঙ্খল + আবদ্ধ।

সমাস ঃ সংস্কৃতিগত—সংস্কৃতিকে গত (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। আচারপদ্ধতি—আচার ও পদ্ধতি (দ্বন্দ্ব সমাস)। শিক্ষাদীক্ষা—শিক্ষা ও দীক্ষা (দ্বন্দ্ব সমাস)। সমন্বয়-সাধন—সমন্বয়ের সাধন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। ধীশক্তি-সম্পন্ন—ধীর শক্তি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। তাহার দ্বারা সম্পন্ন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। দাসমনোভাব—মনের ভাব (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ; দাসসুলভ মনোভাব (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। সংস্কৃত-সমন্বয়—সংস্কৃতির সমন্বয় (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। প্রাণখোলাভাবে—খোলা ভাব (কর্মধারয়) ; প্রাণের খোলা ভাব যাহাতে (বহুব্রীহি)। অপক্ষপাতপূর্ণ—পক্ষে পাত (সপ্তমী তৎপুরুষ) ; পক্ষপাতে পূর্ণ (তৃতীয়া তৎপুরুষ) ; নয় পক্ষপাতপূর্ণ (নঞ্ তৎপুরুষ)। যুক্তিপূর্ণ—যুক্তি দ্বারা পূর্ণ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। জাতিধর্মনির্বিশেষে—জাতি ও ধর্ম (দ্বন্দ্ব সমাস) ; তাহাদের নির্বিশেষ যাহাতে—(বহুব্রীহি)। বিশেষভাবে—বিশেষ ভাব যাহাতে (বহুব্রীহি)। একাদেশদর্শী—এক-দেশ দর্শন করে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) দেশ বিজয়ের **বাসনা তাহার** বহু পরে হয়। (বাসনা—'হয়' ক্রিয়ার কর্তা, তাহার—'পরে' শব্দের যোগে ষষ্ঠী)। (খ) সমগ্র বেদটা একখানি গ্রন্থ, যদিও ইহা চারি **ভাগে** বিভক্ত (অধিকরণে সপ্তমী)।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) **ঃ** অপরিহার্য—নঞ্—পরি√হৃ + ণ্যৎ (য) (কর্মবাচ্যে) সংস্কৃতি—সম্ + √কৃ + ক্তি (Culture)। অবহেলা—অব + √হেড্ + অল্ (ভাববাচ্যে) + আপ্। অভিজ্ঞতা—অভি + √জ্ঞা + অ (কর্তৃবাচ্যে) তা (ভাবে)। পরিশ্রম—পরি—শ্রম + ঘঞ্ (ভাববাচ্যে)। দুর্লভ—দুর্ + √লভ্ + অল্ (কর্মবাচ্যে)। মানসিকতা—মনস্ + ষ্ণিক্ + তা (ভাববাচ্যে)। আরাধনা—আ + √রাধ্ + অন্ (ভাববাচ্যে) + আপ্। বিশ্বাস—বি + √শ্বস + অ (ভাববাচ্যে)। পৌরহিত্য—পুরোহিত + ষ্যঞ্ (য)। প্রেরণা—প্র + √ঈর্ + অন্ (ভাববাচ্যে) + আপ্।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ঃ কোনওরূপ রং ফলাইয়া লিখি নাই—এস্থলে **'রং ফলাইয়া'**

অর্থাৎ অতিরঞ্জন করিয়া। ইহাতে অনেক গাল-গল্প থাকিলেও—এস্থলে 'গাল-গল্প' অর্থাৎ মনগড়া বা কাল্পনিক-গল্প।

পদান্তর : সম্প্রদায় (বিশেষ্য) সাম্প্রদায়িক (বিশেষণ)। কার্যকরী (বিশেষণ) কার্যকর (বিশেষ্য)। প্রতিপন্ন (বিশেষণ) প্রতিপত্তি (বিশেষ্য)। আধ্যাত্মিক (বিশেষণ) আধ্যাত্ম (বিশেষ্য)। দর্শন (বিশেষ্য) দার্শনিক (বিশেষণ)। সাহিত্য (বিশেষ্য) সাহিত্যিক (বিশেষণ)। জ্যোতিষ্ক (বিশেষ্য) জ্যোতিষিক (বিশেষণ)। ব্যাকরণ (বিশেষ্য) বৈয়াকরণ (বিশেষণ)। অতিরঞ্জন (বিশেষ্য) অতিরঞ্জিত (বিশেষণ)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : সংস্কৃতি ধর্ম হইতে আলাদা বস্তু (অস্তিবাচক)—সংস্কৃতি এবং ধর্ম একবস্তু নয় (নেতিবাচক)। যে পথ এতদিন বন্ধ ছিল, মনীষী আল্-বেরুনী তাহা বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন (জটিল)—এত দিনের বন্ধপথ আল্-বেরুনী বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন (সরল)।

বিপরীতার্থক শব্দ : সভ্যতা—অসভ্যতা ; ক্ষীণতা—তীক্ষ্ণতা ; উন্নতি—অবনতি ; কঠিন—কোমল ; স্বাধীনতা—পরাধীনতা ; নিরপেক্ষ—সাপেক্ষ ; সত্য—মিথ্যা ; যোগ্য—অযোগ্য ; বিখ্যাত—কুখ্যাত, অখ্যাত।

ব্যাকারণগত টীকা : যথেষ্ট—ইষ্টকে অতিক্রম না করিয়া (অব্যয়ীভাব) বা 'যথা ইষ্ট' (সুপ্ সুপা সমাস) ইহাকে ব্যাসবাক্যে সমাস করিলে 'যথেষ্ট' পদটি হয়। বাঙলায় কিন্তু 'যথেষ্ট' শব্দটির প্রয়োগ এইরূপ অর্থে হয় না, প্রধানতঃ 'প্রভূত' অর্থে হয়। সুতরাং বাঙলায় 'যথেষ্ট'-কে সমাসবদ্ধ শব্দ না বলিয়া একটি শব্দ বলিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর :—

ক্ষীণতা ; প্রতিপন্ন ; জগৎ ; সহযোগিতা ; জাতিধর্মনির্বিশেষে ; মানসিকতা; ধর্ম-বর্ণনা; পৌরোহিত্যের ; অপক্ষপাতপূর্ণ ; দার্শনিকের ; একাগ্রচিত্ত ; একদেশদর্শী।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :

মানবীয়, প্রভাব, বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য, প্রেরণা, বিতরণ, মানসিকতা, আরাধনা।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :

আচার-পদ্ধতি ; সমন্বয়-সাধন ; সংস্কৃতি-সমন্বয় ; বিশেষভাবে ; ধীশক্তি-সম্পন্ন ; অপক্ষপাতপূর্ণ ; জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে ; জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ; ঈশ্বরপ্রেরিত।

৪। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নির্দেশানুসারে পরিবর্তন কর :

বিজ্ঞানালোচনার জন্য যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি আর্যদের জানা ছিল। (আর্যদের পদটিকে কর্তৃপদরূপে ব্যবহার কর)।

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

[প্রথম পত্র ১৯৬৩]

১। উপযুক্ত শব্দ সহযোগে শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর—

ধন্য, আশা কুহকিনি। তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন,——ত্রিভুবন।
——মানবমনোমন্দিরে তোমায়
যদি না——বিধি, হায়, অনুক্ষণ
নাহি——তুমি যদি সে মন্দিরে শোক,
——ভয়, ত্রাস নিবাসপ্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য——নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দিরশোভা!——নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী——ছাড়িয়া আবাস ;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।

২। যে কোন **তিনটির** উত্তর দাও :—

(ক) যে কোন **পাঁচটির** প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দেশ কর :—

(i) প্রবাহ। (ii) ফণী। (iii) জিজ্ঞাসা। (iv) অভ্যস্ত। (v) অজ্ঞেয়। (vi) প্রকাশিত। (vii) নিস্তব্ধ। (viii) পরিত্যাগ।

(খ) যে কোন **পাঁচটি** শব্দের অবলম্বনে **পাঁচটি** সার্থক বাক্য রচনা কর :—

(i) মানবধর্ম। (ii) রাশীকৃত। (iii) শশব্যস্ত। (iv) রবাহূত। (v) বৈপরীত্য। (vi) পরিবেষ্টনী। (vii) কর্মনাশা। (viii) চড়ন্দার।

(গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :—

ঈশ্বর এসব চেঁচামেচিতে কর্ণপাত করলে না। তারপর, যখন যে উঠে দাঁড়াল, তখন দেখি সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বলছে আর শরীরট হয়েছে ইস্পাতের মতো।

(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর :—

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, তুমি বিবেচনা না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিদুর পিতা পিতামহ ও আচার্য্য দ্রোণ তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না।

(ঙ) **পাঁচটি** শব্দের গদ্যরূপ লেখ :

(i) লভিনু। (ii) নারিলি। (iii) উঠে ঝনঝনি। (iv) ত্যজিলে। (v) জিনিবারে। (vi) মথিয়া। (vii) উজলে (viii) অর্পিব।

প্রশ্নোত্তরে বাঙলা—প্রথম পত্র (১৯৬৫)

[ব্যাকরণ অংশ]

উক্তি পরিবর্তন কর :

১। (ক) প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আসব না তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব।"

যুবা কহিলেন, যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থ দরশনে যেরূপ পরকাজের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পাবে।'

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

(খ) হেদাৎ উল্লা ঈশ্বরকে বল্লে—ধর বেটা সড়কি।

(গ) ইন্দ্র বলিল—"তুই ক্ষেপেছিস, শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?"

আমি (শ্রীকান্ত) বলিলাম—"তোমারই বা কি দোষ ইন্দ্র! তুমিই বা কেন যাবে?" ইন্দ্র কহিল—"আমারও দোষ নেই, ভাই আমি নতুনদাকে আনতে চাইনি। কিন্তু একলা ফিরেও যেতে পারব না, আমাকে যেতেই হবে।"

(ঘ) দুর্যোধন কৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি বিবেচনা না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিদুর পিতা, পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না।"

চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :

২। (ক) প্রস্থান সময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন।

উত্তর : প্রস্থানের সময় উপস্থিত হল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত শকুন্তলার সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা যতটুকু সম্ভব পোশাক আশাক ঠিকঠাক করে দিলেন।

(খ) শিখর নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা, এই যবনিকা অতিক্রম করিলে দৃষ্টি অবারিত হইবে। তুষার নদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিয়াছে।

আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তর স্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

উত্তর ঃ শিখর তুষার নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিচের উপত্যকায় পড়ছে। সামনে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা, এই যবনিকা অতিক্রম করলেই দৃষ্টি অবারিত হবে। তুষার নদীর উপর দিয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করতে লাগলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হতে এসেছে। আসবার সময় পর্বত দেহ ভগ্ন করে প্রস্তরস্তূপ বহন করে এনেছে। সেই প্রস্তর এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত রয়েছে।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যরূপ লিখ ঃ—

তিতিল, দোঁহে, বিদারিছে, রনরনি, পরমাদ, রাঙিয়া, নেহারে, ধাঁধিতে, জীয়াতে, মাগিতে।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ—

সব্যসাচী, অতলস্পর্শ, প্রকৃতিস্থ, অশনবসন, রাসায়নিক, বাহ্যাড়ম্বর, প্রগল্‌ভ, ব্যাপকতা, পুরুষানুক্রমে, সন্তর্পণে।

৫। অর্থের যথাযথতা বজায় রাখিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি নির্দেশানুসারে পরিবর্তন কর—

(ক) এই ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। [মিশ্র বাক্যে পরিবর্তিত কর]।

(খ) রাজা ভাগিনাকে বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আন তো, দেখি [উক্তি পরিবর্তন কর]।

(গ) সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি। [আলোচনাকে কর্তৃপদে ব্যবহার কর]।

(ঘ) কমলাকান্তের মনের কথা এজন্মে আর বলা হইল না [না বাদ দাও।]

(ঙ) ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল [ইন্দ্রকে সম্বন্ধ পদরূপ ব্যবহার কর।]

(চ) ভাগ্যে এমন সব উপমা কদাচিৎ চোখে পড়ে। [নেতিবাচক কর]

(ছ) সংস্কৃত ধর্ম হইতে আলাদা বস্তু। [নেতিবাচক]

(জ) এই ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। [জটিল বাক্যে রূপান্তরিত কর]

(ঝ) সে লোকের মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়। [সরল বাক্যে রূপান্তরিত কর]

(ঞ) কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মরা পোড়ান দেখতে গেলি? [হাঁ-বোধক বাক্যে রূপান্তরিত কর।]

(ট) এরূপ বলি না যে ইহা শিক্ষানিরপেক্ষ। ['শিক্ষানিরপেক্ষ' শব্দটির সমাস ভাঙ্গিয়া ব্যবহার কর]

(ঠ) আপনি তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন ['পুত্রের ন্যায়' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে একটি তদ্ধিতান্ত শব্দ ব্যবহার কর।।

(ড) সূচীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয় তাও আমি ছাড়িব না। [রেখাঙ্কিত শব্দগুলি এক পদে পরিণত কর]

৬। রেখাঙ্কিত পদগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ :—

(ক) নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর

(খ) অনুবীক্ষণ নামে একটি যন্ত্র আছে যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়।

(গ) সন্ন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন।

(ঘ) হুজুর আমি মন্তর তন্তর কিছুই জানি না।

(ঙ) শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী।

(চ) মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে।

(ছ) ব্রাহ্মণ ফলাহারের পরে দক্ষিণা না লইয়া বাড়ী ফিরিতেন না।

(জ) বঙ্গ ভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইত।

(ঝ) বনমর্মরে ত্রস্ত চকিত মৃগদল।

(ঞ) হউক বসন্ত রাণী গৌরাঙ্গিণী হে শ্যামা বরষা।

তৃতীয় খণ্ড

উপপাঠ্য গ্রন্থসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাব-সম্প্রসারণ (Amplification)

চিন্তাবীর শিল্পীদের রচনায় ক্ষুদ্র কথার মধ্যে বৃহৎ ভাবের ব্যঞ্জনা অনেক সময়ই নিহিত থাকে। বীজের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে মহামহীরুহের ইঙ্গিত। শিল্পীর গভীর এবং নিবিড় অনুভূতি, ধ্যান, কল্পনা ইত্যাদি স্বল্প পরিসরে আশ্রিত ব্যাঙ্গার্থবোধক বাক্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশক হয়। যে গভীর ভাবের ব্যঞ্জনা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই গভীর ভাব ব্যঞ্জনাকে বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট করিয়া তোলাই ভাব-সম্প্রসারণের কাজ। অতএব ভাব সম্প্রসারণ ভাবার্থ-ব্যঞ্জক উক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধের সহিত তুল্য। যদিও ভাব-সম্প্রসারণের আকৃতি কখনো প্রবন্ধের ন্যায় হইবে না। তথাপি প্রকৃতির দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বর্তমান। প্রবন্ধে যেরূপ কোন বিশেষ বিষয়ের উপর নিজস্ব চিন্তা, কল্পনা বা জ্ঞানকে বিচার এবং বিশ্লেষণ করিয়া সাজাইতে হয়, ভাব-সম্প্রসারণেও সেইরূপ কোন বিশেষ ভাবার্থবোধক উক্তি সম্বন্ধে নিজস্ব চিন্তা বা ধারণাকে সাজাইয়া নির্দিষ্ট ভাব-ব্যঞ্জক উক্তির সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করিতে হয়।

ভাব-সম্প্রসারণ রচনা পদ্ধতি : সাধারণতঃ পদ্যে ব্যাঙ্গার্থবোধক এবং গভীর ভাবব্যঞ্জক উক্তি অধিক দেখা যায়। পদ্যই হোক বা গদ্যই হোক প্রথমেই ভাবার্থ-ব্যঞ্জক উক্তিটি বার বার পাঠ করিতে হইবে, যাহাতে তাহার প্রকৃত অর্থটি অনুধাবন করা যায়। যতক্ষণ না প্রকৃত অর্থটি বোধগম্য হইতেছে ততক্ষণ ভাবঘন উক্তিটি সম্পর্কে চিন্তা করিতে হইবে। চিন্তার মাধ্যমে ইঙ্গিত-বাহী ভাবঘন বিষয়ের বক্তব্য বা প্রকৃত অর্থ অনুধাবিত হইলে তখন তাহাকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার ভাষা এবং [illegible]ব্য বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। তাহার পর ভাব-সমৃদ্ধ বিষয়টির ভাবটিকে সুস্পষ্ট এবং য[illegible]ব বিস্তৃত করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। ভাবঘন বিষয়ের ব্যাঙ্গার্থকে অনুধাবন করাই ভ[illegible]ণের প্রধান এবং প্রথম কাজ। উক্ত অনুধাবিত বিষয়কে উপযুক্ত ভাষার মাধ[illegible]মে সুস্প[illegible] প্রকাশ করাই ভাব-সম্প্রসারণের দ্বিতীয় এবং মূল কাজ। [illegible]তএব ভাব-সম্প্রসারণ রচন[illegible]তি :

(১[illegible] **ভাব-ঘন বিষয়ের প্রকৃত অ[illegible]াবন।**

(২[illegible] **অনুধাবিত বিষয়টিকে সুস্পষ্ট[illegible] প্রকাশ।**

[illegible]ই পরিচ্ছেদে আমরা উচ্চতর মাধ্যমিক পরী[illegible] নির্বাচিত উপপাঠ্য গ্রন্থগুলি হইতে[illegible] কতকগুলি বিশেষ পংক্তির ভাব-সম্প্রসারণে[illegible] দৃষ্টান্ত দিলাম। এই সকল ভাব-সম্প্র[illegible]রণ পাঠান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ভাব-সম্প্রসা[illegible] সম্বন্ধে সুস্প[illegible] ধারণা জন্মিবে।

বলিয়া আশা করি। মনে রাখিতে হইবে, এই সকল বিশেষ পংক্তির ভাব-সম্প্রসারণ বাদেও পরীক্ষক ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য অংশের ভাব-সম্প্রসারণ করিতে দিতে পারেন। সেই কারণে ছাত্র-ছাত্রীগণকে অবশ্যই অন্যান্য ভাব-সম্প্রসারণ যোগ্য পংক্তির ভাব-সম্প্রসারণ অনুশীলন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, ভাব-সম্প্রসারণ বা এই জাতীয় অন্যান্য রচনা বিশেষ বিষয়ের ভিত্তিতে স্ব-চিন্তার স্বচ্ছ প্রকাশ। নিজস্ব যথার্থ চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত ভাব-সম্প্রসারণই হইবে সার্থক ভাব-সম্প্রসারণ।

গাথাঞ্জলি (নবম শ্রেণীর পাঠ্য)

[১] "তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর,
সেই বৈষ্ণব,—জয়গৌরব ভাবে না সে কভু বড়ো!" (পৃঃ ৩)

প্রকৃত বিষ্ণু উপাসক (বৈষ্ণব) জাগতিক লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়ের উর্ধ্বে অবস্থান করেন। কারণ, তিনি জানেন মানুষের শক্তি সীমিত। কিন্তু সাধারণ মানুষ ক্ষমতার বলে বলীয়ান হইয়া হয় অহংকারে মত্ত। জাগতিক লাভ বা জয় তাহার কাছে অমিত উল্লাসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আবার ক্ষতি বা পরাজয় তাহার জীবনে গভীর দুঃখ বহিয়া আনে। লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় তাহার জীবনকে যথাক্রমে সুখ এবং দুঃখের নাগরদোলায় উত্থিত করে, আবার পতিত করে। দৈন্যে সে পায় বেদনা, সম্পদে লাভ করে আনন্দ। অহংকারী মানুষের অহংকার হয় চূর্ণ। রাজা হয় পথের ভিখারী। সীমিত শক্তিসম্পন্ন মানুষ নিজ ভাগ্যের দ্বারা হয় চালিত। অদৃশ্য ভগবৎশক্তি মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাই যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব হইবেন তাঁহাকে এই জাগতিক জয়-পরাজয় বা লাভালাভের আনন্দ এবং দুঃখ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে হইবে। জাগতিক দৈন্যের আঘাত তাহার সদানন্দ চিত্তকে ব্যথিত করিতে পারিবে না। নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিয়াও বৃক্ষ যেরূপ নিশ্চল এবং নিরব থাকে বৈষ্ণবকে তদ্রূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে। পার্থিব সম্পদের প্রতি তার কোন মোহ থাকিবে না। তৃণ অতি ক্ষুদ্র। মানুষ তাহাকে পায়ে দলিয়া পথ চলে। ত[illegible] অঙ্গে নিত্য নূতন শ্যামলিমা, প্রফুল্লতা দেখা যায়। দুঃখ এবং নির্যাতন[illegible] উপেক্ষা করিয়া খাঁটি বৈষ্ণবকেও শিশিরস্নাত তৃণের মতো প্রফুল্ল থাকিতে হইবে। সুতরাং জয়-পরাজয় এবং লাভ-ক্ষতি তাহার হৃদয়কে কখনো দোলায়িত করে না।

[২] "মহান্ যাহার প্রাণ,
দেশের [illegible]র, লক্ষ লক্ষ প্রজাদের কল্যাণ
সাধন করিতে নিজের জীবন দিতে
প্রস্তুত যেবা, অমর সেইত এই মর ধরণীতে।" (পৃঃ ১২)

মানুষের দেহ ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যু তাহাকে বরণ করিতেই হইবে। তাই যাহা চিরসত্য তাহাকে সুন্দররূপে বরণ করাই কর্তব্য। সত্য মাত্রই সুন্দর। সুতরাং মরণকেও সুন্দররূপেই বরণ করা উচিত। যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে, মরণ তাহাদের নিকটই কুৎসিত এবং ভয়াবহ; মৃত্যুভয়ে তাহারা জীবৎকালেও মুমূর্ষু। মৃত্যুর এই সৌন্দর্য যে মহাপ্রাণ উপলব্ধি করিয়াছে, মৃত্যু তাহাকে বিলুপ্ত করিতে পারে না। পরার্থে মৃত্যুবরণই সার্থক-সুন্দর মৃত্যু। হাজার মানুষের জীবনানন্দের প্রয়োজনে যে মানুষ জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত সে মরিয়াও অমর। ক্ষণস্থায়ী জীবনে সেই তো সার্থক মৃত্যু। ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ সে মৃত্যু বরণে কুণ্ঠিত। মহাপ্রাণ মানুষ মরণের সত্যরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। তাই পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া সে চিরসুন্দর মৃত্যুর মহালগ্নকে বরণ করে। সুতরাং মর ধরণীতে সেই ত্যাগের অমৃতপায়ী মানুষ মরিয়াও অমর।

[৩] "যে মহাসাধক মরণও করেছে জয়,
মৃত্যুদণ্ড তাহার দণ্ড নয়।" (পৃঃ ১৯)

মানবজীবনে সর্বাপেক্ষা বড় দণ্ড নিশ্চই মৃত্যুদণ্ড। কেননা মৃত্যুতেই মানুষের পার্থিব দেহের সমাপ্তি। জগতে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং জয়-পরাজয় দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এ সকলেরই বিলুপ্তি ঘটে। তবুও ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ সুখ-পিয়াসী। জীবনের গভীর দুঃখ এবং নির্যাতনের মধ্যেও সে ভবিষ্যতের স্বর্ণস্বপ্ন দেখে। সুখ-দুঃখ তরঙ্গায়িত জীবনে মানুষ সব সময়েই আনন্দ-সন্ধানী। এক কথায় মানুষ জীবনকে বড় ভালোবাসে। ক্ষণস্থায়ী জীবনে শত দুঃখ লাঞ্ছনার মধ্যেও সে দীর্ঘায়ু কামনা করে। তাই মৃত্যুদণ্ড মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় শাস্তি।

কিন্তু মহাসাধক ব্যক্তি জীবন-মৃত্যুর গভীর তত্ত্বে বোদ্ধা। তাঁরা জানেন মৃত্যুতে [illegible]লমাত্র দেহের অবসান। আত্মা অবিনাশী। সুতরাং সেই মহা-প্রাজ্ঞ মানুষ এই দৈহিক বিনা[illegible] তুচ্ছজ্ঞান করেন। এইভাবে দৈহিক মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাঁহারা হন মৃত্যুঞ্জয়। [illegible] মৃত্যুঞ্জয়, তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেও তাঁহার নিকট উহা দণ্ড বলিয়াই মনে হয় না।

[illegible]৪ । "ভয়ে প্রাণ মান করি[illegible] দান প্রেম সেত সঁপিবে না,
টাকা দিয়া শুধু মাথা কেনা [illegible]হৃদয় যায় না কেনা।" (পৃঃ ২০)

ক্রী[illegible]সত্ব প্রথায় আমরা পরিচয় পাইয়াছি যে [illegible] দিয়া মানুষকে কেনা চলিত। এখনও দেখা যায় যে ঐশ্বর্যশালী মানুষ অর্থবলে [illegible] দাসানুদাস করিয়া রাখে। দরিদ্র এবং দুর্বল মানুষ অসহায় পরিস্থিতিতে ঐশ্বর্যে[illegible] বল প্রয়োগের নিকট নিজের প্রাণ, মান সবই অনেক সময় সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। [illegible] বা সম্পদে[illegible] কাছে দুর্বল

এবং দীনকে নতি স্বীকার করিতে হয়; এইভাবে শক্তিশালী মানুষ ইচ্ছা করিলে দুর্বল বা দীনের মান, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত আদায় করিতে পারে।

কিন্তু ঐ শক্তি বা সম্পদ বলে যাহা আদায় করা যায় না, তাহা হইতেছে প্রেম। প্রেম কাহারও নিকট হইতে মানুষ কাড়িয়া লইতে বা অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে পারে না। হৃদয়ের ভালোবাসা সংগ্রহ করিতে হইলে বিনিময়ে শক্তি বা সম্পদ প্রয়োগে চলিবে না; নিজের হৃদয় হইতেও ভালোবাসা দিতে হইবে। অর্থ বা বলের কাছে দীন বা দুর্বল মানুষ তাহার প্রাণ বা মান অনেক সময়ই সমর্পণ করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহার হৃদয়ের ভালোবাসা সে প্রেমিক হৃদয়েই সমর্পণ করিবে। জগতে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা। সে ভালোবাসা ভয়, বল বা অর্থের নিকট নতি স্বীকার করে না। ভালোবাসার জয়-পরাজয় একমাত্র ভালোবাসার নিকটে।

[৫] "মরণ যখন অনিবার্যই হাসিয়াই চলে যাই,
রক্ষক যেথা ভক্ষক সেথা মরা সেত বাঁচিয়াই" (পৃঃ ২৬)

মানুষ অমৃতপায়ী অমর নয়। মৃত্যু তাহার দুয়ারে উপস্থিত হইবেই। যমরাজের এই নিষ্ঠুর নীতির হাত হইতে কাহারও রক্ষা নাই। তাই বুদ্ধিমান মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না। মৃত্যুকে তাহারা শোকপূর্ণ বা অশ্রুসজল করিয়া তোলে না। অনিবার্য মৃত্যুকে হাসিতে হাসিতেই তাহারা বরণ করে। যাহা সত্য তাহা নিষ্ঠুর বা বিয়োগান্তক হইলেও তাহার জন্য দুঃখ বা শোক প্রকাশ করা মূঢ়তা মাত্র। বরং সত্যকে আনন্দে, সহাস্যে বরণ করিলেই বিয়োগজনিত বেদনা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

বিশেষতঃ কোন কারণে জীবন যদি বিষময় হইয়া উঠে তাহা হইলে সেই জ্বালা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ। যিনি রক্ষাকর্তা, মানুষের জীবনের সুখ-শান্তি যাহার উপর নির্ভরশীল তিনিই যদি দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে জীবনের কোন মূল্যই [illegible] মানুষ জীবনে সুখ এবং শান্তি পাইতে চায়। জীবন যদি কেবলমাত্র [illegible] ভরপূর হইয়া উঠে যিনি সুখ দান কর্তা তিনিই যদি অ-সুখের কারণ [illegible] তাহা হইলে মানুষ হয় জীবন্মৃত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত জীবন মৃত্যুরই সমা[illegible] শান্তির নিয়ামক রক্ষকই যদি শোষণকারী, অত্যাচারী, জীবনে যন্ত্রণা এবং অ-সুখের [illegible] হন, তাহা হইলে জীবনে বাঁচা অপেক্ষা মৃত্যুই ভালো। সুখ-শান্তি আকাঙ্ক্ষ[illegible] জীবনে কেবলমাত্র যন্ত্রণা এবং [illegible] না মৃত্যুরই তুল্য। অত্যাচারী রক্ষকের [illegible]ট হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করা যা[illegible] তাহাতে অত্যাচারীর নৈতিক পরা[illegible] ঘটে। দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত মানুষ যদি হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে, তাহা [illegible]লে সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়াও সে জয়ের উ[illegible]দ প্রকাশ করিয়া যায়।

[৬] "যোগি-ঋষিগন জ্ঞানে ধ্যানে তপে দেখিতে না পায় যাঁরে,
সহজ সরল প্রেমভক্তিতে গৃহে পাওয়া যায় তাঁরে।
শিশুর মতন অকপট মন তাই চান ভগবান।
চান নাক তিনি তপ জপ-জ্ঞান বিদ্যার অভিমান।" (পৃঃ ৪১)

ভগবান মানুষের অন্তরের সহজ, সরল এবং একনিষ্ঠ ভক্তি কামনা করেন। বহুবিধ পূজার উপচার আর শঙ্খঘণ্টা বাদ্যধ্বনি মুখরিত মন্দিরেও তাঁহার দেখা মেলে না, যদি আরাধকের আন্তরিক ভক্তি না থাকে। বাহ্যিক জাঁকজমকের মাধ্যমে অন্তরের ঠাকুর দর্শন পাওয়া যায় না। অন্তরের প্রদীপ্ত প্রার্থনার কাছে বহিরঙ্গের বিবিধ উপকরণ মিথ্যা। ভগবান এইরূপ অন্তরের সহজ ও সরল ভক্তির কাছেই প্রত্যক্ষ হন। ভগবানকে পাওয়ার জন্য মানুষ কত জপ-তপ, কত জ্ঞান-বিদ্যার আয়োজন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের এই জপ-তপ বা জ্ঞান-বিদ্যার জটিলতার অন্তরালে হৃদয়ের সহজ ও সরল একনিষ্ঠ ভক্তিবোধ নষ্ট হইয়া যায়। ভগবান ঐ জপ-তপের কঠিন বিধির মাধ্যমে শুষ্ক ভক্তি প্রার্থনা করেন না। তিনি চান শিশুর মতো অকপট সরল হৃদয়। শিশু স্বার্থান্ধ জগতের জটিলতার সহিত পরিচিত নয়। জাগতিক লাভ ক্ষতির হানাহানি তাহার অন্তরের সারল্যকে ধ্বংস করিতে পারে নাই। তাহার সেই সরল হৃদয়ের কামনা বাসনা সবই অপাপবিদ্ধ, সহজ এবং সুন্দর। ভগবান ভক্তের নিকট এইরূপ সহজ, সুন্দর এবং একনিষ্ঠ ভক্তির কাছেই ধরা দেন। যোগি-ঋষিগণ অনেক সংযম জপতপের পরেও ভগবানের দর্শন পান না।

[৭] "শুধু হাত দিয়ে সেবা নয় সেবা, নাহি সেবে যদি প্রাণ,
শ্রদ্ধার সহ না দিলে ব্যর্থ রাজভোগ্যেরও দান।" (পৃঃ ৫০)

[illegible]ই ভগবৎ সেবা। কিন্তু এই সেবা যদি হৃদয়ের অনাবিল সেবা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে [illegible] চলে না। আন্তরিক অতিথি-সৎকার প্রবৃত্তি যদি না থাকে, বাহিরে ভূরিভোজ্য সামগ্রী প্রদান করিলেও তাহা প্রকৃত সেবা হইবে না। সেবার পশ্চাতে থাকা চাই [illegible] মন। অশ্রদ্ধার সহিত সেবা—সেবার অভিনয় মাত্র। অশ্রদ্ধার সহিত রা[illegible]ভোগ্য সামগ্রী প্রদান করিলেও সেই সেবা ব্যর্থ হইবে। সেবার সহিত হৃদয়ের শ্রদ্ধা [illegible] বর্তমান থাকে, তাহা হইলে সামান্য সাম[illegible] দ্বারা সেবাও প্রকৃত সেবা পদবাচ্য।

[[illegible]] "পরের বেদনা সেই বুঝে শুধু যেজন ভুক্ত[illegible]গী,
রোগযন্ত্রণা সে কভু বুঝে না হয়নি যে কভু [illegible]।" (পৃঃ ৫[illegible])

দুঃখকে উপলব্ধি করিতে হইলে দুঃখের সহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। সুখ এবং সমৃদ্ধির মধ্যে থাকিয়া দুঃখের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব। দুঃখের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকিলে দুঃখের প্রতি একপ্রকার কৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করা চলে; কিন্তু গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা যায় না। গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারে, যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে একমাত্র ভুক্তভোগী। যেমন রোগী ভিন্ন অপরে রোগের প্রকৃত যন্ত্রণা যে কত জ্বালাময় তাহা বুঝিতে পারে না। অন্য একটি কবিতার সহিত তুলনীয়:

"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে
কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

[৯] "যত পুঁথিগত জ্ঞানবিদ্যার ভার, সকলি অসার,
ভবনদী পারে কি মূল্য আছে তার?" (পৃঃ ৫৬)

গ্রন্থ পাঠান্তে লৌকিক জগতে যে মানুষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন তাঁহাকেই আমরা বলি বিদগ্ধজন। এই বস্তুজগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখায় তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানবর্তিকা উজ্জ্বল করিয়া ধরেন। সমাজ তাঁহাদের প্রশংসায় মুখরিত হইয়া উঠে। জাগতিক খ্যাতির বরমাল্য তাঁহাদের অহংকারের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই পুঁথিগত জ্ঞান-বিদ্যা তাঁহাকে জগতের এবং নশ্বর জীবনের অতিরিক্ত কিছু সন্ধান দিতে পারে না। পুস্তকে সত্যের চর্চা করিয়াও তাঁহারা প্রকৃত সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান কোন দিনই পান না। জীবন এবং জগতের ঊর্ধ্বেও যে মহাসত্য বর্তমান তাহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে এই সকল বিদ্যাই অসার।

যে বিদ্যা ঐ সত্য-স্বরূপের সন্ধান দিতে পারে তাহার নাম আধ্যা[illegible] গ্রন্থ-চর্চায় এ বিদ্যা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এ [illegible]ন প্রকৃত সত্য-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হইলে চাই শ্রদ্ধা, ত্যাগ, [illegible] এবং সংযম। চাই চরিত্র-শক্তি। এ বিদ্যা পুস্তকের কালো অক্ষরে লেখা [illegible] এ বিদ্যা মননসাপেক্ষ। এই আধ্যাত্ম-বিদ্যার মাধ্যমে শোক, দুঃখ, [illegible] প্রস্তু জীবন এবং জগৎ হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করে। এ বিদ্যা মানুষের জীব[illegible]চেতনায় জাগ্রত করে সদানন্দ অনুভূতি। অতএব পুঁথিগত জ্ঞান-বিদ্যা ভবনদী[illegible] ওপারে নিষ্ফল।

[১০] "[illegible]শুধু আপনারি দেশে সমাদর রাজা বাদশার
গুণীর আদর মান সব ঠাঁয়ে এই দুনিয়ার।" ([illegible] ৭৪)

'দেশ' নামক কোন সীমাবদ্ধ ভূমিখণ্ডের প্রজাপালক ও শাসক রাজা অথবা বাদশাহ। এইরূপ বহু দেশ লইয়া বৃহৎ পৃথিবী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিতে কত-রাজা-বাদশাহ আছেন। দেশ রক্ষকরূপে এবং প্রজাপালকরূপে স্বীয় সাম্রাজ্যে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা। সেই রাজা যদি অত্যাচারী হন অথবা প্রজাশোষকও হন, তথাপি তাঁহার রাজত্বকালীন সময়ে তিনি সাম্রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে প্রজাগণ কর্তৃক স্বীয় মর্যাদাগুণে সমাদৃত হন। আর যদি তিনি সুশাসক এবং প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, তাহা হইলে তো প্রজাগণ সর্বদাই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠে। কিন্তু রাজা বা বাদশার এই সমাদর এবং মর্যাদা সকলই কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় সামিত। রাজত্বের বাহিরে তাহার ঐ মর্যাদা বা সমাদর নাই।

কিন্তু গুণী বা শিল্পী পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত সমভাবে। তাঁহাদের মর্যাদা অথবা সমাদর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডীমুক্ত। দেশ-কালের বাহিরে জগতের সমস্ত মানুষের জন্য তাঁহারা আনন্দের বাণী বহন করেন। জগতের সমস্ত মানুষ তাঁহাদের গুণমুগ্ধ। তাই পৃথিবী ব্যাপিয়া তাঁহাদের মর্যাদা এবং সমাদর। রাজা বা বাদশাহ যেখানে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় অর্থাৎ কেবলমাত্র তাঁহাদের স্বীয় রাজ্যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত, গুণীজন সেখানে পৃথিবীর সর্বত্র আনন্দবাহী এবং সমাদৃত।

[১১] "গভীর নিবিড় প্রেম যে পেয়েছে সে কখনও হেম যাচে ?
মণিকাঞ্চন তুচ্ছ অসার পরম ধনের কাছে।" (পৃঃ ৮১)

মূল্যবান সামগ্রী প্রত্যেক মানুষই ভোগ করিতে চায়। কেননা মূল্যবান সামগ্রী মানুষের জীবনে আনন্দের বার্তাবহ এবং প্রত্যেক মানুষই আনন্দপিয়াসী। কিন্তু বস্তুর মূল্য নির্ভর করে মানুষের কামনা বাসনার দৃষ্টিভঙ্গির উপর। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি-[illegible] যাহার মূল্য অপরিসীম, মহামানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়তো তাহার কোন মূল্যই নাই। তাই সা[illegible] মানুষের দৃষ্টিতে যেখানে ঐশ্বর্যলাভে আনন্দের সঞ্চার হয়; জ্ঞানী মানুষের দৃষ্টিতে সে[illegible]নে [illegible]লাভে নিবিড় আনন্দের সঞ্চার হয়। একে যেখানে স্বর্ণলাভে আনন্দিত [illegible]পরে সেখা[illegible] [illegible]প্লুত। কিন্তু এই স্বর্ণস্বপ্নের সমাপ্তি নাই। [illegible]াই ঐ আন[illegible]দরও তৃপ্তি [illegible]। পাওয়া, চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বাড়িয়া[illegible] চলে। তাই প্রকৃত আনন্দস্বরূপ [illegible]র স্বর্ণ সমারোহে মিলে না। প্রেমের মাঝে[illegible] যথার্থ আনন্দস্বরূপ নিহিত। যে প্রেম [illegible]াছে এবং প্রেম বিলাইতে শিখিয়াছে সেই[illegible] সদানন্দ পুরুষ। আনন্দ পিয়াসী মানুষ [illegible]র্থ আনন্দের রসসাগরে স্নান করি[illegible] মণিকাঞ্চনরূপ ঐশ্বর্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে। [illegible]শ্বর্যের যে সুখ বা আনন্দ তাহা ক্ষণ[illegible]য়ী। কিন্তু প্রেমিক হৃদয়ের প্রেম দেওয়া নেও[illegible] যে আন[illegible] তাহা চিরন্তন।

তাই যে জ্ঞানীপুরুষ ঐ প্রেম রসের অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছে তাহার নিকট মণিকাঞ্চন তুচ্ছ। প্রেমরূপ পরমৈশ্বর্য যে লাভ করিয়াছে সম্পদের মতো সাধারণ ঐশ্বর্যের তাহার নিকট কোন মূল্যই নাই।

[১২] "সন্তোষ পরম ধন বহু ভাগ্যে মিলে ;
ক্ষতি তার পূরে কভু মন্ত্রিপদ রাজপদ দিলে ?" (পৃঃ ১০০)

মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, অভাবেরও শেষ নাই ; তাই সম্ভোগেও তৃপ্তি নাই। এক অভাবের পূরণ অপর অভাবের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ঐশ্বর্য বাসনার সমাপ্তি দিগন্ত মানুষ কোনদিন খুঁজিয়া পায় না। তাই জীবনের পরম পরিতৃপ্তির মধ্যে যে সুখ এবং আনন্দ আছে তাহা সে কখনও লাভ করিতে পারে না। রাজা বা মন্ত্রী যেহেতু সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত এবং প্রচুর সম্পদের মালিক, সেহেতু সাধারণ মানুষ উক্ত পদদ্বয়কেই মনে করে পূর্ণ পরিতৃপ্তির স্থান। কিন্তু তাহারা জানে না যে, রাজা-মন্ত্রী ঐশ্বর্যের কাঙাল, অগাধ ঐশ্বর্যও তাহাদের শান্তি দিতে পারে না। প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যেও তাহারা আরও ঐশ্বর্যের দুঃস্বপ্ন দেখে এবং না পাওয়ার বেদনায় জীবন যন্ত্রণায় সর্বদাই অশান্তি ভোগ করে। তাই সমাজের যাহা সর্বোচ্চতম পদ, আকাঙ্ক্ষার দুঃস্বপ্নজনিত বেদনায় মানুষ সেখানেও চিরদুঃখী। অজস্র সম্পদের মধ্যে থাকিয়াও তাহারা রিক্ত। সেক্ষেত্রে 'সন্তোষ' পরম ধন। সন্তোষ মানুষকে আকাঙ্ক্ষার দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্ত করে। যাহা পায়, তাহা লইয়াই সে সুখী। নিজেকে সে কখনো বঞ্চিত মনে করে না। রাজা অথবা মন্ত্রীপদ লাভের জন্য তাহার কোন বাসনা আসে না। তাই দরিদ্র হইয়াও সে সুখী। আকাঙ্ক্ষা যেখানে অজস্র ঐশ্বর্যশালীকেও রিক্ত ও দুঃখী করিয়া রাখে, সন্তোষ সেখানে দীনাবস্থাতেও পরমানন্দের সঞ্চার করে। সুখ এবং দুঃখের কারণ তাই যথাক্রমে সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা। সন্তোষ তাই পরম ধন

[১৩] "যারা এ জীবনে হয়েছে সর্বহারা,
পরের জন্য তারা তবু রয় খাড়া (পৃঃ ১১৮)

দুঃখীই যথার্থ দুঃখীর বেদনা উপলব্ধি করিতে পারে [illegible] আজীবন যে সুখে লালিত-পালিত দুঃখীর প্রকৃত দুঃখ উপলব্ধি করিবার [illegible] তাহার নাই। তাই দুঃখীর দুঃখের প্রতি সে কৃত্রিম সহানুভূতি বা সমবেদনা প্র[illegible] করিতে পারিলেও প্রকৃত সহযোগিতা করিবার মতো ক্ষমতা তাহার আসে না। [illegible]ই দীন-দুঃখীর প্রকৃত বন্ধু ঐশ্বর্যশালী মানুষ নয়, দীন-দুঃখীর প্রকৃত বন্ধু দীন[illegible]রাই। নিজেরা রিক্ত সর্বহারা হওয়া[illegible]ও অপর দুঃখীকে সাহায্য করিতে তা[illegible] সর্বদাই প্রস্তুত। কারণ দুঃখীর দুঃখকে উপলব্ধি করিবার মতো সহমর্মিতা তাহাদে[illegible] আছে। ধনী ব্যক্তির দরিদ্রজনকে দান করা [illegible]তা সাময়িক বিলাস [illegible] খেয়াল [illegible]। ক্ষতযন্ত্রণা উপলব্ধি না করিয়াই ক্ষতে ঔষধ [illegible]ন,

তাহার কৃত্রিম সহানুভূতির ক্ষণিক প্রকাশমাত্র। কিন্তু দরিদ্র দরিদ্রের প্রকৃত যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়াই, তাহারা ঐ যন্ত্রণা দূরীকরণের জন্য সর্বদাই হৃদয়ের ভালোবাসা ও অকৃত্রিম সহানুভূতি লইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

কুরুপাণ্ডব

[১৪] "কার্যকারণপ্রবাহে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে। তন্মধ্যে তুমি স্বীয় কর্তব্য অপ্রমত্ত পালন করিলে তোমার ধর্মরক্ষা ও পরিণামে শাশ্বত মঙ্গললাভ হইবে"(পৃঃ ৮৫)

প্রকৃতির অনন্ত নিয়মে জগৎ এবং জীবন চালিত। পৃথিবী এবং জীবন জন্মের সূচনা কাল হইতেই এক কার্য এবং কারণেরপ্রবাহে অতীত হইতে বর্তমান এবং বর্তমান হইতে অনাগত ভবিষ্যতের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। জাগতিক জীবের সাধ্য নাই এই মহাপ্রবাহকে রুদ্ধ করিতে পারে। প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মানুষ অতি দুর্বল। যে কার্যকারণে মানুষের সুখ এবং দুঃখ, উত্থান অথবা পতন, তাহার উপরে মানুষের কোনই হাত নাই। সুখ-দুঃখ উত্থান এবং পতনকে মানুষ তাহার শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। অদৃশ্য দৈবশক্তি অথবা প্রাকৃতিক শক্তি যাহাই বলি না কেন, মানুষের জীবনে সুখ এবং দুঃখের অথবা জয় এবং পরাজয়ের কারণ। অতএব এই দুর্বোধ্য মহাশক্তির নিকট মানুষ পুতুলমাত্র। এই মহাশক্তিরই এক অখণ্ড কার্যকারণপ্রবাহ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সুখীর সুখ, দুঃখীর দুঃখ এবং পাপীর পাপ এই সকল মহাশক্তির কার্যকারণপ্রবাহের দ্বারা সংঘটিত। এক্ষেত্রে মানুষের ধর্মরক্ষার উপায় হইল স্বীয় কর্তব্যে অবিচলিত থাকা। সে কর্তব্যপালন দ্বারা জয় এবং পরাজয় হউক, পাপ অথবা পুণ্য হউক, সকল অবস্থাতেই তাকে কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। যেহেতু পাপ-পুণ্যের, সুখ-দুঃখের অথবা জাগতিক আর যাহা কিছু লাভ-ক্ষতির কার্যকারণ ... দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানুষের তাহাতে কোন ক্ষমতা নাই; সেহেতু কর্তব্যপালনই ধর্মরক্ষার উপায়। কর্তব্যপালনের মাধ্যমেই মঙ্গলের শুভাগমন হইবে।

[১৫] "কর্ণের কথার উত্তরে ... বলিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র, তুমি ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ধর্ম স্মরণ করিতেছ নীচাশয়েরা ... নিমগ্ন হইলেও নিজ দুষ্কর্ম বিস্মৃত হইয়া দৈবকে নিন্দা করে।" (পৃঃ ১৩৭)

কথায় বলে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল।' অতীতের দুষ্কর্মের জন্য ভবিষ্যতের শাস্তি অনিবার্য। আবার অতীতে ধর্মরক্ষার জন্য ভবিষ্যতে ... আশীর্বাদে সুখ-শান্তি অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন। দুষ্কার্যে লিপ্ত হইলেও তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারে এবং পরিণামে ... শাস্তিভোগ করিতে হইবে

তাহার জন্যও তাহারা প্রস্তুত থাকে। দুষ্কর্মজনিত শাস্তিভোগের জন্য তাহারা তাহাদের অদৃষ্ট বা দৈবকে দোষ দেয় না। কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তি পাপ-পুণ্য সম্পর্কে সচেতন। নিজেদের দুষ্কর্ম সম্পর্কে তাহারা উদাসীন এবং অল্প সময়েই তাহা ভুলিয়া যায়, অথবা দুষ্কর্মকে তাহারা উপলব্ধিই করিতে পারে না। জ্ঞানের অভাববশতঃ তাহারা যাহাই করে তাহাকেই সুকর্ম মনে করে এবং জীবনে কোন অন্যায় কার্য করিয়াছে বলিয়া মনেই করে না, অথবা অন্যায়কে অনুধাবন করিতে পারে না। এই অজ্ঞান শ্রেণীর লোকেরা যখন স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য ধর্মের কঠোর শাস্তিভোগ করে, তখন দৈবকে এই দুঃখের কারণরূপে দায়ী করে। তাহারা অতীতের পাপকার্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের রথচক্র মেদিনী গ্রাস করিলে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইল। তাঁহার এই দুঃসময়ের কারণরূপে সে দৈবকেই দোষী মনে করিল। কিন্তু অতীতের অজস্র পাপকার্যের জন্যই যে তাহার এই নিদারুণ শাস্তি মুহূর্তের জন্য তাহা তাহার মনে আসিল না। তখন তাহার মনে হইল না কুলবধূ দ্রৌপদীর অবমাননা এবং অন্যায় সমরে অভিমন্যু বধের কথা। এই ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান ব্যক্তির ধারণা হইল, তাহার এই জীবনসংকট সময়ের জন্য দৈবই একমাত্র দায়ী।

গল্পে উপনিষদ

[১৬] "দম, দান, দয়া—ইহা আমাদের পিতামহ প্রজাপতির একটি বড় শিক্ষা"

প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট দেবতা, মানুষ এবং অসুর। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে দেবতা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে তাহারা নানাপ্রকার ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী। দেবতাদের তুলনায় মানুষ কামনা এবং বাসনার দাস এবং অসুর আসুরিক শক্তিতে বলিয়ান হইয়া শক্তির অপচয় এবং জগতের অমঙ্গল সাধনে সর্বদাই র[illegible]। অথচ প্রজাপতি ব্রহ্মা যিনি এই মহাসৃষ্টির স্বয়ম্ভু স্রষ্টা, তিনি চান সকলে[illegible] সুতরাং 'দ' অক্ষরের মাধ্যমে তাঁহার তিন শ্রেণীর সৃষ্টিকে [illegible] তিন প্রকার শিক্ষা দিলেন। জ্ঞানের দীপ্তিতে দেবতারা একটা উপলব্ধি [illegible]য়াছিলে[illegible] যে, ইন্দ্রিয়ের অসংযমই সকল অশুভের কারণ। দেবতাদের [illegible] অসীম। অ[illegible]ংযমী হইয়া তাহারা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাহা শুভ ফ[illegible] হইবে না। তাই তাহারা [illegible]' অক্ষরের মাধ্যমে উপলব্ধি করিলেন দমন কর[illegible] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সংযম রক্ষা করা। এইভাবেই লোভী স্বার্থান্ধ মানুষ প্রজাপ[illegible] 'দ' শিক্ষার আলোকে উপলব্ধি করিলেন [illegible]ান করা অর্থাৎ স্বার্থ পরিহার ক[illegible] [illegible]র প্রতি উদার এবং দানশীল হইতে হইবে। শক্তিমত্ত অসুরেরা এই 'দ' হইতে জ্ঞা[illegible]ভ করিল দয়া করা। দয়া অভ্যাস করিলে অসুরেরা দুর্বলের উপ[illegible] আর অত[illegible]র করিবে না। জগৎ অত্যাচার এবং নির্যাতনের হাত

হইতে মুক্তিলাভ করিবে। জগতে শান্তি-স্বর্গ স্থাপনের জন্য পিতামহ ব্রহ্মা এইভাবে এক 'দ' অক্ষরের মাধ্যমে তিনপ্রকার চরিত্রে বিশিষ্ট সৃষ্টিকে তিনি শিক্ষার আলোকে প্রোজ্জ্বল করিলেন—'দমন করা', 'দান করা' এবং 'দয়া করা'। এই ত্রিশিক্ষার মাধ্যমেই জগতে স্থায়ী শান্তি আনয়ন সম্ভব।

[১৭] "প্রাণ, তুমিই অগ্নি, তুমিই তেজ, তুমিই প্রজাপতি, সাক্ষাৎ সৃষ্টিশক্তি। তোমাতেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে! মাতা যেমন পুত্রগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তেমনই তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর!" (পৃঃ ৯)

প্রাণের প্রকৃত শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে চক্ষু, কর্ণ, মন এবং বাক্য। এতকাল তাহারা নিজ শক্তির মিথ্যা অহংকারে অহংকারী ছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষায় তাহারা প্রাণের শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। চক্ষু, কর্ণ, মন বা বাক্য প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বতন্ত্র ক্ষমতা আছে। কিন্তু প্রাণই তাহাদের ঐ ক্ষমতার উৎস। প্রাণ না থাকিলে তাহাদের কোন অস্তিত্বই থাকিত না। তাই মনের ক্ষমতা, বাক্যের ক্ষমতা, চক্ষুর ক্ষমতা এবং কর্ণের ক্ষমতা সকলই আসলে প্রাণের ক্ষমতা। প্রাণই যেন একসঙ্গে অগ্নি এবং অগ্নির তেজ। চক্ষু, কর্ণ, মন এবং বাক্য প্রভৃতি যেন প্রজা। প্রাণ প্রজাপতি। প্রাণই সৃষ্টি। প্রাণ সৃষ্টি না হইলে চক্ষু, কর্ণ, মন এবং বাক্য ইহার কেন কিছুরই সৃষ্টি হইত না। প্রাণ সৃষ্টি হওয়াতেই তাহাদের সৃষ্টি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা কিছু শক্তি বা প্রতিষ্ঠা, সকলেরই—মূলে প্রাণ। প্রাণশক্তির এই সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে চক্ষু, কর্ণ, বাক্য এবং মন। তাই প্রাণের নিকট তাহাদের করুণ আবেদন যে, প্রাণ যেন তাহাদের ত্যাগ না করিয়া চলিয়া যায়। প্রাণ চলিয়া গেলে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না। মা যেমন স্বীয় অবোধ অক্ষম শিশুদের স্নেহসহকারে প্রতিপালন করিয়া বাঁচাইয়া রাখেন, প্রাণ তেমনই করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে [illegible] চক্ষু, কর্ণ, মন এবং বাক্যকে রক্ষা করুক।

[১৮] "[illegible] আত্মা, তিনিই পরমাত্মা। তিনিই শক্তি, তাঁহার শক্তিতেই সকলের শক্তি! তাঁহার জ্ঞানেই [illegible]র জ্ঞান, তাঁহার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ! তাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, এই বি[illegible]পালন এবং এই বিশ্বের লয়। তিনিই কর্মের নিয়[illegible] বুদ্ধির প্রেরক, অন্তরের অন্ত[illegible]" (পৃঃ ২১)

[illegible]শ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা। [illegible]র এই সৃষ্টির শাসক তিনিই। ইহার লয়ও তি[illegible] ঘটাইবেন। এই ব্রহ্ম-স্বরূপ সকলে উ[illegible] করিতে পারে না। তাই নিজেদের শ[illegible], আত্মা, জ্ঞান, প্রকাশ, কর্ম, বুদ্ধি এ সক[illegible] তাহারা সচেতন। তাহাদের ধ[illegible]ণা সকলই তাহাদের নিজস্ব। ব্রহ্ম-জ্ঞানের [illegible]বে তাহারা নিজেরাই যে ব্রহ্ম-স্বরূপ

একথা বুঝিতে পারে না। লীলাময় ব্রহ্মার ইচ্ছাতেই জগতে সব কিছুর সৃষ্টি হইয়াছে। তিনিই সকল শক্তির শক্তি, সকল বুদ্ধির বুদ্ধি, সকল কর্মের নিয়ন্তা। তাঁহার মাধ্যমেই সব কিছুর প্রকাশ। জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে সকলই সেই লীলাময়ের ইচ্ছা। তিনিই স্রষ্টা। তাঁহারই সৃষ্ট জগতের যা কিছু চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা, অনুভূতি যা কিছু কর্ম-বুদ্ধি ও শক্তি। অন্তরে অন্তরে তিনিই আছেন। আত্মার পরমাত্মা তিনিই। এক কথায় তিনিই সবভূতে বিরাজমান। ইহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান। কঠোর তপস্যার সিদ্ধি এই ব্রহ্ম-জ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞান যিনি আয়ত্ত করিয়াছেন, জগৎ এবং জীবনের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন।

[১৯] "যিনি সত্যে স্থিত, তিনি ব্রাহ্মণ! সত্য এবং সরলতাই ব্রাহ্মণের পরিচয়। গোত্রধর্ম অপেক্ষা স্বভাব-ধর্ম যে অনেক বড়।" (পৃঃ ২৮)

ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যথাবিধি উপনয়ন পূর্বক উপবীত ধারণ বা গায়ত্রী শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণের ধর্ম তাঁহার আপন স্বভাবের ধর্ম। ব্রাহ্মণ বংশের উত্তরাধিকারী যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণের ধর্ম আচরণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ পদবাচ্যে ভূষিত করা চলে না। আবার অব্রাহ্মণই তাহার স্বভাব-ধর্মের ফলে ব্রাহ্মণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আপন স্বভাব-ধর্মের মহিমায় ব্রাহ্মণ, বংশ গুণে নয়।

সত্য রক্ষাই ব্রাহ্মণের ধর্ম। সরল তাঁহার মন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে কোন মিথ্যার আশ্রয় লইবে না কিংবা মনকে কূটনীতির বিষে বিষাক্ত করিবে না। সদা সত্যপথে, সরল মনে সে জ্ঞান অন্বেষণে অগ্রসর হইবে। তবেই সে যথার্থ ব্রাহ্মণ। সত্যের আশ্রয়ে লালিত, সরল পথে চালিত মানুষ যদি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ নাও করে তবুও সে ব্রাহ্মণ। মিথ্যার জঞ্জালে মলিন, ছলনা ও কূটনীতির পঙ্কে পঙ্কিল মানুষ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ নয়। বংশ বা গোত্র গুণে নয়, সততা এবং সরলতা যাহার ধর্ম [illegible] ব্রাহ্মণ। কেননা সততা ও সরলতাই ব্রাহ্মণের ধর্ম, ব্রাহ্মণে[illegible] উপবীত বা গায়ত্রী শ্লোক উচ্চারণই যথার্থ ব্রাহ্মণের পরিচয় নয়। [illegible]র ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্য জ্ঞান আছে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

[২০] "পৃথিবীতে যদি স্বর্গ করিতে [illegible] তবে স্বর্গেতেই পৃথিবী লইয়া আ[illegible]ব। আমি স্বর্গ ও মর্ত্য এক সোনার সিঁড়ি দিয়া [illegible]থিয়া দিব।" ('নচিকেতা' পৃঃ ৫২)

স্বর্গলোক আনন্দ-নিকেতন। [illegible]র [illegible]রা সেখানে অমর। চির-বসন্তের সৌন্দর্যময় পরিবেশে তাহাদের বাস। দুঃখ কা[illegible]কে বলে তাহারা জানে না। পৃথিবীতে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট। রোগ-শোকের [illegible]র অজস্র হাহাকারে মুখরিত এই মর্ত্যভূমি। স্বার্থে

সঙ্গে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। পরিণামে দুঃখ, বেদনা এবং মৃত্যু। মর্ত্যলোকে মানুষের জীবনে সুখ নাই, আনন্দ নাই। কিন্তু দুঃখ, জরা ব্যাধিগ্রস্ত মানব জীবন হইতে মুক্তি পিপাসু যে মানুষ, সে মানুষ কখনো আপন স্বার্থ লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে না। আপন স্বার্থ ভোগ সম্পর্কে সে উদাসীন। পৃথিবীর সকল মানুষের মুক্তিকামনায় সে অধীর, অস্থির। স্বর্গ ও মর্ত্যকে সে এক করিয়া বাঁধিয়া নিতে চায়। মর্ত্যলোকের মানুষের দুঃখ দুর্দশার অবসান করিতে চায়। মর্ত্যে সে আনিতে চায় স্বর্গলোকের চিরবসন্ত। মানুষকে পান করাইতে চায় অমৃতকণা। যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে সে চায় মৃত্যুর পরে মানুষ অনন্ত স্বর্গ-সুখ ভোগ করুক। দুঃখপূর্ণ মর্ত্যের মাটিতে যেন আর তাহাকে ফিরিয়া আসিতে না হয়। মহাপ্রাণ নচিকেতার মূল বক্তব্য এই যে, মানুষ যেন রোগ, শোক, জরাজনিত দুঃখ ভোগ না করে। তাঁহার পণ তিনি হয় মর্ত্যে স্বর্গ সুখ প্রতিষ্ঠা করিবেন, আর যদি তাহা না হয় তাহা হইলে মর্ত্যের বাস উঠাইয়া মানুষকে স্বর্গবাসী করিবেন। মানুষের হৃদয়ে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করিবেন।

[২১] "সংশয়ই তো সত্যের জনক। সংশয় না হইলে জিজ্ঞাসা আসে না, জিজ্ঞাসা না আসিলে সত্যলাভ হয় না, তাই এ সংশয় বরণীয়।" (পৃঃ ৬৮)

সাধারণতঃ দ্বিধা সংশয়গ্রস্ত মনকে আমরা নিন্দার চোখে দেখি। সত্যতা সম্পর্কে যাহার মনে সন্দেহ বর্তমান তাহাকে আমরা সন্দেহ ব্যাতিকগ্রস্ত বলি। কিন্তু প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে এই সংশয়ের প্রয়োজন। যাহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহা প্রকৃত সত্য নাও হইতে পারে। আমাদের অচেতন দৃষ্টি অনেক সময় মিথ্যাকেও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সেই সত্য সম্বন্ধে যদি আমাদের মনে সংশয় জাগ্রত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য অন্তরে জিজ্ঞাসা জন্মিবে। জিজ্ঞাসা হইতে সত্যস্বরূপ উপলব্ধির জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হইব। প্রকৃত সত্যের স্বরূপ সংশয় [illegible] জিগীষার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। মোহগ্রস্ত আমাদের মন। এই মনে আমরা [illegible] মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু ঐরূপ মিথ্যা সত্য সম্বন্ধে যদি মনে মনে সংশয় [illegible]স্থিত না হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সত্যের সন্ধান আমরা কোনদিন পাইব না। কাজেই [illegible] প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে অনুপ্রেরণা দেয়, সে সংশয়কে নিন্দা করা চলে না। [illegible] সত্যের অনুসন্ধানের জন্য জ্ঞানপিপাসা জাগ্রত করে বলিয়া ইহা বরণীয়। প্রচলিত সমাজ[illegible]বস্থায় অনেক মিথ্যা হয়তো প্রতিষ্ঠিত আছে। কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয় যদি উ[illegible] না হয়, তাহা হইলে সেই মিথ্যা কোনদিন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না। যদি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। এ[illegible]ভাবে সংশয় তথাকথিত মিথ্যা সত্যকে ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবে।

রাজর্ষি (দশম শ্রেণীর পাঠ্য)

[২২] "করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।" (পৃঃ ১২)

জগজ্জননীর চরণে পশুরক্ত অর্ঘ্য দেওয়া আমাদের দেশে অনেককালের বিধি. কিংবদন্তিতে শোনা যায় অনেকে নাকি যূপকাষ্ঠে নরবলি দিয়াও রক্তপিপাসিনী জননীকে সন্তুষ্ট করিতেন। ইহা নাকি শাস্ত্রীয়বিধি। জননীকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তাঁহাকে রুধির পান করাইতে হইবে, ইহার অন্যথা হইলে পাপ। কিন্তু যে জগজ্জননী আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের পালন করিতেছেন, তিনি আমাদের শোণিত পানে উল্লসিত হন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের এবং অশাস্ত্রীয় বিধি আর কী আছে? স্নেহময়ী জননী যাঁর হৃদয় সন্তানের অমঙ্গল ভাবিয়া শঙ্কাতুর হইয়া পড়ে, যিনি সন্তানের দুঃখে অশ্রুজল বর্ষণ করেন তিনিই সন্তানের রক্ত পিপাসু—ইহা অসম্ভব। উপরন্তু জননীর চরণে জীবরক্ত উৎসর্গিত হইলে জননী নিশ্চয়ই আপন সন্তানের রক্তদর্শনে শিহরিয়া উঠেন। মা কখনো তাহার আপন সৃষ্ট জীবরক্ত দেখিতে পারেন না। মা বরং জীবদেহে নূতন রক্ত, নূতন শক্তি সঞ্চারের চেষ্টায় সর্বদা রত। সুতরাং এতদিন শাস্ত্রীয়বিধিরূপে যে ঘোর অশাস্ত্রীয়বিধি সমাজে প্রচলিত ছিল এখন তাহা বন্ধ করিতে হইবে। এই পৈশাচিক অশাস্ত্রীয়বিধির কবলে অনেক জীব প্রাণ হারাইয়াছে। জননী তাঁহার সন্তানের নিষ্ঠুর হত্যা দর্শনে ব্যথিত হইয়াছেন। এবার তাহার অবসান হউক।

[২৩] "হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।" (পৃঃ ১২)

কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা শুনি। কিন্তু কানের দ্বারা কেবলমাত্র কণ্ঠের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। হৃদয়ের কথা শুনিতে হয় হৃদয় দিয়া। হৃদয় যাহার [illegible] মতো কঠিন হইয়া গিয়াছে, কোমল হৃদয়ের বাণী [illegible] পাইবে না। লোভ, হিংসা, অত্যাচার মানুষের কোমল হৃদয়কে ক[illegible]রিয়া তোলে। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি মানবিক কোমল স্বভাবগু[illegible]ন অন্তর হইতে লোপ পা[illegible]। জীবের রক্তগ্রহণ করিতে করিতে যে [illegible] গিয়াছে দয়া, মায়া, স্নেহ বা প্রেমের বাণী সে কখনই শুনিতে পাইবে [illegible] সুতরাং জীবরক্ত দ্বারা জগজ্জননীকে পূজা করা যে কত বড় অপবিত্র [illegible] অশাস্ত্রীয় কাজ কঠিন অন্তরে সে তাহা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। অথচ জননী নিশ্চয়ই সন্তানের রক্ত পিপাসু নহেন। তিনি সর্বদাই সন্তানের ম[illegible] কামনা করেন। তাঁহার অন্তরের বাণী যে, [illegible]ব যেন জীবের উপর অত্যাচার না করে। তাঁহার সন্তান যেন সকল সন্তানকে ভালোবাসে।

কিন্তু কঠিন হৃদয়ের জীব করুণাময়ী জননীর অন্তরের এই স্নেহ-শীতল বাণী শুনিতে পায় না। প্রেমপূর্ণ এই স্বর্গীয় বাণী শুনিবার মত হৃদয় তাহারা হারাইয়াছে।

[২৪] "হিংসার নিকট বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।" (পৃঃ ৩১-৩২) *

জগজ্জননীর চরণে মানুষ জীবের রক্ত উৎসর্গ করে। তাহাদের ধারণা জীবের রক্ত পান করাইতে পারিলে জননী সন্তুষ্ট হইবেন। জননী তুষ্ট হইলেই জীবের মঙ্গল। তাই জননীর তুষ্টির জন্য জীবরক্ত তাঁহার চরণে উৎসর্গ করা শাস্ত্রীয় বিধি হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু তাহারা একথা উপলব্ধি করে না যে, মা তাঁহার আপন সন্তানের রক্ত কী কখনো সহ্য করিতে পারেন? জীবের প্রাণহরণ অর্থাৎ জীবের প্রতি হিংসার মাধ্যমে জননীকে সন্তুষ্ট করিতে যাওয়া মূঢ়তা বা মূর্খতা মাত্র। ইহা কখনো শাস্ত্রীয় বিধি হইতে পাবে না। জননী কখনো তাঁহার আপন সন্তানের রক্ত গ্রহণ করেন না। ইহা হিংসার নিকট বলিদান—হিংসা রিপুর নিকট ইহা মানবধর্মের পরাজয়।

প্রকৃত শাস্ত্রীয় বিধি হইতেছে জীবের প্রতি জীবের প্রেম। হৃদয় হইতে হিংসাকে দূর কবিতে হইবে। জীবকে ভালোবাসিয়া মানবধর্মকে জাগ্রত করিতে হইবে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডূক তথাকথিত শাস্ত্রীয়বিধিকে ত্যাগ করিয়া জীবের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করিতে হইবে। জীবরক্ত উৎসর্গ করিয়া নয়, জীবকে ভালোবাসিয়া, জীবদেহে নূতন রক্ত সঞ্চার করিয়া করুণাময়ী জগজ্জননীকে তুষ্ট করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রীয় বিধি। ইহাই মানবধর্ম।

[২৫] "রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয়।" (পৃঃ ৪০) *

[illegible]ায় কণ্টকিত এই ধরণী। রাজ্যসুখ ভোগ করিবার জন্য মানুষ মানুষকে, ভাই ভাইকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিতবোধ করে না; ক্ষমতায় লিপ্সা মানুষকে এমন পাশবিক স্তরে অবনত করে। এইভাবে [illegible]লোভে পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী রক্তের চিহ্নে ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তাক্ত, কলঙ্কিত। কিন্তু শ[illegible] করিয়া উন্মাদ অভিযানে পৃথিবীকে রক্ত পিচ্ছিল করিয়া সিংহাসনে আরোহণ [illegible]লেই প্রকৃত রাজা হওয়া যায় না। ভালোবাসার দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করিয়া পৃথিবীকে [illegible] করিতে পারিলে তবেই যথার্থ রাজা হওয়া যায়। শক্তির নিকট মানুষ বাধ্যতা স্বীকার [illegible] ভয়ে, শ্রদ্ধায় নয়। শক্তিবলে রাজা হইলেও অন্তরে যদি মানুষের প্রতি প্রেম না থা[illegible] তাহাকে অন্তর হইতে রাজা বলিয়া স্বীকার করে না। জননী পৃথিবীর স্নেহের সন্তান এই জীবকুল। এই জীবকুলকে ভালোবাসিলেই জননী পৃথিবী বশীভূতা হন। মায়ের সন্তানকে যে ভালোবাসে মা

তাহারই বশীভূতা; সেই পৃথিবীর রাজা হইবার উপযুক্ত। এইভাবে মানুষকে জীবকে ভালোবাসিয়া তাহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা সঞ্চার করিতে হয়। তখনই তাহ আপন হৃদয়েই প্রেমিক মানুষকে রাজাসনে বসাইবে—তখনই সে হইবে যথার্থ রাজা।

[২৬] পাপের একটি বীজ যেখানে পড়ে সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কে করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানবসমাজ অরণ্যে পরিণ হইয়া যায় তাহা কেহ জানিতে পারে না।" (পৃঃ ৪১)

সংক্রামক রোগের জীবাণু যেমন এক দেহ হইতে অন্যান্য দেহে সংক্রামিত হইয়া সমগ্র পল্লী বা নগর গ্রাস করিয়া ফেলে, একের পাপ তেমনি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং ক্রমে তাহা পরিবার, সমাজ, সমগ্র রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত ও বিষাক্ত করিয়া তোলে। মানুষের অজ্ঞাতেই তাহাদের হৃদয়ে এই পাপ পরিবাহিত, পরিচালিত এবং বিকীরিত হয়।

বিষবৃক্ষের একটি বীজ মাটিতে পতিত হইলে যেমন সমগ্র অঞ্চলে কালক্রমে বিষবৃক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তেমন পাপরূপ বীজ যদি একবার কোনও সমাজে প্রবেশ করে; তাহা হইলে সেই বিষবীজ হইতে সমাজে অজস্র পাপমহীরুহ অংকুরিত হয়। এই ভাবেই একটি সুশৃঙ্খল সুন্দর মানবসমাজ পাপের একটি বীজ হইতে বিশৃঙ্খল অসুন্দর অরণ্যে পরিণত হয়। পাপ বৃক্ষের এইরূপ ক্রম প্রসারণ মানবসমাজকে আরণ্যক পাশবিক করিয়া তে পাপ হইতে পাপের উৎপত্তি। সুতরাং এইরূপ একটি পাপ হইতে সমস্ত সমাজ পাপবিদ্ধ হইয়া যায়।

[২৭] "মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন।" (পৃঃ ৫১)

রাজত্বের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অজস্র কাহিনীতে মানব-ইতিহাস পূর্ণ। সিংহাসনে আরোহণের জন্য ক্ষমতালিপ্সু মানুষ নির্লজ্জ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ভ্রাতা পিতাকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করিয়াছে, স্বার্থান্ধ হইয়া আপন মনুষ্যত্ব বিস ইতিহাসের পাতায় এই নজীর মিলিবে। মুকুট রাজার চিহ্ন। এই মুকুটের জন্য ভ্রাতৃ সংগ্রাম, পিতৃঘাতী সংগ্রামের নিষ্ঠুর কাহিনীতে ইতিহাস কলঙ্কিত। রাজত্বের মো তথা মুকুটের মোহে মানুষ তাহার মা ...ন বিস্মৃত হইয়া অমানুষিক ক এমন কি মৃ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছে। নিঃসন্দেহে গিয়া ...ভ বা মুকুট পরিধান অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ কিন্তু তাহা অপেক্ষাও দুঃসাধ্য কা... মুকুট পরিধান করিয়া আবার তাহাকে ত্যাগ করা

রাজা হওয়া শক্ত, তাহা... অশা... সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজত্ব ত্যাগ ...ও কঠি তাহার কারণ, রাজত্বে ... অথচ ভ হইয়া বিলাস-ব্যসনে জীবনযাপন করিয়া মানুষ ভো দাস হইয়া পড়ে। ত্যাগ... কামন ... রাজার ধর্ম রাজা তখন তাহা ভুলিয়া যায় ... কল্যা ত্যাগের ...দর্শ বিস্মৃত ... করে। ঐশ্বর্য এবং অহংকারের শৃঙ্খলে সে হয় বন্দী। লোভ হই...

তাহার উত্তরোত্তর লোভ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। সাম্রাজ্যের পর আরও সাম্রাজ্য সে ভোগ-দখল করিতে চায়, ঐশ্বর্যের পাপস্পর্শ তাহাকে আরও ঐশ্বর্যের মোহে স্বর্ণ-কারায় বন্দী করে। স্বার্থ এবং লোভ তাহার রাজাজীবনকে প্রকৃত মানব-জীবন হইতে দূরে লইয়া যায়। মানবিক ত্যাগধর্ম সে বিস্মৃত হয়। কাজেই মুকুট ত্যাগ করা তখন তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

[২৮] "বন্দীও যেমন বদ্ধ বিচারকও তেমনি বদ্ধ" (পৃঃ ৬৭) *

শৃঙ্খলভঙ্গকারীকে শৃঙ্খলরক্ষাকারী অবশ্যই সাময়িকভাবে বন্দী করিবে। প্রণীত আইনের মাধ্যমে বিচারক তাহার বিচার করিবেন। অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত ব্যক্তির যতক্ষণ পর্যন্ত না বিচার সমাপন হইতেছে ততক্ষণ তাহার মুক্তি নাই—ততক্ষণ তাহাকে বন্দী থাকিতেই হইবে। কিন্তু বিচারকও মুক্ত বা স্বাধীন নহেন। বন্দীর প্রতি তিনি স্বেচ্ছানুযায়ী কোন বিচার করিতে পারিবেন না। বিচারশালায় যেরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ সংগৃহীত হইবে বিচারককে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে। সুতরাং প্রণীত আইন বা বিচারবিধির নিকট বিচারকও বন্দীর ন্যায়ই বদ্ধ।

[২৯] "পাপ করিয়া শাস্তি বহন করা যায়, কিন্তু মার্জনাভার বহন করা যায় না প্রভু!" (পৃঃ ৬৮) *

জ্ঞানী ব্যক্তি পাপপুণ্য সম্পর্কে সচেতন। পাপের যে দণ্ড আছে তাহা তিনি জানেন এবং তাহা শিরোধার্য করিবার জন্য সর্বদাই তিনি প্রস্তুত থাকেন। পাপ করিয়া শাস্তিভোগ করিলেই পাপকে ক্ষালন করা সম্ভব। পাপ করিয়া শাস্তিভোগ না করিলে পাপের অনুতাপে তিলতিল করিয়া জ্ঞানীজনের অন্তরাত্মা দহিতে থাকে। পাপের যদি কোন শাস্তি না হয়, পাপকে যদি মার্জনা করা হয়, তবে পাপী দৈহিক নির্যাতন হইতে রেহাই পায় বটে কিন্তু অন্তর হইতে তাহার পাপজনিত গ্লানি যায় না। পাপের [illegible] তাহার অন্তরাত্মা আরও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। পাপের জন্য শাস্তিভোগ করিলেই পাপীর পাপের ভার লঘু হয়, শাস্তির মাধ্যমেই সে সান্ত্বনা লাভ করে। কিন্তু পাপকে মার্জনা করা হইলে সে [illegible] পাপকে বিস্মৃত হইতে পারে না এবং পাপকার্যের দহন তাহার সমগ্র জীবনকে তুষের [illegible] দগ্ধ করে।

[৩০] "পাঁচটা আঙুলেই বেশ [illegible] চলিয়া যায়; দুর্ভাগ্যক্রমে সাতটা আঙুল পাইলে ইহা করিয়া কাজ বাড়াইতে হয়।" ([illegible] ৭০)

প্রকৃতির রাজত্বে একটা শৃঙ্খলা আছে। এই শৃঙ্খলা [illegible]ভিযত হইলেই নানারূপ বিশৃঙ্খলা এবং বিভ্রান্তি দেখা দেয়। জীবের প্রয়োজনীয় সব [illegible] প্রকৃতি তাহার মহাভাণ্ডার হইতে অকাতরে দান করিয়াছে। ইহার দ্বারাই মানুষ স্বাভাবিকভাবে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে

জীবনযাপন নির্বাহ করিতে পারে। কিন্তু অকস্মাৎ যদি এই স্বাভাবিক দানের অতিরিক্ত কিছু মানুষের কাছে আসিয়া যায় তখন তাহা বিভ্রান্তিরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যদি থাকে, তবে অনেক সময়ই মানুষ তাহা লইয়া কি করিবে ভাবিয়া দিশেহারা হইয়া পড়ে। এক কথায় প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা যদি কখনও লঙ্ঘিত হয়, তবে তখন তাহা উৎপাত স্বরূপ বলিয়াই মনে হয়। তখন মানুষের স্বাভাবিক জীবন হয় বিপর্যস্ত। মানুষের হাতে পাঁচটি আঙ্গুল থাকিবে ইহাই প্রাকৃতিক বিধি। ইহার উপরে যদি আরও দুইটি আঙ্গুল উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে তবে তাহা লইয়া কি করিবে মানুষ ভাবিয়া পায় না। তখন এই অতিরিক্ত দুই আঙ্গুল পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা স্বাভাবিকভাবে কাজ করিবার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত দুই আঙ্গুল লইয়া মানুষ তখন বিব্রত বোধ করে। পদে পদে ঐ অতিরিক্ত দুই আঙ্গুলকে কাজে লাগাইতে গিয়া পাঁচ আঙ্গুলের সহজ স্বাভাবিক কাজ পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং প্রয়োজনের অতিবিক্ত কিছু মানুষের উপকার তো করেই না পরন্তু বিভ্রান্তির উৎপাদক হইয়া দাঁড়ায়।

[৩১] "মানবহৃদয়ই প্রকৃত মন্দির, সেইখানেই খড়্গ শাণিত হয় এবং সেইখানেই শত সহস্র নরবলি হয়। দেবমন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র।" (পৃঃ ১৭১)

মানুষের হৃদয়ে একদিকে রহিয়াছে হিংসা, ক্রোধ, জিঘাংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তি। অপরদিকে আবার স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণে মানবহৃদয় পূর্ণ। হিংসা ক্রোধ, লোভ বা মোহবশতঃ মানুষ মানুষকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আবার স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি সদগুণে বিভূষিত মানুষ অপর মানুষকে তাহার ভালোবাসা উজার করিয়া দিতেও কার্পণ্য করে না। জীবহত্যার কারণ মানুষের হৃদয়। আবার জীব প্রেমের কারণও মানুষের হৃদয়। দেবতার মন্দিরে জগজ্জননীর চরণে জীবরক্ত উৎসর্গ করা হয়। শাণিত খড়্গ দ্বারা যূপকাষ্ঠে জীবকে বলি দেওয়া হয়। কিন্তু উহা অভিনয় মাত্র। অভিনেতা মনেতে অভিনয়ের পূর্বে নিজেকে অভিনয়োপযোগী [illegible] প্রস্তুত করেন। মনেতে তাঁহার চরিত্রকে যেমন তিনি চরমরূপ দান করেন তেমনি জীবহত্যার প্রস্তুতি চলে মানুষের হৃদয়ে। হিংসা প্রবৃত্তি মানুষকে দিয়া জীবহত্যা করায়। হৃদয়জাত ঐ হিংসা প্রবৃত্তিই অবশেষে প্রকাশ পায় দেউল অঙ্গনের যূপকাষ্ঠে। অতএব মানবহৃদয়ই প্রকৃত মন্দির। প্রকৃত হিংসার অস্ত্র এবং জীবহত্যা যথাক্রমে মানবহৃদয়েই শাণিত এবং সংঘটিত হইয়া থাকে। মন্দির, যূপকাষ্ঠ এবং খড়্গ প্রভৃতি কতকগুলি বাহ্যিক উপাদান এবং জড়বস্তু মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মানুষের হৃদয়েই ইহাদের আসল ব্যবহার হইয়া থাকে। হৃদয়ঘটিত ঐ মানস হত্যাই মূর্ত হয় বাহ্যিক মন্দিরের যূপকাষ্ঠে।

কাব্য-মঞ্জুষা

(দশম শ্রেণীর পাঠ্য)

[৩২] "কিয়ে মানুষ পশু পাখীকুলে জনমিয়ে
অথবা কীট-পতঙ্গে।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥" ("বিদ্যাপতি" পৃঃ ১)

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী মানুষদের ধারণা যে মৃত্যুর পরেই জীবনের চরম অবসান নয়। কেন না আত্মা মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুতে কেবলমাত্র দেহাবসান ঘটে। আত্মা তখন নবজাত অন্য কোন দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। এক জন্মের কর্ম অনুযায়ী জীব অন্য জন্মে ফল ভোগ করে। পূর্বজন্মে কৃত সুকার্যের জন্য জীব পুরস্কৃত হয় অর্থাৎ যদি সে পূর্বজন্মে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে পরজন্মে সে পরমপুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আবার কার্যের জন্য পরজন্মে তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবকুলে জন্ম লইয়া তাহারা কষ্ট ভোগ করে। এইরূপে প্রায় অধিকাংশ জীবের দেহান্তর ও জন্মান্তর ঘটিতেছে এবং পুনঃ পুনঃ ধরণীর মৃত্তিকার কোলে তাহাদের ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। কর্মফল অনুযায়ী কেহ হইতেছে মানুষ, কেহবা পশুপাখী অথবা কীট-পতঙ্গ। এই জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে শান্তিলাভের একমাত্র উপায় স্রষ্টার সহিত সংযোগ রক্ষা করা। জীব স্রষ্টার ভক্ত। ভক্তের সহিত ভগবানের প্রেমের নিগূঢ় সম্পর্ক। আজন্ম এই প্রেমসাধনা করাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেহান্তর ঘটুক কিন্তু আত্মার যেন সকল সময়ই ভগবানে মতি ও তাহার উপর বিশ্বাস থাকে।

[৩৩] "নানান্ দেশের নানান্ ভাষা;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা
পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর?
ধারা-জল বিনে কভু
ঘুচে কি তৃষা?" ("স্বদেশী ভাষা" পৃঃ ৭)

(মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ। সন্তান যেমন আপন গর্ভধারিণী জননীকে ভালো না বাসিয়া পারে না, মানুষ তেমনি তাহার মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষাকেও ভালো না বাসিয়া পারে না) যেমন মাতৃভূমির সহিত তেমনি মাতৃভাষার সহিত মানুষের সন্তান ও জননী সম্পর্ক। পৃথিবীতে যেমন অনেক জাতি, অনেক দেশ তেমনি ভাষাও অনেক। কিন্তু (বিদেশী ভাষায় মানুষের মন ভরে না) (অন্য রমণীর সহিত

গর্ভধারিণী জননীর যেমন ব্যবধান তেমনি বিদেশী ভাষার সহিত স্বদেশী ভাষারও পার্থক্য। বিদেশী ভাষা-সমুদ্রে যত রত্নই সঞ্চিত থাকুক না কেন, তাহাতে মানুষের হৃদয় মুগ্ধ হইতে পারে কিন্তু পূর্ণ আনন্দে রসাপ্লুত হয় না। মাতৃভূমির ভাষা যদি দীনও হয় তথাপি মানুষ ঐ ভাষাতে কথা বলিয়া এবং লিখিয়া যেমন করিয়া মনেরভাব প্রকাশ করিতে পারে, তেমনটি আর অন্য কোন ভাষার সাহায্যে পারে না। তাই মাতৃভাষা ভিন্ন অপর ভাষায় মানুষের আশা পূর্ণ হয় না—কোথায় যেন তাহারা নিজেকে শূন্য মনে করে। এই বিশাল ধরণী জলে পূর্ণ। তথাপি বৃষ্টির জল ভিন্ন যেমন চাতকের তৃষ্ণা ঘুচে না, তেমনি মাতৃভাষা ব্যতিরেকে মানুষের হৃদয়ের তৃষ্ণাও মেটে না। বিদেশী ভাষা মন-মরুকে স্নেহরস সিঞ্চনে সিক্ত করিতে পারে না। তাই যে কোন অবস্থাতেই মাতৃভাষাই সর্বকালের এবং সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষা।

[৩৪] "প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়-হাতে,
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥" ('ঈশ্বরী পাটনী' পৃঃ ১৬)

দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটনীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। ঈশ্বরী পাটনী হাত-জোড় করিয়া তাহার সন্তানের জন্য সামান্য দুধ-ভাত প্রার্থনা করিল। সে ইচ্ছা করিলে অনেক কিছু প্রার্থনা করিতে পারিত। অনেক ঐশ্বর্য, অনেক রত্ন, রাজত্ব, জীবনের সুখ উপভোগ করিবার জন্য দীর্ঘ পরমায়ু প্রার্থনা করিতে পারিত। কিন্তু দরিদ্র ঈশ্বরী পাটনী মূল্যবান কিছুই প্রার্থনা করিল না। সন্তান-বৎসল দরিদ্র পিতা ঈশ্বরী পাটনী। শিশু সন্তানদের ক্ষুধিত মুখে সে রীতিমত অন্ন তুলিয়া দিতে পারে না। পিতৃজীবনে ইহা অপেক্ষা মর্মান্তিক দুঃখ আর কিসে হইতে পারে। তাই বিশ্বের অন্নাভাব যিনি দূর করেন, সেই মাতা অন্নপূর্ণার নিকট বাঙলাদেশের দরিদ্র মাঝির প্রার্থনা, তিনি যেন তাহার গৃহের অন্নাভাব দূর করেন। তাহার শিশু-সন্তানেরা যেন দুইবেলা দুধভাত খাইয়া থাকিতে পারে। দরিদ্র পিতার জীবনে ইহা অপেক্ষা সুখকর আর কিছু নাই। ইহা অপেক্ষা বড় প্রার্থনাও আর কিছু নাই।

[৩৫] "জাঁকজমকে করলে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে;
তুমি লুকিয়ে তাঁরে-করবে পূজা
জানাবে না রে জগজ্জনে।" ("শ্রেষ্ঠ পূজা" পৃঃ ১৭)

ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণে তাহার হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি উৎসর্গ করিয়া থাকে। দেবতা পূজার উদ্দেশ্যই হইল দেবতাকে ভক্তের সহজ, সরল, অনাবিল ভক্তি সমর্পণ। ভক্তিই আসল; পূজার অন্যান্য উপাদান যেমন মন্দির, মূর্তি, নৈবেদ্য বা ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা

প্রভৃতি বাদ্য অথবা আরও অন্যান্য নানাবিধ জাঁকজমক অনুষ্ঠান, সবই আনুষঙ্গিক উপকরণ মাত্র। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে অহংকারের গুপ্ত কক্ষ আছে। নানাবিধ জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানপূর্বক পূজা করিলে মানুষের হৃদয়ের সেই অহংবোধ জাগ্রত হইয়া ওঠে। ভক্তি তুচ্ছ হইয়া গিয়া সেই অহংকারই তখন মানুষের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। এইভাবে দেবপূজার আসল উদ্দেশ্যই হয় তখন ব্যর্থ। তাই যে সংসারে জাঁকজমকের প্রতিযোগিতা চলিতেছে, সেই সংসারের ভিড়ে, উত্তেজনা এবং উচ্ছ্বাসের মধ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ঝর প্রবাহিত হইতে পারে না। একমাত্র শান্ত-শুদ্ধ তপোবন পরিবেশেই ভক্তি প্রকাশিত হইতে পাবে। পূজাতে যদি বাহ্যিক উপকরণই বড় হইয়া দাঁড়ায় সেখানে প্রকৃত ভক্তির জাগৃতি কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। পূজার সময় ভক্ত তাহার ভগবানকে লইয়া জগৎ সংসারকে ভুলিয়া যাইবে। উৎসব-উচ্ছ্বাসপূর্ণ জনজীবনের উত্তেজনা বা কোলাহল তাহার তপস্যায় বাধা দিতে পারিবে না। তবেই প্রকৃত ভক্তি জাগ্রত হইবে এবং যথার্থ পূজা সাঙ্গ হইবে।

[৩৬] "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়॥" ("স্বাধীনতা" পৃঃ ২২)

মানুষ মুক্তি পিপাসু। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া আপন জীবনাবেগে পথ চলিতে চায়। যদি জীবনের পায়েচলা পথের ধারে প্রতি পদক্ষেপে বাধা সৃষ্ট হয় এবং মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা যদি ব্যহত হয়, তাহা হইলে মানুষ প্রতিপদে হয় পরাধীন। এই পরাধীনতা স্বরূপের স্বচ্ছ প্রকাশ পথে অথবা জীবনের গতির পথে অসহ্য ; মুমুক্ষু মানুষ এই পরাধীনতা স্বীকার করিয়া লয় না। অবশ্য যদি পারিপার্শ্বিক পরিবেশের চাপে মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরিতে হয়, অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক আপন জীবনাবেগে চলার পথে বাধাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তখন মানুষ হয় একটি সচল যন্ত্র মাত্র। মানবিক চৈতন্য তখন তাহার লুপ্তপ্রায় হয়। যান্ত্রিক জীবন-সর্বস্ব মানুষ তখন কলের পুতুলের মতো আপন জীবনপথে বাজীকরের নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে থাকে, তাই এই পরাধীন বা বন্ধনমুক্ত জীবন কাহারও কাম্য নয়। এই জড় জীবনের হীনতায় কোন চেতন-মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায় না। দাসত্ব-শৃঙ্খলও কেহ পায়ে পরিতে চায় না। সুতরাং স্বাধীনতা মানুষমাত্রেই কাম্য।

[৩৭] "কঠোর গঙ্গায় পুজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)

সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন,
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি,
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।"

("কাশীরাম দাস" পৃঃ ৩৪)

মহাতাপস ভগীরথ স্ববংশের যাট হাজার পূর্বপুরুষের উদ্ধারকল্পে গঙ্গাকে মর্ত্যে তথা পাতালে আনয়ন করার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। পুণ্যবাহিনী গঙ্গা ভগীরথের কঠোর তপস্যায় তুষ্টা হইয়া সুউচ্চ শৈলশিখর হইতে সমতল ভূমির দিকে আগমন করেন। তাঁহার পুণ্যস্পর্শে অভিশপ্ত সগরবংশ শাপমুক্ত হয়। কিন্তু গঙ্গার পবিত্রস্পর্শে কেবলমাত্র সগরবংশেরই মুক্তি সাধিত হয় নাই। ত্রিভুবন তাহার স্পর্শে ধন্য হইয়াছে। কঠিন, রুক্ষ মরুপ্রায় সমভূমি জননীর স্নেহশীতল স্পর্শে শ্যামলী হইয়াছে। এই মহাকার্যের সাধক মহাভারত খ্যাত ভগীরথ। তাই তিনি নরকুলে ধন্য, চিরজীবী।

সেইরূপ বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচয়িতা সর্বজন পরিচিত কাশীরাম দাস ভগীরথের সহিতই তুল্য। তিনিও ভগীরথের ন্যায় মহাসাধক। সংস্কৃত ভাষার কঠিন আবরণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল মহাভারতরূপ অমৃত। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ বাঙলার প্রাকৃত জনমানস সেই অমৃত রস হইতে বহুদিন বঞ্চিত ছিল। সেই সুধার কথা তাহারা শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু পান করিবার পথ তাহাদের জানা ছিল না। মহাসাধক কাশীরাম দাস তাহাদের সেই অমৃত-রস পান করাইলেন। তিনি বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত মহাভারতের কাব্যানুবাদ করিলেন। তৃষিত চকোরের মত গৌড়-বাঙলার প্রাকৃত জনমানস সেই ইন্দু-সুধা পান করিল। মহাভারতের অনাবিষ্কৃত মহাজগৎ সাধারণ বাঙালীর নিকট এতদিনে উদ্ঘাটিত হইল। মহাতাপস ভগীরথ যেমন কঠোর তপস্যার অবসানে গঙ্গাকে সাধারণ মানুষের দুয়ারে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কাশীরাম দাসও তেমনি সমগ্র জীবনের ঐকান্তিক সাধনাদ্বারা মহাভারতের কাব্যানুবাদরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। তাই ভগীরথের মতো তিনিও ধন্য। তিনি বাঙলার প্রাকৃত জনের প্রাণগঙ্গার ভগীরথ।

[৩৮] "নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিক ধাঁধিতে!

মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—
এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার।"
("আত্মবিলাপ" পৃঃ ৩৫-৩৬)

আশার মায়ায় মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ। রাত্রিকালের সুখস্বপ্ন মানুষকে ক্ষণিকের জন্য সুখ দান করিতে পারে সত্য কিন্তু জাগিয়াই তাহাকে নিষ্ঠুর বাস্তবের সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং ঐ স্বপ্নের সাময়িক আনন্দ আশার ছলনার সহিত-ই তুল্য। আশা যেরূপ পরিণতিতে মানুষকে ব্যর্থতার কাল-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করে, সেইরূপ ঐ ক্ষণিকের সুখ-স্বপ্নের স্মৃতি জাগরণের কঠোর আঘাতে আরও দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তমসাচ্ছন্ন পথে পথিকের নিকট বিদ্যুতের দ্যুতি উল্লাসেরই কারণ হয়। কিন্তু নির্বোধ পথিক পরে উপলব্ধি করিতে পারে যে ঐ হঠাৎ আলোর ঝলকানি তাহার পথের তিমিরকে আরও নিবিড় করিয়া দিল। ক্ষণিক বিদ্যুৎদীপ্তির মতই আশা মানুষের মনকে প্রতারণা করে। আবার মরুভূমিতে তৃষিত পথিক যখন যন্ত্রণায় অস্থির, তখন মৃগতৃষ্ণিকা বা মরীচিকা তাহাকে বিভ্রান্ত করে। একবিন্দু জলের আশায় ঐ জল ছলনার দিকে সে উন্মাদের মতো অগ্রসর হইতে থাকে। মৃগতৃষ্ণিকার সন্ধান কিন্তু সে কোনদিনই পায় না। পরিণামে বিভ্রান্ত পথিকের ঘটে অপমৃত্যু। আশাও মানুষকে ঐরূপ ছলনায় মোহমুগ্ধ করিয়া সর্বনাশের পথে লইয়া যায়। রাত্রিবেলার সুখ-স্বপ্ন, নিবিড় তিমিরে ক্ষণপ্রভার দীপ্তি এবং মৃগতৃষ্ণিকা, এ সকলই আশার ছলনার মতো মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

[৩৯] "কিন্তু সেই সর্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি—
আপনার জয়চিহ্ন, যুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি।" ("সমুদ্র দর্শন" পৃঃ ৪৩)

মহাকালের অনন্তধারা ছুটিয়া চলিয়াছে অজ্ঞাত অতীত হইতে সুদূর ভবিষ্যতের পানে। মানুষের কত কীর্তি মহাকালের গহ্বরে লীন হইয়া গিয়াছে। আজ যাহা আছে বর্তমানের মনোমুগ্ধকর প্রাসাদ কাল তাহা ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ। মহাকালের এই নিষ্ঠুর আক্রমণের হাত হইতে কাহারও রক্ষা নাই। মানুষ এবং তাঁহার কীর্তি যে ক্ষুদ্র, মহাকাল তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ইতিহাস মহাকালের নিষ্ঠুর আক্রমণের নীরব সাক্ষী। ইতিহাসের পাতায় মানুষের কীর্তির ধ্বংসস্তূপ। শিল্প-সৌন্দর্যের পরিণতি কঙ্কাল করোটিতে। তাই মহাকালের এই দুর্জয় অভিযানের কথা স্মরণ করিয়া মানুষ এবং তাহার কীর্তি এক কথায় সর্ব চরাচর সর্বদাই সশঙ্কিত, মুমূর্ষু। কিন্তু

এই সর্বজয়ী মহাকাল মহাসমুদ্রের নিকট পরাজিত। মহাকাল তাহার নিষ্ঠুর আক্রমণের চিহ্ন পৃথিবীর সর্বত্র রাখিয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপরূপ প্রেতাত্মার নীরব কান্নায় মহাকালের নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রকাশিত। কিন্তু মহাসমুদ্রের উত্তাল এবং উন্মাদ বুকে মহাকালের অভিযানের কোন স্বাক্ষরই নাই। ঊষা যুগের যে সমুদ্র, আজিও সেই সমুদ্র নীল জলরাশির মন্দ্রস্বর। সেই তরঙ্গের নির্ঘোষ। সর্বগ্রাসী মহাকাল মহাসমুদ্রের বুকে তাহার শোণিত-পদচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। সমুদ্র তাই প্রকৃতই মহান।

[৪০] নমি আমি প্রতিজনে—আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অনু
সমগ্রে প্রকাশ! ("মানব-বন্দনা" পৃঃ ৮২)

সকল মানুষই প্রণম্য। কেননা যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের অজস্র কর্মধারাই মানুষকে সভ্যতার সমুদ্রোপকূলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কাহারও একার চেষ্টায় বা একার বুদ্ধিতে বা শক্তিতে, সামর্থ্যে এই বিশাল মানব-সভ্যতা গড়িয়া উঠে নাই। অজস্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমবায়েই যুগে যুগে সভ্যতার একটি একটি করিয়া উন্নতির সোপান গড়িয়া উঠিয়াছে। সকল কর্মীরাই এই সোপান গঠনে তাহাদের শক্তি বা উদ্যম, বুদ্ধি বা সামর্থ্য, প্রতিভা বা ঐশ্বর্যদান করিয়াছে। রাজাও দান করিয়াছে, প্রজাও দান করিয়াছে। প্রভুরও দান আছে, ক্রীতদাসেরও দান আছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই সভ্যতাকে নানা দিক দিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছে। কাহারও দান নগণ্য নয়। সকলের দানের সমবায়েই গড়িয়া উঠিয়াছে সভ্যতা। যেমন বিন্দু বিন্দু জলের সমষ্টিতে গড়িয়া উঠিয়াছে মহাসমুদ্র, যেমন অণুর সমষ্টিতে গড়িয়া উঠিয়াছে মহাবিশ্ব, তেমনি যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের কর্মের সমবায়েই গড়িয়া উঠিয়াছে মহামানব সভ্যতা। স্বর্গরাজ্য হইতে কোন দেবতা আসিয়া মানুষকে সাহায্য করে নাই। মানুষের ক্ষুধার অন্ন মানুষই জোগাইয়াছে। ভীত, শোকার্ত মানুষকে সান্ত্বনা দিয়াছে মানুষই। নানা শ্রেণীর মানুষই নানাভাবে মানুষের কল্যাণার্থে কাজ করিয়াছে। তাই সেই নরদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম।

[৪১] "তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি,
অর্থ তাহার—চেনেনা সে তার শক্তির সংহতি।" ("চাষার ঘরে" পৃঃ ১৪৪)

স্বার্থান্ধ মানুষ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্লজ্জ এবং নিষ্ঠুর হইতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। মানুষ হইয়া মানুষের অমর্যাদা এবং অবমাননা তাহারা হাসিমুখেই করিয়াছে। বুদ্ধিমানের দল স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছে। মূর্খের দল পতিত হইয়াই পড়িয়া রহিল।

জগতে তাই দুই শ্রেণী—শোষক এবং শোষিত অথবা ধনী এবং দরিদ্র। দবিদ্রের দল তথা শোষিতের দল চরম লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া অসহনীয় জীবনযাপন করিতেছে, কেবলমাত্র দেহকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছে। এত করিয়াও তাহারা প্রায় অনাহাবী, বিবস্ত্র, বোগ-শোকেব বিষাদ ছায়ায় তাহাদের গৃহ তমসাচ্ছন্ন। এই দুর্গতিকে তাহারা তাহাদের যথাযোগ্য প্রাপ্য বলিয়াই মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছে। তাই এই অন্যায় এবং অবিচাবেব বিরুদ্ধে তাহারা প্রতিবাদ করে না বা প্রতিবাদ করিবার মতো ভাষা তাহাবা হারাইয়াছে।

কিন্তু তাহারা জানে না যে এই দুর্গতি, এই দুঃসহ যন্ত্রণা এবং শোষণ তাহাদের প্রাপ্য নয়। তাহারা জানে না যে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার মতো মানবিক শক্তি তাহাদের আছে। মনে তাহাবা যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে সংহতি সংস্থাপনপূর্বক এই অন্যায় লাঞ্ছনা ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তবেই তাহারা পুনরায় তাহাদের প্রকৃত মানবিক জীবন ফিরিয়া পাইবে। তাহাদের দুর্গতির কারণ অজ্ঞাত। সংহতি শক্তির জ্ঞান যদি তাহাদের থাকিত, তাহা হইলে তাহারা এই অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবের অগ্নিদাহন করিতে পারিত। চিতা-ভস্মে পরিণত করিতে পারিত ঐ অন্যায় শাসন ও নির্যাতনকে।

[৪২] "হয়ত' আমার এ পথে আব
হবেনাক আসা,
দুধারে যাই রোপন ক'রে
বুকের ভালবাসা।" (পৃঃ ১৩০)

মানুষ অমর নয়। মৃত্যু তাহার সুনিশ্চিত। জন্মান্তরবাদেও অনেকের মন দ্বিধাগ্রস্ত। বার মৃত্যু হইলে আবার এই মাটির মর্ত্যে ফিরিয়া আসা হইবে কিনা কে জানে! হয়তো আর ফিরিয়া আসা হইবে না। হয়তো মৃত্যুতেই জীবনের চরম সমাপ্তি, চিতাভস্মই জীবদেহের পরম পরিণতি। যদি তাহাই হয় তবে যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ মানুষকে তথা জীবকে ভালোবাসিয়াই মৃত্যুবরণ করা উচিত। আমাদের বুকভরা ভালোবাসা আছে। সে ভালোবাসা অকাতরে জীবকে বিতরণ করিয়া যাওয়াই উচিত। যাহাদের সঙ্গে আর কখনো দেখা হইবে না, অথচ যাহাদের সহিত ক্ষণকাল কাটিতেছে—সুখে, দুঃখে, বুকের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করিয়া তাহাদেরই ঢালিয়া দেওয়া উচিত। মৃত্যুর পরেও যেন ভালোবাসার চিহ্ন পৃথিবীর বুকে থাকে। জীবনে চলার পথেব দুইধারে ভালোবাসারূপ বৃক্ষ রোপিত হউক। সেই ভালোবাসারূপ বৃক্ষের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় মানুষের অন্তর স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূরিত হইবে।

[৪৩] "সোনা নিয়ে কি মা হবে ? জমিদার কেড়ে লবে,
লুটে লবে চোরে বা ডাকাতে !
বর দাও মোরে হেন, আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে।" ("বাঙালীর সাধ" পৃঃ ১৪৬)

দরিদ্র বাঙালীর জীবনের একমাত্র কামনা যে তাহার সন্তান-সন্তানাদি যেন আজীবন দুধ ভাত খাইয়া কাটাইতে পারে। ইহার অধিক তাহার কামনা নয়। ইহার অধিক পাইবার অধিকার বা সামর্থ্যও তাহার নাই। অধিক সম্পদ পাইলেই নিষ্ঠুর জমিদার তাহা অকারণে কাড়িয়া লইবে, কিংবা বিচারহীন দেশে চোর অথবা ডাকাত লুঠ করিয়া লইয়া যাইবে। তাই মূল্যবান স্বর্গ পাইবার আগ্রহে দরিদ্র বাঙালী কখনই আগ্রহী নয়। সামান্য সুখ বা সম্পদের মধ্যেই সে জীবনের আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পাইয়াছে। বাঙলার গ্রাম ছিল শান্তির নীড়। এইরূপ একজন সন্তুষ্ট বাঙালী ছিল ঈশ্বরী পাটনী। মাতা অন্নপূর্ণার নিকট হইতে আশীর্বাদ পাইয়াও সে ধনরত্ন, রাজ্য-সাম্রাজ্য এমন কি মুক্তি প্রার্থনা না চাহিয়া শুধু নিজের সন্তান-সন্ততিরা যেন সচ্ছল অবস্থায় দিন কাটাইতে পারে ইহার অধিক তাহার প্রার্থনা নয়। দুধ ভাতের বেশী সে কামনা করে না। তাহার কামনা এই যে, তাহাকে তাহার স্নেহাতুর সন্তানাদিকে যেন নিরন্ন থাকিতে না হয়; যেন তাহারা চিরদিন দুধ-ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহার অধিক কামনা দরিদ্র বাঙালীর নাই। তাই জগজ্জননীর নিকট ইহাদের তুচ্ছ প্রার্থনা "আমার সন্তান যেন চিরদিন থাকে দুধে ভাত।"

রামায়ণী কথা

(দশম শ্রেণীর পাঠ্য)

[৪৪] "গভীর দুঃখে পড়িয়া লোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে ; হৃদয়ে অমানিশার তুল্য শোক, নৈরাশ্য বা অনুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে সেই জ্ঞান আসে না।"
("দশরথ" পৃঃ ১৩)

জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধি বা জ্ঞান দুঃখের অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্চারিত হয়। আমাদের ভাষায় চলিত প্রবাদই আছে যে 'লোকে ঠেকিয়া (ঠকিয়া) শেখে।' প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দুঃখ অভিজ্ঞতার ফসল। সাধারণভাবে অথবা বিলাসিতার মধ্যে আমরা যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রানির্বাহ করি তখন জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে চিন্তা করিবার মতো অবকাশ আমরা পাই না। অথবা চিন্তা করিলেও প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করিতে পারি না। অভিজ্ঞতা আমাদিগকে হাতে কলমে তত্ত্বজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তোলে। বিশেষতঃ দুঃখের অভিজ্ঞতা আমাদের চৈতন্যে প্রবল আঘাত করে।

আমাদের অনুষ্ঠিত কোন দুষ্কর্মজনিত অনুশোচনা বা নৈরাশ্য, আমাদের প্রিয়জনের বিয়োগজনিত শোক ইত্যাদি হৃদয়ে দুঃখের প্রবল আলোড়ন তোলে। তখন সেই দুঃসময়ে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে আমরা প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারি। অন্য সময়ে অর্থাৎ যে সময় আমরা সাধারণভাবে সুখ-বিলাস করিয়া ভোগ-প্রাচুর্যের মধ্যে দিন অতিবাহিত করি, তখন আমরা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারি না।

[৪৫] "আম্রতরুচ্ছেদন করিয়া পলাশ-মূলে জল সেচন করিয়া মূঢ় ব্যক্তি শেষে ফল না পাইলে বিস্মিত হয়, পলাশ ফুল হইতে আম্রফল উদ্গত হয় না।" ("দশরথ" পৃঃ ১৩)

প্রকৃতির রাজত্ব নিয়মের রাজত্ব। নিয়মের বাহিরে এই রাজ্যে কিছুই হইবার উপায় নাই। কার্য অনুযায়ী ফল পাওয়া যাইবে। আমের বীজ রোপন করিলে তাহাতে আম্রফলই পাওয়া যাইবে। ঐ বৃক্ষে পলাশ ফুল পাওয়ার আশা বৃথা। আম্র বৃক্ষ ছেদন করিয়া পলাশ গাছের মূলে জল সিঞ্চিত করিলে পলাশ গাছই বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে পলাশ ফুলই প্রস্ফুটিত হইবে। পলাশ গাছে আম্রফল আশা করা যায় না। তেমনি সুকার্য হইতে অজ্ঞতাবশতঃ নিজেকে বিরত করিয়া দুষ্কার্য সাধন করিলে তদনুযায়ী ফলই পাওয়া যাইবে। পলাশ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিয়া যেমন আম্রফল পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, দুষ্কার্য করিয়াও তেমন সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। কার্যের সহিত কারণের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

[৪৬] "ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে রাম-বনবাসের করুণ কথা হৃদয়ের রক্তে লিখিত রহিয়াছে। এ দেশের রাজভক্তি, পুত্রস্নেহ, জননীর আদর, স্ত্রীর প্রেম সকলই সেই অযোধ্যাকাণ্ডের চিরকরুণ স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।" ("রামচন্দ্র" পৃঃ ২৪)

ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতের দেশ। এই দুই মহাকাব্যের গঙ্গা-যমুনা স্বরূপিনী চিরন্তনী ধারা ভারতীয় মানসকে অমৃতরসের স্পর্শ দিতেছে যুগ-যুগান্তর। কালের নিষ্ঠুর কবলে ভারতের কত অতীত সংস্কৃতি ও সভ্যতা চিরকালের মতো লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু বহু- ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস অতিক্রম করিয়াও ঐ দুই মহাকাব্য আজও চির পুরাতন, চির নূতন। ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এই দুই মহাকাব্য।

কত উত্থান, কত পতন, কত সুখ আর দুঃখ, কত আনন্দ-বেদনার কাহিনীতে ভরা রামায়ণী কথা ভারতবাসীর চিত্ত সমুদ্রকে কত যুগ হইতেই না উদ্বেলিত করিয়া চলিয়াছে। রাম-বনবাসের করুণ কাহিনী বলিতে বলিতে অথবা শুনিতে শুনিতে কত যুগের কত ভারতবাসীর চোখের জল ধূলিতে সিক্ত করিয়াছে। পিতা দশরথ, মাতা কৌশল্যার পুত্র বিরহজনিত মর্মভেদী হাহাকার কত যুগের কত ভারতীয়ের হৃদয়ে অশান্ত কান্নার তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে। নিস্তব্ধ নিশীথে পিদিমের ম্লান আলোয় কথকঠাকুর পড়িয়া

চলিয়াছে বনবাস মুহূর্তে সীতার পতিপ্রেমের কাহিনী, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, পরমপ্রিয় যুবরাজ রামচন্দ্রের বনবাসহেতু অযোধ্যার প্রজাবৃন্দের হাহাকারের কাহিনী। আধো-চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে শত শত গ্রামীণ ভারতের আত্মা উৎসুক্য সহকারে শুনিয়াছে সেই অশ্রুবিদারক কাহিনী, গ্রহণ করিয়াছে সেই রস। সেই নিষ্ঠুর বিদায় কাহিনী যেন ভারতবাসীর হৃদয়ের বেদনাজাত রক্তাক্ষরে লিখিত আছে।

এমনি করিয়া কত যুগে কত গ্রামে পিদিম জ্বলিয়াছে। কত বার রামচন্দ্রের বনবাসের কাহিনী পঠিত হইল। কত অশ্রু বর্ষিত হইল ভারতবর্ষের মাটিতে। আবার কত পিদিম নিবিয়া গেল। কত যুগ অতিক্রান্ত হইল। কিন্তু এত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যাহা ভারতীয় হৃদয়ে রক্তিম অক্ষরে লিখিত হইয়া রহিল, তাহা মুছিয়া যাইবার নহে। ভারতের পারিবারিক জীবনের উপর ঐ হৃদয়-রক্তে-রাঙ্গা কাহিনীর প্রভাব পড়িয়া গেল। ভারতীয়দের রাজভক্তি, পুত্রস্নেহ, স্ত্রীর প্রেম, জননীর আদর সকলই যেন এইসব কাহিনী রসে রসাপ্লুত সকলেই যেন তাহাদের সমগ্র জীবনব্যাপী কার্যক্রমে ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

[৪৭] "মনুষ্যের সুদৃশ্য দেহ জরাবশীভূত হইয়া শক্তিহীন ও বিরূপ হইয়া পড়ে। পক্ক শস্যের যেরূপ পতনের ভয় নাই সেইরূপ মনুষ্যেরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত—কারণ উহা অবধারিত।" ("রামচন্দ্র" পৃঃ ৩১)

নব কিশলয়ের মধ্যে যে শ্যামলিমা থাকে তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কালের কুটিলা গতি অল্প সময়ান্তরেই তাহাকে বিকীর্ণ এবং বিশুষ্ক করিয়া ফেলে। একদিনের কচি কিশলয় অন্যদিন ঝরা-পাতায় পরিণত হয়। যে শিশু বিস্মিত সরল দৃষ্টিতে জীবনের প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিল, কালক্রমে কৈশোর তাহার চঞ্চল পক্ষ বিস্তার করিয়া সেই বনের বাসন্তী আনন্দের কুঞ্জদ্বার উন্মোচন করিবে। কিন্তু হায় সে অমৃতালয়ে যৌবন তৃপ্তি পাইতে না পাইতেই প্রৌঢ়ত্ব তাহাকে আহ্বান করিবে গভীর-গাম্ভীর্যে। দেহ হইবে ক্ষীণ, চলা হইবে ধীর। জীবনের প্রথম সূর্যোদয়ের আনন্দ অনেক সূর্যোদয়দর্শনে মলিন হইয়া যাইবে। নিষ্ঠুর কাল মানুষের শ্রীযুক্ত দেহকে করিবে শ্রীহীন। জরার কবলে মানুষ হইবে বিকৃত ও পঙ্গু। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে এই ক্রম বিবর্তন, এই ধ্বংসোন্মুখী অগ্রস্থতি স্বাভাবিক এবং মৃত্যু চিরন্তন সত্য। জীবনের মৃত্যুর নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে মুক্তি নাই। পক্ক শস্য মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। জীবন মাত্রেরই মৃত্যু আছে এই জ্ঞানে সে প্রদীপ্ত। তাই মৃত্যুর দুয়ারে বসিয়াও সে মৃত্যুভয়ে কখনও শঙ্কিত ও ভীত নয়। নির্ভাবনায় এবং নির্ভয়ে বাতাসের চাঞ্চল্যে সে তাহার জীবনানন্দ প্রকাশ করে। তেমনি জ্ঞান যাহার পরিপক্ক হইয়াছে এবং জীবন মৃত্যুর তত্ত্বজ্ঞানে যে বোদ্ধা হইয়াছে, মৃত্যুকে সে জীবদেহের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মৃত্যুকে স্বাভাবিক বা সুন্দররূপে গ্রহণ করিতে পারে না। সর্বদাই তারা মৃত্যু-

ভয়ে সশঙ্ক। মৃত্যুকে তাহারা স্বীকার করিতে চায় না। মৃত্যুর পরেও মৃতের স্মৃতি ধরিয়া রাখিতে চায় নানা উপায়ে। কিন্তু ধরিয়া রাখা যায় না। মহাকালের কঠিন নিষ্পেষণে একদিন সকল স্মৃতি, বিস্মৃতির প্রদোষ অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যুকে কখনই ভয় করে না, তারা মৃত্যুকে সহজ ও সুন্দররূপে বরণ করে। ফলে জীবিতকালে তাহারা সংকটের অলীক কল্পনায় ম্রিয়মাণ হয় না। জীবনের সকল রস পান করিয়া সহজ সুন্দর মরণের মহালগ্নকে তাহারা সাদরে অভ্যর্থনা করে।

[৪৮] "রামচরিত্র বিশাল বনস্পতির ন্যায়; উহা ক্বচিৎ নমিত হইয়া ভূস্পর্শ করিলেও সেই অবনয়ন তাঁহার নভঃস্পর্শী গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করে না—পার্থিব জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করে মাত্র।" ("রামচন্দ্র" পৃঃ ৬১)

রামায়ণী কথার নায়ক শ্রীরামচন্দ্র। কথিত আছে ভগবান বিষ্ণু অবতাররূপে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক ঐ প্রাচীন মহাকাব্যে বর্ণিত রামচরিত্রের বিকাশ ও বিস্তৃতি বহুদূর প্রসারিত। মহাকাব্যের নায়কোচিত সকল গুণের সমাবেশ ঐ বিশাল বিস্তৃত চরিত্রকে উন্নতির গগনস্পর্শ করাইয়াছে। ঐ চরিত্রের মহত্ত্ব বীরত্ব, প্রেম, স্নেহ, কোমলতা এবং সহৃদয়—সহানুভূতি বহু যুগ যুগ ধরিয়া রামায়ণী কথার পাঠককে এবং শ্রোতাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে। সাধারণ জীবদেহ ধারণ করিয়াও তিনি অসাধারণ মহামানব। মানুষের আদর্শ সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ রামচরিত্রকে মানবোত্তীর্ণ প্রায় এক দেবচরিত্রে পরিণত করিয়াছে। মানবচরিত্রের চরমোন্নতি রামচরিত্রে উন্নীত।

কিন্তু রামচরিত্র যদি এই অতিলৌকিক দেবচরিত্রের ন্যায় হইয়া থাকিত তবে তাহা পাপ-পুণ্য, সুখে-দুঃখে ভরা পৃথিবীর মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না। দেবচরিত্ররূপে রামচন্দ্র তখন হয়তো মানুষের পূজ্য হইত কিন্তু এতখানি হৃদয় অধিকার করিয়া বাসতে পারিত না। যুগ-যুগান্তর পাঠকের হৃদয়ের সহিত তবে এমন করিয়া রাম চরিত্রের আত্মীয়তাও স্থাপিত হইত না।

মহাকবি রামচন্দ্রকে প্রায় অতিলৌকিক দেবচরিত্ররূপে গড়িয়া তুলিলেও রাম যে মানুষ তাহা তিনি ভুলিয়া যান নাই। ধরার ধূলির মানুষ সম্পূর্ণ নির্মল হইতে পারে না। পঙ্কের স্পর্শ তাহাকে কিছুটা মলিন করিবেই। পাপ এবং পুণ্য লইয়াই মানুষের জীবন। যে চরিত্রে কেবলমাত্র পুণ্যরাজির সমাবেশ সে চরিত্রতো মানুষের চরিত্র নয়, সে মনুষ্যোত্তীর্ণ দেবচরিত্র।

রামচরিত্রে মনুষ্যোত্তীর্ণ অজস্র গুণাবলীর সমাবেশ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সে চরিত্র সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। সাধারণ মানুষেরই মতো ক্রোধ, বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। এই কারণেই রামচরিত্র আর দেবচরিত্র হইতে পারে নাই। পৃথিবীর ধূলির স্পর্শ তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

গগনস্পর্শী মহত্ত্ব মাঝে মাঝে অবনমিত হইয়া পৃথিবীর পঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে। তাই রামচরিত্র বিশাল বনস্পতির ন্যায়।

বিশাল বনস্পতির উন্নতি দীর্ঘ উচ্চে উন্নীত। ইহা যেন প্রায় গগনস্পর্শী। তবে কখনও কখনও তাহার উঁচু শাখা নীচু হইয়া মাটি স্পর্শ করিতে চাহে, স্পর্শও করে। কিন্তু বনের পতির সেই উচ্চ বৃক্ষের উন্নতির গৌরব তাহাতে বিনষ্ট হয় না। পরন্তু মাটির সহিত যে তাহার সুগভীর সম্পর্ক রহিয়াছে অবনমনের মাধ্যমে সে তাহারই পরিচয় প্রদান করে। সেইরূপ রামচন্দ্রের গগনস্পর্শী মহত্ত্ব মাঝে মাঝে মাটিকে স্পর্শ করিয়াছে। ইহাতে তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব বিনষ্ট হয় নাই; বরং রামচন্দ্র সে মনুষ্যোত্তীর্ণ দেবচরিত্র নয়, মাটির মানুষের সহিত যে তাহার আত্মীয়তা রহিয়াছে, ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে। তাহার মহত্ত্ব সাধারণ মনুষ্যোচিত আচরণে বিনষ্ট না হইয়া পরন্তু সাধারণ মানুষের সহিত তাহার হৃদয়ের সম্পর্ক আরও গভীর করিয়া দিয়াছে।

[৪৯] "বাল্মীকি-অঙ্কিত রামচরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত—এ চিত্রে সূচিকাবিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়,—এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধূমবিগ্রহে পরিণত হইয়া পুস্তকান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই।" ("রামচন্দ্র" পৃ. ৬২)

রামায়ণ মহাকাব্যের স্রষ্টা মহাকবি বাল্মীকি। মহাকাব্যোচিত নায়কের সকল গুণের সমাবেশ ঐ চরিত্রে বিদ্যমান। কিন্তু মহাকবি বাল্মীকি উক্ত চরিত্রটি কেবলমাত্র একটি আদর্শ বা মহৎ চরিত্ররূপে অঙ্কিত করেন নাই। মানবোচিত নানা সূক্ষ্ম অনুভূতির আবেগ ও উচ্ছ্বাসের স্পর্শে চরিত্রটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের নানারূপ বিকাশ ও বিবর্তন চরিত্রটিকে রক্ত মাংসের একটি শরীরীরূপ দান করিয়াছে। মানুষের হৃদয়ের উত্তপ্ত স্পর্শ ঐ চরিত্র পাঠান্তে পাওয়া যায়। ইহাই মহাকবির মহাশিল্পীর যথার্থ সৃষ্টি। মনুষ্যদেহে সূচিকাবিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেমন রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকে, তেমনি মনে হয় মহাকবি রাম চরিত্রকে এতই জীবন্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন যে, তাহাতেও সূচিকাবিদ্ধ করিলে জীবন্ত মানুষেরই মতো রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকিবে। এ চরিত্রে অস্পষ্টতা কিছুই নাই। ইহা কেবলমাত্র একটি পুস্তকান্তর্গত ছায়া মাত্র নহে। পাঠকালে পাঠক যেন একটি জীবন্ত মানুষকে তাহাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে পায়। সাধারণ কাব্যে বা পুস্তকে যে সকল চরিত্র অঙ্কিত হয় তাহা অনেক সময়ই কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট হয়। কল্পনার পক্ষ অনেক সময়ই রক্ত মাংসের বাহিরে চরিত্রকে লইয়া যায়। সেখানে চরিত্র জীবন্ত হইতে পারে না। কায়ার পরিবর্তে সে চরিত্রে ছায়া দুষ্ট হয়। চারিত্রিক আদর্শ প্রচারই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মহাকবির কৃতিত্ব জীবন ও চরিত্র সৃষ্টিতে। মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্র রক্তমাংসে গড়া ধারার ধূলির জীবন্ত মানুষ। তাঁহার দেহের এবং হৃদয়ের স্পর্শ রামায়ণ কাব্যের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়।

[৫০] "জগতে নিরপরাধীর দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মত আদর্শ ধার্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল।" ("ভরত" পৃঃ ৬৫)

রামায়ণ মহাকাব্যের প্রতিটি চরিত্রের সূক্ষ্ম তুল্য মূল্য বিচার করিলে প্রায় সকল চরিত্রের কোন না কোন অংশে দোষ বা পাপকার্য দৃষ্ট হইবে। এমন কি মহাকাব্যের নায়ক শ্রীরামচরিত্র পর্যন্ত দোষশূন্য নয়। কিন্তু সকল চরিত্র পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায়, একমাত্র ভরত চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ ও শুচিশুভ্র। কোন প্রকার পাপ-পঙ্ক তাঁহার শুচিশুভ্র চরিত্রকে মলিন করিতে পারে নাই। অথচ এই সর্বদোষ শূন্য পুণ্যবান চরিত্রকেই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্যাতন, অধিক দণ্ড সহ্য করিতে হইয়াছিল। মাতা কৈকেয়া তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে অন্যায় সন্দেহের মূল কারণ। পিতা তাঁহাকে পুত্ররূপে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া স্বীয় ঊর্ধ্বদৈহিক কার্য হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ ভরতকে অনেক সময়ই অন্যায় সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এমন কি নায়ক রামচন্দ্র পর্যন্ত ভরতকে নানা সময়ে নানাভাবে সন্দেহ করিয়াছিলেন। সমস্ত রামায়ণ মহাকাব্য যেন ভরতের উপর বিরূপ। অন্যায়ভাবে সর্বত্রই যেন মনে হইয়াছে রাম সীতার বনবাস, নির্যাতন, সকলেরই মূল একমাত্র ভরত। তাই রামায়ণের প্রায় সকল চরিত্রের মুষ্টি অযথা অন্যায়ভাবে ধার্মিক ভরতের প্রতি উদ্যত। যাহারা জগতে অপরাধ করেন না অপরাধীরা তাহাদের ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে। যীশুখৃষ্টকে এইরূপ অন্যায়ের কাছে বলি হইতে হইয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রচুর অন্যায়দণ্ডের সন্ধান মিলিবে। কিন্তু ভরতের ন্যায় ধার্মিক, সর্বদোষশূন্য চরিত্রের উপর এইরূপ অন্যায় নির্যাতনের তুল্য হয়তো দ্বিতীয়-রহিত।

[৫১] "ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলান্ন—সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্জন, জীবিকার সংস্থান।" ("লক্ষ্মণ" পৃঃ ৮৮)।

রামায়ণ মহাকাব্যে ভ্রাতৃভক্তির দুইটি আদর্শ আমরা পাই। অগ্রজ রামের প্রতি ভরতের এবং লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম আমাদিগকে যথাক্রমে মুগ্ধ এবং ভ্রাতৃনিষ্ঠ করিয়া তোলে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা যে কত মহৎ এবং উদার হইতে পারে ভরত ও লক্ষ্মণ তাহার জীবন্ত উদাহরণ। কিন্তু এই দুইজনের আদর্শ তথা উদ্দেশ্য এক হইলেও ভক্তিপথ ভিন্নমুখী। তাই রামায়ণের ভ্রাতৃভক্তির ঐ আদর্শকে আমরা দুই ভাগ করিয়া লইতে পারি।

ভরত ভ্রাতৃভক্ত। কিন্তু তাহার ভক্তি ধ্যানরত তপস্বীর ন্যায়। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াও তিনি ভ্রাতৃভক্তিতে অবিচলিত। তপস্বী যেমন নির্জন ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশে

তাহার আরাধ্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন, ভরতের ভ্রাতৃভক্তি তদনুরূপ। ইহাতে ভক্তি একনিষ্ঠতা প্রকাশিত হয়, ভক্ত-সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, আরাধ্য ও ভক্তের অন্তরের শুচিশুভ্র ভক্তি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঐরূপ ভক্তিতে আরাধ্যের কোন স্বার্থ সিদ্ধ হয় না বা প্রয়োজনের কোন সম্ভার ঐ ভক্তি বহন করিয়া আনে না। অগ্রজ রামের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির অসাধারণ প্রতীক ভরত। প্রাপ্য রাজত্ব ত্যাগ করিয়া দাসানুদাসের মত অগ্রজের পাদুকা-পূজা করিয়া, আজীবন সর্বত্যাগী বনবাসী সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করিয়া ভরত ভ্রাতৃপ্রেমের তথা ভক্তির যে জলন্ত এবং জীবন্ত স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, মহাকবির অমর লেখনীর যাদুস্পর্শে রামায়ণের পাতায় পাতায় তাহা প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ঐরূপ ভ্রাতৃভক্তি আরাধ্যের অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি অনুজ অন্তরের একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা ভক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কিছু পান নাই। ঐরূপ ভ্রাতৃভক্তি ভরতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে কিন্তু রামচন্দ্রের দুঃখময় জীবনের কোন রূপান্তর আনিতে পারে নাই।

কিন্তু লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি ভরতের ন্যায় ভ্রাতৃপ্রেমের কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করে না। ইহা নীরবে তাহার ভ্রাতৃপ্রেম সাধন করিয়া যায়। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি যেন নদীর উপরে বিশাল তরঙ্গ। ইহার আবেগ লক্ষ্য করিতে পারা যায় কিন্তু লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি গভীরতার অন্তরে স্রোতাবেগ। ইহার উচ্ছ্বাস বাহ্যিক নয়, অতএব ইহা দেখা যায় না। লক্ষ্মণ ছায়ার মত রামের পশ্চাদানুসারী। রামের পক্ষে এই ভ্রাতৃপ্রেম প্রয়োজনীয়। লক্ষ্মণ রামের বনবাস-সঙ্গী, ভ্রাতৃভক্তির একনিষ্ঠতায় রাজ্যত্যাগী, লক্ষ্মণ সংকটে রামের সহায়, সম্পদে ত্যাগী, লক্ষ্মণ রামের ভৃত্যের ন্যায় বনবাসকালীন সেবক। লক্ষ্মণ রামের প্রয়োজনে সর্বদাই আনতশির সেবক। তিনি রামের জন্য আত্মত্যাগ করিতেও প্রস্তুত। তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি ভিন্ন রামের বনবাস জীবন অথবা সীতা উদ্ধার কল্পনা করিতে পারি না, লক্ষ্মণ ভিন্ন রাম অসহায়, প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গী ও সেবক সে।

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি পলান্নের সহিত তুলনীয়। পলান্ন আমাদের নিত্য আহার্য বস্তু নয়—বিলাস দ্রব্য। পলান্ন ভিন্নও আমরা জীবনধারণ করিতে পারি। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি পাইলে হৃদয় তৃপ্ত হয়। কিন্তু ইহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। অপরপক্ষে লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি অন্নব্যঞ্জনের ন্যায়। দৈনন্দিন জীবনের জীবিকা আমাদের অন্নব্যঞ্জন। ইহা যেমন আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় তেমনি লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি ভিন্ন রামও চলিতে পারে না। রামের দৈনন্দিন জীবনযাপনে লক্ষ্মণের প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি রামের জীবিকার সংস্থান অন্নব্যঞ্জনের ন্যায়।

[৫২] "আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন ; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণথালে উপাদেয় আহার করিতেছেন।"
("লক্ষ্মণ" পৃঃ ৮৮-৮৯)

রামায়ণ মহাকাব্যে ভ্রাতৃভক্তির অনন্য উদাহরণ লক্ষ্মণ। ছায়ার মত তিনি সর্বদা রামের অনুসঙ্গী। সংকটে এবং প্রয়োজনে সকল সময়ই তিনি রামের রক্ষক ও একনিষ্ঠ সাধক। রামচন্দ্রও একনিষ্ঠ ভক্তির বিনিময়ে অকৃত্রিম স্নেহ প্রত্যার্পণ করিয়াছেন। অগ্রজ ভালোবাসা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন অনুজকে। শক্তি-শেলাহত লক্ষ্মণের জন্য রামচন্দ্রের মর্মস্পর্শী বিলাপ আমাদের হৃদয়কে বিচলিত করে। আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম ও ভক্তিবোধ রাম, লক্ষ্মণ এবং ভরতের চরিত্রপাঠান্তে জাগ্রত হয়।

রামায়ণ মহাকাব্যের আদর্শের ধারক ও বাহক ভারতবাসী। ভারতের ইতিহাসে কত দুর্যোগের কাল-বৈশাখী আসিয়া প্রাচীন কত কীর্তি বিস্মৃতির মহেন্জোদড়ো-হরপ্পার গর্ভে বিলীন করিয়া দিল; কত পরিবর্তন-বিবর্তন-বিপ্লব কত শত স্মৃতিকে ধ্বংসের শ্মশানে ভস্ম করিয়া দিল, কত পুরাতন ইমারত ধ্বংস করিয়া কত নূতন জন্মগ্রহণ করিল। কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া গেল কিন্তু ভারতবর্ষ আজও সেই সনাতন-রামায়ণ মহাভারতের ভারতবর্ষ। ঐতিহাসিক প্রলয় রামায়ণী সংস্কৃতিকে কালের গহ্বরে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। রাম, সীতা, ভরত ও লক্ষ্মণ ইত্যাদি আজও ভারতবাসীর অন্তরে চিরজাগরূক—ভারতীয় জনজীবনের আদর্শ।

কিন্তু হায় মোহগ্রস্ত হইয়া, বর্তমানের সংকীর্ণ পরিবেশে মহতীবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া আমরা সেই মহান আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। ভ্রাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রেমের জ্বলন্ত আদর্শ লক্ষ্মণ ও রামচন্দ্রকে নামসর্বস্ব কেবলমাত্র আমরা মনে রাখিতেছি। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুমহান পথ হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিতেছে। আজ আমরা ভ্রাতার সংকটে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া ভ্রাতার বিপদে সুখলাভ করিয়া থাকি। কী আশ্চর্য অধঃপতন আমাদের। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির ক্ষণিক মোহে উত্তেজিত হইয়া আমরা যদি অন্ধের মত ভারতের এই সুমহান সভ্যতা ও সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত হইতে থাকি, তবে আমাদের জাতীয়স্বাতন্ত্র্য তথা সমগ্র জাতি ধ্বংস হতে বাধ্য। রামায়ণী আদর্শে আবার যদি আমরা উদ্বোধিত না হই, ভ্রাতৃভক্তিকে যদি আমরা আস্তাকুঁড়ের আবর্জনাতেই চিরকালের মতো নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তবে ইহা অপেক্ষা রামায়ণের দেশে আর দুঃখের কারণ কি থাকিতে পারে ?

[৫৩] "কৌশল্যাচিত্র হিন্দুস্থানের আদর্শ জননীর চিত্র—আদর্শ-স্ত্রী চরিত্র। প্রতি পল্লীগৃহের হিন্দুবালক এখনও এই স্নেহ ও আত্মত্যাগ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতেছে।"
('কৌশল্যা" পৃঃ ১০০)

রামায়ণী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ভারতবাসী। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা প্রভৃতি যথাক্রমে ভারতের জন-জীবনের বীরত্ব, ভ্রাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভক্তি এবং বধূর আদর্শ। দশরথ স্ত্রী, রামমাতা কৌশল্যাও তেমনি মাতা ও স্ত্রীরূপে ভারতীয় নারীজীবনের আদর্শ-স্বরূপিণী। স্ত্রীরূপে কৌশল্যা আপন মর্যাদা পান নাই। রূপপিপাসু রাজা দশরথ মধ্যমা স্ত্রী কৈকেয়ীর রূপোন্মাদ ছিলেন। তথাপি মর্যাদাহীনা হইয়াও কৌশল্যা আপন নারীধর্ম কখনও বিসর্জন দেন নাই। স্বামী দেবতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রেম ছিল একনিষ্ঠ। নানারূপ নির্যাতনেও তিনি এই নারীধর্ম বজায় রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীরূপে কৌশল্যা তাই ভারতীয় নারীজীবনের আদর্শ।

যেমন স্ত্রীরূপে, তেমনি মাতারূপেও কৌশল্যা ছিলেন ভারতীয় নারীজীবনের আদর্শ। স্বামীর ভালোবাসা অপ্রাপ্য হইল জানিয়া কৌশল্যার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। রামচন্দ্র রাজা হইবেন। অভাগিনী কৌশল্যা আবার জীবনানন্দ খুঁজিয়া পাইবেন। স্বামীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিতা নারীর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল পুত্রের রাজ্যলাভ। কিন্তু তাঁহার সেই স্বপ্নও রূপায়িত হইল না। সোনার স্বপ্নে বাদ সাধিলেন দশরথ-প্রেমিক কৈকেয়ী। রাজত্বের পরিবর্তে কৌশল্যা পুত্রকে বনবাসে যাইতে হইল। স্নেহ নদীতে বান্ ডাকিল। পুত্রস্নেহকাতরা কৌশল্যা ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। বঞ্চিতার বহুদিনের বুক-সঞ্চিত স্বপ্নভঙ্গের হাহাকার তাঁহার চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠিল। পাঠককে অশ্রুসজল করিল। এই স্নেহময়ী, দুর্ভাগিনী, আত্মত্যাগিনী কৌশল্যার চরিত্রে ভারতীয় নারীজীবনে প্রতি-ফলিত। ভারতবর্ষের বহু নারী পতি-প্রেম বঞ্চিতা, পুত্রস্নেহকাতরা। নানারূপ ত্যাগের দ্বারা, স্নেহের দ্বারা বুকে পুঞ্জিত অভিমান রাখিয়য়াও তাঁহারা সংসারকে করুণার মূর্তিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ভারতীয় নারীর চরিত্রে কৌশল্যার জীবনের এই আদর্শের প্রতি-ফলন দেখিয়া ভারতবাসী ধন্য।

চরিত-কথা

(একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)

[৫৪] "বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।" ("ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" পৃঃ ৩)

অণুবীক্ষণ নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে। যাহা দ্বারা অণুকেও অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম বস্তুকেও বৃহৎরূপে পর্যবেক্ষণ করা যায়। নিঃসন্দেহে অণুবীক্ষণ বিজ্ঞান জগতে এক শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

যদিও বৃহৎ জিনিসকে ছোট করিয়া দেখিবার জন্য কোনরূপ যন্ত্রের অস্তিত্ব আমাদের অজ্ঞাত। তথাপি অতি বৃহতের নিকট সামান্য বৃহৎ আমাদের নিকট ক্ষুদ্ররূপেই প্রতীয়মান হয়। পিপীলিকা মানুষ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। মানুষকে তাহার তুলনায় আমরা বৃহৎ-রূপেই দেখি। কিন্তু রূপকথার জগতে যে সব বৃহৎ দৈত্য বা দানবের কথা আমরা

পড়িয়াছি, কল্পদৃষ্টিতে তাহাদের যখন দেখিতে পাই তখন তাহাদের তুলনায় আবার মানুষকে নিতান্তই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। অতি বৃহতের সহিত তুলনা করিলে সামান্য বৃহতের ক্ষুদ্রত্ব বুঝিতে পারি।

বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিতে কঠোরের সঙ্গে কোমলের সংমিশ্রণে এমন মাহাত্ম্য দেখিতে পাই, মানবোচিত শ্রেষ্ঠ গুণাবলির এমন প্রকাশ দৃষ্ট হয় যে, তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্যের নিকট আর সকল চরিত্রকে অতি ক্ষুদ্র মনে হয়। চন্দ্রালোকের দুগ্ধধবল জ্যোৎস্নার নিকট গৃহকোণের মাটির প্রদীপকে যেরূপ নিষ্প্রভ দেখায়, বিদ্যাসাগরের চরিত্র মাহাত্ম্য তেমন করিয়া অন্যান্য সকল চরিত্রকে প্রভাহীন করিয়া রাখিয়াছে। পৌরুষ চেতনায় প্রবুদ্ধ জীবধর্মের সঙ্গে মিলিত অশ্রু-সজল কোমলতা তথা স্পর্শকাতর হৃদয় বিদ্যাসাগরকে অনন্য করিয়া রাখিয়াছে। বিধিব নিষ্ঠুর বিধানের বিরুদ্ধে তাঁহার আজীবন বজ্রকঠোর সংগ্রাম মেরুদণ্ডের দৃঢ়তার পরিচয়ই বহন করে। পুনরায় জগতভরা দুঃখের অশ্রুর সহিত তাঁহার অশ্রুর মিলন মানবতার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য দান করে। কঠিন-কোমল বিদ্যাসাগরের এই অদৃষ্টপূর্ব চরিত্রমাহাত্ম্যকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে! বিদ্যাসাগর অনন্য। চন্দ্রালোকের ন্যায় তাঁহার জ্যোতি প্রদীপালোককে নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছে।

[৫৫] "নীর বর্জন করিয়া ক্ষীরগ্রহণের ক্ষমতা একা রাজহাংসেরই আছে। বঙ্কিমচন্দ্ররূপী রাজহংস পাশ্চাত্ত্য নীর হইতে যে পরিমাণ ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, আমাদের মত দাঁড়কাকের দ্বারা তৎটাব সম্ভাবনা নাই।" ("বঙ্কিমচন্দ্র" পৃঃ ৬৬)

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদিগকে যথেষ্ট আলোকিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদিগকে আধুনিকতার মন্ত্র গ্রহণে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় বা সংস্কৃতিতে একদিকে যেমন আলোর দীপ্তি আছে, অপরদিকে আবার তমসার কালিমাও বর্তমান। কোন জাতির সভ্যতাকে অন্ধের মতো অনুকরণ করিয়া জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ বা উন্নয়ন সম্ভব নয়। দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিলেও দাঁড়কাকই থাকিবে। ইহাতে দাঁড়কাকের সৌন্দর্যবৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্যে যতটুকু মহৎ অংশ আছে, যাহা আমাদের জাতীয় জীবনের উপযোগী, কেবলমাত্র ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত। শুধু অন্ধের মতো অনুকরণ করিলে আমাদেরও ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের ন্যায়ই দুর্দশা হইবে। আবার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে কোন জাতি যদি গোঁড়া মনোভাব লইয়া সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কূপমণ্ডূকের ন্যায় অবস্থিতি করে, তাহা হইলেও জাতীয় সংস্কৃতি বা সভ্যতার উন্নয়ন সম্ভব নয়। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'—এই নীতি গ্রহণ করিলেই জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তৃতি, বিকাশ ও উন্নয়ন সম্ভব। অর্থাৎ অপর সভ্যতার ভালো ভালো উপকরণগুলিকে স্বীকৃত করিতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি আমাদিগকে মোহাবিষ্ট করিয়াছিল। তাই ভালোমন্দ বিচার করিবার অবকাশ আমরা পাই নাই। সেইজন্য অন্ধের মতো অনুকরণ প্রবৃত্তিতে আমরা সেদিন উন্মাদ হইয়াছিলাম। এমন সময় জাতীয় জীবনের সৌভাগ্য-সূর্য বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে তিনি একেবারে বর্জন করিলেন না। আশ্চর্য ধীশক্তিসম্পন্ন এই মহামানুষ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা হইতে কেবলমাত্র জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় অংশটুকু বাছিয়া লইলেন এবং আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত তাহার সমীকরণ সাঙ্গ করিলেন। কেন্দ্র-বিচ্যুতি না ঘটাইয়া সভ্যতার পরিধিকে বৃহত্তর করিয়া লইলেন।

পক্ষীকুলে একমাত্র রাজহংসের জলের অন্যান্য মূল্যহীন অংশ ত্যাগ করিয়া সার অংশটুকু গ্রহণের ক্ষমতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ রাজহংসের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুপোযোগী অংশগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সারঅংশগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মোহাবিষ্ট জাতির সাধারণ মানুষদের ছিল দাঁড়কাকের মতো অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি। তাই তাহাদের অনুসৃত পথ জাতীয় জীবনের পক্ষে বিষময় হইতে পারিত। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে এই সংকটকালে আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান দিলেন।

[৫৬] "আলোকেরই নীল, পীত ও হরিৎ এবং উজ্জ্বল ও তীব্র ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণ আছে, কিন্তু অন্ধকার চিরদিনই আঁধার; তাহার অন্য বিশেষণ নাই।"

("অধ্যাপক মক্ষমূলর" পৃঃ ৬২-৬৩)

মানুষ প্রকৃত সত্যের অন্বেষণে যুগ হইতে যুগান্তর জয়যাত্রার দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। হয়তো একদিন সে সার্থকতার দিগন্তেও উপস্থিত হইবে। সত্যানুসন্ধানী এই অভিযাত্রী দল বিজ্ঞানের বিস্তৃত এবং জটিল পথ অতিক্রম করিতেছে। পূর্বে যাহাকে প্রকৃত পথ বলিয়া বুঝা গিয়াছিল, পরে হয়তো দেখা গেল সে পথ প্রকৃত নয়। জ্ঞান-রাজ্যের জটিল বিস্তৃতির মধ্যে অহরহঃই মত এবং মতান্তর ঘটিতেছে। এই জ্ঞানরাজ্য আলোকের সহিত তুল্য। সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মানুষ নিত্য নূতন নানা রঙের-আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান পাইতেছে। সূর্যের আলোতে সপ্ত রঙের বর্ণ বাহার আছে। ইহা যেমন কখনো বা উজ্জ্বল, কখনো বা তীব্র, তেমনি বিজ্ঞান-রাজ্যের মত এবং মতান্তরও যেন ঐ নানা বর্ণের আলো-বৈচিত্র্যের মতো।

কিন্তু বিজ্ঞানরাজ্যে এইরূপ মতান্তর দেখিয়া যাহারা ইহাকে উপহাস করেন, তাঁহারা করুণার পাত্র। বিজ্ঞান মানেই সত্য সন্ধানের আলোকবর্তিকা। আলোর মধ্যে যেমন বর্ণ-বৈচিত্র্য আছে, তেমনি বিজ্ঞানেও মতান্তর আছে। অজ্ঞান মানেই অন্ধকার, অন্ধকারের কোন বর্ণ বৈচিত্র্য নাই। ইহা চির কালিমায় আবৃত। তাই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের রাজত্বে কোন মতান্তরও নাই।

[৫৭] "বড় লোকে ছোট কাজকে অবজ্ঞা করেন না ; তাঁহাদের যত্নে ছোট বীজ হইতে বড় গাছ উৎপাদিত হয়।" ("অধ্যাপক মক্ষমূলর" পৃঃ ৬৯)

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে—'ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো' অর্থাৎ ছোট কাজের জন্য অখ্যাত, অবজ্ঞাত মানুষকে নিযুক্ত কর। বড় বড় কাজ যাহাতে দশ জনের বিস্তর বাহবা পাওয়া যাইতে পারে তাহার জন্য অনেক মানুষই প্রস্তুত, এমন কি স্বার্থত্যাগেও প্রস্তুত। এই শ্রেণীর মানুষেরা ছোট ছোট কাজকে কর্তব্য বলিয়া মনে না করিয়া নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করেন এবং এইসব কাজ করিলে নিজেদের সম্মানহানি হইবে এইরূপ আশঙ্কাও করেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত মহৎ এবং প্রকৃত ধীসম্পন্ন মানুষ, তিনি কখনই ছোট কাজকে তুচ্ছ মনে করেন না। কারণ তিনি এই জ্ঞানে বোদ্ধা যে, ছোট হইতেই একদিন সুমহৎ বিকশিত হয়। ক্ষুদ্র কলিই একদিন শতদলে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। বীজের মধ্যেই শোনা যায় মহীরূহের অভ্রান্ত পদধ্বনি। একবারেই সার্থকতার পুষ্প পুষ্পিত হইয়া উঠিবে এরূপ আশা করা যায় না। কলি প্রস্ফুটনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। একবারেই মহামহীরূহ জাগিয়া উঠিবে, বীজের নিকট এইরূপ প্রত্যাশা করা বৃথা। বীজকে অংকুরিত করিতে হয় এবং অংকুরণের পর সযত্নে লালন পালন করিতে হয়। মহীরূহের সম্ভাবনা আসে তখনই। পৃথিবী কল্পনাময়, অলৌকিক যাদুজগৎ নয়। প্রত্যেক কার্যের পশ্চাতেই রহিয়াছে কারণ। সৃষ্টি, বিকাশ ও উন্নয়ন পারস্পরিকভাবে ক্রমাগ্রসর হয়। অকস্মাৎ বৃহতের সৃষ্টি হইতে পারে না। ক্ষুদ্রের সাধনায় বৃহতের সিদ্ধি ; তাই প্রকৃত জ্ঞানীপুরুষ ক্ষুদ্র কাজকে কখন তুচ্ছ বলিয়া অবহেলা করেন না।

[৫৮] "এখন কর্মের প্রতি,—সত্যের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন আবশ্যক। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্যম জন্মিবে, এই উদ্যম কালে ফলপ্রসবে সমর্থ হইবে।" ("উমেশচন্দ্র বটব্যাল" পৃঃ ৭৭)

আদর্শ যখন ভারগ্রস্ত হইয়া তাহার গতিকে হারাইয়া ফেলে, তখন সে আদর্শ বর্জনীয়। কোন সময়ে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগরণের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা হইয়াছিলাম পরলোকে বিশ্বাসী একান্তরূপে ধর্ম-নির্ভর জাতি। কিন্তু কালক্রমে দেবতার প্রতি ভক্তি ও স্তুতির আতিশয্য আমাদিগকে ইহলোকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিল। পরলোকের অস্পষ্ট চেতনা জগৎ এবং জীবন হইতে আমাদিগকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

যুগ-প্রয়োজনে একদিন যে আদর্শ আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ হয়তো তাহা বর্জনের সময় আসিয়াছে। জগৎ সম্বন্ধে অতিরিক্ত মোহান্ধতার ফলে আমাদিগকে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। পুনরায় আজ যখন আমরা জাগতিক কর্তব্য-কর্মকে বিস্মৃত হইতে চলিয়াছি, তখন ইহলৌকিক চেতনা জাগৃতির প্রয়োজন উপস্থিত।

জগতকে বিস্মৃত হইয়া আমরা উদ্যমহীন জড়বস্তুর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। আজ আমাদের পুনরায় কর্ম তথা সত্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতে হইবে। গীতায় ভগবান কথিত কর্মবাদকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কর্মের প্রতি আকাঙ্ক্ষাই জাতিকে উদ্যমপূর্ণ করিয়া তুলিবে। উদ্যম ভিন্ন কাহারও মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব এই কর্মপ্রচেষ্টা, এই উদ্যম একদিন জাতিকে সমুন্নত করিতেই সক্ষম হইবে।

সীতার বনবাস

(একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)

[৫৯] "লোকরঞ্জন কি দুরূহ ব্রত"। (পৃঃ ৩০)

মানব চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। মানুষের প্রকৃতিতেও বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। সংস্কৃতে প্রবাদ আছে—"ভিন্ন রুচিহিলোকাঃ' অর্থাৎ দেশ কাল, পাত্রভেদে মানুষের রুচির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিবেই। একের পছন্দ অপরের নিকট পছন্দ নাও হইতে পারে। তাই জগতে মত ও পথ লইয়া এত বিতর্ক এবং সমস্যা দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী এবং পথানুসারী। মানব চরিত্রের এই বৈচিত্র্য মানুষকে কোনদিনই ভিন্ন মতের ও পথের সমন্বয়সাধন করিতে দেয় নাই। এমতাবস্থায় সকল মানুষের মনোরঞ্জন করিয়া চলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ যিনি প্রজাপালক রাজা, তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির প্রজাপুঞ্জের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতেই হইবে। অন্যথায় রাজা প্রজাপুঞ্জের বিদ্বেষের এবং অশ্রদ্ধার কারণ হইবেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির প্রজার বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে গিয়া অনেক সময় রাজাকে অসহনীয় অবস্থায় পতিত হইতে হয় এবং দুঃসাধ্য সাধন করিতে হয়। লোকরঞ্জন তাই নিঃসন্দেহে এক কঠিন পরীক্ষা এবং দুরূহ ব্রত।

[৬০] "অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ! কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্ধক্য সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত।" (উঃ মাঃ ১৯৬৪; পৃঃ ৬৯)

প্রেম বা ভালোবাসার তুল্য বস্তু জগতে আর দ্বিতীয় নাই। অবশ্য যদি সেই প্রেম বা ভালোবাসা যদি অকৃত্রিম হয়। মণি-কাঞ্চন, সম্মান-প্রতিপত্তি সকলই এই অমৃত-রস-নির্ঝরের নিকট নিতান্তই মলিন। জগতে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা মানুষেরই হৃদয় উদ্ভুত ভালোবাসার মধ্যে নিহিত। অর্থের বিনিময়ে বা বর্বরতার বিনিময়ে এই মহামূল্যবান ভালোবাসা বা প্রেম পাওয়া যায় না। প্রেমিক হৃদয় প্রেমিক হৃদয়ে আত্মসমর্পণ করিয়া জগতে অনন্ত স্বর্গ-সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

পার্থিব জগতে নিত্যই পদার্থের নানারূপ রূপান্তর ঘটিতেছে। এই রূপান্তর কখনো বা বাহ্যিক আবার কখনো বা মানসিক। শিশু কিশোর হইতেছে, যুবক হইতেছে বৃদ্ধ; সুখী হইতেছে দুঃখী এবং দুঃখী হইতেছে সুখী; সম্পদশালী হইতেছে বিত্তহীন, আবার

বিত্তহীন হইতেছে বিত্তবান। কিন্তু জাগতিক এত রূপান্তরের মধ্যেও যাহার ক্ষয় নাই, ক্ষতি নাই, যাহার এতটুকু রূপান্তর নাই, যাহা চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন, যাহা অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো চির-অমলিন, তাহা হইতেছে মানুষের হৃদয়জাত অকৃত্রিম প্রেম বা ভালোবাসা। সম্পদেও যে প্রেম, বিপদেও সেই প্রেম। সুখ অথবা দুঃখ যাহাই হউক না কেন, প্রেমসর্বত্র অবিকৃত। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ সকলকে জয় করিয়া প্রেম অবিনাশী। বাহ্যিক অথবা মানসিক অন্যান্য রূপান্তর প্রেমকে কখনো মলিন করিতে পারে না। সুতরাং অকৃত্রিম প্রেম অনন্য।

[৬১] "গভীর জলধি, কখনও, অল্প কারণে আকুলিত হয় না ; সামান্য বায়ুবেগের প্রভাবে, হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না।" (পৃঃ ৪৫)

মহাশক্তি কখনো সামান্য আঘাতে বিচলিত হয় না। যাহা ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন, অতি অল্পতেই তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে। মোমের পুতুল অতি সহজেই গলাইয়া ফেলা যায় ; কিন্তু লোহার দণ্ড গলাইতে হইলে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। আঘাত সামান্যকে অনায়াসে করিতে পারে ; অসামান্যকে জয় করিতে কঠিনতর আয়াসের প্রয়োজন হয়। সামান্য ঝড়েরপ্রবাহ ক্ষুদ্র অচলকে বিচলিত করিতে পারে কিন্তু হিমাচল সদৃশ মহান পর্বতকে বিচলিত করার জন্য বায়ুপ্রবাহের ক্ষিপ্রতা প্রচণ্ড হইতে হইবে।

মানুষের মধ্যেও সামান্য ও অসামান্য বা সাধারণ ও অসাধারণ ভেদাভেদ আছে। সাধারণকে শঙ্কিত করার জন্য যে শক্তি বা আঘাতের প্রয়োজন, অসাধারণকে সে শক্তির আঘাতে কখনই শঙ্কিত করা যাইবে না। সামান্য আঘাত মহামানুষেরা তুচ্ছজ্ঞান করেন। তাঁহাদের বিচলিত অথবা শঙ্কিত করিয়া তুলিবার জন্য আঘাতকে কঠিনতর করিতে হইবে। তাই যদি কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহামানুষকে কখনো বিচলিত হইতে দেখা যায়, তখন বুঝিতে হইবে আঘাত তাঁহার নিকট কঠিনতরভাবে আসিয়াছে। নতুবা তিনি বিচলিত হইতেন না।

[৬২] "সামান্য লোকের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সামান্য ; যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাই বলে এবং যাহা শুনে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে। তাহাদের কথায় আস্থা করিতে গেলে, সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না।" (পৃঃ ৪৬)

প্রকৃতির রীতি অত্যন্ত জটিল। ইহাকে অনুধাবন করিবার জন্য জ্ঞানের গভীরতা প্রয়োজন। সম্যকবুদ্ধি ও বিশ্লেষণীশক্তি, স্পর্শাতুর হৃদয় এবং নিবিড় চিন্তা প্রকৃতিরাজ্য তথা মানবরাজ্যের নিত্য নতুন রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতেছে। জগতে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করিবার জন্য জ্ঞান-চর্চার তাই বিরাম নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যাসত্য অনুধাবন করা অথবা ন্যায় অন্যায় বিচার করা দুঃসাধ্য ব্রত। একমাত্র সুস্থ গভীর চিন্তা

এবং সুনিপুণ বিচারবুদ্ধি তাহা কিয়দংশে স্থির করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞানী, সুস্থ গভীর চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ জগতে বিরল।

জগতের অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত সাধারণ প্রকৃতির। বিচারবুদ্ধি তাহাদের নাই, সুস্থ চিন্তাশক্তি অথবা চিন্তা করিবার মত ধৈর্যও তাহাদের নাই। অধিকাংশ স্থলেই চিন্তা না করিয়া দুরূহ বিষয় সম্পর্কে তাহারা তাহাদের স্ব স্ব মত উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্তু এইসব মত প্রায়ই কোন যুক্তিবহ থাকে না এবং ইহাদের কোনই মূল্য নাই। ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কেও তাহাদের কোন বিবেচনা নাই। সাময়িক আপন খেয়াল হইতেই তাহারা বিচার কার্য সমাধান করিয়া থাকে। অপরের মুখের জাবরকাটা তাহাদের অভ্যাস। চিন্তা বা বিবেচনা না করিয়াই, লোকে যাহা বলে তাহাতেই তাহারা বিশ্বাস করে। তাহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহে তাহারা গা ভাসাইয়া দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের মতামত নিরর্থক। যে মতের পশ্চাতে চিন্তা বা বিবেচনা নাই, বিচারশীল বুদ্ধি বা হৃদয় নাই, তাহাদের কথায় চলা মূর্খতা মাত্র। বিশৃঙ্খল জনতার বা প্রজাপুঞ্জের মতানুসারে চলিতে গেলে পদে পদে সত্য ও আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। নিত্য নব রহস্যের উন্মোচক বুদ্ধিবৃত্তি, বিশ্লেষণী শক্তি, গভীর চিন্তাকে বিসর্জন দিতে হইবে। এক কথায় মানবিক শক্তির অপচয় করিতে হইবে। কোন বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ এইরূপে গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে প্রস্তুত হইবেন না।

[৬৩] "মধ্যে মধ্যে, সকলেরই চিত্ত-বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সকল সময়ে একভাবে থাকে না।" (পৃঃ ৫৪)

মানুষের হৃদয় এক বিচিত্র রাজ্য। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, উদ্বেগ-অশান্তি প্রভৃতি ঐ হৃদয় রাজ্যে সকল সময়ই এক চঞ্চল ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। উহা এক লহমার জন্যও স্থির নয়, সর্বদাই গতিশীল এবং অনন্ত তার গতি। কখনো বা আনন্দ-তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে সে উচ্ছ্বসিত, আবার কখনো বা বেদনা-ক্রন্দনের হাহাকারে সে মুখরিত, কখনো বা আশার রংমশাল স্বপ্নে মশগুল, আবার কখনো বা নিরাশার শূন্যতায় বিধুর। এই উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে মনের সর্বদা চঞ্চল গতি। একটি বিশেষ ভাবনায় ইহা কখনো স্থির নহে। এমনকি যাহারা চিত্তসংযমী তাহাদের হৃদয়েও মাঝে মাঝে আলোড়ন উপস্থিত হয়। স্নেহ-প্রেম, ভালোবাসার নিকট মন সর্বদাই দুর্বল। এই স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা হইতেই মানসিক চিত্ত-বৈকল্য অধিক ঘটিয়া থাকে। চিত্তসংযমী মহাপুরুষও ইহার হাত হইতে নিস্তার পান না।

[৬৪] "সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে; উন্নতি হইলেই পতন হয়; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে; জীবনে হইলেই মরণ হইয়া থাকে।" (পৃঃ ৭১)

লৌকিক জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। জাত সব জীবিত বস্তুর ধ্বংস সুনিশ্চিত।

জাগতিক সকল জীবমাত্রেরই যেমন বিকাশ এবং বিস্তৃতি আছে, তেমনি পরিণতিও রহিয়াছে মৃত্যুতে। শৈশব হইতে কৈশোর, কৈশোর হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ়ত্ব এবং প্রৌঢ়ত্ব হইতে বার্ধক্য, এই সকল ক্রমাগ্রস্থতিই মৃত্যুতে পরিণতি লাভ করে। অবস্থাও চিরকাল কাহারও সমান যায় না। উন্নতি হইলে পতন ঘটিবেই। প্রাকৃতিক এই চক্র-নীতির হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। চিরকাল কেহ পূর্ব দিগন্তের সূর্য-স্নেহ লাভ করিতে পারে না। অস্তাচলের রক্তিম মালিন্য তাহাকে স্পর্শ করিবেই। কাজেই যাহা সাময়িক সুখ, তাহা লইয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার কোন কারণ নাই, তেমনি যে দুঃখ সাময়িক সেই দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়াও মূঢ় মানুষেরই লক্ষণ।

[৬৫] "প্রাকৃত লোকেই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে।" (পৃঃ ৭১)

স্নেহ-ভালোবাসার নিবিড় বন্ধনে সংসারজালে মানুষ বন্দী। প্রিয়জনের বিয়োগজনিত বেদনায় তাহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠে। জীবমাত্রেরই পরিণতি মৃত্যুতে। জীব বিরহাতুর জীবের আর্তিতে তাই বিশ্বচরাচর সর্বদাই মুখরিত। অথচ যেখানে এই সুস্পষ্ট পরিণতির কথা সকলেরই নিকট জ্ঞাত সেখানে সেই পরিণতিতে শোকে মুহ্যমান হওয়া জ্ঞানীজনের লক্ষণ নয়। যাহা সত্য, যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার নিমিত্ত যাহারা দুঃখ প্রকাশ করে অথবা শোকে কাতর হয়, সত্যদৃষ্টি তাহাদের নাই। সত্যদৃষ্টি লাভের জন্য মহাপুরুষ-সুলভ চৈতন্য এবং জ্ঞানচর্চা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের এই সত্যানুসন্ধান প্রবৃত্তি নাই। স্বাভাবিক ভাবেই তাহারা প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় হাহাকার করিয়া উঠে। যাহারা জ্ঞানী, সত্যানুসন্ধানী তাহারা জীবদেহের এই শাশ্বত পরিণতিকে অবশ্যম্ভাবী এবং চিরসত্য বলিয়া জানিয়াছে। তাই তাহারা প্রাকৃত জন-সাধারণের ন্যায় বিরহ বা বিয়োগজনিত শোকে কখনও মুহ্যমান হইয়া পড়ে না।

সংকল্প ও স্বদেশ

(একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)

[৬৬] "থামো, শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসারপথ
তরিয়া
যত মানবের গুরু মহৎ-জনের
চরণচিহ্ন ধরিয়া।" ("ভৈরবী গান" পৃঃ ১৪-১৫)

জীবনের যাত্রাপথ বন্ধুর। উষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত পরিণতি পর্যন্ত জীবনের যে পথ প্রস্তুত, তাহা মসৃণ, সুন্দর পুষ্প-বীথি নহে, বাধা-বিরোধের কণ্টকে

সর্বদাই সমাকীর্ণ। প্রকৃতির নিষ্ঠুর আঘাত প্রতিরোধে মানুষ নিতান্তই শিশু মাত্র। জীবন-যাত্রা পথের এই নির্মম কাঠিন্য অনেকেই সহ্য করিতে পারে না। বাধা-বিঘ্ন, নানাবিধ সমস্যায় মানুষ সর্বদাই প্রপীড়িত, অসহায় এবং দুর্বল। এই দৌর্বল্যে শক্তি সঞ্চার করিতে সক্ষম একমাত্র মানব হৃদয়স্থিত ভাবগত চৈতন্য। প্রতিকূল পরিবেশে ঐশ্বরিক চেতনা মানুষের অন্তরে নূতন শক্তি আনয়ন করে। বাধা বিরোধ ও নানাবিধ সমস্যার সহিত সংগ্রাম করিবার মনোবল তখন সে ফিরিয়া পায়। নিষ্ঠুর সংসারের নির্মম কঠিন জীবন পথে এই ঐশ্বরিক সাহস ও শক্তি একমাত্র ভরসা। একমাত্র এই শক্তি ও সাহসই মানুষকে জীবনে চলার পথে দুর্বার ও দুর্জয় করিয়া তোলে। যুগে যুগে মহাপুরুষেরা এই ঐশ্বরিক চৈতন্যে প্রবুদ্ধ হইয়া সংসারের নিষ্ঠুর মরণকে হাস্যমুখে বরণ করিয়াছেন। বাধা-বিঘ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন অবিচলিত শক্তি ও সাহসের সঙ্গে। দুঃখ ও বেদনাকে ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্যে সদানন্দময় এবং সদাহাস্যমুখর করিয়াছেন। জীবন-রসিক সেই সব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেই জীবনের দুর্গম পথকে সুগম বলিয়া মনে হইবে। ঐশ্বরিক শক্তি দুঃখের দিনে সহ্য করিবার মতো অসাধারণ শক্তি জাগ্রত করিবে। সংসারের বন্ধুর যাত্রাপথকে তখনই মনে হইবে সহজ ও সুগম।

[৬৭] "সদা সহিয়া চলিব প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে।" ("ভৈরবী গান" পৃঃ ১৫)

ধরার ধূলিতে যে প্রাণ আবির্ভূত হইয়াছে যাত্রাপথের নির্মম বন্ধুরতা তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। জীবন সর্বদাই সুখকর নয়। অধিকাংশ সময়ই তাহাকে কঠিন আঘাত এবং নির্মম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু আঘাত এবং দুর্ভাগ্য দেখিয়া সেই পথ হইতে ফিরিয়া আসা চলিবে না। আঘাত এবং দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। হয়তো মধ্যাহ্নে সূর্যের অগ্নি-দহনের নিষ্ঠুর জ্বালা সহ্য করিতে হইবে। হয়তো পায়ে চলার পথের নিষ্করুণ বন্ধুরতার আঘাত প্রতি পদক্ষেপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে। তথাপি জীবন-পথিক সম্মুখ দিগন্ত সন্ধানে অগ্রসর হইবে। কঠিন আঘাত বা দুর্ভাগ্যের উৎপীড়ন তাহাকে জীবনের নিষ্ঠুর সংগ্রাম পরাস্ত করিতে পারিবে না। ইহারই নাম জীবন। জীবন সংগ্রামে যে প্রাণ ব্রতী, সে প্রাণই সার্থক। যদি সে সংগ্রামে জীবন রক্ত-রঞ্জিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং পরিণতিতে যদি মৃত্যু আসে তবে সে মৃত্যুও সুখকর। জীবনে মৃত্যু তো অনিবার্য। সে মৃত্যুকে যদি সংগ্রামের মধ্য দিয়া বীর সৈনিকের মতো বরণ করা যায়, তবে তাহাই সার্থক

জীবন এবং সার্থক মৃত্যু। জীবন সংগ্রামে পশ্চাৎপদ যে ভীত সৈনিক সে বাঁচিয়াও মৃত। অতএব তাহার জীবনে যেমন গৌরব নাই; মৃত্যুতেও তেমন সার্থকতা নাই।

[৬৮] "এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা" ("এবার ফিরাও মোরে" পৃঃ ১৭)

স্বার্থ সংঘাতের চরম প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মানুষে মানুষে ভেদ এবং বিরোধিতা সৃষ্টি হইয়াছে। লোভ ও মোহ মানব অন্তরে দুই ঘৃণ্য প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিদ্বয় মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট করিয়াছে। মানব ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে রক্তপঙ্কিল ও কলঙ্কময় করিয়া তুলিয়াছে। জগতে প্রধানতঃ দুইটি জাতি—ধনী এবং দরিদ্র। বুদ্ধিজীবী ও শক্তিশালীর দল প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করিয়া ধনের তহবিল বৃদ্ধি করিয়াছে। অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান এবং দুর্বল মানুষ হইয়াছে কালক্রমে রিক্ত ও সবহারা। একদিকে বিলাস-উল্লাস-উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য, অপরদিকে দৈন্য, মালিন্য ও রিক্ততার আর্তি। অথচ বিধাতার সৃষ্ট জীবকুলে এই ভেদাভেদ না থাকারই কথা। সকল জীবেরই সমান অধিকার আছে ; কিন্তু একদল লোক অধিক ক্ষমতা ভোগী, অপর দল অধিকারচ্যুত।

যাহারা অধিকারচ্যুত তাহারা তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞান, অচেতন। দুর্যোগের কালবৈশাখীর নিবিড় তমসা তাহাদিগকে দিনের পর দিন জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। অধিকার চেতনা যেমন তাহারা হারাইয়াছে, তেমনি প্রতিবাদের ভাষাও তাহারা ভুলিয়াছে। তাহারা মূক। দেহ হইয়াছে তাহাদের জীর্ণ, কঙ্কালসার। সুদীর্ঘ মন্বন্তর তাহাদের বুকের সমস্ত শক্তিকে হরণ করিয়াছে। প্রতিবাদের ভাষা যেমন তাহাদের নাই তেমনি সংগ্রামী শক্তিও তাহারা হারাইয়াছে। এইসব অজ্ঞান-অচেতন-দুর্বল মানব সমাজকে জ্ঞানের আলোকে উদ্দীপিত করিতে হইবে। মানবিক অধিকার সম্বন্ধে তাহাদের সচেতন করিতে হইবে। দুর্বল হৃদয়ে আশাবরী সংগীত শুনাইতে হইবে এবং শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। মূককণ্ঠে দান করিতে হইবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জ্বালাময়ী ভাষা। ধরাতে সাম্য শান্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

[৬৯] "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট ;" ("এবার ফিরাও মোরে" পৃঃ ১৭-১৮)

স্বার্থ, লোভ প্রণোদিত ভেদাভেদ বুদ্ধির জন্য অনেক ক্ষেত্রেই মানবিক অধিকার লাঞ্ছিত। মানুষ হইয়াও অধিকাংশ মানুষ পশুর সামিল। পূর্ণ মানবিক চেতনা হইতে তাহারা চ্যুত, আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট। অথচ জীবকুলে মানুষ শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ যদি পশুর স্তরে নামিয়া আসিয়া থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের ও বেদনার আর কি আছে?

দুঃখ-দারিদ্র্যের মালিন্য, অজ্ঞানতার অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস আমাদিগকে পাশবিক স্তরে নীত করিয়াছে ও করিতেছে। মানবতার এই দুর্দিনে করুণাময় ঈশ্বরের নিকট আজ প্রার্থনা করার মতো দিন। ক্ষুধাতুরকে অন্ন দেওয়া হোক। রিক্ত নির্জীব জীবনে প্রাণের উল্লাস ফিরাইয়া দেওয়া হোক। অজ্ঞানতার নিবিড় তিমিরে দেওয়া হোক্ সূর্য প্রদীপ্ত জ্ঞান-রশ্মি। অধিকার চেতনাচ্যুত মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা ফিরিয়া আসুক। দেহ পূর্ণ হোক অসীম শক্তিতে। শান্ত-সুশীতল-স্নিগ্ধতায় বাতাস পূর্ণ হোক। নির্জীব-রিক্ত-হাহাকার পূর্ণ—সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা নয়—জীবন উজ্জল আনন্দময় হোক। কোন প্রকার ভীরুতা বা দৌবল্য যেন আমাদিগকে জীবন সংগ্রামে পশ্চাদ্পদ না করিতে পারে। দুর্বল বক্ষ অপূর্ব সাহসে স্ফীত হোক। মানবতার লাঞ্ছনার দিনে ভগবানের নিকট আজ এই পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রার্থনা।

[৭০] "বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।"
("এবার ফিরাও মোরে" পৃঃ ১৯)

ভেদাভেদ বুদ্ধি মনুষ্যত্বের জয়পতাকাকে অবনমিত করিয়াছে। স্বার্থমগ্ন মানুষ মানবিক চৈতন্য বিস্মৃত হইয়াছে। লোভ-মোহ প্রভৃতি প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া সে নীতিভ্রষ্ট হইয়াছে এবং ভাবিতেছে জগতে বাঁচিয়া থাকিবার আনন্দ-উল্লাস ভোগ করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এইক্ষুদ্র স্বার্থের আরও ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ পৃথিবীকে সে পাইয়াছে। স্বার্থ তাহার পৃথিবীকে আপন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করিয়াছে। জগতে আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও সে চেনে না, আর কাহারও সহিত তাহার সদ্ভাব নাই। এইভাবে মানবিক আদর্শ হইতে সে ভ্রষ্ট হইয়া লোভী, হিংস্র জন্তুর মতো জীবন-যাপন করে। মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকা কাহাকে বলে তাহা সে ভুলিয়াছে। প্রেম, সৌভ্রাতৃত্ব, মানব জীবনকে যে কী মহীয়ান ও সুন্দর করিয়া তুলে এ জ্ঞান তাহার লুপ্ত। প্রেমের মধ্যে আছে বৃহৎ পৃথিবী। মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্বের মধ্যে আছে মহৎ জীবন, আছে পূর্ণ মানবিকতা। স্বার্থের সাময়িক উল্লাস, উত্তেজনা অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ ও সৌন্দর্য রহিয়াছে ভালোবাসারূপ অমৃত মধ্যে। ভালোবাসার মধ্য দিয়া এই বৃহৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার নামই প্রকৃত জীবন। অতএব এই পূর্ণ মানবিকতাটুকু ফিরিয়া পাইতে গেলে আমাদিগকে স্বার্থজয়ী সাধনা করিতে হইবে। আপনার সুখের উল্লাস ভুলিতে হইবে, আপনার দুঃখের ক্রন্দন ভুলিতে হইবে। হৃদয়স্থিত গভীর প্রেম দিয়া সকলকে ভালোবাসিতে হইবে। তবেই পৃথিবীর সকল

সুখামৃত কুড়াইয়া পাওয়া যাইবে। মানুষের প্রাণ হইতে পৃথিবীর মানুষের প্রতি যে আস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার ফিরিয়া আসিবে। বিশ্বাস জাগ্রত হইবে যে প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে, সত্য আছে, সফলতা আছে, আছে আলো। এই চেতনায় আজ আমাদের অন্তর্দীপ্ত হইবার সময় উপস্থিত।

[৭১] "বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর।" ("বিদায়" পৃঃ ২৩)

প্রতিটি মানুষের অন্তরে লীলাময় ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন। প্রতিটি মানুষের অন্তর তাই পবিত্র দেব-মন্দির। জাগ্রত-বিগ্রহ সেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর। মানুষের হৃদয় যখন এই সত্য জ্ঞানে দীপ্ত হয়, তখন সে ভেদাভেদ ভুলিয়া যায়। স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া জগতের সকলের সঙ্গে সে তখন এক সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভালোবাসায় সে হয় পূর্ণ, স্নেহরসে স্নিগ্ধ। অন্তরস্থিত ভগবৎ প্রতীতি মানুষকে এই মহান চৈতন্য দান করে। স্নেহ-ভালবাসার দুর্বার আকর্ষণ এবং গতি, জাগতিক অন্য সমস্ত বৈষয়িক বন্ধনকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে। স্বার্থবুদ্ধির চারি দেওয়াল তখন ফাটিয়া হয় চৌচির। বৃহত্তর পৃথিবীর উপর উন্মুক্ত আকাশ বাতাসের আহ্বানে সে তাহার ক্ষুদ্র ঘরের রুদ্ধ দ্বারকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। সকল মানুষকে তখন সে আপন বলিয়া জানে; সকল মানুষের ঘরই তখন তাহার আপন বাসস্থান স্বরূপ হয়।

[৭২] "করো মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।" ("সংকল্প" পৃঃ [illegible])

কর্তব্যসম্পাদন করা মানব জীবনের পরম ধর্ম। উষর, বন্ধুর জীবনপথে এ কর্তব্যসম্পাদন করা সহজসাধ্য নয়। কর্মসাধনার পথে পথে থাকে বাধার [illegible]ল প্রাচীর দণ্ডায়মান। সেই বাধার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কর্মসাধনার পক্ষকে নির[illegible]ণ করিতে হইলে প্রয়োজন কর্মপ্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা সফল হউক অথবা নিষ্ফল হউক ইহা ভিন্ন কর্ম সাধকের উপায়ান্তর নাই। দুর্গম-গিরি আর দুস্তর-মরু লঙ্ঘন করিতে হইলে তাহাকে দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। জয়যাত্রার অভিযান অঙ্গে অঙ্গে

ক্ষতরক্ত তিলক আঁকিবেই। কর্মসাধককে এ রক্ত তিলক সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা ভাববিলাসী তাহাদের পক্ষে এইরূপ কর্ম-সাধনা সম্ভব নয়। ভাবের কুসুমবীথি আর কর্মের কঠিন পথ পরস্পর বিরোধী। ভাববিলাসীর কোমল মন, কর্মসাধকের দুঃসহ দুরূহ ব্রতপালনে সক্ষম হইবে না। সেই কারণে কর্মসাধককে ভাববিলাস বর্জন করিতে হইবে।

কর্মসাধক কবির তাই অন্তর্যামী দেবতার নিকট আকুল প্রার্থনা—তিনি যেন আর তাঁহাকে ভাবের সৌন্দর্যশালার রুদ্ধ কক্ষে আবদ্ধ করিয়া না রাখেন। ধূসর, ঊষর কর্মের মরুপথ ধরিয়া তিনি সার্থকতার উদার দিগন্তে পৌছিতে চান। তাই ভগবান যদি তাঁহাকে এবার কর্মবীর সৈনিকরূপে সজ্জিত করিয়া দেন, তাহা হইলে অঙ্গের সকল শিল্পসুখের অলংকারকেও তিনি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। দুঃসহ আঘাতের ক্ষত রক্তচিহ্ন হউক তাঁহার অঙ্গের অলংকার স্বরূপ। কবি জানেন, এই প্রচেষ্টায় তিনি সফলও হইতে পাবেন, আবার নিষ্ফলও হইতে পারেন। কিন্তু কর্মজীবনের আকুল আহ্বান তিনি শুনিয়াছেন, কারুশালার ভাবের সুন্দর বন্দী মন, বাতায়ন দিয়া কর্মজীবনের উন্মুক্ত পথ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। তাই কবি সেই পথের পথিক হইতে চাহেন। অন্তর্যামীর নিকট তাই তাঁহার প্রার্থনা—তিনি যেন তাঁহাকে কর্ম করিবার মতো স্বাধীন সত্তা এবং সক্ষমতা প্রদান করেন।

[৭৩] "অপমানে নতশির ভয়ে-ভীত জন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন।" ("সংকল্প" পৃঃ ৩৫)

প্রত্যেক মানুষের আত্মায় পরম পবিত্র ভগবানের অধিষ্ঠান। তাই প্রতিটি মানবদেহ পবিত্র। মানবাত্মায় এই পরমপুরুষের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রতীতি যাহার নাই, সে প্রতি পদে পদে আপনার সহিত সেই পরমপুরুষকে অপমানিত করিয়া থাকে। আত্মাস্থিত পরমপুরুষের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া সে মিথ্যার অন্ধজালে বন্দী হয়। শক্তিস্বরূপ ভগবানকে অস্বীকার করিয়া সে হয় দুর্বল। স্বভাবতঃই দুর্বল প্রাণ প্রতি পদে মিথ্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ভগবৎ প্রদত্ত কর্তব্যভার হইতে দূর বিচ্যুত হয়। এইভাবে সমগ্র হৃদয় তাহার মিথ্যার পঙ্কিলতায় ভরিয়া যায়। যে সিংহাসনে পরম পবিত্র ভগবানের অধিষ্ঠান, সেই পবিত্র সিংহাসন মিথ্যার আশ্রয়ে অপবিত্র হইয়া যায়। মিথ্যার আশ্রয় লইয়া জগতে সে হয় অনাদৃত। সর্বদাই সে শঙ্কাগ্রস্ত এবং নতশির থাকে। মিথ্যার দাস সেই দুর্বল পুরুষ এইভাবে তাহার আপন পুরুষত্বকে হারায়। জীবনকে কলুষিত করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে অপমানিত করে এবং আত্মাস্থিত ভগবানকেও সে অপবিত্র ও অসম্মানিত করে।

[৭৪] "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।" ("সংকল্প" পৃঃ ৩৬)

মানুষের অন্তরে স্বয়ং ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন। অন্তরস্থিত এই ভগবানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সকলের কর্তব্য সর্বদা অন্যায় বর্জন করা। ভগবানের ইচ্ছা যে, তাঁহার সৃষ্ট এই বিশ্বসংসারের সর্বত্র ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রতিটি মানুষ অন্যায় এবং মিথ্যাকে বর্জন করুক, সত্যের প্রতি হউক সকলের অনুসন্ধিৎসা। এইজন্য তিনি সকলের মধ্যে ন্যায়দণ্ডরূপ বিবেক-চেতনা জাগ্রত রাখিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় অন্যায় করা যেমন অমার্জনীয় অপরাধ, অন্যায় সহ্য বা স্বীকার করাও তেমনি অপরাধ। যে রাজ্যের স্রষ্টার বিধান সর্বদা অন্যায়কে বর্জন করিয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সে রাজ্যে অন্যায় নিশ্চয়ই অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু কেবলমাত্র নিজে অন্যায় না করিলেই কর্তব্য পূর্ণরূপে সাঙ্গ হইবে না। অন্যায়কারীকেও বাধা দিতে হইবে। সৎ এবং বিবেকবুদ্ধি দিয়া অন্যায়কে প্রচণ্ড আঘাত করিতে হইবে। ন্যায়শক্তির নিকট অন্যায়কে সমূলে পরাজিত করিতে হইবে। কবি তাই অন্তর্যামী দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেমন অন্যায়কারীকে শাস্তি দিবেন, তেমনি যে অন্যায়কে সহ্য করে তাহাকেও শাস্তি দিবেন। কারণ দুইজনেই সমান অপরাধী। একজন বিধির বিধান অস্বীকার করিতেছে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া, আর একজন সব জানিয়াও ভগবানকে অপবিত্র করিতেছে অন্যায়কে আশ্রয় দিয়া। অতএব ভগবৎ বিচারে এই দুইজনকেই সমান কঠিন আঘাতে সমুচিত শিক্ষা-দেওয়া হউক।

[৭৫] "সর্বকর্মে তব শক্তি এই জেনে সার
করিব সকল কর্মে তোমারে প্রচার।" ("সংকল্প" পৃঃ ৩৭)

মানুষের সকল কর্ম, সকল চিন্তা-ভাবনা এবং কল্পনার মধ্য দিয়া লীলাময় ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করেন। তাই মানুষের অন্তরে সর্বদাই এই পরম-পুরুষের অধিষ্ঠান। এই জ্ঞানে যিনি বোদ্ধা, তিনি সর্বদাই অন্তরস্থিত সেই পরমপুরুষের পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। যেহেতু সকল কর্মের মধ্য দিয়া ভগবানের আত্মপ্রকাশ, সেহেতু তাঁহার কর্মও সর্বদা ন্যায়পথে পরিচালিত হয়। তিনি জানেন, কোনরূপ মিথ্যা বা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ, ভগবৎ প্রকাশকে অমর্যাদা করা; মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়া কেবলমাত্র ভগবৎ শক্তির অপচয় করা হয়। জীবনের সকল দিক হইতে সকল প্রকার অন্যায়, মিথ্যা, দ্বেষ ও অমঙ্গলকে বর্জন করিয়া সর্বদা ন্যায় এবং সত্যকে প্রকাশ করিতে হইবে। সকল কর্মের মধ্য দিয়া স্রষ্টার চিরসুন্দর রূপকে প্রকাশ করিতে হইবে। মিথ্যা আর অন্যায়ে সৌন্দর্য নাই। সকল কর্মে সত্য-সুন্দরের পরিচয় প্রকাশ করিয়া স্রষ্টার এই সৃষ্টি সম্বন্ধে সকলের

মনে প্রতীতি জন্মাইতে হইবে। সত্য কর্মসাধনার মধ্য দিয়া সকল কর্মের সার সেই ভগবানকে প্রকাশ করিতে হইবে।

[৭৬] "তাঁরি হস্তস্পর্শরূপে করি অনুভব
মস্তকে তুলিয়া লই দুঃখের গৌরব।" ("সংকল্প" পৃঃ ৪২)

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, উত্থান-পতন সকলই পরমেশ্বরের দান। সুতরাং সকলকেই সাদরে গ্রহণ করা উচিত। লীলাময় ভগবান বহুরূপে ভক্তের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন। সুখের মধ্য দিয়া যেমন তাঁহার প্রকাশ, দুঃখের মধ্য দিয়াও তাঁহারই প্রকাশ। সুতরাং দুঃখকে যখন পরমেশ্বরের প্রকাশ রূপে বুঝা যাইবে, তখনই দুঃখ অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। দুঃখের সমস্ত বেদনা তখন এক আশ্চর্য আনন্দ-রসে রসান্বিত হইয়া উঠিবে। দুঃখকে তখনই মনে হইবে অলংকার ও অহংকার স্বরূপ এবং দুঃখ হইবে মাথার মুকুট। পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই চেতনা জাগ্রত না হইলে দুঃখ হয় অসহনীয়। তখন জীবনের সকল আকর্ষণ লুপ্ত হয়। কিন্তু এই দুঃখকেই যখন পরমেশ্বর প্রদত্ত বলিয়া জানা যায়, তখন তাহা দুঃখ না হইয়া গর্বের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। অতএব সর্বপ্রকার সুখ এবং দুঃখের মধ্য দিয়াই পরম সৌন্দর্যময় ভগবানের প্রকাশ।

[৭৭] "রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে
আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে।" (সংকল্প" পৃঃ ৪৬)

মানুষ তাহার সকল কর্মসাধনার মধ্য দিয়া সর্বদাই ভগবানকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই কর্মসাধনার জন্য প্রয়োজন অসাধারণ শক্তি ও অপরিসীম ধৈর্য। এই শক্তি এবং ধৈর্য সর্বদা সমভাবে না থাকিয়া মাঝে মাঝে দুর্বলতা এবং অবসাদ আসিয়া কর্মশক্তি প্রবাহের গতিকে ক্ষীণ করিয়া দিতে পারে। তখন সকল কর্মসাধনার মধ্য দিয়া যে ভগবৎ পূজার প্রয়াস, সেই পূজার উৎসবও তাহার ঐশ্বর্য দীপ্তি হারাইয়া ফেলে। সে উৎসবের উপকরণ তখন হয় দরিদ্র। ভক্ত কবি তাই অন্তর্যামী দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি যেন সেই দুর্বল এবং অবসাদের ক্ষেত্রে তাহাকে দিয়া আর কাজ না করান। কবি চাহেন না অবসাদজনিত দৌর্বল্যে ভগবৎ পূজার মহান উৎসব দরিদ্ররূপে প্রকাশিত হয়। ঐ অবসাদক্ষণে কবির তাই প্রার্থনা, রাত্রি নামিয়া আসুক। মেঘ-বেষ্টিত দিবসসূর্যের ম্লান ছায়া অপেক্ষা সেই সময়ে রাত্রির ঘনকালো যবনিকা উত্তোলিত হউক। অবসাদ ও দৌর্বল্য কাটাইবার জন্য কবি সেই নিশীথের তিমিরে তপস্যা করেন। আবার তিনি পূর্ণ শক্তিতে জাগ্রত হইবেন নবীন ভোরে। ভগবৎ পূজার উপচার উপকরণে ঐশ্বর্যের দীপ্তি আনিতে চেষ্টিত হইবেন। তামস-তপস্যার অবসানে প্রাচীন দিনান্তে নবীন সূর্য উদিত হইবে। অবসাদগ্রস্ত জীবনের কালরাত্রি অবসিত হইলে কবি পুনরায়

নব কর্ম উদ্দীপনা ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু এই অবসাদ ও দৌর্বল্য লইয়া তিনি এখন আর ভগবৎ আরাধনার তথা কর্ম সাধনার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে চাহেন না।

[৭৮] "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি ক'রে, মানুষ করো নি।" ("বঙ্গমাতা"—পৃঃ ৬১)

মধুর দৃশ্যাবলী শোভিত বাঙলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে মনোহর। নদীমাতৃক বাঙলার সমতল প্রান্তর সহজ কর্ষণের উপযোগী। জননী বঙ্গভূমি যেন সৌন্দর্যের এবং ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার সকলের জন্য অঢেল উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সহজেই যে জীবনধারণ উপযোগী অভাব মিটাইতে পারে এবং অফুরন্ত সৌন্দর্যের আনন্দ নিকেতনে যাহার বাস, সে ব্যক্তি স্বভাবতই বিলাসী, আরাম প্রিয় এবং অলস প্রকৃতির হইয়া থাকে। বঙ্গজননীর এই করুণাস্বরূপিনী মূর্তি ও তাঁহার বঙ্গসন্তানদের প্রচুর সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যের স্নেহাঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়া আরাম প্রিয় এবং বিলাসী করিয়া রাখিয়াছেন। স্বভাবতই ভাবরাজ্যের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার তাহারা যথেষ্টই সমৃদ্ধ করিয়াছে কিন্তু বহির্জগতের অগ্রগতি হইতে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। বাহ্যিক জীবনের নিষ্ঠুর সংগ্রামের বৈপ্লবিক সৈনিকরূপে তাহারা প্রস্তুত হইতে পারে নাই। করুণাময় প্রাকৃতিক পরিবেশে শান্ত-সুন্দর তাহাদের জীবনযাত্রা। বাঙলা দেশের সংকীর্ণ অবরুদ্ধ ঐশ্বর্যের এবং সৌন্দর্যশালার কক্ষে তাঁহারা বন্দী। স্নেহময়ী জননীর অন্ধ ভালবাসা তাহাদিগকে নিতান্তরূপেই বাঙালী করিয়া রাখিয়াছে—বিশ্বমানবের সহিত একান্তরূপে একাত্ম হইবার অবকাশ দেয় নাই। ফলে মানব জীবনযাত্রার মহামিছিলে তাহারা অনুসারক হইতে পারে নাই। অর্থাৎ প্রাণ-শক্তির অফুরন্ত গতিবেগ ও চাঞ্চল্য লইয়া জীবনপথে উদ্দাম এবং দুর্বার হইয়া উঠিতে পারে নাই। নিতান্তই সুবোধ শিশুর মতো 'মৎস্য ধরিব খাইব সুখে' ভাবিয়া মন্থর গতিতে একঘেয়ে জীবনযাত্রা যাপন করিতেছে।

[৭৯] "যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।" (দুই উপমা—পৃঃ ৬[illegible])

স্রোতই নদীর গতি, স্রোতই নদীর প্রাণ। উৎস হইতে উদ্দাম এবং দুর্বার স্রোতরাশি নদীকে সাগর অভিমুখে লইয়া চলে। সেই উদ্দাম এবং দুর্বার স্রোতশক্তির সম্মুখে যাহা কিছু বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, সে তাহাকে আপন গতিবেগের প্রচণ্ড সংঘাতে তখন খড়কুটার মতো ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাহার প্রাণচঞ্চল গতির নিকট সমস্ত বাধা পরাভূত হয়। কেহই তাহার অফুরন্ত গতিবেগকে রুদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু এই নদী যখন তাহার প্রাণস্বরূপ স্রোতশক্তি হারাইয়া ফেলে, তখন বিভিন্ন বাধার নিকট সে

পরাভূত হয়। তখন তুচ্ছ শৈবাল আসিয়া অতি সহজেই তাহার স্বাভাবিক গতিপথকে অবরুদ্ধ করিয়া দেয়। তখন নদী হয় নিশ্চল। তাহার প্রাণচঞ্চল তরঙ্গের কুলুকুলু ধ্বনি তখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তখন আপন ধারার শক্তি হারাইয়া দুর্বল শক্তির নিকট তাহার মহৎ আকাঙ্ক্ষা পরাভূত হয়।

জাতির জীবনকে নদীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জাতির জীবনধারাও নদীর ধারারই মতো। জাতি যখন তাহার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হয়, তখন সে তাহার স্বাভাবিক গতিশক্তি হারাইয়া ফেলে। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইয়াই জাতির জয়যাত্রার পথে ক্রমপদক্ষেপ। এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিস্মৃত হইলে, স্বভাবতই জাতি তাহার আপন স্রোতশক্তি তথা গতিবেগ হারাইয়া ফেলে। তখনই নানাবিধ লৌকিক কুসংস্কার শৈবালেরই মতো জাতির জীবনশক্তিকে নষ্ট করিয়া তাহার আপন সহজ স্বাভাবিক চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে। স্রোতহারা নদীর দুর্দশার মতো জাতির জীবনেও দেখা দেয়। যে জীবনে গতি নাই, প্রাণচাঞ্চল্য নাই, উদ্দাম-উন্মাদ অগ্রগতি নাই, যে জীবন অচল-অসাড় সে জীবন অর্থহীন। জীবন শব্দের অর্থই অগ্রগতি, প্রগতি। গতিহারা জীবন তথা জাতীয় জীবন কুসংস্কারের কূপমণ্ডূকতায় বন্দী হইয়া নিকৃষ্ট অবস্থায় কালযাপন করে। যেমন স্রোতহারা নদীর শৈবালকে বাধা দিবার ক্ষমতা থাকে না, তেমনি জীবনহারা ঐতিহ্য বিস্মৃত জাতিরও জীর্ণ লোকাচারকে বাধা দিবার ক্ষমতা থাকে না।

[৮০] “এক দিকে অসি আর অজ্ঞতা অটল,
অন্য দিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল।” (“অভিমান”—পৃঃ ৬৩)

অসি ও মসী লইয়া অত্যন্ত সুবিদিত বিতর্ক বর্তমান। কেহ বলিয়াছেন অসি বড়, আবার কেহ বলিয়াছেন মসীরই জয়। কিন্তু এই সকল বিতর্কের উর্ধ্বে যে কথাটি সত্য, তাহা হইতেছে এই যে কেবলমাত্র মসীর উন্মাদ আস্ফালনে অসির হিংস্র আক্রমণকে রোধ করা যায় না। অসিধারী মানুষের অন্তরে হিংসা রিপুর বাস। লেখনীর কাতর নিবেদন অথবা বৈপ্লবিক নিনাদ, সকল কিছুকেই সে নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কাগজের পাতায় কালো হরফ তাহাদের ইস্পাত নির্মিত শাণিত ফলককে প্রতিহত করিতে পারে না। অসিকে প্রতিহত করিবার জন্য অসির মতোই শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে। সে শক্তি মসীর নাই। তাহার সকল আবেদন অবশেষে সে দেখিতে পায় ক্ষুরধার অসির নিদারুণ অবজ্ঞা এবং পুনরাক্রমণ। তখন মসীর অশ্রুজল ফেলা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না।

[৮১] “আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছে সংকীর্ণ—রুদ্ধ দ্বার-বাতায়ন
তারা আজি কাঁদিতেছে। আসিয়াছে নিশা—
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা।” (স্বদেশ” [illegible], পৃঃ[illegible])

স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে ক্ষুদ্রতার রুদ্ধগৃহে আবদ্ধ করে। ক্রমে জগতে আপন ভিন্ন আর কাহাকেও সে চেনে না, ভালোবাসে না। তাহার সকল কর্ম, সকল চিন্তা, কল্পনা তখন আপন ক্ষুদ্রতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। বস্তু-জগতের লোভ-মোহ প্রভৃতি তাহাকে হৃদয়-জগতের মহাপ্রসারিত ক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া ফেলে। স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মানবিক চৈতন্যগুলি তখন তাহার হয় লুপ্ত। হৃদয় রাজ্যের মহাপৃথিবী হইতে মহা-পৃথিবীর বিশাল জনতার প্রেমিক হৃদয় হইতে তখন সে আপনার সৃষ্ট ক্ষুদ্র পৃথিবীর অন্ধ কক্ষে আবদ্ধ হয়। সেই স্বার্থবুদ্ধি সৃষ্ট ক্ষুদ্র কক্ষের বাতায়ন রুদ্ধ। অতএব বৃহৎ পৃথিবীর প্রেমের আভাস, আলো হাওয়ার সুকোমল সুস্নিগ্ধ স্পর্শ সেখানে পৌছাইতে পারে না। এই অবস্থায় এক সময় তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে। আপনার সৃষ্ট ক্ষুদ্র অন্ধ পৃথিবীতে তখন সে বুঝিতে পারে মানব মহামিছিল হইতে সে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। আপনার মধ্যেই তাহার সমস্ত চৈতন্য সীমায়িত হইয়াছে। সকল মানুষের অন্তর হইতে তাহার আসন লুপ্ত হইয়াছে। বিশাল বিশ্বের স্বার্থ সৃষ্ট এক অন্ধ কারাকক্ষে সে হয় বন্দী। তখন তাহার মুমুক্ষু প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মুক্ত জীবনানন্দের সন্ধানে তখন সে হয় জাগ্রত। কিন্তু আপনার সৃষ্ট অন্ধকার মধ্যে তখন সে দিক খুঁজিয়া পায় না। তাহার জ্ঞান সীমা শাস্ত্র পুস্তকের শুষ্ক বুলি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাহার কর্মশক্তি কুসংস্কারের অবরোধে পঙ্গু। তাই সেই জীর্ণ প্রাণের তখন কান্না ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না।

[৮২] "তব সত্য তব গান রুদ্ধ হয়ে বাজে
রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে শুষ্কপত্র-মাঝে" ("স্বদেশ" ৩৫ নং, পৃঃ ৯৩)

সৃষ্ট সকল কিছুর মধ্য দিয়াই ভগবানের বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত। বিশাল শৈল তাঁহার গভীর গম্ভীর মূর্তিস্বরূপ। অনন্ত আকাশ তাঁহার বিরাট বিস্তৃতি স্বরূপ। অতল সমুদ্রে তাঁহার সুগম্ভীর মন্দ্রধ্বনি। তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহার আনন্দ-উচ্ছ্বাস। বাতাস, নদী তাঁহার সুমধুর সংগীত লহরী বহিয়া আনে। পুষ্পে পুষ্পে তাঁহার পবিত্র সৌরভ। প্রকৃতি রাজ্যের সর্বত্র তাঁহার সৌন্দর্যময়, আনন্দপূর্ণ প্রকাশ। মূর্খ মানুষ এত প্রকাশের মধ্যেও সেই সহস্র সুন্দরকে দেখিতে পায় না। জটিল চিন্তা, জটিল তত্ত্বকথার শাস্ত্রকারাগারে সেই মহামুক্ত আনন্দস্বরূপকে তাহারা করিয়াছে বন্দী। সেখানে আনন্দের লেশ-মাত্র নাই, সেখানে সংগীতের রেশমাত্রও শোনা যায় না। সত্যরূপে আনন্দ প্রকৃতিতে প্রকাশিত, যাহার সংগীত-ধ্বনি আকাশে-বাতাসে, আলোকে মুখরিত। সুরের সুরধুনি যাহার পাষাণ-ভাঙ্গিয়া ব্যাকুল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার এই আনন্দ-উচ্ছ্বসিত সুন্দর স্বরূপের বিচিত্র বাণীকে জীর্ণ শাস্ত্রের শুষ্ক কাগজের পাতায় মূর্খ মানুষ বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তত্ত্ব-প্রাচুর্যের জটিল ধাঁধার ফাঁদে মুক্ত আনন্দস্বরূপ ভগবান সেখানে বন্দী। সেখানে না আছে তাঁহার সৌন্দর্যের দ্যুতি, না আছে সংগীতের আনন্দ মুখরিত ধ্বনি

[৮৩] "অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন
স্বপনের সুখে, সুখের ছলনা,
আর নাই তাহে প্রয়োজন।" ("যাত্রা সংগীত" পৃঃ ১০৬)

অতীত বিলাসী মানুষ বর্তমানকে ভুলিয়া যায়। অথচ বর্তমান হইতেই অতীতের সৃষ্টি। বর্তমানের সুযোগ্য ব্যবহার করিলেই মহান অতীত সৃষ্টি হইবে। বর্তমান অপব্যবহারে তাহা ফুরাইলে কালক্রমে ইতিহাসের অন্ধকারার অন্তরালে লুক্কায়িত হইবে। যাহাদের অতীত মহৎ, তাহাদের জাতি নিশ্চয়ই বর্তমানকে হেলায় হারায় নাই। কিন্তু মহৎ অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে জাতি স্মৃতি-স্বপ্ন দেখিতে ব্যস্ত, তাহারা বর্তমানকে হেলায় হারায়। স্বপ্ন ঘুমন্ত মানুষেই দেখে। অতএব সে জাতি সুপ্ত। আবার স্বপ্ন তো কখনো সত্য নহে বা প্রকৃত সুখ নহে। জাগরণে বিভাবরী অবসানে সে দেখিতে পায় নিষ্ঠুর বাস্তবকে, প্রস্তর কঠিন কর্মপথকে। অতএব স্বপ্নের যাহা সুখ তাহা সুখের ছলনা মাত্র। অতএব যে জাতি কর্মসাধক নহে, সে জাতির প্রগতির পথও রুদ্ধ। অতীত স্বপ্নচারী সুপ্ত জাতি কখনও কর্মসাধক হইতে পারে না। সুতরাং জাতিকে জাগ্রত হইতে হইলে স্বপ্নসুখ ভুলিয়া, অতীত স্মৃতি রোমন্থন ত্যাগ করিয়া কর্মসাধক হইতে হইবে। বর্তমানের সহস্র ঝড়-ঝঞ্ঝার নিষ্ঠুর আঘাতকে সহ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

কমলাকান্ত

(একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)

[৮৪] "পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।" ("একা" পৃঃ ৪) [উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৩]

জগতের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভু ভগবান। তিনি আপন স্বরূপকে উপলব্ধি করিবার জন্য এক হইতে বহু হইয়াছেন। আপনার মধ্য দিয়াই আপনাকে উপলব্ধি করা যায় না। আপন মাহাত্ম্যও আপনার মধ্যে অনুভূত হয় না। তাই একমেবদ্বিতীয়ম সৃষ্টিকর্তাকে দুই হইতে হইয়াছে। দর্শক না থাকিলে অভিনেতার নাট্য রসভোগ করিবে কে? রসিক মানুষ না থাকিলে কবির কাব্য সৃষ্টি বৃথা। যে কোন মূর্তিই একে পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। তাহার যুগল সম্মেলন প্রয়োজন। রস সৃষ্টি-কারক ও রস ভোক্তা এই দুইয়েই সৃষ্টির সার্থকতা। পুষ্প সুন্দর, ইহার সৌরভ চতুর্দিকে আমোদিত করে। কিন্তু ঐ সৌন্দর্য দেখিবার জন্য যদি কোন রূপদর্শী না থাকে, ঐ নির্যাস উপলব্ধি করিবার জন্য যদি কেহ না থাকে, তাহা হইলে পুষ্পের সকল সৌন্দর্য, সকল সৌরভ বৃথা। সৃষ্টি আপনাতে আপনি সুন্দর হইলেও দুইয়ের মধ্য দিয়াই তাহার পূর্ণ প্রকাশ। তেমনি মানবহৃদয়ও কেবলমাত্র

আপনার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মানব হৃদয়-গহনে রহিয়াছে প্রেম ও প্রীতিরূপ অমৃত-রস। তাই ইহা কুসুমের ন্যায় সুন্দর। কিন্তু ঐ প্রেম ও প্রীতি যদি অপরকে ভোগ করিতে দেওয়া হয়, তবেই হৃদয়কুসুমের সার্থকতা। একাতে কাহারও সুখ নাই। সকলের জন্য সকলে থাকিলেই প্রকৃত সুখ।

[৮৫] "বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরেনা, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই।" ("একা" পৃঃ ৬)

এ জগৎসংসারে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। পূর্ণের সাথে সাথে যেমন শূন্য বিহার করে, তেমন সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য সমভাবে এ পৃথিবীতে বর্তমান। উহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। জগৎ স্রষ্টার রুচি, ইচ্ছা ও অনুভব উহারই সমর্থন জানায়। মানবসংসারের ক্ষেত্রেও উহার অন্যথা হয় না। সব মানুষই সমানভাবে উন্নত নয়। সব মানুষ একই রুচি, ইচ্ছা, কামনা-বাসনার দ্বারা পরিচালিত নয়। প্রত্যেকের অন্তরে সমান ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার অনুভব নাই। সব মানুষই সমাজের উপকার করে না। তবুও উহাকেই স্বাভাবিক বলিয়া ধরা উচিত। কারণ নানা বৈষম্যের মাঝে এককে উপলব্ধি করাই বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির উপায়। উহাই স্রষ্টার অভিপ্রেত, সৃষ্টি সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের উৎস।

[৮৬] "মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপ আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?" (পৃঃ ৯)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের দশজনের সহিত বাস করিয়া মানুষ আনন্দ পায়। স্নেহ-প্রীতি ও ভালোবাসা মানবমনের অন্তর সম্পদ। উহা কর্মে প্রেরণা, চেতনায় পরিচ্ছন্নতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া দ্বিগুণতর প্রেরণা দান করে। ইহাদের [illegible] অস্বীকার করিয়া শুধুমাত্র খাওয়া-পরা ও বাঁচাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। ইহার ঊর্ধ্বচারী প্রেরণা ও উৎসাহের প্রয়োজন। স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি প্রভৃতি মানববৃত্তি তাহাই দান করে। একাধারে সমাজস্থিতি ও অন্যদিকে সমাজ বৈচিত্র্য-সাধনের উপায়স্বরূপ এই সকল বৃত্তি, এইগুলি সহজাত। ব্যথা-বেদনা-সংশয় [illegible] নৈরাশ্যের দ্বারা পীড়িত মানব-মনে অত্যুজ্জ্বল আশা-উদ্দীপনার সঞ্চারপূর্বক এই অ[illegible] বৃত্তিগুলি সহস্রদল বিকশিত পদ্মের ন্যায় পাপড়ি মেলিয়া ধরে। তাই এইগুলি ছাড়া কোন ভাবেই সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়।

[৮৭] "যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।" ("আমার মন" পৃঃ ২৪)

সামাজিক নিয়মকানুনের মধ্যে বিবাহ অন্যতম। বৈবাহিক সম্বন্ধের মাধ্যমে স্নেহ-প্রীতি-প্রেম প্রভৃতি সূক্ষ্ম কোমলবৃত্তিগুলির স্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দু'টি হৃদয় একই সূত্রে গ্রথিত হয়। ভবিষ্যৎ জীবনধারার নির্মল প্রবাহ নিঃসৃত হইয়া সমাজ চিত্তের সহিত

যোগসেতু রচনা করে। ফলে ব্যক্তি একদিকে যেমন পারিবারিক, অন্যদিকে আবার তেমনি সে সামাজিক। খণ্ড হইতে অখণ্ডের অনুভব আনিয়া দিয়া বিবাহ প্রীতি ও শুভেচ্ছা দান করে। তাই বিবাহের ফলে এক মানুষ বহুর সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। এ কারণেই সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করিবার মতো শিক্ষা বিবাহের মাধ্যমে আয়ত্ত হয়। ব্যক্তিমনের কপাট মুক্ত রাখিয়া, সমাজের আর দশজনের মাঝে নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করাই হইল বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য। যিনি নিজের স্ত্রী-সন্তান-সন্ততিকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিতে পারেন তাহার পক্ষে অন্যের সন্তান-সন্ততিকেও নিজের করিয়া লওয়া সম্ভব। যে সংকীর্ণচেতা, স্বার্থপর ও দুশ্চরিত্র তাহার পক্ষে নিজের স্ত্রী-সন্তান-সন্ততিদের যেরূপ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করা কষ্টসাধ্য, অন্যের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। উহারা চিন্তা ও চেতনার দিক হইতে অসামাজিক। সুতরাং সমাজ উহাদের আশ্রয় দিলেও কিন্তু পূর্ণ স্বীকৃতি দেয় না।

[৮৮] "তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।"

("বসন্তের কোকিল" পৃঃ ২৫)

ঋতুরাজ বসন্ত শ্রেষ্ঠ। ফলে-ফুলে সুশোভিত, নয়ন মনোহররূপে বিমোহিত। এই ঋতুতে মানব মনে এক অবাঙ্ মানসগোচর অনুভূতি জাগে। প্রকৃতি রাজ্যে কত সুন্দর সুন্দর পাখীর কলতানে মুখরিত হইয়া উঠে। ঐ সকল বিভিন্ন বিহঙ্গের মধ্যে কোকিল অন্যতম। তাহার শ্রুতিমধুর স্বর এই ঋতুতেই শোনা যায় অন্য ঋতুতে নয়। কোকিলের মতো মনুষ্য জগতেও এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। এক জনের সুদিনের খবর পাইলে উহারা আসিয়া ভীড় করে। ভুরি ভুরি চাটুবাক্য উচ্চারণ করিয়া ধনীব্যক্তির সাহচর্য পাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ধনীব্যক্তির যেদিন দুর্দিন উপস্থিত হয়, জটিল সমস্যায় যেদিন তিনি ভারাক্রান্ত হন, সেদিন কিন্তু ঐ সকল পদলেহীদের সাক্ষাৎ মেলে না। উহারা স্বার্থপর। তাই স্বার্থ সাধনাটাই উহাদের চরম লক্ষ্য। দুর্দিন নয় সুদিনই তাই তাহাদের কাম্য। ইহাদের কাছে কোকিলের মতো ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না। সমাজ-সংসারে উহারা বসন্তের কোকিল। অন্যের ভাল-মন্দ বিচারের দিকে উহারা লক্ষ্য রাখে না। কেবল নিজের স্বার্থ টুকু মিটিলেই উহারা প্রসন্নচিত্তে বিদায় নেয়। কোকিল যেমন হাড় কাঁপানো শীত, প্রখর কিরণে উত্তপ্ত গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র বসন্তেই প্রকৃতিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর ঢালে। সমাজসংসারের কোকিলরাও সেরূপভাবে সমাজসংসারে চলাফেরা করে। কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি এবং অসুবিধার মাঝে উহারা যাইতে চাহে না।

[৮৯] "টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাকশালে আমাদের মন ভাঙে-গড়ে। টাকাই গাহ্ সম্পদ্।"

("আমার মন" পৃঃ ২৩)

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে লেন-দেনের মাধ্যমস্বরূপ টাকার আবিষ্কার হইয়াছে।

টাকশাল হইতে সদ্য বাহির হইয়া আসিয়া উহা আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। জিনিস-পত্রের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি টাকার মানদণ্ডেই নিরূপিত হয়। টাকার মাধ্যমে সমাজে ধনী-দরিদ্র নিরূপিত হয়। সর্বোপরি টাকা আমাদের সুখ-সুবিধা, ভোগ-কামনা সব কিছুই মিটাইবার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। সে কারণে টাকা ছাড়া আমাদের চলে না। অপর্যাপ্ত সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সাথে সাথে টাকার মাধ্যমে দুঃখ-কষ্ট, সংঘাত-বেদনারও উৎপত্তি হয়। এ কারণে পণ্ডিতজনেরা বলিয়াছেন—'অর্থই অনর্থের মূল'। কমলাকান্তও উহা স্বীকার করেন। পার্থিব জীবনের সুখ-সুবিধাই চরম নহে। পার্থিব জীবনের উর্ধ্বে ন্যায়নীতি প্রসূত এক আধ্যাত্মিক রাজ্য বিরাজমান। অর্থের মরীচিকার পশ্চাতে দৌড়াইলে কোনক্রমে ঐ আধ্যাত্মিক রাজ্যের সন্ধান মিলিবে না। সে কারণে পার্থিব জীবনের সুখ-সুবিধা বিধানের দিকে নজর দিলে উহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে। জগতে থাকিয়া নরকের ন্যায় বিসদৃশ পরিবেশের অস্তিত্ব চেতনায় ধরা পড়িবে। সে কারণেই অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া চলিলে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-সুবিধা বিধানের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক রাজ্যের সন্ধান করা উচিত। সত্য-ন্যায়-মহত্ব প্রভৃতি গুণগুলির প্রকৃত বিকাশ আধ্যাত্মিক রাজ্যে পৌছাইয়া দেয়। সেই রাজ্যের সন্ধান করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। উহার আশ্রয় ব্যতিরেকে অনন্তশান্তি ও অনন্তমাধুর্য পাওয়া যায় না। সে জন্যেই অর্থের সর্বাতিশয়ী গুরুত্ব দিতে নাই।

[৯০] "চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?" ("বিড়াল" পৃঃ ৪৩)

আপাত-বৈষম্যই হইল সমাজ সংসারের বৈচিত্র্য। ন্যায়-অন্যায়, লোভ-ত্যাগ, উদ্দেশ্য-অনুদ্দেশ্য ও সত্য-অসত্য মানবসংসারে বর্তমান। সংখ্যা-গরিষ্ঠের যেখানে আধিপত্য রহিয়াছে, সেখানে মুষ্টিমেয়র কোন প্রকারই মূল্য দেওয়া হয় না। কমলাকান্তের ন্যায় চিন্তাশীলের মতে উহা অনুচিত কার্য। দণ্ডিতের সাথে সাথে দণ্ডদাতারও আত্ম-সমালোচনা করা উচিত। দরিদ্রের পাশাপাশি ধনীকেও আপন আপন ন্যায়-অন্যায় বোধ সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। প্রয়োজনের তাগিদে পশুবৃত্তি প্রসূত চৌর্য পরায়ণতা মানুষ অবলম্বন করে। সমাজে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অসুবিধাই উহার মূল কারণ। তাই চোরকে শাস্তি দিবার সময় শান্ত এবং ধীর চিত্তে সমগ্র ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখা উচিত। ধনীর অর্থসম্পদ বৃদ্ধির মূলে দরিদ্রের অবদান রহিয়াছে। তাই ধনীর দম্ভ প্রকাশ করিবার সময়ও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করা উচিত। দরিদ্রের প্রতি ধনীরও সমান সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। সমাজস্থিতি রক্ষা করিতে হইলে সমাজের অভ্যন্তরে প্রতিটি মানুষ সমান প্রেম-মৈত্রী ও সৌহার্দ্য বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠা বাঞ্ছনীয়। নচেৎ অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। যোগ্য-অযোগ্য পাশাপাশি থাকিলে, অযোগ্যকে যোগ্যতা করিয়া

তুলিলেই যোগ্যতম ব্যক্তির মহত্ব প্রমাণিত হইবে। ইহাই হইল সর্বোৎকৃষ্ট পথ। অন্য কোন উপায় নাই।

[৯১] "একটু বকাবকি লেখালেখি কম কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" ("বাঙালীর মনুষ্যত্ব" পৃঃ ৬১)

মানুষ চিন্তাশীল সচেতন জীব। প্রয়োজনের মানদণ্ডে মানুষ কর্মকেই জীবনক্ষেত্রে গুরুত্বদান করিয়াছে। অলসের ন্যায় চিন্তা এবং কর্তব্য নির্ধারিত করিলে অসাব কর্মই সাধিত হইবে। উহাই যথার্থ পথ নহে। যুক্তি-বুদ্ধির সারবত্তা না থাকিলে কোন কর্মই পরিপূর্ণ হয় না। সমাজের প্রতিটি মানুষেরই এই বিষয়ে সমান সচেতন হইতে হইবে। সাহিত্য স্রষ্টাদের ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য প্রযুক্ত। শুধুমাত্র গালাগালি কিংবা অলস চিন্তার উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। সুস্থ ধীর মনে চিন্তা করিয়া প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। অকারণে সময় কাটানো কিংবা আজে বাজে কথার মালা গাঁথিয়া সার্থক সাহিত্য রচনা অসম্ভব। একারণেই কমলাকান্তের উপদেশ হইল সর্বপ্রকার আলস্য, কুঁড়েমি অথবা স্বার্থসিদ্ধির কথা ভুলিয়া গভীরভাবে সব কিছু চিন্তা করা উচিত। গভীর চিন্তাই সর্বকর্মের সার্থক নিয়ন্তা। তাই কর্মই জীবন, চিন্তাই অবলম্বন। যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার সারবত্তাই হইল প্রকৃত পথ ও সার্থক উপায়।

[৯২] "আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের জন্য কোন মূল্য নাই।" ("আমার মন" পৃঃ ২০)

সম্পদ-ঐশ্বর্য বা যশ হইতে যে সুখ আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা স্থায়ী সুখ নহে। চলমান জগতের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল সুখও লুপ্ত হইয়া যায়। দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদ কামনা করে। তাহার ধারণা সম্পদ প্রাচুর্যের মধ্যেই সুখ লুক্কায়িত। সম্পদশালী ব্যক্তি প্রচুর সম্পদ পাইয়াও প্রকৃত সুখী নহে। আরও সম্পদের লালসা তাহার অস্থায়ী সুখী মনকে ক্রমশই বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ যশ কামনা করে। এই যশোকাঙ্ক্ষা তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলে। অতএব যশেও প্রকৃত সুখ নাই। ইন্দ্রিয় চর্চাতেও স্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হয় না। কারণ ঐ আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি নাই। সকলই "নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।" অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা লোভ করিয়া প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। ত্যাগেই রহিয়াছে স্থায়ী সুখ। অপরের জন্য জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করার মধ্যে যে আত্মসুখ উপলব্ধি হয়, তাহার তুলনা নাই। ইহাতে চাওয়ার তাগিদ নাই, না পাওয়ারও দুঃখ নাই। অতএব শান্ত-নিবিড় সুখোপলব্ধি একমাত্র আত্মবিসর্জনেই পাওয়া যাইতে পারে।

[৯৩] "যে সুন্দর তাকেই ডাকি; যে ভাল তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া

আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি; আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস।" (বসন্তের কোকিল" পৃঃ ২৯)

সুন্দরকেই আমরা আহ্বান করি, অভ্যর্থনা করি। অসুন্দর আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না। অতএব ইহাকে আমরা স্বাগত জানাইতে পারি না। সর্বাগ্রে প্রকৃত সৌন্দর্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যাহা কিছুই আপাতদৃষ্টিতে আমাদের চর্মচক্ষুর নিকট সুন্দররূপে প্রতীয়মান হইল, তাহাই প্রকৃত সুন্দর নহে। যাহা চির পুরাতন অথচ চির নূতন তাহাই প্রকৃত সুন্দর। যাহা যুগ যুগ অতিক্রান্ত হইয়াও অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো অমলিন, তাহাই সুন্দর। জগতের কৃত্রিম বস্তুর মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, কালক্রমে উহা ইতিহাসের কঙ্কাল করোটিতে পরিণত হয়। অতএব ইহাদের সৌন্দর্য প্রকৃত সৌন্দর্য নহে। সুতরাং যাহা শাশ্বত সুন্দর তাহাকে আহ্বান করিতে হইবে। কারণ সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে সেই শাশ্বত সৌন্দর্য। ইহা চির অমলিন, চির নূতন। ইহা বিরাট বিস্ময়। যুগ যুগ ধরিয়া এই রহস্যের উন্মোচনের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এই রহস্যকে জানা যাইতেছে না, ইহাকে প্রকাশ করা যাইতেছে না, ইহা অনির্বচনীয়। ইহার অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের দিন-রাত্রি প্রলুব্ধ করিতেছে। কিন্তু এই সৌন্দর্যের সমাপ্তি দিগন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই সৌন্দর্যের অন্তরালে রহিয়াছে আত্মা। এই আত্মা অবিনাশী এবং আনন্দস্বরূপ। সৃষ্ট সকল বস্তুর অন্তরালেই এই আত্মা অবস্থিত বলিয়া সৃষ্টিমাত্রই সুন্দর। অতএব সকল সৌন্দর্যের মূলে আমরা এই আত্মাকেই আহ্বান করি।

[৯৪] "দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম্—এক কুকুর জাতীয়, আর এক বৃষ জাতীয়।" ("পলিটিক্স্" পৃঃ [illegible])

জগতে সাধারণতঃ বস্তুকে লাভ করিবার জন্য দুইটি পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। একটি [illegible] প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকার, অপরটি মোসাহেবী বৃত্তি অবলম্বন বা আবেদন দ্বারা অধিকার। রাজনীতির উদ্দেশ্যই হইল অলভ্য বস্তুকে লভ্য করা। ইহার জন্য রাজনীতিবিদরা সাধারণতঃ উক্ত দুইটি পথই অবলম্বন করিয়া থাকে। কমলাকান্ত এই দুইটি পথের নামকরণ করিয়াছেন যথাক্রমে 'বৃষ পদ্ধতি' ও 'কুকুর পদ্ধতি'। কুকুর থাকে প্রভুর অনুরক্ত। প্রভুর মোসাহেবী করিয়া, আবেদন নিবেদন করিয়া সে অলভ্য বস্তুকে লভ্য করিতে চেষ্টা করে। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদও কুকুরের ন্যায় তাহাদের রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য চালাইয়া থাকে। বৃষ কিন্তু তাহার সুখের নিমিত্ত আবেদন নিবেদন করে না। তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে আয়ত্ত করিবার জন্য সে বল প্রয়োগ করিয়া থাকে। সে জানিয়াছে যে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদও ঐ বৃষ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে। দাতার দয়ার দানের দিকে তাকাইয়া থাকে না। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাহারা তাহাদের বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। নিঃসন্দেহে এই দুই জাতের পলিটিক্সের মধ্যে বৃষপদ্ধতি

শ্রেষ্ঠ। স্বাধীন শক্তিতে বৃষ অলভ্য বস্তু লাভ করিতে চাহে। সে পরমুখাপেক্ষী নহে। আর কুকুর পরাশ্রিত জীব। পরবশে প্রাপ্যসুখে প্রকৃত কোন সুখ নাই। অতএব দুর্বল রাজনীতি অপেক্ষা সবল রাজনীতি অনেক ভালো।

অনুশীলনী

১। গাথাঞ্জলি

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির ভাব-সম্প্রসারণ কর :

(১) "যদি প্রেমভরা হৃদয়......জয় নাহি করা যায়।" (রাজা ও মন্ত্রী)

(২) "ধন-বন মাঝে জয়......পায় সে মুক্তি ধন।" (শ্রীদাম সখা, পৃঃ ১৭)

(৩) "মানব জীবনে অনিবার্য......তুমি পরম ধর্ম জেনো।" (উর্ব্বিরী)

(৪) "ধর্মের তরে দুঃখ......ধর্মেরই হয় জয়।" (দুর্বাসার পরীক্ষা, পৃঃ ৬৯)

(৫) "একনিষ্ঠ ভাবাবিষ্ট...দিগন্তপ্রসারী।" (অজন্তাগুহায়, পৃঃ ১২৩)

২। গল্পে উপনিষদ

(৬) "সত্যকে প্রকাশ করিতে হইবে......ভারতের গৌরবময় যুগের মহাজনী।" (গুরুগৌতম, পৃঃ ২৯)

(৭) "মর্ত্যলোকের সকলেই.... -মিথ্যা আচরণেই বা লাভ কি ?" (পৃঃ ৪৭)

(৮) "ওঠো ! জাগো ! শ্রেষ্ঠ আচার্যগণকে বরণ করিয়া প্রবুদ্ধ হও।" (পৃঃ ৬৪)

(৯) "বিত্ত ও সম্পত্তি দ্বারা কোন লোকের তৃপ্তি হয় না।" (নচিকেতা)

(১০) "বিদ্যার এমনই মহিমা ! সেখানে ছোট-বড় উচ্চ-নীচ কোনও ভেদ নাই।" (বৈশ্বানরপুরুষ, পৃঃ ১২৫)

৩। কাব্য-মঞ্জুষা

(১১) "হে রজনী, দয়াময়ী......ভিখারী রাঘবে।" (রামের বিলাপ, পৃঃ ৬৩)

(১২) "মাটির-ই যদি বা এহেন মূল্য, মানুষের দাম নাই ?" (চাষার ঘরে)

(১৩) "ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে......পথিকে ধাঁধিতে।" (আত্মবিলাপ)

(১৪) "নমি আমি প্রতিজনে......সমগ্রে প্রকাশ।" (মানব বন্দনা, পৃঃ ৮৮)

(১৫) "সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল......সকল শূন্য করে।" (ছিন্নমুকুল, পৃঃ ১১৮)

(১৬) "নির্জন তটে চেয়ে........হাট করিনে রে ভাই !" (হাটে, পৃঃ ১৩৭)

(১৭) "নৌকা ফেলি' কেন......সেঁউতি 'পরে রেখে।" (বাঙ্গালীর সাধ, পৃঃ ১৪৩)

(১৮) "ঈশ্বরী পাটনী কয়......বাসনা—কও, কও।" (বাঙ্গালীর সাধ, পৃঃ ১৪৩)

(১৯) "যদি কৃপা হলো হেন......থাকে দুধে ভাতে।" (বাঙ্গালীর সাধ, পৃঃ ১৪৪)

(২০) "অন্নপূর্ণা ক'ন নেয়ে......যাবে তাতে দৈন্য-ভয়" (বাঙ্গালীর সাধ, পৃঃ ১৪৫)

(২১) "ললাটে তোমার ভাস্বর টীকা······দেশ-ভক্ত-শির!"
(শাত-ইল আরব, পৃঃ ১৪৯)

(২২) "ইঁটের পরে ইঁটকে গেঁথে······রঙিন চিঠি লুকায়ে।"
(কারায় শরৎ, পৃঃ ১৫৫)

(২৩) "বাইরে আলো, দুষ্ট ছেলে······থাকতে ভাল না বেসে!"
(কারায় শরৎ, পৃঃ ১৫৬)

৪। রাজর্ষি

(২৪) "মহারাজ সেই প্রভাতে......অসীম প্রেমসমুদ্রের পথ দেখিতে পান।" (পৃঃ ২৯)

(২৫) "দুঃখ যে পাপেরই ফল······কাটাইয়া গিয়াছেন।" (পৃঃ ১১৮)

(২৬) রাজা কহিলেন, ধ্রুবকে হারাইয়া সকল বালককেই আমার ধ্রুব বলিয়া বোধ হয়।" (পৃঃ ১৫৭)

৫। রামায়ণী কথা

(২৭) "মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য।" (পৃঃ [illegible])

(২৮) "তুমি গতি হীনের......চক্ষু হীনের চক্ষু—" (পৃঃ ১৪[illegible])

(২৯) "তৎপর অযোধ্যায়······বাল্মীকির লেখনী!" (পৃঃ ২৪)

(৩০) "তোমার ন্যায় এই জগতে···দুঃখে তুমি ব্যথিত হইও না।" (পৃঃ [illegible])

(৩১) "ব্যাঘ্রী যেরূপ স্বীয়······রক্ষা করিতেছিলেন।" (পৃঃ [illegible]৩)

(৩২) "ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিরা অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না।" (পৃঃ [illegible]৭৯)

৬। চরিত-কথা

(৩৩) "যাহার নাম ধর্ম······স্বভাবের নামান্তরই 'স্বাস্থ্য'। (পৃঃ ৪৪)

(৩৪) "বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন।" (পৃঃ ৭)

(৩৫) "ভাগীরথী গঙ্গার······বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।"
(পৃঃ ১৫)

(৩৬) "যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিস বাঙলাদেশে অচল।" (পৃঃ ৩১)

৭। সীতার বনবাস

(৩৭) "শোক ও মনস্তাপ করা……সদ্বিবেচনার কার্য নয়।" (পৃঃ ৬১)

(৩৮) "তথায় যে অসংখ্য……হইতে পারিবে।" (পৃঃ •৪)

৮। কমলাকান্ত

(৩৯) "এদেশে এক জাতি লোকে……বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পরে।" (পৃঃ ১১)

(৪০) "রমণীমণ্ডল এ সংসারের নারিকেল।" (পৃঃ ৯

(৪১) "কমলাকান্ত বলিল, "আমার না তো কার! আমি……বেটা পালিস্ ব'লে তোর বাবার গোরু হলো!" (পৃঃ ১৪)

(৪২) "লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়; রূপ বিকৃত হয়; স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে। কু—উঃ বটে—তুমি গাও।" (পৃঃ ২৭)

৯। সংকল্প ও স্বদেশ

(৪৩) "হে রাজেন্দ্র……মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান।" (পৃঃ ২৬)

(৪৪) "অন্ধ মোহান্ধ …..তোমার।" (পৃঃ ৫৭)

(৪৫) "পতিত ভারতে……আজি নিশীথের চোখে।" (পৃঃ ৬৫)

(৪৬) "রাজা তুমি নহ……তোমার উত্তরীয়।" (পৃঃ ৬৫)

১০। কুরুপাণ্ডব

(৪৭) "ক্ষত্রিয়দের বলই শ্রেষ্ঠ।" (পৃঃ ১৫)

(৪৮) "হে অর্জুন……উত্থান করো।" (পৃঃ ৮৪)

(৪৯) "ক্ষুদ্র মানবীয়……..করিতে হয়।" (পৃঃ ৮৫)

(৫০) "অধর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই।" (পৃঃ ১২৫)

(৫১) "ভুজঙ্গম যেমন পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না।" (পৃঃ ১২৬)

(৫২) "প্রাণরক্ষার্থে মিথ্যা কহিলে পাপস্পর্শ হয় না।" (পৃঃ ১৩০)

(৫৩) "প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেরু পর্বতকে ভগ্ন করিতে পারে না।" (পৃঃ ১৩৫-৩৬)

(৫৪) "বিপৎকালে সকলেই……দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করো।" (পৃঃ ১৪৭)

(৫৫) "স্বয়ং দেবরাজও……সিদ্ধ করিয়া থাকেন।" (পৃঃ ১৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সারসংক্ষেপ

অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু বাদ দিয়া কোন গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের সারাংশ লিখিতে হয়। সারসংক্ষেপ বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া লিখিবার চেষ্টা করা উচিত। ইংরাজীতে এই সারসংক্ষেপ-রীতিকে বলে Precis। একাধিকবার মূল বিষয়টিকে পড়িয়া নিজের ভাষায় সংক্ষেপে উহার সহজ অর্থ লিখিবার চেষ্টা সারসংক্ষেপীকরণ রীতির মাধ্যমে ব্যক্ত। এই কারণে অলংকার প্রাচুর্য কিংবা গুরুভার ভাবের যথাযথতা বজায় রাখিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণতঃ সারসংক্ষেপ করিতে গিয়া সমগ্র বিষয়টির এক চতুর্থাংশ কিংবা এক তৃতীয়াংশ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। কোন জটিল শব্দের অর্থোদ্ধারে অপারগ হইলে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। বার-দুই বিষয়বস্তুটি পাঠ করিলেই মনে সহজ অর্থ জাগিয়া উঠিবে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে অনুশীলনী ব্যতিরেকে সার্থক সারসংক্ষেপীকরণ অসম্ভব। তাই প্রশ্নপত্র কিংবা টেস্ট পেপার ঘাঁটিয়া একাধিকবার অনুশীলন করাই সার্থকতার উপায়।

ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য কতকগুলি সারসংক্ষেপের নমুনা দেওয়া হইল :

গাথাঞ্জলি

"ত্রিরত্ন" (পৃঃ ১-৩, মূল প্রায় ৫৪০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ : পরমবৈষ্ণব শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজধাম বৃন্দাবনে ভগবৎ আরাধনায় ব্যস্ত। এমনি সময়ে এক দাম্ভিক পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বৈষ্ণবদ্বয় বিনয়ের অকৃত্রিম প্রেরণায় তাঁহারা তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া পণ্ডিতকে বিজয়-পত্র লিখিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য শ্রীজীব ইহা মানিয়া লইতে পারিলেন না। ফলে সে দাম্ভিক পণ্ডিতকে তর্ক-যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া বৃন্দাবন হইতে বিতাড়িত করিলেন। যশাকাঙ্ক্ষী তরুণ শ্রীজীবের আচরণ শ্রীরূপ গোস্বামী ক্ষমা করিতে পারিলেন না। শ্রীজীব অনুনয় বিনয় করিয়া গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উহাতে কোন ফলোদয় হইল না। ইহাতে সনাতন রূপের অতি-বিনয়ী অভিমানও যে পরোক্ষতঃ অন্যায় তাহা বুঝাইয়া দিলেন। কিছুদিন বাদে রূপের ক্ষমাহীন চিত্ত দ্রবীভূত হইল। সে নিজেও তাঁহার আত্মদোষ উপলব্ধি করিল। অন্যদিকে, শ্রীজীব আপন অপরাধ লাঘব করিবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শারীরিক দিক হইতে দুর্বল হইয়া পড়িলেন। এমনি সময়ে সনাতনের মধ্যস্থতায় গুরু-শিষ্যের পূর্ণ মিলন হইল।

"রাজা ও মন্ত্রী" (পৃঃ ১৮-২০, মূল প্রায় ৩৯৬ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ বৈশালী রাজ্যের অধিপতি কঙ্ক অপেক্ষা তাহার মন্ত্রী বিজয় দীন-দরিদ্রের অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। রাজা ইহা সহ্য করিতে না পারায় গোপনে চক্রান্ত করিয়া বিজয়কে হত্যা করাইলেন। প্রজাগণ রাজার এরূপ অন্যায়-আচরণ ক্ষমা করিতে পারিল না। রাজা সমগ্র বৈশালী রাজ্যে বিজয়ের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বৈশালী নগরের উদয় নামে এক-ব্যক্তি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজ-সমীপে নীত হইল। রাজা লোভ দেখাইয়া মহামণি দান করিলেন। উদয় তথাপি এই মহামণি লাভের পশ্চাতে বিজয়ের নামমহিমার মাহাত্ম্য বর্তমান রহিয়াছে বলিতে চাহিল। রাজা অবশেষে মৃত্যুঞ্জয়ী বিজয়ের নাম মহিমা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া আত্মশোকের জ্বালায় যন্ত্রণাতুর হইয়া উঠিলেন। (প্রায় ৯২ শব্দ)

"রক্ষক ও ভক্ষক" (পৃঃ ২৫-২৬, মূল প্রায় ২৬২ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ এক রাজা দুরূহ-রোগমুক্ত হইবার আশায় মহাশক্তির কৃপালাভের নিমিত্ত একটি বালককে তাঁহার জনক-জননীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আনিলেন। বিচারক রাজাদেশ পালনের স্বপক্ষে অনুমতি দিল। ঘাতকের শাণিত খড়্গ বালকের উদ্দেশ্যে উদ্যত হইল। ঘাতক, রাজা, বালকের জনক-জননী ও বিচারক জগৎ-সংসারের অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তির বিচারহীন আদেশকে সহজভাবে বরণ করিয়া লইতে চাহিল। তাহারা প্রতিকারহীন অবস্থায় আপন আপন মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত হইল। অবশেষে রাজা স্বকৃত অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করিয়া বালককে মুক্তি দিলেন। আত্মস্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত রাজা স্বীয় অন্যায় উপলব্ধি করিতে পারিলেন। (প্রায় ৮০টি শব্দ)

"সাবিত্রী বাই" (পৃঃ ৫৬-৬২, মূল প্রায় ৭৬৮ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ মারাঠা-নায়ক শিবাজীর সেনানীরা কর্ণাট বিজয়ে উল্লসিত হইল। তাই কোল্হাপুর ফিরিবার পথে তাহারা বেলভাড়ি গড়ে দারুণ লুণ্ঠন চালায়। দুর্গাধিষ্ঠাত্রী রাণী সাবিত্রী বাই প্রজাগণের ধর্ম-মান ও জীবনরক্ষাকল্পে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া শত্রুপক্ষকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলে। মারাঠাপতি শিবাজী নারীর হস্তে তাহার সেনানীদের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া রাণী সাবিত্রী বাইকে সমুচিত শিক্ষা দিবার আদেশ দান করেন। সেনানায়ক দাদাজী সর্বতোভাবে নারীর অবমাননা করেন, সাবিত্রীর দক্ষিণ হস্ত কর্তন করিয়া তাঁহাকে রাজসমীপে আনয়ন করেন। শিবাজীর রাজ্যে নারী হত্যা নিষিদ্ধ থাকায় বন্দিনী সাবিত্রী বাই শৃঙ্খল বদ্ধ অবস্থায় তাহার নিকট আনীত হন। মারাঠাপতি

শিবাজী এই বীরাঙ্গণার চরণতলে পতিত হইয়া স্বকৃত অন্যায়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ মাতার অনুরূপ মর্যাদাদান করিলেন। স্বভাবতই সেনানায়ক দাদাজীও উপযুক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত হইল। (১০৪ শব্দ)

"নারীর শক্তি" (পৃঃ ৩৪-৩৬, মূল শব্দ প্রায় ৩০৪)

সারসংক্ষেপ: প্রতাপগড়ের রাজা রাঠোর সূর্য সিংহ শিরোহী রাজকন্যাকে লাভের নিমিত্ত আগ্রহী। কুল গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়া শিরোহী পতি রাঠোর কুলের যুবরাজকে কন্যাদানে অসম্মত। সূর্য সিংহ ইহাতে অপমান বোধ করিলেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি সেনাপতি শূরসিংহকে শিরোহীগড় ধ্বংস করিতে পাঠাইলেন। শূরসিংহ সাফল্য লাভ করিল। তাহার বীরত্বে শিরোহীগড় লুণ্ঠিত এবং রাঠোরাধিপতি অর্জুন সিংহ বন্দী হইল। চরম ক্রোধে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া সূর্যসিংহ শিরোহী পতির কন্যাদানের ইচ্ছা এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জনা ভিক্ষার প্রস্তাবকে উপেক্ষা করিলেন। শিশু-ক্রোড়ে বহু পুরনারীসহ শিরোহী রাজমহিষী শূরসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। শাশ্বত মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি শান্তি ও সন্ধির প্রার্থনা জানাইলেন। রাঠোর সেনাপতি বৈরীভাব দূর করিয়া উভয় রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক মিলনে রাজী হইলেন। এবং পরদিন প্রভাতে সৈন্য-বাহিনীসহ তিনি শিরোহীগড় ত্যাগ করিলেন। নারীচিত্তের করুণ-কোমল অনুরোধে দ্রবীভূত হইবার জন্য প্রতাপগড়ের বিচার সভায় বীরশ্রেষ্ঠ শূর সিংহের মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। চরম শান্তি গ্রহণাভিলাষে দ্বিধাহীনচিত্তে শূরসিংহ দণ্ডায়মান। এমনি সময়ে সহসা সেনাপতির প্রাণ ভিক্ষার দাবি লইয়া শিরোহী রাজমহিষী সেখানে উপস্থিত হইলেন। শূরসিংহ বিচারে অব্যাহতি পাইলেন। এরূপভাবে আপন যোগ্য মর্যাদা নারী স্বীয় কৃতিত্ব এবং দক্ষতাবলে রক্ষা করিলেন। (১৫৬ শব্দ)

"অম্বরীষের যজ্ঞ" (পৃঃ ৫-১২, মূল শব্দ প্রায় ৬৮৫)

সারসংক্ষেপ: দ্বাদশবৎসর-ব্যাপী একাদিক্রমে বৃষ্টিপাত না হইবার দরুণ কোশল রাজ্য শুষ্ক পাণ্ডুররূপ ধারণ করিল। ঋষি ভরদ্বাজ মুনির উপদেশে প্রজাবৎসল কোশলাধিপতি অম্বরীষ মরুত্ত যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। আপন পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়া স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র যজ্ঞের পশু অপহরণ করিলেন। অসমাপ্ত যজ্ঞ সমাধা করিতে হইলে এরূপ অবস্থায় একটি ব্রাহ্মণ বালকের প্রয়োজন যে, পশুরূপে কল্পিত হইলে অসমাপ্ত যজ্ঞ সার্থক হইবে। সমষ্টি স্বার্থে আত্মদানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঋচীক মুনির মধ্যম পুত্র শুনঃসেফ জনকজননীর আশীর্বাদ গ্রহণান্তর আত্মদানে কৃতসংকল্প হইল। মাতুল বিশ্বামিত্রের উপদেশে বালক শুনঃশেফ যজ্ঞযুপের নিকট খড়্গোত্তোলিত হইলে দুইটি ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিল। মন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতার দরুণ ত্রিলোক আন্দোলিত হইয়া উঠিল। স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র স্বয়ং অপহৃত পশু অম্বরীষকে ফিরাইয়া দিতে মর্ত্যলোকে আসিলেন। দেবলোক ও মানবলোক

কর্তৃক ঋষি তনয়ের মুক্তিলাভ যথার্থই আত্মত্যাগের জয় ঘোষণা করে। অবশেষে বহুদিন অতীত হইবার পরে অম্বরীষের রাজ্যে পূর্ব ঐশ্বর্য ফিরিয়া আসিল। পাখীর কলতান, ফুলে-ফলে ভরা প্রাচুর্য, আনন্দিত ময়ূরের কেকাধ্বনি এবং সুদূর আকাশে খণ্ডমেঘের সঞ্চালন—সবকিছুই ঋক্‌মন্ত্রগানের মাহাত্ম্য বলে সম্ভাবিত হইল। (১৪৫ শব্দ)

"রাকা ও বাঁকা" (পৃঃ ৭৪-৮১, মূল শব্দ প্রায় ৫৫৪)

সারসংক্ষেপ ঃ পাণ্ডুরপুর গ্রামে নিষ্পাপ, নির্লোভ ও প্রবল হরিভক্তিসম্পন্ন এক দম্পতি বাস করিত। সামান্য উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া রাকা ও বাঁকা নামে ঐ দম্পতি অতি সুখে দিন অতিবাহিত করিত এবং সদাসর্বদা হরিগুণ গানে রত থাকিত। এই দম্পতির আর্থিক দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া ঋষি নারদ স্বর্গপুরীতে লক্ষ্মী ও নারায়ণকে তাহা জানাইল। লক্ষ্মী নারদকে বাঁকা ও রাকার যাতায়াতের পথে কতকগুলি মোহর ছড়াইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। চলাচলের পথে মোহর দিখিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ রাকা উহা হেলায় মাটি চাপা দিল। স্ত্রী বাঁকা উহা স্পর্শ করিতে গেলে সে তাহাকে নিষেধ করিল। অবশেষে নারদ স্বর্গলোকে আসিয়া ঐ সকল মোহর ফিরাইয়া দিয়া লক্ষ্মী এবং নারায়ণের নিকট উহার কারণ জানিতে চাহিল। ভক্ত পার্থিব ঐশ্বর্যে তৃপ্ত নয়, তপস্যাসঞ্জাত ঈশ্বররূপ ধনেই তৃপ্ত; তাই এই শ্রেণীর লোকের নিকট আর্থিক দুরবস্থা চরম নহে, উহা তপস্যাস্বরূপ। (১১০ শব্দ)

"দুই পণ্ডিত" (পৃঃ ৫৩-৫৬, শব্দ সংখ্যা প্রায় ৪০০)

সারসংক্ষেপ ঃ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জয়নারায়ণের অপরিসীম দুঃখ দেখিয়া কাশীনিবাসী তাঁহার সুহৃদ ধনী পণ্ডিত মহেশচন্দ্রের করুণার উদ্রেক হইল। তাই তিনি সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ভিনিস সাহেবকে ধরিয়া জয়নারায়ণ তর্করত্নের জন্য ষাট টাকা মাহিনার একটি কাজ যোগাড় করিয়া দিলেন। এই খবর নির্লোভ জয়নারায়ণকে দিলে তিনি বিনয়ের সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। পার্থিব মোহত্যাগ করিয়া, অধ্যাত্মিক সুখ-সুবিধার জন্যই তিনি উন্মুখ। তাই এইরূপ প্রত্যাখ্যান ধনী পণ্ডিতের চিত্তেও অনুকরণীয় আদর্শ স্বরূপে উপস্থিত হইয়া জয়নারায়ণের তুলনায় তাঁহার নিঃস্বতাবোধ সুস্পষ্টতররূপে অনুভূত হইল। (৭২ শব্দ)

"দুর্বাসার পরীক্ষা" (প্রায় ৭০৪ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ কুটিল দুর্বাসা মুনি একদিন দশ সহস্র শিষ্যসহ কুরুপতি দুর্যোধনের গৃহে অর্ধ রাত্রিতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কুরুরাজ পরমপরিতোষ সহকারে অতিথিসৎকার করেন। ইহাতে ঋষি দুর্বাসা প্রসন্ন হইয়া দুর্যোধনকে বর দিতে চাহিলেন। সঙ্গীসাথিদের সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্যোধন প্রভাসে কাম্যক বনে বনবাসী পাণ্ডবদের শিবিরে সশিষ্য ঋষির উপস্থিতি ঘটুক—ইহাই বর চাহিলেন। আকস্মিকভাবে দুর্বাসার উপস্থিতি যুধিষ্ঠিরসহ

অপরাপর পাণ্ডবদের চিন্তিত করিয়া তুলিল। ঋষি সন্ধ্যাবন্দনার জন্য সমুদ্রতীরে গিয়া পুনরায় মধ্যরাত্রিতে আবার আসিবেন একথা পাণ্ডবদের স্মরণ করাইয়া গেলেন। অন্নভাণ্ড শূন্য অথচ অতিথির সংখ্যা অসংখ্য। এইরূপ পরিস্থিতিতে অসহায় পাণ্ডবরা কেবলমাত্র 'হরিভরসা' করিয়া তাঁহাকে আকুলস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাদের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি নিজে সামান্য অন্নকণা আনন্দিতচিত্তে গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার দ্বারা সশিষ্য দুর্বাসাও পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি সেদিন রাত্রে না আসিয়া পরদিন প্রভাতে কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিলেন। বিভিন্ন সুপাচ্য ভোজ্যাদি দিয়া যুধিষ্ঠির অতিথি সৎকার করেন। আনন্দিতচিত্তে ঋষি দুর্বাসা যুধিষ্ঠিরকে বর দিতে চাহিলেন। সর্বপ্রকার বিপদ আপদে যেন সত্য-ধর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকিতে পারেন—এই বরই যুধিষ্ঠির প্রার্থনা করিলেন। ধর্মের প্রতি অকুণ্ঠিত অনুরক্ত থাকিলে কোন দুঃখই দুঃখ বলিয়া প্রতিভাত হয় না। সব তপস্যাই জয়যুক্ত হয়। (প্রায় ১৬৫ শব্দ)

গল্পে উপনিষদ

"এই নিখিল সৃষ্টির রক্ষণ ও পালন করাই দেবতাদের কার্য।......এবং দুগ্ধ হইতে যজ্ঞের ঘৃত লাভ করিতেন।" (পৃঃ ১২-১৩, ১৪৮টি শব্দ)

সারসংক্ষেপ : এই নিখিল সৃষ্টির নিয়ন্তা দেবকুল অসুরদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণ হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের ভূমিকা অসামান্য। বজ্রধারী ইন্দ্র একাধারে যেমনি দৈত্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেন, অন্যদিকে তিনি মর্ত্যলোকের অধিবাসীদের জীবনকেও সহজ-সুন্দর খাতে প্রবাহিত করাইবার জন্য তৎপর হইতেন। ইন্দ্র-প্রদত্ত বারিপাতের ফলে প্রচুর শস্য ও ঘাস জন্মিত। ইহার ফলে ঋষিকুল এবং রাজগণ গো-পালন করিত এবং প্রচুর দুগ্ধলাভ করিত। ঐ দুগ্ধ হইতেই যজ্ঞের ঘৃত প্রস্তুত হইত। (৬৭ শব্দ)

"আজ যে দেবভাগ্যে বড় শুভদিন। সূর্যের শেষ রশ্মিমালার স্বর্ণ আভাটুকু......সমস্ত সংশয় দূর করিয়া দিয়া সেই মহান পুরুষের আবির্ভাব সূচনা করে।" (পৃঃ ১৯, প্রায় ১৯০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ : ব্রহ্ম-লাভেচ্ছুক ইন্দ্রের অপেক্ষায় দেবতারা উপস্থিত হইয়াছেন। এই সময়ে তথায় এক আশ্চর্য নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটায় সকলে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রের মনের অন্ধকার অপসারিত হইয়া হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠল।

ইন্দ্র উপলব্ধি করিলেন যে পরম ব্রহ্মের আবির্ভাব সূচিত করিবার নিমিত্ত পরম কল্যাণময়ী দেব-জননী উমার আবির্ভাব। (৪৭ শব্দ)

"দূরে দেবগণ তখনও ইন্দ্রের প্রতীক্ষায়।……এই ব্রহ্মের শক্তিতেই শক্তিমান হইয়া তাঁহারা বিজয় লাভ করিয়াছেন।" (পৃঃ ২১, প্রায় ৯৬ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ উমার কৃপায় ইন্দ্রের মধ্যে পরম জ্ঞানোপলব্ধি ঘটিল। তিনি আপন উপলব্ধির মাধ্যমে এ নিখিল সৃষ্টির ধারক ও বাহক ব্রহ্মার অসীম ক্ষমতা অনুভব করিলেন। এই ব্রহ্মার কৃপাতে অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় শক্তিমান দেবতারও অনায়াসে বিজয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। (৩৪ শব্দ)

"স্তব্ধ শান্ত যজ্ঞভূমি। একদিকে চিন্তাকুলচিত্ত……শব্দমুখর হইয়া উঠিয়াছে।" (পৃঃ ৭৪-৭৫, মূল শব্দ প্রায় ২১০)

সারসংক্ষেপ : শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ নির্বাচন-মানসে রাজর্ষি জনক এক আশ্চর্য প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে সহস্র ব্রাহ্মণের অধিকাংশই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আলোড়িত থাকা সত্ত্বেও, যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক নির্বিকারচিত্ত তেজস্বী ঋষি সায় দিলেন। নিজেকে তিনি ব্রহ্মিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিলেন। জনক প্রদত্ত স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ-সহস্র ধেনু তিনি গ্রহণ করিলেন। ইহার ফলে ব্রাহ্মণ সভায় আবেগ ও উত্তেজনা প্রাবল্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। ইহার মধ্যেও যাজ্ঞবল্ক্য নিজ আসনে শান্ত নির্বিকার চিত্তে বসিয়া আছেন। (৬৫ শব্দ)

"ধন্য এই মহীয়সী……পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যের সমীপবর্তী হইলেন।" (পৃঃ ৮৫, প্রায় ১৪৮ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ প্রখর ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন যাজ্ঞবল্ক্যের তীক্ষ্ণবুদ্ধিবত্তার নিকট একে একে ধুরন্ধর সাতজন ঋষি পরাভব স্বীকার করিলেন। অবশেষে ব্রহ্ম-বিদুষী গার্গী অতুল আত্মবিশ্বাস অবলম্বন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট দুইটি শাণিত প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন তাঁহার বুদ্ধিদীপ্তি সভাকক্ষে সুগভীর গাম্ভীর্য আনয়ন করিয়া অপরাপর ব্রাহ্মণদের বিস্মিত করিয়া দিল। (৪২ শব্দ)

"প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন……অপ্রিয় কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না" (পৃঃ ১১৭, প্রায় ১৭০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ—মানবদেহ প্রতিনিয়ত কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত। একটির পর আর একটি অবস্থা আসিয়া ইহার রূপান্তর সাধিত করে। কিন্তু ইহার কোন অবস্থাতেই দেহাতীত পরম আত্মার সাক্ষাৎ মিলে না। ত্রিতাপ দঃখবঞ্চিত শোক বহির্ভূত অমৃতময় পুরুষ পরমাত্মা দেহাতীত অপূর্ব এক বস্তু। আত্মা সুখ দুঃখের অতীত। সে প্রিয়-অপ্রিয়-র অপেক্ষা রাখে না। (৪৩ শব্দ)

কুরুপাণ্ডব

"ক্রমে এক ফলমুল জলহীন হিংস্রজন্তু সমাকুল······একাকী সতর্কভাবে জাগরণ করি।" (পৃঃ ১৯-২০, প্রায় ২০২ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ সন্ধ্যসূচিত তমিস্রাঘন এক নিশীথে অরণ্যশঙ্কুল পরিবেশে জঠরের জ্বালায় পাণ্ডকুল পথাতিক্রমে অপরাগ হইলেন। পিপাসার্ত জননীর নিমিত্ত বারি আনয়ন করিয়া ভীম সকলকে নিদ্রাতুর দেখিতে পাইয়া স্থির করিলেন যে তিনি কাহারও বিশ্রামের ব্যাঘাত করিবেন না। স্বীয় বিবেচিত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে একাকী রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি সকলকে রক্ষার নিমিত্ত তৎপর হইলেন।

"দুই দল সম্মুখীন হইয়া······আপনি স্বয়ং ভীষ্মকে রক্ষা করুন।"

(পৃঃ ৮৩, প্রায় ১৭৫ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ পাণ্ডব ও কৌরবসৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিল। রথ ও হস্তীর দ্বারা শোভিত পরিবেশে পরিধানে বর্ম এবং অঙ্গে স্বর্ণময় অঙ্গদ ধারণ করিয়া তাহারা সকলই উপস্থিত হইল। খ্যাতিসম্পন্ন বীরগণের বিচিত্রধ্বজা আন্দোলিত হইতে লাগিল। এমনি সময়ে ভীম কর্তৃক রক্ষিত ব্যূহ দেখিয়া দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে ভীষ্মের রক্ষার জন্য নির্দেশ দিলেন। অপরাপর বীরদের আপন স্থানে থাকিয়া ব্যূহ রক্ষার জন্যও তিনি উপযুক্ত আদেশ দিলেন। (৬৪ শব্দ)

রামায়নী কথা

"যে জাতি খণ্ড সত্যকে······পথ পাইবে।" (পৃঃ ৷৷৶০, ১৪০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ অখণ্ড মানব স্বীকৃতিতে প্রোজ্জ্বল সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্যে এক বৃহত্তর জীবন-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে প্রদর্শিত উদার আদর্শ ভরতবাসীর জীবনে অক্ষয় প্রভাব স্থাপন করিয়াছে। ঐ আদর্শের যথার্থানুসরণেই আমাদের জীবনে বৃহত্তর মানবতাবোধ আনিয়া দিবে। (৩০ শব্দ)

"তখন বর্ষাকাল······তীক্ষ্নবাণ নিক্ষেপ করিলেন।"

(দশরথ, পৃঃ ১৩, শব্দ ১২৮)

সারসংক্ষেপ ঃ বর্ষার সন্ধ্যায় পার্বত্যপ্রদেশে গমনাগমন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বিন্দু বিন্দু বারিপতনের শব্দ আর ভেকের রব ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। এমনি পরিস্থিতিতে কুমার দশরথ সরযূ নদীর তীরে মৃগয়ারত। হস্তী ভাবিয়া শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপপূর্বক তিনি এক মুনি-তনয়কে নিহত করিলেন। (৪৯ শব্দ)

"দেশ পর্যটনে মনের ভার……বিশ্রামের উদ্যোগ করিলেন।

(রামচন্দ্র, পৃঃ ২৫-২৬, শব্দ প্রায় ১৭০)

সারসংক্ষেপ ঃ মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া রথারোহী দুই ভাই এবং সীতা গঙ্গাতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঊর্মিমালার নিরন্তর প্রবাহ তাঁহাদের মনে বিস্ময়কর অনুভব আনিয়া দিল। অবশেষে তাঁহারা নদীতীরে এক ইঙ্গুদী বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রামের অয়োজন করিলেন। (৩৪ শব্দ)

"কতক দূরে যাইতে যাইতে……জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন।"

(রামচন্দ্র, পৃঃ ৩৮, শব্দ প্রায় ১৮৮)

সারসংক্ষেপ ঃ রুধিরাক্ত ভূমি এবং সীতার শ্লথিত আভরণ সকল পতিত দেখিয়া পথাতিক্রমে রত রামচন্দ্র সীতাকে রাক্ষসেরা খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করিলেন এবং অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইলেন। জীবনপণ করিয়া রাক্ষসদের শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি উদাত্ত শপথ গ্রহণ করিলেন। এমনি সময়ে লক্ষ্মণের সুপরামর্শে রামের চিত্ত নির্মল ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। (৪৪ শব্দ)

"প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী……দেখিতে পাইলেন না।"

(ভরত, পৃঃ ৬৭, শব্দ প্রায় ১০২)

সারসংক্ষেপ ঃ দশরথের মৃত্যুতে এবং রাম, লক্ষণ ও সীতার অনুপস্থিতিতে অযোধ্যানগরী ম্লানরূপ ধারণ করিয়াছে। ভরতচন্দ্র পূর্বে ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তাই তিনি প্রতিহারীদের অভিনন্দন গ্রহণপূর্বক পিতৃকক্ষে প্রবেশ করিয়া উহার শূন্যতা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। (৩০ শব্দ)

"এই নিত্যদুঃখসহায় ভৃত্য……নীরব হইয়া আছ।"

(লক্ষ্মণ, পৃঃ ৮০-৮১, শব্দ ১৯৫)

সারসংক্ষেপ ঃ শোকে-দুঃখে নিত্য সঙ্গী লক্ষ্মণ রামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। যুদ্ধরত লক্ষ্মণ যেদিন রাবণের শেলে নিহতপ্রায় হইলেন, সেদিনও রামচন্দ্র সর্বপ্রকার বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করিয়া ভ্রাতাকে আগলাইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষ পর্যন্ত বানর সেনানীরা লক্ষ্মণকে রক্ষার ভার লইলে তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত রামচন্দ্র পুনরায় ভ্রাতার নিকট উপবেশনপূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রিয় লক্ষ্মণ না বাঁচিলে রামের আর পূর্বোত্তম ফিরিয়া আসিবে না। (৬২ শব্দ)

"পম্পাতীরবর্তী স্থান······সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন।"

(রামচন্দ্র, পৃঃ ৪০-৪১, প্রায় ১৩০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ : বসন্তঋতুর মলয় পবনে পম্পা নদীর তটভূমি এক বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিল। জীব জগৎ ও প্রকৃতি জগৎ সমভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। আর এমনি এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে রামচন্দ্র প্রিয় পত্নীর বিচ্ছেদে বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। (৩৩ শব্দ)

রাজর্ষি

"তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল······জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।"

(পৃঃ ২৫-২৬, ১৩৬ শব্দ)

সারসংক্ষেপ : বর্ষাস্নাত আষাঢ় মাসের একটি প্রভাতে বহুদিন পর সূর্যোদয় হওয়ায় দশদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। আকাশে রামধনু, বন্য জন্তু জানোয়ারদের উল্লাস, ধেনু লইয়া মাঠে গমনোদ্যত রাখালদের নদীর ঘাটে সোরগোল—সবকিছুই অভূতপূর্ব জীবন স্পন্দনের ইঙ্গিত দেয়। ঠিক অমনি সময়ে জয়সিংহ মন্দিরে আসিয়া ঢুকিলেন। (৩৭ শব্দ)

"রাজা কহিলেন······পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয়।"

(পৃঃ ৪০, প্রায় ১৬৭ শব্দ)

সারসংক্ষেপ : বৈরী নয়, মৈত্রীই হইল রাজপদ লাভের সার্থক উপায়। প্রজা-সাধারণের দুঃখ-কষ্টকে যিনি নিজের করিয়া লইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। অপরের স্বার্থ-বিস্মৃত রাজ্যশাসন দস্যুতার নামান্তর মাত্র। স্বকীয় গুণবত্তাই পৃথিবীকে রাজার বশীভূত করিয়া তোলে। (৩২ শব্দ)

"তাহার পরদিন ভোরে ·····সমস্ত প্রস্তুত।"

(পৃঃ ৯৩-৯৪, প্রায় ১২৫ শব্দ)

সারসংক্ষেপ : পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নক্ষত্র রায় জানালা হইতে সূর্যোদয় দেখিতেছিলেন। এই সময়েই ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী গ্রামগুলি তাঁহার দৃষ্ট হইল। অদূরে একটি কুটিরে তিনি জীবন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেন। পাখীর কাকলি এবং

আরও অনেক কিছু লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন ঠিক এমনি সময় রঘুপতি আসিয়া তাঁহাকে যাত্রা করিতে বলিল। (৪৫ শব্দ)

"দীর্ঘ পথ। কোথাও বা নদী……শূন্য মরুভূমি।"

(পৃঃ ৯৭-৯৮, শব্দ ১২৫)

সারসংক্ষেপ ঃ দুরতিক্রম্য ও কষ্টসঙ্কুল পথে নক্ষত্র রায় একাকী হাঁটিয়া চলিয়াছেন। পথিমধ্যে বহু বিচিত্র দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হয়। কিন্তু এই সকলকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করিয়া নক্ষত্র রায়ের মনে বারবার রঘুনাথের স্মৃতি উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। তাঁহার দুরদৃষ্টই তাঁহাকে লোকালয়শূন্য এক বিজন মরুভূমিতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। (৩৯ শব্দ)

"ময়ানি নদীরধারে……প্রতিধ্বনিত হইতেছে।" (পৃঃ ১৫১, শব্দ ১৪০)

সারসংক্ষেপ ঃ বেগবতী ময়ানি নদীর কালো পাহাড়িয়া তটভূমির অদূরে বিস্তৃত ঘন বন এবং মাঝে-মাঝে শ্যামল কদলী বৃক্ষের বন। অনেকগুলি ঝরণা তটভূমি হইতে নদীর জলে পতিত হইয়াছে। নদীতীরে উচ্চ পাহাড় থাকায় বিলম্বে উহার জলে সূর্যকিরণ পড়ে। স্রোতের প্রাবল্যে নদীর জল উঁচু হইতে নীচে পড়িয়া ঝর্‌ঝর্ শব্দ হয়। এখানেই মহারাজ কুটিরে বাস করেন।

✓ "রাজা কহিলেন……চলিয়া গেলেন।" (পৃঃ ১৩৭, শব্দ ১৩৬)

সারসংক্ষেপ ঃ প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া রাজা স্বেচ্ছায় রাজপদ ত্যাগ করিলেন। নক্ষত্র রায়কে প্রজাসাধারণ সৎ ও কল্যাণকর কার্যে ব্রতী করিয়া তুলে —ইহাই রাজা একমাত্র কামনা করেন। রাজার সহিত নক্ষত্র রায়ের তুলনা করা অনুচিত। বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া রাজা অবশেষে যখন যাত্রা করিলেন, তখন প্রজাদের নয়ন অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। (৩৯ শব্দ)

"আজ রাত্রে চতুর্দশ……লাগিল।" (পৃঃ ৫০-৫১, প্রায় ১৭৩ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ চতুর্দশ পূজার দিনে মনোহর প্রভাতকালে জয়সিংহের মনে শৈশবের সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বটচ্ছায়া, পুকুরের তীর, মন্দিরের সিঁড়ি সকলই তাঁহাকে আশ্চর্য রকমভাবে পুলকিত করিয়া তুলিল। তাঁহার মনে হইল, উহারা যেন তাঁহাকে পশ্চাতে ফিরিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতেছে। মন্দিরের মৃন্ময়ী তাহার নিকট এক্ষণে চিন্ময়ীর রূপ লইয়া উপস্থিত হইল। (৪৪ শব্দ)

"বিল্বন ঠাকুর রাজাকে……কাজ বাড়াইতে হয়।"

(পৃঃ ১০৬-১০৭, শব্দ ১০৫)

সারসংক্ষেপ ঃ বুদ্ধিমানদের সংস্পর্শে থাকিলে সহজ কাজও সূক্ষ্মবুদ্ধি খাটাইয়া জটিলভাবে উহা সম্পাদিত হয়। ফলে কাজও বাড়িয়া উঠে। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করার চেষ্টাই হইল স্বাভাবিক উপায়। (শব্দ ২৩)

"তাহার পর……আসিতেছে।" (১১৭-১১৮, শব্দ ২১৬)

সারসংক্ষেপ ঃ অন্তরে সুগভীর ভ্রাতৃ-প্রীতি থাকিবার দরুন নক্ষত্র রায়কে নির্বাসন দিবার পরমুহূর্ত হইতে রাজা অন্তরে অন্তরে অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। ভ্রাতৃত্ব অপরাধের মানদণ্ডে বিচার্য নহে। পাপের গুরুভার লঘু করা দরকার। রাজাকে নির্বাসিত করিয়া দিয়া নক্ষত্র রায় সেই সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। অশান্ত গোবিন্দ-মাণিক্যের চিত্ত পাপ নয়, পুণ্যের দ্বারাও হয়ত বা চালিত হইতে পারে। (শব্দ ৪৭)

"গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন……দেখুন।" (পৃঃ ১২০-১২১, শব্দ ১৭৫)

সারসংক্ষেপ ঃ দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখিয়া রাজা মনে করিলেন তাহারই অযোগ্যতার ফলে উহা ঘটিয়াছে। এমনকি তাহারই কৃতকর্মের দরুন যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে এবং রাজাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইতেছে। তিনি অস্ত্রধারণে অনিচ্ছুক। বিল্বন ঠাকুরের মত কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহার মতে কোনক্রমেই রাজকার্যে অবহেলা করা উচিত নয়। সর্বোপরি কর্তব্যের আহ্বানের নিকট স্নেহ-প্রেম সব কিছুই তুচ্ছ। (৫০ শব্দ)

কাব্য-মঞ্জুষা

"পূজারিণী" (মূল প্রায় ৪০৪ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ বুদ্ধের দেহাবশেষ সংগ্রহ করিয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা বিম্বিসার একটি চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় প্রতিদিন আরতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহার পুত্র অজাতশত্রু বৌদ্ধবিদ্বেষী ছেলেন। সে কারণে তাহার রাজ্যে বুদ্ধ পূজা নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল। আদেশ অমান্য করায় বহু বুদ্ধশিষ্য প্রাণ দিল এবং নির্বাসন দণ্ডলাভ করিল। শ্রীমতী নামে একজন বৌদ্ধানুরাগী ভক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রাবল্যে বৌদ্ধ পূজার অর্ঘ্য লইয়া একে একে রাজমহিষী, রাজবধূ, রাজকুমারী এবং পুরবাসীদের নিকট ঘুরিয়া আসিল। প্রত্যেকেই তাহাকে মৃত্যুঞ্জয়ের কথা স্মরণ করাই দিল। সকলের সহায়তা বঞ্চিতা শ্রীমতী রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া বুদ্ধের বেদীমূলে অর্ঘ্য স্থাপন করার অপরাধে নীরবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল। (৮৬ শব্দ)

"কালকেতুর বিক্রম" (প্রায় ১৭৫ শব্দ)

সারসংক্ষেপ : শিশু কালকেতু দিন দিন চরিত্রে এবং রূপে-গুণে, সর্বদিক হইতে সুন্দরতর হইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার সুস্বাস্থ্য এবং দৈহিক কমনীয়তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অবশেষে এক শুভদিনে ব্যাধ তনয় কালকেতুর হস্তে ধনুর্বাণ দেওয়ার পর বিবাহ দেওয়া হইল।

"মানব-বন্দনা" (পৃঃ ৭৭-৮২, প্রায় ৪৩৭ শব্দ)

সারসংক্ষেপ : প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া রূপান্তরশীল মানব সভ্যতা বর্তমানরূপ ধারণ করিয়াছে। প্রস্তরযুগ হইতে পশুচারণ যুগ, আর পশুচারণ যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবেতিহাসের অগ্রগতি মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। এই অগ্রগতির পশ্চাতে কত নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষেরা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমান যুগের মানুষ গ্রাম ও নগরের সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞানের অবদানে কত নতুন নতুন জিনিস এযুগের মানুষ উদ্ভাবন করিয়াছে। এক কথা মানুষের ঘরেই দেবতার ঠাকুরালি পরিলক্ষিত হইয়াছে। অসহায় অবস্থা হইতে সবলতা প্রাপ্ত উন্নত মনুষ্য সমাজের উদ্দেশ্যে কবি প্রণতি জানাইতেছেন। (৭৯ শব্দ)

"বঙ্কিম-বিদায়" (পৃঃ ৬৪-৬৬, প্রায় ৩১০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ : বসন্ত যেমন প্রকৃতির মধ্যে সজীবতা এবং সরসতা আনয়ন করে, বঙ্কিমচন্দ্রও বঙ্গ-সাহিত্যে তাহাই করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপদেশ,সকল যুক্তি-তর্কের মধ্যে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার স্বাধীন মত। অসাধারণ লোকোত্তর প্রতিভা সম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু আকস্মিক ঘটনা। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমের মতো অসাধারণ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিলে জগতের কল্যাণ, আমাদের মতো শত শত ব্যক্তির মৃত্যুতে কিছু যায় আসে না। (৬০ শব্দ

"ভক্তির যুক্তি" (পৃঃ ১২৭-১৩০, প্রায় ২০০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ : জগদীশ্বরের প্রকৃতরূপ নারী না পুরুষ এ বিষয়ে স্পষ্ট মন্তব্য করা কষ্টসাধ্য। বিশ্বের অপার্থিব সৌন্দর্যে শিখী-শিখীনীর নৃত্যে এবং শত শত জীব-জন্তুর লীলার পশ্চাতে সৌন্দর্যানুরাগী নারীচিত্তের পরিচয় ফুটিয়া উঠে। সামান্য জিনিসের মধ্যে অসামান্যের ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিবার পিছনেও তাই সেই একই শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু ইহাকেই চরমভাবা উচিত নয়। কারণ প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ অনুভব এবং বিশ্বাসই হইল এ বিতর্ক সমাধানের একমাত্র উপায়। (৫৬ শব্দ)

চরিত-কথা

"আমরা যে বিদ্যাসাগরের······আলোচনার বিষয়।"

(বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৬-৭, শব্দ ১৪৮)

সারসংক্ষেপঃ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগরের ন্যায় প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্যই অস্বাভাবিক ঘটনা। তিনি কোনদিনই অন্যায় এবং অসত্যকে মানিয়া লন নাই। যাহারা জীবন যুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিয়া ভাগ্যলক্ষীর আশীর্বাদ শিরে বহন করিয়া আনে, একমাত্র তাহাদের পক্ষেই বিদ্যাসাগরের সর্বাতিশয়ী প্রতিভার পরিমাপ করা সম্ভব। (শব্দ ৩৯)

"বিদ্যাসাগর একজন···মেরুদণ্ড নমিত করেন।"

(বিদ্যাসাগর পৃঃ ১৬-১৭, প্রায় ২৪২ শব্দ)

সারসংক্ষেপঃ বিদ্যাসাগরের মানস-প্রবণতা কোমলতা ও কঠোরতার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। বাল্য-বিবাহের ন্যায় কুসংস্কার প্রসূত সামাজিক রীতি-নীতি যেমন তাঁহাকে ব্যথিত করিত, অন্যদিকে ঠিক তেমনিভাবে প্রবল কঠোরতা অবলম্বন করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য আন্দোলন করিতেও তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করেন নাই। সব সময়েই মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিতে গিয়া সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তিকেই তিনি অত্যন্ত নগণ্য মনে করিয়াছেন। (৪৮ শব্দ)

"নবেলের মত······ন্যূনতা স্বীকার করিবে না।"

(বঙ্কিমচন্দ্র পৃঃ ৩৩, প্রায় ২৯৪ শব্দ)

সারসংক্ষেপঃ অন্যান্য বহু বিদেশী জিনিসের ন্যায় নবেল ও মাসিক পত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বহু পূর্বে আমাদের দেশে ছিল। যথোপযুক্ত ঔদার্যের সহিত উহাকে এদেশবাসী গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্বসূরীরা এই দুইটিকে তত আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মাসিক পত্র সম্পাদনে এবং নবেল রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন। (৪৫ শব্দ)

"যাহার নাম ধর্ম তাহাই স্বভাব······প্রয়োজন নাই।"

(পৃঃ ৪৪-৪৫, প্রায় ১৬০ শব্দ)

সারসংক্ষেপঃ স্বভাবই ধর্ম। স্বভাবের বিরোধিতাই ব্যাধিস্বরূপ। বিদেশীর দ্বারা শাসিত ও শোষিত ভারতবাসী বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বিভিন্ন দিক হইতে বিদেশীর অন্ধানুকরণ করিত। ফলে আচার-ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় স্বভাবানুগ রীতি-নীতি পালনের নিমিত্ত মহর্ষি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। ইংরেজীর পরিবর্তে নিজ দেশীয় ভাষায় ধর্ম প্রচারের চেষ্টাই তাহার সার্থক পরিচয় দেয়।

"বঙ্কিমচন্দ্র এক কালে বাঙ্গালার ······প্রতিহর্তা থাকিবে।"

(উমেশচন্দ্র বটব্যাল, পৃঃ ৭৮-৭৯ প্রায় ১৪৮ শব্দ)

সারসংক্ষেপ: আন্তরিক স্বদেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাঙলার ইতিহাস রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উমেশচন্দ্রও সেইরূপ বাসনার দ্বারা পরিচালিত হন। এ কারণে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণপূর্বক বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী উমেশচন্দ্রের থাকা সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার দরুন তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন নাই। (৪০ শব্দ)

"আমাদের বৈদিক শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা······লইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না"। (অধ্যাপক মক্ষমূলর, পৃঃ ৬৪, প্রায় ১৪০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশের বিভিন্ন শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্বক অধ্যাপক মক্ষমূলর এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। আর্য দেশভেদে কালভেদে একই উৎস-নিসৃত ধর্মসাধনার রূপান্তরশীল স্বরূপ নির্ণয়ে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহু ভাষাবিদ হইবার দরুন তাঁহার প্রচেষ্টা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। (৫০ শব্দ)

"লেখকের ভাবুকতা ও শিল্পী কৌশল······প্রতিপন্ন হইবে।"

(বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৮, শব্দ ১৪০)

সারসংক্ষেপ: সামঞ্জস্য ও সংযম ব্যতিরেকে সার্থক শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এই গুণ ছিল। তিনি বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি নিজে যেমন সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপভোগ করিতেন, পাঠককেও তাহার আস্বাদ দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। প্রতি পদে পদে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বিষয়বস্তুকে কখনও জটিল করিয়া তুলেন নাই। (৪৫ শব্দ)

কমলাকান্ত

"কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত······তাই এত মধুর বোধ হইল।"

(একা, পৃঃ ৪-৫, শব্দ ২০৪)

সারসংক্ষেপ: যৌবনের সৌন্দর্য-সম্ভোগী ক্ষমতা বার্ধক্যে থাকে না। যৌবনে হৃদয় প্রফুল্ল থাকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির দরুন বার্ধক্যে মানুষ অত্যন্ত নীরস হইয়া উঠে। বার্ধক্যে সংগীতের শ্রুতিমাধুর্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া বিগত-যৌবনের ন্যায় তত পুলকিত করিয়া তুলে না। সাধারণতঃ এই বয়সে যদি কাহারও কাছে সংগীত ভাল লাগে, তবে তা যৌবন স্মৃতি উদ্রেককারী বলিয়াই ভাল লাগে। (৪৩ শব্দ)

'দেখিলাম, মনে হইল···· ·পতঙ্গ না তো কি ?"

(পতঙ্গ, পৃঃ ১৬, প্রায় ২২৫ শব্দ)

সারসংক্ষেপ আশা মানব-মনের স্বাভাবিক অবলম্বন। এই আশার সুতীব্র আকর্ষণে মানুষ উন্মাদ হইয়া উঠে সর্বক্ষেত্রে আশা হয়ত বা জয়যুক্ত হয় না। তথাপি ব্যর্থতার দরুন হতাশ হওয়া অনুচিত কারণ সাফল্যের পশ্চাতে ব্যর্থতা আছে বলিয়াই সমাজ সংসারে আপন অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে। ব্যর্থতা অনেকক্ষেত্রে নবপ্রেরণা আনয়ন করে। (৪০ শব্দ)

"দেখিলাম অকস্মাৎ···সুবর্ণময় বঙ্গ প্রতিমা।" (পৃঃ ৩৬-৩৭, ১৬৪ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ কোন মানুষই নিঃসঙ্গ নয়। দেশ জননী প্রত্যেক সন্তানের নিকট সমানভাবে বন্দিত। ভক্তির প্রাবল্য এবং অনুভূতির প্রসারতা থাকিলে মৃন্ময়ীর চিন্ময়ী স্বরূপ হৃদয়ের কাছে ধরা পড়ে। (২৪ শব্দ)

"আর আমাদিগের দশা দেখ···কেহ আইসে নাই।" (পৃঃ ৪৩, ১৩৫ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ মানুষ প্রয়োজনের দাস। ক্ষুন্নিবৃত্তি দরিদ্র এবং ধনী উভয়েরই আছে। ধনী শুধুমাত্র উদর-পূর্তিটাকেই বড় করিয়া দেখে, গরীবের কথা একটিবারের জন্যও তারা চিন্তা করে না। এ জন্য দরিদ্ররা চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। ফলে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু গ্রহণের নিমিত্ত নিষ্ঠুর ধনীদেরও উপযুক্ত শাস্তি পাওয়া উচিত। (৪৪ শব্দ)

"আমি বুঝাইয়া বলিলাম······কর্তব্য।" (বিড়াল পৃঃ ৪৪-৪৫ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ সামাজিক উন্নতির জন্যই ধনীর অর্থের প্রয়োজন। দরিদ্র ব্যক্তির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক না থাকিলেও সামাজিক স্থিতি রক্ষাকল্পে চোরের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত। (২১ শব্দ)

"বিড়াল বলিতেছে······পারিয়াছে।" (বিড়াল, পৃঃ ৪০-৪১)

সরাসংক্ষেপ ঃ সর্বপ্রকার উপাদেয় আহার্য গ্রহণের অধিকার সকলেরই আছে। ইহার দরুন কলহ বাধাইবার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানেরও শিক্ষা করিবার মতো বহু বিষয় থাকে। (২২ শব্দ)

"ভ্রমর বাবাজী······লাগিল।" (বিড়াল, পৃঃ ৫৮)

সারসংক্ষেপঃ ভ্রমরের শব্দে বিরক্ত হইয়া কমলাকান্ত উহাদের উপর রাগিয়া গেলেন। উহাদের তাড়াইবার বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের বীর্যবত্তাও ক্ষুদ্র পতঙ্গের কাছে হার স্বীকার করিল। (২৪ শব্দ)

"কমলা। জানি যে,……মিষ্টালাপ করি।" (পৃঃ ৭১)

সারসংক্ষেপ ঃ গরু চুরির ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া কমলাকান্তের সহিত উকিলের হাস্যকর কথোপকথন চলিল। চোর গোপনে চুরি করে। সে সাক্ষীর অপেক্ষা রাখে না। কমলাকান্ত গরুর দুধ খাইয়াছে বলিয়া একমাত্র গরুকেই চেনে, অন্য কিছুর খবর সে রাখে না।

সীতার বনবাস

"লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন……অবলোকন করিয়াছিলাম।" (পৃঃ ১৮-১৯ প্রায়, ১৩০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ লক্ষ্মণ রামকে অন্য বিষয়ে আলোচনায় নিযুক্ত করাইবার জন্য মাতঙ্গ মুনির আশ্রম, শবরী, শ্রমণা এবং পম্পা সরোবরের কথা বলিল। 'পম্পা'—এই নামটি শুনিয়া রামের মনে পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। নিরুদ্দিষ্ট সীতার উদ্ধার সাধনের জন্য একদিন তিনি এই সরোবর পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। ইহার অনুপম রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। (৪৩ শব্দ)

"রাম, মন্ত্রণাভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন……অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।" (পৃঃ ২৯-৩০, ১৫২ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ অসময়ে রামচন্দ্র মন্ত্রণা সভায় প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে তিনি ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। রামের অশান্ত মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার তিন ভ্রাতা তখন রোদন করিতে লাগিলেন। (৩৬ শব্দ)

"এই বলিতে বলিতে,……আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না।" (পৃঃ ৪৭-৪৮, প্রায় ১২০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ অকারণে স্বামী বনবাস যাপনের আদেশ করায় জনক দুহীতা সীতা অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। তিনি স্বামীর এই আদেশকে পূর্বজন্মের পাপের ফল হিসাবে গ্রহণ করিলেন। (২২শব্দ)

"কুমারেরা ক্রমে ক্রমে……গান করিব আদেশ করুন।"
(পৃঃ ৮৩ ৮৪, প্রায় ১২৫ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির সহিত কুমারেরা রাজসভায় প্রবেশ করিল। রাম তাহাদিগকে গান শুনাইতে আদেশ করিলেন। বিপুল রামচরিতের কোন অংশ গান করিতে হইবে কুমারেরা তাহা জানিতে চাহিল। (২৫ শব্দ)

রজনী অবসন্না হইল ······সংশয় হইতে পারে না।"

(পৃঃ ১০৬, মূল শব্দ প্রায় ১১৫)

সারসংক্ষেপঃ প্রভাতে বাল্মীকি লব, কুশ ও দুর্বলদেহা সীতাকে লইয়া রাজসভায়-প্রবেশ করিলেন। সীতার দুরবস্থা দেখিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথাতুর হইলেন। কিন্তু প্রজা-সাধারণের মনোবাসনা না জানিয়া কোন কিছু করা অসম্ভব। সেই কারণে রামচন্দ্র নীরব রহিলেন। বাল্মীকি সর্বসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধ চরিত্রের উল্লেখ করিতে লাগিলেন। (৩৪ শব্দ)

সংকল্প ও স্বদেশ

"মনশ্চক্ষে হেরী যবে ভারত প্রাচীন—

*　　*　　*

প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা, পককেশজালে,
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত জলে।"

(স্বদেশ, পৃঃ ৭৫, প্রায় ৭০ শব্দ)

সারসংক্ষেপঃ অতীতকালে ভারতবর্ষের রাজারা আত্ম অহংকার বিস্মৃত হইয়া তপস্যা-নিমগ্ন ঋষিদের নিকট হইতে সুপরামর্শ লইতেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁহারা স্থায়িভাবে এখানে বাস করিতেন। রাজার ছেলে-মেয়েরাও এখানে ঋষির নিকট পাঠভ্যাস লইত। (৩০ শব্দ)

"না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে
হে বরেণ্য, এই বর দেহো মোর চিতে।

*　　*　　*

আমার আসন যেন রহে সর্ব ঠাঁই
হে দেব, একান্তচিত্তে এই বর চাই।" (পৃঃ ৪১, শব্দ ৭৫)

সারসংক্ষেপঃ জগৎস্রষ্টার অনুপম সৃষ্টি এ পৃথিবী। ইহার অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যের আস্বাদ পরম উপভোগ্য। জড় অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করা অনুচিত কার্য।

(১৮ শব্দ)

কী গাহিবে, কী শুনাবে। বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থ মগ্ন যে জন বিমুখ

*　　*　　*

নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যু গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো।"

(এবার ফিরাও মোরে, পৃঃ ১৯-২০ প্রায়, ১২০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ আত্ম সুখের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে কখনও কোন কল্যাণকর কর্মই সাধিত হয় না। অগ্রগামী পথিকরা এক দুর্বার আকর্ষণে অজানার রহস্যালোকের স্বরূপ নির্ণয়ে যুগ-যুগান্তর কাল ধরিয়া ব্রতী হইয়াছেন। কোন বন্ধনই তাহাদের প্রতিহত করিতে পারে নাই।

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমার পূর্ব গগণে, দেখিনু তোমার স্বদেশে।

* * *

তব মঙ্গল বিজয় শঙ্খ বাজিছে আমার স্বদেশে।"

(পৃঃ ৪৯, প্রায় ১৮০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ বিশ্বদেবতার প্রতিবিম্ব কবি ভারতবর্ষে দেখিতে পাইয়াছেন। অতীতের তপোবনে ঋষিরা এই বিশ্বদেবতার স্তবগাথা রচনা করিয়াছেন। আশাবাদী কবি তাঁহার স্বদেশে সনাতন আদর্শের পুনঃপ্রকাশ আপন প্রজ্ঞা দৃষ্টিবলে লক্ষ্য করিয়াছেন। সেদিন স্বার্থবাহদের লোভ এবং যুদ্ধ-কামীদের হিংস্র মনোভাব বিদূরিত হইবে। বিশ্বব্যাপী ভারতের সুমহান আদর্শ পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। (৪৫ শব্দ)

"ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি হে আর্য আচার্য জগদীশ।
...... শান্ত গুরুর বেদীতে।" (পৃঃ ৭৩-৭৪, প্রায় ১৮৪ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ জগদীশচন্দ্র ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং নিরলস সাধনা বলে বিশ্বের প্রাণশক্তির স্বরূপ নির্ণয়ে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অতীত চিন্তায় এবং ঐতিহ্যের জয়গানে অধিকাংশ ভারতবাসী যখন মুখর, তখন জগদীশচন্দ্র আপন স্থির লক্ষ্য সাধনে চেষ্টিত। তাঁহার লক্ষ্যের সার্থকতার দরুন ভারত আবার পুনরায় নিজ গৌরব অর্জন করিয়াছে, গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (৪৬ শব্দ)

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত গাথাগুলির সারসংক্ষেপ (Precis) রচনা কর (রচনার শব্দ সংখ্যা যত অল্প হয় ততই ভাল):

১। গাথাঞ্জলি

(১) শ্রীদাম সখা, (২) গুণীর পুরস্কার, (৩) উজির ও বাদসাহ, (৪) মুচির মোচন, (৫) ডাক হরকরা, কুরুক্ষেত্র, (৭) দাতা ও কবি, (৮) উমা ও মেনকা এবং (৯) কৌষেয় ও কাষায়।

২। গল্পে উপনিষদ

(১০) "একদিন আমাদের......চাইতে শ্রেষ্ঠ।" (পৃঃ ৪)

(১১) "সকলের অভিমান যখন......রক্ষা কর।" (পৃঃ ৯)

(১২) "জননী চক্ষু মুছিয়া......স্পর্শ করিতে পারে।" (পৃঃ ২৪)

(১৩) "যাহা চাহিবার·····...প্রদীপ ধরিতে চাহিলেন।" (পৃঃ ৫৫-৫৬)

(১৪) "এইবার ব্রাহ্মণ সভা········দূরের কথা।" (পৃঃ ৭৯)

(১৫) "জিজ্ঞাসু ঋষিগণ......শিক্ষা দিলেন।" (পৃঃ ১৩৫)

(১৬) "সবশেষে প্রজাপতি......কামনার পরিপূর্তি।" (পৃঃ ১৮৯

৩। রামায়ণী কথা

(১৬ক) "আমাদের আজকালকার সমালোচনা.........তিনি নিজের অথবা সর্ব-সাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।" (রামায়ণী কথার 'ভূমিকা' পৃঃ ||০)

(১৭) "সহসা নিবিড় গহনপন্থায় পদ দ্বারা···যাহাতে তিনি এরূপ আর্ত হইয়াছেন? (রামচন্দ্র, পৃঃ ২)

(১৮) "ভরত কোনক্রমেই......অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।" (রামচন্দ্র পৃঃ ৪৩)

(১৯) "কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া......তাহার মূলে কৈকেয়ী।" (ভরত, পৃঃ ৮৭-৮৮।

(২০) "নিবিড় মেঘমণ্ডল......করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।" (ভরত, পৃঃ ৯১)

(২১) "আরণ্যজীবনের যাহা········মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন।" (লক্ষ্মণ, পৃঃ ১০২-১০৩)

(২২) "ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত·······আমরা রাক্ষসকে বধ করি।" (লক্ষ্মণ, পৃঃ ১১১)

(২৩) "কৌশল্যার মুখে এই......বিগলিত হইতে লাগিল।" (কৌশল্যা, পৃঃ ১২৯)

(২৪) "এই দুইটি কথায় তাঁহার·····উদাহরণ দেখাইয়াছেন।" (কৈকেয়ী, পৃঃ ১৩৯)

(২৫) "তারপর রাজকুমারদ্বয়····অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেন।" (সীতা, পৃঃ ১৫২(

(২৬) "সীতার কাহিনী, দুঃখ পবিত্রতা......ছিন্নকন্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তিকর হইয়া উঠে।" (সীতা, পৃঃ ১৬৮)

(২৭) "বাল্মীকি অঙ্কিত হনুমান......'আর্য হনুমান' বলিয়া সম্বোধন করিতে দ্বিধা করেন নাই।" (হনুমান, পৃঃ ১৯৩-৯৫)

৪। রাজর্ষি

(২৮) "এই বৎসরে ত্রিপুরায় এক ......লক্ষণ প্রকাশ করিল।" (পৃঃ ১)

(২৯) "তাহার পরদিন......তাহারই রক্ত।" (পৃঃ ৭-৮)

(৩০) "নক্ষত্র রায় .....উপলক্ষ হইলাম।" (পৃঃ ২২)

(৩১) "জয়সিংহ আসিয়া......পাইতেছি না।" (পৃঃ ৪৪-৪৫)

(৩২) "ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ......গিয়াছে।" (পৃঃ ৬৯-৭০)

(৩৩) "খুড়ো সাহেবের......নিদ্রা নাই।" (পৃঃ ৮২)

(৩৪) "পুরোহিত-ঠাকুরকে......কহিতে পারে না।" (পৃঃ ১০৯-১১০)

(৩৫) "অবশেষে যখন......গেলেন।" (পৃঃ ১৪১)

৫। কাব্য-মঞ্জুষা

(৩৬) "নিষ্ফল উপহার", (৩৭) "কাশীরাম দাস", (৩৮) "মাতৃহারা", (৩৯) "চাষার ঘরে", (৪০) "ছিন্ন-মুকুল।"

৬। চরিত-কথা

(৪১) "রত্নাকরের রামনাম......পাই না।" (পৃঃ ১-২)

(৪২) "রামায়ণ......স্বাভাবিক!" (পৃঃ ১৪-১৫)

(৪৩) "এই চারিটি......থামে নাই।" (পৃঃ ৩১)

(৪৪) "বঙ্কিমচন্দ্র...বোধ করিল না।" (পৃঃ ৩৯-৪০)

(৪৫) "যাঁহারা ভারতবর্ষের...অলঙ্কৃত করুন।" (পৃঃ ৪৫-৪৬)

(৪৬) "জৈব পদার্থ...প্রক্রিয়া নহে।" (পৃঃ ৫১-৫২)

(৪৭) "শরীরতত্ত্ববিৎ...চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ।" (পৃঃ ৬৭-৬৮)

(৪৮) "বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্য ··সুধিগণের আলোচ্য।" (পৃঃ ৭৩-৭৪

৭। কমলাকান্ত

(৪৯) "একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, সেখানে পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত।

যেখানে পোলাও, কাবাব, কাফতার সুগন্ধ, যেখানে ডেকচি-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুট বুটবুট-টকবকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস, সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন দ্বিতীয় দধীচির ন্যায় পরোপকারার্থে আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংস সংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমারূপ বজ্র নির্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে পাচকরূপী বিষ্ণু কর্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন রাহু গিয়া গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রাসমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেশনে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রাসমণির সন্তানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।"

(আমার মন, পৃঃ ১৮-১৯)

(৫০) এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। মন হইতে এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচারণে মন দাও। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে। জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অন্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভর আফিঙ দিব।" (বিড়াল পৃঃ ৪২)

(৫১) "আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মহাশয় বঙ্গদর্শনটা কি তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।" আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম। কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল। অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয় তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটি "বঙ্গদশন" অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আমি তাহাকে চতুষ্পাটি খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব-বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "ইহার অর্থ পূর্ব বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি", অর্থাৎ "A Guide to

Eastern Bengal।" এইরূপ বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, 'বঙ্গদর্শন' একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্দ্ধর ঐ ধনরত্নগুলি নিজ প্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে।" (কমলাকান্তের পত্র, পৃঃ ৪৭)

(৫২) "গোধূলি লগ্ন........পাইয়া থাকেন।" (ফুলের বিবাহ, পৃঃ ৩২-৩৩ ,

(৫৩) "তারপর ভাবিয়া........বুঝিয়া আসিল।" (পলিটিক্স, পৃঃ ৫৪)

৮। সীতার বনবাস

(৫৪) "একদিবস, রামচন্দ্র জানকী সমীপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, প্রতীহারী আসিয়া বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া, অষ্টাবক্র মুনি আসিয়াছেন। রাম ও জানকী শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তাঁহাকে ত্বরায় এই স্থানে আন। প্রতীহারী, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থানপূর্বক পুনর্বার অষ্টাবক্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অষ্টাবক্র দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাম ও জানকী প্রণাম করিয়া বসিতে আদান প্রদান করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে, রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গ কুশল? তাঁহার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে, সীতাও জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার গুরুজন ও আর্যা সকলে কুশলে আছেন? তাঁহারা আমাদিগকে মনে করেন, না একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন।" (পৃঃ ২৮)

(৫৫) "লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া বলিলেন, আর্য্যে! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এইরূপ ভাবিয়া ম্লান বদনে বলিলেন হা নাথ। এই পর্য্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল, রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, অয়ি বিয়োগ কাতরে। এই চিত্রপট বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য। চিত্র দর্শনে চিরাতীত জনস্থান বৃত্তান্ত বর্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দুরাচার মারীচ, হিরন্ময় মৃগের আকৃতি ধারণ করিয়া, যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈরনির্যাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতি পথে অরূঢ় হইলে মর্মবেদনা প্রমাদ করে। এই ঘটনার পর, আর্য্য, মানব সমাগম শূন্য জনস্থান ভূভাগে, বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতর ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত হইলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিকীর্ণ হইয়া যায়।" (পৃঃ ৩৪)

(৫৬) "রামের বাক্য........পরম সুখে আছি।" (পৃঃ ৩৯)

(৫৭) "এই বলিয়া সীতা........করিতে লাগিলেন।" (পৃঃ ৫৩)

(৫৮) "এ বলিতে বলিতে·· ····মার্জনা করিবেন।" (পৃঃ ৬৪-৬৫)

(৫৯) "মহর্ষি কুশ ······শিষ্য।" (পৃঃ ৮৮)

(৬০) "কৌশল্যার········অবাক হইয়া রহিল।" (পৃঃ ৯৯)

(৬১) "জননীর তাদৃশ···· ···করিয়াছেন।" (পৃঃ ১০৮)

৯। সংকল্প ও স্বদেশ

(৬২) "সংসারে বসাই····· মনে মনে।" (পৃঃ ১৬-১৭)

(৬৩) "হে রাজেন্দ্র ······মহীয়ান।" (পৃঃ ৩১)

(৬৪) "আমি ভালবাসি····· মরণে।" (পৃঃ ৩৭)

(৬৫) "মুক্ত করো · ····বন্ধনহীন করি।" (পৃঃ ৪৩)

(৬৬) "এ জীবন সূর্য ······এ শুধু স্বপন।" (পৃঃ ৫১)

(৬৭) "কারে দিব········অশ্রুজল।" (পৃঃ ৬৩)

(৬৮) "হে ভারত,········সে মন্ত্র তব।" (পৃঃ ৬৮-৬৯)

(৬৯) আমরা·····জগতে।" (পৃঃ ৯৭)

(৭০) "হে ভারত রত·······সম্মুখে।" (পৃঃ ৯৭)

(৭১) "নব বৎসরে·······তোমার দীক্ষা।" (পৃঃ ১১৪-১৫)

১০। কুরুপাণ্ডব

(৭২) "ভীমসেন রাক্ষসকে·········ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।" (পৃঃ ২১)

(৭৩) "রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া········মোচন করা উচিত।" (পৃঃ ৫৩)

(৭৪) "কুরুসভা ভঙ্গ হইবে · ····হইবে। (পৃঃ ৭৮-৭৯)

(৭৫) "কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ·······সিদ্ধ হইবে।" (পৃঃ ৯৮)

(৭৬) "স্নেহভাজন·······আমার উপদেশ।" (পৃঃ ৯৯)

(৭৭) "ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন ···· শক্তি নাই।" (পৃঃ ১০২-১০৩)

(৭৮) "এইরূপ কথোপকথনে······উপদেশ করি নাই।" (পৃঃ ১১৬)

(৭৯) "একমাত্র কর্ণ······প্রয়োগ কর। (পৃঃ ১২৭)

(৮০) "ইতিমধ্যে কর্ণ চেতনা লাভ········কী হইবে।" (পৃঃ ১৩৭)

(৮১) "তখন রাজা দুর্যোধন·······দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে।" (পৃঃ ১৪০-৪১)

(৮২) "এই সময়ে কতকগুলি ব্যাধ········অনুগমন করিলেন।" (পৃঃ ১৪৫)

(৮৩) (পৃঃ ১৪৬)

(৮৪) "তখন রাজা দুর্যোধন······ সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।" (পৃঃ ১৪৬-৪৭)

(৮৫) "ভীমসেনের এই অভিনন্দন····রাজ্যদানের প্রতিজ্ঞা করিলেন।" (পৃঃ ১৪৯)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভাবার্থ লিখন (Substance-Writing)

সারসংক্ষেপ ও ভাবার্থ লিখন এক বস্তু নহে। 'সারসংক্ষেপ' অর্থে সাধারণতঃ কোন একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত প্রকাশকেই বুঝায়। সুতরাং ইহাতে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় অংশই প্রকাশ করিলে চলে ; কিন্তু 'ভাবার্থ লিখন' করিবার সময় বিষয়টি ভালভাবে পড়িয়া উহার মধ্যে যে মূল ভাব নিহিত থাকে তাহা অধিগত করিয়া, সেই ভাবটিকেই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হয়। রচনা বর্ণনামূলক ও ভাবগর্ভ হইতে পারে। বর্ণনামূলক রচনা হইতে সারবস্তু আবিষ্কার করা অতি সহজ কিন্তু ভাবগর্ভ রচনার সারমর্ম লেখা কঠিন। সুতরাং ভাবগর্ভ রচনাকে একাধিকবার পড়িয়া বিষয়টি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিলে আসল বক্তব্যটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

অনেক সময় এইরূপ দেখা যায় যে, ভাবার্থ লিখন করিতে গিয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী কেবল সংক্ষেপকরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মূলভাবটিকেও বাদ দেয়। ইহা পরীক্ষায় বিশেষ বিপদজনক। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য কতকগুলি ভাবার্থ লিখনের নমুনা দেওয়া হইল :

গল্পে উপনিষৎ

"উমার কৃপায় ইন্দ্রের নয়নে অপূর্ব জ্ঞান-বিভা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে··· ···তাঁহারা বিজয় লাভ করিয়াছেন।" (দেবগণের ব্রহ্মদর্শন—পৃঃ ২১)

ভাবার্থ লিখন : নিরাকার ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। তিনি একধারে যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি আবার বৃহৎ। তিনিই এই বিশ্বসৃষ্টির স্থিতি ও লয়। তিনিই মহাজ্ঞান বা পরমাত্মা। তিনিই একমাত্র প্রকাশ এবং তাঁহার শক্তিতেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই শক্তিমান।

"গুরু গৌতমের শিষ্য সত্যকাম······বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না !" (ব্রহ্মচারী সত্যকাম—পৃঃ ৩৬)

ভাবার্থ লিখন : গুরুই শুদ্ধবান শিষ্যের আসল শিক্ষাদাতা। গুরুর নিকট হইতে যে শিক্ষালাভ করা যায়, তাহা যেমন উৎকৃষ্ট তেমনই ফলপ্রদ। গুরুই একমাত্র তাঁহার অনুভূত বিদ্যার দ্বারা সত্যের সন্ধান দিতে পারেন। দেবতাগণের উপদিষ্ট জ্ঞানও ততক্ষণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, যতক্ষণ গুরুর নিকট তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত না হয়।

"নচিকেতা যমের মুখে সমস্ত শুনিলেন···ত্রিভুবনে অমর হইয়া গেল।"
(নচিকেতা—পৃঃ ৫৪)

ভাবার্থ লিখন ঃ কোন বিষয়ের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা, মনোযোগ ও আগ্রহ না থাকিলে এ জগতে মানুষ কোন বিদ্যাই আয়ত্ত করিতে পারে না এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য এই সমস্ত গুণগুলি যে মানুষের মধ্যে অধিকমাত্রায় বিদ্যমান থাকে তিনিই আপন কৃতবিদ্যার দ্বারা এ জগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারেন।

"আর কতদূর ?······লয় পাইতেছে।" (ভৃগুর তপস্যা—পৃঃ ৬৯-৭০)

ভাবার্থ লিখন ঃ সাধক তখনই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে, সত্যকারের ব্রহ্মার স্বরূপ জানিতে পারে, যখন তাহার অন্তরে জ্ঞানের আলোক প্রদীপ্ত হয়। যাহার দ্বারা বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ হয় তাহাই ব্রহ্ম। অন্তর্লোক নব চেতনার আলোক উদ্ভাসিত হওয়ার নামই ব্রহ্মোপলব্ধি।

"জনক-রাজার পুরোহিত ···শান্ত হইয়া গেল।"
(যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী—পৃঃ ৭৫)

ভাবার্থ লিখন ঃ সকল প্রকার রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন, তিনিই সত্যকারের ব্রহ্মকে জানিয়াছেন এবং তিনিই আসল ব্রহ্মিষ্ঠ। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন তিনি স্বতঃ, তমঃ, রজ প্রভৃতি গুণের অধিকারী। এবং তাহার দ্বারাই তিনি সকলের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন। নিজ গুণের দ্বারা তিনিই আত্ম-অহংকারী, দুর্বিনীত পাণ্ডিত্যাভিমানী মানুষকে শিক্ষাদান করিতে পারেন।

"রাজার সেবা ও বিনয়······রাজকার্যে চলিয়া গেলেন।"
(বৈশ্বানরপুরুষ—পৃঃ ১২৬-১২৭)

ভাবার্থ লিখন ঃ উপযুক্ত বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান করিলে সেই বিদ্যা প্রসারলাভ করে ও তাহার দ্বারা জগতের মঙ্গল হয়। তাই কোন বিদ্বান ব্যক্তি আপন অধিগত গূঢ় বিদ্যা জ্ঞান-পিপাসু আগ্রহশীল বিদ্যার্থীকে দান করিতে কখনই কুণ্ঠাবোধ করেন না। তিনি সানন্দে তাহা দান করিয়া ও তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার আরও বাড়াইয়া তোলেন। অতএব শ্রেষ্ঠ বিদ্যা যতই দান করা যায় ততই তাহা প্রসারিত হয় ও সার্থকতা লাভ করে।

রামায়ণী কথা

"মনুষ্যের সুদৃশ্য দেহ জরাবশীভূত······নিশ্চয়তা নাই।"
(রামচন্দ্র—পৃঃ ৩১)

ভাবার্থ লিখন ঃ জরা-ব্যাধি-মৃত্যু প্রভৃতি মানুষের জীবনে ঘটিবেই। মানুষ কখনই এইগুলির হাত হইতে রক্ষা পায় না। মৃত্যু যখন জন্মের সহিত একই সূত্রে

গ্রথিত তখন মৃত্যুকে ভয় করিলে চলে না—তাহাকে মানিয়া লইতেই হইবে। এই অনিত্য জীবনে মানুষ নানা আত্মীয়তা ও স্নেহের বন্ধনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আবদ্ধ হয়। তাই মৃত্যুর দ্বারা সংঘটিত চির-বিরহকে অস্বীকার করা চলে না।

"রামের চরিত্র কিছু জটিল……তাঁহার চরিত্র দর্শনীয়।"

(রামচন্দ্র—পৃঃ ৫৯)

ভাবার্থ লিখন ঃ রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রগুলির তুলনায় রাম-চরিত্র অপেক্ষাকৃত জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার কারণ, কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে রাম চরিত্র বহুমুখী। কিন্তু ভরত, লক্ষ্মণ এবং সীতা প্রভৃতির চরিত্রগুলি একমুখী। সেইজন্য কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে রাম চরিত্রের আশ্রয়েই অন্যান্য চরিত্রগুলির পুষ্টি ও বিকাশ সাধন হইয়াছে। এই বহুমুখীতার জন্যই রামায়ণ মহাকাব্যে রাম চরিত্র অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় বৈচিত্রপূর্ণ ও লক্ষ্যণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

"অরণ্য-জীবনের যাহা কিছু কঠোরতা তাহার সমধিক ভাগ লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল……নিজসত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।"

(লক্ষ্মণ পৃঃ ৭৭-৭৮)

ভাবার্থ লিখন ঃ মৌন সন্ন্যাসীর মতই লক্ষ্মণ অক্লেশে রামচন্দ্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আরণ্যক জীবনের যত কিছু কঠোরতা তিনিই সহ্য করিয়াছেন। বনবাসকালে তিনি আপন সুখ বিসর্জন দিয়া রামচন্দ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণের জন্যই রামচন্দ্রের কোনরূপ কায়িক শ্রম করিতে হয় নাই। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রভু জ্ঞান করিয়া সেবকরূপে আপন সত্তা হারাইয়া ভ্রাতার সেবা করিয়া গিয়াছেন।

"রামকে ছাড়িয়া……হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।"

(দশরথ—পৃঃ ৬-৭)

ভাবার্থ লিখন ঃ সত্যবদ্ধ হইয়া সত্যরক্ষা না করার মত অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আবার সত্যভঙ্গ করা দশরথের মত মানী ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু তুল্য অপমান। কিন্তু সত্যরক্ষার জন্য বিনা কারণে চিরানুগত স্নেহভাজন প্রিয়তম পুত্রকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া বনে প্রেরণ করা তাঁহার পক্ষে হৃদয়বিদারক কার্য। এই মানসিক দ্বন্দ্ব দশরথকে বিহ্বল ও ব্যথিত করিয়া তুলিল।

"রামকে লইয়া রথ গিয়াছিল……সজলচক্ষে প্রশ্ন করিল।"

(দশরথ পৃঃ ১২)

ভাবার্থ লিখন: রাম অযোধ্যা নগরীর প্রাণ স্বরূপ। তিনিই অযোধ্যা নগরীর সব কিছুর উৎস ছিলেন। তাই তাঁহার বিরহে অযোধ্যাবাসী বেদনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত প্রাকৃতিক শোভাও যেন অন্তর্হিত হইয়াছে।

"সীতাকে আমরা তাপসপত্নীগণের নিকট…………ভীতিদায়ক হইয়া উঠিলেন।"

(সীতা পৃঃ ১১৭-১৮)

ভাবার্থ লিখন: কোমলা, লজ্জাশীলা ব্রততী এক নারী—ইহাই সীতার একমাত্র পরিচয় নহে। সতী-সাধ্বী ও তেজস্বিনী নারী রূপেও তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি। অমিত তেজ মহাবীর অসুর, যাহার ভয়ে জগৎ ভীত হয় সেই রাবণও এক সময় সতীর নিকট ঐশ্বর্য ও শক্তির গর্ব করিতে গিয়া তাঁহার তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া ভীত হইয়া উঠিলেন।

কুরুপাণ্ডব

"প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভীষ্ম ব্রাহ্মণের…পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণ করিব।"

(পৃঃ ৬৭-৬৮)

ভাবার্থ লিখন: ব্রাহ্মণের কথা পাণ্ডবদের কুশলবার্তা লাভ করিয়া এবং পাণ্ডবেরা যে সন্ধির প্রার্থনা জানাইয়াছেন সে-কথা শুনিয়া প্রাজ্ঞ সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডবদের রাজ্যধিকার যে যুক্তিসঙ্গত সে-কথাও তিনি বলিলেন। ভীষ্মের বাক্য সমর্থন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রও বলিলেন যে, সন্ধিস্থাপনের জন্য তিনি সঞ্জয়কে প্রেরণ করিবেন।

"অর্জুন কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ……পাপ স্পর্শ করিবে না।"

(পৃঃ ৭৮-৭৯)

ভাবার্থ লিখন: অর্জুন যখন গুরুজন-বধে পরাঙ্মুখ হইয়া কাতরচিত্তে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, কৃষ্ণ তখন তাহাকে ক্ষুদ্র মানবীয় সুখ-দুঃখের কথা ভুলিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, কর্তব্য সম্পাদনের সময় সকল প্রকার কাতরতা বিসর্জন দিয়া, নিঃসংশয়চিত্তে ও স্থিরসংকল্প হইয়া অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, ফলাফল চিন্তা করিতে গেলেই মনে সংশয় আসে এবং সংশয় থাকিলে কোন কর্তব্যই সুসম্পন্ন হয় না।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাতরতা দেখিয়া······নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে।"

(পৃঃ ৯৮)

ভাবার্থ লিখন : অর্জুনের ভীষ্ম-বধের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় অর্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণ সর্বাধিক দুঃখিত হইয়া অর্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষাকল্পে ভীষ্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও আবার কৃষ্ণের যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় দেখিয়া যুধিষ্ঠির উদারচিত্ত ভীষ্মের নিকট হইতে তাঁহার বধের উপায় জানিবার জন্য তাঁহারই শরণাপন্ন হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

"এইরূপ কথোপকথনে······উপদেশ করি নাই।" (পৃঃ ১১৬)

ভাবার্থ লিখন : কৃষ্ণার্জুন পাণ্ডবশিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া সেখানকার সকলকে বিশেষ অভিভূত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং অভিমন্যুকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া তাহার চক্রব্যূহে প্রবেশে বিপদের আশঙ্কা আছে ভাবিয়া তাঁহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন।

"একমাত্র কর্ণ অবিচলিত চিত্তে······এখনই প্রয়োগ করো।"

(পৃঃ ১২৭)

ভাবার্থ লিখন : যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ-ই একাকী রাক্ষসী মায়া নিবারণে সচেষ্ট দেখিয়া রাক্ষসেরা তাঁহার প্রাণবধে তৎপর হইয়া উঠিল। ঘটোৎকচের রণ-কৌশলে যখন সকলে বিপর্যস্ত, তখন অনেকে অর্জুনবধের নিমিত্ত সযত্নে রক্ষিত বাসবস্ত্রটি প্রয়োগ করিবার জন্য কর্ণকে অনুরোধ করিল।

"দ্রোণাচার্য এই দারুণ······বিচেতন প্রায় হইলেন।"

(পৃঃ ১২৯-৩০)

ভাবার্থ লিখন : দ্রোণাচার্য যখন কৌরব-পক্ষে যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডব-পক্ষ ধ্বংস করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণের পরামর্শে ভীমসেন অশ্বত্থামা নামক একটি গজ হত্যা করিয়া দ্রোণের নিকট উক্ত নামধেয় দ্রোণপুত্র হত হইয়াছে বলিলেন। সেই সংবাদ ক্ষণকাল বিষাদগ্রস্ত হইলেও, দ্রোণাচার্য ভীমের কথায় আস্থা স্থাপন না করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যদি দ্রোণাচার্যকে অশ্বত্থামার নিধনবার্তা জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে

দ্রোণ সে-কথা বিশ্বাস করিয়া দুর্বলচিত্ত হইবেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ঐরূপ মিথ্যাভাষণ অসম্ভব বুঝিয়া কৃষ্ণ বলিলেন যে, প্রাণরক্ষার্থে মিথ্যাকথা বলিলে পাপ হয় না। মিথ্যাভাষণে অনভ্যস্ত যুধিষ্ঠির তখন দ্রোণের নিকট যাইয়া 'অশ্বত্থামা হত' বলিলেন বটে, কিন্তু সেই উক্তি-শেষে 'ইতি গজ' শব্দও উচ্চারণ করিলেন। দ্রোণাচার্য সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের শেষোক্তি না শুনিয়াই পুত্রশোকে মূর্ছিত প্রায় হইলেন।

রাজর্ষি

"রাজা কহিলেন······রাজা হইতে হয়।" (রাজর্ষি—পৃঃ ৪০)

ভাবার্থ লিখন ঃ রাজ সিংহাসন ও মুকুট পাইলেই রাজ্যলাভ করা যায় না। সত্যকারের রাজ্য তথা রাজত্বলাভ করা যায় ত্যাগ এবং ভালোবাসার দ্বারা। মানুষের দুঃখ দূর করিতে না পারিলে, মানুষকে আপন বলিয়া ভাবিতে না পারিলে যথার্থ রাজ্যলাভ হয় না। ভোগের মধ্যে কোন ঐশ্বর্য নাই। ভোগের অপর নাম দস্যুতা। প্রচুর রাজভোগে রাজাকেই বধ করা হয়—তাহাতে রাজত্ব মেলে না।

"বিল্বন কহিলেন······আমি যোগ্য নই। (রাজর্ষি—পৃঃ ১১২)

ভাবার্থ লিখন ঃ বিশ্বসংসারে সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার মত আনন্দ ও পরিতৃপ্তি আর কোন কিছু হইতে পাওয়া যায় না। তাই মানুষের সেবা করার মধ্য দিয়াই সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায়। তাই রাজা নিজেকে রাজার অনুপযুক্ত মনে করিলেন।

"রাজা কহিলেন······চৈতন্য হইয়াছে।" (রাজর্ষি—পৃঃ ১৩০)

ভাবার্থ লিখন ঃ সময়ের কাজ সময় মত করিতে না পারিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মানুষ অনেক সময় সময়ের মূল্য দেয় না বলিয়া পরে তাহাকে অনুশোচনা করিতে হয়। সময় বুঝিয়া মানুষ যদি সময়োপযোগী কাজ করে, তাহা হইলে জীবন-পথে চলিতে তাহাকে কোনরূপ বাধা-বিপত্তি সহ্য করিতে হয় না। বিপদের মধ্যে পড়িয়া রাজার তাই চৈতন্যোদয় হইয়াছে।

"রাজা কহিলেন······চলিয়া গেলেন।" (রাজর্ষি—পৃঃ ১৩৭-১৩৮)

ভাবার্থ লিখন ঃ শক্তিমান ও আত্মাভিমানী ব্যক্তি আপনাকে সর্বসাধারণের স্তর হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। কিন্তু সে যদি তাহার অহংকার ও শক্তিমত্তাকে

দূরে সরাইয়া দিয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারে, সাধারণ লোকের মত মান-অপমান, সুখ-দুঃখ সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার নিকট জীবন ও জগৎ সুন্দর ও আনন্দময় হইয়া দেখা দিবে এবং তাহার দ্বারা সে তাহার পরম বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করিবে। তাই রাজা নিজেকে সর্বসাধারণের মধ্যে মিশাইয়া দিয়া জগৎপিতাকে বন্ধু বলিয়া জানিয়াছেন।

"রঘুপতির কাজ শেষ হইয়া গেল। শেষ পর্যন্তই যে·········বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।" (রাজর্ষি—পৃঃ ১৪০-১৪১)

ভাবার্থ লিখন ঃ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মধ্যে কোনরূপ সুখ নাই, কোনরূপ তৃপ্তি নাই। প্রতিহিংসা মানুষের মনকে নানাপ্রকার সংশয় ও বৈকল্যে ভরপুর করিয়া তোলে। পৃথিবীর সকল জিনিসই তাহার নিকট কটু বলিয়া প্রতিভাত হয়। কোন কিছুর মধ্যেই সে আনন্দের বা সুখের সন্ধান পায় না। তাই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া রঘুপতির অন্তর বিষাদ ও অস্থিরতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

"গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া······সন্ন্যাসীও সাজিতে হয় নাই।" (রাজর্ষি—পৃঃ ১৬৭-১৬৮)

ভাবার্থ লিখন ঃ রাজ-বেশ বা সন্ন্যাসী-বেশ গ্রহণ না করা সত্ত্বে গোবিন্দমাণিক্য নিজের মধ্যে যুগপৎ রাজা ও সন্ন্যাসীর রূপ দেখিতে পাইলেন। সব কিছু ত্যাগ করিয়া আসিয়াও তাঁহার যেন মনে হইল, সব কিছুই স্বেচ্ছায় তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাঁহার কারণ, তিনি সকল আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছেন। আবার জীবনের ক্ষুদ্র সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়া বৃহত্তর সংসারের নিকটে আসিয়াছেন বলিয়া তিনি আজ সন্ন্যাসী।

"মহারাজ পূর্বে একা গোমতী তীরে আসিতেন······প্রেমসমুদ্রের পথ দেখিতে পান।" (রাজর্ষি—পৃঃ ২৮-২৯)

ভাবার্থ লিখন ঃ শুধু দিনযাপনের জন্যে নয়, প্রাণধারণের গ্লানিতে ভরা সাংসারিক এই জীবন'। প্রয়োজনের কাছে দাসখত লিখিয়া জড় ক্লৈব্যের ন্যায় জীবনযাপন করা ছাড়া এই জটিল সংসারে টিকিয়া থাকা যায় না। কত শত ভাব-ভাবনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অশান্তি এবং স্বার্থপরতা দৈনন্দিন জীবনের মাধুর্যকে অব্যাহত রাখিতে দেয় না। অক্টোপাশের ন্যায় ইহার আকর্ষণ হইতে মুক্ত রাখিয়া সহজ ও সরল খাতে জীবনকে প্রবাহিত করা শান্তিপ্রিয়, নিরীহ এবং মুমুক্ষু মানুষমাত্রেরই কার্য্য। ইহার আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া উদার-উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া একটু

নিরিবিলিতে বিশ্রাম লইতে চাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। রাজারও তাই কাম্য। প্রকৃতির ধ্যানে সহজ-সরল শিশুর সহিত ক্ষণকালের জন্য অতিবাহিত করিতে রাজা উন্মুখ। তাই লোকালয় হইতে দূরে ধ্রুব নামক শিশুর সান্নিধ্যে ক্ষণকালের মাধুর্য, চিত্তের শান্তি ও নিবিড় মুক্তিলাভ পরমনির্ভর এবং সান্ত্বনাদায়ক।

"রাজা বলিলেন,·········নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন।"

(রাজর্ষি—পৃঃ ১২-১৩)

ভাবার্থ লিখন ঃ বিশ্বাসই দৈবশক্তি। দৈবশক্তি নির্ভরতা কুসংস্কারপ্রসূত মনগড়া বিশ্বাসের বলে গড়িয়া তোলা যায় না। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হইয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট করার নামে পশুবলি দেওয়া নিষ্ঠুর এবং নগণ্য প্রথা। দেবতা কখনও রক্তপাত চাহেন না। দেবতা সব মানুষের প্রতি সমান মমতাসম্পন্ন। দেবতা মানুষের অন্যায়, অসত্য এবং নিষ্ঠুর আচরণের বিরোধী। উহা হইতে মানুষকে মুক্ত করিবার জন্য দেবতা ভক্তদের চিত্তের নিকট স্বীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। হৃদয়ের প্রসারতাই চিত্তে দেবতার উপস্থিতের কথা জানায়। জগন্মাতা মনুষ্য-হৃদয়ে অহিংসা প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া তোলেন এবং চিত্তের গহনে নিবিড় প্রশান্তি স্থৈর্য এবং ধৈর্য আনয়ন করেন। আজন্ম-লালিত মিথ্যা দৈবপ্রীতির পরাকাষ্ঠাকে বিদূরিত করিয়া আত্মানুশীলনে জাগ্রত বিশ্বমাতা সম্পর্কে দেবতা উদার অনুভূতি আনিয়া দেন।

"রঘুপতি চলিয়া গেলে·········কাহারও বন্ধু নহি।" (রাজর্ষি—পৃঃ ৬৭)

ভাবার্থ লিখন ঃ নিস্বার্থপরতা এবং নিরপেক্ষতার দ্বারা পরিচালিত বিচারই হইল সুবিচার। উহাই বিচারের আদর্শ পন্থা। সমষ্টির জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্তই বিচার এবং আইনের প্রয়োজন। সহৃদয় বিচারক কখনও একদেশদর্শী মনোভাব পোষণ করিতে পারেন না। যদি তিনি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হইয়া আপন খেয়াল-খুশি মত বিচার করিতে চান, তাহা হইলে তাহাকে ভ্রান্ত নীতির অনুসারক হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, কখনও অপব্যবহারের দ্বারা দায়িত্ব রক্ষা করা যায় না। দেশবাসীর প্রতি প্রবল সহানুভূতি এবং দেশমাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকিলে বিচারক কখনও ভ্রান্ত আদর্শের অনুসরণ করিতে পারেন না। ঐকান্তিক সমদর্শিতাই বিচারককে নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ এবং সচেতন করিয়া তোলে।

"রাজা কহিলেন·········উত্তর দিয়াছিলেন।" (রাজর্ষি—পৃঃ ৩১-৩২)

ভাবার্থ লিখন ঃ মানুষ আপনার খেয়াল-খুশি মতই শাস্ত্রের জন্ম দিয়াছে।

তাই নানা জনে বিভিন্ন উপায়ে আপন স্বার্থসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া থাকে। শাস্ত্রের দোহাই পাড়িয়া হিংসা এবং রক্তপাতের আশ্রয় লইতেও মানুষ কখনও দ্বিধাবোধ করে না। জিঘাংসা-উদ্দীপক বিধি-বিধান যথার্থ শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম নয়। একশ্রেণীর ভণ্ড, স্বার্থপর, লোভী এবং হিংস্র প্রকৃতির ব্যক্তি নিজেদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারক হিসাবে প্রচার করিতে চায়। উহারা বিকৃত ব্যাখ্যা দেয়, কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয় এবং শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকের কাছেই শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে। রঘুপতির ন্যায় ব্যক্তিরা নিজ স্বার্থসিদ্ধিকল্পে দেবতার আদেশের নাম করিয়া অন্যায়, অসত্য এবং ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। ধর্মের নামাবলী পরিয়া, বহুজনের উদার চিত্তকেও ইহারা বীভৎসতা দান করে। দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, ঔদার্য এবং মহত্ব ইহাদের অন্তরকে আলোড়িত করে না। সুতরাং এই সব লোকদের বিরুদ্ধবাদী মতকে ধ্বংস করিয়া, শাস্ত্র সম্বন্ধে সর্বদা উদার চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়াই হইল শাস্ত্রপালনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

কাব্য-মঞ্জুষা

"সেই আদিযুগে যবে অসহায় নর
নেত্র মেলি ভবে,

* * *

সে নহে বন্দনাগীতি, ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত
খুঁজিছে স্বজন।" (মানব বন্দনা—পৃঃ ৭৭)

ভাবার্থ লিখনঃ অতীতকালে ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ প্রভৃত প্রাকৃতিক দুর্দৈব অসহায় মানুষকে ভীত এবং সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিপদভঞ্জন কল্পে মানুষ দৈবপ্রীতি যাচ্ঞা করিয়াছে। কার্যক্ষেত্রে দৈব নহে, মানুষ নিজেই আপনাকে সবলতর করিয়া তুলিয়াছে। সুগভীর বিশ্বাস দৈবপ্রীতির পশ্চাতে থাকিলেও আপন কৃতকর্মের সুফলই মানুষকে তাহার নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। পরিণতিতে উহা মানব-মনে সুগভীর আত্মবিশ্বাস, দৃপ্ত পৌরুষ এবং জীবনানন্দকে উপলব্ধির অদম্য আকাঙ্ক্ষা আনয়ন করিয়াছে। চলা পথের সফলতা মানুষকে গভীরতর উপলব্ধি দিয়াছে। মানুষ নিজেই নিজের আপন ভাগ্য নিয়ন্তা। তাই সমাজবদ্ধ মানুষের সহায় একমাত্র দেবতাই নয়, মানুষই মানুষের শ্রেষ্ঠ সহায়।

"কিয়ে মানুষ পশু পাখী কুলে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।

* * *

তিল এক দেহ দীনবন্ধু।" (পৃঃ ১)

ভাবার্থ লিখন ঃ ভগবান এ-জগতের স্রষ্টা। তিনিই ইহার প্রভু এবং রক্ষাকর্তা। ভগবানের চরণতলই হইল ভক্তের একমাত্র পরম নির্ভর স্থল। ভক্ত আপন কৃতকর্মের জন্য জন্মান্তর লাভ করে। এক জন্মের কর্মফল অপর জন্মে লাভ করিতে হয়, ভগবানের ইহাই বিধান। ইহাকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তের মানিয়া লওয়া উচিত। তাই সে পরজন্মে যে জীব হইয়াই জন্মলাভ করুক না কেন, সর্বদা ভগবানের প্রতি যেন তাহার ভক্তি থাকে। ইহাই ঐকান্তিক ভক্তি। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি নিজেও সব সময় ভগবানের প্রতি অবিচল ভক্তি এবং নিষ্ঠা রাখিবেন। ত্রিতাপ দুঃখে সমাচ্ছন্ন এ-জগতের মায়া কবি কাটাইতে চাহেন। পরম নির্ভর ভগবানই তাঁহাকে সে উপায় নির্দেশ করিবেন। কারণ, তিনিই স্বয়ং দীনের নাথ। সব ভক্তের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি এবং সম-অনুরাগ।

"সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে

* * *

যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।" (জীবনসংগীত—পৃঃ ৫২-৫৩)

ভাবার্থ লিখন ঃ এ কর্মসংসার একটি বিশাল সমরক্ষেত্র। এখানে প্রতিনিয়ত বাধা-বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সংগ্রাম করিয়াই বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদলাভ করা যায়। মহাজ্ঞনী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান প্রভৃতি ব্যক্তিরাও এই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। কর্তব্যকর্মের সফলতাই তাঁহাদের গৌরবদান করিয়াছে। তাঁহাদের জীবনই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ বাণী। তাঁহাদের জীবনের আচরিত আদর্শই একান্ত নির্ভর এবং অনুসরণ যোগ্য। উহার সার্থক ব্যবহার আমাদের জীবনেও ঐশ্বর্যদান করিবে। ভবিষ্যৎকালের দরবারে আমাদের অনুসৃত আদর্শ অক্ষয় মহিমা অর্জন করিবে। উত্তর-সাধকরা ইহার সুফল লক্ষ্য করিয়া, সর্বতোভাবে ইহাকে তাঁহাদের নিজেদের কর্তব্যকর্ম সাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইবেন।

"চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত রস-ঋষি দ্বৈপায়ন,

* *

মহাভারতের কথা অমৃত সমান

হে কাশী ! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্ ।”

(কাশীরাম দাস—পৃঃ ৩৪)

ভাবার্থ লিখন : ভগীরথ স্ববংশের উদ্ধারসাধন-কল্পে জটাশ্রয়ী সুরধুনীকে তপস্যাবলে মর্ত্যভূমিতে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন। বাঙালী কবি কাশীরাম দাসও তদ্রূপ কৃতিত্ব ও দক্ষতা বলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারত মহাকাব্যের অমৃতনিষ্যন্দী রূপকে বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে বঙ্গবাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তপস্বী ভগীরথের ন্যায় কাশীরাম দাসের অলোক সামান্য মাহাত্ম্য সমষ্টি কল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছিল। একারণেই কবি কাশীরামের কথা বাঙালী কখনও বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না।

“আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্‌দিগন্ত ঢাকি ;

* * *

আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হ'তে
অপূর্ব আশা বহি।” (খাঁচার পাখী—পৃঃ ৭৯)

ভাবার্থ লিখন : পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় পরাধীন জাতির জীবন। অত্যাচার-অবিচারে জর্জরিত দুঃখের অমারাত্রি পরাধীন জাতির জীবনে মুহুর্মুহু বেদনাবোধ সঞ্চারিত করে। এই বেদনার অবসান ঘটাইয়া সুখ-স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন অত্যুজ্জ্বল আশার পূর্ণপ্রকাশ ভুক্তভোগী মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত। সুগভীর জীবনানন্দ উপভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সকলেরই আছে। তাই সে আশার পূর্ণায়ত বিকাশ স্বাভাবিক ঘটনা।

“সবচেয়ে যে ছোট পিঁড়িখানি
সেইখানে আর কেউ রাখে না পেতে ;

* * *

সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।”

(ছিন্নমুকুল—পৃঃ ১১৭-১১৮)

ভাবার্থ লিখন : জীবিত অবস্থায় সংসারের সবচেয়ে ছোট যে শিশু তাহার উপস্থিতিকে তত বেশী করিয়া দেখা হয় না। কিন্তু যখন তাহার মৃত্যু হয়, তখন সংসারের সর্বত্রই তাহার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাহার শৈশব-চাপল্য, অশান্ত চিত্ত ও কর্মমুখর রূপটির উপর যবনিকা পড়িলে তাহার অনুপস্থিতি এক অপরিসীম বেদনার উদ্রেক করে। সর্বত্রই এক অনাকাঙ্ক্ষিত শূন্যতা বিরাজ করে। সামান্যতেই সুখী সেই শিশু মৃত্যুর পর স্মৃতির রাজ্যে অসামান্যের বেশে উপস্থিত হয়। তাহার ছোট

মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব-অভিযোগগুলি তখন বৃহত্তররূপ লইয়া দেখা দেয়। ইহার মূলে রহিয়াছে একমাত্র গভীর স্নেহ। কারণ, স্নেহ দূরকে নিকট এবং পরকে আপন করিয়া তোলে। স্নেহের অভাবে এই জগৎ-সংসারে টিকিয়া থাকা অসার বলিয়া মনে হয়।

চরিত-কথা

"অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট……সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—পৃঃ ৩)

ভাবার্থ লিখন: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণ বাঙালী সমাজে বিদ্যাসাগরের ন্যায় অনন্যসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব অস্বাভাবিক ঘটনা। তাঁহার ন্যায় অলোকসামান্য প্রতিভার স্বরূপ নিরূপণ করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সামান্য দৃষ্টিতে যাহা চোখে পড়ে না, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই নূতন উপলব্ধি আনিয়া দেয়। বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়া, তাঁহার ব্যক্তিস্বরূপকে চিনিতে গেলেও একই অনুভব বর্তমান থাকা বাঞ্ছনীয়। ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যে বড়োর বড়ত্ব যেমন স্পষ্টরূপ লইয়া ধরা পড়ে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন-কাহিনীও আমাদের নিকট তদ্রূপভাবে উপস্থিত হয়।

"এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন,……তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।" (পৃঃ ২৭)

ভাবার্থ লিখন: নভেল জীবন-নির্ভর সাহিত্য। নভেল রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা জনের নানা মত বর্তমান। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল সম্পর্কে বহু পাঠকের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব প্রকাশ পায়। আপাত-বিরোধী অনুভূতির দ্বন্দ্ব কিংবা পাপ-পুণ্যের মানদণ্ডে উপন্যাসকে বিচার করিতে গেলে সংকীর্ণ মনোভাব দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, উহাই নভেল বিচারের সর্বোত্তম পন্থা নয়। নভেল বিশ্লেষণকে স্বীকার করে, কিন্তু সৌন্দর্য বিরহিত অসংলগ্নতাকে সে মানিতে চায় না। কারণ নভেলও এক শ্রেণীর কাব্য। সৌন্দর্য-সৃষ্টি সার্থক না হইলে কাব্য সার্থক হয় না।

"যুগধর্ম সংস্থাপনের জন্য যিনি………তখন সেই মহাস্বপ্নভাঙ্গা দিনে যে আধ-সত্য সত্যের সমুদ্রমাঝে হয়ে যাবে লীন।" (পৃঃ ৪০-৪১)

ভাবার্থ লিখন: গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, অন্যায়, অসত্য ও অবিচার রোধকল্পে তিনি এ মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূত হইবেন। গীতায় অভিহিত ভগবানের এই স্বরূপকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে বৈষ্ণব সাধনায় ভগবানের আনন্দরূপ বিবৃত হইয়াছে। উহার প্রভাবে বাঙালী

সর্বশক্তির নিয়ন্তা, জগৎ ও জীবনের স্রষ্টা, ঈশ্বরের সর্বাতিশয়ী শক্তির যথার্থ রূপকে ভুলিয়া যাইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উহার যথার্থ ব্যাখ্যা পাঠকদের দরবারে পৌঁছাইয়া দিয়া ঈশ্বরের পূর্ণরূপ ও ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করিয়া তুলেন। জগৎ ও জীবনের নিয়ন্তা ঈশ্বর সম্পর্কে পূর্ণোপলব্ধির উৎসধারা খুলিয়া দিয়া তিনি দেশীয় জনগণের মহতী উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ববলে ঈশ্বর সম্পর্কে অখণ্ড ও অবিমিশ্র সত্যবোধ আমাদের চেতনায় ধরা পড়িয়াছে।

"কিন্তু মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 'মানুষ অতি দুর্বল জীব······ কেবলই চেষ্টা করিতেই হয়।" (পৃঃ ২৯)

ভাবার্থ লিখন ঃ স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতা-বোধে উদ্দীপিত মানুষ সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে। সর্বনাশ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য মানুষ ধর্মবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। একাধারে লোকস্থিতি, অন্যদিকে সমাজ-সংহতি রক্ষা করিয়া ধর্ম প্রতিটি সামাজিক মানুষের মনের গহনে উদার অনুভব আনয়ন করিয়াছে। আত্মরক্ষা এবং বংশবৃদ্ধির উর্ধ্বে জীবনের যে ছন্দ ও মাধুর্য আছে, ধর্ম তাহাই জ্ঞাপন করে। সেজন্য ধর্মবুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ সমাজের যথেষ্ট হিতসাধন করিয়া থাকে। নিজ ক্ষমতা-নৈপুণ্য ছাড়াও ধর্মবুদ্ধি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিকত্ব বজায় রাখিয়া থাকে। উহার ফলে ধর্মবুদ্ধি স্বতন্ত্র মহিমালাভ করিয়া মানব-মনে সুগভীর নৈতিক দায়িত্ববোধ আনিয়া দেয়।

"সেই সনাতন ধর্মের প্রকোষ্ঠ হইতে সাহিত্যকে নির্বাসিত করিয়া······ বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই।" (পৃঃ ৪৩-৪৪)

ভাবার্থ লিখন ঃ ধর্মের বৃহত্তর সংজ্ঞা হইল কোন কিছু ধারণ করা। নিরালম্ব, নির্বস্তু কিংবা অসার সামগ্রীকে ধারণ করিবার কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না। ধর্ম অখণ্ড ও অচিন্ত্যনীয় এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত সমস্ত কিছুকে একান্ত নির্ভরশীল করিয়া চিন্তা করিবার মূলেও উহা রহিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ইহার অন্যথা হয় না। তাই সাহিত্যকে ধর্ম-বিগর্হিত সামগ্রী হিসাবে গণ্য করা অনুচিত। ধর্ম লোকস্থিতি নির্ভর, চিত্তের স্ফূর্তি এবং প্রশান্তির সহায়ক। উদ্দেশ্যগত দিক হইতে সাহিত্যের লক্ষ্যও অনেকটা সেইরূপ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিনটি কাল। ইহার একটি অতিক্রান্ত, অন্যটি আগত, অপরটি অনাগত। এই তিনটি কালপ্রবাহকে সাহিত্য সেতুর ন্যায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ধর্মও যেমন সময়ের গতি অস্বীকার করে না, তেমনি সাহিত্যও নহে। তাই সাহিত্য ধর্মেরই একটি শাখা। সুতরাং ইহার একটির সহিত অপরটির অনন্তনির্ভর সম্পর্ক বর্তমান।

"মনুষ্যের ভাষার সহিত মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালীর অচ্ছেদ্য···সমালোচনার বিষয়।" (পৃষ্ঠা ৬৫)

ভাবার্থ লিখন: ভাষা মনের ভাবপ্রকাশের বাহন। আর চিন্তা হইল মানবমনের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল উপাদান। এই দুইটির মধ্যে কতটুকু নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা লইয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে আপাতবিরোধী ধারণা বর্তমান। এরূপ একটি জটিল বিষয়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর যথেষ্ট অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমসাপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এবম্বিধ কর্মনৈপুণ্য তাঁহাকে ভাষাতাত্ত্বিকদের সমাজে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার ন্যায় ভাষাতাত্ত্বিকের যশ এবং প্রতিপত্তির সত্যাসত্যতা নির্ধারণ প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না। নিঃসন্দেহাতীত চিত্তে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইতে হয় এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এতটুকু দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

"বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনে ও জগদ্বিধানের এই সমস্যা······আর উহা চলিতে লাগিল,—তাহার পর উহা থামে নাই।" (পৃঃ ৩১)

ভাবার্থ লিখন: বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যের সব্যসাচী। বাঙলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখাই তাঁহার অবদানে উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে নন, অগ্রগামী চিন্তাশীল হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব জাতীয় জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। একারণে তাঁহার প্রদর্শিত পথে বাঙলা সাহিত্যের গতি নির্ধারিত হইয়াছে। সর্বতোভাবে বাঙলা সাহিত্যকে গচলতা দান করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আপন প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। একারণে বঙ্কিম-প্রভাব বিবর্জিত বাঙলা সাহিত্যের কথা আমাদের চিন্তায় আসে না।

"বৈদেশিকের সহিত········এই দর্প ঠিক সেই দর্প" (পৃঃ ৯)

ভাবার্থ লিখন: প্রকৃত দেশপ্রেমিক নিজ দেশের মৌলিক আচার-ব্যবহারকে অস্বীকার কিংবা অশ্রদ্ধা করিতে পারে না। ঈশ্বরচন্দ্র প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন। তাই নিজের দেশের আচার-ব্যবহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের ক্ষেত্রে তিনি এতটুকুও দ্বিধাজড়িত বা অশ্রদ্ধামিশ্রিত মনোভঙ্গির আশ্রয় লইতেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরানুকরণ ও পরজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল তখন দেশীয় জনসাধারণ নিজের দেশের প্রথাকে বিদ্রূপ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। উদার-হৃদয় ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু সেদিনও প্রকৃত বাঙালীআনা বজায় রাখিবার নিমিত্ত

তৎপর ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা সেদিনও বর্তমান ছিল। অন্যের ভ্রান্ত পন্থানুসরণের দিকে তাকাইয়া তিনি আপন জন্মভূমিকে আরও ঐকান্তিকভাবে ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হৃদয়প্রাবল্যে এবং স্বদেশপ্রীতির স্বতোৎসারিত আবেগ তিনি কখনও নিজ দেশের মৌলিক পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারের মূল্যকে খর্ব করিবার চেষ্টা করেন নাই।

কমলাকান্ত

"কিন্তু বারেক মাত্র……এত মধুর বোধ হইল।" (পৃঃ ৪-৫)

ভাবার্থ লিখনঃ যৌবনকাল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তখন মনের প্রসারতা ও প্রফুল্লতা অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকে। তাই যৌবন বিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে বার্ধক্য ও মানসিক বৈকল্য আসিয়া জমা হয়। সেইজন্য কোন বস্তু যৌবন-স্মৃতিসূচক হইলে জরাজীর্ণ-বার্ধক্যেও মানুষ তাহা হইতে আনন্দলাভ করিতে পারে।

"রাগ করিও না………সেদিন আসিবে কেন।" (পৃঃ ২৫-২৬)

ভাবার্থ লিখনঃ এ জগতে মানুষের সুখের সময় বন্ধুর অভাব হয় না। যাহারা মানুষের সুখের সময়ের বন্ধু, তাহারা কিন্তু আপন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্যই বন্ধুত্ব করে। তাই এ জগতে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র বিপদের সময়। যে প্রকৃত বন্ধু হয়, সে সুখে-দুঃখে সব সময়েই তাহার বন্ধুর সঙ্গে থাকিয়া, তাহার সুখ-দুঃখের সমান ভাগ লইয়া থাকে। তাই স্বার্থপর লোকদিগকে বসন্তের কোকিলের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

"তোমাদের কথা……হইতে পারে না।" (পৃঃ ২৩-২৪)

ভাবার্থ লিখনঃ কেবল নিজের উদরপূর্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করিলেই হয় না—অন্যের কথাও ভাবা উচিত। আপনার সুখের সঙ্গে অন্যের সুখের কথা ভাবিলে তবেই প্রকৃত সুখের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহাতে উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়।

"অকস্মাৎ কালের স্রোত………এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।"

(পৃঃ ৩৬-৩৭)

ভাবার্থ লিখনঃ মাতৃরূপা দেবীকে পূজা করিবার জন্য তাঁহাকে অন্ধের মতই অজ্ঞানতার অন্ধকারে খুঁজিয়া ফিরিতেছি। এই দেশমাতৃকাই মাতৃরূপা দেবী।

তাই তাঁহার পূজা করিতে পারিলেই দেবীর্চনার সার্থকতা লাভ করা যায়। দেশমাতা জননী-জন্মভূমির মধ্য দিয়াই সকল দেব-দেবীর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

"আমি চোর বটে·········কে হইবে ?" (পৃঃ ৪১-৪২)

ভাবার্থ লিখন ঃ দরিদ্রের দুঃখভোগে কেহ কাতর হয় না। কিন্তু বিত্তশালী ব্যক্তি তাহারি চাইতেও বিত্তবানের দুঃখে দুঃখিত হয়। এমতাবস্থায় অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যদি চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করে তাহার জন্য দায়ী হইবে ঐ সমস্ত বিত্তবানেরা। কারণ তাহারা ধনাহরণের জন্য কত লোককে ধনভোগ হইতে বঞ্চিত করে। কিন্তু তাহার জন্য দরিদ্রকে তাহারা কোনরূপ প্রতিদান করে না।

"তোমাদের মধ্যে·········করিতে বসিয়াছ।" (পৃঃ ৫০-৬০)

ভাবার্থ লিখন ঃ এ জগতে সকলেই আপন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। যাহারি দ্বারা কাজ হাঁসিল করা যাইবে, তাহার নিকট সকলেই নানা সূত্রে আপন আপন অভাব-অনটনের কথা ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। পেশাদার-অপেশাদার, উচ্চ-নীচ প্রভৃতি সকলেই এইভাবে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া চলিয়াছে এবং এই ঘ্যান্ ঘ্যানানির বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

"কোকিল তুমি প্রকৃতির······বলেন, কি না ?" (পৃঃ ২৭-২৮)

ভাবার্থ লিখন ঃ এই বিশ্বসংসারে সুখের সহিত যেমন দুঃখ, তেমনি সৌন্দর্যের সহিত কদর্যতাও পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। সেইজন্য এই কদর্যতার সুষ্ঠু প্রতিকার হওয়া দরকার এবং তাহার দ্বারাই দুষ্ট লোককে শিক্ষা দেওয়া যায়। এমতাবস্থায় অপ্রিয় সত্যেরও মাঝে মাঝে দরকার হয়—কেবলমাত্র চিৎকার করিলেই হয় না।

"আর আমাদিগের দশা দেখ·········কেহ আইসে নাই।" (পৃঃ ৪৩)

ভাবার্থ লিখন ঃ খাইতে না পাইলে লোকে শেষ পর্যন্ত চুরি করিতে বাধ্য হয়। আর তাহার জন্য চোরের শাস্তি বিধানও করা হয়। কিন্তু যে ধনবানের ধন হইতে চোর চুরি করে চোরের তাহা তো ন্যায্য পাওনা। কারণ কৃপণ ধনী তাহার ধন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া বহু দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়াছে। ধনী ব্যক্তি যদি তাহার উদ্বৃত্ত আহার্য দরিদ্রকে দিতে কার্পণ্য না করিত, তাহা হইলে কেহ তাহার ধন চুরি করিত না। তাই চোরের শাস্তি হওয়ার পূর্বে নির্দয়তার শাস্তি হওয়া উচিত।

সীতার বনবাস

"তৎপরে অযোধ্যা প্রবেশকালীন……সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।"

(পৃঃ ৩২ প্রথম পরিচ্ছেদ)

ভাবার্থ লিখন ঃ আলেখ্য দর্শনে রত রামচন্দ্র সীতাকে অনেকগুলি দৃশ্য দেখাইয়া প্রতিটি দৃশ্যের তাৎপর্যও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নব বিবাহিত অযোধ্যার যুবরাজ রামচন্দ্র আপন স্ত্রীকে লইয়া অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিতেছেন এবং রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলে বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষীদের পূর্বাবস্থার দৃশ্যও রাম সীতাকে দেখাইলেন। মন্থরার ন্যায় কুটিল স্বার্থলোলুপা, অশান্তির উপাসক নারীর চিত্র কোনভাবেই ধার্মিক রামচন্দ্র ক্ষমার চোখে দেখিতে পারিলেন না। নিষাতপতির মধুর ব্যবহারের স্মৃতি রামের মনে উদিত হওয়ায় তিনি তাঁহার চিত্রের প্রতি সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। দৃশ্যের দর্পণে সীতার নিকট অতীত স্মৃতিকে অত্যন্ত জীবন্তরূপে উপস্থাপনের জন্যই এ আলেখ্য দর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া। তাই রামচন্দ্র প্রতিটি চিত্রই অত্যন্ত যত্ন এবং ধৈর্য সহকারে সীতার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

"সীতাকে বনবাসে দিয়া………তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।"

(পৃঃ ৬৮-৬৯ পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

ভাবার্থ লিখন ঃ রামের প্রতি সীতার প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাঁহার ন্যায় সতী-সাধ্বী স্ত্রী বিরল। সর্বপ্রকার অবস্থাতেই তিনি রামের সঙ্গলাভে নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছেন। তাই রামও সীতাকে জগতের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম নারীর মর্যাদায় গ্রহণ করিয়াছেন। সীতার প্রেমে রাম মুগ্ধ। অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পর সীতার প্রেম রামের নিকট আরও গভীর রূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাম যেমন আদর্শ পতি সীতাও তেমনি আদর্শ সতী। একজকে বাদ দিয়া অপরের জীবন শূন্যতায় মণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ। প্রজা প্রীতি দেখাইবার তাগিদে রামচন্দ্র অযৌক্তিকভাবে সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়াছেন। এজন্য সীতার বিরহ রামচন্দ্রের নিকট দুর্বিষহ রূপ লইয়া দেখা দিল। দুঃখভরা চিত্তের বোঝা তাঁহার নিকট অসহ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

"বাল্মীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া……অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।"

(পৃঃ ৮৪ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

ভাবার্থ লিখন ঃ বহুদিন ধরিয়া সীতা স্বামী বিরহিত জীবনযাপন করিতে থাকায় অকস্মাৎ কথাপ্রসঙ্গে বাল্মীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া তিনি পুলকিত হইয়া উঠিলেন। সতী-সাধ্বী সীতার চিত্তে স্বামীর জন্য দুঃখ এবং সহানুভূতি জাগিল।

বাল্মীকি যখন রামচন্দ্র কর্তৃক আহূত যজ্ঞের উল্লেখ করিলেন, সীতার মনে তখন এক অজানা আশঙ্কা জাগ্রত হইল। রাম পুনর্বার বিবাহ করিয়াছেন—লোকমুখে এই ঘটনা শুনিয়া সীতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অধিকদিন স্বামী বিরহ কাটাইয়া সীতার মনে স্বামী রামচন্দ্র সম্পর্কে দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার উদ্রেক হওয়া সঙ্গত ঘটনা। পূর্বের প্রেমবন্ধন বিস্মৃত হইয়া স্বামী রামচন্দ্র যদি তাঁহার প্রতি বিরূপ হন—এই চিন্তাতেই সীতার মন নিরন্তর দ্বন্দ্বে প্রবল আলোড়িত হইতে লাগিল।

সংকল্প ও স্বদেশ

"বেদনারে করিতেছে পরিহাস……মনে মনে।" (পৃঃ ১৬-১৭)

ভাবার্থ লিখন : সমাজে যাহারা কম খাইয়া কম পরিয়া মানুষ, তাহারা মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির অত্যাচার ও অবিচারে জর্জরিত। এদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া উঁচুতলার মানুষেরা ইহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করে না। দুরাত্মা অত্যাচারী শোষক সম্প্রদায়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া দুর্বলেরা আপন অদৃষ্ট সম্বন্ধে বিরূপ চিন্তা করে। এইরূপ চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করার অর্থ হইল আপনার দুর্বল এবং অসহায় অবস্থাকে বাড়াইয়া তোলা। ন্যায় অধিকার দাবি করিতে হইলে তাহাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন এরূপ দুর্বল মনোভাব অপসারণপূর্বক ঐক্যবদ্ধ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানো। তাহাদের সংঘবদ্ধ শক্তি পরিণতিতে নিজেদের ক্ষমতার উপর অগাধ বিশ্বাস আনিয়া দিবে। একারণে নিজ নিজ ভাগ্যের পরিবর্তনের নিমিত্ত প্রতিটি দুর্বল অসহায় মানুষকে সজাগ এবং সচেতন হইয়া উঠিতে হইবে।

"আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।

* * *

কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।" (পৃঃ ৩০)

ভাবার্থ লিখন : সংগ্রামমুখর মানবজীবন। প্রতিনিয়ত নিত্য-নূতন আকর্ষণ-বিকর্ষণ সংগ্রামমুখর চিত্তের সুষ্ঠু সার্থক পরিণতিকে ব্যাহত করিয়া তোলে। অন্যদিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-নিরাশা মানুষের অব্যাহত গতিকে রুদ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এরূপ বিরোধী উপাদানসমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া চিত্তের সরলতা আনয়ন করা প্রয়োজন। ঈশ্বর-প্রেমিক কবি অলক্ষ্যচারী মহাশক্তির নিকট অদম্য সাহস, সুগভীর আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় উৎসাহলাভের প্রার্থনা জানাইতেছেন।

"পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
* * * মানুষ করো নি।" (পৃঃ ৬১)

ভাবার্থ লিখন ঃ কূপমণ্ডুকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে জাতি আপনাকে সংকীর্ণ চৌহদ্দির ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার পক্ষে বিশ্বের অপরাংশের শ্রেষ্ঠ জাতিদের সহিত সমপংক্তিতে বসা অসম্ভব। বাঙালীর প্রিয় কবি মনে-প্রাণে বাঙালী জাতির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ এবং সমৃদ্ধি কামনা করেন। ইহার জন্য বাঙালীরা যাহাতে পরিপূর্ণভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া বিশ্বের অপরাপর জাতিগুলির শ্রেষ্ঠতর গুণগুলিকে আত্মস্থ করিতে পারে, কবি মনে-প্রাণে তাহাই চান। সার্থক মাতা চায় প্রতিটি সন্তানের সম-অগ্রসরতা, সম-উন্নতি এবং সম-অনুসন্ধিৎসাবোধ। বাঙলার সাতকোটি সন্তানের মধ্যে প্রতিটি সন্তান যাহাতে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বের সম্মুখে আপন দেশমাতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিতে পারেন —বঙ্গমাতার ইহাই একমাত্র কাম্য বলিয়া কবি মনে করেন। সেজন্য প্রয়োজন সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা এবং অজ্ঞানতাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, অখণ্ডভাবে এবং ঐক্যবদ্ধচিত্তে বিশ্বজনীন মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠা। এবং প্রগতিশীল যুগের সহিত সমতালে আগাইয়া চলা।

"শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীনবৎসল,
* * *
সহজে বিপুল জল বহি [illegible]বে শিরে।" (পৃঃ ৪৫)

ভাবার্থ লিখন ঃ কবির মনে বিপুল আশা থাকা সত্ত্বেও সামান্য একজন মানুষ হিসাবে তাঁহার কর্মক্ষমতা খুব বেশি নহে। কিন্তু ঈশ্বরের আদর্শ সেবক হিসাবে কবি বিশ্ব-স্রষ্টার প্রতিটি সৃষ্টিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অনুভব করেন। প্রতি মুহূর্তে কর্মচাঞ্চল্য আসিয়া কবিকে নতুন পথ বাছিয়া লইতে দেয় না। তবুও কবি কর্মক্লান্ত শুষ্ক চিত্তে সুগভীর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস নির্ভর করিয়া আপন কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত সর্বদা সমানভাবে সচেতন থাকেন। তিনি আপন সুখ-দুঃখকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করিয়া স্বীয় কর্তব্যসাধন করিতে চেষ্টা করেন।

"তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
* * *
অহর্নিশ আপনারে রাখিবারে স্থির।" (পৃঃ ৪৭

ভাবার্থ লিখন ঃ সর্বপ্রকার দীনতা বর্জন করিয়া ঈশ্বরের উপর সুগভীর বিশ্বা রাখিয়া কবি যাহাতে নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিতে পারেন, জগদীশ্বরের নি

ইহাই তাঁহার শেষ প্রার্থনা। সকল প্রকার খণ্ডতা এবং ক্ষুদ্রতাকে মন হইতে অপসারিত করিতে চান। ইহার নিমিত্ত প্রয়োজন শক্তি, সাহস এবং ভক্তি। তাহা না হইলে কবি আপন লক্ষ্যে পৌঁছিতে অক্ষম হইবেন। ইহার জন্য কবি ঈশ্বরের কাছে সুখমিশ্রিত এবং ভক্তিমিশ্রিত শক্তিলাভ করিতে চান। উহার যথার্থ সদ্ব্যবহার তাঁহার মনে অখণ্ড সমতা বোধ আনয়ন করিবে।

"লোকভয় ? কেন লোকভয়

* * *

তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার।" (পৃঃ ৩২)

ভাবার্থ লিখন : লোকভয়, রাজভয় এবং মৃত্যুভয় স্বকপোলকল্পিত ক্ষণভঙ্গুর চিন্তামাত্র। সমাজ-বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা করিয়া এই সকল ভয়গুলি ব্যক্তিমনের সহজ ও সাবলীল আনন্দবোধকে ব্যাহত করে। সংকীর্ণ এবং স্বার্থপরতা আনয়নপূর্বক মানবমনের অবারিত প্রকাশকে স্থিতিত্ব দান করে। বাস্তবে কিন্তু এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সন্ত্রস্ত কিংবা বিপর্যস্ত হইবার পশ্চাতে কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আনিয়া অখণ্ড চিন্তার আলোকে সবগুলিকে সহজভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এইগুলির অসারত্ব অতি সহজেই ধরা পড়িবে। পরমাত্মার প্রতি সুগভীর বিশ্বাস রাখিয়া ধৈর্য, স্থৈর্য এবং সহনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখী হওয়াই সর্বোত্তম উপায় এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আনয়নের শ্রেষ্ঠতম পন্থা।

"আমারে সৃজন করি যে মহাসম্মান।

* * *

আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব।" (পৃঃ ৩৩)

ভাবার্থ লিখন : স্রষ্টা জগদীশ্বর তাঁহার আপন সৃষ্ট মানুষের আচরিত আদর্শের মাধ্যমে আত্মস্বরূপকে প্রতিবিম্বিত করিয়া তোলেন। মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়াই এরূপ সম্ভব হয়। কিন্তু স্বার্থপর মানবজাতি আপন মনুষ্যত্ব বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বর সম্পর্কে-ভ্রান্ত চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁহার প্রতি অসম্মান করিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করে না। কবি নিজে ঈশ্বরের আদর্শ সেবক। তাই ঈশ্বরের প্রতি যেমন তাঁহার পরম নির্ভরতা বর্তমান, তেমনি অন্যের ক্ষেত্রেও যাহাতে তাহাই অনুসৃত হয়—কবি মনে-প্রাণে তাহা চান। সে কারণে যদি নাস্তিক ব্যক্তি কাহাকে উপেক্ষা, অনাদর কিংবা অবজ্ঞা করে তিনি তাঁহার জন্য প্রতিবাদ করিতে যুগ যোগ্য শাস্তি দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন।

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির,

* * * *

ভারতেরে যেই স্বর্গে করো জাগরিত।" (পৃঃ ৯৪)

ভাবার্থ লিখন ঃ ভারতকে পরিপূর্ণ বিকাশ এবং উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে সচল এবং সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে। তাহার জন্য প্রয়োজন, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, বীর্যবত্তা, জ্ঞানানুরাগ, মন ও প্রাণের দিক হইতে নিবিড় ঐক্য এবং অখণ্ড চিত্তে ভাবের আদান-প্রদান করিবার মত স্বতোৎসারিত হৃদয়াবেগ। পরিপূর্ণ বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ সর্বপ্রকার কারণগুলিকে সমূলে অপসারিত করিতে হইবে। এইরূপ উদ্দেশ্যের সফলতা সাধনের জন্য প্রয়োজন হইল জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা ঈশ্বরের উপর পরম নির্ভরতা। ভারতের সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে হইলে সর্বাগ্রে এই মহান আদর্শের সুনিশ্চিত সফলতা ও কৃতকার্যতা আনয়ন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত ভাবার্থগুলি নিজেরা করিতে চেষ্টা কর।

১। গল্পে উপনিষৎ

(১) "একদিন আমাদের.........মীমাংসা চাহিতে।" (পৃঃ ৫, প্রাণের জয়)
(২) "দেবতায় ও অসুরে.........অন্ধ না হয়।" (পৃঃ ১৫, দেবগণের ব্রহ্মদর্শন)
(৩) "আচার্য সত্যকাম.........লাগিলেন।" (পৃঃ ৪২, গুরু সত্যকাম)
(৪) "যম শুনিয়া.........লাভ করিবে।" (পৃঃ ৫৭-৫৮, নচিকেতা)
(৫) "এই সকলের.........তাহাই আত্মা।" (পৃঃ ১০৩, দেবাসুরের আত্মজ্ঞান)
(৬) "রৈক্ক বলিলেন.........বরল নহে।" (পৃঃ ১৪৩, রাজা ও রৈক্ক)

২। কুরুপাণ্ডব

(৭) "কুন্তীর বাক্যাবসানে.........স্মরণ থাকে।" (পৃঃ ১৯)
(৮) "ইহাতেও তৃপ্ত.........রহিল না।" (পৃঃ ৩৭)
(৯) "ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন.........শক্তি নাই।" (পৃঃ ১০২-১০৩)
(১০) "স্নেহভাজন.........আমার উপদেশ।" (পৃঃ ৯৯)
(১১) "অনন্তর আপনার পিতা.........করিতে সক্ষম নহে।" (পৃঃ ১০২)

(১২) "শরশয্যায় শয়ান মহামতি.......তুমি অবধারণ করো।" (পৃঃ ১০৫-১০৬)
(১৩) অনন্তর সকলকে নিরন্তর.......আনন্দিত হইতেছ।" (পৃঃ ১১৬)
(১৪) "কিয়ৎক্ষণ এইরূপে.......হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব।" (পৃঃ ১১৭)
(১৫) "সে রজনী প্রভাত হইলে.......দেবগণেরও অসাধ্য হইবে।" (পৃঃ ১১৮)
(১৬) "এদিকে দুর্যোধন.......জীবনধারণে প্রয়োজন কী" (পৃঃ ১২৫)
(১৭) "অরাতিঘাতন নিশাচর.......রথসমুদায় নিষ্পিষ্ট হইল।" (পৃঃ ১২৭)
(১৮) "কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন.......তাঁহাকে নিবারণ করো।" (পৃঃ ১২৮)
(১৯) "স্বীয় সৈন্যদলকে.......প্রবৃত্ত হইও না।" (পৃঃ ১৩১-৩২)
(২০) "কৌরবসৈন্যগণ শকুনিকে.......ধাবিত হইলেন।" (পৃঃ ১৪৩)
(২১) "যে জলরাশির স্বাভাবিক.......সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।" (পৃঃ ১৫৫-৫৬)
(২২) "যৌথ পরিবার এখন.......আর কিসে দিতে পারে?" (পৃঃ ১৫৬-৫৭)
(২৩) "মনুষ্যের কতকগুলি.......দুঃখেই মনুষ্যের মহত্ত্ব।" (পৃঃ ১৬০)
(২৪) রামায়ণ-কাব্য......পৃথিবীর অন্যত্র বিরল।" (পৃঃ ১৬০-৬১)
(২৫) আমাদের ঋষিগণ.......জগতে অতুলনীয়।" (১৬১-৬২)

৩। রামায়ণী কথা

(২৬) "ইহাতে কেবল......প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।" (ভূমিকা, পৃঃ ॥/০)
(২৭) "তৎপর.......জড়িত।" (রামচন্দ্র, পৃঃ ২৪)
(২৮) "বিশাল লঙ্কাপুরীর.......সাবধান হইয়াছে।" (পৃঃ ৪৯-৫০)
(২৯) "রামায়ণ-পাঠককে.......প্রতিপন্ন হইবে।" (পৃঃ ৬০-৬১)
(৩০) রামায়ণে যদি কোন......দেখা যায় না।" (ভরত, পৃঃ ৩৭)
(৩১) "ভরতের চরিত্র.......বধ করি।" (লক্ষ্মণ, পৃঃ ৮৩-৮৪)
(৩২) "এই তাপস চরিত্র......আস্থা জন্মিল।" (পৃঃ ১৩৭-৩৮)

৪। রাজর্ষি

(৩৩) "রঘুপতি.......উপলক্ষ্য হইলাম।" (পৃঃ ২২)
(৩৪) "কিয়ৎক্ষণ.......থামিল না।" (পৃঃ ৪৯)
(৩৫) "তাহারা বলিতে.......হইল।" (পৃঃ ১১০-১১১)
(৩৬) "পার্বত্য প্রদেশ.......পাইলেন।" (পৃঃ ১৫৪)

৫। কাব্য-মঞ্জুষা

(৩৭) "মাধব, হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অত এব তোহারি বিশোয়াসা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভবতারণ-ভার তোহারা॥"

(কৃতাঞ্জলি—পৃঃ ২)

(৩৮) "বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যোবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি-বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥"

(ঈশ্বরী পাটনী—পৃঃ ১৪)

(৩৯) "কিন্তু সেই সর্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরথরি—
আপনার জয়চিহ্ন, বুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি।

সত্য-যুগে আদি-মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন ;
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন।
এই যে দাঁড়ায়ে পুন সেই কিনারায় !
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জলরাশি !
উদার সাগর, দাও বিদায় আমায়
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি।”

(সমুদ্র দর্শন—পৃঃ ৪১)

৬। চরিত-কথা

(৪০) “বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলানথ্রপিষ্ট……স্বতন্ত্র ছিল।” (পৃঃ ১০-১১)
(৪১) “বঙ্কিমচন্দ্র যাহার……সমর্থ হইয়াছিল।” (পৃঃ ৩৫)
(৪২) “ইউক্লিডের সময় হইতে……নিরস্ত থাকিতে হইল।” (পৃঃ ৫৯)
(৪৩) “শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা……চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ।” (পৃঃ ৬৭-৬৮)

৭। কমলাকান্ত

(৪৪) নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল, ঝুনার বেলা বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য ? তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। একদিকে কন্যা বসিয়া আছেন মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয়ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন—ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা না হইলে ব্যবসা হয় না—ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি। দুই-চারিটা প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়ো বয়সে দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষে যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি ? যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।”

(মনুষ্য ফল—পৃঃ ৯-১০)

(৪৫) "দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতে চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে—চোর যে চুরি করে সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়, চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?"

(বিড়াল—পৃঃ ৪১)

(৪৬) "দেখ আমাদের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদের মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহ-মার্জার হইয়া মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি।" (বিড়াল—পৃঃ ৪২)

(৪৭) "আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাইনা। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীতে মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাওয়ার পর যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

(৪৮) "এস, ভাইসকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা, দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে উহারা পথ দেখাইবে। চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের কাজ কি? আইস প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজায় ধূম বাধিবে। মেষক ছাগকে হাঁড়িকাটে ফেলিয়া সংকীর্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি

দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকি, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা করিয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া-নাকাড়ায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে।"

(আমার দুর্গোৎসব—পৃঃ ৬৮)

৮। সীতার বনবাস

(৪৯) লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে, সীতা রামকে বলিলেন, নাথ! চিত্র দেখিতে দেখিতে আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! কি অভিলাষ বল, অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবেক। তখন সীতা বলিলেন, আমার অভিলাষ এই, পুনর্বার মুনি-পত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া তপোবনে বিহার ও নির্মল ভাগীরথী সলিলে অবগাহণ করিব। সীতার অভিলাষ শ্রাবণগোচর করিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস। এইমাত্র গুরুজন আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। অতএব গমনের উপযোগী আয়াজন কর; কল্য প্রভাতেই ইনি অভিলষিত প্রদেশে প্রেরিত হইবেন। সীতা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, নাথ! আপনিও সঙ্গে যাইবেন। রাম বলিলেন, অয়ি মুগ্ধে! তাহাও কি তোমাকে বলিতে হইবেক।"

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পৃঃ ৩৬-৩৭)

(৫০) "এই বলিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রাম কিয়ৎক্ষণ, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর লক্ষ্মণকে বলিলেন! অন্তঃকরণ হইতে সকল ক্ষোভ দূর করিয়া, আমার আদেশ প্রতিপালন কর। ইতঃপূর্বেই, সীতা তপোবন দর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন; সেই ব্যাপদেশে তুমি তাঁহারে লইয়া গিয়া মহর্ষী বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আইস; তাহা হইলে আমার প্রীতি-সম্পাদন করা হয়। এবিষয়ে আপত্তি করিলে, আমি যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইব। তুমি কখনও আজ্ঞা লঙ্ঘন কর নাই। অতএব বৎস! কল্য প্রভাতেই মদীয় আদেশের অনুযায়ী কার্য করিবে, কোনও মতে অন্যথা করিবে না। আর, আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, আমি যে তাঁহারে-এজন্মের মত বিসর্জন দিলাম, ভাগীরথী পার হইবার পূর্বে, জানকী যেন, কোনও অংশে, এ বিষয়ের কিছুমাত্র জানিতে না পারেন। তোমার হৃদয়-করুণারসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম।"

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ পৃঃ ৫১)

৯। সংকল্প ও স্বদেশ

(৫১)	"এবার ফিরাও মোরে……বাঁশি।"	(পৃঃ ১৮)
(৫২)	"সকলে আমার……আসিবে আপনি।"	(পৃঃ ২৯)
(৫৩)	"ত্রাসে লাজে……সিংহাসন।"	(পৃঃ ৩৫)
(৫৪)	"মুক্ত করো……বন্ধহীন বারি।"	(পৃঃ ৪৩)
(৫৫)	"এ বিশ্বসমাজে……আসে জল।"	(পৃঃ ৫২-৫৩)
(৫৬)	"কারে দিব দোষ……শুধু অশ্রুজল।"	(পৃঃ ৬৩)
(৫৭)	"ইহার চেয়ে……সিন্ধু মাঝে লুটে।"	(পৃঃ ৬৫-৬৬)
(৫৮)	"এ দুর্ভাগ্য……উন্মুক্ত বাতাসে।"	(পৃঃ ৭৭)
(৫৯)	"হে ভারত……মঙ্গল উদার।"	(পৃঃ ৯৮)
(৬০)	"আগে চল্……চল্ ভাই।"	(পৃঃ ১০৬)
(৬১)	"একী অন্ধকার……থাকে না।"	(পৃঃ ১০৯)
(৬২)	"তুমি চাও পিতা,……মিলিয়া চলিত।"	(পৃঃ ১১০)
(৬৩)	"যেথায় থাকি যে……আয় রে মাকে।"	(পৃঃ ১১১)
(৬৪)	"বিশ কোটি কণ্ঠে 'মা'……বিমল প্রতিভা বিকাশে।"	(পৃঃ ১১২)
(৬৫)	"নব বৎসরে করিলাম পণ……লইব তোমার দীক্ষা।"	(পৃঃ ১১৪-১৫)



চতুর্থ খণ্ড

প্রবন্ধ-রচনা

প্রবন্ধ-রচনা

বহু কুসুম একত্র চয়ন করে শিল্পী মনের মতো সাজিয়ে তুলে মালা। একদিকে কুসুমের সৌন্দর্যের উপর যেমন নির্ভর করে মালার সৌন্দর্য, অপরদিকে মালাকারেরও চাই শিল্পীসুলভ রচন-ভঙ্গী। সুন্দর মালা রচনা করার জন্যে মালাকারের চয়ন করতে হবে রুচিসম্মত ফুল, সেই ফুলকে পর পর এমন করে সাজিয়ে তুলতে হবে, যাতে করে কোথাও রূপাঙ্গিকে ত্রুটি না থেকে যায়। তবেই স্বীকার্য হবে শৈল্পিক ভাব-দৃষ্টি তথা রূপ-দৃষ্টির সার্থকতা; সৃষ্টি হবে সার্থক সুন্দর।

মণি আহরণ করে মণিকার যেমন রচনা করে রুচিসম্মত অলংকার, শব্দ চয়ন করে লেখক তেমনই রচনা করে সাহিত্য। সৌন্দর্য-সৃষ্টি এবং আনন্দ সঞ্চার সকল শিল্পীরই লক্ষ্য। তবে সুন্দর কুসুম চয়ন করেই যেমন সার্থক মালা রচনা করা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে চাই মালাকারের শিল্পী মানস; তেমনি কেবলমাত্র ঝংকারবহুল বা গুরুগম্ভীর শব্দ আহরণ করলেই সার্থক সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়—উন্নত ভাবদৃষ্টির সঙ্গে শব্দ চয়নের গঙ্গা যমুনা সঙ্গম হলেই সার্থক সাহিত্য রচনা হতে পারে।

অনেকে অঙ্গে বিচিত্র অলংকার সাজিয়ে নিজের রূপবৃদ্ধির প্রয়াস পান। কিন্তু দেহে যদি লাবণ্য না থাকে, বিবিধ কারুকার্যখচিত অলংকারও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারে না। রচনারও আন্তরসৌন্দর্য যদি না থাকে, ভাবে যদি থাকে শিথিলতা ও দৌর্বল্য—তাহলে সৃষ্টি সার্থক হতে পারে না। শিল্প-সৌন্দর্য হারিয়ে রচনা তখন অলংকারের ভারে হয় পঙ্গু, কুশ্রী হয়ে ওঠে তার অঙ্গ। অনাবশ্যক অলংকারের ঔজ্জ্বল্য পাঠকের চিত্তকে ক্ষণপ্রভার মতই মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে বিভ্রান্ত করে কিন্তু কোন নিবিড় রসরূপ সৃষ্ট করতে পারে না। ভারাক্রান্ত রচনা হারায় তার সহজ স্বাভাবিক পদ্ধতি। চটুলনৃত্যে ক্ষণিক আনন্দ আছে—গভীর মর্মস্পর্শিতা নেই। ভাবহীন অলংকারবহুল ভাষায় সেই চটুল লীলাচাপল্য আছে—কিন্তু তা পাঠকের হৃদয় সমুদ্রে গভীর আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে না। তাই সার্থক রচনা সৃষ্টি করতে গেলে কেবলমাত্র গুরুগম্ভীর বা ঝংকারবহুল অনুনাসিক শব্দ চয়ন করলেই চলবে না, বিবিধ শব্দালংকারে এবং অর্থালংকারে রচনার দেহকে সাজিয়ে তুললেই চলবে না, এ সকলের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে ভাব-সৌন্দর্যের। তবেই রচনার আন্তরসৌন্দর্য প্রকাশিত হবে। শব্দের এবং অলংকারের

সার্থক সৌন্দর্য তখনই হবে প্রতিভাত। সুতরাং রচনা-শিল্পীর চাই তিনটি প্রধান গুণ। যথা—(১) ভাব-দৃষ্টি তথা রূপ-সৃষ্টির ক্ষমতা, (২) যথাস্থানে যথোপযুক্ত অলংকার-ব্যবহারের ক্ষমতা ও (৩) সুনিপুণ শব্দচয়ন ক্ষমতা।

রচনার অন্তর্দেশে যদি ছড়িয়ে থাকে ভাব-লাবণ্য এবং বহিরঙ্গে যদি প্রকাশিত হয় শব্দের চমক ও অলংকারের ছটা, সৃষ্টি তখনই হয় সার্থক। মনে রাখ্‌তে হবে রচনাও শিল্প। তাই তার সৌন্দর্য নির্ভর করবে শিল্প-সার্থকতার উপরে। ভাব, ভাষা ও অলংকারের ত্রিবেণী সঙ্গম রচনা-শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব। শিল্পীর চাই বিবিধ-গুণ। তার কল্পনার প্রসারতা রচনায় সৃষ্টি করবে সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা। বিশ্লেষণী ও বিচার শক্তি সৃষ্টি করবে অপরূপ দীপ্তি। সর্বোপরি তার সুস্থ মানস সৃষ্টি করবে সমগ্র রচনাটির মধ্যে গতি-স্বাচ্ছন্দ্য। সার্থক রচনায় একাধারে থাকে কল্পনা-প্রসারতা, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এবং স্বচ্ছন্দ গতি। রচনায় যদি স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতি না থাকে, তাহলে রচনাশিল্পের অন্যান্য সব গুণ থাকা সত্ত্বেও রচনা-সৃষ্টি সার্থক হয় না। সুতরাং সার্থক রচনা লিখতে গেলে শিল্পীকে এই গতি স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মনে রাখ্‌তে হবে গতিই প্রকৃত প্রাণের প্রতীক। স্থিরতার মধ্যে প্রাণ থাকতে পারে কিন্তু নিশ্চল হওয়ার দরুণ সে প্রাণের উত্তাপ হৃদয়স্পর্শ করতে পারে না। যে কোন সার্থক শিল্পীর রচনা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, রচনা-শিল্পের এই সব সার্থক গুণে অন্বিত হয়েই তাদের সৃষ্টি হয়েছে সুন্দর। রচনা লিখন-পদ্ধতি পাঠ করেই কেউ সার্থক রচনা-শিল্পী হতে পারে না। অনেকে বলেন, শিল্পী-মানস নাকি জন্মপ্রাপ্ত বা দেবদত্ত। এসব কথা সমস্যা ও বিতর্কের বিষয়। আমরা এ সকল বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে এই সত্যটুকু নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, চর্চা ভিন্ন কোন শিল্পই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। রচনা-শিল্পকে আয়ত্ত করতে হলেও চাই নিষ্ঠাপূর্ণ চর্চা। সুতরাং অনুশীলনই সার্থক রচনা সৃষ্টির আলোকজ্জ্বল পথে নিয়ে যেতে পারে।

রচনা ও প্রবন্ধ সমার্থক যে নয় এ কথাটি মনে রাখ্‌তে হবে। প্রবন্ধও এক শ্রেণীর রচনা কিন্তু রচনামাত্রই প্রবন্ধ নয়। শিল্পী মানসের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই রচনায় দেখা দিচ্ছে এত বৈচিত্র্য। তাই নিত্য নূতন ধরণের রচনা প্রকাশিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরও বিচিত্র ধরণের রচনা প্রকাশিত হবে। গল্প রচনা, কবিতা রচনা, নাটক রচনা, উপন্যাস রচনা ইত্যাদি বহুবিধ ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়ে আস্‌ছে। ইদানীং প্রকাশিত হচ্ছে 'রম্য-রচনা' নামে এক বিশেষ শ্রেণীর রচনা। এই বিবিধ রচনাসমূহেরই এক শ্রেণীতে প্রবন্ধের স্থান। পরীক্ষার্থীদের এই প্রবন্ধ-রচনা সম্পর্কেই বিশেষভাবে জান্‌তে হবে।

অন্যান্য রচনার সঙ্গে প্রবন্ধের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃষ্ট বন্ধন আছে যাতে তাকেই বলি প্রবন্ধ। প্রবন্ধে ভরাগাঙের মতো কুলপ্লাবী উচ্ছ্বাস থাক্‌বে না। পুষ্করিণীর

মতো এর ভাব এবং ভাষার চতুর্দিকে থাক্‌বে এক দৃঢ় বন্ধন। পুষ্করের (পদ্মের) সৌন্দর্য এতে থাকবে কিন্তু সে সৌন্দর্য হবে সুমিত ও সংযত। এক কথায় অন্যান্য রচনার মতো প্রবন্ধে স্বাধীন উচ্ছ্বাসের অধিকার নেই। কল্পনার অসীম সমুদ্রে অবগাহনের মতো প্রস্তুতিও এতে নেই। প্রবন্ধ শিল্পীকে হতে হবে, সর্বদাই যুক্তিনিষ্ঠ ও অর্থনিষ্ঠ। সুস্থ চিন্তা ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় থাক্‌বে প্রবন্ধে। বিশেষ বিষয়ের ভিত্তিতে চিন্তা করে সেই চিন্তাকে করতে হবে বিশ্লেষণ। প্রয়োজনানুযায়ী সরবরাহ করতে হবে তথ্য এবং সমগ্র রচনাটিই হবে যুক্তিবহ। সমগ্র চিন্তাটিকে কতকগুলি সূত্রাকারে বেঁধে ফেলে পরে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সেই সব সূত্রকে করতে হবে বিচার-বিশ্লেষণ। সূত্রগুলির আলোচনায় কোথাও আড়ষ্টতা থাক্‌বে না। তাহলে প্রবন্ধ তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেল্‌বে। প্রবন্ধ-রচনা করার সময়েই এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। প্রবন্ধ-রচনা করার জন্য একাধারে প্রয়োজন হয় সুস্থ চিন্তা, বিশ্লেষণী শক্তি এবং তথ্যজ্ঞান। সুতরাং প্রবন্ধ শিল্পীকে কেবলমাত্র নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্লেষণী শক্তির উপর নির্ভর করলেই চলবে না—বিবিধ বিষয়ের উপর তাকে তথ্যজ্ঞানও সঞ্চয় করতে হবে। প্রয়োজনানুযায়ী ভাষাকে করতে হবে ঝংকারমুখর অথবা গুরুগম্ভীর। অতিরিক্ত অলংকার প্রয়োগে প্রবন্ধ-শিল্পের ধ্যান-গাম্ভীর্যকে লীলাচপল করে তোলা চলবে না। মোটকথা প্রবন্ধকে হতে হবে বলিষ্ঠ। পৌরুষ-গতি নিয়ে চিন্তা ও তথ্যের জগতে হবে তার স্বচ্ছন্দ বিহার।

প্রবন্ধও নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন—

(ক) চিন্তামূলক,

(খ) সমস্যামূলক,

(গ) তথ্যনিষ্ঠ (জীবনী জাতীয় প্রবন্ধ-রচনা এ পর্যায়ে পড়ে),

(ঘ) বিতর্কমূলক ইত্যাদি।

এ ছাড়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধরণের রচনার সঙ্গেও ছাত্রদের পরিচিত হতে হবে। যেমন কোন কিছুর বর্ণনামূলক রচনা, আত্মকথামূলক এক অভিনব ধরণের রচনা ইত্যাদি। তবে এ সব রচনায় চিন্তা বা বিশ্লেষণী প্রাখর্যের তেমন প্রয়োজন নেই। বর্ণনামূলক রচনায় থাকবে অনেকটা গাল্পিক ভঙ্গী আর আত্ম-কথামূলক রচনায় প্রয়োজন হবে কল্পনাপ্রসারতা। রচনা লিখনের জন্য যে যে সাধারণ গুণগুলির কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার সবগুলির সমাবেশ একজনের মধ্যে নাও হতে পারে। কারও বা হয়তো রয়েছে চিন্তা ও বিশ্লেষণী শক্তির প্রাচুর্য, কারও বা হয়তো রয়েছে কল্পনাপ্রসারতা, আবার কারও বা আছে গল্পকার সুলভ-ভঙ্গী। তাই স্ব স্ব নিপুণতা এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রচনা নির্বাচন করে নিতে হবে।

পরীক্ষার্থীদের আরও একটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে। যে কোন ধরণের রচনাই হোক্ না কেন, বিষয়বস্তুর দিকে ও নামকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা ভাষার সামান্য পরিবর্তনেই বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। যেমন ধরা যাক—'তোমার জীবনের লক্ষ্য' আর 'জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন' এই দু'টি রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটিতে মধ্যম পুরুষকে বলা হচ্ছে তার জীবনের লক্ষ্যের কথা জানাতে আর দ্বিতীয়টিতে বলা হচ্ছে 'জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন' সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করতে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একের বিষয়বস্তু যদি অপরের উপর আরোপ করা যায়, তাহলে সম্পূর্ণ রচনাটিই ভুল হয়ে যাবে।

ভাষা প্রয়োগের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে একই রচনায় সাধুভাষা ও চলিতভাষা যেন মিশে না যায়। তাহলে বৈয়াকরণ অভিহিত 'গুরুচণ্ডালী' দোষ ঘটবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। মোটকথা ভাষানুরূপ রচনা লেখাই বাঞ্ছনীয়। আমরা এই দুই জাতীয় ভাষারই রচনার উদাহরণ সন্নিবিষ্ট করেছি। এগুলি পাঠান্তে ছাত্রছাত্রীদের মনে রচনা-রচন সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা জন্মাবে বলে আশা করি এবং এই দীর্ঘ ভূমিকার উপসংহারেও এ কথা বলব যে চর্চা ভিন্ন কোন শিল্পকেই সম্যকরূপে আয়ত্ত করা যায় না।

মহান ভারত

(চলিত ভাষায়)

উত্তরে হেমশীর্ষ আকাশস্পর্শী হিমালয়, পূর্বে শাল-সেগুনের শ্যামবনানী শোভিত ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে তরঙ্গ নৃত্য চঞ্চল আরবসাগর আর দক্ষিণে দিগন্তপ্রসারী মহাসমুদ্রের মেঘমন্দ্রধ্বনির চতুঃসীমায় বেষ্টিত মহান ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক দেশ মাত্র নয়। মানবতার মহামন্ত্রের উদ্ঘোষক এবং প্রচার কর্তারূপে এই দেশ সমগ্র পৃথিবীর তীর্থস্বরূপ।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন। সত্যই বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ। একই সঙ্গে প্রতিবেশীর মতো এখানে বাস করছে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন রকমের আচার-ব্যবহার এবং বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী বিচিত্র মানুষ। সর্বাপেক্ষা বেশী সামাজিক বিভেদ রয়েছে এই দেশে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় সর্বাপেক্ষা বেশী সাম্য ও অভেদের বাণী এ দেশেই উচ্চারিত হয়েছে জগতে আর কোথাও এমন দেখা যায় না। বিভিন্ন ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতির বৈচিত্র্য অন্যান্য দেশে ঐক্য সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু

ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় এখানে কখনো প্রবল ধর্ম দুর্বল ধর্মকে রাহুগ্রস্ত করে ফেলেনি, বলিষ্ঠ সমাজনীতি বা উন্নত সংস্কৃতি, অনুন্নত সমাজনীতি বা সংস্কৃতিকে বিধ্বংস করে ফেলেনি। তাই এখানে উন্নত বৈদিক ধর্মের পাশাপাশি ধারা বেয়েই চলেছে অনার্য সংস্কৃতি ও ধর্ম। এই ঔদার্যবোধ ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে মহান করে তুলেছে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

মানবতার জয়গান প্রথম অনুরণিত হয়েছে এই ভারতবর্ষে। ধ্যানগম্ভীর তপোবনে ভারতীয় ঋষির কণ্ঠেই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছে মানুষ অমৃতের পুত্র। সেই মনুষ্যত্বের জয়গান প্রচার করতে ভারতের চারণ কবির কণ্ঠ যুগে যুগে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস আন্দোলিত করে। ভারতবর্ষের কবিই কম্বু-কণ্ঠে ঘোষণা করেছে :

মানবতার জয়গান

"শোন হে মানুষ ভাই! সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

সংশয়-সমাচ্ছন্ন দুর্যোগের দিনেও ভারতীয় কবির-কণ্ঠ একই সুরে প্রতিধ্বনি—

"শোন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
স্রষ্টা আছে কি নাই।"

এদেশ মানবতার মহান শক্তিতে গভীর বিশ্বাসী। যুদ্ধ-জর্জর রক্ত-রাঙা পৃথিবীতে মানুষ যখন হারাতে বসেছিল মানবতার প্রতি বিশ্বাস, জননী পৃথিবীকে যখন মনে করছিল রক্তলোলুপ ছিন্নমস্তারূপে, তখন এই মহান দেশের কবিই শুনিয়েছেন আশ্বাসের বাণী, শুনিয়েছেন ভারতীয় সাধনা-উদ্ভূত সেই চির পুরাতন মন্ত্র নূতন কালের ভাষায় :

"দিকে দিকে নাগিনীরা
ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত-বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস ;
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই,
শত শত দানবের সাথে সংগ্রামের তরে
মানুষেরা প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

একদিকে যেমন মহান ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীকে শুনিয়েছে মহামানবের জয়গান, অপরদিকে তেমন সে প্রচার করেছে মানবধর্ম। যুগে যুগে মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন এই দেশে। দেশকালের সীমা লঙ্ঘন করে আবাহমান কালের মানুষকে তাঁরা দীক্ষিত করে গেছেন প্রেম ও অহিংসার মন্ত্রে। সুগভীর ঐক্যের অনুভব এবং আর্য ঋষিদের ঐতিহ্যের পুষ্ট কবি মনের নিভৃতে

মানবধর্ম প্রচার

সব মানুষের সাথে ঐক্যের অনুভব এনে দিয়েছে। তাই মধ্যযুগের সাধক কবীরের মুখে আমরা শুনেছি :

"জোর ফুদাই মসীত বশত হৈ ঔর মুলিক কিসকেরা।
তারথ মূরতি রাম নিবাসা দুহুঁমে কিনহূঁন হেরা॥
পূরিব দিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মুকামা।
দিহম হী খোজি দিলে দিল ভীতরি ইহা রাম রহিমানা॥"

(অর্থাৎ, মন্দির, মসজিদ, তীর্থদর্শন সব কিছুরই অবস্থিতি মানুষের মনে। চিত্তের শুচি-শুভ্রতাই উহাদের যথার্থ অবস্থিতি নির্দেশ করে দেয়।)

এই ঐক্যের অনুভবই এ-যুগের সাধককে বলিয়েছে—

"জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

শক্তিমত্ত পশুপ্রায় যুযুধান মানজাতিকে যুগে যুগে এ দেশ থেকে শোনানো হয়েছে মিলনের মহাবাণী। মানব-ধর্মের মুমূর্ষু অধ্যায়ে এ দেশ সূচনা করেছে নবযৌবনের প্রেরণা। বৈদিকযুগের ঋষিকুল থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, কবীর ও নানকের যুগ অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী পযন্ত যে বিশাল কাল প্রবাহিত এই বিশাল কালপ্রবাহের সবত্রই ভারতীয় শান্তির শঙ্খ ঘোষণা করেছে মিলনের মহা-নির্ঘোষ। তাই—

"রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত
যারা এসেছিল সবে—"

—তারা সকলেই কী এক যাদুমন্ত্রের স্পর্শে রণমত্ততা ভুলে গিয়ে এদেশের মাটিতে আত্মলীন হয়ে গেছে। সে যাদুমন্ত্র মহান ভারতের প্রেমমন্ত্র। যুগে যুগে এই প্রেমমন্ত্র প্রচার করে জননী পৃথিবীর সংকটকালে সঞ্জীবনী শক্তি এনে দিচ্ছে এই মহান ভারত।

ভারতীয় সংস্কৃতির সাধনা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন। কিন্তু এই ঐক্যতো কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করলে চলবে না। সমস্ত মানুষ জাতিকে যে একই শান্তির পতাকার তলে সমবেত করতে হবে। তাদের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি এবং হিংসার অনল রয়েছে তাকে অবসান করতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি সাধনার সেদিনই হবে পূর্ণ সিদ্ধি। ভারতীয় কবির দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের এ মহামিলন রচিত হবে ভারত তীর্থেই। অতিথি সেবার দেশ মহান

মিলনের মহামন্ত্রে সকলের আহ্বান

ভারতবর্ষের কবি তাই পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে আহ্বান জানায় মিলন উৎসবের মঙ্গল ঘট পূর্ণ করার জন্য :

"এসো হে আর্য এসো অনার্য
হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃষ্টান।"

সাময়িকভাবে কালবৈশাখীর সংহারলীলা হয়তো ভারতবর্ষের মনকে করে তুলেছে প্রক্ষিপ্ত। কিছু কিছু ভেদবুদ্ধি ভারতীয় ঐক্যসাধনার পথে হয়তো অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ভারতের এই মহান ঐতিহ্য, বিশ্বময় ভারতের শান্তি ও মৈত্রীর বাণী সাময়িককালের এক দুর্যোগে শেষ হয়ে যেতে পারে না। যুগ-যুগান্তর ধরে যে মহান আদর্শের, মহান ধর্মের পতাকা বহন করে নিয়ে চলেছে ভারতবর্ষ, ক্ষণকালেব আঘাতে সে পতাকা ছিন্ন হয়ে যেতে পারে না। কালবৈশাখীর এই মেঘের অন্তরালে নিশ্চয়ই রয়েছে ভাস্বর ভাস্কর। আমরা সেই সূর্যের প্রতিক্ষায় রয়েছি।

উপসংহার

বাঙলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

বাঙলাব প্রকৃতি—স্নিগ্ধ, সরস এবং স্নেহময়। জন্মের পর হইতেই এই প্রকৃতির কোলেই আমরা বড় হইয়া উঠি। ইহার সোহাগ-পরশে ভোরে চোখের পাতা মেলিয়া থাকি, আবার ইহারই মোহময় শান্তির বক্ষে পরিশ্রান্ত তন্দ্রালু দেহটিকে সঁপিয়া দিই। একমাত্র বাঙলার প্রকৃতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় শ্যামল শোভা, সহজ রূপ ও অনাড়ম্বর সৌন্দর্য। সবুজ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, আম-কাঁটাল-লিচু-সুপারী নারিকেলশোভিত শ্যামল বাগান, বেল-বকুল-মল্লিকা-মালতীর কুঞ্জ, শীর্ণ-বক্ররেখায় প্রবাহিনী নদী, কোকিল-দোয়েল-পাপিয়া-শ্যামার মধুর গান—ইহারাই বাঙলার প্রকৃতির রূপ ও রস।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বাঙলার প্রকৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহার জলের প্রাচুর্য। কত খাল-বিল, নদ-নদী, দীঘিকা-পুষ্করিণী যে এই প্রকৃতিকে সরস ও সুন্দর করিয়াছে তাহার অন্ত নাই। বর্ষাকালে বাঙলার গ্রামের শোভা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই স্মরণ করিবেন—চারিদিকে জল থৈ থৈ করিতেছে, মাঠ ক্ষেত, বাগান সব ভাসিয়া গিয়াছে, ধান গাছগুলির শীর্ষ জলের ঢেউতে হেলিতেছে দুলিতেছে। এই দৃশ্য কত কবির কাব্যে আজও অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। জলের প্রাচুর্যের জন্যই বাঙলার মাটি এত সজল, এত সরস হইয়াছে। বাঙালী মায়ের ন্যায় এই মাটি নরম, সেই মায়ের ন্যায় ইহার বুকে অবারিত পীযূষধারা সঞ্চিত হইয়া আছে।

জলের প্রাচুর্য

বাঙলায় সজল মাটির জন্যই তাহার তরুলতা এত শ্যামল, এত স্নিগ্ধ। বাঙলায় পার্বত্যদেশের শৈত্য নাই এবং সামুদ্রিক দেশের উষ্ণতাও নাই। এইজন্য বাঙলার বায়ু এত মনোরম আর সেজন্যই প্রকৃতির সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠতা এত অধিক। বাঙলার আকাশে কুয়াশার প্রাচুর্য নাই আবার সারা-বৎসরব্যাপী মেঘের আতিশয্যও নাই। সেজন্যই বাঙলার প্রকৃতির মধ্যে এত হাসি, এত উৎসব।

মাটি, বায়ু ও আকাশ

বাঙলার প্রকৃতির মধ্যে সুর যোগায় তাহার পাখী। মঞ্জরিত আম্রবৃক্ষের শোভা আরও শতগুণে বর্ধিত হয়, যখন সেই বৃক্ষের অন্তরালে কোকিল পঞ্চম তানে গান গাহিতে থাকে। দোয়েলের শিষে, পাপিয়ার সুরে, ঘুঘু পাখীর কূজনে বাঙলার বন যে কি মধুর ঝংকারে ঝংকৃত হইয়া উঠে তাহা কাহারও অজানা নাই। 'বউ কথা কও' পাখীর অবিরাম মানভঞ্জন ও 'চোখ গেল' পাখীর সকরুণ আর্তনাদের মধ্যে যে বাঙলার কত গোপন হিয়ার নিরুদ্ধ রহস্য নিহিত আছে, তাহা ভাবুকমাত্রই অনুভব করিবেন। বাঙলার প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার ফুলের রাজ্য। কত বিচিত্র ফুলের বসন-ভূষণে যে বাঙলার প্রকৃতি সজ্জিত হইয়া উঠে তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়! অশোক-কিংশুকের রক্তবাস, বেল-বকুলের মালা, চম্পক-গোলাপের অলংকার এবং রজনীগন্ধার মুকুট পরিয়া বাঙলার প্রকৃতি যে কি অপরূপ সাজে সজ্জিত হয় যেন তাহা বিশ্বমনকে মোহিত করিয়া ফেলে। ফুলের সৌন্দর্য বর্ধিত হয় প্রজাপতি, ভ্রমর ও মৌমাছির দ্বারা—সেইজন্যই তো দেখি কবিদের কাব্যে ফুলের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহারা না থাকিলে ফুলের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হয় না এবং ফুলের মহিমাও ব্যক্ত হয় না।

পাখী ও ফুল-ফল

বাঙলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জীবন্ত। সেইজন্য নূতন ঋতুতে নব নব সাজ-সজ্জায় প্রকৃতিদেবী ভূষিত হইয়া উঠেন। এই নিত্য নূতন বৈচিত্র্যের জন্যই এই সৌন্দর্য এত মধুর, এত মনোহর। বৎসর যখন আরম্ভ হইল তখন দেখি প্রকৃতির রূপ রুদ্র ও ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে। ঈশানকোণ হইতে কাল-বৈশাখীর হুঙ্কার শুনা যায়—'রহি রহি দহি দহি উগ্র বেগে উঠিছে ঘুরিয়া, আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া।' কিন্তু যেমন রুদ্রের প্রচণ্ডতা আছে, তেমনি আবার শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপও আছে। আম-কাঁঠাল-লিচু- জাম প্রভৃতি ফলের অবারিত দাক্ষিণ্য গ্রীষ্মের খর প্রদাহকে অনেকখানি লঘু করিয়া ফেলে।

বাঙলায় ষড়্‌ঋতু

তারপর একদিন প্রসন্ন আকাশে পুঞ্জপুঞ্জ কালো মেঘ জমা হইতে থাকে। তৃষ্ণার্ত ধরণীর বুকে অজস্র বৃষ্টিপাত নামিয়া আসে। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির রূপ

বদলাইয়া যায়। নববর্ষার আগমনে ময়ূর কলাপ বিকাশ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, মত্ত দাদুরীর দলে উল্লাস আরম্ভ হয় এবং ডাহুক-ডাহুকী অবিরাম ডাকিতে থাকে। বর্ষার মেঘ কাটিয়া গেল, বৃষ্টিধারা থামিয়া গেল, স্বচ্ছ নীল আকাশে প্রসন্নতার দীপ্তি দেখা দিল। শরতের এই অমল মহিমা দেখিয়া কবি গাহিয়াছিলেন :

"আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শরৎ প্রভাতে,
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।"

কেতকী-কাশের জগতে প্রাণস্পন্দন দেখা দিল এবং শেফালিকার আস্তরণ ধরণীর বুকে পাতা হইল। সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গ এক মহাব্রতে রত হইল, আনন্দময়ীর আগমনের সাড়া দিকে দিগন্তরে পড়িয়া গেল। বঙ্গের শরৎ আনন্দের ঋতু, উৎসবের ঋতু।

হেমন্তে কুয়াশা ও শিশির আসিয়া প্রকৃতির মধ্যে রাজত্ব আরম্ভ করে। মাঠে মাঠে পক্কশীর্ষ শস্যের নয়নবিনোদন দৃশ্য। হিমের শীতল নিঃশ্বাসে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। নগ্ন রিক্ততায় কাননের সৌন্দর্য খসিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির দ্বারে বসন্ত আসিয়া জাগ্রত হয়। বসন্ত আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রকৃতির মধ্যে যেন আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। সমস্ত বনস্থলী উৎসবের সজ্জায় ভূষিত হইয়া উঠে। কোকিলের কাকলিতে উৎসবের বাঁশি বাজিয়া উঠে, ভ্রমরের গুঞ্জনে উৎসবের মন্ত্র ধ্বনিত হয়, রাশি রাশি ফুলে উৎসবের হাসি ফুটিয়া উঠে। ঋতুরাজ বসন্ত যেন নূতন প্রাণের, নূতন আনন্দের উল্লাস বহিয়া নিয়া আসে।

বাঙলার প্রকৃতির সহিত বাঙালীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং এই প্রকৃতির রূপ ও রস বাঙালীর চিত্তকে সরস ও সঞ্জীবিত করে। প্রকৃতির এই সজল মৃত্তিকাই বাঙালীর মনকে এত কোমল করিয়াছে, এই সবুজ লীলাই বাঙালীর প্রাণকে এত সতেজ ও নবীন করিয়াছে। বাঙলার এই মনোহর প্রকৃতিই বাঙালীকে এতখানি ভাবুক ও কবি করিয়াছে। মোটকথা বাঙলাদেশে ষড়ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির মধ্যে যে রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়, অন্য কোন দেশে তার তুলনা নাই।

বাঙালী মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব

বাঙলার উৎসব

উৎসব প্রিয় জাতি হিসাবে বাঙালীর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। 'বারো মাসে তের পার্বণের দেশ' বাঙলা। কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্ভবত এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা।' বঙ্গজননী স্বয়ং অন্নপূর্ণা।

সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা তাহার রূপ। নয়নলোভন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, অনুপম সৌন্দর্য এবং উছল প্রাণশক্তির চমৎকারিত্বই বাঙালীর উৎসব-প্রিয়তার কারণ। জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ এইসব উৎসবের মাধ্যমে শত ধারায় প্রকাশিত।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

উৎসব বলিতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানকে বোঝায়। যে অনুষ্ঠানে একাধিক ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে এবং একের স্নেহ, প্রীতি ও শুভেচ্ছা অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত হয় সেইখানেই উৎসব। সারা বৎসর একটানা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করিয়া মানুষের মন নিরানন্দ ও বিষাক্ত হইয়া উঠে। একের সহিত অপরের যোগসূত্র ছিন্ন হয়। উৎসবের সময়ে সকলে একসাথে মিলিত হইয়া নবীন প্রাণোদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া উঠে। প্রগাঢ় স্নেহের বশে একে অপরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। একের স্নেহ, প্রীতি ও মঙ্গল চিন্তা প্রিয়জনের কল্যাণের নিমিত্ত ব্যয়িত হয়।

উৎসব কাহাকে বলে

বাঙলার উৎসবগুলিকে আমরা প্রধানত চারিটি ভাগে ভাগ করিতে পারি। যেমন—(১) ধর্মীয় উৎসব, (২) ঋতু উৎসব, (৩) সামাজিক উৎসব ও (৪) রাজনৈতিক উৎসব। ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল দুর্গাপূজা। এই শুভ মুহূর্তের প্রতিক্ষায় বৎসরের প্রথম দিন হইতে বাঙালীরা অপেক্ষা করিতে থাকে। শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। শরতের আকাশে বাতাসে যেন পূজার দিনের চিঠি আসে। ঐতিহ্যপ্রিয় বাঙালী আনন্দাতিশয্যে দুর্গাপূজার জন্য প্রস্তুতি লয়। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই চারিদিন পূজা হয়। ষষ্ঠী তিথিতে ঘটস্থাপন ও দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বিজয়া দশমীর স্মৃতি বাঙালী মনকে মাতৃবিরহে ব্যথিত করিয়া তুলে। মাতৃ-বিসর্জনের সহিত যেন বাঙালীও তাহার হিংসা, দ্বেষ ও বৈরীভাবকে দূরে অপসারিত করিয়া দেয়। তাহার পরের পূর্ণিমায় আসে লক্ষ্মীপূজা এবং উহার পরবর্তী অমাবস্যায় আসে শ্যামাপূজা। শাক্ত বাঙালী জাতির কাছে যেন নতুন এক প্রাণচাঞ্চল্যের রূপ লইয়া আসে এই শ্যামাপূজা। এ উৎসবে আলোকমালায় বাঙলার আকাশ বাতাস সজ্জিত হয় এবং আতস বাজিতে চারিদিকে আলোকিত হইয়া উঠে। মাঘ মাসের শুভ পঞ্চমী তিথিতে বাগ্দেবীর অর্চনা করা হয়। এই পূজায় বাঙলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা মনের ও প্রাণের অর্ঘ্য জানায় বিদ্যাদায়িনী দেবীর নিকট। সরস্বতী পূজার পূর্বে আসে কার্তিক পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা প্রভৃতি। এইসব ধর্মীয় উৎসবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আনন্দের বন্যাধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চলে মহরম, ঈদ, রোজা, শবেরাৎ প্রভৃতি মুসলমানদের উৎসবগুলি।

উৎসবের শ্রেণী ও ধর্মীয় উৎসব

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার জলে-স্থলে ঘটে পট-পরিবর্তন। প্রাচীনকালের

সনাতন উৎসবগুলিতে ঋতু আবাহনসূচক উৎসবগুলি সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করিত। প্রকৃতিরাণীর বিচিত্রময়ী রূপের সহিত যাহাদের পরিচয় যত বেশি, সাধারণতঃ তাহারাই এ উৎসবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিত। অগ্রহায়ণ মাসে মাঠ হইতে ধান কাটিয়া আনিয়া কৃষকেরা নবান্ন উৎসব করে। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে মনে প্রাণে জাগে এক নতুন তেজ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সম প্রাণচঞ্চল। সকলেই উন্মত্ত হয় হোলী খেলায়। বহির্জগতে রঙের বর্ণালী সমারোহের সাথে সাথে অন্তর্জগতেও রঙ্ লাগে। আবীর রঞ্জিত সাজসজ্জার আড়ালে মনের বিচিত্র অনুভবগুলি যেন সহস্রদল বিকশিত পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। অশোক, করবী, শিমুল ও পলাশে ছাওয়া প্রকৃতি রাজ্যকেও যেন এই উৎসব বেশ-বাস পরিবর্তনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ঋতু উৎসব

সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মনুষ শ্রেষ্ঠ। সামাজিক রীতি-নীতি এবং বিভিন্ন উৎসবগুলি যেন অফুরন্ত প্রণাবেগ, আশ্চর্য জীবনীশক্তি এবং অনাবিল প্রাচুর্যের কথাই মনে করাইয়া দিতে চায়। বিবাহ হইল অন্যতম সামাজিক উৎসব। এই একটি দিনে সনাতন ঐতিহ্যের পূজারী সমাজ বাঙালী পুরাতন রীতি-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার পরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য সামাজিক উৎসব হইল—জামাইষষ্ঠী। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াতে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার অক্ষয় তিলক আঁকিয়া দিয়া স্নেহময়ী ভগিনী ভ্রাতার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির কামনা করে। ইহা ছাড়াও, বিভিন্ন ধনী পরিবারে কাহারও জন্মদিনকে উপজীব্য করিয়া সামাজিক উৎসব করিতে দেখা যায়। অবশ্য ঐসব উৎসব আশীর্বাদের চেয়ে লৌকিকতাই প্রাধান্য লাভ করে।

সামাজিক উৎসব

রাজনৈতিক উৎসবের মধ্যে অন্যতম হইতেছে ১৫ই আগষ্ট—স্বাধীনতা উৎসব ও ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্রদিবস। অবশ্য প্রথমোক্ত দিনটির সহিত বাঙালী জাতির এক বেদনাময় স্মৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে। এই দিনেই বাঙলাদেশকে পূর্ব এবং পশ্চিম —এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সে যাহাই হউক এই দিনকে স্মরণ করিয়া এখনও উৎসব পালন করা হয়। এই দিনে দিল্লীর লালকেল্লায় যেমন তোপ দাগা হয়, বাঙলাদেশেও তেমনিভাবে উৎসব এবং উদ্দীপনার সহিত এই দিনটি প্রতিপালিত হয়।

রাজনৈতিক উৎসব

এই চারি প্রকারের উৎসব ছাড়াও আর এক শ্রেণীর উৎসব রহিয়াছে। মনীষীগণের জন্মদিনকে লক্ষ্য করিয়া এইসব উৎসব প্রতিপালিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটি হইতেছে, ২৫শে বৈশাখের উৎসব। এইদিনে আমরা বিশ্ববরেণ্য কবি ঋষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নতুনরূপে বোধন করি। প্রবৃত্তি হই তাঁহার সৃষ্টি সামগ্রীর ব্যাখ্যায়। ইহা ছাড়াও, স্বামী

মনীষীগণের জন্মদিনকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব

বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্মোৎসব প্রভৃতি পালন করিয়া থাকি।

সমস্যা জর্জরিত বর্তমান যুগে আর তেমন উৎসবের প্রাচুর্য নাই। দ্রুত অবক্ষয়ের পথে বাঙলাদেশ আগাইয়া চলিয়াছে। ইহার উপরে আছে প্রাকৃতিক দুরবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়িবার মত বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। তদুপরি রহিয়াছে শক্তির প্রাচুর্য, ধনীর ঐশ্বর্য ও ছল-চাতুরীর কলাকৌশল। ইহার ফলে বাঙালীর উৎসব প্রসিদ্ধির সুনাম নষ্ট হইতে চলিয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে বাঙালীর মর্মজীবনে রঙ্গ রসোৎসবের ফল্গুধারা এখনও সুপ্ত রহিয়াছে। উপযুক্ত সুযোগ এবং পরিবেশ পাইলে অদূর ভবিষ্যতেই সেই সুপ্ত রস আবার প্রবাহিত হইবে প্রাণচঞ্চল বেগে। বাঙালী মানসের সেই জাগরণের দিকে আমরা তাকাইয়া আছি।

বর্তমান উৎসবের রূপ ও উপসংহার

বাঙলার ঋতু বৈচিত্র্য বা ষড়্ঋতু

[স্কুল ফাইনাল ১৯৫৯]

সোনার বাঙলায় আকাশে, বাতাসে আছে এমনি-এক অনির্বচনীয় আনন্দের সুর যাহা আমাদের মনপ্রাণকে করে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। শ্যামলা, বিপুলা ধরণীর দিকে আমরা যতই তাকাই, ততই আমাদের বিস্ময়ের অন্ত পাই না। প্রকৃতির রসভাণ্ডারে আছে যে-সৌন্দর্যের উৎস, সেই সৌন্দর্য প্রতিনিয়তই অমাদিগকে জাগাইয়া তোলে অপূর্ব পুলকে। প্রকৃতি কখনও দীপ্তচক্ষু, শীর্ণ সন্ন্যাসী —কখনও বা স্নেহময়ী জননী সাদৃশ। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই প্রকৃতির সৌন্দর্যের আর শেষ নাই। প্রকৃতিতে যদি শুধু বর্ষার অশান্ত ক্রন্দন থাকিত কিংবা শুধু বসন্তের কোকিলের কুহুতানই থাকিত, তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাদের এমনিভাবে স্পর্শ করিতে পারিত না। শীতের দেশে প্রকৃতির যে-রূপ পাই, সেই রূপে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। বসন্তে শ্যামল শস্যশষ্প, পাখীর কলরব, কচি নবপল্লবের আন্দোলন, সুমধুর, সুন্দর বাতাস আর প্রসন্ন আকাশ; মেঘমুক্ত আকাশে স্বচ্ছতম নীলাভের নির্মল বিস্তার। তারপর শীতের কঠোর আঘাতে বসন্ত তাহার ফুলদল লইয়া কোথায় অদৃশ্য হয়। আকাশে, বাতাসে প্রকৃতির ক্রন্দন। সব-কিছুকে পাইয়া সব-কিছু হারানোর রিক্ততা যে নিঃস্বতা, তাহা আকাশ বাতাসে ব্যাপ্ত।

প্রারম্ভিক ভূমিকা ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

বাঙলার প্রকৃতিতে কিন্তু সেইরূপ রিক্ততার রূপ দেখি না। বাঙলার প্রকৃতি ষড়্ঋতুতে নব নব সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। বাঙলার প্রকৃতিতে পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য। হয়তো মাঝে মাঝে সে পরিপূর্ণতার ছেদ ঘটে কিন্তু ছেদ এমনি সামান্য যে তাহার হাহাকারের তীব্রতা নাই।

বাঙলার প্রকৃতি বিভিন্ন ঋতুতে তাহাদের নব নব সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত করিয়া নব নব রূপ প্রকাশ করে। প্রকৃতির এই বিচিত্রতা আছে বলিয়াই বাঙলার প্রাকৃতিক জগতেদেখিতে পাই অভিনব রূপ। বাঙলার প্রকৃতি—স্নিগ্ধ, সরল এবং স্নেহময়। বাঙলার প্রকৃতিতে সাধারণতঃ ছয়টি রূপ : গ্রীষ্ম, বর্ষ, শরৎ হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য

গ্রীষ্মে প্রকৃতির রুদ্রভয়াল মূর্তি! ধূলায় ধূসরিত ধরণী। নদীতীরে শুষ্কজল, শস্যশূন্য মাঠ। শস্যহীন মাঠে দুই-চারিটি গোরু চড়িয়া বেড়ায়। গ্রীষ্মের নির্বাক-স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া কাল-বৈশাখীর ঝড় উন্মত্ত উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে। ঘন-ঘোর মেঘস্তূপে, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণ, ভয়ঙ্কর অন্ধকারে দিগ্‌দিগন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। বৈশাখীর মত্ত হাহাকারে উৎকণ্ঠিত পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া চলে।

গ্রীষ্মের আবির্ভাব

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ ধরণীর বুকে গুরু গরজনে পায়ের নূপুর বাজাইয়া নামিয়া আসে, মধুর না হইলেও সরস বর্ষাকাল। এই সময়ে আকাশে অবিশ্রান্ত ঘনঘটা দেখা যায়; অবিরাম বারি বর্ষণ চলিতে থাকে। গগনে মেঘের গুরু গুরু গর্জন শুনা যায়। নবীনধান্য হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া সারা হয়। দিগন্তের বনভূমি অন্তরাল হইয়া যায়। শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন, বাঁশের বন, কাশবন জলের মধ্যে মাঝে মাঝে কাঁপিয়া দুলিয়া উঠে। গাছপালা হইতে অবিরাম টুপ্‌টাপ্ শব্দ। কর্ম নাই, বৈচিত্র্য নাই, শুধু শ্রাবণের অশান্ত ক্রন্দন। বর্ষার গলিয়া-পড়ার ঝরিয়া-পড়ার ক্রন্দন থামিয়া যায়।

বর্ষার আগমন

শরৎ তাহার স্নিগ্ধ সুমধুর দিনগুলি লইয়া আসে। তখন সাদা-মেঘে আকাশ ছাইয়া যায়। গগনের নীলে কে যেন শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। কাশবন আবার জাগিয়া উঠে। জলমগ্ন মাঠগুলি শ্যামল তৃণে ভরিয়া যায়। গানের শ্যামলতার রূপ মনপ্রাণকে ডুবাইয়া দেয়। ঢালু সবুজ অবারিত মাঠ সঙ্কীর্ণ জনশূন্য গ্রাম-পথ; ঘন আম্রকুঞ্জে নিবিড় ছায়া—সমস্তই একসঙ্গে মিলিয়া যেন প্রকৃতির আমন্ত্রণ-লিপি দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতে থাকে। প্রকৃতির এই বিচিত্র সভায় বাঙলার হিন্দুগণ দুর্গাপূজার আগমন কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া থাকে।

শরতের প্রকাশ

শরতের পর হেমন্ত আসে শীতের আমেজ লইয়া। পাকা সোনার ধান। কৃষকেরা নবান্নের উৎসবে মাতিয়া উঠে। আটি আটি ধান বাঁধিয়া গৃহের প্রাঙ্গণ ভরিয়া ফেলে। পাকা সোনার ধানের সুগন্ধে আকাশ বাতাস ভরিয়া যায়। সারা বৎসরের দুঃখের পর সুখের আশায় তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। হেমন্ত জানায় শীতের পূর্বাভাস। ঘাসে, গাছের পাতায় শিশিরবিন্দু সূর্যের আলোয় টল্‌মল্ করিয়া শুকাইয়া যায়।

হেমন্তের আগমন

হেমন্তের পর শীত আসে। গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। তখন শুষ্কপত্রে বনতল যেমন আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, তেমনি কুয়াসায় আকাশ আবৃত হয় এবং গাছপালা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। শীতের মধ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়। মানুষের জীবনে যেমন প্রথম ভাগে সব কিছুই পূর্ণতা লাভ করিয়া বার্ধক্যে ঝরিয়া পড়ে; শীতের মধ্যেও তেমনি প্রকৃতির বার্ধক্যের রূপ ফুটিয়া উঠে। তবে বাঙলায় শীত ঋতুতে শীতের সেই ভয়াবহ রূপের পরিচয় মিলে না।

শীত ঋতুর প্রকাশ

শীতের পর বসন্ত আসে প্রকৃতির ভরা যৌবন লইয়া। গাছে গাছে নব নব পল্লব, মাঠে মাঠে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, দূরে কোকিলে কুহুতান। বনে বনে ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ মাতাল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বসন্তে বিরহী প্রকৃতির সকল সাধনা সার্থক হয়। বৃক্ষশাখা ফলভরে নত হয়, কেবল গাছে কচি নবপল্লব দেখা যায়। মধুকর ফুলে গুঞ্জন করিয়া ফিরে। বসন্ত নিত্যকালের নয় বলিয়াই তো সে মর্ত্যে এত প্রিয়। বসুন্ধরাতে তাহার ক্ষণিক আগমনই ধরণীকে স্বর্গের উচ্ছ্বাস-রসে ভরিয়া তোলে। শীতের কঠোর আঘাতে ধরণী যখন সকল নিঃস্বতায়, রিক্ততায় হাহাকার করে, তখনই বসন্তের নয়ন ভুলানো রূপ আনন্দের দ্বার খুলিয়া দেয়।

বসন্তের আবির্ভাব

তাই বলি, বাঙলার ষড়্‌ঋতু যেন বীণার ছয়টি তার। বীণার একতারে ঝঙ্কার দিলে সঙ্গীতের রস সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না—কেমন যেন বেসুরো তালে বাজে; তাই বুঝি একটির পর একটি করিয়া বাঙলার ষড়্‌ঋতু বাঙলার প্রকৃতিকে নিত্য নূতন রস, নিত্য নূতন সুষমা এবং নিত্য নূতন অভিব্যক্তি আনিয়া দেয়। শীতের পর বসন্ত আসে, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা প্রভৃতি কালের সহজ-নিয়মে পর পর আসে। ইহারা সকল বৈচিত্র্য লইয়া আসে বলিয়াই প্রকৃতির সৌন্দর্য চির পুরাতন হইয়াও চির নূতনের আভাস দেয়।

উপসংহার

বাঙলার বর্ষা

বর্ণসম্ভারে বিচিত্র সঙ্গীতে বর্ষার আগমন যেন প্রকৃতির এক নূতন আবির্ভাব। সমস্ত প্রকৃতি উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্যে একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। ঘনঘোর মেঘের স্তূপে আকাশ ছাইয়া যায়। নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসে। থাকিয়া থাকিয়া মেঘাবৃত আকাশে মেঘ ডাকার শব্দ; ছায়াবৃত বনকুঞ্জে বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত আনন্দরাশি, নিজেকে প্রকাশ করিবার বেদনায় তার 'গুমরি ক্রন্দনের' আর শেষ নাই—বহুদিন পর তাহার রুদ্ধ বেদনা বাহির হইবার পথ পাইয়াছে। সেই বেদনাকে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াও যেন শান্তি নাই। বর্ষার স্পর্শে শুষ্ক প্রায় নদী খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠে। গ্রামের অলিপথ গলিপথ, জলধারায় পূর্ণ হইয়া উঠে। কাশবন, শরবন, স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হয়।

বর্ষার আগমন ও বর্ষা প্লাবিত ধরণী

গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়ায়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায় তৃণগুল্মে, ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা মাটির ঘরগুলি ধ্বসিয়া পড়ে। বাড়ির কোণে নৌকা ভাসে। চারিদিকে শুধু জল আর জল।

বর্ষার বর্ণনা

বর্ষাকালে প্রকৃতির শোভা অপূর্ব সুন্দর হইয়া থাকে। আকাশ প্রায় সব সময়েই স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ মেঘমালা দ্বারা আবৃত, সে মেঘের দিকে চাহিলেও চোখ যেন জুড়াইয়া যায়। বারি-বর্ষণের ফলে চারিদিকে গাছপালার ও মাঠের তাজা সবুজের হাট, নয়ন ও মন উভয়ের পক্ষেই পরিতৃপ্তিকর। সারাদিন ধরিয়া যখন বাদল ঝরে তখন ঘরে বসিয়া থাকা, ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যাহার মাথার উপর আশ্রয় আছে ও যাহার আহারের চিন্তা নাই, তাহাদের পক্ষে বিশেষ আরামদায়ক হয়। বিশেষতঃ রাত্রিকালে যখন আকাশে কৃষ্ণমেঘ ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, গুরু গুরু মেঘগর্জন হয় ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতে থাকে তখন সকল মানুষের মনে এক অপূর্ব ভাব আসে। বর্ষাই বাঙলাদেশকে শস্যশ্যামলা করিয়াছে। বাঙলার অন্ন, বাঙলার ঐশ্বর্য, বাঙালীর মনের সরলতা ও কোমলতা বর্ষার বারিধারার উপর নির্ভর করে।

অপকারিতা

বর্ষাকালে নয়ন ও মন উভয়ই পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু এই সময়ের অসুবিধাও অনেক আছে। যাহাদের বাহিরে যাতায়াত করিতে হয়, তাহাদের বড়ই কষ্ট। পথিকের পক্ষে বর্ষাকাল আদৌ প্রশস্ত নহে। এজন্য আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই এই রীতি চলিয়া আসিয়াছে যে সন্ন্যাসী,ভিক্ষু,পরিব্রাজক প্রভৃতি ব্যক্তিরা সারা বৎসর দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন কিন্তু বর্ষার সময় চারিমাস তাহারা কোনও স্থানে একটানা বাস করিতেন। পল্লী অঞ্চলে আবার বর্ষার সময়ে সাপের ভয়—গর্তে জল ঢোকে বলিয়া সাপ বাহিরে আসে ; এ ছাড়া জোঁকেরও ভয় আছে। কাঁচা রাস্তাগুলি আর রাস্তা থাকে না, পাঁকে ও কাদায় দ' হইয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে মহিষের গাড়ী ভিন্ন অন্য যান বর্ষাকালে সম্ভব হয় না এবং হাঁটিয়া যাতায়াত করা কঠিন হয়। পূর্ববঙ্গ নদী-বহুল দেশ, বর্ষায় সেখানে জলপ্লাবন হয়। মনে হয় সমস্ত দেশ জলে জলময়—বাড়ীর একঘর হইতে অন্যঘরে যাইতে গেলেও জল ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। তখন নৌকা ভিন্ন একটুখানিও যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

উপকারিতা ও উপসংহার

বর্ষাকালে গরীবদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাহাদের ভাঙ্গা চাল দিয়া অবিরাম জল পড়ে, তখন গৃহে অবস্থানও কষ্টকর হইয়া উঠে। তখন অনেককেই ভিজা কাপড়ে থাকিতে হয়। মাঠে খালি পায়ে চলাফেরা করার ফলে পায়ে, হাজা বা পাকুই প্রভৃতি হয়। আবার বর্ষার কিছু পর হইতে নানাপ্রকার ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, এই সময়ে পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বাড়িতে থাকে। বর্ষাকালে আমোদ প্রমোদ একেবারেই বন্ধ থাকে—একমাত্র রথযাত্রা ছাড়া অন্য

কোন পূজা-পার্বণ প্রায় কিছুই হয় না। এই সময়ে কৃষাণদের পক্ষে বিশেষ পরিশ্রমের সময়। বর্ষাকালের সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। তবুও বর্ষাকাল আমাদের দেশের বিশেষ উপকার করে। আমরা কিন্তু সকলেই এই-ঋতুকে মনে-প্রাণের সহিত ভালবাসি, এই ঋতুর জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করি। আমাদের ভারতবর্ষের কবিরা আবহমান ধরিয়া উল্লাসের সহিত বর্ষার বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। বর্ষা ঋতু জল দিয়া জগতের এত উপকার বলিয়াই উহার এত আদর।

বাঙলার শরৎ

বর্ষচক্রের আবর্তনে প্রকৃতির ঋতু-রঙ্গশালা বাঙলার বুকে পর্যায়ক্রমে রূপান্তর আসে—উহাই হইল ঋতু। বিভিন্ন ঋতুতে বাঙলার জলে-স্থলে ও আকাশে বিচিত্রতর রূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের তপ্ত-রিক্ততা, বর্ষার ধরণীস্নাত আবেশ-বিহ্বলতা, শরতে নাই।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

শরৎ কয়েকটি দৃশ্য সমষ্টির মাঝে নিজের আত্মাকে মেলিয়া ধরে একটি বিশেষ ক্ষণে, বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ কয়েকটি অবস্থার ভিতর দিয়া সে আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলে। দৃশ্যের দর্পণে প্রতিবিম্বিত শরৎ আত্মার স্বরূপ কবিদের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির কাছে অত্যন্ত স্পষ্টোজ্জ্বল রূপ লইয়াছে। শরৎ ঋতুর বর্ণনাও তাই মধ্য ও আধুনিক যুগের কবিকুলের হাতে সুন্দরতম রূপলাভ করিয়াছে।

বর্ষার ধরণীস্নাত আবেশ-বিহ্বলতা শরতের সাথে সাথে অভিনব রূপ লাভ করে। আকাশের নিঃসীম নীল ভাব আর শরতে নাই। শরতের আকাশ কাচের মত স্বচ্ছ। ক্রীড়াচঞ্চল শৈশব চাপল্যে ভরপুর। শরৎ দিকে দিকে যেন ফুল ছড়াইতে আসে। শিউলি, কাশ, পদ্ম প্রভৃতি পুষ্পসম্ভার যেন বঙ্গ প্রকৃতি-রাণীকে অভিনব বৈচিত্র্য দান করে।

শরতের রূপ

চতুর্দিকে এক অত্যাশ্চায ভাব-ভাবনার বিকাশ ঘটিতে থাকে। বহু-দিনের তৃষিত চাতক যেন আনন্দ বারিধারা আকণ্ঠ পান করে। সকলে বর্ষার দিনের স্মৃতি ভুলিয়া গিয়া দিকে দিকে পূজোর দিনের আলো দেখিতে পায়। স্বতোৎসারিত আনন্দে বঙ্গবাসিগণের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে আলোড়িত করিয়া তুলে। আকাশের কান্না তখন থামিয়া গিয়া ভারি মুখে হাসি ফোটে। সমন্বয়ের আলোকে শরৎ ধনী, দরিদ্র সকলের মনোহরণকারী সংবাদ বহন করিয়া আনে। আনন্দময়ীর আগমন ধ্বনি পাখীর কলতানে মুখরিত হইয়া উঠে। শরতে ধরণীর আঁচল শিশিরসিক্ত রূপ ধারণ করিয়া তপনে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝলমল করিয়া উঠে, মনে হয় যেন দিকে দিকে কত শত মণিমুক্তা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শরতের রাত্রি দিনের চেয়েও অধিকতর মনোহর। সম্ভবতঃ শরৎ প্রকৃতির এইরূপ নয়নলোভন রূপের দিকে তাকাইয়া কবি বলিয়াছেন—

"মাতার কণ্ঠে শেফালী মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে অবনী।
পরেছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে
কুসুমভূষণ জড়িত চরণে,
দাঁড়ায়েছ মোর জননী।"

উৎসবপ্রিয় বাঙালী জাতির জীবনে শরৎ ঋতু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই শরৎকালীন, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের শোভার মধ্যেই বাঙালী বিশ্বজননী দুর্গাদেবীর আবাহন করে। ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ দুঃখের স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া আশা-আকাঙ্ক্ষায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। বাঙলার প্রবাসী-সন্তান শত রকম বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করিয়াও শ্যামল পল্লীর কোমল বুকে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া আসে। বহুদিনের নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যাশা পূজা-অর্চনার পর উৎসব আনন্দের শেষে, দশমীর দিন ঘটে। এইদিনে বাঙালী আনন্দময়ী মাতৃজননীকে অশ্রু পরিপূর্ণ নয়নে বিদায় দেয়। এই শরৎকালেই দুর্গাপূজার পর একে একে লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙলার সন্তানদের কলরবে পল্লীর জনবিরল মাঠগুলি পর্যন্ত এই ঋতুতে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। শৌর্যে-বীর্যে অতীত বাঙালী সমাজে রাজা-মহারাজারা এই ঋতুতে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। মাতৃপূজার পরে শিরে জগজ্জননীর আশীর্বাদ-তিলক লইয়া শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতেন। এই কারণে শরৎ ঋতুর সহিত বাঙালী সমাজের সনাতন ঐতিহ্য জড়িত রহিয়াছে।

শরৎকালীন উৎসব

বাঙলাদেশের ষড়্ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির মধ্যে যেরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়, তার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বাঙলা দেশের এই ছয়টি ঋতুর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই সম্পর্কে যথার্থ জবাব দেওয়া সত্যই কষ্টসাধ্য। তবুও আমরা আনন্দে, মাধুর্যে, সৌন্দর্যে এবং উৎসবের প্রাচুর্যে শরৎ ঋতুকেই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারি। বসন্ত ঋতুরাজ হইলেও শরৎ ঋতু কোন অংশেই তাহার অপেক্ষা কম নহে। বসন্ত ঋতুর আবেদন মনে, আর শরতের আবেদন প্রকৃতির সহিত নৈকট্যস্থাপনে। বসন্ত ঋতু প্রিয়, আর শরৎ হইল একান্ত অন্তরঙ্গ। সম্ভবতঃ এই কারণেই বাঙলা সাহিত্যে বসন্তের গান অপেক্ষা শরতের গানেই সুগভীর অন্তরঙ্গতার সুর ধ্বনিত হয়।

উপসংহার

বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি

সংস্কৃতির অর্থ বিশেষ ব্যাপক। সুতরাং এই সংস্কৃতি বলিতে ধর্ম, সামাজিক আচা[illegible] ব্যবহার, শিল্প সাহিত্য, গীত-বাদ্য ইত্যাদি সব কিছুতেই বুঝায়। লৌকিক সংস্কৃতির [illegible] সেই ধরণের সংস্কৃতি যাহা লোক-সাধারণের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, মননশীল পণ্ডিতের জ্ঞান ও বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে, তাহাকে আমরা লৌকিক সংস্কৃতি বলিতে পারি না। সংস্কৃত, ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিজাতীয় সমাজ আদর্শ, আমরা বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না। কিন্তু কথক ঠাকুরের কথকতা অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েত আমরা বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতির অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি। উচ্চ রাগ-রাগিণীযুক্ত ধ্রুপদ ও খেয়াল বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কহীন হইলেও ভাটিয়ালী ও যাত্রা গান এই সংস্কৃতির পরিচায়ক।

লৌকিক সংস্কৃতি কাহাকে বলে

মরা মানুষ অমরত্ব লাভ করে সংস্কৃতির দ্বারা। মানুষ মরে, তাহার রাষ্ট্র ও সভ্যতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু তাহার সংস্কৃতি অক্ষয়, অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকে। ভারতবর্ষে আর্য আগমনের পর অনার্য শাসন ও সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া গেল কিন্তু অনার্য সংস্কৃতি বাঁচিয়া রহিল আর্য সংস্কৃতির মধ্যে। এক সংস্কৃতি যখন অন্য সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, তখন অনেক সময়েই তাহা ছদ্মবেশ ধারণ করে। সে জন্য ভিন্ন সংস্কৃতির রূপ বুঝা অনেক সময়ই শক্ত হইয়া পড়ে। বহু সংস্কৃতির ধারা এমনভাবে আমাদের বর্তমান সমাজের মধ্যে টিকিয়া রহিয়াছে, যাহাদের স্বরূপ পুরাতত্ত্ববিদ ছাড়া অন্য কাহারও কাছে সহজে ধরা পড়ে না। ভারতের সামাজিক জীবনে কলা, ধান, সুপারী, সিন্দুর ইত্যাদি সংস্কৃতির চিহ্ন। এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে—ইহাই হইতেছে সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ আর্য সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র কিন্তু আর্যদের সংস্কৃতির প্রভাব এই দেশে সর্বত্র পরিস্ফুট। দ্রাবিড়, শক, হুন, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি কত বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির প্রভাব আর্য সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে কে তাহা গণনা করিয়াছে?

সংস্কৃতি প্রাচীনকাল হইতে বহিয়া চলে

বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি বাঙলার গ্রাম ও প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। বাঙলার মাটির প্রভাবেই বাঙালীর মন গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই বাঙালীর গীতিকা, ছড়া ও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তো এই স্নিগ্ধ ও কোমল অন্তরের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙলার প্রকৃতি পল্লব ও কিসলয়ে, ফুলে ও ফলে অপরূপ শ্রী ও শোভা ধারণ করে; সেইজন্যই তো বাঙালী এত ভাবুক, এত কাব্যরসিক, বাঙালীর সারা জীবনই যেন একটি কাব্যের সুরে বাঁধা।

বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

বাঙলার দেব-দেবী, আচার অনুষ্ঠান এবং শিল্প-কলার মধ্যে আর্যেতর সমাজের বহু পরিচয় জীবন্তভাবে বিদ্যমান।

বাঙলায় সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হইতেছে ধর্ম। ইহা আমাদের জাতীয়তা ও সংস্কৃতির উৎস। বাঙলার মধ্যে লৌকিক ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্ম পাশাপাশি বিরাজমান রহিয়াছে।

বাঙলার লৌকিক ধর্ম

আবার অনেক লৌকিক দেব-দেবী, পৌরাণিক দেব-দেবীর সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ষষ্ঠীদেবী, মনসাদেবী, ওলাদেবী প্রভৃতি এইরূপ কত অনার্য দেব-দেবী যে বাঙলার ঘরে ঘরে পূজিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নেই।

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানও সংস্কৃতির অন্তর্গত। ডাক ও খনার বচন বাঙলার কৃষকদের কৃষিকার্যে অনেক উপদেশ দান করিয়া থাকে। হাঁচি, টিকটিকি, সর্পদর্শন, চক্ষুপক্ষ্ম

বাঙলার সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান

কম্পন ইত্যাদি বহু প্রকার কুসংস্কার সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। সূতিকাগৃহে ও বিবাহ বাসরে এমন সব লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়, যাহা কোন শাস্ত্র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙলার পরিচ্ছদ, অলঙ্কার আভরণের মধ্যেও তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় প্রাচীন বাঙলা কাব্যে পাওয়া যায়।

সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয় সাহিত্যে। বাঙলার লোক সাহিত্যের মধ্যে তাহার লৌকিক সংস্কৃতি জীবন্ত হইয়া আছে। শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্যে, যাত্রা, কবিগান, বাউল ও

বাঙলার সাহিত্য

ভাটিয়ালী, ছড়া ও প্রবাদ ইত্যাদির মধ্যে বাঙলার প্রাণ বাঁচিয়া রহিয়াছে। এই সাহিত্যের মধ্যে জয়দেবের সঙ্গীত নাই, বিদ্যাপতির অলঙ্কার নাই, ভারতচন্দ্রের ভাষা নাই কিন্তু ইহার মধ্যে সবল পল্লী জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আছে। ফুল্লরা, খুল্লনা, বেহুলা, কালু ও লখ্যা, আগমনী ও বিজয়াগানের মেনকা ও উমা, মহুয়া, মলুয়া কঙ্ক ও লীলা আমাদের পল্লী সমাজের নিখুঁত চরিত্র।

চিত্রকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মধ্যেও বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের গড়া পুতুল ও খেলনা দ্রব্য আজ পর্যন্তও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙলার মেয়েদের আঁকা আলপনার সৌন্দর্যের তুলনা খুব কম চিত্রকলার মধ্যেই আছে। বাঁশ, খড় ও মাটির দ্বারা পল্লীবাসী বাঙালী যে রকম কুটীরনির্মাণ করে,

বাঙলার চিত্রকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও কুটীরশিল্প

তাহা বাঙলার বাহিরে কোথাও দৃষ্ট হয় না। পটুয়াদের পট এবং হাঁড়ি-কলসী, বাসন ও বস্ত্রের মধ্যে যে সূক্ষ্ম চিত্রণ দেখা যায়, তাহা সত্যই অপূর্ব। বাঙলার কারিগরেরা যেরূপ সুন্দর প্রতিমা নির্মাণ করেন, তাহার শিল্পসৌন্দর্য অনবদ্য। বাঙলার নানাপ্রকার কুটীর-শিল্পের মধ্যেও তাহার লৌকিক সংস্কৃতির চিহ্ন পরিস্ফুট। গ্রামের মেয়েরা যে কাঁথা সেলাই করিতে পারে, তাহার শিল্প নৈপুণ্যও অতীব প্রশংসনীয়। গ্রামের গরীব লোকেরা ঘরে

যে সব পাটী, মাদুর, মোড়া ও আসন তৈয়ারী করেন তাহাদের দ্বারাও অনেক লোকের জীবিকার সংস্থান হয়। বাঙলার গ্রামের তাঁতিরা আজ পর্যন্তও সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ... করিয়া বস্ত্রসংকট খানিকটা দূর করিতেছে।

বর্তমান অবস্থা ও উপসংহার

আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আঘাতে বাঙলার প্রাচীন লৌকিক সংস্কৃতি দেশের মধ্য হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বাঙলার গ্রাম হইতে বাঙালীর প্রাণ সহরের মধ্যে আজ সঞ্চারিত হইয়াছে। সহরের মধ্যে আধুনিক যন্ত্র ও জড়বাদের প্রভাবে নূতন বিজাতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু বাঙলার গ্রামের সংস্কৃতি আজ অযত্নে এবং অনাদরে প্রায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই লৌকিক সংস্কৃতিকে বাঁচাইতে না পারিলে বাঙলার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

বাঙলার কুটীরশিল্প

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় কিছুটা পিছাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বাঙলা তথা ভারতবর্ষের কুটীরশিল্প সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিত। মাত্র অর্ধ শতাব্দী আগেও আমাদের পল্লীগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। কৃষি ও শিল্প দুই-এর মধ্যে ছিল সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা। বাঙলার চাষী উৎপাদন করিত খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল আর কারুশিল্পীরা তৈয়ারী করিত বিচিত্র ধরণের শিল্প-পণ্য। একের চাহিদা মিটাইত অপরে। তখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য আমাদিগকে বহির্দেশের কাছে হাত পাতিতে হয় নাই। আত্মনির্ভরশীলতার ও সহযোগিতামূলক শ্রমবিভাগ সকল অভাব দূর করিয়াছে। অর্থসাম্যই ছিল সকল উন্নতির উৎস। বংশানুক্রমে তন্তুবায়, সূত্রধর, চর্মকার, শাঁখারী, কাঁসারী প্রভৃতি শ্রমজীবীরা অপূর্ব নৈপুণ্যের সহিত পণ্য উৎপাদন করিয়া তাহাদের বংশখ্যাতি ও সর্বোপরি বাঙলার কুটীর-শিল্পের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে।

কুটীরশিল্প লুপ্তপ্রায়

কিন্তু বাঙলা ও ভারতের কুটীরশিল্পের সেই সুবর্ণযুগ আজ ইতিহাস। বর্তমানে বিদেশ হইতে শিল্পজাত পণ্যের অবাধ-আমদানী ও ভারতে যন্ত্রদানবের আবির্ভাব এদেশের কুটীরশিল্পগুলিকে মারাত্মকভাবে আঘাত করিয়াছে। ফলে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পগুলির সঙ্গে দেশীয় শিল্পগুলির প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিল না। ফলে পল্লীর শিল্পীরা নিরুপায় হইয়া তাহাদের জন্মগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, দেখিতে দেখিতে গ্রামের অর্থসাম্য নষ্ট হইল। ফলে বেকার সমস্যা ও তজ্জনিত অর্থাভাব দেশের মধ্যে দেখা দিল। তাঁতি, জোলা, ছুতোর, কুমোর, শাঁখারী, কাঁসারী প্রভৃতি সম্প্রদায় ধ্বংসের মুখে আগাইয়া চলিল—বাঙলার কুটীরশিল্প মরিতে বসিল।

এ যাবৎ কুটীরশিল্পগুলির পুনরুদ্ধার ও উন্নতি সাধিত না হওয়ায়, ব্যবসায়-...ন্য ও শিল্পের অভাবে বাঙালীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহার জন্য এতটুকু ব্যগ্রতা পর্যন্তও আমাদের নাই। দেশের শিল্পগুলি লোপ পাওয়াতে ও লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিতে জমির উপর বর্তমানে অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে, তাই কেবল কৃষি আমাদের জীবিকা সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না। বৃহৎশিল্পের পাশে কুটীরশিল্পের স্থান করিয়া দিতে হইবে এবং এইভাবে উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জাপান, জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্র। বিগত যুদ্ধের সময় আমাদের কুটীর-শিল্পগুলির আপন অস্তিত্বের সার্থকতা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছে। যান্ত্রিক উৎপাদন যুদ্ধের সকল চাহিদা পূরণ করিতে পারে নাই। যানবাহনের অভাবে আমদানি-রপ্তানি ব্যাহত হইলে, বাঙলার কুটীরশিল্পগুলিই তখন দেশবাসীর সমস্ত চাহিদা মিটাইয়াছে।

কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার আবশ্যক

দেশের আর্থিক অভাব ঘুচাইতে হইলে কৃষি ও কুটীরশিল্পের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে, তাহা হইলে মুমূর্ষু অবস্থা কাটিয়া পল্লীপ্রাণ বাঙলার বুকে আবার জীবনের স্পন্দন দেখা দিবে। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগে জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে হইলে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প অপরিহার্য কিন্তু কেবল কল-কারখানাগুলি দেশের বেকারত্ব ঘুচাইতে অপারক। এগুলি শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কিছুটা অভাব ঘুচাইতে পারে বটে কিন্তু বৃহত্তর দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই। কেন না যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শ্রমের প্রয়োজন কমিয়া আসে, ফলে শ্রমিকদল বৃত্তিহীন হইয়া পড়িতে বাধ্য। এই কারণেই যান্ত্রিকশিল্পসমৃদ্ধ আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার অবস্থায় রহিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের বেশ কিছুটা উন্নতি হইয়াছে অথচ সেই অনুপাতে শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত হয় নাই; উপরন্তু বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দেশের বৃহৎশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটীরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা অপেক্ষা কম। সুতরাং কুটীরশিল্পকে উন্নত করিতে পারিলেই আমরা আর্থিক দুর্দশার হাত হইতে কিছুটা রেহাই পাইব।

যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে কুটীর-শিল্পেরও প্রয়োজনীয়তা

বাঙলার অনেকগুলি কুটীরশিল্প আজ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতশিল্প, রেশমী বস্ত্রশিল্প, হস্তনির্মিত কাগজশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতু শিল্প, শাঁখা শিল্প, বোতাম ও চিরুনীশিল্প কোনরকমে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আজও বাঙলার বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছে। উপযুক্ত পরিচালনায় পুরান কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে এদেশে যে বিচিত্র রকমের শিল্পপণ্য তৈরী হইতে পারে, তার দৃষ্টান্ত 'শ্রীনিকেতন' ও 'খাদিপ্রতিষ্ঠান' এবং এজন্য সরকারী তত্ত্বাবধানেই সর্বাগ্রে

কাম্য। বাঙলার কুটীরশিল্পীরা অবিশ্রান্ত রকমের দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করে। মূলধনের অভাবে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়িয়া প্রাপ্য লভ্যাংশ হইতে ইহারা বঞ্চিত হয়। শিল্পদ্রব্য বিষয়ে ক্রেতার রুচিরও নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে। কিন্তু কুটীরশিল্পের ক্ষেত্রে গবেষণা ও যথাযোগ্য শিক্ষার অভাবহেতু পল্লীশিল্পীরা শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্মত মানুষের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। এসব কারণে কুটীরশিল্পের প্রসার বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। শ্রমিকের অভাব এদেশে নাই, এক্ষেত্রে অধিক মূলধনেরও প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন শুধু সংগঠন শক্তি, ব্যবসায়িক বুদ্ধি, আত্মপ্রত্যয় ও অর্থসাহায্য তথা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। উপযুক্ত তত্ত্বাবধান হইলে বাঙলার কুটীরশিল্পগুলি যে গ্রামের আর্থিক অবস্থার সম্যক উন্নতিবিধান করিতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কুটীরশিল্পের সুতত্ত্বাবধান

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার একমাত্র প্রধান সহায়। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে কুটীরশিল্পের স্থান কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। বর্তমানে দেশে বেকার সমস্যাও উগ্ররূপে দেখা দিয়াছে। দেশের সর্বশ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে কুটীরশিল্পেরও প্রয়োজন আছে। কুটীরশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতির উপরই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং যান্ত্রিক সভ্যতা ও নগর জীবনের মোহ কিছুটা ত্যাগ করিয়া প্রাচীন অর্থনীতির দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। বাঙলার গ্রামগুলি বাঁচিলেই বাঙালী বাঁচিবে। নবোদ্যমে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে পারিলে কুটীরশিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালীর হৃতগৌরব পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।

উপসংহার

বাঙলার বেকার সমস্যা

কর্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কর্মে নিযুক্ত না হইবার সমস্যাই বেকার সমস্যা। ইহা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। সময়গতিকে এই সমস্যা কখনও তীব্রতা লাভ করে, আবার কখনও বা হ্রাস পায়। কারখানা প্রথার প্রবর্তন, শিক্ষার বিস্তৃতি এবং যন্ত্রশিল্পের সহিত কুটীরশিল্প আঁটিয়া উঠিতে না পারায় বেকার সমস্যার উদ্ভব। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বেকার সমস্যার সহিত বাঙলাদেশের বেকার সমস্যার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। অবিভক্ত বাঙলায় এই সমস্যা তত তীব্র ছিল না। স্বাধীনতালাভের পরে বাঙলাদেশকে পূর্ব এবং পশ্চিম—এই দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। উহার ফলে কৃষির দিক হইতে উন্নত পূর্ব বাঙলা এবং শিল্পোন্নয়নের দিক হইতে উন্নত পশ্চিম বাঙলার সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা এখন পশ্চিম বাঙলার অধিবাসী। সুতরাং বাঙলার বেকার সমস্যা

প্রারম্ভিক ভূমিকা

[?]লিতে আমরা পশ্চিম বাঙলার বেকার সমস্যাই মনে করিব। দিনের পর দিন পশ্চিম [?]লার বেকার সমস্যা তীব্র হইতে তীব্রতর রূপ ধারণ করিয়াই চলিয়াছে।

বারো মাসে তের পার্বণের দেশ এই বাঙলা। এখানকার মাটিতে নাকি একদিন সোনার ফসল ফলিত। এখানকার জলবায়ু-আবহাওয়ার মধ্যে কেমন জানি একটা মাদকতা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই ব্রিটিশ বণিকদের নিকট এই দেশ অধিকতর আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাদের চেষ্টাতেই একদিন বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পনগরী কলিকাতার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাদের প্রয়োজন নির্বাহের তাগিদে সামান্য মাত্র ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীর কাজেই সেদিনকার বাঙালী সমাজ চরম বলিয়া মনে করিত। ফলে কৃষিকর্মের প্রতি বিরাগ জন্মাইল, পল্লীবাসে বিতৃষ্ণা দেখা দিল। সমগ্র দেশব্যাপী ভাঙ্গা-গড়া আর উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া সেদিন এই সমস্যার সূত্রপাত দেখা দিল। তবুও পুকুরের মাছ, গাছের ফল, বাগানের সব্জী, ক্ষেতের ফসলের টানে শিক্ষিতেরা গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হইত। অবসর সময়ে ঘরে বসিয়া মাটির পুতুল ও খেলনা, বাঁশের দ্বারা রচিত সুন্দর নিত্যব্যবহার্য জিনিস প্রভৃতি কুটীরশিল্পের প্রতি মন-সংযোগ করিত। বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় একদিন উহা পরাজয় স্বীকার করিল। এইরূপে এই সমস্যা দিনের পর দিন তীব্ররূপ ধারণ করিল শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্মুখে যেমনি উহা কর্মসংস্থানের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল, অন্যদিকে তেমনিভাবেই শ্রমিক এবং কৃষকদের সম্মুখেও এই সমস্যা বর্ধিতরূপ লইয়া উপস্থিত হইল। সর্বোপরি, বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের লোকেরা উদ্বাস্তু হইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবার জন্যই উহা আরও জটিলতর রূপ ধারণ করিল।

ব্রিটিশ ভারতে বেকার সমস্যা

ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলির ন্যায় বর্তমান যুগে বাঙলাদেশের বুকে তিন শ্রেণীর বেকার সমস্যা দেখা যায়। যেমন—(১) শিল্পগত বেকার সমস্যা, (২) কৃষিগত বেকার সমস্যা এবং (৩) শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা। আমরা শহরে বসিয়া কেবলমাত্র শিক্ষিত এবং শিল্পগত দিক হইতে বেকারদের সমস্যার কথাই শুনি। গ্রামে গেলে কৃষিগত সমস্যার সহিত পরিচিত হওয়া যায়। এই তিনটি সমস্যার সহিত পরিচিত হইতে হইলে সর্বাগ্রেই যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইল জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙলাদেশেও প্রতি বছর অত্যন্ত প্রবলহারে জন্মের হার বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই পূর্ব সমস্যার আশু সমাধান হইতে না হইতেই আরও বহু চাকুরী প্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলে সরকারের পক্ষে এইরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দিশেহারা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এ যুগে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ হইতে সদ্যপ্রাপ্ত সার্টিফিকেট লইয়া চাকুরীপ্রার্থী যুবক-যুবতীরা দিশেহারা হইয়া ঘুরিতে থাকে। সুজলা-

বর্তমান অবস্থা

সুফলা দেশের মানুষ আজ খাওয়া পরার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। বাঙলাদেশের প্রাণ কলিকাতা মহানগরীতে অন্যান্য প্রদেশবাসী এবং বিদেশীরা বিভিন্ন বাজার আগলাইয়া রাখিয়াছে। একদিকে যেমন চাকুরী না পাইবার যন্ত্রণা, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রী করিবার তাগিদ, অন্যদিকে আবার প্রতিবাদ মিছিলের গগনভেদী সোরগোলে বাঙলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরী আজ সন্ত্রস্ত এবং বিপর্যস্ত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাধীন দেশের সরকার এই সমস্যার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন সত্য, তথাপি এখনও বাঙলাদেশে বেকারের সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ।

একদিন বলা হইত বাঙলাদেশের শিক্ষিতেরা কায়িক পরিশ্রমের প্রতি বিমুখ এবং উহাকে অপমানজনক বলিয়া মনে করে। এ যুগে কিন্তু সমস্যা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

বেকারদের কর্মের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি

বহু সংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারী প্রভৃতির প্রতি অনেকেরই আগ্রহ বাড়িয়া গিয়াছে। আজকাল শিক্ষিত যুবকেরা যে কোন প্রকার পরিশ্রমসাপেক্ষ কর্মগ্রহণে উৎসাহী এবং আগ্রহী।

যদিও এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান অসম্ভব। তথাপি যদি দ্রুত শিল্পায়ন, স্বজন পোষণ নীতির উচ্ছেদ এবং পল্লী অঞ্চলে কুটীরশিল্প যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করিতে হইবে—তাহা হইলে এই সমস্যার তীব্রতাকে অনেকটা লঘুতর করা যাইতে পারে। পর্যাপ্ত সংখ্যক আর্থিক

উপসংহার

মূলধন সরবরাহ করিলে অনেক ব্যক্তির দ্বারাই এক কিংবা একাধিক মালিকানা ভিত্তিতে গঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া প্রয়োজন মত বহু বেকারকেই কর্ম সংস্থান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সমস্যার সম্পূর্ণতর সমাধান কষ্টসাধ্য বলিয়াই অসৎ উপার্জনের পথ বাছিয়া লওয়া কিংবা আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করার পশ্চাতে কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকিতে পারে না। বেকার সমস্যা কেবলমাত্র আমাদের দেশের একার সমস্যা নহে, অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ভারতবর্ষের ন্যায় বহু পুঁজিবাদী দেশেই বর্তমান রহিয়াছে।

বাঙলার কৃষি ও কৃষক

[স্কু: ফা: ১৯৬১, উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২]

'হাসিম শেখ' ও 'রামাকৈবর্ত' আমাদের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের

প্রারম্ভিক ভূমিকা

কল্পিত কৃষক দুইজন বাঙলার কৃষক সমাজের সার্থক প্রতিভূ। ইহাদের চাষ ও জীবনযাত্রার প্রণালী বাঙলাদেশের কৃষকের চাষ ও জীবনযাত্রার প্রণালীরই সার্থক রূপায়ন। কঙ্কালসার দুইটি বলদ আর তাহাদের মনিব

এই 'হাসিম শেখ' আর 'রামা-কৈবর্ত'কে আমাদের আজ আর চিনিতে ভুল হয় না, যখন বাঙলার কৃষকের অবস্থার বাস্তব চিত্র। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গজননীর প্রশস্তি গাহিয়াছেন:

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্

এই দেশের মাটিতে বাঙলার চাষী আঁচড় কাটিলেই যেন সোনা ফলিত। কিন্তু সেই যুগ দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। সেদিনও যেমন এই দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিত, আজও তেমনি করিয়া থাকে। যে বৎসর ফসল ভাল হয় না সেই বৎসর দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদও দুর্বল হইয়া পড়ে।

বর্তমানে বাঙলার কৃষকের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে চলিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ইহার একটি কারণ। যে হারে জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার তুলনায় খাদ্য উৎপন্ন না হওয়ার দরুণও কৃষির উপর চাপ পড়িতেছে।

কৃষকদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি শিল্পেরপ্রসার ঘটিত তাহা হইলে কৃষির উপর এত চাপ পড়িত না। কিছু সংখ্যক লোক শিল্প কারখানায় কাজ করিয়া অন্ন সংস্থান করিতে সক্ষম হইত। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের লোক কৃষির উপর অনেকাংশে কম নির্ভরশীল। আমাদের দেশের চাষীদের স্কন্ধে দারিদ্র্য—একটি অভিশাপের মত চাপিয়া বসিয়া আছে। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তারা বিশেষভাবে জর্জরিত। এই উৎকট দারিদ্র্যের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য তারা খাইতে পায় না, ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায় ও নানাপ্রকার ব্যাধির কবলে পতিত হয়। উপযুক্ত পথ্য ও ঔষধের অভাবের জন্য তাহারা একে একে বীজধান, লাঙ্গল জোয়াল প্রভৃতি বেচিয়া শেষ পর্যন্ত মহাজনের নিকট ঋণ করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে সর্বহারা হইয়া তাহারা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়।

অশিক্ষা ও অজ্ঞানতাজনিত নানাবিধ কুসংস্কার চাষীকে দিন দিন অবনতির দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। যুগ যুগ ধরিয়া কৃষ্টি ও সভ্যতার অভাবে তাঁহারা বিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রকার আধুনিকতার স্বাদ হইতে বঞ্চিত। এই অশিক্ষার জন্য তাহারা অন্যান্য দেশের

অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতা

চাষীদের সম্পর্কে কোন তথ্য জানিতে পারে না বা জানিবার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করে না। এই অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া দালাল শ্রেণীর লোকেরা চাষীদের বিশেষভাবে প্রতারিত করে ও তাহাদের ফসলের ন্যায্য মূল্যও দেয় না। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ নানাদিক আগাইয়া চলিতেছে সত্য, কিন্তু কৃষকদের দুঃখ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান। যে সমস্ত দেশে অধিক পরিমাণে

শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে সেই সমস্ত দেশগুলিতে চাষের অবস্থা বাঙলা দেশের মত দুঃখজনক নহে। বেশী পরিমাণে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকিলে জমির উপর চাপ কম পড়ে। ইহা ভিন্ন অনেকে শিল্পে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা উপার্জন করিতে পারে। তাহা ছাড়া কৃষকদের যখন জমিতে কাজ না থাকে, তখন তাহারা শিল্পে নিযুক্ত হইয়া উপার্জনের দ্বারা নিজেদের জীবনে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা আনিতে পারে।

কৃষি ও শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

জলসেচ ব্যবস্থা চাষের পক্ষে একটি অপরিহার্য উপাদান। জমিচাষের জন্য অধিকাংশ সময় চাষীকে আকাশের করুণার উপর নির্ভর করিতে হয়। কোন বৎসর বৃষ্টি নাই, আবার কোন বৎসর অতিবৃষ্টি হইয়া গ্রামের পর গ্রাম জলে ভাসিয়া যায়। সেইজন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার জলসেচ ব্যবস্থার জন্য বহু নদীতে বাঁধ দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক অর্থব্যয় করিয়া সেচযোগ্য খাল, বিল, পুষ্করিণীগুলির সংস্কার করা হইতেছে। কিন্তু এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও তেমন আশানুরূপ উৎকর্ষলাভ করিতে পারে নাই।

জলসেচ পদ্ধতি

ভাল সার, বীজধান ও উপযুক্ত জলসেচ না করা হইলে কৃষকের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। উন্নত ধরণের বীজধানের অভাবেও চাষীর ফলন ভাল হয় না। ইহা ছাড়া এখনও অনেক জমি পতিত ও অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেই সমস্ত জমিতে চাষ করিতে হইলে অনেক উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করিতে হইবে। কৃষিসংক্রান্ত পরীক্ষাগার, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকেন্দ্র এবং কৃষি শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রভৃতির একান্ত অভাব থাকার দরুণও আমাদের দেশে চাষের অবস্থা এত অনুন্নত।

সার, বীজধান প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার কৃষির উন্নতির জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন একটি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ সমবায়ের ভিত্তিতে ভূমিচাষ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে পূর্বের তুলনায় চাষের কিছু কিছু উন্নতি হইতেছে। তৃতীয়তঃ গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি উন্নয়ন বা সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারাও চাষ তথা চাষীর উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহার মাধ্যমে রাসায়নিক সার, উন্নত ধরনের বীজধান এবং অল্প সুদে কৃষকেরা ঋণ পাইতে পারিবে। গত ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর হইতেই কৃষকেরা কিছু কিছু সুবিধা পাইতেছে। ইহার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বাসগৃহের উন্নতি, শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার, নারীকল্যাণ ও শিশুমঙ্গল এবং ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের উন্নতি করা হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

...ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও বাঙলার কৃষকের তথা কৃষির তেমন উন্নতি ...। বাঙলার কৃষক যেই তিমিরে অবস্থান করিতেছিল সেই তিমির হইতে এখনও নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। সরকারী ব্যবস্থার বহু ত্রুটিই ইহার একমাত্র কারণ। সেই কারণে সরকারকে এই ব্যাপারে আরও যত্নবান হইতে হইবে।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, কৃষক ও কৃষির উন্নতির পথে নানা প্রতিবন্ধক বর্তমান। কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি না করিতে পারিলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণও ব্যাহত হইতে বাধ্য। তাই আজ আমরা কৃষি-ব্যবস্থার এই অধঃপতন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। বাঙলার চাষীকে যদি আজ আমরা বাঁচাইতে না পারি, তাহা হইলে সমগ্র বাঙলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে মৃত্যুর হাত হইতে রেহাই পাইবে না। বাঙলার চাষী বাঁচিলে আবার আমরা সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা রূপময় বাঙলাকে সত্যকারের দ্রষ্টার মত প্রত্যক্ষ করিতে পারিব।

উপসংহার

বাঙলার শীতকাল

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২]

বঙ্গপ্রকৃতি চির-চঞ্চলা, চিত্তস্পর্শিনী ও বিচিত্ররূপিণী। ঋতুতে ঋতুতে ইহার অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত হয় নতুন প্রাণাবেগ। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর রাজ্যেও পরিবর্তনের দুর্বার স্রোতঃপ্রবাহে চঞ্চল হইয়া ওঠে। মোহময়ী প্রকৃতির পরিবর্তন বর্ষচক্রের আবর্তন-বিবর্তনকে লইয়াই ইহাকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি দেয়। একাদিক্রমে দুই দুইটি মাস জুড়িয়া এক একটি ঋতু আসিয়া প্রকৃতির দ্বারে উপস্থিত হয়। সংখ্যার হিসাবে যদিও ছয়টি ঋতু, আসলে কিন্তু চারিটি ঋতুরই একচ্ছত্র আধিপত্য। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্ত এই চারিটি ঋতু স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বকীয় মহিমায় ভাস্কর। ইহাদের মধ্যে শীত ঋতুর জনপ্রিয়তা খুব বেশী নয়। তবুও প্রবল প্রতাপশালী শীত তাহার অপরিসীম আধিপত্য বিস্তার দ্বারাই মর্যাদা সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং বাঙালীর নিকট স্মরণীয় ঋতু বলিয়া স্বীকৃতিলাভে ধন্য হইয়াছে।

আরম্ভিক ভূমিকা

শীত ঋতু দুঃখের ঋতু। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও যে একটা ঐশ্বর্য আছে, একটা প্রাচুর্যতা আছে, শীত ঋতু যেন আমাদের তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়। রাত্রে হিম, সকালে কুয়াসা, গাছ হইতে পাতা যায় ঝরিয়া, ফুলের সৌন্দর্য আসে শেষ হইয়া—কিন্তু শীতের দিনে রিক্ততারভারে ক্লিষ্ট নয়, শীত হইতেছে সঞ্চয়ের ঋতু। তাই পৌষ আসিতেই কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন :

শীতের বর্ণনা

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে।

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে ॥'

ভোরের কুয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া স্বর্ণোজ্জ্বল তপনের অপরূপ অভ্যুদয় ঘটে। তাহার স্বর্ণচ্ছটা দিক্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে। অলসতার জড়তা কাটাইয়া জাগিয়া ওঠে প্রতিটি মানুষ। মানবসংসারে আবার সুরু হয় কর্মকোলাহল। দূরে কারখানার বাঁশী ওঠে বাজিয়া।

হৈমন্তিক শস্যসম্ভারে মাঠে মাঠে গৃহে গৃহে জাগে আনন্দের বিদ্যুৎশিহরণ। ফলে-ফুলে, শাক-সব্জীর প্রাচুর্যতায় দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয় শীতের ঐশ্বর্যদীপ্তি। মানুষের দেহ-মনে জাগে এক আশ্চর্য সজীবতা। এইরূপ আশ্চর্য সজীবতার ঐশ্বর্যে মনে-প্রাণে জাগে এক অপূর্ব পুলক। তবুও এই শীতের ঐশ্বর্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় চিররিক্ততা। তাই গরীবের কাছে শীত বড়ই কষ্টের, বড়ই বেদনার। ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া ছেঁড়া কাপড় পরিয়া শীত অতিবাহিত করার জ্বালা যে কি অসহনীয় তাহা একমাত্র ভুক্তভোগীই উপলব্ধি করিতে সক্ষম। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের বরেণ্য কবি মুকুন্দরামের সজীব বর্ণনায় শীতের অসহনীয়তার দিক সজীব হইয়া উঠিয়াছে :

'মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি ভগবান্।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ॥
উদর ভরিয়া ভক্ষ্য দিল বিধি যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি ॥'

এইরূপ যম সম শীতে দরিদ্রা অন্ত্যজ সম্প্রদায়ভুক্তা দীন রমণী অভাগী ফুল্লরার অবস্থা হইল :

'পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বূল তপনে ॥
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা-মাত্র শীতের ভাজন ॥
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
পরিতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা ॥'

হয়ত বা এই নিদারুণতার জন্যেই কাব্যরাজ্যে চির উপেক্ষিত, চির অনাদৃত এই শীতঋতু। অবশ্য বাঙলার শীত পাশ্চাত্যের শীতের ন্যায় পত্র-পল্লবহীন নীরস নয়।

বারো মাসে তের পার্বণের দেশ এই বাঙলা। এদেশে ঋতুতে ঋতুতে উৎসব। ঋতুতে ঋতুতে নূতন রঙ্ প্রকাশ পায়। শীতের শুরু হইতেই নানা উৎসবে বাঙলাদেশ মুখর হইয়া ওঠে। মধ্যযুগের মত এখনও এই বাঙলাদেশে নানা প্রকার পালা-পার্বণের প্রাচুর্যতা এই ঋতুতেই ঘটে। পৌষ সংক্রান্তির পিঠা, পায়স খাইবার মহড়া এখনও ভোলা যায় না।

শীত ঋতুর একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। কারণ, এই শীতের সময়েই ...দেবীর পূজা হয়। বিদ্যার্থীরা শ্রীপঞ্চমীর সুপ্রভাতে জ্ঞানদাত্রী দেবীর চরণে নিবেদন করে নির্মল ভক্তির পুষ্পহার। কৃষকের ভাগ্যেও জোটে এই সময়ে সাময়িক অবসর। সারা বছরের কর্মক্লান্তি ও ...অবসাদ ঘুচাইয়া দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে শুরু হয় কবিগান, যাত্রা, সার্কাস, কথকথা ও কী...ছড়া। শীতের অন্যতম প্রধান খেলা ক্রিকেট। নানা দেশ হইতে এই খেলার জন্য খেলোয়াড় আসে আমাদের দেশে। সংবাদপত্রের বুকে দেখা যায় নানাদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড় শীতের অতিথিদের।

শীতের সৌন্দর্য শুধু প্রকৃতির রাজ্যেই নয় মানবমনেও রাখে স্থায়ী স্বাক্ষর। ঋতুরাজ বসন্তের আবাহন গীত করিতে যেন এ ঋতু আসিয়া উপস্থিত হয়। শীতে না আছে বর্ষার আনমনা, গ্রীষ্মের উত্তপ্ততা কিংবা বসন্তের মন উচাটন ভাব। শীতের আপন পরিচয়েই আপনি ধন্য। ইহার সৌন্দর্য মানুষে ও প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত। তাই এর আবেদন প্রতি বাঙালীর অন্তরে অন্তরে।

বাঙলা সাহিত্য ও উহার বৈশিষ্ট্য

(চলিত ভাষায়)

সাহিত্য শব্দটির মৌলিক অর্থ হ'ল জীবনচর্যা। সাহিত্য হ'ল মননশীলতার ক্রমাভিব্যক্তি এবং ... বিচিত্র পরীক্ষ-নিরীক্ষার সুষ্ঠ লেখচিত্র। তাই প্রত্যেক ভাষাভাষীর কাছে তার দেশী সাহিত্য সবিশেষ মূল্যবোধের অধিকারী। চারিদিকের প্রবহমান মানবজীবন এই সাহিত্যে রূপ পায় তাই বাঙালী জাতির ঐতিহ্যপ্রীতি ও মননশীলতা ক্রমাভিব্যক্তির বিভিন্নস্তর এই বাঙলা সাহিত্যের মাধ্যমেই অনুসন্ধান করা চলে। সেজন্য বাঙলা সাহিত্য শুধু বাঙালীকে আনন্দ দেয় না, তার ঊর্ধ্বেও কিছু জানিয়ে দেয় এবং এজন্যই নির্ভয়ে একথা বলা চলে— বাঙলা সাহিত্য বাঙালীর জীবন বেদ।

গ্রহণ-বর্জনে সক্ষম এক অবিমিশ্র সংস্কৃতির অধিকারী এই বাঙালী জাতি। তাই বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায় জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে প্রবেশাধিকার লাভে সক্ষম হয়েছে। বাঙালী কবির কণ্ঠে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে একথা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' বাঙলা সাহিত্যের আদি-যুগের নিদর্শন মেলে চর্যাপদে এবং তা হ'ল মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা রচিত। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখি, আর্য-অনার্যের ভাব ভাবনা হ'তে শুরু করে ঐস্লামিক দর্শনের পর্যন্ত অনুপ্রবেশ। এই সব কিছুর আত্মস্থীকৃত রূপ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে বর্তমান রয়েছে। সেজন্য 'কানু-পা', 'ভুসুক',

(পার্শ্বটীকা: ...কের শোভায় বাঙলায় প্রাণস্পন্দন; উপসংহার; প্রারম্ভিক ভূমিকা; বাঙলা সাহিত্যের মৌলিক দিক)

'হাড়িপা' প্রভৃতি সাহিত্য স্রষ্টাদের যেমনি আমরা আদিযুগের বাঙলা সাহিত্য... গিয়ে স্মরণ করি, অন্যদিকে তেমনি মধ্যযুগের আলোচনায় সুধন্য বর্মা, আলাওল, হ... ওস্তাদ পরাগল খাঁ প্রভৃতির অবদানকেও অস্বীকার করতে পারা যায় না। আধুনিক... বাঙলা সাহিত্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইংরেজদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ... অভ্যুদয় ঘটে। করে পারি না। শুধু কি ইংরেজ, কোথাকার কোন্ রুশদেশী... টাইয়া জাগিয়া ও... সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথম নাট্য প্রদর্শন... অদূরে কারখানার বাঁশী পাশে বেঁধেছেন। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কাছে আমরা যে কত... করা যায় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের বাঙলা গদ্য... শিহরণ। ফলে-ফুলে, ক্ষেত্রে অবদান অনস্বীকার্য। ... মানুষের দেহ-মনে

উপরোক্ত বক্তব্যকে উপজীব্য করে বাঙলা সাহিত্যের একাধিক মৌলিক... প্রাণে জাগে এক করা চলে—(১) সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রহণ-বর্জনের অধিকারী হওয়া। তাই গরীবের সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমীকরণ শক্তির পরিপ্রকাশ ঘ... ড় পরিয়া শীত বতাবাদ... হিউম্যানিজমের স্বীকৃতি অনেকদিন আগেই বাঙলা সাহিত্যে উপলব্ধি করিতে তা... ফলে বোধ হয় বাঙালীকে য়ুরোপীয় সাহিত্যের হিউম্যানিজমের ...নায় শীতের ...রেছে এবং (৩) আর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র ধর্মের বিজ্ঞাপ... প্রচার সামগ্রী হিসাবে বিভিন্ন যুগের সাহিত্যরথীরা বাঙলা সাহিত্যকে ব্যবহার... মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে অলৌকিকত্বের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেলেও লৌ... আবরণে তা মুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা ধর্মটাকে ক... দেখেন, চাটুকারসুলভ মনোবৃত্তিটা একান্ত বলে মনে করেন। ফলে সেটা সার্থক স... শিল্প না হয়ে চারণগীতি বা চাটুকার সাহিত্যের মর্যাদালাভ করে। হয়ত বা সেজন্য: রেডিও কবি সম্মেলনে বাঙালী কবিরা যখন নতুন কিছু বলেন, অন্যান্য ভাষাভাষী কবি... তখন সরকার কিংবা ভগবানের যশোগাথা বর্ণনা করে চলেন। অসীম সমীকরণ শক্তির অধিকারী বাঙালীর পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটার বর্ণ সমারোহে আকৃষ্ট হওয়া সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মাতামহী সংস্কৃত ভাষার স্নেহচ্ছায়ায় লালিত এবং ইংরেজী ভাষার দ্বারা পালিত হয়ে বাঙলা সাহিত্য অনন্য সাধারণ মৌলিকত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছে।

বাঙলা সাহিত্য ধারা বিকাশের বিভিন্ন স্তরের আলোচনা করলে একটা মৌলিক ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। তা হলো, এ দেশের সাহিত্য সমষ্টির দ্বারা রচিত এবং মানবতাবাদের সুসামঞ্জস্য ব্যঞ্জনা সার্থক রূপারোপে প্রোজ্জ্বল। প্রায় হাজার বছর পূর্বে রচিত চর্যাপদের রচয়িতারা মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মধ্যযুগের অনুবাদ শাখা, জীবনচরিত শাখা এবং মঙ্গলকাব্য শাখাও বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্ট। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিচ্ছটার

[illegible]যুগের (১৪৫০—১৮০০ খৃঃ) প্রায় সব সাহিত্য শাখাই সমুদ্ভাসিত। এঁদের [illegible]তিক্রম বোধ হয় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু। চণ্ডীদাস সমস্যার [illegible] ও একজন বিশিষ্ট চণ্ডীদাসের সাথে একজন বিশিষ্ট বিদ্যাপতির কাব্য সৃষ্টির আশ্চর্য [illegible] এবং তা হোল উভয়ের মানবরস সম্ভোগী ক্ষমতা। আধুনিক [illegible] আলোচনায় প্রথমদিকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদনের [illegible] ভাষাগত দিক হতে প্রভাব বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। [illegible]ংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম [illegible]ক দশক পর্যন্ত মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের প্রভাব [illegible]তো রবীন্দ্রকযুগ নামকরণের মধ্যেই নিহিত। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব [illegible] যা রচিত হচ্ছে তাও একেবারে বাঙলা দেশ বহির্ভূত সাগর-[illegible]পূর্ব পরিকল্পিত প্রচারোদ্দেশ্যে লেখা মনে করলে ভুল করা হবে [illegible] সৃষ্টির পশ্চাতে একটি সচেতন উদ্দেশ্য থাকে, একথা সত্য এবং তা [illegible]ল্পে রচিত নয়। মানুষকে মানুষ বলে স্বীকৃতি যদি বাঙলা সাহিত্যের [illegible] দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা পরিশোধিত ও পরিমার্জিত আকার নি[illegible] [illegible]া সাহিত্যে রূপ পেলে বিস্মিত হবার মত কিছু নেই। বিজ্ঞানকে অস্বীকার [illegible]ক যুগে বাস করা নিশ্চয়ই মৌলিক চিন্তাশক্তির লক্ষণ নয়। সাম্প্রতিক [illegible]ত্যে যদি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাবোধ সম্প্রসারিত হয়ে ওঠে, তবে তাতে [illegible]নন্দিত হ'তে হবে।

[illegible] রূপান্তরের মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যের কায়াতে অভিনব মৌলিক পরিবর্তনের আলো দেখা গিয়েছে। অতিক্রান্ত অতীত ও চলমান বর্তমানের সব সম্ভাবনার স্পষ্টতর বিকাশ ঘটে অনাগত ভবিষ্যতে। তাই জীবন রসিক বাঙালী পাঠক সমাজ আশা নিয়ে থাকবে সেই অনাগত ভবিষ্যতের জন্য।

॥ কলিকাতাবাসের সুখ-দুঃখ ॥

মানব সভ্যতার নিকট পুঁজিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হইতেছে বৃহৎ নগরগুলি। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মূলধন বৃদ্ধির দুরূহ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বণিককুল বিভিন্ন নগরের গোড়াপত্তন করিয়াছেন। আর এই নগরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া পুঁজিবাদীরা চাহিয়াছেন বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর জন্য বাজার গড়িয়া তুলিতে। পরিণামে এই বৃহৎ নগরগুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছে বর্তমান সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো, পিকিং এবং দিল্লীপ্রভৃতি বড় বড় শহরগুলির ন্যায় কলিকাতাও স্বীয় বিরাট ঐশ্বর্য ও নতুনত্বের আড়ম্বরে বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন

প্রারম্ভিক ভূমিকা

করিতেছে। জব চার্ণক নামক একজন বণিক গোবিন্দপুর, সুতানুটি প্রভৃতি
ভবিষ্যৎ কলিকাতা মহানগরীর গোড়াপত্তন করেন। আজ তিনি বাঁচিয়া থা
নিশ্চয়ই ইহার বিরাট বিপুলতা এবং ব্যাপকতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইতেন।

আজকাল সকলেরই কলিকাতাবাসের দিকে ঝোঁক পড়িয়া ... অভ্যুদয় ঘটে।
পর দিন কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ... টাইয়া জাগিয়া ও
ঋতুতে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি মারাত্মক রোগের প্রা ... দূরে কারখানার বাঁশী

কলিকাতার আকর্ষণ বৃদ্ধি ও উহার পরিণাম

যাইতেছে। সরলতা ও শান্তির নিকে
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সম্ভার আজ অনাদৃত ... শিহরণ। ফলে-ফুলে,
শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মস্তিষ্কে ... মানুষের দেহ-মনে
পল্লী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেছে। অন্নহীন দ ... -প্রাণে জাগে এক
আশায় পল্লীর মায়া ত্যাগ করিয়া এই শহরের গৃহে গৃহে ভিক্ষা মাগি ... । তাই গরীবের
করিতেছে। ফলে অনাহার, অনিদ্রা এবং রোগশোক কলিকাতা ... ড় পরিয়া শীত
জীবনের নিত্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ... পলব্ধি করিতে

অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই এখন আমাদের কাছে কলিকাতা ... নায় শীতের
কথা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। জীবনযাত্রার যে পন্থা শিক্ষা, তাহ
কলিকাতা। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার শিক্ষায়তনগুলি বিশেষভাবে

কলিকাতাবাসের সুখ

শোভাবর্ধন করিতেছে। সুবৃহৎ সাধারণ পাঠাগারসমূ
জ্ঞানের ভাণ্ডার কলিকাতাবাসীর জন্যই সুসজ্জিত করিয়া
কলিকাতায় ব্যবসায় এবং অন্যবিধ কার্যোপলক্ষে বিভিন্ন দেশের লোক আগমন ক
তাহাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, আকৃতি-প্রকৃতির সহিত অনায়াসে প্রত্যক্ষ পরিচ
করা যায়। কলিকাতায় তাই বিভিন্ন জাতির মিলনস্থল।

কলিকাতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হইতেছে আমোদ-প্রমোদের সুব্যবস্থা। নাট্যশালা, চলচ্চিত্র প্রভৃতির সম্বন্ধে যতই বিরুদ্ধ সমালোচনা হউক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা ক্ষেত্র বিশেষে সুপরিচালিত হইয়া শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই প্রদান করিতে পারে। ইহা ছাড়া ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়ানুষ্ঠান এই মহানগরীতে হইয়া থাকে। যানবাহনের চলাচল দিনের পর দিন এই মহানগরীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করিতেছে।

আলো আর অন্ধকার উভয়ই যেমন পাশাপাশি অবস্থান করে, কলিকাতা মহানগরী বাসের সুখের কথা বলিতে গিয়া তেমনি স্বাভাবিকভাবে ইহার দুঃখের কথা উল্লেখ করিতে হয়। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক হইতে সমস্যা ভারাক্রান্ত রূপটির যথার্থ প্রতিধ্বনী এই মহানগরীতে বাস করিয়া অনায়াসে শুনিতে পাওয়া যায়।

...হয় চুরি, রাহাজানি ও ব্যাভিচারের ঘটনা এই নগরেই বেশী ঘটে। জনবহু...রাধিকারী পরিবেশে ক্ষয় রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। তাই কলিকাতা মহানগরীতে অকালমৃত্যুর হারও অত্যন্ত বেশী। রাজনৈতিক দিক হইতে প্রতিনিয়ত আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ আসিয়া নাগরিক ...রিয়া তোলে। সর্বোপরি নাগরিক জীবনের আপাতবৈষম্য এক ...গাঁথা 'মানুষ কীটের ...আস্তানা এই কলিকাতা মহানগরী। কাহারও ...থা চিন্তা করিয়া নিদ্রাদেবীর প্রসাদলাভের চিন্তা দূর হইয়া যায়; আবার কাহারও বা এই নগরে বাস না করিলে ঘুম আসে না। সে যাহাই হউক, সুষ্ঠু নাগরিক জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য কলিকাতা ...ও উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। পৌর প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ...রিয়া উহাকে যথার্থই জনসাধারণের জন্য পরিচালিত এবং প্রসারিত করিয়া ... এইসব দায়িত্ব কোন ব্যক্তিবিশেষের নহে, সমষ্টিগতভাবে উহা সকলের।

...বাসের দুঃ...
বাঙলায় প্রাণস্পন্দন...
সার্কাস, কথকথা ও কী...
দেশ হইতে এই খেলার...
যায় নানাদেশের ক্রিকে...
শীতের সৌন্দর্য...
বসন্তের আবাহন গী...
উপসংহার
ব্যাপ্ত। তাই...

ভ্রমণের উপকারিতা ও কার্যকারিতা

[স্কুল ফাইনাল ১৯৫৮; ১৯৬৩]

...তুকতাকে বৈচিত্র্য-পিপাসু মানবমন কোন ক্রমেই চরম বলে মেনে নিতে পারে ...দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানির অতিরিক্ত কিছু মানুষ চায়। তার সে চাওয়ার ...ত থাকে উদ্দীপিত জিগীষাবোধ, সুগভীর কৌতূহল এবং অপরিসীম অনুসন্ধিৎসা। স্বভাবতই সার্থক ভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের এই অনন্ত আকাঙ্ক্ষার আংশিক পরিপূর্তির মত সুযোগ সুবিধা লাভ করা যায়। আর সে জন্যেই শুধু ভ্রমণ করার জন্য নয়—অপেক্ষাকৃত বড় একটা উদ্দেশ্য এর পশ্চাতে চালিকা শক্তির অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

সাধি... এবং ... দেশী...
...ক ভূমিকা ও প্র...ণ করার উদ্দেশ্য

মানব জীবনগঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশের মূল্য অপরিসীম। যারা সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্য থাকতে অভ্যস্ত, তারা তার ঊর্ধ্বে কোনক্রমেই উঠতে পারে না; তাদের পক্ষে মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয় এবং সে কারণেই ভ্রমণ করার মহতী উদ্দেশ্য হল চিন্তার পরিমণ্ডলের প্রসার। পরিবেশের প্রসার করতে হলে চাই ভ্রমণ করার মত স্বতোৎসারিত উৎসাহ এবং অনুরাগের সম্পূর্ণতার বিকাশ দেখাতে হলে অজানাকে জানবার ও অচেনাকে চিনবার মত প্রদীপ্ত জিগীষাবোধ থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

ভ্রমণের ফলে মানুষের চিন্তা ও পরিমণ্ডলের প্রসার

সেই কোন্ সুদূর অতীতে অশোক নামে এক মহানুভব রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের

হিতার্থে কি করেছেন, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর অবদান কতটুকু, সে সব তথ্য ... দায় ঐতিহাসিকের ; কিন্তু ভ্রমণেচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে ঐতিহাসিক তথ্যের অতিরি... জেনে নেবার মত ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়। ... কাছে অশোকের শিলালিপি কোথায় কোথায় ... ঘটে। সভ্যতা সত্যই আর্য পূর্ব কিনা কিংবা ...গাইয়া জাগিয়া ও... বিদ্যালয় অতীত ভারতে অনুক... অদূরে কারখানার বাঁশী জেগে উঠা স্বাভাবিক। এইসব অসংখ্য প্র... ভ্রমণের মাধ্যমে। ...াস পাঠ করে আহ...হরণ। ফলে-ফুলে, ...করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সার্থক ভ্রমণের। রূপকথা ও ...নুষের দেহ-মনে ঐতিহাসিক যে প্রকৃত... ধোকা দেননি, তার পরিশ্রমলব্ধ তথ্য যে প্রাণে জাগে এক ব্যবহারিক সমর্থন ...তে হলে বস্তুনিষ্ঠ সচেতনতাবোধ থাকা অত্যন্ত। তাই গরীবের প্রয়োজন মে...বার জন্যই তাই ভ্রমণ করা বিধেয়। ...পরিয়া শীত

ভ্রমণের ফলে পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে পরিচিত অর্থতত্ত্বের সম্পর্কের ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ ও শিক্ষা

নৃতত্ত্ববি...করা বলেন—কোল, ভীল, মুণ্ডা—এইসব জাতির ভাষা ও ...দ্ধি করিতে অন...সুলভ গুণগুলি ফুটে উঠে। আর যাদের আচার-আচরণে উন্নত... শীতের ...কাশ ঘটে সেইসব উন্নতেরা হল আমাদেরই উত্তর পুরুষ। অজানাকে ... নিয়েছে বিজ্ঞান, আর সে জন্যই নৃতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং পারম্পর... যে তথ্য পরিবেশন করেছেন সেটার মূল্যকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। তবুও অনস্বীকার্য যা তাকেও মানুষের সচেতন যুক্তিনিষ্ঠা মাথা পেতে নিতে পারে কেমন জানি একটা 'কেন কেন' ভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। শহরে সভ্যতার ... বাতির আলোকে আলোকিত পরিবেশে, বেতারযন্ত্রের মন্দ্র মুগ্ধকর সঙ্গীত লহরী চলচ্চিত্রের জীবন রস-সম্ভোগ দেখবার মত অবসর না পেলে... জ্ঞানানুরাগী অগ্রগামী মানব প্রেমিকের দল তা দেখে। কোথায় কোন্ ছোটনাগপুর অঞ্চল, সাঁওতাল পরগণা সব জায়গায়ই তাদের অবাধ যাতায়াত। আর জানা জিনিসকে ঝালিয়ে নেবার মত সুজাগ্রত ও সুনিশ্চিত আশংকা ও মানবজীবন সম্ভোগ করবার মত ক্ষমতা তাদের রয়েছে। তাই উপন্যাসে আমরা দেখি এই সব অনাদৃত অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষদের স্বীকৃতি, ভাষা-তাত্ত্বিকের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করবার মত সুকঠোর পরিশ্রম স্বীকার আর সুপ্ত সংস্কৃতি উদ্ধার করবার অধ্যবসায়। আর এসব কিছুর পশ্চাতে যা না থাকলে চলে না তা হল সার্থক ভ্রমণ করবার মত আগ্রহ। এজন্যই বলা চলে ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশীয় মানব-প্রকৃতির আচার-ব্যবহার-প্রভৃতির সাথে পরিচিত হবার মত সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকি।

বিভিন্ন দেশীয় মানব প্রকৃতির আচার ব্যবহার প্রভৃতির সাথে পরিচিতি লাভের সুযোগ-সুবিধা

সাধ যেখানে সাধ্যের প্রতিকূলে সে ক্ষেত্রে সার্থক ভ্রমণের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও …ফেল হতে পারে'। এর জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল আর্থিক অসুবিধা থাকায় …মণানুরাগ, অধ্যবসায়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাবোধ, কৌতূহল ও অনুরাগের মূল্যবোধ ক্রমহ্রাসমান বিধিতে দাঁড়িয়ে যায়। এছাড়া দ্বিতীয়তঃ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা …ন জড়িয়ে থাকে, তার বাইরে মন-তুরঙ্গের অবাধগতিকে শ্লথ করে দিয়ে শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানির প্রশ্নকে বড় করে দেখলেও ভ্রমণ ক…য়, শুধু ভ্রমণ করার জন্য অর্থাৎ সাদা কথায় এ কথা ঠিক চিত্তচমৎ…রী নয়ন মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফটোগ্রাফ তার ক্যামেরায় ধরে রাখেন, যে শিল্পী তুলি ও রং-এর আশ্রয়ে এঁকে কবি মনের মাধুরী মিশিয়ে ছন্দ-বন্ধ কাব্যরূপ দি…নে পাঠকদের দরবারে তাদের ভ্রমণের মূল্যকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।

উপসংহার

আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলিতে ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের সুব্যবস্থা আছে। দরিদ্র দেশগুলিতে যেখানে অধিকাংশ নাগরিকের জীবন ধারণের …টাই ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা যায়, সেখানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করবার …ষ্টা অনেকের কাছে উদ্দেশ্যবিহীন এবং বিলাসিতার সামিল বলে ম… তবুও স্বাধীন দেশের সরকার ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের আংশিক খরচ বহন… ছাত্রদের কাছে যে সুযোগ-সুবিধা এনে দেন, তাকে অবশ্যই আমাদের মাথা পেতে হবে 'স্বাগতম'।

ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রারম্ভিক ভূমিকা

অতীতের আদর্শজীবন আমরা অতিক্রম করে এসেছি। তখনকার দিনে ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য 'ছাত্রানামধ্যয়নং তপঃ' এর নৈতিক মানদণ্ডে বিবেচিত হত। এরূপ আদর্শ আশ্রম-জীবনের সরল এবং শুচিশুভ্র পরিবেশের সাথে মানান সই ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগ হ'ল আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দিক হতে সমস্যার যুগ। সমস্যা ভারাক্রান্ত অবক্ষয়শীল সমাজে থেকে অতীতের আদর্শ রাজ্যের বাসিন্দা হবার স্বপ্ন অবাস্তব এবং অলীক। সর্বোপরি ছাত্রসাধারণ সমাজ বহির্ভূত জীব নয়। তাই সমাজের সমস্যাকে উপেক্ষা করে জ্ঞান-কৈবল্যের কল্যাণে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে সঁপে দেওয়া অসম্ভব।

আধুনিক মানদণ্ডে ছাত্র শব্দটি বহু অর্থবোধক। সংকীর্ণ অর্থে ছাত্র বলতে সাধারণতঃ স্কুল জীবন হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পাশ-ফেলের রাজ্যের

বিজ্ঞান শিক্ষায় ভবিষ্যতে কি পরিণতি হইবে আজও তাহা অজ্ঞাত। কিন্তু সাহিত্য শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে এইরূপ কোন প্রশ্নই ওঠে নাই। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের সাধনা, বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের কল্যাণের জন্যই। বিজ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করিয়া, সন্ধান করিয়া, বিচার করিয়া সাহিত্যিকের কল্পনাকে আরও গভীর করিয়া সাহিত্যশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসার করিয়াছে। মানুষের মনোবৃত্তি উন্নততর হইলে, বিজ্ঞান অভিশাপ না হইয়া মানুষের জীবনে আশীর্বাদই হইবে সন্দেহ নাই। সাহিত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার মিলন হইলেই মানবজীবন পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। আমাদের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে বিজ্ঞানের চেতনা। তাই সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে মানুষের জীবন, মানুষের সৃষ্টি সুন্দর ও সত্য হইয়া উঠিতেছে।

উপসংহার

জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন

প্রত্যেকের জীবনে ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, উচিত-অনুচিতের প্রশ্নের সাথে বড় হবার প্রশ্নও সমানভাবে জড়িত। এই জেগে ওঠা প্রশ্ন অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতার আবরণে ঢাকা ভবিষ্যৎ জীবনের চলাপথে আলোকবর্তিকার মত কাজ করে। জড় অদৃষ্টের অমোঘ বিধানের কাছে পরাভব স্বীকার করে 'যে শুইয়া থাকে, তার ভাগ্যও শুইয়া থাকে'। তাই এ যুগের কবি-ঋষির বাণী, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,...তবে একলা চল একলা চলরে।' অর্থাৎ কবি বলতে চেয়েছেন, জীবন পথে চলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বিড়ম্বনা সহ্য করতে হলেও দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে এগিয়েই যাওয়াই সর্বোত্তম পন্থা। সংগ্রাম মুখর এ মানব জীবনের পথে পথে কাঁটা ছড়ান রয়েছে। আর রয়েছে ব্যথা-বেদনা, সংশয়-নৈরাশ্যের দ্বারা পীড়িত এক অনাগত ভবিষ্যৎ। সেজন্যেই বহমানা জীবনের নিরন্তর ধারা পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও, অত্যুজ্জ্বল আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠে। একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে অনাগত দিনগুলির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়। পালহীন নৌকা ভরা জোয়ারে যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে তার পরিণতি যেরূপ অনিশ্চিত এবং অলক্ষ্যচারী, লক্ষ্যহীন জীবন প্রস্তুতিও অনেকটা সেইরূপ।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে নানাপ্রকার সমস্যার জাঁতাকলে পিষ্ট এযুগের মানুষকে অসংখ্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সামাজিক দিক হতে আপাত-বৈষম্য, আর্থিক দিক হতে অনিশ্চয়তা, রাষ্ট্রনৈতিক দিক হতে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভঙ্গীর একচেটিয়া প্রাধান্য, স্বাভাবিকভাবেই এ যুগের মানুষকে বিড়ম্বিত করে তোলে এবং এ কারণেই সাধ সাধ্যের প্রতিকূলে চলে যায়।

লক্ষ্য স্থির করা ক্ষেত্রে অসুবিধা

তবুও বিশেষ একটি লক্ষ্যের প্রতি ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত সহজাত আকর্ষণ থাকা। সে আকর্ষণবোধ কারও ক্ষেত্রে বা স্পষ্ট আবার কারও ক্ষেত্রে বা অস্পষ্ট। যদি কাউকে তার স্থির বিশ্বাস বলিয়ে দেয় যে তার জীবনের লক্ষ্য অত্যন্ত অস্পষ্ট, তবে তাকে প্রতিক্ষেত্রে

এ ব্যাপারে সজাগ থাকা অবশ্যকর্ম। কেউবা শৈশবে ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখেছে, যৌবনের প্রান্তে পৌঁছে সে তার অতীত স্বপ্ন বা আশাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারেনি। অবক্ষয়শীল সমাজের যন্ত্রণাবিদ্ধ পরিবেশ তাকে বেকারের দুঃসহনীয় অনিশ্চয়তা ঘেরা পথে টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। প্রাণপণ যুঝে জীবনযুদ্ধের বীরসৈনিক পরাজয়কে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তাতে এতটুকুও তার লজ্জা বা গ্লানি থাকতে পারে না। উদাত্ত শপথের ঝিকিমিকি আলোয় আর ছায়ায় যার দৃষ্টি সমান থাকে সে পরাজয়কে মেনে নেবে নবজীবনের আসন্ন সুপ্রভাত হিসাবে। এইসব কারণে ধরে নেওয়া যাক কোন একজনের জীবনের লক্ষ্য বা প্রধান আকাঙ্ক্ষা—সে গায়ক হবে।

তবুও একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি সহজাত সমর্থন

প্রত্যেক শিল্পীই আন্তরিকতার সাথে সাধনা করে এবং গভীর চর্চার আশ্রয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন। লাভ করেছেন বাগ্‌দেবীর আশীর্বাদ বারি; প্রত্যেকের কাছেই তার নিজ নিজ জীবনলক্ষ্য যুক্তিযুক্ত এবং মূল্যবান। তার দরুণই অন্যের জীবনের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে অযৌক্তিকভাবে যুক্তির ছুরি চালানোর প্রয়োজন হয় না। সে কারণেই, যাঁর জীবনের লক্ষ্য সঙ্গীতসাধক হওয়া, তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ একাধিক যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে লক্ষ্যের চরম পর্যায়ে উপনীত হতে হলে গভীর অধ্যবসায় এবং ঐ লক্ষ্যের প্রতি পরিপূর্ণভাবে অনুরাগ থাকা উচিত। একটি বিশেষ আনন্দ-বোধ প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। মানুষের জীবনের এই বিশেষ আনন্দবোধ হতেই সর্বপ্রকার শিল্প-ভাবনার জন্ম হয়েছে। তবে সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সমাজের কতটুকু উপকার করতে পারবেন—এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই কারও মনে জাগবে না। না জাগাটাই স্বাভাবিক। এর স্বপক্ষে বললে বলতে হবে, আর্থিক সম্পর্কান্বিত বৃত্তি নির্বাচন করলেই যে যথেষ্ট টাকা উপার্জন করা যায় এর কোন নিশ্চয়তা নেই। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, সমাজ বৈচিত্র্যের স্থায়িত্ব সম্পাদনের নিদান হ'ল 'নানা মুনির নানা মত'। আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে কারও মতকে কোন অংশে কম বলে প্রমাণ করা পশ্চাৎপ্রসারী মনোভঙ্গীর আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

লক্ষ্য, সমর্থন ও উহার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ

যুগে যুগে শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে সভ্য মানুষ উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের পরিচয় দিয়েছে। তাই সঙ্গীতসাধনাকে যিনি জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন করেছেন, তাঁর সাফল্য এবং ব্যর্থতার প্রশ্নের সাথে একটি দেশের ঐতিহ্যানুরাগ এবং শিল্পানুরাগের প্রশ্ন নির্ভর করছে। বিলম্বিত ছন্দে লক্ষ্য সাধনাকল্পে এগিয়ে যেতে যেতে সঙ্গীতসাধকের বার বারই একথা মনে পড়বে 'বহুজন হিতায়ের' মহতী আদর্শের কল্যাণে তিনি আত্মোৎসর্গীকৃত।

উপসংহার

অবসর বিনোদন

যান্ত্রিকযুগের মানুষ প্রয়োজনের নিকট দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে। তাই কর্মচক্রের আবর্তনে একটি কাজ শেষ হইতে না হইতে আর একটি আসিয়া দেখা দেয়। বিচিত্র ভাব-ভাবনায় আন্দোলিত মানবমনের গোপন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পরিশ্রম বহির্ভূত উপায়ে ক্ষণিকের জন্য জীবনটাকে চালাইতে কে না চায়? এইরূপ মনোমোহিনী আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে একদিকে যেমন রহিয়াছে শ্রমকাতর হৃদয়ের একঘেঁয়ে অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা, অন্যদিকে আবার রহিয়াছে জীব-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ, মানব-জগৎ সব কিছুরও মাঝে যে

প্রারম্ভিক ভূমিকা

অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং কমনীয়তা উহারি পূর্ণতর আস্বাদ-লাভ। বৈচিত্র্য-তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটাইবার প্রয়োজনেই যেন অকস্মাৎ কর্ম-চাঞ্চল্যের কথা মানুষ ভুলিয়া যায়। কেমন যেন একটা অজানা, অচেনা ভাব-ভাবনা আসিয়া আন্দোলিত করিয়া তোলে; এই আন্দোলন মনে জাগায় পুলক, হৃদয়ে জাগায় বিস্ময় আর চিন্তায় আনে মুক্তি। কর্মের বন্ধনমুক্ত অবস্থাই হইল অবসর। আর এই অবসরের সার্থক ব্যবহারই হইল অবসর বিনোদন।

কর্মের নাগপাশে জড়িত অবস্থাতেই মানবমনে জাগে অবসর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। তখন জীবনটাকে যেন এক দুর্বহ বোঝা বলিয়া প্রতিভাত হয়। চিমনির ধোঁয়া, যন্ত্রের ঘর্ঘর,

অবসরের প্রয়োজনীয়তা

যানবাহনগুলির সংকেতবাহী শব্দ আর কারখানার বাঁশি—সব কিছুই বলে ঐ কাজের কথা। এরূপ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই অবসর বিহীন জীবনের এক ঘেঁয়েমিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাই কবি বলেন—"A poor life this, if full of care, We have no time to stand and stare..." সত্যই তো এইরূপ জীবন থাকার উদ্দেশ্য কি? এইরূপ জীবনযাপনে অনিচ্ছাই মানুষের কল্পনার রাজ্যে এক নতুন জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়। সেই কল্পনা রাজ্যে কাজের পাশাপাশি অবসর যাপনের প্রশ্নও সমভাবে জড়িত রহিয়াছে।

পশুচারণযুগ এবং কৃষিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্পযুগ পর্যন্ত মানব সভ্যতার বিভিন্ন রূপান্তরের মূলে রহিয়াছে কর্মের প্রতি আসক্তি এবং উহার সদ্ব্যবহারের ইচ্ছা। পরিণতিতে

এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অবসর বিনোদনের চিন্তা

উহা মানব মনে আনিয়া দিয়াছে কর্ম করিয়া অবস্থার উন্নতি করিবার মত গভীর অনুরাগ। ইহার স্বাভাবিক পরিণতিতেই বোধ হয় এ যুগের মানুষ শ্রমদেবতার আরাধনাকে চরম মোক্ষ মনে করিয়াছে। এ যুগের মানুষের দর্শন হইল তাই কর্মদর্শন। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা কারখানা প্রথার সৃষ্টি করিয়া আলস্যকে অপসারিত করিয়া দিয়া কর্মের স্বপক্ষেই ওকালতি করিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই একইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সমগ্র জগৎ প্রবাহই যেন

মানব-মনে উঁকিঝুঁকি মারে না। হয়ত বা ইহার দরুণই যান্ত্রিক যুগের নর-নারী কর্মের দ্বারা শ্রান্ত, ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত।

মানুষের অন্যতম প্রাণধর্ম হইতেছে সজীবতা, চিত্তের স্ফূর্তি এবং মুক্তিলাভের অভীপ্সা। জড়পদার্থের ন্যায় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধুমাত্র কাজ করিয়া গেলেই যথার্থ প্রাণশক্তির বিকাশ হয় না। গতির প্রতি অত্যাসক্তির জন্য মানুষের আবেগপ্রবণ চিত্তের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে না। পরিণামে ইহা সুখ-শান্তি বঞ্চিত অশান্তিপূর্ণ জীবনকে ডাকিয়া আনে। এইরূপ নেতিবাচক পরিস্থিতির কবল হইতে মুক্তিলাভের কথা চিন্তা করিয়া অবসর যাপনের মূল্য ও তাৎপর্য বিচার করিতে হইবে।

অবসর যাপনের মূল্য

কর্মক্লান্ত দেহ ও মন লইয়া উর্ধ্বাকাশে বিহঙ্গকুলের কলতান, পত্রের মর্মর-ধ্বনি, টুকরো মেঘের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আনাগোনা, নদীর কুল্‌কুল্‌ বাহিয়া চলা, মলয় পবনের উচাটন ভাব বহিয়া আনা, পাহাড়িয়া জায়গায় মর্ত্যসুষমা—সবকিছুই অনুপম আনন্দের বার্তা বাহিয়া আনে। একটানা ক্লাস কিংবা দোতলা লাইব্রেরীর কক্ষে বসিয়া গ্রন্থকীট সাজিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ যদি নীচের দিকে তাকাইয়া ফেরিওয়ালার গগনভেদী চিৎকার, সদ্য ইস্কুলফেরতা ছাত্রের উল্লাস কিংবা রিক্সাওয়ালায় বিশ্রাম লইবার দৃশ্য দেখা যায়, তাহার আনন্দ সত্যই অবর্ণনীয়। বস্তুজগতের জড়তাসঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাকে উপভোগ করিবার মত ইন্দ্রিয়সচেতন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। তাহাদের ক্লান্ত ভারনত হৃদয়কে দমবন্ধ পরিবেশ হইতে মুক্ত করার মাধ্যমেই অবসর বিনোদনের যথার্থ মূল্য স্বীকৃত হয়।

ইন্দ্রিয়বশ, নৈষ্কর্ম্য কখনও মানুষকে যথার্থ আনন্দ দিতে পারে না। অবসর বিনোদন করার অর্থ এই নয় যে, অলস-ইন্দ্রিয় সচেতনতাবোধ। অবসর বিনোদনের সার্থক রূপ হইল বৈচিত্র্য পিপাসু মানবমনের অনন্ত আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ বিকাশ। এই কারণেই গতানুগতিক কর্ম কিংবা পরিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া ভিন্নতর পরিবেশে অতিবাহিত করার দ্বারাও অবসর বিনোদন করা চলিতে পারে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য স্থান পরিবর্তন যেমন অত্যাবশ্যক, ঠিক তেমনই কোন একটি বিশেষ কর্মে অভ্যস্ত হইবার জন্য যদি চেষ্টা করা যায় সেটারও যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে। ইস্কুলের ছাত্রদের কথাই এ প্রসঙ্গে বলা চলিতে পারে—তাহারা সাধারণতঃ দিনের পর দিন শিক্ষক মহাশয়ের কথা শুনিয়া ক্লাস করিয়া যায়। সদিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া যদি তাহারা অশিক্ষিত দেশবাসীদের অক্ষরজ্ঞান দিবার জন্য সমাজসেবার আশ্রয় নেয়, তাহা হইলে যে সফলতা লাভ করা যাইবে—তাহার মূল্যই বা কম কিসে? ছাত্ররা এ কারণে যদি দেশসেবা, সমাজসেবা এবং প্রতিবেশী সেবা করিয়া অবসর বিনোদন করিতে চেষ্টা করে, তাহা

সার্থক অবসর যাপন

হইলে উহাই হইবে আদর্শ অবসর বিনোদন। 'সেবা' শব্দটি আমাদিগকে একই শ্রমের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তবুও সেবা এবং কর্মের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহার স্বাদ ভিন্ন, বৈচিত্র্য এবং উপযোগিতার প্রশ্নও ভিন্ন।

কথায় আছে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।' এই পৃথিবীর রূপ, সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্যের আস্বাদ মানুষ বীরত্ব এবং পরিশ্রম দ্বারাই লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক মানুষ তাই আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বভাবতই একারণেই বলা চলে, কর্মকে অস্বীকার না করিয়া উহাকে পাশাপাশি রাখিয়া অবসর বিনোদনের চেষ্টাই হইতেছে এ যুগের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলার প্রকৃষ্ট লক্ষণ এবং আদর্শ পথ।

উপসংহার

ইতিহাস পাঠ

পারম্পর্য রক্ষা করিয়া তথ্যের আলোকে ঘটনার ব্যাখ্যান ও দেশ-কালের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণই ইতিহাস। ঘটনার দ্বারা ঘনঘটাচ্ছন্ন রোমাঞ্চকারী অতীত-কাহিনী ইতিহাস নহে। ইতিহাস গবেষকের নিকট অতীত-বর্তমানের মধ্যে যোগসেতু রচনা করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকাটা বাঞ্ছনীয় কিন্তু উহাই চরম নহে। ইতিহাস পাঠক একথা জানেন, 'কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে—সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।' সামগ্রিকভাবে ইতিহাস বলিতে বোঝায়—'The history of the world is the record of a man in quest of his daily bread and butter."

প্রারম্ভিক ভূমিকা

সামান্য উৎসাহকে পুঁজি করিয়া ইতিহাস পাঠে নিয়োজিত হইলে প্রথম প্রথম তথ্যের কণ্টক দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইতে হয়। ক্রমে ক্রমে উহা গভীরতর আনন্দ ও বৈচিত্র্যের খোরাক যোগায়। কোন একটি দেশের সামগ্রিক পরিচয় লইবার চেষ্টায় উৎসাহিত হইয়া ইতিহাস পাঠ করিতে গেলে দেখা যায়, উহা পাঠের আনন্দ রোমাঞ্চকারী চিত্ত-চাঞ্চল্যের ভরপুর উপন্যাস পাঠের আনন্দকেও ম্লান করিয়া দেয়। ইতিহাস গবেষকের নিরলস সাধনায় একটি জাতির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা—সব কিছুই প্রাঞ্জলরূপ লইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হয়। ধারাবাহিক ঘটনানুসরণের পশ্চাতে ঐতিহাসিক বলেন, 'দিগ্বিজয়ী রাজ-রাজড়ার কথা, রাজর্ষি অশোক কিংবা রাজা আলফ্রেডের ন্যায় দয়ালু রাজাদের কথা আর অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদীদের কথা।' এই সকলের পশ্চাতে থাকে অখণ্ড জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার আগ্রহ।

ইতিহাস পাঠে আনন্দ ও বৈচিত্র্যদান করে

একজন রোমান কবি বলিয়াছেন—"I am a man, and nothing human is foreign to me." সমগ্র মানবসমাজের সহিত নিবিড়তর ঐক্যের অনুভবই উক্ত কবিকে এইরূপ কথা বলাইয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের মহৎ কর্মাদর্শও এক জাতির নিকট অপর জাতির আক্রান্ত হইবার কাহিনী ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমাদের চিন্তার পরিমণ্ডলের প্রসার হয়। একদিকে যেমন মহৎকর্ম এবং আদর্শ আমাদের নিকট অনুকরণ যোগ্য হয়, অন্যদিকে তেমনি আক্রমণকারী জাতিগুলির হিংস্র মনোবৃত্তিকে আমরা ধিক্কার জানাই। দুর্বলতম জাতির অসহায়তা আমাদের সমবেদনা জাগায়। এই সমবেদনার মূলে রোমান কবির মতও আমাদের মনে জাগে একটি অখণ্ড ভাবাদর্শ। পরিণতিতে ঐ ভাবাদর্শ আমাদের প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি চিন্তায় যথেষ্ট উৎসাহ এবং জীবনীশক্তির বিকাশ ঘটায়।

চিন্তা ও কল্পনার প্রসার বৃদ্ধি

অতীত অনালিঙ্গিত বর্তমানের কথা ভাবাটা অস্বাভাবিক। জগৎ জুড়িয়া যে মানব-জাতির অধিষ্ঠান ইতিহাস সেই মানব-জাতির স্মৃতি কাহিনী। বর্তমানের অবস্থার দিকে তাকাইয়া অতীত বিস্মৃত চিন্তা মানবমনে দেখা দেয়। অতীতের শূন্যতাকে বর্তমানের পূর্ণতায় আনিয়া যাচাই করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে কেহ চাহেন না। এক্ষেত্রে ইতিহাস লুপ্ত স্মৃতির ইতিহাসকে রোমাঞ্চতর করিয়া ইতিহাস পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করে। একটি জাতির ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তা-চেতনাকে অতীতের ধারানুসরণ করিয়া জানিবার জন্যই ইতিহাস পাঠ। যে জাতি ঐতিহ্য বিস্মৃত বর্তমানে শুধু দিন যাপনের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত সে জাতির নিকট ইতিহাস তাদের পূর্ব ঐতিহ্য এবং গৌরবের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়গুলির কথা বহন করিয়া আনে। ইতিহাসকে এই কারণে একটি জাতির বিকাশ এবং বর্তমান অবস্থার মূল কুঞ্চিকাস্বরূপ নির্দেশ করিলে অযৌক্তিক কিছু বলা হইবে না। বর্তমান প্রতিনিয়তই অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। আমরা অতীত চিন্তা ব্যতিরেকে বর্তমানের আদর্শ, ভাবনা, প্রচলিত কীর্তি এবং স্থিতিশীল অবস্থার স্বরূপকে চিনিতে পারিব না। কারণ খণ্ডিতরূপ দেখিয়া জন্মেতিহাসকে চেনা যায় না। অতীত ইতিহাস এই কারণে শুধু অতীতের কথাই বলে না, বর্তমানকেও চিনিতে ও জানিতে আমাদের সহায়তা করে।

বর্তমান অবস্থার পরিচয় দান

চলমান বর্তমানও একদিন নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, তখন সেই অনাগত ভবিষ্যতে চলমান বর্তমানের স্বরূপকে জানিতে হইবে—সেদিনও বিগত অতীতের ন্যায় আজিকার বর্তমানকে চিনাইয়া দিতে সহায়তা করিবে। একটি জাতির সামগ্রিক বিপর্যয় কবলিত অবস্থা হইতে বাঁচাইতে হইলে সেদিনও ইতিহাস পাঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

তবে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনার দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদন না করিলে সার্থক ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। শুধু মাত্র পারম্পর্য নহে, ঘটনানুসরণকেই একমাত্র পুঁজিস্বরূপ গ্রহণ না করিয়া নিরপেক্ষভাবে ঐসব উপাদানগুলিকেই সুগ্রথিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার সহিত ইতিহাসের গতিশীল রূপটিকেও চিনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক যুগে প্রগতিকে বাদ দিয়া স্থিতিশীল মানবগোষ্ঠীর কাহিনী বলিয়া গেলে উহা অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধিপ্রসূত হইবে। তাই ইতিহাস পাঠ যেমন আনন্দ, বৈচিত্র্য এবং জিগীষাবোধের নিবৃত্তি ঘটাইতে পারে, তেমনি অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত ইতিহাস পাঠ আবার বিভ্রান্তও করিয়া তুলিতে পারে। সেজন্য সতর্ক পদক্ষেপে ইতিহাস পাঠককে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভবিষ্যতের নিশানা

কারিগরী শিক্ষা

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানুষ আপন বুদ্ধিবলে যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া প্রকৃতির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শুধু প্রকৃতিই নহে অন্যান্য জীবজন্তুদের উপর মানুষের সর্বময় প্রাধান্যও বর্তমান রহিয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ হইল যন্ত্রউদ্ভাবন এবং উহার ব্যবহার প্রণালী। যন্ত্রের ব্যবহার প্রণালী ও উদ্ভাবন কৌশল যে বিদ্যার আশ্রয়ে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, তাহা হইতেছে কারিগরী বিদ্যা। এই কারণেই কারিগরী বিদ্যাশিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার সার্থকতার প্রশ্নের সহিত কোন একটি বিশেষ জাতির চরমধাপে আরোহণের প্রশ্নও গভীরভাবে জড়িত রহিয়াছে।

উপকারিতা

সভ্যতার আদিপর্বে মানুষ ছিল বিশৃঙ্খল, অসভ্য ও বর্বর। সভ্যতা সৃষ্টির মধ্যাহ্ন হইতে মানব সভ্যতা ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া বর্তমানরূপ ধারণ করিয়াছে। মানুষ আজ আর বিশেষ কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াই তৃপ্ত নহে। প্রয়োজনের অনন্ত চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে প্রতিদিন নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং উহার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে। এইসব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অবশ্য মানব-সভ্যতাকেও প্রগতির পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। স্বভাবতঃ যে জাতি যতবেশী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইবে, সেই জাতি তত জটিল জীবনযাত্রা প্রণালীকে সহজতর করিতে পারিবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ইহা পর্যবেক্ষণ করা গিয়াছে যে, কারিগরী বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা নিপুণ জাতি দুর্বলদের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্যও বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সমাজবদ্ধ মানুষের ব্যষ্টি এবং সমষ্টির প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্ব কারিগরী বিদ্যা নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে উহা জটিলরূপ ধারণ

করিয়াছে। দৈহিক, নৈতিক, ভৌতিক এবং মানসিক সমস্ত দিক হইতেই জটিল সামাজিক পরিবেশে লালিত মানুষের চাহিদা নানা প্রকার। অবশ্য পূর্বোক্তগুলির মধ্যে দৈহিক এবং ভৌতিক-প্রয়োজনীয়তা নির্বাহের প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বলাভ করিয়াছে। ইহাদের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা কারিগরী কর্মীরা গ্রহণ করিয়াছেন। সে কারণেই আধুনিক সমাজে বহু কারিগরী কর্মীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কৃষক, তাঁতি, মুচি, ছুতার প্রভৃতি সমাজবন্ধুরা এতদিন পর্যন্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইয়া আসিতেছিল। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রণালী আয়ত্ত করিয়া উঁহারাও নিজ নিজ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বল্প মূলধনে অথচ অসময়ে অনেক বেশি পণ্য তাহারা সরবরাহ করিতে পারে। যদি তাহারা উপযুক্ত কারিগরী শিক্ষালাভ করিবার মত সুযোগ সুবিধা পায়, তাহা হইলে ইহাতে অপর্যাপ্ত পুঁজি বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকিবে না। তবে বেকার-সমস্যার দূরীভূত করিবার ক্ষেত্রে এই প্রকারের কারিগরী শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তাকে কোন অংশেই কম করা চলিবে না।

বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী বিদ্যা

অনেক সম্ভাবনার আলোকবর্তিকা বহন করিয়া বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে নতুনের উদ্দীপনা এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার জন্য কারিগরী শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা আজ শুধু কৃষক, তাঁতি, ছুতার, মুচি প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। সমাজের প্রতিটি স্থান হইতে কারিগরী শিক্ষালাভের জন্য যথেষ্ট অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এমনকি শিক্ষিত এবং দায়িত্বশীল ইঞ্জিনিয়ার দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে নিবদ্ধ হইয়াছে। স্বাধীন ভারত সরকারও কারিগরী বিদ্যার উন্নতির জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হইয়াছেন। দেশব্যাপী কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য ছাত্রসমাজের মধ্যেও কম উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় নাই। কলা ও সাধারণ বিজ্ঞান পাঠের দিকে অধিকতর নজর না দিয়া কারিগরী শিক্ষার দিকে অপেক্ষাকৃত বেশি লক্ষ্য রাখা অবশ্যই প্রয়োজন।

বর্তমান কারিগরদের অবস্থা

প্রতিবছর আমাদের দেশের বহু ছাত্রকে কারিগরী বিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জনকল্পে রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের তিনটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় এই বিদ্যাকেও উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। সারা ভারতের কারিগরী শিক্ষার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটি কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া এই কাউন্সিলের সদস্যমণ্ডলী কারিগরী শিক্ষালাভের অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কাউন্সিলের প্রচেষ্টায় বর্তমানে খড়্গপুর ও যাদবপুর

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দুইটি ছাড়াও অন্যান্য পলেটেক্‌নিক্ শিক্ষালয়গুলি ইহার উজ্জ্বল স্বাক্ষরবহন করিতেছে।

কারিগরী বিদ্যার বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি হইতেছে, ইহা বড় বেশি যান্ত্রিক এবং একঘেঁয়ে। পরিণতিতে মানুষ জীবনের উচ্চতর আদর্শের কথা বিস্মৃত হইয়া জড় পদার্থের মত হইয়া উঠে। ফলে শুধু মাত্র ব্যবহারিক দিকটাই বড় করিয়া দেখে। ইহা দূরীভূত করিবার উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া হিউম্যানিটিজ বিষয়টি অবশ্য পাঠ্য করিবার কথা বলা চলে। ইহা বিবেচনা করিয়াই আমাদের দেশে নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় উপরোক্ত বিষয়টিকে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কারিগরী বিদ্যার প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশতঃ কলা এবং বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষালাভের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবশ্য শিক্ষা হওয়া উচিত প্রত্যেকের নিজ নিজ বৃত্তি এবং প্রতিভা অনুযায়ী।

কারিগরী বিদ্যা লাভের কুফল

সমস্যা ভারাক্রান্ত সমাজে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য প্রত্যেকেই তৎপর। একারণেই বেকার সমস্যা এই বিষয়ের প্রতি অধিকাংশ ছাত্রদের আকর্ষণ সৃষ্টি করিবার অন্যতম কারণ। সমতা রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক—ইহাই সবার আকাঙ্ক্ষিত। সমস্যা বিজড়িত সমাজে শিক্ষা অর্জনের অভিলাষ যেন কেবলমাত্র আর্থিক মানদণ্ডেই না হয়। এই ব্যাপারে দেশের চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী এবং সরকারের নজর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তাহা না হইলে কারিগরী শিক্ষানবীশদের সম্মুখেও বেকার সমস্যার অসহনীয় যন্ত্রণা একদিন আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

উপসংহার

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

শিক্ষা যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়ক না হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষা নিরর্থক। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা জীবন যুদ্ধের পাথেয় যোগায় না। শিক্ষিত বেকার তাই আজ দেশ ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের উদরান্নের সংস্থানে সাহায্য করে না। বাস্তব জীবনের সহিত এ শিক্ষার যোগ নাই। সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আমরা চক্ষে ধোঁয়া দেখি। চাকুরি অর্থাৎ কেরাণী-গিরি ছাড়া শিক্ষিত ব্যক্তির জীবিকার পথ নাই। চাকুরি আর কত পাওয়া যায়। তাই আজ দেশ জোড়া হাহাকার; বেকার সমস্যা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দেখা দিতেছে। সবচেয়ে বড় শিক্ষা দুনিয়ার বুকে টিকিয়া থাকার উপায় করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেতাবে সে উপায় দেখানো নাই, শুধুমাত্র ভাব ও চিন্তা দ্বারা মানুষ বাঁচিতে পারে না; তাহার হাত দুইটি প্রধান মূলধন। সেই মূলধন কাজে লাগাইয়া পৃথিবীর বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, খাইয়া বাঁচিবার উপায় করা।

কিন্তু আমাদের হাত মিলিয়াছে। শুধু কলম পিষিতে। মস্তিষ্ক শিখিয়াছে পরের বুলি লইয়া আলোচনা করিতে। আমরা সকলেই হইয়াছি শিক্ষিত তোঁতা, অফিসের দাড়ে বসিয়া মাসিক বরাদ্দ মাহিনার ছোলা ছাড়া আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্যপথ নাই।

দুনিয়া জোড়া কর্মের যে মহাযজ্ঞ হইতেছে তাহাতে আমাদের কি কিছুই করিবার নাই? কৃষি-কর্মে কামারের কাজ, ছুতারের কাজ, যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কাজ, কোন যন্ত্রের সাহায্যে কিছু উৎপাদনের কাজ, প্লাষ্টিকের কাজ, চামড়ার কাজ, বাঁশ বেতের কাজ, মাটির পুতুল তৈয়ারীর কাজ ইত্যাদি কত শত কাজ রহিয়াছে। আমরা হাত থাকিতে, কর্মশক্তি থাকিতে, মস্তিষ্ক থাকিতে এই সব কাজ হইতে দূরে থাকিলে কে আমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবে। আমাদের এই কর্ম কৌশল শিখিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষার প্রতি দেশের যুবকদের দৃষ্টি না ফিরাইলে দেশ জোড়া বেকার সমস্যার সমাধান কোনদিনই হইবে না।

কেহ যদি বলেন যে তাহা হইলে দেশ কি কেবল কারিগরের দেশ হইবে? এখানে কেতাবি শিক্ষা কি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে? এখানে কি জ্ঞানবিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ হইবে? কখনই নহে। যাহারা প্রতিভাশালী, যাহারা মেধাবী তাহারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকুক। কিন্তু যাহারা তাদৃশ মেধাবী নহেন তাহাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার দ্বারও যুক্ত করিয়া দেওয়া হউক। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাহায্যে তারা দেশের নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে লাগিয়া যাওয়া বা লাগিয়া গেলে তাদেরও উদরান্নের ব্যবস্থা হইবে, দেশের অর্থও দেশে থাকিবে। কাজেই শিক্ষাকে দ্বিমুখী করা অত্যাবশ্যক—এক মুখে থাকিবে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার দিকে ইহা ক্রমশঃ উচ্চতর শিক্ষার সোপানরূপে থাকিয়া মাধ্যমিক স্তরেই কতকগুলি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা ছাত্রের হাতে কলমে কাজ করার মত শক্তি ও প্রতিভা নির্ধারণের উপায় রূপে। যে ছাত্র যে বৃত্তির উপযোগী হইবে তাহাকে সেই বিশেষ বৃত্তির ক্রমশঃ উচ্চতর শিক্ষা দিলে সে আপন উদরান্নের ব্যবস্থা ঐ বৃত্তি অবলম্বনেই করিয়া লইতে পারিবে।

গান্ধীজী প্রবর্তিত নবশিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোন একটি হস্ত শিল্পকে অবলম্বন করিয়া তাহারাই মাধ্যমে ছাত্রদের ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যামিতি ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা মূলত গান্ধীজির 'নই তামিলি' শিক্ষা। এই শিক্ষার পুরাপুরি প্রচলন হইলেই ছাত্রগণ শিক্ষাকালেই কোন একটি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণে সমর্থ হইবার উপায় আয়ত্ত করিতে পারিবে।

"কাজই ভগবানের পূজা"—কোন কাজই ছোট নয়। সার্থক ভাবে কর্ম করিতে পারিলে আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মসম্মানবোধ জাগরিত হইবে মানবের সেবার মহান আদর্শ আমরা সমাজের সেবা করে। তাহারা সমাজের হিতকারী বন্ধু। যাহাদের

কার্য শক্তি থাকা সত্ত্বেও পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খায় কর্মীদের অবজ্ঞা করে তাহারা নরাধম।

নব প্রবর্তিত সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় নবম শ্রেণী হইতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় শীঘ্র দেশের শিক্ষা এক নব অধ্যায়ের সূচনা হইবে। আর শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িবে না। এইজন্য এই ব্যবস্থায় বৃত্তি নির্বাচনের জন্য বিশেষ শিক্ষক থাকিবেন। তিনি ছাত্রগণের মানাসিক বৃত্তি অনুশীলন করিয়া কে কোন্ বৃত্তির উপযোগী তাহা ঠিক কবিয়া দিবেন।

দেশের যুবশক্তির অমিত কর্মশক্তি কাজে লাগানো বা লাগাইলে দেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। যে যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজেই নিযুক্ত করিলে প্রতিভা বা দক্ষতার অপব্যয় হইবে না। এই বিপুল জনসংখ্যা এইভাবে সার্থক কাজে নিযুক্ত হইলে ভারতের ঘরে ঘরে আনন্দের জোয়ার আনিবে। কাজেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারীগরি শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষা যতদিন পুরাপুরি কর্মকেন্দ্রিক এবং শিল্পমুখী না হয় ততদিন আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান নাই। বর্তমানে এইভাবে শিক্ষার মোড় ফিরাইয়া তাহাকে অবস্থানুযায়ী না করিলে দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধান সুদূর পরাহত। সরকার এই বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন। এখন জন সাধারণ গতানুগতিক শিক্ষার মোহত্যাগ করিয়া এই ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে দেশ সত্যই রক্ষা পাইবে।

পারিবারিক জীবনের শিক্ষা

মানুষ যেদিন হইতে গৃহ-রচনা করিয়া পরিবারবর্গ লইয়া বাস কবিতে শিখিয়াছে, সেদিন হইতে তাহার জীবনের ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজের নূতন প্রতিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে তাহার মন অস্থির ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহা তাহার প্রকৃত স্থান খুঁজিয়া পাইল। তাহার বিক্ষিপ্ত যাযাবর জীবনের অবসান হওয়ায় সে সুখশান্তিময় পারিবারিক জীবনে একটা নূতন সত্যের আভাষ পাইল। এই সত্য মানব-জীবনের চিরন্তর সত্য। এই সত্য কেবল ব্যক্তিগত নহে; ইহা সর্বজনীন সত্য; যেহেতু পারিবারিক জীবন সমগ্র মানবসমাজের বৈচিত্র্যময় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানুষ এই পারিবারিক ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরে থাকিয়া জগচ্ছবি নিরীক্ষণ করে, এইখানেই সে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুলি খুঁজিয়া পায়। এইখানেই জীবনের প্রথম উন্মেষ ও এইখানেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা। এইখানে তাহার চরিত্রের যেরূপ অঙ্কুর উদ্গম হইবে, পরিণামে সেইরূপ বৃক্ষই উৎপন্ন হইবে এবং সেই বৃক্ষে সেইরূপ ফুল-ফল প্রসব করিবে। বস্তুতঃ, মানুষ কখনই পারিবারিক

জীবনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না—কতক জ্ঞাতসারে, কতক বা অজ্ঞাতসারে তাহার প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক কর্ম ইহা দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

এইজন্যই পারিবারিক জীবন প্রকৃষ্ট শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র—ইহার শিক্ষা আমাদের জীবনে মূর্তরূপে অনুভূত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা অনেকটা গ্রন্থগত, সে শিক্ষা মানসিক বৃত্তির কোন এক বিশিষ্ট অংশের উন্মেষ-সাধনে সাহায্য করে মাত্র। সে শিক্ষার প্রয়োজন বাহিরের দিকে যতটা, ভিতরের দিকে ততটা নহে। কিন্তু পারিবারিক জীবনের শিক্ষার লক্ষ্য হৃদয় নিহিত সদ্ভাবসমূহের উন্মেষ, চরিত্রের উন্নতি এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ। সুতরাং জীবনগঠন ব্যাপারে ইহার প্রয়োজনীয়তা অসীম। শিক্ষাদান বিষয়ে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব যতখানি, পরিবারের দায়িত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চরিত্রগঠনের সুবিধাও অল্প, ব্যবস্থাও বড় অধিক নহে, কিন্তু পারিবারিক শিক্ষার সর্বাংশ একমাত্র চরিত্র-গঠনের জন্য প্রযুক্ত হয়। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে—প্রত্যেক পরিবারের একটা স্বর্গীয় পবিত্রতা আছে; তাহা আমাদের সামান্য ত্রুটি, অবহেলা বা অপরাধের দ্বারা আমরা ক্ষুণ্ণ করিতে পারি না।

পারিবারিক শিক্ষার উপকারিতা

ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Charity begins at home.' শুধু বদান্যতা কেন, জীবনের অধিকাংশ গুণরাজির অঙ্কুর নিজ পরিবারের মধ্যে উদ্গত হয়। পরিবারের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি পরস্পরের যে স্নেহ ও সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবে জন্মে, তাহাই উত্তরকালে প্রসারলাভপূর্বক মানব-জাতির প্রতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে—পারিবারিক প্রেমই একদিন বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়। পরিবারের মধ্যে আমরা যে স্বার্থত্যাগ অভ্যাস করি, তাহাই ভবিষ্যৎ জীবনের বৃহত্তর স্বার্থত্যাগে পরিণত হইয়া জীবনকে গৌরবান্বিত করে। এই পারিবারিক জীবনের মধ্যেই আমরা গোষ্ঠী-জীবনের অভ্যাস লাভ করি এবং মানব-সমাজরূপ বৃহত্তর পরিবারে স্থানলাভ করিবার যোগ্য হই। পরিবারের প্রত্যেকের সহিত আলাপ, ব্যবহারে আমরা যে অভ্যাস অর্জন করি, সেই অনুসারেই আমরা বাহিরের লোকের সহিত ভবিষ্যতে ব্যবহার করিয়া থাকি। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির রোগ হইলে তাহার সেবা করিয়া আমরা সমগ্র মানবজাতির সেবা শিক্ষা করি। এইরূপে সমস্তদিক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে পরিবারের মধ্যে থাকিয়া আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, তাহাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

উদ্দেশ্য

এই শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সকল পরিবারের শিক্ষা সমান হইতে পারে না, তাহা হইলে জগতে এইরূপ বৈচিত্র্য ও বৈষম্য থাকিত না। কোন কোন পরিবারের পূর্ব ইতিহাস অতীব গৌরবময়; আবার কোন পরিবারের ইতিহাস কলঙ্কলিপ্ত।

এই অতীত ইতিহাসের প্রভাব বংশধরদিগের উপর আসিয়া পড়ে এবং সেই অনুসারে তাহাদের মনোভাব ও চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোনও এক ব্যক্তির শিক্ষা ও ব্যবহার দেখিয়া তাহার পরিবারের সম্বন্ধে আমরা অনেক সময় একটা সাধারণ ধারণা করিয়া লইতে পারি। অবশ্য জগতে অনেক নগণ্য পরিবারের সুসন্তানের প্রতিভা, ধর্মনিষ্ঠা ও চরিত্রবলে খ্যাতি অর্জন করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন পরিবার কুসন্তানের কুকাজের জন্য অধোগমন করিয়াছে—ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সুতরাং পরিবারের ইতিহাসের ধারা পরিবর্তিত করা একেবারে অসম্ভব নহে।

বিভিন্ন রূপ

যখন পারিবারিক শিক্ষা ব্যক্তিগণের চরিত্র ও কর্মের উপর নির্ভর করে, তখন প্রত্যেকেরই এরূপভাবে জীবন-যাপন করা কর্তব্য যে, তাহার প্রভাবে যেন পরিবারের নৈতিক আদর্শ আরও উন্নতি হয় ও পারিবারিক প্রথাগুলি নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া উঠে। ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে প্রকৃত মানুষ এবং সচ্চরিত্রের আদর্শ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট ধনরত্ন আর কিছুই দান করিতে পারে না।

উপসংহার

সাধারণ গ্রন্থাগার

বিবিধ পুস্তকের সংরক্ষণশালাকেই সাধারণতঃ গ্রন্থাগার বলা হয়। প্রত্যেক সুসভ্য এবং উন্নতদেশের অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে পঠন-পাঠনের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ। শুধুমাত্র ব্যবহারিক দিক হইতেই পারদর্শী হইলেই কোন দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব নহে, প্রামাণিক দিক হইতে উপযুক্ত জ্ঞান আহরণ করা অত্যাবশ্যক। আর এই প্রামাণিক দিক হইতে জ্ঞান আহরণেরও সর্বোত্তম পন্থা হইতেছে গ্রন্থাগার। এ যুগের মনীষী কার্লাইলের মতে সত্যিকারের বড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে পুস্তক সংরক্ষণশালা। "The true university of these days is a collection of books."

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে জানিতে পাবা যায় যে আলেকজান্দ্রিয়ার বিরাট পাঠাগারকে খলিফা ওমর ধ্বংস করেন। ভারতীয় ইতিহাসে আছে, নালন্দা নামক একটি বিশ্ববিদ্যালয় অতীত ভারতের গর্ব করিবার মত বৈশিষ্ট্য লইয়া বর্তমান ছিল। বিশেষ করিয়া উহার পাঠাগারটি সর্বাপেক্ষা বেশি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। খলজী শাসনকালে উক্ত পাঠাগারটি ধ্বংস করা হয়। কনষ্টান্টিনোপলের বিরাট পাঠাগারটি ধ্বংসের কথাও পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে। এইসব পাঠাগারগুলির ঐতিহ্য মণ্ডিত ইতিহাস জ্ঞানানুরাগী মানব মনীষার স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মানুষ জ্ঞানের প্রদীপ চির-প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া

গ্রন্থাগারের অতীত ঐতিহ্য

নব নব ভাব-ভাবনার আশ্রয় লইয়াছে। তাই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সেদিনকার আজও অটুট রহিয়াছে। সেকারণেই বৃটিশ মিউজিয়াম, লেনিনগ্রাডের বিরাট পাঠা বিবিলিওথেক এবং ন্যাশনাল প্রভৃতি পাঠাগার আজও সর্বোতোভাবে গর্ব করি উপাদান বহন করিয়া রাখিয়াছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এই বিরাট পাঠাগারটির বিভিন্ন জায়গায় পাঁচটি শাখা আ ব্রিটিশ রাজত্বে ইহার নাম ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী।

একদিন পাঠের একমাত্র অধিকারী ছিল সমাজের উচ্চমঞ্চের লোকেরা; তাই উহা সর্বাতিশয়ী প্রাধান্যের কেন্দ্রভূমি ছিল এই পাঠাগার। অতীত ভারতের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃ মূলেও রহিয়াছে ঐরূপ সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির প্রসার। পাঠের আগ্রহ সকলের সমান ভাবে থাকিলেও জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে উন্নততর আদর্শের সহিত পরিচিত হইবার সুযো সমাজের প্রতিটি মানুষের আছে। এ যুগের গ্রন্থাগার তাই সকলের জন্যই অবারিত দ্বা আধুনিকযুগের পাঠাগার শুধুমাত্র জ্ঞানানুশীলনের সুযোগ করিয়াই দেয় না, উন্নত চিন্ত

বর্তমান

পথও উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইউরোপ মহাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী বিভিন্ন পাঠাগার খুলিবার চেষ্টা করা হয় এবং উহার সুফল প্র করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে ভারতবর্ষে বিভিন্ন পাঠাগার খোলা হয়। বি প্রয়োজনের তুলনায় উহা খুবই অল্প। প্রত্যেক সুসভ্য ও উন্নত দেশের ভাব-ভাবনার র সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পাঠাগার অত্যন্ত গুরুত্বলাভ করিয়াছে। প্রত্যেক শহ বহু উন্নত এবং প্রাচীন গ্রন্থের সংরক্ষণশালা থাকিলেও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে গ্রামে গা ভারতবর্ষের প্রয়োজনের তুলনায় পাঠাগারের সংখ্যা অত্যন্তই অল্প।

উন্নত সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত বর্তমান যুগের মানুষ আমরা। শিক্ষানুশীলনে মহতী আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। অবস্থার প্রতিকূলে পড়িয়া মানুষ বিভিন্ন প্রকারের আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। ইহার জন্য পাঠের আকাঙ্ক্ষা বলবৎ থাকিলেও পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠানুশীলন করা কষ্টসাধ্য। এই দুরূহ সমস্যা

প্রয়োজনীয়তা

সমাধান করিতে পারে একমাত্র পাঠাগারই। তাই ছাত্রদের এ জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠাগারগুলি সুগঠিত করিয়া তোলা দরকার। সামান্য চাঁদার বিনিময়ে প্রতিদিন বিভিন্ন মনীষী জ্ঞানানুশীলনের সহিত পরিচিত হওয়ার সুফল সম্ভাবিত হয়। শিক্ষা নির্বাহের ক্ষে ছাত্রদের জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের এবং জীবনচর্চার দিক হইতে জনসাধারণে জন্য পাঠাগার বিভিন্ন প্রকার উপকার করিয়া থাকে।

জটিল সামাজিক পরিস্থিতির দিকে তাকাইয়া এবং প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখি বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠাগার খোলা হয়। ইস্কুল কলেজে ছাত্রদের জন্য যে পাঠাগার থা

উহাতে শিক্ষামূলক এবং চিন্তামূলক গ্রন্থই বহুল পরিমাণে রাখা রহিয়াছে। জনসাধারণের জন্য পরিচালিত পাঠাগারে বিচিত্র রুচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তক সংগৃহীত হয়। এই পাঠাগারে পুস্তক পাঠ করিবার সুবিধার জন্য উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে হয়। জনসাধারণের দ্বারাই এই সকল পাঠাগার পরিচালিত হয়। সরকারের পরিচালনায় একশ্রেণীর পাঠাগার রহিয়াছে, যেগুলি বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাবিদ্‌দের মানসিক খোরাক জোগাইবার জন্য পরিচালিত হইয়া থাকে। সরকার কর্তৃক সুগঠিত উপায়ে ও উন্নত কর্মপদ্ধতির আশ্রয়ে এই সকল পাঠাগার সুগঠিত ও সুসমৃদ্ধ। আর এক শ্রেণীর পাঠাগার রহিয়াছে ঐগুলিও সরকারের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু উহাতে কেবলমাত্র ছাত্রদের উপযোগী পুস্তকই সংগৃহীত হইয়া থাকে।

গ্রন্থাগার কয় প্রকার

জ্ঞানানুশীলনের সহজাত প্রবণতাকে পুষ্ট করিতে হইলে পাঠাগারের পরিবেশ অবশ্যই উন্নত হওয়া উচিত। যথার্থ অধ্যয়ন পিপাসু ব্যক্তি সময়ের পরিমাপ করিয়া পাঠাগারে গিয়া বসে। খোস গল্প এবং চলতি ঘটনার আশ্রয়ে যাহারা আজগুবি কাহিনী ফাঁদিয়া মূলবান সময়ের অপচয় করিবার জন্য পাঠাগারে গিয়া বসেন, তাহাদের যথার্থই পাঠস্পৃহা প্রবল নহে। তাহাদের প্রয়োজনে পাঠাগার নহে। পাঠাগারের সুস্থ সবল পরিবেশ গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে সকলের সমভাবে দায়িত্ব রহিয়াছে।

গ্রন্থাগারের স্থান নির্ধারণ

কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর প্রবণতার উদ্বোধক পুস্তকের সংরক্ষণশালা হিসাবে পাঠাগারকে গড়িয়া তুলিলে চলিবে না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে পাঠাগারকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তোলা প্রয়োজন। এবিষয়ে প্রগতিশীল রাষ্ট্রীয় সরকারের দৃষ্টি দেওয়া অনস্বীকার্য। পাঠাগারের বৃহত্তর উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের প্রতিটি মানুষকে জ্ঞানানুশীলনের প্রতি উৎসাহিত করিয়া তোলা। সেইজন্যই পাঠাগার হইতেছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ্‌বিশেষ। তাই উহার উৎকর্ষের প্রশ্নের সহিত একটি জাতির সামগ্রিক প্রশ্নও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত রহিয়াছে।

উপসংহার

সময়ের মূল্য বা সদ্ব্যবহার

[স্কুল ফাইনাল ১৯৫৭]

সময় অমূল্য ধন। সময় ও নদীর স্রোত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কালের গতির বিচার করিলেই সহজেই অনুমেয় হয় যে ইহা মুহূর্ত মাত্রেরও কম। অথচ প্রত্যেক মানুষই বিশেষ বিশেষ কর্তব্যপালনার্থে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সময় মত কাজ করিয়া যাইতে হইবে। সময় চলিয়া গেলে বিশ্বের সমগ্র ঐশ্বর্য দিয়াও আর তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। সেইজন্য সময় থাকিতেই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিলে জীবনে ব্যর্থতা বরণ করিতে হয় না।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

যায়। মহারাজ অশোক জনহিতকর কাজ করিয়াই ধর্মাশোক হইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে সেবাকার্য বিস্তার লাভ করে। ভগবান্ যে কাজ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই, সে কাজ যে সাধারণ মানুষ হীন বলিয়া পরিত্যাগ করিবে একথা অবিশ্বাস্য।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে ধরনের সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে—এই ধরনের প্রতিষ্ঠান পূর্বে আমাদের দেশে ছিল না। কিন্তু তথাপি পল্লীর নানা উৎসবের মধ্যে, সামাজিক ভোজনের মধ্যে আমরা পারস্পরিক আন্তরিকতা বোধ দেখি—এবং ইহাই সেবাধর্ম প্রবৃত্তির প্রাথমিক নিদর্শন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যদেশে ভ্রমণ করিয়া সে দেশের সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়াছিলেন। সেইজন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশের অনুকরণে এদেশে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেবার্থীদের বলিতেন—দরিদ্র নারায়ণ। তাহাদের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের রূপ পরিস্ফুট দেখিতেন। রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশের যুবকবৃন্দের মধ্যে সেবার আগ্রহ অতিমাত্রায় দেখা দেয়। সেজন্য যখনই সেবার আহ্বান আসিয়াছে যুবকবৃন্দেরা প্রফুল্ল বদনে সে কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তখন হইতে অদ্যাবধি রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ অনুসরণে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্ম হইয়াছে—বহু সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে।

জনসেবার সুফল

স্বাধীন ভারতকে যথাযথ মর্যাদা সম্পন্ন করিতে হইলে—গ্রাম হইতে রোগ, মহামারী, অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর করিতে হইবে। এই মহান কর্তব্য সম্পাদন করিতে নিঃস্বার্থ ও নিষ্কলুষ চরিত্র যুবকের কর্তব্য এই সমস্ত গ্রামবাসীদের সেবাকার্যের মধ্য দিয়া উন্নতস্তরে আনা। নগর এবং গ্রামের সমৃদ্ধিসাধন হইলে ভারতের গৌরব বাড়িবে। বিত্তশালী নাগরিকদের অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে গ্রামে—যে গ্রামের উপরই নির্ভর করে আড়ম্বরপূর্ণ নাগরিক জীবন। বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া জগৎ যাহাকে স্বীকার করিয়াছে সেই মাহাত্মা গান্ধীর জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার জীবন আর্তের সেবায় সদাই নিয়োজিত ছিল।

উপসংহার

বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তিনির্বাচন

পৃথিবী জুড়িয়া বর্তমানে একটা দ্রুত পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। যন্ত্রবিজ্ঞান ও শিক্ষার অগ্রগতি এই পরিবর্তনকে আরও গতিশীল করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত। বিগত যুদ্ধে বাঙালী তথা ভারতবাসী তাহাদের সর্বস্ব হারাইয়াছে। ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আজ আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তনসাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। শিক্ষাই জাতির পথচলার নির্দেশ। সুতরাং সমগ্র জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণের জন্য দরকার যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনক্ষেত্রে একটি বিশেষ পেশার উপযোগী করিয়া তোলে তাহাই বৃত্তিশিক্ষা। ইহা উপার্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হইবার পর হইতে অদ্যাবধি আমরা কেবল পুঁথিগত শিক্ষাই পাইতেছি। কিন্তু এই শিক্ষা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না বলিয়া বেকার সমস্যা আজ দিন দিন উগ্ররূপ ধারণ করিতেছে। ফলে দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে জাতীয় দুর্দশা ও দারিদ্র্য। অতএব শিক্ষার সামগ্রিক আদর্শই যে ক্ষুণ্ণ হইতেছে একথা বলাই বাহুল্য। শুধু উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ ভাব লইয়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। ভাবসাধনার সাথে কর্মসাধনারও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

পুঁথিগত শিক্ষা

আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অন্ধভাবে ছুটিয়া চলে। সকলেরই লক্ষ্য উচ্চতর শিক্ষালাভ। শিক্ষা সমাপ্তির পর মুষ্টিমেয় ভগ্নাংশ সরকারী ও সওদাগরী অফিসে নেহাৎ কৃতার্থের মতো স্বল্প বেতনে ঢুকিয়া পড়ে; অবশিষ্টেরা লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি কেতাবী শিক্ষার সাথে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে আজ জাতীয় জীবনে এতখানি ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হইত না—আমরা দেশের সম্পদ্ বাড়াইতে পারিতাম, দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ পাইতাম। বৃত্তিশিক্ষার অভাবে এ দেশের বিদ্যার্থীরা তাহাদের মানস-প্রবণতা অনুযায়ী বৃত্তিনির্বাচন করিতেও অসমর্থ।

নিম্নতর বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে একরূপ নাই বলিলেও চলে। এ দেশের জনসাধারণের প্রধান জীবিকা হইল কৃষি। অথচ কৃষিশিক্ষার সুবন্দোবস্ত আজও পর্যন্ত আমরা করিতে পারি নাই। যাহারা কৃষিকে অবলম্বন করিয়া আছে বৎসরের অর্ধেক সময়েই তাহারা অলসভাবে কাটায়। নানা রকমের সহজ-সাধ্য শিল্প ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে দেশের জনগণের এক বিরাট অংশ আর্থিক দুরবস্থার হাত হইতে অব্যাহতি পাইত। বৃহৎ শিল্পে বিস্তর মূলধন আবশ্যক কিন্তু ক্ষুদ্রশিল্পে বেশী মূলধন অপেক্ষা বেশী শ্রমিকেরই প্রয়োজন।

নিম্নতর বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

অর্থনৈতিক দৈন্য বাঙালীর জাতীয় জীবনকে দিন দিন পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনশক্তি অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমাদের কম নাই। কিন্তু এগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য আমরা কোনরূপ প্রচেষ্টা করি নাই। শিল্পশিক্ষালাভ করিলে আমাদের দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষীতার ভাব সহজেই কাটিতে পারে। তাই এসব বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। গান্ধীজী রচিত 'ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা'য় হাতে কলমে শিল্প শিক্ষার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত নির্দেশ অনুযায়ী বাস্তবক্ষেত্রে এখনও শিক্ষার সংস্কার সাধিত হয় নাই।

বাঙালীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল কারণ

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে নানা প্রকার বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলেজী শিক্ষার সোপান হিসাবে না দেখিয়া উহাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আত্মস্বতন্ত্র করিয়া তোলা আবশ্যক। প্রতি বৎসর বহু ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পড়াশুনায় ইস্তফা দেয়। মাধ্যমিক স্তরে কিছুটা বৃত্তিশিক্ষা পাইলে তাহারা পরবর্তী-কালে স্কুল হইতে বাহির হইয়া আপন আপন রুচি ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী একটি বৃত্তিনির্বাচন করিয়া সাবলম্বী হইতে পারে। বর্তমানে আমাদের যে নানা প্রকার বৃত্তিশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই শিক্ষার প্রবর্তন হইলেই দেশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষান্তে সমাজ জীবনে স্বাধীন মানুষ হইয়া উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শুধুমাত্র বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হইলেই দেশের বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য ঘুচিবে না। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যেরও প্রসার করিতে হইবে। আনন্দের কথা যে সম্প্রতি দেশের সরকার এ বিষয়ে কিছুটা সচেতন হইয়াছেন। নূতন শিক্ষাধারা দেশের জীবনের মান উন্নত করুক, ইহা সকলেরই একান্ত অভিপ্রেত।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন এবং উপসংহার

দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা

বিজ্ঞান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীও দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে। জীবনযাত্রা প্রণালীকে সহজ করিবার জন্য প্রতিটি মানুষই সচেষ্ট হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীকে সহজতর ভাবে প্রবাহিত করিবার জন্যও প্রতিটি বিষয়ের পরিবর্তন দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাহারই ফলস্বরূপ গণিতের ক্ষেত্রে নব রূপায়ণ দশমিক পদ্ধতির প্রবর্তন। ভারতই সর্বপ্রথম এই দশমিক মুদ্রা পদ্ধতির আবিষ্কার করে। কিন্তু ভারতে বহু পরে এই পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থাকে পৃথিবীর বহু দেশ পূর্ব হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পরে অন্যান্য দেশ এই মুদ্রাপদ্ধতি চালু করে। পৃথিবীর ১৪০টি দেশের নিজস্ব মুদ্রা আছে। তন্মধ্যে ৬০টি দেশ এই মুদ্রা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের দেশে বিগত ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল এই দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গত ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লোকসভা ভারতীয় মুদ্রা আইন পাশ করিয়া এই ব্যবস্থা চালু করা হয়।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

দশমিক মুদ্রাব্যবস্থায় টাকা, আনা, পাই-এর হিসারের বদলে ‘পয়সার’ হিসাব করা হইবে। পূর্বেকার ব্যবস্থায় টাকার চৌষট্টি ভাগ করা হইত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় এক টাকার একশত ভাগ করা হইয়াছে। ফলে টাকার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে এই পদ্ধতি অনেক সহজ হইয়াছে।

মুদ্রার স্বরূপ

তাহা ছাড়া বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারেও এই ব্যবস্থা অনেক সুবিধা দান করিবে। লেন-

দেনের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশের কোন অসুবিধা হইবে না। কারণ পৃথিবীর বহু দেশেই এই মুদ্রা পদ্ধতি চালু হইয়াছে। সভ্যতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতকেও সমান তালে তাল রাখিয়া চলিতে হইবে। সেই কারণেই বিশেষজ্ঞগণ ভারতে দশমিক মুদ্রা পদ্ধতি গ্রহণের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। তাহা ছাড়া

এই ব্যবস্থায় সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা

ভারতে শিল্পবিপ্লব শুরু হইতে আর বিশেষ দেরী নাই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের ফলে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই শিল্প-বিপ্লব শুরু হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। ভারতে মেট্রিক ওজন পদ্ধতিও এতকাল চালু না থাকার দরুণ বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইত। সেইজন্য মুদ্রাব্যবস্থার সহিত তাল রাখিয়া ওজন পদ্ধতি প্রবর্তনও অনেক সহজ হয়। সেই বিষয়ের প্রতি চিন্তা করিয়া দশমিক মুদ্রা পদ্ধতি চালু ভারতের পক্ষে অন্যতম প্রয়োজন ছিল। তাহা ছাড়া পুরাতন ধারাপাতের বুড়ি-গণ্ডা, কড়া-ক্রান্তি, ধুল-দন্তি, কাক-তিল প্রভৃতি জটিলতা পাঠ্যসূচীকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাতেও জটিলতা দূর হইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নূতন পদ্ধতি অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে।

এই নূতন ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম মানুষের কাছে একটু অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার কারণ, যুগ যুগ ধরিয়া যে প্রণালী আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশতঃ মানুষের কাছে নূতন কোন পদ্ধতি অসুবিধা সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক ও সংগতভাবেই পুরাতন ব্যবস্থার রদবদল করিতে গেলে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। তাহার জন্য কিছুকাল পুরাতন ব্যবস্থার পাশাপাশি নতুনকে চালানো হইয়া থাকে। অবশেষে মানুষের কাছে নূতন ব্যবস্থা ধাতস্থ হইয়া গেলে তাহার পর নূতন ব্যবস্থা মানুষের

এই ব্যবস্থা চালুর পথে অন্তরায়

কাছে আর নূতন বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশেও এইরূপ ভাবেই নূতনের সঙ্গে পুরাতন ব্যবস্থাকে খাপ খাওয়ানো হইয়াছিল। অনেক সময় মানুষ এই ব্যবস্থাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে চায় নাই। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ উৎসাহের সঙ্গেই এই ব্যবস্থায় সহযোগিতা করিয়াছে; তাহার ফলেই এত তাড়াতাড়ি আমাদের দেশে দশমিক মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে।

তবুও সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এই দশমিক মুদ্রা পদ্ধতি অনেক সহজ ও জটিলতাহীন। হিসাব-নিকাশ ও লেন-দেনের ব্যাপারেও অনেক সুবিধা

উপসংহার

হইয়াছে। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অনেক দেশ লেন-দেনের ব্যাপারে জটিলতামুক্ত হইয়াছে। সব দিক দিয়া এই ব্যবস্থা অভিনন্দনযোগ্য। এতকাল গণিতের প্রাথমিক পাঠ্যক্রম নব্যশিক্ষার্থীর নিকট একঘেঁয়ে ও ভীতিপ্রদ ছিল। কিন্তু বর্তমান নূতন পদ্ধতি তাহাদের নিকট অনেক সহজ হইবে এবং তাহাদের গণিত শিক্ষায় উৎসাহ সঞ্চার করিবে। সেইজন্য ভারতের পক্ষে এই মুদ্রাব্যবস্থা সময়োপযোগী হইয়াছে।

ধর্মঘট

মানুষের ইতিহাস শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিষময় কুফলের ইঙ্গিত দেয়। দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্র এইগুলি ইতিহাসের বিভিন্ন ক্রমিকস্তর। কারখানা প্রথার প্রবর্তন, উন্নত যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, যানবাহনের সহজ বাহন, মূলধন ও পুঁজিবৃদ্ধির মত বিস্তর সুযোগ-সুবিধা —এই সব কিছুই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দ্বারা সৃষ্ট এবং মানবপ্রগতির নির্দেশক। কিন্তু ইহার অন্যদিকে রহিয়াছে সমজাবক্ষয়, বিশৃঙ্খলা এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বপ্রসূত অনৈক্যবোধ।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ধর্মঘটের মূলেও রহিয়াছে এই অনৈক্য এবং বিশৃঙ্খলা। একজনের অধীন কিংবা একটি যৌথ কারবারের অধীনে সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারিগণের একযোগে ও সর্বসম্মতিক্রমে কর্মবিরতি দিবার যে পন্থা উহাই ধর্মঘট। সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে থাকিয়া অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ করিবার আদর্শ হইতেই ধর্মঘটের জন্ম। যুগের দ্বারা লালিত হইয়া সমাজ অভ্যন্তরে সর্বশ্রেণীর মধ্যে এই আদর্শ বোধ উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তাই এ যুগে ধর্মঘট শুধু শ্রমিকরাই করে না—সমাজের যে কোন বৃত্তির মানুষই অন্যায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়া চরম পন্থা হিসাবে ধর্মঘটকে বাছিয়া লয়।

ধর্মঘটের মূলে রহিয়াছে দুইটি পক্ষ। সাধারণতঃ মালিক এবং শ্রমিকের বিরোধকে কেন্দ্র করে যে ধর্মঘট হয়, উহার ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট কোন কারখানাতেই নিবদ্ধ থাকে। অন্যদিকে অত্যাচারী এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের অন্যায্য কোন বিল কিংবা জটিল কোন সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নাগরিকেরা একযোগে ধর্মঘট করিতে পারেন। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় লভ্যাংশের সমবণ্টন হয় না। লভ্যাংশের চার ভাগের মধ্যে দুই ভাগ মূলধনের প্রয়োজনে এবং অপর দুইভাগের মধ্যে একভাগ মালিক ও অপর ভাগ শ্রমিকের পাওয়া উচিত। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমাগতই বাড়িয়া থাকে।

বিভিন্ন রূপ ও পক্ষ

অন্যদিকে সরকারী কেষ্ট-বিষ্টুরা যদি আপন খেয়াল খুশিমত স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যায়, তবে তাহাতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নাগরিকদের মনে বিরুদ্ধ ভাব-ভাবনার উদ্রেক হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আশ্রয় না করিয়া নেতিবাচক আদর্শানুসরণে যদি কেহ ধর্মঘটকে অন্যায্য দাবী মনে করেন, তবে তিনি ভুল করেন। কারণ তাহাদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য কখনও অন্যের কথা ভাবিবার মত পরিসর সৃষ্টি করিতে দেয় না। তাহা না হইলে তথাকথিত নির্ভেজাল ব্যক্তিদের কখনও শ্রমজীবীদের সান্নিধ্যে আসিতে হয় না, তাই তাহারা এরূপ উক্তি করিতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন না।

বর্তমানে দ্রুত শিল্পায়নের যুগে ধর্মঘট হইল অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়। এ যুগে কারখানার প্রথার প্রবর্তন এবং বৃহৎ যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। সংঘবদ্ধ না হইবার পূর্ব পর্যন্ত মালিকের জুলুমকে শ্রমিকেরা স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইত। তাই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার পূর্বেকার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রমিকদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং আর্থিক দৌর্বল্যের সুযোগ মালিকেরা পুরোপুরি গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ না দেখাইয়া শ্রমিকদেব সেদিন মালিকেরা পদচ্যুত করাইতে পারিত। হয়ত বা প্রয়োজনের তাগিদে বহু শ্রমাকাঙ্ক্ষীই স্বাভিবিক্ত হইয়া চাকুরী গ্রহণ করিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করিত না। কিন্তু এ যুগের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ভিন্নরূপ। এযুগের শ্রমিকেবা জানেন, সংঘবদ্ধ না হইলে মালিকদের জোর জুলুমকে মানিতেই হইবে, ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। তাই শ্রমজীবী সম্প্রদায় তাহাদেবই স্বার্থে নতুন একটি প্রতিষ্ঠানেব আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে, ইহা হইল 'ট্রেড্ ইউনিয়ন'। এককভাবে কোন শ্রমিকের দাবীকে মালিককুল হয়ত বা স্বীকৃতি দিতে চাহিবে না। কিন্তু গণতন্ত্রের যুগে সমাজকে বঞ্চনা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। যদি মালিক বঞ্চনাই করিতে চায়, সে যদি অতিবেশী মুনাফাবৃদ্ধির কথাই ভাবে—তবে শ্রমিকসমাজ নীরব হইয়া থাকিতে পারে না। অবশ্যই প্রতিকাবের কথাই চিন্তা করিবে। আর সে প্রতিকারের চরমতম পথ হইল ধর্মঘট করা। শ্রমিকদের অভাবে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কর্ম বন্ধ থাকিবে। ইহাদেব বাদ দিয়া নূতন কাহাকে নিয়োগ করাও কষ্টসাধ্য। হয়ত বা ইহার দিকে তাকাইয়াই মালিকসম্প্রদায় সমষ্টির দাবীর নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। শ্রমিক যদি যথেষ্ট তৎপর হয়, তবে তাহারা অনায়াসেই শিক্ষা, বাসস্থান, উচ্চবেতন, কর্মকালের সময় হ্রাস এবং সুউন্নত উপায়ে কাজ করিবার মত সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারে।

সুযোগ ও সুবিধা

একথা অস্বীকার করা যায় না, ধর্মঘটের উদ্দেশ্য এবং আদর্শকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে যথেষ্ট প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হইতে হয়। ধর্মঘটের সাফল্যও অনেক সময় বিপদ ডাকিয়া আনে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ও জনসাধারণের প্রয়োজন নির্বাহের ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা এবং অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। ব্যর্থতা পরিণামে ধর্মঘটীদের মধ্যে হিংসা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এমন কি অনেক সময় মালিক এবং শ্রমিকপক্ষ মহম্মদ বিন-তুঘলকসুলভ মনোবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অত্যাবশ্যক দিনগুলিকেও বাদ দিয়া চলেন। তবে ইহা একান্তই সত্য যে প্রতিবাদ এবং অভিযোগ পেশ না করিলে মালিক পক্ষের হুঁশ হয় না। হয়ত বা হিংসা উপায়ে শ্রমিকরা মালিকপক্ষকে সচেতন করাইতে পারেন। কিন্তু ঐরূপ আচরণ মনুষ্যত্ব বিরোধী ও অযৌক্তিক। আর সে কারণে ধর্মঘটই হইল অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়।

অসুবিধা এবং কুফল

এই পথ ছাড়া প্রতিবাদ পেশ করিবার অন্য কোন বিকল্প পন্থা নাই, তবে ইহাও সত্য, অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকপক্ষ একযোগে ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করে না, এমন কি শ্রমিকদের স্বার্থে পরিচালিত বিভিন্ন মজদুর-ইউনিয়নগুলির কার্যনির্বাহক সমিতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেও শ্রমিকেরা দ্বিধাবোধ করে না। আবার অনেক সময় ইহাও দেখা যায়, কার্য-নির্বাহক সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতারা সরকারের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমষ্টি স্বার্থের মূল দাবীপূরণের কথা বিস্মৃত হইয়া ন্যূনতম দাবী পেশ করেন।

বর্তমান যুগে ধর্মঘট শুধু মালিক-শ্রমিকের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত নহে। সমাজের সর্বপ্রকার মানুষ আজ রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তাই অহিংস উপায়ে শৃঙ্খলার সাথে প্রতিবাদ করিতে গিয়া অনেকেই ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুদ্ধ, কালোবাজার, লোভ-বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা প্রতিদিনকার সমাজ-জীবনকে কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। এই অবস্থার সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে শ্রেণীদ্বন্দ্ব। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিষময় পরিণতি হইতে সমাজকে বাঁচাইতে হইলে প্রতিটি সুস্থ-বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে অন্যান্য অসত্যের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অহিংস উপায়ে প্রতিবাদের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া ধর্মঘটের গুরুত্ব বাড়িয়া উঠিয়াছে।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের বিগত বন্যা

জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়, ঠিক তেমনই প্রকৃতির দুর্যোগের সঙ্গেও তাহাকে লড়াই করিতে হয়। পার্থিব-সংগ্রামে তবুও মানুষ বাধা-বিপত্তির একটি সীমা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালের কাছে মানুষ একান্ত অসহায়। বন্যা প্রকৃতির এই খেয়ালের মর্মান্তিক রূপ। বৃষ্টিধারা যে জলরাশি বহিয়া আনে, তাহা মানুষকে অজস্র ভাবে যেমন পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, তেমনই তাহার অতিরিক্ততা আমাদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত ছিনাইয়া লইয়া, তাহাকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া যায়। ভূমিকম্পে, অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত মৃত্যু, রোগ-শোক, মহামারী প্রভৃতিতে মৃত্যু তো আছেই, কিন্তু বন্যা ভীষণরূপ ধারণ করিয়া মানুষের মৃত্যুকে বিভীষিকা করিয়া তোলে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বন্যাবিধ্বস্ত বাঙলাদেশের দুরবস্থা আমরা ব্যক্তিগত জীবনে এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাই। মেদিনীপুরের বন্যা, দামোদরের বন্যা, ব্রহ্মপুত্রের প্লাবন, মহানদী, কোশী প্রভৃতির বন্যার বেগ গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। গত ১৩৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলাই বন্যার প্রকোপে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মানুষ এই দুর্নিবার বন্যার কাছে একান্ত অসহায়। দুরন্ত জলস্রোত মানুষ, পশু সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। জলপ্লাবন যেন এক বিরাট

ফলাফল

মহশ্মশানের সৃষ্টি করে। তাহার পর দেখা দেয় মহামারী। ক্ষেতের ফসল যায় নষ্ট হইয়া। গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন বন্যার্ত দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশার আর অন্ত থাকে না। তখন সাহায্যের জন্য সর্বত্র আবেদন জানানো হয়।

বন্যার সর্বপ্রধান কারণ হইতেছে অতিবৃষ্টি। অতিবর্ষণের ফলে নদীগুলি স্ফীত হইয়া ওঠে। এদিকে পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতির জলাশয় সব একাকার হইয়া যায়। বৃষ্টি না কমিলে ক্রমশ সেই জল ঘর বাড়ি ভাসাইয়া লইয়া যায়। নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া সেই জল গ্রামে ও শহরে প্রবেশ করে। তখন স্বভাবতই বন্যা হয়। দ্বিতীয়তঃ বন্যা শুধু জল-স্রোতকেই বহন করিয়া আনেনা, এই সঙ্গে পলিমাটি প্রভৃতিও বহন করিয়া আনে। এই পলিমাটি নদীগর্ভে জমিয়া তাহার গভীরতাকে অনেকখানি কমাইয়া ফেলে। ফলে প্রথম বন্যার পরে যদি আবার বন্যা দেখা দেয়, তখন নদীর সে জলধারা বহন করিবার ক্ষমতা থাকে না। তখন জলধারা নদীর দুইকূল প্লাবিত করিয়া লোকালয়, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি ডুবাইয়া দেয়। কারণ, নদী-গর্ভে পলিমাটির স্তর জমিয়া নদীকে গতিমন্থর করিয়া ফেলে।

বন্যার কারণ

বন্যার প্রকোপ নিবারণের উপায়ও মানুষ খুঁজিতেছে। মনে হয়, প্রথমেই প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বাঁধের ব্যবস্থা করা দরকার। নদীর বাঁধগুলি কতকটা জল প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয়। পাকা বাঁধ না হইলেও অন্ততঃ কাঁচা বাঁধও বন্যার বেগকে কিছুটা প্রতিরোধ করিতে পারে। এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশের নদীগুলিতে পাকা বাঁধ অপেক্ষা কাঁচা বাঁধই বেশি দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধের ব্যাপারে চীন আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। ইহা ছাড়া নদীগুলির পাশে বড় বড় জলাধারও সৃষ্টি করা উচিত। এই জলাধারে বৃষ্টির এমন কি নদীর স্ফীতজলও রক্ষিত হইতে পারে। খরস্রোতা নদীগুলির কাছাকাছি জলাধার রাখিলে বন্যার বেগ কিছুটা প্রশমিত হইতে পারে। বিশেষ করিয়া যে সব নদী বেশী ঢালু তাহাদের জন্য এই জলাধার নির্মাণ করা খুবই দরকার।

বন্যারোধের কারণ

বন্যা নদীতে যে বালি ও পলিমাটি এবং পাথরের মতো অন্যান্য পদার্থ বহন করিয়া আনে তাহাতে নদীগর্ভ ভরিয়া উঠে। এই মাটি-পাথর সরাইবার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। বর্তমানে নদীগর্ভের গভীরতা ঠিক রাখিবার জন্য নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; পর্বতসঙ্কুল এবং নদীমাতৃক ভারতে এইরূপ যন্ত্র মজুত রাখা উচিত। নদী-গর্ভের উপযুক্ত গভীরতা থাকিলে জলস্রোত বহিয়া চলিয়া যাইতে পারে। কাজেই এই গভীরতা যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্য উক্ত যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তিনজন ইঞ্জিনীয়ার দীর্ঘমেয়াদী কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছেন। দুর্গত অঞ্চলগুলিতে গ্রামের ভূমিভাগের উচ্চতা বৃদ্ধি-

নির্মাণ করিয়া শহরগুলিকে রক্ষার জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন। বন্যার প্রকোপ যে সব নদীতে বেশি, সেই নদীগুলি হইতে খাল কাটিয়া দিলে এবং সেই সব খালের মুখ বর্ষার দিনে বন্ধ করিয়া দিয়া পরে গ্রীষ্ম বা শীতের সময় জল ছাড়িয়া দিলেও জলের দুর্বার বেগ কিছুটা প্রশমিত হয়। ইহার দ্বারা বন্যা কিছুটা রোধ হয়।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের আশীর্বাদস্বরূপ আমরা অনেক নূতন নূতন যন্ত্রপাতি পাইতেছি। প্রকৃতির খেয়ালখুশীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়া হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যর্থ হইবে। তবুও মানুষের যে ঐকান্তিক ইচ্ছা তাহাকে নানা বাধা প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল করিয়া তুলিয়াছে—যে বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছায় মানুষ মৃত্যুকে একেবারে পরাজিত করিতে না পারিলেও অন্ততঃ তাহাকে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে—ঠিক সেইভাবেই আজ নানা চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির প্রতিকার নির্ণয় এই মানুষকেই করিতে হইবে।

আমরা যদি কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বিধাতার খেয়াল বলিয়া দুর্বল, অসহায়ের মতো চুপ করিয়া মৃত্যুর মার খাইয়া যাই—তাহা হইলে মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতেও পারিব না। অবশ্য এ সব ব্যাপারে রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব অধিক। দেশের সরকার যদি এই বিষয়ে সচেতন হন এবং ভারত সরকার যদি তাঁহাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে এই বন্যা প্রতিরোধের পরিকল্পনা অন্যতম পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বন্যার ভয়াবহতা হইতে দেশ রক্ষা পাইতে পারে।

উপসংহার

মানুষের এই দুর্দিনে মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য রহিয়াছে—নরনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করা, বিপন্নের উদ্ধারে অগ্রসর হইতে হইবে, নিজের সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভুলিয়া পরের দুঃখমোচন করিতে হইবে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের কৃপায় মানবজন্ম সার্থক হইবে। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই—

"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

লোকগণনা বা আদমসুমারী

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬১]

লোকগণনায় সর্বপ্রথম প্রচলন সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে অতি প্রাচীনকালেই ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। পৃথিবীতে যাহারা প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী সেই রোমানদের সাম্প্রতিক গড়িয়া উঠিবার বহু পূর্ব হইতেই লোকগণনা প্রথা প্রচলিত হয়। খৃষ্ট জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ব্যাবীলনের অধিবাসীদের কৃষি সম্পাদন অবস্থা নিরূপণ করিবার জন্য এইরূপ একটি গণনা কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে পারস্য, চীন ও মিশর

প্রারম্ভিক ভূমিকা

দেশে কেবলমাত্র রাজস্ব নির্ধারণের জন্য নহে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কি পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ করা যাইত তাহা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যেই লোকগণনা করা হইত। ভারতবর্ষে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম লোকগণনা করা হয়।

লোকগণনার উদ্দেশ্য প্রণালী

বর্তমানকালে রাষ্ট্রের বিশেষতঃ নাগরিকগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বন করা হইবে তাহাই লোকগণার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেক দেশেই তাই কোন এক নির্দিষ্ট দিনে, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যেক স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ প্রভৃতির সংখ্যানির্ণয় করিয়া তাহাদের বৃত্তি, আর্থিকঅবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ হইয়া থাকে। এইরূপ গণনা দ্বারা অতীত ও বর্তমানের তুলনামূলক আলোচনা হইতে প্রত্যেক রাষ্ট্র কিভাবে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রতি দশ বৎসর অন্তর আমাদের দেশে লোকগণনা করা হয়।

লোকগণনার সম্বন্ধে প্রাচীনকালের মনোভাব

এমন একদিন ছিল যেদিন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার অভাবে মানুষ এই প্রথাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পায় নাই। অজ্ঞতা ও সংস্কারবশতঃ তাহাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে, যদি কোন মানুষকে গণনা করা হয় তবে অচিরাৎ তাহার মৃত্যু হইবে। এমন কি সাধারণ ইংরাজদের মধ্যেও ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে এইরূপ মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, লোকগণার ফলে দেশে বিরাট মহামারী দেখা দিতে পারে। তখন কেবলমাত্র অতি সামান্য সংখ্যক সমাজ ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হন। গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবাসী লোকগণনা সু-নজরে দেখিতে আরম্ভ করেন।

লোকগণনার প্রয়োজনীয়তা

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা সম্বন্ধে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাহা নির্ভুল বলা যায় না। কারণ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাঙলায় হিন্দুজনসংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার সময় হিন্দুরা এ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল হওয়ায় ও সতর্কতা অবলম্বন করায় যাহাতে গণনাকার্য নির্ভুল-ভাবে সম্পাদিত হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করেন। সেই সময় হইতে সকলেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে থাকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর ১৯৬১ সালে প্রথম লোকগণনা করা হয়—ইহাই স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম লোক-গণনা। বর্তমানকালে, যখন দেশের জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে সেই সময় নির্ভুলভাবে লোকসংখ্যা নির্ণয় করিতে না পারিলে জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধান করিবার জন্য কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কি পরিমাণ খাদ্যবস্ত্র প্রয়োজন, দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলি কিভাবে সমাধান করা

যাইতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বপ্রথম দেশের জনসংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক। দেশের কত লোকের অন্নসংস্থান করিতে হইবে, উৎপাদনের জন্য কি পরিমাণ সুদক্ষ কর্মী সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ঐ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে একটি নির্ভুল লোকগণনার প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও লোকগণনায় রাজনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট আছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই নির্বাচন কার্য পরিচালিত হয়। নির্বাচনের প্রত্যেকটি কেন্দ্রের নির্দিষ্ট জনসংখ্যার প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে নির্ধারিত প্রতিনিধি দ্বারা রাষ্ট্র কার্য পরিচালিত হয়, সেখানে সঠিক লোকগণনার বিশেষ গুরুত্ব আছে সন্দেহ নাই। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতে যে সর্বপ্রথম লোকগণনা হয়, তাহা যাহাতে নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হয়, এজন্য সর্বরকম সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল।

লোকগণনায় রাজনৈতিক গুরুত্ব

আজ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক—অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও উন্নতির জন্য ভারতীয় নাগরিকগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য—প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নানারূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। ইহা ছাড়া মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন বৃত্তি, জীবনধারণের মান প্রভৃতি নির্ধারণের জন্য সঠিক জনসংখ্যা কি, সে বিষয়ে অবগত হইয়া জাতি গঠনের জন্য সরকার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং জাতি গঠনের কার্যে লোকগণনার অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেক নাগরিকের গণনাকারীদের সর্বরকম সাহায্য করা কর্তব্য। গণনাকার্য গোপনীয়তা রক্ষা করাই সরকারের বিধান ও উদ্দেশ্য। এই গণনা কার্য বিশেষ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অধীনে কার্য করিবার জন্য বহু গণনাকারী নিযুক্ত করা হয়। এই সমস্ত কর্মচারী যাহাতে গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া আবশ্যকীয় তথ্যটি সততার সহিত সংগ্রহ করিয়া নির্ভুলভাবে গণনা কার্য সম্পাদন করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি ভিন্ন এ কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিকেরই কর্তব্য গণনাকার্যের সরকারী কর্মচারীদের সর্বরকম সহানুভূতি ও সাহায্য দান করিয়া জাতির কল্যাণকর এই লোকগণনা কার্যটিকে সার্থক করিয়া তোলা।

উপসংহার

সংবাদপত্র

বর্তমান সভ্যসমাজের অত্যাবশ্যক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে সংবাদপত্র অন্যতম। ইহা সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। জগতের কোনও সভ্যসমাজই ইহা ব্যতীত সচল অবস্থায় থাকিতে পারে না। খাদ্যপানীয় যেমন আমাদের উদরের ক্ষুধার নিবৃত্তিসাধন করে, সেইরূপ সংবাদপত্র আমাদের অন্তরের ক্ষুধা দমনের উপকরণ সংগ্রহ

করিয়া থাকে। সংবাদপত্র কর্মীর কর্ম সম্পাদনের যেমন অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী, নিষ্কর্মা ব্যক্তির ও ইহা তদ্রূপ অবসর বিনোদনের একান্ত সহচর। কি ব্যবসায়ী, কি সাহিত্যিক কি রাজনীতিবিদ্, কি দার্শনিক, কি শিক্ষক সকলকেই সংবাদপত্র তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্বাহের উপকরণ জোগাইয়া থাকে। যাহারা সংবাদপত্রের নিত্য পাঠক যতক্ষণ তাহাদের হস্তে সংবাদপত্রখানি আসিয়া উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের অস্বস্তির অবধি থাকে না। সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ দান। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানব স্বীয় সমাজের উন্নতি বিধায়ক যতপ্রকার সামগ্রী আবিষ্কার করিয়াছে, সংবাদপত্রকে সে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দান করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা মানব-সমাজে যতদূর কল্যাণ সাধিত হইতেছে, অপর কোন সামগ্রী দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

অতি প্রাচীনকালে চীনদেশে এক জাতীয় সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। মোগল বাদশাহগণের শাসনকালে একপ্রকার হস্ত-লিখিত সংবাদপত্র ছিল। কিন্তু তাহা সর্বসাধারণের জন্য নহে, শাসন-বিষয়ক কার্যনির্বাহার্থ উহা কেবল উচ্চ রাজকর্মচারিগণের মধ্যে প্রচারিত হইত। আধুনিক সংবাদপত্রের জন্মস্থান ইংলণ্ডে। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে উহা প্রথমে ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়। অবশ্য ইহার পূর্বে ভিনিস নগরে একপ্রকার সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল, উহা কেবল শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহ সর্বসাধারণকে জানাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইত। ভিনিসের অনুকরণে এই মহাদেশের অন্যান্য রাজ্যে ঐ প্রকার সংবাদপত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে 'গেজেট অফ্ প্যারিস্' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই প্রাচীন পত্রিকাখানি অদ্যপি বর্তমান আছে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পরেই সংবাদপত্রের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হয়।

পূর্ব ইতিহাস

সংবাদপত্র সুদূর নিভৃত পল্লীতে বিশ্বের যাবতীয় তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করিয়া পল্লীর সহিত বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপন করিতেছে। কোন্ দেশে কি রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইল তাহা আমরা সংবাদপত্রের সাহায্যে গৃহে বসিয়া অবগত হইতে পারি। বিজ্ঞানের আবিষ্কার, মনীষীগণের নব নব চিন্তাধারা, সমর-সংবাদ প্রভৃতি সংবাদপত্র আমাদের নিকট বহন করিয়া আনে। জনমত-গঠনে সংবাদপত্রের শক্তি অদ্বিতীয় শাসক ও শাসিতের মনোভাব সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সহজ পন্থা। কোন বিষয় অত্যল্প সময়ের মধ্যে লোকসমাজে প্রচার করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই। ব্যবসায়ীদিগের স্ব স্ব পণ্যদ্রব্যের বিবরণ সংবাদপত্রের স্তম্ভে ঘোষণা করিয়া উহার বহুল প্রচারসাধন একমাত্র সংবাদপত্রের দ্বারাই

সংবাদপত্র সরবরাহ ও জনমত গঠনে সংবাদপত্রের শক্তি

সম্ভব হইয়া থাকে। সংবাদপত্রের বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, সমাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য পাঠ করিয়া আমরা আমাদের অভাব এবং তাহা নিবারণকল্পে যথাকর্তব্য নির্ধারণের জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন সমাজে জ্ঞানের আলোকপাত করিতে সংবাদপত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ দীপ-বর্তিকা। অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিও নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে অশেষ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকে। ভাষা শিক্ষা করিতে সংবাদপত্রপাঠের তুল্য সহজ উপায় নাই। মোটের উপর, সংবাদপত্র মনুষ্যসমাজের যে অভাবনীয় উপকার সাধন করিতেছে তাহা নির্ণয় করা অল্প কথায় সম্ভবপর নয়।

আমাদের দেশের ইংরেজ শাসনের পূর্বে আধুনিক ধরণের সংবাদপত্রের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট 'ইণ্ডিয়ান গেজেট' নামক সংবাদপত্র প্রথম এদেশে প্রচলিত করেন। খৃষ্টান মিশনারিগণ শ্রীরামপুরে বাঙলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া এদেশে মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রচারের উদ্যোগী হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারী উইলিয়ম কেরী 'দিগ্‌দর্শন' নামক বাঙলা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। পরে তথাকার মিশনারীদিগের দ্বারাই সপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়; ইহাই ভারতীয় ভাষায় আধুনিক ধরণের সংবাদপত্র।

প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র

স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন প্রকার সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। ঐ সকল পত্রিকার মধ্যে কোনটি দৈনিক, কোনটি মাসিক, আর কোনটি সাপ্তাহিক। বাঙলা দেশে বর্তমানকালে আনন্দবাজার, যুগান্তর ও বসুমতী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দৈনিক সংবাদপত্র। ইহা ছাড়াও ইংরাজিতে Statesman, Amrita-bazar Patrika প্রভৃতি বর্তমানকালে প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষে অন্যান্য ভাষায় রচিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বাঙলা দেশের সংবাদপত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদালাভ করিয়াছে।

বর্তমান বাঙলা সংবাদপত্র

গতকাল লণ্ডনে, নিউইয়র্কে বা বার্লিনে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, অতি প্রত্যুষে সদ্যঃ নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমরা সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহার আনুপূর্বিক বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এত অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সুদূর দেশসমূহের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কাগজে মুদ্রিত করা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে? জ্ঞানবিস্তার ও জাতিগঠনেও সংবাদপত্র বিশেষ সাহায্য করে। সংবাদ সংগ্রহ এবং সরবরাহের জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে কতকগুলি সংঘ আছে। ইহাদের মধ্যে 'রয়টার'-এর নামই বিখ্যাত। পৃথিবীর সর্বদেশে ইহার শাখা আছে। উহারা সেই সকল প্রদেশ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তারযোগে পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দেয়। সংবাদপত্রসমূহকে এই সংবাদের জন্য রীতিমত অর্থ প্রদান করিতে হয়। ভারতবর্ষেও 'রয়টার'-এর কয়েকটি শাখা আছে। কিন্তু বর্তমানে উহা 'প্রেস ট্রাষ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া' নামে

উপকারিতা ও বিবিধ সংবাদ সরবরাহ সংঘ

অভিহিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এদেশে সংবাদ সরবরাহ ও সংগ্রহের জন্য 'এসোসিয়েটেড্ প্রেস', 'ইউনাইটেড্ প্রেস' প্রভৃতি সংঘ আছে। বর্তমানে বেতারযন্ত্র এই সংবাদ সরবরাহের অভাবনীয়রূপে সাহায্য করিয়া থাকে। বর্তমানকালে সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য একপ্রকার দ্রুত মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অতিঅল্প সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র কাগজ মুদ্রিত, ছাঁটাই ও ভাঁজ হইয়া বাহির হয়। এইরূপে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অপর প্রান্তে প্রচারিত হয়।

একটি প্রাচীন বটগাছের আত্মকাহিনী

জ্ঞানোদয়ের পূর্বের ঘটনা-বৃত্তান্ত যেমন শিশুর সুকুমার মানস-পটে অঙ্কিত থাকে না, তেমনি জীবনের অতি শৈশবের কোন কথাই আজ আমার মনে নাই। কেমন করিয়া, কোথা হইতে আসিয়া এই অরণ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম সে কথা আজ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এমনি এক অজানা তন্দ্রাবেশের মধ্যে কখন যে শৈশবের কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করি নাই। তবে এ কথা বেশ মনে পড়ে—যেদিন কৈশোরের প্রান্তসীমায় আসিয়া উপনীত হই, সেদিন এই ক্ষুদ্র বন-সমাজ আমার বিরোধিতা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ঈর্ষাপরায়ণ ঝোপ-জঙ্গল, কাঁটা-গুল্মাদি আমার উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—আমার নবোন্মেষিত প্রাণ-শক্তিকে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু এই রুগ্ন-ক্ষীণ বন-সমাজ বিরোধিতায় আমার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। আমার প্রতিবাসিনী যে দুই-একটি স্বর্ণলতিকা ছিল, তাহাদের কোমল স্বভাবে আমি সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিলাম; তাহাদিগকে আমার বড় ভাল লাগিত; তাই তাহাদের সাহচর্য পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। জীব-জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার মত ক্ষমতা তাহাদের ছিল না; সেইজন্য আমারই স্নেহ-নির্ভর আশ্রয়ে তাহারা পরিবর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে আজ আমার শাখা-প্রশাখাগুলিকে আবদ্ধ করিয়াছে। তখন হইতে সুখে-দুঃখে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া কতদিন, কত বৎসর অতিক্রম করিয়া আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়াছি।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

তবু যৌবনের উন্মাদনার কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে এক বসন্তের আলোকোজ্জ্বল প্রভাত! ফুলে-ফলে শস্য-শ্যামলা পৃথিবী; বিহগ-কাকলী-মুখর আকাশ-বাতাস; বনবনান্তরে সবুজের সমারোহ; ধৌত আলো-ঝলমল তরুবীথি! সেইদিন নীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে বাতাসে মর্মরিত হইয়া ওঠে আমার পল্লবিত সমস্ত শাখা। বিপুল বিস্ময়ে সেদিন চাহিয়াছিলাম দূরের নীল আকাশ পানে। আলোক-নির্ঝরি-স্নাত আমার শ্যাম কলেবর যৌবনের লাবণ্যে অনুভব করিয়াছিল ধাত্রী-দেবতার স্নেহ-স্পর্শ! সেই আমার বৃক্ষজীবনের প্রথম জাগরণ।

এই গ্রামের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহদের মুখে শুনিয়াছি যে, চৌধুরী-বংশের এক খ্যাতনামা জমীদার গ্রামের প্রবেশ-পথে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক মেঘমুক্ত প্রভাতে এই তৃণ-গুল্মের রাজ্যে আমার অভিষেক হয়। দিগ্‌বধূরা সেদিন গগনাঙ্গনে রক্ত-রাঙা আলপনা আঁকিয়াছিল; আমার অভ্রভেদী সু-উন্নত ভালে অরুণ-সারথি পরাইয়া দিয়াছিল রাজটীকা। সেদিন প্রকৃতির রাজ্যে কি মাতামাতি, কি আনন্দ উচ্ছলতা! কিন্তু প্রথম যেদিন বীজ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাটির মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করি—সেদিন নিশ্চয় প্রকৃতির এত সমারোহ ছিল না; তৃণ-গুল্মের রাজ্যে আমার অভ্যর্থনার জন্য কেহ প্রস্তুত ছিল না; ভবিষ্যতের এত সম্ভাবনা আমার মধ্যে যে মুক্তি-প্রতিক্ষায় আছে—তাহা স্বয়ং আমিও জানিতাম না! কেহ হয়ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, ছায়া-সুশীতল আমার রাজছত্রতলে একদিন শ্যামশ্রী উঠিবে, জাগিয়া উঠিবে গন্ধনন্দির বাতাস বিহগ-কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া, এই বনরাজ্যের মাঝে আসিবে পূর্ণ জোয়ার!

তবু একদিন সেই অভাবিত স্বপ্ন বাস্তবরূপ গ্রহণ করে—আমার অভ্রভেদী আকৃতি দেখিয়া দেশের চক্ষু বিস্মিত হইয়া ওঠে। কর্মব্যস্ত বিহঙ্গেরা আমার শাখে-শাখে রচনা করে সহস্র নীড়। তারপর বছরের পর বছর ধরিয়া নানা সুখ-দুঃখে জীবনের কত অধ্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে। সকাল-সন্ধ্যায় কত পিক-পাপিয়ার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে আমারই পল্লব-কুঞ্জে। মধ্যাহ্নে ছায়া-শীতল আমার তৃণশয্যায় পথভ্রান্ত পথিক বিশ্রাম-লাভের আশায় আসিয়া ভিড় করিয়াছে; নিদ্রা-জড়িত সুরে মূর্ছিত হইয়াছে রাখালের বাঁশী; নৃত্য-চপল কৃষকশিশুর কত আব্দার সহ্য করিয়াছি। কত ভীম ঝঞ্ঝা আর পঙ্গপালের উপদ্রব চলিয়া গিয়াছে আমার উপর দিয়া; কত কাঠুরিয়ার নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে আমার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে; রাজা-ওমরাহের হাতী আমার ডালপালা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কত সাধু-সন্ন্যাসীর প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে গ্রামবাসীরা ভিড় করিয়াছে। নিশীথে আমার অথিতিশালায় কত দুর্বৃত্ত, সর্প আর হিংস্রশ্বাপদ নির্ভয়ে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, শত্রু-মিত্রের কোন ভেদাভেদ আমার নিকট ছিল না—সকলের কাছে ছিল চিরমুখ আমার অতিথিশালার দ্বার। কত বাহক বরণের বধূসহ আমার পাদমূলে শিবিকা নামাইয়াছে। আজও আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে এই সমস্ত কথা স্তূপীকৃত হইয়া আছে।

সেবারত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা

তারপর যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে নানা বিবর্তনের মাঝে, রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে পৃথিবীর রূপ। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের ঢেউ লাগিয়াছে। জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে আজ বিজ্ঞানের বিজয়-বৈজয়ন্তী। আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত মানুষও আজ বিজ্ঞান বলে রাতারাতি

মহারণ্য অপসারিত করিয়া বা পর্বতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেশ-দেশান্তরে স্থাপন করিয়াছে—বিলাসের লীলাক্ষেত্র—নগর-নগরী। প্রকৃতিকে মানুষ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বিলাসের নানা উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাহাতে আপনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যে নিয়োজিত করিয়াছে। গ্রাম-সীমান্তের এই বনভূমি আজ মানুষের কবলে পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে। তথাপি এই মৃতকল্প অরণ্যের এক উপেক্ষিত কোণে আমি অতীতের সাক্ষী-স্বরূপ ঊর্ধ্ববাহু ঋষির ন্যায় বসিয়া আছি। আমি অনন্তকাল ধরিয়া কত উত্থান-পতনের বিচিত্র লীলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাসের কত পট-পরিবর্তনই না আমার চোখের সম্মুখে দেখিয়াছি, তাহার হিসাব কে রাখে? জীবের দুঃখ দূর করিবার পন্থা আবিষ্কার করিতে বুদ্ধদেব যে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা আমারই ছায়ায় বসিয়া। যেদিন আলিবর্দীর আদরের দুলাল সিরাজ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, তখন তাহাকে ধরিবার জন্য যাহারা ঘুরিতেছিল তাহারাও আমার ছায়ায় বিশ্রাম করিয়াছিল। কত দস্যুরদল আমারই শাখায় আশ্রয় লইয়া কত অসহায় পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের প্রাণনাশ করিয়াছে। ঐ যে মাঠের শেষে ভাঙ্গা বাড়ী দেখা যাইতেছে, ওখানে থাকিত নীলকুঠির সাহেবরা; তাহারা দেশের লোকদের ধরিয়া নিয়া কত অকথ্য অত্যাচারই না করিত। আজ আর তার কিছুই নেই। আমার পাশে ঐ যে শ্মশান দেখিতেছ, ওখানে যে মর্মবিদারী দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা আর তোমাদের কি বলিব! জমিদারের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাহার সদ্যোবিধবা কিশোরী বধূ স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। এমনি কত ঘটনা আমি দেখিয়াছি। আজও আমি সাক্ষী দেবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আরও কত কি দেখিবার জন্য থাকিব তাহাই বা কে জানে?

অতীতের সাক্ষী

আমার জীবনের ইতিহাস ও আমার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবে আমার সুদীর্ঘ জীবনে একটি পরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি—সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নয়। মানুষ আজ প্রকৃতির আবেষ্টনীর বাহিরে বহুদূরে অনাত্মীয়দের মধ্যে সরিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির নিবিড় সম্বন্ধ মানুষ আর তেমন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই মানুষেরা বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ধাতব-সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ গড়িয়া তুলিতেছে—কল-কারখানা এবং আরও কত কি। এই সব দেখিয়া আমি বুঝিতেছি আমার মৃত্যুও সন্নিকট। জন্মিলেই মরিতে হইবে। সুতরাং আমাকেও এ পৃথিবীর বুক হইতে বিদায় নিতে হইবে ইহাতে দুঃখের কি আছে? মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আসিয়াও নিজেকে ধন্য মনে করি। কারণ, জগতে আসিয়া জীবকুলকে ক্ষণিকের জন্যও শান্তি দিতে পারিয়াছি। ইহাই আমার বৃক্ষজীবনের চরম সার্থকতা।

উপসংহার

রাজপথের আত্মকথা

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত অজগর-সর্পের ন্যায় অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া দেশ দেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড় শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্যের সহিত ধূলায় লুটাইয়া শাপান্ত কালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটি মাত্র কচি ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি! কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলই অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ; কেবলই পদশব্দ, আমার এই গভীর জড় নিদ্রায় লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশ আবর্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে মুহূর্তমধ্যে এক-একটি করিয়া লতা অংকুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই, অর্থ নাই; তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই; তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন, থামিই বা কেন; তাহার প্রতি পদক্ষেপে আমার শুষ্ক ধূলি যেন আরো শুখাইয়া যায়। পৃথিবীর কোনও কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি, কত গান, কত কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্য যখন কান পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই।

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয় ত কোথাও আছে, কিন্তু আমি ত দেখিতে পাইনা। একটি চরণচিহ্ন ত আমি বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রান্ত চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। যাহাদের গৃহ সুদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়। আমি যে পরম ধৈর্য সহকারে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই? গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখ-সম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল

শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। বালক বালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্বাদ, মাতার স্নেহ, গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধূলিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকৃত করে ও তাহাদের ছোট ছোট হাতগুলি দিয়া সেই স্তূপকে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়! বিমল হৃদয় লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোট ছোট কোমল পা-গুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসুমের দলের মতো কোমল হইতে সাধ যায়। অরুণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপর চলে কেন? কিন্তু তা যদি না চলিত তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না। প্রতিদিন যাহারা আমার উপরে চলে তাহাদিগকে আমি বিশেষ-রূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মূর্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি।

কী প্রখর রৌদ্র! উহু-হুহু। এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছে আর তপ্ত ধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনীদরিদ্র, সুখীদুঃখী, জরাযৌবন, হাসিকান্না, জন্মমৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মতন উড়িয়া চলিয়াছে। পথের হাসিও নাই, কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শত সহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদ-গৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসি-ও না, কান্না-ও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।*

একটি ভাঙ্গা বাড়ির আত্মকথা

(চলিত ভাষায়)

আমি এক ভাঙ্গা বাড়ি। এক বিরাট অট্টালিকার ধ্বসে-পড়া অবশিষ্ট। বার্ধক্যের বলিরেখা আমার আনতদেহের খাঁজে খাঁজে। সৃষ্টি-স্থিত-প্রলয় চক্রের আবর্তে

প্রারম্ভিক ভূমিকা

আমার সুখৈশ্বর্যময় দিনের হয়েছে অবসান। কিন্তু আমার এ অথর্ব শরীরের অবসান নেই। জানিনা, আমার এ হেয় জীবনের যবনিকা-পাত কবে হবে—কবে হবে এই ঘৃণিত জীবন-বন্ধনের মুক্তি। জনমানবহীন সাথীহারা এক দুর্বিসহ জীবনের বোঝা বয়ে চলেছি। শেষ কোথায়? কি আছে এই পথের শেষে?

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতীতের পুরাতন জীর্ণ পাতার অন্তরালে আমার পূর্ব জীবনের ইতিহাসের পরিচয় মেলে। ভাল লাগে মানসপটে বিগত দিনের সমৃদ্ধচিত্র মেলে ধরতে। এই আমার সুখ-দুঃখের সান্ত্বনা। আমি ছিলাম এক ধনীর প্রাসাদ। বিলাসিতার সঙ্গে আমি তাই আজন্ম পরিচিত। আমার সৃষ্টিকালে অট্টালিকাকুলে আমি যাতে মর্যাদাসম্পন্ন হই সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। তাই কারুকার্যের চারুদর্শনের অভাব ছিল না। স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে আমার জীবনধারা উৎসারিত এবং প্রবাহিত ছিল। নিজের দিকে চেয়ে আমার নিজেরই ঈর্ষা হত। অন্যান্যদের সহিত তুলনা ক'রে গর্ব অনুভব করতাম। সেই গর্বের আগুনেই বোধকরি আমার সুখ-শান্তিঘেরা আনন্দের দিনগুলি দগ্ধ হয়েছে।

সমৃদ্ধ আমার ছিল। তার চিহ্ন আজও আমার ধ্বসে-পড়া ইষ্টকস্তূপে, দেখা যায় ভগ্নস্তূপে ফাঁকে ফাঁকে তোরণঘরের পার্শ্বস্থ সেই মূর্তিগুলির ভগ্নাংশ, কোথাও কার্নিশের এক সূক্ষ্ম কাজকরা অংশ, কোথাও বা শ্বেতপাথরের মেঝের এক ফালি। প্রতিটি জিনিসই যে অতি আদরের ছিল তাতে সন্দেহ নাই। আর আজ কোন মানুষের পদধূলিই এখানে পড়ে না। কিন্তু তবু যেন আমার কানে বাজে বহু-দূর হতে ভেসে আসা জন-কোলাহল। অলিন্দে অলিন্দে, সংলগ্ন পুষ্করিণীর সোপানশ্রেণীতে আজও যেন নূপুর নিক্কণ বাজতে থাকে। সংগীতের মূর্ছনা শোনা যায়। অন্দরমহলের দিকে চেয়ে আজও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই জমিদার পত্নীদের। আমার দিবা-স্বপ্নের রঙিন মুহূর্তগুলি মূর্ত হয়ে উঠে। যেন কোন্ এক স্মৃতির অন্তরাল হতে কানে আসে কত কথা, কত হাসি, কত উৎসব-কোলাহল।

অতীত দিনের কথা

ধনাঢ্য জমিদার প্রভু আমাকে অপরূপ সাজে সাজিয়েছিলেন। ধনলক্ষ্মীর কৃপায় বিলাসোপকরণের অভাব ঘটে নাই। আমার বাসভূমি গ্রাম হলেও ভিত্তির দৃঢ়তায়, বহিরঙ্গের চাকচিক্যে আমি যে-কোন পৌরপ্রাসাদের সমতুল্য ছিলাম বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভোরের প্রথম অরুণালোকে যখন আমার সুদৃশ্য ত্রিতলশীর্ষে আলো-আধারির খেলা চলত, আবার যখন অস্তায়মান সূর্যের রঙিন আলোকে সেখানে বিকীর্ণ হত গোধূলির রহস্যময় স্বপ্নালোক, তখন মনে হত আমার মত ভাগ্যবান আর নাই, ধন্যবাদ দিতাম অদৃষ্টলিপিকে।

কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"। তাই আমার সুখের দিন শেষ হয়ে দুঃখানিশা ঘনিয়ে এল। সেই দিবাবসানের কারণ হল মড়কের আবির্ভাব। মৃত্যুর ছায়া গ্রামের বুকে নেমে এল। আমার প্রভু জমিদার গ্রামরক্ষার চেষ্টা করলেন আপ্রাণ। কিন্তু অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকদের অজ্ঞতা তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করল। তিনি মহামারীর হাত হতে গ্রামের লোকদের বাঁচাবার জন্য বহু বাধানিষেধ আরোপ করলেন। কিন্তু তারা ভুল বুঝল। মৃত্যুর অমোঘ বিধানকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। নিরুপায় জমিদারবাবুও আমায় পরিত্যাগ করে শহরবাসী হলেন।

দুঃখের আরম্ভ

গ্রামের ধনজন-সমৃদ্ধির মধ্যে আমার যে জীবন তার হল সমাপ্তি। গত-সুখ, হৃত-সৌন্দর্য হয়ে রইলাম আমি। বহুদিন ধরে গ্রামের পরিত্যক্ত মাটির ঘরগুলি ভেঙে পড়তে লাগল। জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে উঠল গ্রামের পথ, নিকানো উঠোন, পুকুর-ঘাট। জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করবার জন্য আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু প্রবহমানকাল কাহাকেও অব্যাহতি দেয় না। তাই আমার সুদৃঢ় ভিত্তি, অঙ্গের জৌলুস যাহার গর্বে আমি গর্বিত ছিলাম তাও কালের নিষ্পেষণে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। আজও পূর্বের মত সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, মধুময় চন্দ্র স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করে পৃথিবীর বুকে। আজও ঋতুচক্র ঘুরে চলে চিরাচরিতভাবে। কিন্তু আমি আর সেই আমি নাই। আমার সৃষ্টির পর স্থিতির কালও বোধহয় নিঃশেষপ্রায়—সম্মুখে প্রলয়ের মহালগ্নের সংকেত। প্রলয়েই আমার জীবননাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাই অপেক্ষায় আছি।

উপসংহার

জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানব যে স্থানে মাতৃজঠরমুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, প্রথম নিঃশ্বাসেই যে স্থানের বায়ু গ্রহণ করে এবং যে স্থানের জল বায়ু, উত্তাপ, আলোক ও খাদ্যে তাহার প্রথম-জীবন রক্ষিত ও সুখে অতিবাহিত হয়, উহাই তাহার জন্মভূমি। এই ভূমি মাতার ন্যায় স্ববক্ষোজাত খাদ্যাদি দান করিয়া পরিপুষ্টি করেন বলিয়া ইহার অন্য নাম—মাতৃভূমি।

বিদ্যাশক্তি অর্থোপার্জন বা বাণিজ্যাদি উপলক্ষে মানুষকে অনেক সময় স্থানান্তরে বা দেশান্তরে গমন করিতে বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু তাঁহার প্রাণ সর্বদাই স্বদেশ গমনোন্মুখ থাকে; কখনই তাঁহার মন হইতে সেই স্থানের শোভা ও সুখসমৃদ্ধির বিষয় অন্তর্হিত হইতে পারে না; কি এক অপূর্ব অপার্থিব মায়া তাঁহাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া রাখে। স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশের প্রাকৃতিক শোভাসমৃদ্ধি শতগুণে অধিক হইলেও তাহা তাঁহার নিকট অধিকতর সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। বিদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সমধিক সুবিধা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যরক্ষাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, রাজ্যশাসনের সুপ্রণালী প্রভৃতি সকলই তাঁহার নিকট নিকৃষ্ট ও অশান্তিপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মনে হয়, যেন তাঁহার স্বদেশে চন্দ্রসূর্য অপর স্থান অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিয়া থাকেন, সেখানকার বৃক্ষলতাদিও যেন সমধিক শোভান্বিত, যেন তথাকার প্রকৃতি ভগবানের সমধিক কৃপাপাত্রী। সে-স্থান অশিক্ষিত ও অসভ্য অধিবাসীতে পূর্ণ হইলেও সুখপ্রদ, শিক্ষাপদ্ধতি ও স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও উৎকৃষ্ট, তথাকার সুখসমৃদ্ধি, শোভা-সৌন্দর্য অপূর্ব, অপার্থিব ও অবর্ণনীয়। কেহ সেই দেশ সম্বন্ধে

আকর্ষণী শক্তি

কোনরূপ নিন্দাসূচক কথার উল্লেখ করিলে তিনি তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। স্বদেশের সুসংবাদ প্রাপ্ত হইলে যেন হস্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হন ; স্বদেশাগত কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভ যেন তাঁহার মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের ন্যায় বোধ হয়। বস্তুতঃ, বিদেশস্থিত ব্যক্তি যেন সর্বপ্রকার সুখে বঞ্চিত হইয়া তথায় মৃতপ্রায় অবস্থান করেন।

প্রমাণ

মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূত' নামক কাব্যে যক্ষের ব্যাকুলতা ও আগ্রহসহকারে স্বদেশীয় শোভাদির বর্ণনা-স্থলে স্বদেশের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও তাহার মাহাত্ম্যই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, যক্ষ স্বদেশ হইতে নিবাসিত হইয়া বিদেশে মৃতের মতো অবস্থান করিতেছিল।

যদি কোন ব্যক্তি কোনরূপে জন্মভূমির স্বার্থহানির চেষ্টা করে তথাকার প্রত্যেক ব্যক্তিই অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হন। কোন প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশীয় শক্র অপরিসীম বিক্রমের সহিত উক্ত দেশ আক্রমণ ও অধিকারের প্রয়াস করিলে অনায়াসে তাঁহার আশা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তথাকার প্রত্যেক সমর্থ পুরুষই স্ত্রী-

অনুরাগ ও তাহার জন্য আত্মত্যাগ

পুত্রাদির মায়া ত্যাগ করিয়া অস্ত্রধারণপূর্বক শত্রুর সম্মুখীন হন এবং অকাতরে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া প্রাণবিসর্জন করেন, তথাপি জীবন থাকিতে স্বীয় মাতৃভূমি শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নন। স্ত্রীলোক-গণও ইহার রক্ষার জন্য সবদাই নানাপ্রকার স্বার্থত্যাগ, পতিপুত্রের মায়াত্যাগ, এমন কি, প্রয়োজন হইলে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। প্রাচীন ইতিহাস ইহার শত শত দৃষ্টান্ত জলন্ত অক্ষর হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

চিতোর, হল্‌দিঘাট প্রভৃতি স্থানে রাজপুতগণ স্বদেশরক্ষার জন্য কিরূপ অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পাতায় আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। রোমদেশবাসীরা যে সময়ে কার্থেজ নগরের উচ্ছেদ সাধন বাসনায় উহা আক্রমণ করে, তখন কার্থেজীয় রমণীরা নিজেদের মাথার চুল দ্বারা যুদ্ধস্থলে ধনুকের ছিলার অভাব পূরণ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য দেহের অলংকার পর্যন্ত মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। সুলতান মাহ্‌মুদ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ভারতবর্ষের

উদাহরণ

রমণীরাও অনঙ্গপালের সাহায্যার্থে গাত্র হইতে নানাবিধ অলংকার খুলিয়া দিয়াছিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ, রাণী কর্মদেবী, চাঁদবিবি প্রভৃতি বীর রমণীরা স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ-স্থলে অবতীর্ণা হইয়া স্বদেশানুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ধাত্রীপান্না স্বদেশের হিতার্থেই নিজের শিশুপুত্রকে ঘাতকহস্তে বিসর্জন দিয়া রাজ-পুত্রকে রক্ষা করিয়া আত্মত্যাগের অসাধারণ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। আধুনিক সভ্যজাতি-গণের মধ্যেও স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের শত শত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

জন্মভূমির সুখশান্তি ভোগ করিয়া মানব এত তৃপ্ত হয় যে, সে আর স্বর্গবাসের অজ্ঞাত

ও অনির্দিষ্ট সুখলাভ কামনায় লোলুপ হইবার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেনা এবং বর্তমান সুখ-শান্তিপ্রদায়িনী, প্রাণরক্ষয়িত্রী, প্রতিপালিকা ও আধারভূতা মাতৃভূমিকেই স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করিয়া কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহারই আরাধনায় ব্যাপৃত থাকে। বস্তুতঃ প্রত্যেক মানব-সন্তানেরই কায়মনোবাক্যে স্বদেশের উন্নতিসাধনপূর্বক উহার মুখ উজ্জ্বল করা ও আন্তরিক ভক্তির সহিত মাতৃভূমির পূজাব্রতে নিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

উপসংহার

যে সহে সে রহে

পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই সংগ্রাম করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। একমাত্র জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিলেই মানুষ বাঁচার মত বাঁচিতে পারে। জীবনে অনেক সময় এমন কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেয় যে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি না থাকিলে, ঐরূপ অবস্থার প্রতিবন্ধক যাহারা সৃষ্টি করে তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা না থাকিলে মানুষকে অবশ্যম্ভাবী পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। আমাদের একটি কথা সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, এই পৃথিবীতে বাঁচিবার অর্থ কোনরকমে খাইয়া পরিয়া টিঁকিয়া থাকা নয়—জীবনকে সুন্দর সার্থক করিয়া বাঁচিয়া থাকা। যে মানুষ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, তিনি মানবসমাজে পরম শ্রদ্ধা এবং সম্মান পাইয়াছেন।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে সহন শক্তির প্রয়োজন আছে। এই শক্তি না থাকিলে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। এই শক্তি শুধু দেহের শক্তিই নয়—ইহাতে মানসিক শক্তির থাকাও প্রয়োজন। মানুষ যতই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ততই তাহার জীবনে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। এইরূপ সংগ্রাম করিয়া বাঁচিবার মধ্যে আনন্দ আছে। যে এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পশ্চাদ্পদ হয়, যে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে ভয় পায়—তাহার জীবনের কোন মূল্যই থাকে না। বরং সে দুর্বিসহ দুঃখময় জীবন লইয়া প্রতিদিন বিব্রত ও সশঙ্কিত অবস্থায় থাকে। যে মানুষ দুঃখে অসহিষ্ণু হইয়া ওঠে—তাহার জীবনে দুঃখের আর অন্ত থাকে না। জীবনে কারও বা বিরাট আশা ছিল—হয় ত তাহা সার্থক হইল না—তখন কেহ কেহ এই ব্যর্থতাজনিত যে দুঃখ ভোগ করেন—যেরূপ ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন তাহাতেও তাহাদের পরাভূত মনোভাবটি সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। আবার অনেকে জীবনের সাধারণ ছোটখাটো দ্বন্দ্ব সংঘাতেও মুষড়াইয়া পড়েন।

সহনশীলতা

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানারকম নিন্দা-গ্লানি সহ্য করিতে হয়—অনেকে অপ্রত্যাশিত দুঃখ জীবনকে আচ্ছন্ন করে। সেই দুঃখদ্বন্দ্বকে সহ্য করিতে পারিলে

জীবনের যাত্রাপথের অনেকখানি বাধা অতিক্রম করা যায়। এই ছোটোখাটো সংঘাতে ভাঙিয়া পড়িলে জীবনের চলার পথ বিক্ষোভময় ও দুর্বিসহ হইয়া পড়ে। অবশ্য ইহাও

জীবন-সংগ্রামে পরাজয়

সত্য যে, সকল রকম দুর্যোগ দুর্বিপাক মুখ বুজিয়া সহ্য করাও যায় না। জীবনের যে দুঃখ, যে নিন্দা-গ্লানি অন্যায়ের পথ ধরিয়া আসে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রতিহত করা দরকার। অন্যায়কে মুখ বুজিয়া সহ্য করিবার মত পাপ আর নাই। তাই কবির ভাষায় বলিতে হয়ঃ

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।'

দারিদ্র্যের দুঃখ—তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য নানা দুর্যোগের মুখোমুখি দাঁড়ান, জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হওয়ার গৌরব আছে, সেখানে যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া যায়।

'যে সহে সে রহে' এই বাণীটি আমাদের সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে এ জীবনে

উপসংহার

যেমন দুঃখ দুর্যোগকে সহ্য করিবার শক্তি থাকা দরকার তেমনই আবার অন্যায়, অত্যাচার এবং অবিচাররূপ দুঃখ দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবারও শক্তি থাকা প্রয়োজন। অন্যায়কে সহ্য করিবার কথা বলা হয় না, তাহাতে শুধু নিজের জড়তা এবং দুর্বলতার পরিচয়ই দেওয়া হয়।

সবারে করি আহ্বান

সেই অস্পষ্ট অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত মানবসভ্যতার অগ্রগতির মূলে রয়েছে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার এবং অস্পষ্টকে স্পষ্টতর করে তুলবার মত স্বতোৎ-স্ফুরিত আকাঙ্ক্ষা এবং অনুরাগ। আর এই গুরুদায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে অগ্রগামী

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানুষের উপরে। জড় অদৃষ্টের অমোঘ বিধানকে চরম ভেবে পদে পদে প্রতিহত হয়ে যে মানুষ পশ্চাদ্‌গামী হয়ে রয়েছে, তার পক্ষে মহামানবের মিলন যজ্ঞভূমিকে দাঁড়িয়ে একথা কোন ক্রমেই উচ্চারণ করা সম্ভবপর নয়, 'সবারে করি আহ্বানে'।

সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও বিবেক-বুদ্ধিহীনতা মানব-সভ্যতার অগ্রগতির অফুরন্ত স্বীকৃতিকে মুছে দিয়ে ক্ষুদ্রতাকে আশ্রয় করাতে বাধ্য করেছে। অবশ্য এগুলি মানসিক বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে উদার সমুন্নত ভাবাদর্শকে বরণ করে নিয়ে শূন্যের সম্ভাবনাকে পূর্ণকে দিয়ে ভরিয়ে তোলা এমন কিছুই কষ্টসাধ্য নয়। ইতিহাসের স্বীকৃতি নিয়ে একথা বলা যায়, যে জাতি পরাক্রমকে চরম ভেবে অসির ঝনঝনানির আশ্রয়ে আপন বীর্যবত্তা মেটাতে চেষ্টা করেছে, বিচ্ছেদের পথে এসেছে

এগিয়ে—তার পক্ষে জাতি হিসাবে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। গ্রীসের স্পার্টা, রোমান সাম্রাজ্য হতে শুরু করে আজকের ব্রিটেনের ইংরেজদের পর্যন্ত এ বক্তব্যের ব্যবহারিক সমর্থক জাতি হিসাবে উল্লেখ করলে অত্যুক্তিকর কিছু বলা হবে না। এমন কি, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিষ্টটলের জন্মভূমি এথেন্সের উন্নত সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল পতনের মূলেও রয়েছে ঐ একই ক্ষমতালিপ্সা এবং উগ্র সাম্রাজ্য ক্ষুধা। অন্যদিকে ভারতের ইতিহাস হল মিলনের ইতিহাস। বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করবার ইতিহাস। 'সবারে করি আহ্বানের' ইতিহাস। তাই বোধ হয় মহামানবের মিলনতীর্থে শক, হুণদল, পাঠান, মোগল এক দেহে লীন হয়ে গেছে। যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদীর দল জয়োদ্ধত যোদ্ধার বেশে এসেছে ভারতবর্ষকে লুঠতরাজ করতে কিন্তু বাধ্য হয়েছে ভারতবর্ষের প্রেম, মৈত্রী ও অহিংসার সুমহান আদর্শের কাছে নতি স্বীকার করতে।

ইতিহাসের বিচারে ইহার সমর্থন

আর্য ঋষিরা বলেছেন, 'মানুষ অমৃতের পুত্র'। এই স্বীকৃতির পশ্চাতে রয়েছে সমগ্র মানবজাতির সাথে অপরিসীম অভিন্নতাবোধ। তাই সেই অস্পষ্ট অতীত হতে একটি সার্বিক দৃষ্টিকোণের আশ্রয় গ্রহণ করে ভারতের অধিবাসীরা নিগূঢ় ঐক্যের সম্পর্ক উপলব্ধি করেছে। সেই উপলব্ধির ফলশ্রুতি ভারতীয় সাধকগণের ধ্যান-ধারণার মধ্যে সার্থকরূপ লাভ করেছে। ভারতের সাধক চেয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাথে মিলনডোর বাঁধতে। ভারতের কবি গেয়েছেন মহামানবের মিলনগীতি। আর তার জন্যেই অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবে ভারতের কবির লেখনীতে ধ্বনিত হয়েছে চিরন্তন আহ্বানের সুর 'সবারে করি আহ্বান'। কিন্তু আহ্বানই ত সব নয়। আহ্বানকে জয়যুক্ত করতে হলে চাই আন্তরিক অনুরাগ, সুগভীর আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপিত উদার ভাবাদর্শ। সেই উদার অনুভবে বলীয়ান হয়ে ওঠে অগ্রগামী পথিক 'দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু'র দুরধিগম্য পথকে শতধাবিচ্ছিন্ন করে এগিয়ে চলতে সক্ষম হতে পারে। এবং এই সক্ষমতা অর্জনের জন্য চাই একলা চলার প্রস্তুতি এবং অনুরাগ। আর তার জন্যেই আমাদের পূর্বপুরুষ আর্য ঋষিগণ মানবসাধারণকে উপদেশ দিয়েছেন এগিয়ে চলতে। কিন্তু আত্মসার্থসিদ্ধির উগ্র উদ্দেশ্য সাধনের অবিরত চেষ্টার পশ্চাতে সার্থকতার আলো লুকিয়ে নেই। জাতি-ধর্ম, আচার-ব্যবহারের আপাত বৈষম্যের অবান্তর প্রশ্নকে বাদ দিয়ে সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখবার মত উদার সমুন্নত ভাবাদর্শ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। শুধু অগ্রবর্তী নয় পশ্চাদ্‌প্রসারীদেরও এতে দিতে হবে সমানাধিকার

ভারতের সাধনা ও স্বার্থরক্ষার কুফল

রবীন্দ্র সাহিত্যে আমরা শুনেছি এই উদার আহ্বানের নিত্য নতুন সুর। এই সুরের অনুরণন ছিল রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানে-প্রেমে ও অনুভবে। আর তার জন্যেই রবীন্দ্রবাণী, 'সবারে করি আহ্বান' কথাটির তাৎপর্য নতুন করে ব্যাখ্যা করবার দিন সমাগতপ্রায়।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সার্থকতা খোঁজ করতে হলে রবীন্দ্রবাণীর উপযোগিতার মধ্যেই তা পাওয়া যাবে। কারণ, মানুষ মরে যায়, পড়ে থাকে শুধু তার স্মৃতি, আদর্শ এবং স্বপ্ন। তাঁর আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ সম্পূর্ণতাই পাঠক সাধারণের অনুসন্ধিৎসা এবং কর্তব্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে। দেশ-কাল ও সমাজবিচ্ছিন্ন কোন কবি প্রতিভাই স্বয়ম্ভু নয়। এ কারণেই রবীন্দ্র-বাণীর বাস্তব রূপায়ণ পাঠক সাধারণেরই করে তোলা উচিত। সে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই রবীন্দ্রবন্দনা সার্থকতর হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্র চিন্তায় ইহার স্বীকৃতি ও উপসংহার

বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি

(আশীর্বাদ না অভিশাপ)

সভ্যতার সূতিকাগার হইতেই বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গী। কোথায় সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ, আর কোথায় এই বিংশ-শতকের শেষার্ধ—ভাবিলেও বিস্ময় বোধ হয়। জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে আজ মানুষের বিজয় বৈজয়ন্তী। ক্ষুদ্র মানুষের বড়োর ভূমিকায় এই অভিনয়ের পশ্চাতে রহিয়াছে সতত ক্রিয়াশীল বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর অদৃশ্য হস্ত। এখন আমরা যে যুগে বাস করিতেছি, তাহাকে বলা যাইতে পারে 'বিজ্ঞানের যুগ'। জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিজ্ঞান-লক্ষ্মী প্রবেশ করে নাই; কিন্তু মাত্রকয়েকটি বৎসরের মধ্যে যে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়া গেল, তাহাতে বিজ্ঞানের রুদ্র রূপটি অতি মাত্রায় প্রকট হইয়া পড়িল। ভীতত্রস্ত মানুষের দল শঙ্কাভরে প্রশ্ন তুলিলেন বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি—আশীর্বাদ না অভিশাপ। শুধু সাধারণ মানুষই নয়—বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণও আজ দিশাহারা।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

পাথরে-পাথরে, কাঠে-কাঠে ঘষিয়া মানুষ যেদিন আগুন জ্বালিতে শিখিল, সভ্যতার ইতিহাসে সেই দিনই বিজ্ঞানের সূচনা। কল্পনাতীত এই বিরাট বিশ্ব-রহস্যের লীলা নিকেতন আর কৌতূহল মানুষের সহজাত সংস্কার—তাই ভয়ে অরণ্যাচারী প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যেমন একদিকে দেখিয়াছে বিশ্ব-কারখানায় নিয়ত ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়া জড় শক্তির রূপান্তর, অন্যদিকে তেমনি খুঁজিয়া ফিরিয়াছে—কি করিয়া এই বিশাল বিশ্বরহস্যের জটিল-গ্রন্থি উন্মোচন করা যায়। প্রকৃতির ঘটনাবলীর মধ্যে ক্রিয়াশীল কোন শৃঙ্খলা সূত্রের আবিষ্ক্রিয়া কি সম্ভব নয়? প্রকৃতির লৌহ-যবনিকা ক্রমশ অপসৃত হইল, আপাত 'ছন্নছাড়া' বিশ্বে ছন্দের ছায়া পাওয়া গেল। জন্ম নিল বিজ্ঞান। প্রকৃতির সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান আর আপাত বিচ্ছিন্ন অগণিত ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র, একটি সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার—এই হইল ইহার লক্ষ্য। মৃত্যু নয়, অমৃত সম্পদের বিনাশ নয়, অজানাকে জানা, জড়কে নিঙড়াইয়া তাহার মর্মকথাটি উদ্ধার করিয়া লওয়াই এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

সভ্যতা ও বিজ্ঞান

জয়লাভ করিয়াই তাই বিজ্ঞান আপনার কল্যাণ হস্তটি চারিদিকে প্রসারিত করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে হইল—সভ্যতার সোপানে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। যে মানুষ একদা অসহায় অবস্থায় আরণ্যক জীবনযাপন করিত, গিরিগুহায় আর বৃক্ষের কোটরে বন্যপশুর সহিত একত্রে বাস করিত, বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা সে আজ ঐশী শক্তির অধিকারী। যাযাবর মানুষ আজ সামাজিক জীব। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের গতি ছিল ধীর ও মন্থর। জেম্‌স ওয়াট্ বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভাবন করিয়া বিজ্ঞান জগতে সভ্যতার যুগান্তর আনিলেন।

বিজ্ঞানের আশীর্বাদ

দানবীয় শক্তিসম্পন্ন রেল ইঞ্জিন লক্ষ লক্ষ টন পণ্যসম্ভার ও সহস্র সহস্র যাত্রী লইয়া ভূপৃষ্ঠ-কম্পিত করিয়া লৌহবর্ত্মে ছুটিয়া চলিল; ইহার সহিত সার্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মনিয়োগ করিল পেট্রোলচালিত মোটরগাড়ী। তরঙ্গক্ষুব্ধ প্রলয়ঙ্কর মহাদানবের মূর্তিতে আর মানুষ ভীতত্রস্ত নয়—সগর্বে ধূম্ররাশি উদ্‌গীরণ করিতে করিতে অর্ণবযান মহাসমুদ্রের কল্লোলধ্বনিকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া তাহার বক্ষোপরি বিচরণ করিতেছে; গর্বিত হিমাচল শীর্ষও আজ আর মানুষের যাত্রাপথে বাধা দিতে পারে না, ডানা মেলিয়া তাহার ঊর্ধ্বে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, বছরের পথ ঘণ্টায়, দিনের পথ মিনিটে আজ অতিক্রান্ত হইতেছে। আকাশের বিদ্যুৎ আজ মানুষের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। তাহাকে দিয়া সে ঘরে ঘরে আলো জ্বালায়, পাখা ঘোরায়, ট্রাম, ট্রেন, কলকারখানা চালায়, রান্না করে, পরিধেয় বস্ত্র ইস্ত্রি করিয়া লয়, টেলিফোনে সংবাদ আদান প্রদান করে; বিদ্যুৎ-চালিত মুদ্রাযন্ত্র ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ সংবাদপত্র ছাপাইয়া প্রত্যেক গৃহে জ্ঞান বিতরণ করিতেছে। রেডিওর কল্যাণে দেশ-দেশান্তরের ব্যবধান আজ তুচ্ছ, দূর হইয়াছে নিকট, সারা বিশ্বের সহিত রেডিও আজ আমাদের মর্মের সম্পর্ক ঘটাইতেছে। আজ ক্যামেরায় সময়কে আমরা বাঁধিয়া ফেলিয়াছি, চলচ্চিত্রে ধরিয়া রাখিতেছি জগতের স্মৃতি; রূপ ও বাণী একত্রে গ্রথিত করিয়াছে টেলিভিশন। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিস্ময়কর জীবাণু-জগৎ, যন্ত্রের দ্বারা নক্ষত্রজগৎ ও বিশ্বরূপও আমাদের গোচর হইতেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'রক্তদান' একটি বিরাট অধ্যায়। মৃত্যুকে জয় করিতে না পারিলেও বিজ্ঞান আজ মৃত্যু যন্ত্রণাকে পরাহত করিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতির রহস্য মন্থন করিতে গিয়া শুধু অমৃতই ওঠে নাই, সঙ্গে উঠিয়াছে হলাহল। সেই হলাহলের মানব সভ্যতার সর্বাঙ্গ আজ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বিজ্ঞানের দেওয়া মারণাস্ত্রের চাপে নিষ্পেশিত মানুষ আজ তাই আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি মৃত্যু—সভ্যতার পাদপীঠে বিজ্ঞান কি অভিশাপ? জাতিতে জাতিতে আজ মারণাস্ত্র নির্মাণের নির্লজ্জ বীভৎস প্রতিযোগিতা, সমস্ত পৃথিবী আজ হিংসায় উন্মত্ত। আর এই তাণ্ডবনৃত্যের মঞ্চে ইন্ধন যোগাইতেছে আধুনিক বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের অভিশাপ

স্বার্থলোভী হিংস্র মানুষের দল আপন মূঢ়তায় ও লোভে নিজের অধঃপতন নিজেই ডাকিয়া আনিল, আর আত্মদোষস্খালনের উদ্দেশ্যে অপরাধ চাপাইয়া দিল—নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানের স্কন্ধে। সৃজন ও কল্যাণে প্রযুক্ত হইলে যে শক্তি মানব সভ্যতায় নবযুগ আনিতে পারিত, মানুষ নিজের নির্বুদ্ধিতে সেই শক্তিরূপী দৈত্যকে দিয়া নিমেষে নগর-জনপদকে উদরস্থ করাইতেছে। বিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া বৃথা। বিজ্ঞান তো তার কর্তব্য যথাযথরূপেই সম্পাদন করিতেছে। গর্বিত মানুষ, মোহান্ধ হইয়া শেখে নাই কি করিয়া নিজেকে শাসন করিতে হয়। সভ্যতার ধ্বংসকে আজ যদি কেউ ডাকিয়া আনিয়া থাকে তবে সে বিজ্ঞান নয়, ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের অশুভ স্বার্থবুদ্ধি ও লোভ। বিজ্ঞানের অপব্যবহার দেখিয়া যাঁহারা বিজ্ঞানকে দোষী সাব্যস্ত করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি অস্বচ্ছ, বিচারশক্তি পঙ্গু। বস্তুতঃ, "সভ্যতার পাদপীঠে বিজ্ঞান অভিশাপ", "বিজ্ঞান ধ্বংসকে ডাকিয়া আনিতেছে"—এইসব অর্থহীন প্রলাপ নির্বুদ্ধিতারই অভিব্যক্তি। বর্তমানে যে এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ মানুষ পৃথিবীতে ধ্বংসের বহ্নি জ্বালাইতে চাহে, তাহার সুষ্ঠু প্রতিকার করাই স্থিরবুদ্ধি মানুষের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তুলনা ও উপসংহার

যুদ্ধ ও বিজ্ঞান

সভ্যতা সৃষ্টির শুরু হইতে অদ্যাবধি মানবেতিহাসকে নিত্য নূতন খাতে প্রবাহিত করাইবার দুরূহ দায়িত্বভার বিজ্ঞান আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে। বৈজ্ঞানিক অবদানে সুসমৃদ্ধ হইয়া বর্তমান যুগে উহার উপযোগিতা অত্যন্ত দ্রুত বাড়িয়াই চলিয়াছে। বেতার, বিদ্যুৎ, উড়োজাহাজ, ট্রেন, মোটর, বাস এমন কি সদ্যঃ আবিষ্কৃত স্পুটনিকের ব্যবহার প্রণালী পর্যন্ত সব কিছুই স্পর্ধিত বিজ্ঞানের জয়যাত্রার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। কর্ম-উৎসাহ এবং পরিশ্রম লাঘব করিয়া আধুনিক যুগে বিজ্ঞান জীবনযাত্রা প্রণালীকে অধিকতর উন্নতখাতে প্রবাহিত করিবার মত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মনে হয় যেন, তমিস্রাঘন অন্ধকার দূরীভূত করিবার মহান দায়িত্ব লইয়া অগ্রগামী বিজ্ঞান গর্বিতপদভরে আলোকবর্তিকা বহন করিয়া চলিয়াছে। মেদিনী তাহার আলোকে আলোকিত, পদভরে চমকিত এবং অগ্রগতিতে বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিজ্ঞান ভাল কি মন্দ এই প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব। কারণ, বিজ্ঞানের উদ্ভাবক যেমন মানুষ, ঠিক তেমনি উহার ব্যবহারের সার্থকতা ও ব্যর্থতা সম্পূর্ণভাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়ম নিরূপণ কিংবা কোন কিছুর উদ্ভাবন করিবার পূর্বে অনেকের মঙ্গল করিবার শুভ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হন। মানুষ যখন রোগে-শোকে ভোগে তখন নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভের চিন্তাটাই তার প্রবল হয়। বিজ্ঞানীও অপরিসীম পরিশ্রম সহকারে এবং অনুসন্ধিৎসা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জনকল্যাণের

নিমিত্ত অগ্রগামী হন। এখানে উদাহরণস্বরূপ লুই-পাস্তুরের আবিষ্কারের উল্লেখ করা চলে। জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু আবিষ্কার করিয়া তিনি মানবজাতির মহতী কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। রেডিয়ামের আবিষ্কারক কুরী পরিবারও সেই উদ্দেশ্যসাধনে প্রয়াসী ছিলেন। এতদুভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞানীদের কোন কিছু আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবনের পশ্চাতে সৎচিন্তাটাই বড় হইয়া দেখা দেয় এবং উহাই স্বাভাবিক। মানুষ আপন প্রয়োজনে বিজ্ঞানীর শ্রমলব্ধ গবেষণাকে অসদ্ব্যবহার করিয়া চারিদিকে নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস নির্ঝরিত করিয়া তোলে। পরিণতিতে উহাই আমাদের বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে সংশয়াত্মক চিন্তার উদ্রেক করে।

বিজ্ঞানের ব্যবহার প্রণালী

আণবিক অস্ত্র উদ্ভাবনের পূর্বে সাধারণতঃ যে সমস্ত যুদ্ধ হইত উহা নির্দিষ্ট কোন দেশেই সীমাবদ্ধ থাকিত। তখনও এক পক্ষ পরাজিত হইত এবং বহুসৈনিক প্রাণাহুতি দিত। অপর পক্ষ বিজয়ের আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিত। তবুও তৎকালীন যুদ্ধ কখনও সমগ্র মানব সমাজের ধ্বংসাত্মক পরিণতির সূচনা করিত না। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ভাবিত হইবার বেশ কিছুকাল পরে যখন আণবিক অস্ত্র আবিষ্কৃত হইল, তখন হইতেই স্বার্থপর মানব সমাজে এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে জোরালো সংগ্রামের পথে নামিল এবং এই কারণেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল এক জাতির সহিত আর এক জাতির। শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞানে অগ্রসর জাতিগুলি সর্বনাশা ধ্বংসাত্মক অস্ত্রধারণ করিয়া 'যুদ্ধং দেহি' রূপ ধারণ করিল। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি পরোক্ষত আর্থিক স্বাচ্ছল্যের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। এই কারণেই বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনে যথেষ্ট অর্থ খরচ করিয়া রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান শাখার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করা সহজলভ্য হইয়া ওঠে। নাগাসাকি এবং হিরোসীমার উপর পতিত দুইটি আণবিক বোমা প্রয়োগের শোচনীয় দুর্গতি আজও বিশ্ববাসীকে ভোগ করিতে হইতেছে। বিভিন্ন দেশ আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার প্রণালী আয়ত্ত করিবার জন্য বহু তোড়জোড় দেখা গিয়াছে। হাইড্রোজেন বোমা এবং রকেটের আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত হইবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। যদি কোন জাতি জয়ের আনন্দে উল্লসিত হইয়া ওঠে, তবে ঐ আনন্দ সম্পূর্ণ ভোগ করিবার মত জীবিত ব্যক্তির সংখ্যা নিরূপণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে এবং ঐরূপ সর্বনাশা যুদ্ধ হয়ত বা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও বিজ্ঞানের অবদানে সমৃদ্ধ আধুনিক সমাজকে পূর্ব পরিণতি দান করিবে। পাশ্চাত্যের শক্তিশালী দেশগুলি আপন দম্ভভরে সমগ্র মানবজাতির সমূহ ধ্বংসাত্মক পরিণতিকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে। সম্প্রতি বৃদ্ধ দার্শনিক জন রাসেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা-

বিজ্ঞান ও বর্তমান যুদ্ধ

সহিত পরিচিত করিবে। ভারতের এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা আমাদিগকে জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

জাতীয় পতাকার ব্যবহার যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে ইহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হয় না। স্থানে, অস্থানে যথেচ্ছভাবে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। কোন শোভাযাত্রায় জাতীয় পতাকা বহন করিতে হইলে, জাতীয় পতাকা কোন শোভাযাত্রাকারীর দক্ষিণ স্কন্ধে উন্নত রাখিয়া তাহাকে শোভাযাত্রার অগ্রে রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, জাতীয় পতাকাই সর্বাগ্রে থাকিবে। জাতীয় পতাকা বহনকারীকে উপযুক্ত সাম্যভাবের সহিত সেই পতাকা বহন কবিতে হইবে। কোনও প্রকারে যেন পতাকার সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যখন কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতের জাতীয় পতাকার সহিত অন্যান্য দলীয় বা অনুষ্ঠানের প্রতীক

জাতীয় পতাকার ব্যবহার প্রণালী

পতাকাসমূহ উত্তোলিত হইবে, তখন ভারতের জাতীয় পতাকাই সর্বপ্রথম উত্তোলিত হইবে এবং উহা সর্বশেষে নামাইতে হইবে। অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত পতাকা নামাইবার পর এই পতাকা নামাইতে হইবে। পতাকা উত্তোলনকালে এই পতাকাই সর্বোচ্চে থাকিবে। অন্যান্য পতাকাগুলি ইহার নিম্নে এবং বাম পার্শ্বে থাকিবে। সভাস্থলে জাতীয় পতাকা থাকিবে বক্তার পশ্চাতে এবং অন্যান্য সমস্ত সজ্জার ঊর্ধ্বে। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস প্রভৃতি জাতীয় উৎসবে প্রতি গৃহেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা উচিত। স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করিয়া জাতীয় আদর্শের সংকল্প গ্রহণ করা কর্তব্য।

পৌনে দুইশত বৎসর পরাধীনতার পর আজ আমরা স্বাধীনতালাভ করিয়াছি। আজ যখন এই ধর্মচক্রশোভিত পতাকা আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে, তখন

উপসংহার

ভারতের প্রত্যেক নর-নারীর সংকল্প থাকিবে যে জীবন দিয়াও আমাদের জাতীয় পতাকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিব। সনাতন ভারতবর্ষের সুমহান আদর্শ, প্রেম, মৈত্রী ও অহিংসার প্রচার ও প্রসার এই জাতীয় পতাকাকে অগ্রভাগে রাখিয়াই করিতে হইবে।

জীবনচরিত পাঠের আবশ্যকতা

[স্কুল ফাইনাল ১৯৬২]

জীবন থাকলেই জীবনচরিত রচিত হয় না। প্রতিদিন কতশত মানুষের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই মহাপুরুষ হইয়া জন্মান নাই। কিংবা অনমুকরণীয়

প্রারম্ভিক ভূমিকা

এমন কোন আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন নাই যাহার দ্বারা কালের বুকে অক্ষয় অব্যয় হইয়া থাকিতে পারেন। অথচ সব মনুষ্য সন্তানেরই জীবনচরিতের যা শ্রেষ্ঠ, যা মহৎ, যা অন্যান্য সাধারণ উপাদান তাহার সমন্বয়েই প্রতিভাধর

ব্যক্তিদের জীবন গঠিত হয়। অতএব, প্রতিভাধর ব্যক্তিদের জীবনচরিতে সমগ্র মনুষ্য সমাজের জীবন স্পন্দন অনুভব করা বলা যাইতে পারে।

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি, বারংবার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও হতাশায় ক্ষত-বিক্ষত এ মানবজীবন। এই বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করিয়া স্বমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বাসনা সর্বপ্রকার মানুষেরই আছে। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর আত্মবিশ্বাসে ভর করিয়া প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সহজভাবে বরণ করিয়া নিবার মত মনোবল সাধারণ মানুষের থাকে না। তাই প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত হইয়া ব্যথাহত চিত্তে বিড়ম্বিত মনে সাধারণ মানুষ পিছু হটিয়া যায়। প্রতিভাধর ব্যক্তিরা কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাহারা আঘাত-প্রত্যাঘাতে ব্যথিত হন না। ব্যর্থতাকে মনে করে ভবিষ্যতে সাফল্যের অস্ফুট সম্ভাবনা। দুঃখকে মনে করে সুখ-সৌন্দর্যলাভের উপায়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁহারা বিচলিত হন না। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, কঠোর মনোবল, দুর্মদ প্রাণাবেগ ও দুর্দম উৎসাহে তাঁহারা জীবনপথের কণ্টকাকীর্ণতাকে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করে। এখানেই সাধারণ অসাধারণের মূলানুগ পার্থক্য, এখানেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এখানেই জীবনী পাঠের চরম আবশ্যকতা স্বীকৃত। অখণ্ড মানবজীবন বলিতে জীবনের প্রতিকূল—অনুকূল রূপের সংমিশ্রণ বোঝায়। এইরূপই জীবনচরিতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্যাদা পায়। জীবনের পরিপূর্ণ সুষমা উপলব্ধি যাঁহারা করিতে পারিয়াছেন, অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যেও স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন চরিতই পরম সমাদরে ও আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়া থাকে।

জীবন চরিত কি

সাধারণ্যে জীবনচরিত বলিতে অসাধারণ মহাপুরুষের জীবনী পাঠই বুঝায়। এজন্যে জীবনচরিতে অলৌকিকতা, অতি মানবীয়তা আরোপ করিয়া জীবন চরিতকে অতি বেশী অসাধারণত্বের আবরণে মণ্ডিত করা হয়। ছলে, বলে এবং কৌশলে জীবনচরিতে বর্ণিত ব্যক্তিকে অন্য গ্রহান্তরের মানুষ বলিয়া প্রমাণের নিরন্তর চেষ্টা করা হয়। বাস্তবে কিন্তু ইহারা বিরোধী সাক্ষী দেয়। জীবনচরিতে বর্ণিত ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, রাজনীতিবিদ, সমাজ নীতিবিদ প্রভৃতি সব কিছুই হইতে পারেন। এইগুলি আসলে ব্যক্তির গৌণ পরিচয়, আসল পরিচয় হইল তিনি মানুষ। সাধারণ গতানুগতিকভাবে মনুষ্য সমাজে অবস্থান করিয়া একজন ব্যক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইলেন কিরূপে জীবনচরিতের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় তাহাই। তাই জীবনচরিতে বর্ণিতব্যক্তির অলৌকিক জীবন নয়, ইহ জীবনই পরম আগ্রহে পঠিত হয়।

সাধারণ মনুষ্যজীবনে অসাধারণত্বের বর্ণলেপন

'জীবন চরিত' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একেকটি জাতির যাঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ব্যক্তি

তাঁহাদেরই জীবন চরিত রচিত হয়। এইরূপ অসাধারণ ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ পরিচয় যিনি তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করেন, তাহার দায়িত্বও কোন অংশ কম নহে। কোন প্রকার গোঁড়ামি

জীবনচরিত রচয়িতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপর মনোভাবের আলোক প্রতিভাধর ব্যক্তিদের জীবনচরিত রচনা করিলে তাহার উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সেজন্য গভীর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সহকারে জীবনচরিত রচিত হওয়া উচিত। ব্যক্তিজীবনের সহিত মনীষী জীবনের পূর্ণায়ত পবিচয় তুলিয়া ধরিতে হইবে। নতুবা শুধুমাত্র প্রতিভাধর বলিয়া বর্ণালেপন অথবা ব্যক্তিজীবনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করিয়া জীবনচবিত রচনা করিলে তাহা শিথিল ও অসম্পূর্ণ জীবনচরিত হইয়া থাকিবে।

মানুষের ইতিহাসের বিচার শুধু কালের বিচারে হয় না। সারা জাতির আশা-হতাশা, ব্যথা-বেদনা, সুখ সাধ-স্বপ্ন সব কিছুই ইতিহাসে বর্ণিত হয়। একেকজন প্রতিভাধর ব্যক্তির কার্যের মধ্য দিয়া সমগ্র জাতিব আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি মূর্ত হইয়া ওঠে। একটি জাতির সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতি তথা সর্বাঙ্গীন প্রগতির পরিচয় তখনকার সমসাময়িক

জীবনচরিত এক শ্রেণীর ইতিহাস

প্রতিভাধর ব্যক্তিদের আচরণে প্রকাশ পায়। অতএব, ঐতিহাসিক মূল্য বিচারে মহাপুরুষ বা প্রতিভাধর ব্যক্তিদের জীবনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা সত্য সত্যই অনস্বীকার্য। সাময়িকতাকে, তুচ্ছতাকে চিরন্তন ও শাশ্বত কালের সামগ্রী করিয়া তোলে প্রতিভাধরদের কার্যকলাপ। তাই তাঁহারা শুধু নিজ নিজ দেশে নয়, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে চিরকালের জন্য স্মরণীয়, বরণীয় হইয়া থাকেন। কালাতীত দেশাতীত ঐতিহ্য সৃজন করেন প্রতিভাধরেরা। তাই তাঁহাদের জীবনচবিত মানবজাতির বৃহত্তর ইতিহাস।

সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দিক হইতে অসম্পূর্ণ। ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরা গতানুগতিক মনুষ্যজীবন। প্রতিনিয়ত কতশত আশা-আকাঙ্ক্ষায় মানবচিত্ত আলোড়িত হয়। কিন্তু রূঢ়বাস্তবের মুখোমুখি সব স্বপ্নই ধূলিস্যাৎ হয়। পরিণামহীন অবিমৃষ্যকারিতা

জীবনচরিত একশ্রেণীর আত্মসমালোচনা গ্রন্থ

সাধারণ মনুষ্যজীবনে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ ও রিক্ত হইবার মূল কারণ। এই ত্রুটি, এই ব্যর্থতা, এই রিক্ততা—সংশোধনের পথনির্দেশ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের জীবনচরিতে দেওয়া আছে। কঠোর অধ্যবসায় ও গভীর অনুরাগের সহিত পাঠ না করিলে উহার পূর্ণতর আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং, জীবনের অসম্পূর্ণতা, ব্যর্থতা ও রিক্ততাকে দূর করিবার প্রয়োজনে প্রতিভাধরদের জীবনচরিত পাঠ আবশ্যক। জীবনচরিত তাই এক শ্রেণীর ব্যাপক জীবন সমালোচনা। এই জীবন সমালোচনা পাঠের দ্বারা পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি, মমতা ও প্রীতিবোধের উন্মেষ ঘটে।

সব মানুষের জীবনচরিত রচিত হয় না। প্রধানত অসাধারণদেরই জীবনচরিত রচিত হয় এবং ইহাদের কার্যকলাপই অবিনশ্বর অমরতা আনিয়া দেয়। সুতরাং ইহাদের আচরিত আদর্শ আমাদের নিকট চির অনুকরণযোগ্য। কিন্তু মহান প্রতিভাধর ব্যক্তিদের জীবনকে অসম্ভব কিছু ভাবিলে বাড়াবাড়ি হইবে। কারণ, প্রতিভাধর ব্যক্তিদের ভৌম চেতনা ও মর্ত্যঘনিষ্ঠজীবন সম্প্রীতিবোধই আমাদের অতি কাছে তাঁহাদের আনিয়া দেয়। তাই মহাকবি সেক্সপীয়র যথার্থই বলিয়াছেন: "But be not afraid of greatness : some are born great, some achieve greatness and some have great thrust upon' em" (Twelfth Night)

উপসংহার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[কলিকাতা বি. প্র. ১৯৪২]

আত্মবিস্মৃত বাঙালী যখন কলুষপঙ্কে নিমগ্ন, সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কুসুম-কোমল হৃদয় ও অনমনীয় চরিত্রের গুণে তিনি পথভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খল বাঙালী সমাজকে সংযত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বীরসিংহের সিংহশিশু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র নাম বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধবনিতার নিকট সুপরিচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নবীন বঙ্গের শিক্ষাগুরু বলিলেও ভুল হয় না। বর্তমান যুগে এমন শিক্ষিত বঙ্গবাসী খুব কমই আছেন, যিনি তাঁহার প্রণীত 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' হইতে বিদ্যারম্ভ করেন নাই। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তিনি সামান্য বেতনে একটি চাকুরী করিতেন।

জন্ম-পরিচয়

পাঁচ বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। আট বৎসর বয়সে উচ্চ বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য তিনি পিতার সহিত কলিকাতা আগমন করেন। তখন এদেশে কোন রেলপথ ছিল না। সেইজন্য নিজের গ্রাম হইতেই কলিকাতা পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে পায়ে হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছিল। আসিবার সময় পথ চলিতে চলিতে রাস্তার দুই ধারে মাইল ষ্টোনের নম্বর দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পিতার নিকট হইতে জানিয়া মুখে মুখে ইংরাজী সংখ্যাগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তাঁহাকে দুইবেলা রন্ধন, বাসন মাজা, বাজার করা প্রভৃতি যাবতীয় গৃহস্থলীর কাজ নিজেকেই করিতে হইত। রাত্রিকালে রন্ধন

বাল্যশিক্ষা

করিবার অবসরে তিনি পাঠভ্যাস করিতেন। অর্থাভাবে অনেক সময় তৈল ক্রয় করিতে না পারায় তাঁহাকে রাত্রিকালে রাস্তায় গ্যাসের আলোতে দাঁড়াইয়া পড়া তৈয়ারী করিতে হইত। তিনি তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির বলে অতি অল্পকালের মধ্যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষা প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধিলাভ করেন।

কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদলাভ করেন। তখন তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংস্কৃত শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। সেখানে কাজ করিতে করিতে তিনি ইংরেজি, হিন্দী, ওড়িয়া ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে উক্ত কলেজের চাকুরী ত্যাগ করেন। এই সময় স্বরচিত পুস্তকগুলির সাহায্যে তাঁহার জীবিকানির্বাহ হইত। ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় পঁচিশখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও 'বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী', 'শকুন্তলা', সীতার বনবাস' প্রভৃতি সাহিত্য পুস্তক এবং তাঁহার রচিত 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ও 'উপক্রমণিকা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙলাদেশে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার একজন উৎসাহ-দাতা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বালিকা বিধবার দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার এই মতবাদের বিরুদ্ধে তখন দেশে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইলেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ আইন' তিনি গভর্ণমেণ্টের দ্বারা বিধিসম্মত করাইয়া লইলেন। কিন্তু তিনি শুধু আইন করাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি নানাস্থানে বিধবা বিবাহের প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; এমন কি আপনার পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে তিনি এক বাল্য-বিধবার সহিত বিবাহ দিলেন। শিক্ষাবিস্তারের কার্যেও বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রণী ছিলেন। মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাহা ছাড়া, তিনি নিজ গ্রামে একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার সীমা ছিল না। তাঁহার নিকট কোন প্রার্থী বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিত না। তিনি নিরাশ্রয় দরিদ্রদের দুঃখ দূর করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। বিদ্যাসাগরকে সকল লোকই 'দয়ার সাগর' বলিত। তাই তাঁহার উদ্দেশ্যে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন :

"দয়ার সাগর তুমি বিখ্যাত ভুবনে
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে
দীন যে দীনের বন্ধু !"

তিনি সামান্য মোটা ধুতি-চাদর ব্যবহার করিতেন। বিলাসিতা তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার আর একটি গুণ ছিল মাতৃভক্তি। জনক-জননীকে তিনি

প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। মাতার আদেশ ব্যতীত তিনি কোন গুরুতর কার্যই করিতেন না; যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে বাড়ী যাইবার জন্য তাঁহার মাতা তাঁহাকে পত্র লেখেন। বিদ্যাসাগর ছুটি চাহিলেন, কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ছুটি দিতে অস্বীকৃত হইল। ইহাতে তিনি পদত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন্। পরে তাঁহাকে ছুটি দিলে পদব্রজে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বর্ষায় স্ফীত ভীষণ দামোদর নদ, নৌকা অভাবে তিনি সন্তরণ পূর্বক তাহা উত্তীর্ণ হইলেন এবং সিক্ত দেহে গৃহে উপস্থিত হইয়া মাতৃচরণ বন্দনা করিলেন। তিনি সর্বদা ন্যায়পথে চলিতেন ও জীবনে কাহারও নিকট কখনও মস্তক অবনত করেন নাই।

চরিত্র

ঈশ্বরচন্দ্রের শেষজীবন অত্যন্ত অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যাহাদের উপকার করিয়াছিলেন, তাহারা অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত। তাঁহার পুত্র নারায়ণচন্দ্র এতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল যে, তিনি তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করিতে বাধ্য হন। এইরূপ নানা কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। অতঃপর বঙ্গমাতার এই কৃতী সন্তান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই সমস্ত দেশবাসীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন।

মৃত্যু

স্বামী বিবেকানন্দ

[কলিকাতা বি. প্র. ১৯৫২]

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে আমরা যখন সনাতনধর্মকে পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছিলাম, যখন আমাদের বিদেশী শিক্ষার মোহ দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইতেছিল, ঠিক সেই সময় আবির্ভূত হইলেন জগতের আনন্দ স্বামী বিবেকানন্দ। দেশের অবস্থা ছিল তখন অত্যন্ত শোচনীয়। ইংরেজের অত্যাচার পরাধীন ভারতবাসীকে নিপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। সামাজিক কুপ্রথাগুলি জাতির উন্নতির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সমাজের যে উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তাহাও স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। অন্যায় ও অনাচারের দাবদাহে দগ্ধ ভারতে আবির্ভূত হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ বিধাতার আশীর্বাদরূপে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

কলিকাতা নগরীতে সিমলা স্ট্রীটের দত্ত পরিবারের ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবী। বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীরূপে কাজ করিতেন।

জন্ম পরিচয়

নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাই ভুবনেশ্বরী দেবী মাঝে মাঝে বলিতেন যে, তিনি বিশ্বনাথের নিকট সন্তান চাহিয়াছিলেন, তাই শিব তাঁহার কোন অনুচরকে পাঠাইয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। সন্ন্যাসী দেখিলেই তিনি ছুটিয়া যাইতেন। বাল্যকালে ধ্যান করা ছিল নরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় খেলা। প্রায়ই তিনি সঙ্গীদের সহিত বসিয়া ধ্যান করিতেন। সাত বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি হন। বিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়পাত্র। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথ কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। পরে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পড়িবার সংকল্প করেন। ইতিমধ্যে দেখা দিল নরেন্দ্রনাথের জীবনে দুর্দিনের ঘনকৃষ্ণ মেঘ-রাজী, তাঁহার ভাগ্যাকাশ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। এই সময় বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় লোকান্তরিত হন। ফলে পারিবারিক অশান্তি ও দারিদ্র্যের জ্বালা নরেন্দ্রনাথের জীবনে বিষাদময় অধ্যায়ের সূচনা করিল।

বাল্যকাল ও শিক্ষালাভ

এই সময় তাঁহার এক বন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে ঠাকুরের অনুরোধে তিনি কয়েকটি গান গাহিলেন। নরেন্দ্রনাথের অবেগপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ঠাকুরের ভাব-সমাধি হইল। ইহার পর হইতে প্রায়ই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ভগবানকে দেখিয়াছেন কি-না। ঠাকুর বলিলেন যে তিনি নরেন্দ্রনাথকে যেরূপ দেখিতেছেন, ভগবানকেও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছেন। ঠাকুরের কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা যেন জুড়াইয়া গেল। ইহার পর নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই ঠাকুরের নিকট যাইতেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর দীক্ষা দিলেন। তাঁহার শ্রীচরণের তলে উপবেশন করিয়া নরেন্দ্রনাথ লাভ করিলেন ব্রহ্মজ্ঞান। নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আকর্ষণও ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাই তিনি নরেন্দ্রনাথের অদর্শন সহ্য করিতে পারিতেন না। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেবের সহিত পরিচয়

এই সময়ে তাঁহাদের অত্যন্ত অভাবের মধ্যে দিন কাটাইতে হইতেছিল। ফলে নরেন্দ্রনাথকে গৃহে সামান্য আহার গ্রহণ করিয়া তাঁহার আহার্যে অপরের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেন। কখনও বা তাঁহাকে অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকিতে হইত। সকলেই তাঁহাকে উপদেশ দিল, তাঁহার দারিদ্র্যের কথা ঠাকুরকে জানাইতে। অবশেষে একদিন তিনি ঠাকুরকে অর্থাভাবের কথা জানাইলেন। ঠাকুর হাসি-মুখে বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা কি? তুই মায়ের কাছে চেয়ে নিবি।"

কর্মজীবন

ঠাকুরের কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে কি বলিতেছেন? পাথরের দেবীমূর্তি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন কিরূপে? ঠাকুর তাঁহার মনের কথা বুঝিয়া বলিলেন, "একবার গিয়েই দেখ না।"

ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিতেন যে তিনি জগতে মায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সাধারণ জীবনযাপন করিলে চলিবে না। ইহার কিছুদিন বাদে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পরমহংসদেব দেহরক্ষা করেন। ইহার পর বৎসরই নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজকরূপে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া তিনি ভারতবাসীদের প্রকৃত অবস্থার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, ঠাকুরের বাণী জগতে প্রচার করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় হইতেই তিনি নবযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দরূপে পরিচিত হন। তিনি বলিয়াছেন :

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে সেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে জগতের সকল ধর্মের এক মহাসম্মেলন হইতেছিল; নরেন্দ্রনাথ এই ধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন। এখানে আসিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে উপযুক্ত পরিচয়-পত্র না থাকিলে এই ধর্মসম্মেলনে যোগদান করিতে পারা যাইবে না। তাহা ছাড়া এই সময়ে চিকাগো শহরে থাকাও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এদিকে তাঁহার অর্থও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন অনেকের পরামর্শে তিনি ধর্ম সম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত বোষ্টন শহরে বাস করাই স্থির করিলেন। বোষ্টন যাত্রাকালে গাড়ীতে এক প্রৌঢ় মহিলার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। স্বামীজী বেদান্ত প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া তিনি তাঁহার গৃহেই স্বামীজীকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বলিলেন। এই সময়ে চিকাগো শহরে ধর্ম মহা-সম্মেলন সুরু হইয়াছে। যাঁহারা এই সম্মেলনে বক্তৃতা করিবেন তাঁহারা সকলেই প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজী প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করা হইলে তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমার আমেরিকা-বাসী ভাই ও ভগিনীবৃন্দ" তাঁহার এই প্রথম সম্বোধনেই উপস্থিত জনমণ্ডলী আনন্দে এরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে, প্রায় দুই মিনিটকাল স্বামীজী চুপ করিয়া রহিলেন। হাত-তালি থামিলে স্বামীজী আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এক সন্ন্যাসীর অগ্নিগর্ভবাণীর মধ্যে পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদী সমাজ সত্যের সন্ধান জানিতে পারিল।

পাশ্চাত্ত্যদেশে হিন্দুধর্মপ্রচার

তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমেরিকাবাসিগণ দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী বিলাতে গিয়া সেখানেও ধর্ম প্রচার করেন। সেখানেও শত শত মনীষীর হৃদয় জয় করিয়া বিজয়গৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সত্যই বলিয়াছেন: 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়।' মার্গারেট নোবল তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেন। পরবর্তীকালে তাঁহার নাম হইল 'ভগিনী নিবেদিতা'।

বিবেকানন্দ সমাজসংস্কারক ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। আজও আমরা তাঁহার দেশপ্রেমের বাণী শুনিতে পাই—"হে ভারত ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

সমাজ সংস্কারমূলক কার্য

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহার আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী বেলুড়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার আমেরিকায় যাত্রা করেন। সেখান হইতে ইউরোপের নানা দেশ ঘুরিয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই মহান আদর্শ প্রচারের জন্য তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে ১৯০২খৃষ্টাব্দে ভারতের এই নবযুগ স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়ে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ মানবসেবায় ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর। তাঁহার আদর্শের প্রধান অঙ্গ ছিল দরিদ্রনারায়ণের সেবা। তিনি জাতিভেদ ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং দেশে দেশপ্রেমের আদর্শ দ্বারা ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া নবভারত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ আমাদিগকে যুগ যুগ ধরিয়া সত্যের পথে লইয়া চলিবে। হে নবভারত স্রষ্টা তোমাকে অন্তরের প্রণাম জানাই।

তিরোধান ও উপসংহার

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গমাতার সুসন্তান আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সুসন্তান বক্ষে ধারণ করিয়া ভারতমাতা ধন্যা। এই প্রতিভাবান পুরুষ বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য তথ্য দান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

আচার্য জগদীশচন্দ্রের পিতৃভূমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাঢ়ীখাল গ্রামে। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মৈমনসিংহে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে ফরিদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয় এবং পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া 'হেয়ার স্কুলে' প্রবেশ করেন। পরে ষোল বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি 'সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে' প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানে বি-এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। জগদীশের পিতা ভগবানচন্দ্র অতিশয় চিন্তাশীল ও দূরদর্শী লোক ছিলেন। বাল্যেই তিনি পুত্রকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন যাহাতে জগদীশচন্দ্রের মনে প্রাকৃতিক রহস্য উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত আগ্রহ জন্মে। পিতার ইচ্ছা—পুত্র বিলাতে গিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ করে। কিন্তু পুত্র যখন বি-এ পাশ করিল, তখন ভগবানচন্দ্র নানা কারণে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ প্রায় ঐ সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। এই সকল কারণে জগদীশচন্দ্রের বিলাত গমন কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল। কিছুকাল পরে পিতা ও মাতা উভয়ের চেষ্টায় তিনি বিলাতগমনে সমর্থ হইলেন। বিলাতে গিয়া জগদীশচন্দ্র প্রথমে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা হেতু কিছুকাল পরেই তাঁহাকে উহা ত্যাগ করিতে হয়।

জন্ম, বংশপরিচয় ও বাল্যকাল

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিজ্ঞান পড়িতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ট্রাইপস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ সময়েই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস-সি পরীক্ষায় সসম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে আসিয়া জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ীভাবে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা কার্যের অবসরে জগদীশচন্দ্র কলেজের পরীক্ষাগারে বসিয়া নানারূপ গবেষণা কার্যে রত থাকিতেন। উক্ত পরীক্ষাগারে

তখন বিশেষ উন্নত ছিল না। সেইহেতু, অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইত। এই অসুবিধা দূরীকরণের ইচ্ছায় তিনি স্বদেশের শিল্পীগণের দ্বারা কতিপয় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করাইয়া তাহার সাহায্যে গবেষণা চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা শীঘ্রই আপনার বিকাশপন্থা খুঁজিয়া বাহির করিল। জগদীশচন্দ্র কয়েক বৎসরের মধ্যে আপনার গবেষণার বিষয় বিলাতে 'রয়্যাল সোসাইটি'তে প্রেরণ করেন। 'সোসাইটি' তাঁহার প্রতিভার মূল্য বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি যাহাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করিলেন। ক্রমশ তাঁহার নিত্য নূতন গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ নানাস্থানে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার এইরূপ উচ্চাঙ্গের গবেষণার পুরস্কার স্বরূপ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এস-সি. উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মৌলিক গবেষণা কার্যে সুবিধাদানের জন্য বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা বৃত্তি নির্ধারণ করেন।

শিক্ষা ও কর্মজীবন

ইহার পর জগদীশচন্দ্র তাঁহার গবেষণাগুলি প্রচারের জন্য ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা করেন। সেখানে গিয়াই তিনি লিভারপুলে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। সেই সভায় তিনি অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। নানা দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া মিলিত করতালি-ধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে সংবর্ধিত করিলেন। বেতারে সংবাদ প্রেরণের কৌশল জগদীশচন্দ্রই প্রথম উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তাঁহার বেতার-যন্ত্র আবিষ্কারের এই ইতিহাস এক দুঃখ ও বেদনার ইতিহাস। আমরা দূর হইতে ইউরোপকে নানা সদ্‌গুণে ভূষিত বলিয়া মনে করি; কিন্তু সেখানেও ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার অভাব নাই। এই ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার আক্রমণ হইতে জগদীশচন্দ্রও রেহাই পান নাই; বিশেষতঃ একজন ভারতবাসীকে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের সম্মানলাভে সমুদ্যত দেখিয়া কতিপয় ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে প্রতিপদে বাধা দিয়াছিলেন। সেই দূর বিদেশে এক হীন ষড়যন্ত্রের ফলে জগদীশচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া ওঠেন। বৈজ্ঞানিকগণের ঘৃণা মিথ্যাচারে বিরক্ত হইয়া জগদীশচন্দ্র পদার্থ বিদ্যা ছাড়িয়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যার আলোচনা ধরিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার করিলেন যে, বৈজ্ঞানিক জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি দেখাইলেন, জড়-জগৎ ও প্রাণিজগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উদ্ভিদ্ বিষয়ক একটি আবিষ্কারেও তিনি এইরূপ বাধা পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন: "যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন।"

বিজ্ঞান সাধনা

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর জগদীশচন্দ্র পুনরায় পূর্ণোদ্যমে গবেষণা-কার্যে মনোনিবেশ করেন। এই সময়েই তিনি তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত উদ্ভিদ্ সম্পর্কীয় তথ্য আবিষ্কার করেন। প্রকৃতির এই অচল, মূক সন্তানগণেরও যে মানুষের মত চেতনা ও অনুভূতি আছে, তাহারাও যে শ্রমে ক্লান্ত এবং বিশ্রামে সবল হয়, এমন কি একমাত্র চলচ্ছক্তি ভিন্ন অপর কোন বিষয়ে যে তাহারা সচল জীবগণ অপেক্ষা হীন নহে, জগদীশচন্দ্র তাহা আবিষ্কার করিয়া যন্ত্র সাহায্যে তাহা প্রমাণিতও করেন। তাঁহার এই অদ্ভুত আবিষ্কারে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয় এবং এই বাঙালী বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদিগের এক সম্মেলন আহূত হয়। তাহাতেও বক্তৃতা দিবার জন্য জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রিত হন। সেখানেও তিনি আপন অসামান্য প্রতিভাপ্রদর্শন করিয়া প্রভূত সম্মান ও গৌরব অর্জন করেন। প্যারিস হইতে তিনি লণ্ডন গমন করেন এবং সেখান হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। স্বদেশে আসিয়া জগদীশচন্দ্র পুনরায় ধ্যানযোগী ঋষির মত প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে মনোনিবেশ করেন। সমগ্রবিশ্বব্যাপী তখন তাঁহার নিত্য নূতনবার্তা পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাই পুনঃ পুনঃ বিদেশের আহ্বানে চঞ্চল হইয়া তিনি আরও কয়েকবার বিজ্ঞান অভিযানে বহির্গত হন।

ইংলণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স, ইটালি, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে তিনি বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন এবং তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি ঐ সকল দেশে সবিশেষ প্রশংসা লাভ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে নানারূপ উপাধি সম্মানে ভূষিত করে এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে 'রয়্যাল সোসাইটি'র সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জেনেভার রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে। একটি গবেষণাগারের অভাবে জগদীশচন্দ্রকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল ; সেই অভাব দূর করিবার জন্য তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির' নামে একটি সুন্দর গবেষণাগার স্থাপন করেন। যাহাতে কোন ভারতীয়ের

তাঁহার অবদান

পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোন অসুবিধা না হয়, সেই উদ্দেশে তিনি ইহা স্বদেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া যান। একমাত্র বিজ্ঞানেই নহে বাঙলা সাহিত্যেও জগদীশচন্দ্রের অবদান কম ছিল না, তাঁহার লিখিত 'অব্যক্ত' গ্রন্থ তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়।

সারা জীবন ধরিয়া প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিবার ফলে এবং বার্ধক্যের আক্রমণে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া

মৃত্যু

তিনি সমাহিত চিত্তে আপন কাজে রত ছিলেন। ফলে তাঁহার শরীর আরও ভাঙিয়া পড়ে। তখন বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি গিরিডি নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করেন। তথায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর ভারতের এই কৃতী সন্তান, বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক দেশবাসীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুতে বৈজ্ঞানিক জগতের যে ক্ষতি হইয়াছে, তদপেক্ষা বহু গুণে অধিক ক্ষতি হইয়াছে ভারতবর্ষের। মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা—এই উভয়ের প্রতিই তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। জননী জন্মভূমির সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা পুণ্যভূমি ভারতের অধিবাসী; ইহাই আমাদের গৌরব।" তিনি আরও বলিতেন, "আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত তাহা হইলে প্রত্যেকবারই আমি হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।" গত ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমগ্র দেশব্যাপী পুণ্যকীর্তি মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

উপসংহার ও জন্ম শতবার্ষিকী

মহাত্মা গান্ধী

ইংরেজের শাসন-শোষণে যখন আমাদের দেশ, আমাদের ধ্যানের ভারত অন্তঃসারশূন্য ও নিষ্পেষিত, যখন ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরিত হয় নাই, তখন এই মৃত-প্রায় জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য এবং ভারতমাতাকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন মহাত্মা গান্ধী। জগতের শ্রেষ্ঠ মানব, অহিংসার একনিষ্ঠ পূজারী, ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ইংরেজি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত পোরবন্দরে এক সম্ভ্রান্ত বণিকবংশে মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মাজীর পিতার নাম কাবা গান্ধী ও মাতার নাম পুতলীবাঈ।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

শৈশবে গান্ধীজীর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মাত্র তের বৎসর বয়সে কস্তুরীবাঈ-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। মাত্র সতের বৎসর বয়সে গান্ধীজী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভবনগরে শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হন। গান্ধীজীর কলেজে পড়া অধিক দূর আর অগ্রসর হইল না। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদিগের পরামর্শে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করেন।

জন্ম ও শিক্ষা

নয় মাস একনিষ্ঠভাবে পড়াশুনা করার পর গান্ধীজী ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তিনি বোম্বাই শহরে আইন ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না। এই সময়েই তিনি দাদাভাই নৌরজী ও গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সহিত পরিচিত ও জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহার পরে তিনি রাজকোটে যাইয়া ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এক জটিল মোকদ্দমার ভার লইয়া

গান্ধীজী আফ্রিকায় যান। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের হাতে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইতেছিল। ভারতীয়দিগের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণে গান্ধীজীর মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তথায় ভারতবাসীর প্রতি যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন। এইজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের কার্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে তথাকার ভারতবাসীরা তাঁহাকে তাহাদের নেতা বলিয়া মানিয়া লইল। রাজনীতি ছাড়াও তিনি অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আফ্রিকা বাস

বুয়ার যুদ্ধের পর গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া বোম্বাইয়ে পুনরায় ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি ভারতে অবস্থান করিতে পারেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের হইয়া সংগ্রাম পরিচালনার জন্য আবার তাঁহার আহ্বান আসিল। তিনি আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া গেলেন। এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাকে প্রবল সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত। এই প্রবল আন্দোলনের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করিলে সমস্ত স্থান হইতে তাঁহার বিপুল সংবর্ধনা হইতে লাগিল। ঐ বৎসর কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে যে সভা হয় তাহাতে বক্তৃতায় তিনি বলিলেন, "সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করা যাইবে না; পাশ্চাত্ত্য দেশে যাহা সম্ভব ভারতবর্ষে তাহা চলিবে না।"

সত্যাগ্রহ নীতি

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বিহারের চম্পারন জেলায় নীলকরদের উপর অত্যাচার নিবারণ করিতে গান্ধীজী চেষ্টা করেন। তাঁহার এই চেষ্টার ফলে নীলকরদের উপর অত্যাচার বন্ধ হইয়া গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গান্ধীজী বৃটেনের পক্ষে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পুরস্কার স্বরূপ ভারতীয়দের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য যখন কুখ্যাত 'রাউলাট' আইন পাশ হইল, তখন তাহার প্রতিবাদে গান্ধীজী এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল হরতাল পালনের সময় দিল্লীতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বহু লোক হতাহত হইলে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখিলেন। ইহার পর আসিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল—গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দিন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, গান্ধীজী ছিলেন এই তদন্ত কমিটির সভাপতি।

অসহযোগ আন্দোলনের বিকাশ

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন বসে। মহাত্মাজী এই অধিবেশনে সরকারের সহিত অসহযোগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন—বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই বৎসরই ১০ই মার্চ তারিখে পুলিশ মহাত্মাজীকে তাঁহার আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ আশ্রয়ে গ্রেপ্তার করে। দায়রা জজ রাজদ্রোহের অপরাধে গান্ধীজীর প্রতি ছয় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। কারামুক্তির পর মহাত্মাজী গঠনমূলক কার্যে ও হরিজন উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মাজী এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে, 'যদি এক বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট নেহরু কমিটির শাসনতন্ত্র গ্রহণ না করেন, তবে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন গ্রহণ করিবে।' উহারই সমর্থনে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলন

এই বৎসরই গান্ধীজী অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে মাত্র উনআশি জন সত্যাগ্রহী লইয়া আইন অমান্য করিবার জন্য 'ডাণ্ডী' অভিমুখে যাত্রা করেন। দুই শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি ডাণ্ডীতে উপনীত হইয়া লবণ আইন ভঙ্গ করেন। সমস্ত ভারত জুড়িয়া আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়া যায়। অবশেষে ৪ঠা মে তারিখে মধ্যরাত্রে পুলিশ মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করে। ১৯শে মে তারিখে মহাত্মাজী বিখ্যাত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাতযাত্রা করেন। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় মহাত্মাজী পুনরায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলে ৪ঠা জানুয়ারী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া যারবেদা জেলে আটক রাখা হয়। এই জেলে থাকা কালে হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে মহাত্মাজী ২০শে সেপ্টেম্বর অনশন আরম্ভ করেন। পুনরায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন এবং ২৯শে মে অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট পুনরায় মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করিয়া এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য গান্ধীজী তুমুল আন্দোলন করেন। এই বৎসর ২৬শে অক্টোবর তারিখে তিনি কলিকাতায় অনশন আরম্ভ সুরু করেন।

ইহার পরই আরম্ভ হয় বিখ্যাত আগষ্ট বিপ্লব। ইহা এক গৌরবময় ঘটনারূপে ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে (বোম্বাই শহরে) মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। ইহাই বিখ্যাত আগষ্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। বড়লাট তখন মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। ফলে চারিদিকে প্রচণ্ড বিদ্রোহের আগুনে সমগ্র ভারতবর্ষ কাঁপিয়া উঠিল।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজী পুনরায় পুণায় বন্দী শিবিরে অনশন আরম্ভ করেন এবং একুশ দিন ব্যাপী অনশন করিয়া ৩রা মার্চ তিনি উহা ভঙ্গ করেন। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ার গান্ধীজীর পত্নী কস্তুরীবাঈ গান্ধী পরলোক গমন করিলে গান্ধীজী গভীরশোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জিন্না পাকিস্তান দাবী করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিলে ভারতের নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। নোয়াখালীতে এই ভ্রাতৃহত্যা চরম আকার ধারণ করিলে মহাত্মাজী এই বীভৎস ভ্রাতৃহত্যার সংবাদে স্থির থাকিতে না পারিয়া আটাত্তর বৎসর বয়সে ছুটিয়া গেলেন ভ্রাতৃবিরোধ মিটাইবার জন্য। তাহার পর বিহারে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা আরম্ভ হইলে গান্ধীজী পুনরায় ছুটিয়া আসিলেন বিহারে।

সত্য ও অহিংসা সাধন

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুনের প্রস্তাব অনুসারে ভারতকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করা হইল; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি রাষ্ট্র ১৫ই আগষ্ট হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। গান্ধীজীরই প্রচেষ্টায় এই স্বাধীনতা লাভ করে। এতকাল পরে মহাত্মাজীর অন্তরের বাসনা তথা 'ভারত ছাড়' ধ্বনি সত্যে পরিণত হইল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কলিকাতায় আবার হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই সংবাদে মহাত্মাজী বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বেলেঘাটায় এক মুসলমান বাড়ীতে তাঁহার শান্তির আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য অনশন করিলে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আবার প্রীতি ফিরিয়া আসিল।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের পক্ষে মহা মর্মান্তিক দিবস। ঐদিন মহাত্মা গান্ধী বিকাল ৫-৩০ মিনিটের সময় দিল্লীতে তাঁহার প্রার্থনা সভায় যোগদান করিবার জন্য যখন যাইতেছিলেন, তখন এক মারাঠা যুবক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া রিভলভারের গুলি ছুঁড়িল। মহাত্মাজী পেটে ও বুকে গুলির আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতের এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পরেই ভারতের প্রদীপ্ত সূর্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইল।

গান্ধী হত্যার কাহিনী

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বাঙলাদেশে একদিকে যেমন মনীষী ও সাধকবৃন্দ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন, তেমনি এদেশে বীরেরও অভাব হয় নাই। বাঙলার চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি অসংখ্য বীর এদেশে শৌর্যের পরাকাষ্ঠ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাদেরই শৌর্য-বীর্যের উত্তরাধিকারী লইয়া আর একজন বীর এযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র। আমরা ভারতবাসী বর্তমানে স্বাধীনতা পাইয়াছি। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূলে রহিয়াছে সুভাষচন্দ্রের ত্যাগ,

প্রারম্ভিক ভূমিকা

স্বদেশসেবা ও কর্মদক্ষতা। বৃটিশের বিরুদ্ধে তাঁহার সমর ঘোষণাই ভারতের স্বাধীনতা পথকে বহু পরিমাণে সুগম করিয়া দিয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি ছিল চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক শহরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু তথাকার একজন অর্থশালী ও খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের শৈশব কটকেই অতিবাহিত হয় এবং সেই স্থানেই তাঁহার প্রাথমিক বিদ্যারম্ভ হয়। তিনি যে ভবিষ্যৎকালে একজন স্বদেশ-সেবক হইবেন তাহা তাঁহার শৈশবের ছাত্রজীবনের নানা ঘটনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছিল।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

কটকের 'রাভেন্‌শ' কলেজিয়েট স্কুল হইতে সুভাষচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর আই, এ, পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই সুভাষচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইঁহাদের প্রভাব সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে বিশেষ কার্যকারী হইয়াছিল। সন্ন্যাসী হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় একদিন সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কিছুকাল নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি হতাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পড়াশুনা করেন।

ছাত্রজীবন

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র আই, এ, পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলেজে পড়িবার সময়েই সহপাঠিগণের উপর তিনি তাঁহার অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইউরোপীয় অধ্যাপক মিঃ ই, এফ, ওটেন ছাত্র-দিগের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিতেন। ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র কলেজ হইতে বিতাড়িত হন। ইহাতে কিছুদিন সুভাষচন্দ্রের পড়াশুনায় বাধা পড়ে। অবশেষে তিনি স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্কটিশ চার্চ কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইতে সমর্থ হন। এই কলেজ হইতে সুভাষচন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য যোগদান করেন।

অতঃপর তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাত গমন করেন। সেখানে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বি, এ, পাশ করেন। মাত্র আট মাস পড়িয়া সুভাষচন্দ্র ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় দেশের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। তখন তিনি সিভিল সার্ভিসের কার্য পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া আসেন এবং সক্রিয়ভাবে ভারতমাতার মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করেন।

যে সময়ে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন তখন দেশে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রধান সহকর্মী হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয় বিদ্যায়তন' নামে স্বদেশী কলেজে সুভাষচন্দ্র হইলেন অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রিন্সিপাল। বাঙলায় স্বেচ্ছসেবক বাহিনী তাঁহার নির্দেশে পরিচালিত হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবনে তাঁহার কঠোর পরিশ্রমের স্মৃতিকথা আজও পর্যন্ত দেশবাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। সুভাষচন্দ্র কলিকাতা পৌরসভার প্রধান কর্মসচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়ক হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা পৌরসভার পৌর-প্রধান নির্বাচিত হন। স্বদেশসেবার জন্য তাঁহার উপর সরকারের বড় কড়া নজর ছিল। জীবনের অধিকাংশ সময়েই তাঁহাকে কারা জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ই ভারতের ও বঙ্গদেশের নানা কারাগারে তাঁহাকে বন্দী জীবনযাপন করিতে হয়। নির্বাসন ও কারাযন্ত্রণা জনিত স্বাস্থ্যহানিতে তাঁহাকে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু নির্ভীক সুভাষচন্দ্র একদিনের জন্যও তাঁহার দেশসেবার ব্রত বিস্মৃত হন নাই।

রাজনৈতিক জীবন

সুভাষচন্দ্র বহু বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং অদ্ভুত কর্মদক্ষতা ও দূরদর্শিতার সহিত নিখিল ভারত জাতীয় সমিতির কার্য পরিচালনা করেন। পরের বৎসরেও তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নেতৃবর্গের সঙ্গে মতদ্বৈধতা হেতু ঐ পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি দল গঠন করেন। কলিকাতার হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ সুভাষচন্দ্রের জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। এইজন্য তিনি আন্দোলন পরিচালনা করিয়া কারারুদ্ধ হন। পরে কারাগারে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। তখন তিনি স্বগৃহে বন্দীভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সহসা সুভাষচন্দ্র রহস্যজনকভাবে গৃহ হইতে অন্তর্ধান হইলেন। সুভাষচন্দ্র বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাবুলের মধ্য দিয়া ইউরোপে উপস্থিত হন। তখন গত মহাযুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি মনে করিলেন যে, যুদ্ধ করিয়া ইংরেজকে ভারত ছাড়িতে বাধ্য করার এই উপযুক্ত সময়। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজের শত্রুদের সহিত বন্ধুত্ব করেন এবং ইংরেজ পরিত্যক্ত শত্রুহস্তে পতিত ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া এক বিশাল সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদলের নাম 'আজাদ-হিন্দ ফৌজ' অর্থাৎ ভারতীয় মুক্তি সৈন্য। সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এক অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজে তাহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

স্বদেশপ্রেম

আজাদ-হিন্দ সৈন্যেরা অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আসামের কিয়দংশ অধিকার করে। কিন্তু ভারতের মিত্রশক্তি জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী আজাদ-হিন্দ সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে বাধ্য হন। এই আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠন ও পরিচালনে নেতাজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কর্মদক্ষতা এবং গঠনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের পতনের পর নেতাজীর জীবনকাহিনী এক রহস্যজালে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, জাপানে যাইবার সময় তিনি ব্যোমযান দুর্ঘটনায় আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আবাব কেহ কেহ বলেন, তিনি কোথাও আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেছেন সময়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করিবেন। যাহা হউক, নেতাজী যে সমগ্র বাঙালী জাতির তথা সমগ্র ভারত-বাসীর গৌরবের সামগ্রী সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। প্রতি বৎসর ২৩শে জানুয়ারী ভাবতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙালী এই বরেণ্য বীরকে অন্তর হইতে আহ্বান জানায়। তাঁহার 'জয়হিন্দ' বাণী ভারতবাসীকে চিরকাল উদ্বুদ্ধ করিবে।

উপসংহার

শিক্ষা প্রসারে চলচ্চিত্র

[স্কুল ফাইনাল ১৯৬২]

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জীবন রসসম্ভোকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। আধুনিক যুগের স্মৃতিদিয়ে ঘেরা স্বপ্নদ্বারা পূর্ণায়ত নির্বাক মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র বিন্দু করিয়া রচিত সাহিত্য সবটুকু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটাইতে অক্ষম। ইহার দরুনই বিজ্ঞানের সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ বেগ পাইয়াছে কিন্তু আবেগ আজ ক্রমহ্রাস্যমান বিধিতে দাঁড়াইয়াছে। সে কারণেই সময়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া জীবনরস সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার সহজ-সাধ্য প্রচেষ্টা উদ্ভাবন করার দরকার। চলচ্চিত্র আজ সে দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে। সেজন্যই চলচ্চিত্র একাধারে যেমন সবাক মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের খণ্ড ও ক্ষুদ্র এবং অনুভবের সার্থকতার রূপকে উপস্থাপিত করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি উহা সময়েরও সামঞ্জস্য বিধান ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছে। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার প্রশ্নও তাই অত্যন্ত গুরুত্বলাভ করিয়াছে। বিজ্ঞানীর অনলস শ্রমসাধনার দ্বারা আবিষ্কৃত যাহা আমাদের নিকট উল্লেখযোগ্য সমাদরলাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে চলচ্চিত্র অনায়াসে প্রথম শ্রেণীর আবিষ্কার। জনপ্রিয়তার তারতম্যের দিক হইতে চলচ্চিত্র সংবাদপত্র অপেক্ষাও বেশী মর্যাদা পাইয়াছে। চলচ্চিত্র আজ শুধু চিত্রই নহে। যুগোপযোগী প্রগতির ধারক হিসাবে সে চলমানও বটে। চলমান জীবনের দুর্দম-দুর্বার গতির প্রতিটি পদক্ষেপ আজ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত এবং পরিবেশিত।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

চলচ্চিত্রের গোড়াকার ইতিহাস অস্পষ্ট এবং অস্বচ্ছ। বিজ্ঞানের অবদানের সবটুকু সুফল উপভোগের পূর্বাহ্নে চলচ্চিত্র ছিল না, ছিল যাত্রাগান ও নাচ। আর সেখানে জীবনের লঘু-চপল দিকটিই পাইত সবিশেষ প্রাধান্য। উদ্দেশ্যের দিক হইতে যাত্রা, নাটক প্রভৃতি ছিল অলক্ষ্যচারী অতীতচারী জীবন বন্দনা। অশান্ত, অতৃপ্ত মানবহৃদয় উহাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তির আস্বাদ পায় নাই। এজন্যই প্রয়োজন ছিল ইহা অপেক্ষা উন্নততর আবিষ্কারের। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ, আমেরিকান এবং ফরাসী বিজ্ঞানীদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলেই 'সিনেমাটোগ্রাম' নামক জটিলতর যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা উহাকেই চলচ্চিত্র বলিয়া থাকি। কিন্তু এই আবিষ্কারের প্রথম প্রচেষ্টা ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড মায়ব্রিজ এবং জে, ডি, ইসাক নামক দুইজন বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছিল। এই আবিষ্কারের পূর্ণতর সাফল্য ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুসিয়ারের অবদানে সংঘটিত হয়। প্রথম সার্থক চলমান চিত্রের নির্মাণ বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঘটে।

চলচ্চিত্রের উদ্ভাবনের গোড়ার ইতিহাস

কিন্তু উহা ছিল নির্বাকচিত্র সমষ্টিমাত্র। সবাকচিত্রের আবিষ্কার ইহার কিছুদিন পরের ঘটনা। চলচ্চিত্র উদ্ভাবনের প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য একটি চিত্র হইতেছে 'কুওভেডিস্'। ওয়াল্টার রচিত কাহিনী অবলম্বনে উহা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইয়াছিল। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের অবদানে সমৃদ্ধ হইয়া উহাতে আরও বিচিত্রতর উপাদান সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে কাহিনীর অবলম্বনে রচিত চিত্র, প্রচারমূলক চিত্র, ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের দায় মিটাইবার জন্য নির্মিত চিত্র এবং সংবাদ সমীক্ষার দ্বারা পরিবেশিত চলচ্চিত্র অত্যন্ত গুরুত্বলাভ করিয়াছে।

বর্তমান সমাজে জনপ্রিয় এই শিল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম। এযুগের চলচ্চিত্রের আবেদন মানুষের মর্মমূলের গোপনতন্ত্রীতে। তাৎপর্যের দিক হইতেও ইহা স্বমহিমায় প্রজ্বল। আধুনিকযুগের ধারক, বাহক এবং প্রচারক মানুষের বিভিন্ন আদর্শ তথা সমস্যাবহুল রূপটির সার্থক প্রতিফলিত ঘটে ইহার মাধ্যমে। তাই এ যুগের মানুষের উন্নত চিন্তা আদর্শ হইতে সুরু করিয়া অসহনীয় সামাজিক সমস্যারূপ ইহার মাধ্যমে পরিবেশিত। অন্যদিকে আবার যুদ্ধ ও শান্তি, অন্যায়-উৎপীড়ন, রাজনৈতিক বৈপ্লবিক তথা— সামাজিক অ-সাম্যের পূর্ণ পরিচয় লাভ এই চলচ্চিত্রের দ্বারাই পাওয়া যায়। 'Variety is the Spice of life.' কথাটির মর্যাদা চলচ্চিত্রের আবিষ্কার শতগুণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এ যুগের চলচ্চিত্র শুধুমাত্র সাহিত্যের অনুসরণ করে না। মানুষের স্বাধীন চিন্তাবিকাশের মূলেও ইহার অবদান অনস্বীকার্য। তাই চলচ্চিত্র হইতেছে 'জনমত' সৃষ্টির অন্যতম বাহন।

বর্তমান সমাজে চলচ্চিত্রের প্রভাব

শিল্প মাত্রই কিছু না কিছু প্রচারকল্পে রচিত হয়। চলচ্চিত্র শিল্পও উহার ব্যত্যয় ঘটায়

নাই। একারণে উন্নত চলচ্চিত্রে যেমন জীবনে উচ্চতর নৈতিক জীবনকে রূপায়িত করে, অন্যদিকে তেমন হীনরুচির পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা নির্মিত লঘু চলচ্চিত্রও সৃষ্টি হয়। কুশ্রীতা নোংরামির বিকাশকে কোনভাবেই স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাই পশ্চাদ্গামী আদর্শের সমর্থকদের অবদানকে অভিনন্দন যাহারা জানায় তাহারা সংখ্যায় অত্যন্তই অল্প। ইহার নিমিত্তই মুহূর্তের তরে আদর্শ ভ্রষ্ট না হইয়া একথা নিঃসন্দেহভাবে বলা চলে, চলচ্চিত্র মানবপ্রগতির সমর্থক উপাদানের সঞ্চয়ন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সুসংগঠিত পরিচালনার দ্বারা চলচ্চিত্র শিল্পকেও অন্যতম সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। গ্রাম্য কুসংস্কার দূরীকরণ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে। বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে ইহাকে অন্যতম শিক্ষার বাহনরূপে পরিগণিত করা হইতেছে। ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের অক্ষর জ্ঞানহীন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত ইহার উপযোগিতাকে কোন প্রকারেই কম করা চলে না। অন্যদিকে জনস্বাস্থ্যের রক্ষার মহতী আদর্শ প্রচারের দিক হইতেও চলচ্চিত্রকে অন্যতম হাতিয়ারের মর্যাদা দেওয়া চলে।

উপকারিতা

অনুকরণ এবং অনুসরণ মানুষের সহজাত গুণ। প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টির আলোকে ইহাদের অনুসরণ আবার সামাজিক ক্ষতির কারণ হইয়া দেখা দেয়। চলচ্চিত্র শিল্পীদের হাসি কান্না হইতে সুরু করিয়া উঠা বসা পর্যন্ত সব কিছুকে অনুসরণ করিলে অবিসংবাদিত-ভাবে উহার কুফল ভোগ করিতে হয়। উন্নত আদর্শের আলোকে রচিত চিত্রের পাশাপাশি নোংরামি আশ্রয়ে রচিত চিত্রও মর্যাদা পায়। আলোর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কালো চিরদিনই স্বীকৃতি পায়। তাই উন্নত চলচ্চিত্রের পাশাপাশি অবনত চিত্রের অবস্থান থাকা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তবে উহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না, চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেতৃদের সবকিছুকেই অন্ধ অনুকরণ করা উচিত নয়।

কুফল

আধুনিক যুগের কর্মক্লান্ত সমস্যাকণ্টকিত মানুষ বাস্তবের রূঢ় আঘাতে জর্জরিত। তাই আজ তাহার একান্ত প্রয়োজন অনাবিল মানসিক আনন্দ। চলচ্চিত্র দেখিয়া মানুষ ভুলিয়া যায় তাহার দিনানুদৈনিক একটানা একঘেঁয়ে জীবনের ক্লান্তি, দুঃখ ও বেদনা। বর্তমান যুগের জীবন্ত রূপটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে রূপায়িত হয়। ইহার সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানব কল্যাণকামী ক্ষমতার দিকটির উপর আকর্ষণ বর্ধিত হওয়া প্রয়োজন। সুস্থ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কল্পে ইহাকে ব্যবহার করা চলে। নিম্নবৃত্তির উদ্বোধক নহে, বিনষ্টধারী ক্ষমতার পরিচালক হিসাবে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের কল্যাণকে ডাকিয়া আনা যাইবে।

উপসংহার

বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যুতের দান

[প্রাক্ বিশ্ব. ১৯৬১]

মানুষ বাঁচিবার প্রয়োজনে প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। সভ্যতার আদিমযুগে জীবনধারণের জন্য তাহাকে বনে বনে ঘুরিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। বন্যজন্তুর হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য পাথর ঘসিয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। পশুপ্রায় আদিম মানুষের প্রাণধারণের জন্য এই প্রয়াস, এই দ্বন্দ্ব ব্যর্থ হয় নাই। এইভাবে যুদ্ধ করিতে করিতেই মানুষের শরীর ও মনের বিকাশ হইয়াছে—তাহারা বুদ্ধি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। মানব-সভ্যতার ইতিহাস এই দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস। বাঁচিবার সাধনা করিতে করিতেই মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। তাহাকে কাজে লাগাইয়াছে, মানুষের প্রকৃতিজয়ের সাধনার ধারা অনুসরণ করিয়াই বিজ্ঞানের সূচনা হইয়াছে। বিদ্যুতের আবিষ্কার ও তাহাকে কাজে লাগাইবার পিছনেও এই সাধনার ধারাই কাজ করিতেছে। মেঘাবৃত আকাশে মুহূর্তের জন্য অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিল, কোথা হইতে এই ক্ষণপ্রভার উৎপত্তি? এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের অভ্যন্তরে যে অসীমশক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইল? কেনই বা বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গুরু-গুরু মেঘগর্জনে চারিদিক প্রকম্পিত হয়, আর কেনই বা বিদ্যুৎতেজের সংস্পর্শে যাহা আসে, তাহাই পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়? এই প্রশ্নগুলির পিছনেই বিদ্যুতের আবিষ্কার ও তাহার ক্রমোন্নতির সাধনা ও ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

পৃথিবী ও তাহার উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের সকল স্থানে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার নাম তড়িৎ। এই তথ্য যেদিন মানুষ প্রথম আবিষ্কার করিল, সেদিন তাহার কাছে প্রকৃতির রহস্য খানিকটা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। এই আশ্চর্য পদার্থটি আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। কিন্তু কখনও কখনও ইহা কোন বস্তু হইতে তীব্র জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটার আকারে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি এই পদার্থেরই কার্য। অনেক পর্যবেক্ষণের পর তড়িতের আর একটি বিশেষ গুণ মানুষের কাছে ধরা পড়িল। এই গুণটি হইল, যদি ঐ তড়িৎ এক স্থানে অধিক থাকে এবং তাহার নিকটবর্তী স্থানে অল্প থাকে, তাহা হইলে উহা শেষোক্ত স্থানে আসিয়া উভয় স্থানেই সমান হয়। আকাশে সঞ্চিত একখণ্ড মেঘে যদি বেশী পরিমাণে তড়িৎ থাকে এবং নিকটেই আর একখানি মেঘে যদি অপেক্ষাকৃত কম থাকে

বিদ্যুতের উৎপত্তি

তাহা হইলে যে মেঘখানিতে বেশী তড়িৎ আছে উহার উদ্বৃত্ত অংশ অপর মেঘখানিতে সঞ্চারিত হয়। ফলে অতি প্রখর জ্যোতিপ্রকাশ ও ঘোরতর মেঘগর্জন হয়। ইহাকেই আমরা বিদ্যুৎ বা বজ্রধ্বনি বলি।

বিদ্যুতের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তি বিরাজ করিতেছে, সেই শক্তি যে মানব সমাজের অশেষ কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহা প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল। কালক্রমে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই উন্নতি করিতে লাগিল, ততই বিদ্যুৎশক্তিকে কিভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে তাহার উপায়ও উদ্ভাবন করিতে লাগিল। চিন্তাশীল মনীষীগণ কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিদ্যুৎ আবিষ্কারক

কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে সকল বৈজ্ঞানিক অক্লান্ত সাধনা করিয়া মানুষের নমস্য হইয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন ইংলণ্ডের মাইকেল ফ্যারাডে এবং আর একজন আমেরিকার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা সুরু হইলেও উনবিংশ শতাব্দীতে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারে যুগান্তর আনিয়া দেয়। কৃত্রিম-বিদ্যুৎ-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার একটা নূতন যুগ আসিয়া পড়িয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত কলকারখানা মানুষের জীবন-যাত্রায় বহু পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। ইহার সাহায্যে নিমেষে গৃহ আলোকিত হয়, প্রখর গ্রীষ্মে শীতল বাতাস উপভোগ করা যায়, টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের সাহায্যে অতিঅল্প সময়ে দূর দেশে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। রঞ্জনরশ্মির আবিষ্কার তো চিকিৎসা জগতে এক নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছে। বিদ্যুতের সাহায্যে যাহাতে মানবের আরও কল্যাণসাধন করিতে পারা যায়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহারই চেষ্টায় আজও নিয়োজিত আছেন। যেদিন হইতে মানুষ বিদ্যুৎকে আকাশ হইতে নামাইয়া, ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিয়া মনুষ্যের হিতকরকার্যে নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইদিন হইতে মানবজীবন অধিকতর নিশ্চয়তা, আরাম ও সুখের অধিকারী হইয়াছে। সত্যই মানুষ রহস্যময়ী প্রকৃতিকে পরাজয় করিয়াছে।

বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার ও উপসংহার

মানুষের অন্তরীক্ষ বিজয়

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৩]

রামায়ণের লঙ্কেশ্বর রাবণের রথ একদিন বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে বেড়াত আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদের মেঘের আড়ালে বসে যুদ্ধ করা প্রভৃতি আমাদের কাছে এতকাল সত্যই এক কল্পনার বস্তু হয়ে পড়েছিল। রামায়ণের এই কাহিনী একদিন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের করতো ভক্তি বিহ্বল আর নবীন-নবীনাদের কাছে ছিল এক অলৌকিক বিস্ময়।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা। এখন আমাদের এসবে আর বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে না। সে নিয়েছে একটা বিশ্বাসের বিরাট পরিধি। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একবার মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে তাঁর ব্যক্তিগত এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, 'কিছুদিনের মধ্যেই এক গ্রহের সঙ্গে অপর গ্রহের যোগাযোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা বেতারের মারফৎ খবরা-খবর আদান-প্রদান করা যাবে।' এই ঘটনার পরে সংবাদপত্রে নানা রকম গুজবও বেরোতে লাগল এই মর্মে যে, 'মঙ্গল গ্রহের কয়েকজন অধিবাসী পৃথিবীর বুকে নামতে সুরু করেছে।' এ ছাড়া একদিন একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্পষ্টই ঘোষণা করলেন যে, 'তিনি ইতিমধ্যেই মঙ্গলগ্রহের কোন এক অধিবাসীর সঙ্গে আকারে ইঙ্গিতে কথাবার্তাও চালিয়াছেন।'

প্রস্তুতির প্রথম পর্ব

এই সমস্ত জল্পনা-কল্পনা ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই। অটো-হান্ নামক জনৈক জার্মান বিজ্ঞানী যখন একটি পরিকল্পনা করলেন একটি কৃত্রিম উপগ্রহের—যাহা স্বাভাবিকভাবেই আকাশ পরিক্রমা করতে পারবে। এই ঘটনার পর বিষয়টি আরও পরিষ্কার হতে লাগলো। এই কৃত্রিম উপগ্রহটিই হবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। গবেষণা চলতে লাগলো দ্রুত গতিতে। ফলে আবিষ্কার হল রকেটের। শেষে গত ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববাসীকে হঠাৎ চমকে দিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাকাশে 'স্পুটনিক' পাঠালো। এটি মহাকাশে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো এবং পৃথিবীর কাছে "বিপ-বিপ" শব্দে জয়েরবার্তা ঘোষণা করলো। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'স্পুটনিক' পর্যায়ক্রমে আকাশের পথে পদসঞ্চারণ সুরু করে দিল।

প্রস্তুতির দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় 'স্পুটনিক লাইকা' একটি কুকুর বহন করে নিয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর দূত হিসাবে সৌরসাম্রাজ্যের নূতন সংবাদ বয়ে আনবার জন্যে। আর এক বিস্ময়ের দিন ১৯৫৯ সালের ৩রা জানুয়ারী। ঐ দিন রাশিয়া পাঠালো 'খোকা চাঁদ' 'বুড়ো চাঁদের' সঙ্গে মিতালী করবার জন্যে। নূতন যুগের ভোরের সূচনা করলো সে। বিরাট সম্ভাবনার বাণী বয়ে আনলো এই 'খোকা চাঁদ। এর অন্য নাম 'লুনিক'। তারপর দ্বিতীয় 'লুনিক' আকাশে উঠল সোভিয়েত পতাকা নিয়ে। তৃতীয় 'লুনিক' আকাশ পরিক্রমা করে নিয়ে এল চাঁদের বিরাট রহস্যময় দিকটির ছবি ও নানা তথ্য।

মহাকাশ রহস্য নিরূপণের সাফল্য

এরই মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পাঠালো একটি নকল উপগ্রহ। যার নাম 'ভ্যানগার্ড'। ফলে দুই দেশের মধ্যে লেগে গেল বিরাট প্রতিযোগিতা কে আগে চাঁদে পৌঁছুবে। প্রতি-যোগিতার ফলও ফললো। অবশেষে মানুষ সাফল্যের সঙ্গে অন্তরীক্ষের পথে পা বাড়ালো। ইংরেজির ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে সোভিয়েতের মানুষ য়ুরি গ্যাগারিন

সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ পরিক্রমা করে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এলেন। এর কিছুদিন পরেই আকাশে উড়লো পৃথিবীর দ্বিতীয় মানুষ শেপার্ড। ইনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বিতীয় মানুষ গ্যারমান তিতভের দীর্ঘক্ষণ মহাকাশ পরিক্রমা। ইনি পৃথিবীর তৃতীয় মহাকাশচারী মানুষ। এতদিনে মানুষের অন্তরীক্ষ বিজয় অভিযান সমাপ্ত হল। এখনো এই অন্তরীক্ষ বিজয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ হয় নি। রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা আরও উন্নততর গবেষণার দ্বারা গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যাবার জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষ যে একদিন লঙ্কেশ্বর 'রাবণের' মতই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করতে পারিবে এ বিশ্বাস আজ আমরা করতে পারি। প্রতীক্ষায় থাকবো সেই দিনটির যে দিনটিতে আমরা সগর্বে ও নিঃসংশয়ে বলতে পারবো :

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের অবদান ও উপসংহার

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

স্কুল ম্যাগাজীন

সাহিত্য রচনা মানুষের এক সুমহান কীর্তি। সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ তাহার মনের আনন্দ ও বেদনাকে ভাষা দিতে শিখিয়াছে। কিন্তু এই সাহিত্য রচনা করিতে গিয়া মানুষকে যুগের পর যুগ সাধনা করিতে হইয়াছে। এই সাধনা যেমন যুগের পর যুগ বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকগণ সমষ্টিগতভাবে করিয়া চলিয়াছেন, তেমনি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকটি সাহিত্যিককেও এই সাধনা করিয়া চলিতে হইতেছে। দৈনন্দিনকার সাধনার দ্বারাই সাহিত্যিক আপন আপন প্রতিভার বিকাশ ঘটান। চেষ্টা ও সাধনা ভিন্ন জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় সাহিত্য সৃষ্টি ক্ষেত্রেও কেহ উন্নতি করিতে পারে না। আজিকার যিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক তাহাকেও একদিন না একদিন কাঁচা হাতে কলম চালাইতে হইয়াছিল। সেই কাঁচা হাতে কলম চালাইতে চালাইতে তিনি সাহিত্য রচনায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী প্রত্যেকটি ব্যক্তিকেই সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশের মত কলম চালান শিখিতে হয়। জীবনের অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় সাহিত্য সাধনার হাতে-খড়ি ছাত্রজীবনে হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষানবীশ সাহিত্যিকদের জন্যে কোন সাময়িক পত্রের পাতা কোন দেশেই বরাদ্দ থাকে না। ছাত্র সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাইবার অসুবিধা দূর করিবার প্রয়োজনেই তাই স্কুল ম্যাগাজীন। আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত

স্কুল ম্যাগাজীন ও উহার প্রয়োজনীয়তা

স্কুলেই প্রতি বছর ম্যাগাজীন প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা আছে। সাহিত্য রচনায় উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে এই ম্যাগাজীনে আপন আপন লেখা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়।

প্রত্যেক স্কুলের ম্যাগাজীন প্রকাশের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটিতে ছাত্ররাই প্রতিনিধিত্ব করে। কেবলমাত্র তত্ত্বাবধানের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ দুই একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষককে কমিটিতে রাখিবার নির্দেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা সম্পাদন ব্যাপারে তাঁহারই চরম তত্ত্বাবধান করেন। প্রকাশ যোগ্য রচনার গুণাগুণ বিচারের গুরু-দায়িত্ব তাহাদের উপর থাকে। ইহার একটি প্রধান সার্থকতা এই যে শিক্ষকদের পরিপক্কবুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞান প্রকৃত ভাল রচনাকেই প্রকাশ যোগ্য বলিয়া অনুমোদন করে। অতি মাত্রায় কাঁচা হাতের লেখা এবং অপর্যাপ্ত ভুল ভ্রান্তিতে ভরা রচনাকে কোনক্রমে স্কুল ম্যাগাজীনে স্থান দেওয়া যায় না। এই কারণে বহু রচনা দেখিয়া যথার্থ ভাল রচনাগুলিকেই যোগ্য মর্যাদা দিবার চেষ্টা করা হয়। লেখকের সুযোগ দেওয়া পাঠককে আনন্দ দেওয়ার মহতী উদ্দেশ্য স্কুল ম্যাগাজীন প্রকাশের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কার্যকরি হয়।

ম্যাগাজীন পরিচালনা কমিটি গঠন ও উহার পরিচালনা

স্কুল ম্যাগাজীনে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা যেমন প্রচুর থাকে, তেমনি থাকে স্কুলের বাৎসরিক কার্য প্রণালীর মোটামুটি ইতিবৃত্ত। স্কুল ম্যাগাজীনের সম্পাদক প্রত্যেকক্ষেত্রেই ছাত্রদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হয়। সম্পাদক তাহার প্রবন্ধ ম্যাগাজীন সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও ছাত্রদের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয় লইয়া পর্যালোচনা করে। ম্যাগাজীন পাঠকের কাছে এই আলোচনা অনেক তথ্য বহন করিয়া আনে।

স্কুল ম্যাগাজীনে প্রকাশের বিষয়

পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর এরূপ ব্যবস্থা রাখা উচিত যাহাতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রকাশিত ম্যাগাজীনগুলি পড়িতে পারে। তাহা হইলে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের পত্রিকাকে আরও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা গড়িয়া উঠিতে পারে। এইরূপ প্রতিযোগিতা পরিণামে কল্যাণকর হয়।

স্কুল ম্যাগাজীন যে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রের একটি নবীন সংস্করণ। সাহিত্যের বিষয় ছাড়াও খেলাধূলা, বিশেষ সংবাদ ইত্যাদি নানা বিষয় ইহাতে প্রকাশ করা হয়। যাহা কিছুই ইহাতে প্রকাশ করা হউক না কেন, সব কিছুতেই ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সংগে সংগে ছাত্রদের মনে সাহিত্যরচনার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা হয়। এদিক হইতে স্কুল ম্যাগাজীন ছাত্রদের মানসিক উন্নতি এবং তাহাদের সাহিত্যিক প্রতিভার অঙ্কুরোদগমের প্রশস্ত ক্ষেত্র। প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে স্কুল ম্যাগাজীনের প্রভাব তাই অনস্বীকার্য।

উপসংহার

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের দান

মানুষের কৌতূহলী সৃষ্টি ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা মানুষ নিজ জীবনযাত্রাকে সহজ ও সুন্দর করিবার জন্য নব নব আবিষ্কার করিয়া নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা তাহাকে আরও উন্নয়ন করিয়াছে। তাহারই ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। যুগে যুগে মানুষ তাহার সাধনার

প্রারম্ভিক ভূমিকা

দ্বারা বর্তমান বিজ্ঞানকে উন্নতির চরম পর্যায়ে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। আর সেই বিজ্ঞানের প্রভাব জগৎ তথা জাগতিক মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ বিজ্ঞানের বলেই দূরকে নিকট করিয়াছে, পরকে আপন করিয়াছে এবং জীবনকে সহজ ও সুন্দর করিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্দৈব তাহাকে আজ আর সম্পূর্ণ পরাস্ত করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।

সহর কেন্দ্রিক প্রত্যেকটি মানুষ বিজ্ঞানের প্রভাবকে মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিতেছে। বিজ্ঞানের বলে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে এবং সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মাথার উপর রহিয়াছে বৈদ্যুতিক পাখা। প্রচণ্ড শীতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সে ঠাণ্ডা অনুভব করিতেছে না। বাড়ী হইতে বাহির হইবামাত্র তাহার পরিশ্রম লাঘবের জন্য রহিয়াছে নানা দ্রুত যানবাহন। ফলে দুই ঘণ্টার পথ মানুষ অর্ধঘণ্টায় পার হইতে পারিতেছে। রেলগাড়ী চাপিয়া সে অল্পসময়ের মধ্যে বহু দূরে পৌঁছাইতেছে। বিমান শূন্যমার্গে যাত্রী ও সংবাদ লইয়া শত শত মাইল পরিক্রমা করিতেছে, জলযান জলপথে ভারী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া দূর দূরান্তে যাতায়াত করিতেছে। টেলিগ্রাম মারফৎ বহুদূরের সংবাদ আমরা পাইয়া থাকি। বেতারও নানা খবরাখবর বিতরণ করে। ঘরে বসিয়া টেলিভিশনের মারফৎ কোন বাস্তব ঘটনা মানুষের দৃষ্টির সামনে প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। বন্যাবিধ্বস্ত ও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট অঞ্চলে তাড়াতাড়ি খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহেও আর্তদের কার্য সাধিত

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের দান

হইতেছে। দুরারোগ্য ব্যাধিও আজ বিজ্ঞানের কৃপায় আরোগ্য হইতেছে। নূতন নূতন চিকিৎসা পদ্ধতিও আজ আবিষ্কার হইয়াছে। স্ট্রেপ্টোমাইসিন্, পেনিসিলিন্, আলট্রাভাওলেটরে, এক্সরে, রেডিয়াম এবং রেডিয়াম চিকিৎসা জগতের অভূতপূর্ব আবিষ্কার। অন্ধকার দূর করিবার জন্য জ্বলসায়মান বৈদ্যুতিক আলোও বিজ্ঞানেরই প্রভাব। বিজ্ঞান প্রভাবে পরিশুদ্ধ পানীয় জল আমরা নিশ্চিন্তে পান করিতে পারিতেছি। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে আজ

আহরণের পথকেও আজ সুগম করিয়াছে বিজ্ঞান। পল্লীজীবনের ক্ষেত্রেও আজ বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ধীরে ধীরে পল্লীর মানুষও সহরবাসীদের মতই বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধালাভ করিতে পারিবে।

ভাবগত জীবনের উপরেও বিজ্ঞান প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিজ্ঞান কেন্দ্রিক শিক্ষা মানুষের জ্ঞানকে আরও প্রসার করিয়া দিতেছে। ইহারই ফলে মানুষ শিখিয়াছে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। জীবনকে তাই সে আজ সময়ের পরিমাপে কর্মময় করিয়া তুলিয়াছে। অলস মন্থরতা দূর করিয়া মানুষের মধ্যে সে আনিয়াছে কর্মোদ্যোমতা। তাহারই প্রেরণায় মানুষ একটি মুহূর্তকেও বিফলে যাইতে দিতে নারাজ। নানা প্রকার কুসংস্কারকে বিজ্ঞান আজ দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছে। তাহার ফলে মানবজীবনে ও সমাজে আসিয়াছে একটা পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা।

মানব জীবনে বিজ্ঞানের ভাবগত প্রভাব

বিজ্ঞানের একটি অকল্যাণকর দিকও আছে। একদিকে বিজ্ঞান যেমন জীবনে ও সমাজে সমুন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়াছে। অন্যদিকে তেমনি জীবন ও সমাজের মধ্যে কৃত্রিমতা আনিয়া দিয়াছে। ফলে সরল বিশ্বাসী মানুষ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছে। যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে নিষ্প্রাণ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে উহা স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোক কায়েমীস্বার্থে উহার অপব্যবহার করিতেছে। ইহাতেই জগতে সৃষ্টি হইয়াছে 'বঞ্চিত-সমাজ'। মানুষের বিরাট অংশ ঐ মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হইতেছে। এই যান্ত্রিক সভ্যতাই সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ধনীর হাতে পড়িয়া দরিদ্র সাধারণ মানুষ তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মানুষের অন্তরের মধ্যে অবিশ্বাস ও স্বার্থপরতার ফলেই আজ বিজ্ঞান ভুলপথে পরিচালিত হইতে চলিয়াছে। তাই বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ইহার একটি অকল্যাণকর দিকও আছে। মানুষ বিজ্ঞানের স্রষ্টা। মানুষের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের উপর বিজ্ঞানের সফলতা নির্ভর করে। তাই সর্বতোভাবে যাহাতে বিজ্ঞানের কল্যাণময়ী রূপটির বিকাশ ঘটে, তাহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উপসংহার

বুনিয়াদী শিক্ষা

সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিতের দেশে শিক্ষা-সচেতনতাবোধ অনেকেরই নাই বলিলেই চলে। বাস্তবে ইহা কিন্তু জাতিগত দুর্বলতা এবং শোচনীয় পরিণতির কারণ। বহুদিন পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকিবার দরুন আমাদের দেশে অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষার প্রসার হয় নাই। কিন্তু এখন স্বাধীনতালাভের পরে শিক্ষার উত্তরোত্তর উন্নতি বিধানের চিন্তা অনেকের মনেই আসিয়াছে। সেকারণে সহজসাধ্য উপায়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের গড়িয়া তুলিবার প্রশ্নও

আজ অনেকের মনে দেখা দিয়াছে। এইসব লক্ষ্য করিয়া এবং আর্থিক অগ্রসরতার কথা চিন্তা করিয়া মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তৃতির নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই দরিদ্র। শুধুমাত্র জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তিটা তাহার দরুন বড় হইয়া দেখা দেয় না। ব্যবহারিক জীবনের সহিত শিক্ষানুশীলনের সামঞ্জস্যপূর্বক জ্ঞান আহরণই হইবে সার্থক পন্থা। শুধু মাত্র ইস্কুল-কলেজে কিংবা কনভেন্টে

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

প্রেরণ করিয়া ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্পর্ক রহিত শিক্ষা এ যুগে বহু ছাত্রছাত্রীকেই অসার গ্রন্থকীটে পরিণত করিয়াছে। কৃষির সহিত শিল্পের দ্বন্দ্বে যখন শিল্পেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে তখন প্রকৃষ্ট শিল্পজ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। শুধু মাত্র তত্ত্বকথা গিলাইয়া সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের নিকট শিক্ষা বিভীষিকা উৎপাদনের দায়ভারও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের সাহায্যে দূর করা যায়। জাতির জনক গান্ধী সম্ভবতঃ এই দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলনের কথা বলিয়াছিলেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার মেয়াদ শিশুর সাত হইতে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত। এই আট বৎসরের শিক্ষা মেয়াদকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। প্রতিটি স্তরেই ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য ও গণিতকে অবশ্য পাঠ্য বিষয়ের মর্যাদা দেওয়া

বুনিয়াদী শিক্ষার রূপ ও গঠন

হইয়াছে। শুষ্ক পাঠ্য বিষয়কে সহজবোধ্য ভাষায় প্রণয়নের নিমিত্ত গ্রন্থকারদের নির্দেশ দেওয়া হইবে। ইহার পাশাপাশি চলিতে থাকিবে নানাবিধ শিল্পকলা ও দৈনন্দিনকার জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক সামগ্রী নির্মাণের চেষ্টা। হাতে-কলমে এইসব ব্যবহারিক জিনিস-পত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীকে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইবে। প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হইবে। খেলাধূলা ও ব্যায়াম করা অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মর্যাদা পাইবে। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমে চালু করিতে হইবে। বিভিন্ন হাতের কাজ যেমন—তাঁতশিল্প, সূচীশিল্প, অঙ্কন, চামড়ার জিনিস, কাঠের কাজ, বই বাঁধাই, খেলনা, দড়ি, পেরেক, বাসন প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী নির্মাণের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে হইবে। তাহাতে প্রামাণিক এবং ব্যবহারিক উভয় বিষয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা সমান দক্ষ হইয়া উঠিবে। অর্থনীতি শিক্ষার সহিত নাগরিক শিক্ষালাভ করিয়া যাহাতে এই স্বাধীন ভারতের ছেলেমেয়েরা চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে স্বাবলম্বী ও আত্মচেতন হইয়া উঠিতে পারে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

ইংরেজি শিক্ষার দৌলতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠই অতি বেশী পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া

উঠিয়াছে। ফলে নিজের দেশকে বিস্মৃত হইয়া সাগরপারের দেশের চিন্তাটাই তাহাদের নিকট প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনে দেশবাসীর সম্পর্কে স্বাজাত্যবোধ দৃঢ় হইবে। আর্থিক ও মানসিক উভয় দিক হইতেই জাতির মধ্যে সুস্থ সতেজতার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাস্তবজগতের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে বহু ব্যক্তিকেই সচেতন করিয়া তুলিবে। সর্বোপরি, দ্রুত শিল্পায়নের যুগে শৈশবেই অনেকের নিকট শিল্পোৎকর্ষিতার উপযোগিতা লাভের নিমিত্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইবে।

উপকারিতা

শুধু রাষ্ট্রনায়ক নন, শুধু জাতির জনক নন, সার্থক শিক্ষানুরাগী হিসাবেও মহাত্মা গান্ধী চিরস্মরণীয়—চিরবরণীয়। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি এই বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে জাকীর হোসেনের শিক্ষাপ্রণালী অর্থাৎ 'সার্জেন্ট স্কীম'-এ বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট জোরারোপ করা হইয়াছে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও আত্মানুশীলন, সুগভীর আত্মনির্ভরশীলতা, অটুট কর্মক্ষমতা এবং ব্যবহারিক নৈপুণ্যলাভের বীজ এই বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে সুকুমারমতি বালক-বালিকার চিত্তে রোপিত হইবে। জাতির প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্বাবলম্বন বোধ ফিরিয়া আসিবে। সঙ্গে সঙ্গে চলিবে অহিংসা, শান্তি, মৈত্রী, কল্যাণ ও প্রগতির আরাধনা। আমাদের দেশীয় সরকার এই সব দিকের কথা চিন্তা করিয়াই আলোচ্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আশা করা যায় একদিন না একদিন ইহার সুফল অবশ্যই লক্ষ্য করা যাইবে।

উপসংহার

সহশিক্ষা

এমন একদিন ছিল যখন নারীকে অবলা ও বুদ্ধিহীনা বলিয়া অন্দরমহলে বন্দিনী থাকিতে হইত। পরিচিতিতে নারী ছিল অসূর্যম্পশ্যা। আর সেই জন্যই পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকারের প্রশ্ন কাহারও মনে উদিত হইত না। পুরুষও সর্বান্তকরণে চাহিত নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে। বাল্য-বিবাহ, সতীদাহ প্রথার ন্যায় মনগড়া কুসংস্কারের বোঝা নারীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইত। ফলে নারীর পক্ষে এইরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করা কষ্টসাধ্য হইত। পরে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে নারী-পুরুষের সমান অধিকার পাইল। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলির ন্যায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারী যোগ্য মর্যাদা পাইল। উচ্চশিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা পুরুষের ন্যায় নারীর মনেও জাগিল। সম্ভবতঃ পূর্ব প্রস্তুতির অভাবে নারীর পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষালাভের উপযোগী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা দেখা দিল। একারণেই পুরুষের সহিত মিলিয়া

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মিশিয়া নারী সহশিক্ষালাভের সুযোগ পাইল। সহশিক্ষা কথাটির অর্থ হইতেছে, নারী-পুরুষের একত্রে শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা। জীবনের সর্বদিক হইতে যখন পুরুষের পাশাপাশি থাকিয়া নারী আপন কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিয়া সমাজস্থিতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তখন শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে শিক্ষালাভের প্রশ্ন তোলা বাতুলতা মাত্র। ববং উভয়ের মধ্যে মেলামেশার ফলে উভয়ের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা পরিপক্কতা লাভ করিতে পারে।

নারী পুরুষের সহিত একত্রে শিক্ষালাভ করার প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া দুই দল বিরুদ্ধ-বাদীর মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য উভয় দলীয়রাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নয় বছর পর্যন্ত সহশিক্ষা চালু করাকে সমর্থন কবিয়াছেন। তবুও সনাতন পন্থীদের মতে নারী আর পুরুষের বিদ্যাভ্যাসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমান নহে। পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নারী কোনক্রমেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। সৌকুমার্য, কোমলত্ব, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি গুণ নারীর ভূষণ। পুরুষের শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত নারীর শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে। নারী পুরুষের সহিত একত্রে শিক্ষালাভ করা তাই তাহাদের মতে অনুচিত। অন্য দল নবীনপন্থী। তাহাদের মতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে নারীও পুরুষের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে। সমাজস্থিতি বক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রায় সমান অবদান। সর্বোপরি নারী-পুরুষ উভয়েই সমাজের অঙ্গ বিশেষ। তাই একটি মাত্র অংশের উত্তরোত্তর উন্নতি বিধানের চেষ্টা সার্থক প্রয়াস নহে। ইহা ছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে যখন উভয়েরই সমানাধিকার স্বীকার পায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন ইহার অন্যথা হইবে।

সহশিক্ষা সম্পর্কে দুই দলের মতামত

উভয় মতটিকে বিচার করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহাতীত চিত্তে শেষোক্ত মতবাদটিকে সমর্থন করিতে হয়। সনাতন মতবাদীদের মধ্যে পশ্চাদ্‌প্রসারী মনোভাবের সমর্থন মেলে। সম্ভবতঃ ইহারাই একদিন নারীকে বন্দিনী যাপনে অভ্যস্ত দেখিয়া আত্মতৃপ্ত হইতেন। তাহা ছাড়া তাঁহারা যে অনুরাগের প্রশ্ন তুলিয়াছেন, উহারও কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই। সহশিক্ষার জন্য যদি অনুরাগের সৃষ্টি হয়, শৈশবেও উহা ঘটিতে পারে। সভ্যতার প্রগতিকে যিনি চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন, তিনি কখনও এরূপ যুক্তিহীন বক্তব্যকে সমর্থন জানাইবেন না। অন্যদিকে নবীনপন্থীদেব মতবাদকে সমর্থন করিয়াও একথা বলা যায়, নারী পুরুষের ন্যায় সর্ববিষয়ে সমানভাবে মনোনিবেশ করিতে পারে না। ইচ্ছা থাকিলেও ইহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য হইয়া ওঠে। স্থান সঙ্কুলান ও পৃথক ব্যবস্থার অভাবের দরুনই সহশিক্ষার উদ্ভব। নারী-পুরুষের মধ্যে সহশিক্ষার দরুন যদি অনুরাগের সৃষ্টি হয়, উহা যদি পরস্পরের সম্মান এবং সদিচ্ছার উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়,

দুই মতের সমালোচনা

তাহা হইলে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু ইহার বিপরীত পরিণতি অর্থাৎ অনুরাগের নাম করিয়া যদি নোংরামী, কুশ্রিতাপ্রসূত হীনমনোবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবে উহার বিরোধিতা না করিয়া পারা যায় না। শুধু শ্রী নয়, হ্রীও নারীর একটি সম্পদ। পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় যদি এই পরম সম্পদটি সে হারায়, তাহা হইলে দুঃখের আর তাহার শেষ থাকে না। পুরুষের কঠোরতা, নারীর কোমলতা; পুরুষের গতি, নারীর স্থিতি; পুরুষের শৌর্য, নারীর মাধুর্য—শিক্ষা যেন ইহার আনুকূল্য করে ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রাথমিক এবং উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে সহশিক্ষার রীতি আমাদের দেশে চালু হইয়াছে। উচ্চচিন্তা, উদার মনোভাব ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এ যুগের বুদ্ধিজীবীরা সহশিক্ষার প্রশ্নটি বিচার করিয়া দেখিতেছেন। অন্যান্য বহু দেশের ন্যায় উচ্চ মাধ্যমিক

বর্তমান সহশিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে সহশিক্ষার রীতি চালু হয় নাই। প্রয়োজন মিটাইবার মত পর্যাপ্তসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় বর্তমান থাকার দরুন উহার প্রয়োজনীয়তা তত বড় হইয়া দেখা যাইতেছে না। কিন্তু অর্থ নৈতিক সংকটের কথা চিন্তা করিয়া বহু সংখ্যক বালক-বালিকাদের উপযোগী কলেজ খোলা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই একই কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী এবং পুরুষের একত্রে শিক্ষালাভ করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষে সহশিক্ষার আদর্শ প্রবর্তনের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁহার 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করেন। হয়ত বা উহার সুফলের কথা চিন্তা করিয়া চিন্তাশীল অভিভাবকদের মধ্যে বর্তমানে খুব কমই আছেন, যাঁহারা আজ সহশিক্ষার বিরোধিতা করেন।

অতীত ভারতের সনাতন আদর্শের অনুসরণে নারীজাতির যোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া বাঞ্ছনীয় ঘটনা। ইহার বিরোধী মনোভাব অবশ্য ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন কবিই দেখাইয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা সঙ্কীর্ণ মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সেদিন নারীজাতি সম্পর্কে উচ্চ চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এ যুগের কবি ঋষি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মর্মে

উপসংহার

মর্মে পুরুষের পাশে নারীর অবস্থিতির কথাই চিন্তা করিয়াছেন। তাই তিনি তাঁহার 'রক্তকরবী' নাটকের আলোচনা করিতে গিয়া যথার্থই বলিয়াছেন—"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা' হলেই তাঁর সৃষ্টিকৃত যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্টি যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।" নারী আর পুরুষ—একই বিধাতা পুরুষের সৃষ্ট দুই বিচিত্র রূপ। একক বাদ দিয়া অপরের বিকাশ অসম্পূর্ণ। এ কারণেই সহশিক্ষার তাৎপর্য অপরিসীম।

সর্বোদয় ও ভূদান আন্দোলন

ভূদান শব্দের অর্থ জমিবণ্টন। কিন্তু শুধু জমিবণ্টনই এই ভূদান বা সর্বোদয় আন্দোলনের চরম আদর্শ নহে। ইহার সার্থক উদ্দেশ্য হইল সমাজকে শ্রেণীহীন, শোষণহীন করিয়া তোলা এবং অহিংসা প্রতিষ্ঠা করা। এই চিন্তাধারার ভিত্তিতেই ভূদান-যজ্ঞ বা

প্রারম্ভিক ভূমিকা

সর্বোদয় আন্দোলনের সূচনা হয় হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গেনায় আচার্য বিনোবা ভাবের নেতৃত্বে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আচার্য ভাবে এই আন্দোলন সুরু করেন। হায়দ্রাবাদের শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডীর নিকট হইতে তিনি একশত একর জমি পাইয়া তাহা হায়দ্রাবাদের সর্বহারা শ্রেণীর আশীটি পরিবারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূদান-যজ্ঞ বা সর্বোদয় আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল।

ভূমিহীনকে ভূমিদান ও মাটির সঙ্গে তাহাদের নিকট সম্পর্ক স্থাপনও এই সর্বোদয় বা ভূদান আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। ভারতের অর্থনীতি ভূমির উপর অশ্রেয় করিয়াআছে। এক কথায়—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। তাই অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি ভূদান আন্দোলনের সার্থক লক্ষ্য ভূমিদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধনহে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য আরও ব্যাপক। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা

আন্দোলনের ভিত্তিভূমি

আনয়ন ও উন্নতি বিধান করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং অহিংস পথেই তার সমাধান সম্ভব। ভারতে ভূমিই হইল সমাজ উন্নয়নের আসল বস্তু। তাই সর্বাগ্রে চাই ভূমি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তাহাও আবার অহিংসার দ্বারা। ভারতের ভূমি সংস্কার আইনেরদ্বারা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনের দ্বারা ভূমির উন্নয়ন করার কথা ভারত সরকার চিন্তা করিয়াছেন। কিন্তু ভাবেজী ইহার সমর্থন করেন না। তিনি আইন বা বল প্রয়োগের বিরোধী। তাঁহার মতে জমিদার থাকিবে এবং তাহার হাতে জমিও থাকিবে। কেবল তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমিদার দান করিয়া দিবেন। তাহার মধ্যে সকলেরই অবস্থান সমাজের নিকট বাঞ্ছনীয়।

আচার্য বিনোবা ভাবের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ কোটি একর জমি পাঁচ লক্ষ গ্রামের প্রতিটি পরিবারের মধ্যে পাঁচ একর করিয়া জমি বণ্টন করিয়া দিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'ভূদান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়া

আন্দোলনের অগ্রগতি

জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যেই 'ভূদান সমিতি' গত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কয়েক লক্ষ একর জমি সংগ্রহ করিয়া তাহা কৃষকদের মধ্যে বণ্টনও করিয়া দেয়। এই আন্দোলনে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ পরিবার উপকৃত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করিয়াছেন।

ইহাকে সফল করিবার জন্য কোন কোন রাজ্যসরকার 'ভূদান সমিতির' ভূমিবণ্টনে সহযোগিতা করিয়াছেন।

ভূদান আন্দোলনে ভূমিহীন কৃষকদেরই সহায়তা করে। তাই ভূদান আন্দোলন মানুষের মনে সাম্য সদিচ্ছা ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টার একটি সুন্দর মনোবৃত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছে।

ইহার তাৎপর্য

ভূদান আন্দোলনের পরিকল্পনার আরও চারিটি উদ্দেশ্য আছে। তাহা হইল—'শ্রমদান', 'সম্পত্তিদান', 'বুদ্ধিদান' ও 'জীবনদান'। সুতরাং ইহা বিশ্বপ্রেমের আদর্শে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে ও প্রেরণা যোগায়।

এই ভূদান আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রগঠনের সহায়ক হইয়া উঠিবে। কারণ সমাজের মধ্যে সমবায়মূলক ভিত্তি রচনাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য লইয়াই

আন্দোলনের সুফল

এই আন্দোলন সূচিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে কৃষি মজুরদের হাতে কিছু জমি যাইবে ও তাহার দ্বারা তাহারা উপকৃত হইবে। ফলে, তাহাদের জীবনযাত্রামানেরও কিছু পরিবর্তন হইতে পারে। নৈতিক দিক দিয়াও তাহারা অনেকটা মার্জিত হইতে পারিবে।

সর্বদিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থা ভূমিহীন কৃষকদের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করিতে পারিবে না। এই ভূদান আন্দোলন সমবায়ের

উপসংহার

ভিত্তিতে জমি চাষ না করাইতে পারিলে চাষী অথবা চাষের কোন উন্নতি হইবে না। তাহার জন্য চাই আদর্শ ত্রুটিহীন পরিকল্পনা। তাহা না করিতে পারিলে ভূদান আন্দোলনের সার্থকতা থাকিবে না। মোটকথা সমগ্রভাবে বিচার করিলে এই আন্দোলনে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি না হইতে পারে কিন্তু যে অগণিত মানুষ ভূমিহীন হওয়ায় যাযাবরের মত জীবন যাপন করিতেছে—অসহ্য দারিদ্র্য যাহাদের জীবনকে নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদের জন্য এই আন্দোলন মানবতার দিক দিয়া সার্থক।

পৌরকর্তব্য

সমষ্টি বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যক্তির বিকাশ অসম্ভব। সমষ্টির মাঝে ব্যক্তি আপনাকে প্রকাশিত করেন। তাই একক সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সহিত ব্যক্তি রাষ্ট্রের অপরাপর ব্যক্তিদেরও সুখ-সুবিধা বিধানের চিন্তা করেন। কবি তাই বলিয়াছেন—'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' নিজ নিজ স্বাধীন সত্তার বিকাশ

প্রারম্ভিক ভূমিকা

সম্ভাব্য ঘটনা। ইহার সহিত অপরের চিন্তা-কর্মের সাযুজ্যতা বিধানও একান্ত প্রয়োজন। তাই ব্যক্তির স্বকীয় ব্যক্তিত্বকে সমষ্টির সহিত জড়িত করিয়া ভাবা উচিত। দেখিতে হইবে যে, উহার সহিত যেন অপরেরও উপকার সাধিত হয়। ইহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পৌরবৃত্তি নিরূপণ করা হয়। পৌরবৃত্তি হইল

নগর কিংবা রাষ্ট্রে বাস করিয়া রাষ্ট্রগত ও সমাজগত মঙ্গলের জন্য চিন্তা করা। এই চিন্তার মূলে একাধারে অধিকারবোধ ও অন্যদিকে কর্তব্যবোধ জড়িত থাকে।

ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র না রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি এই প্রশ্ন দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া নানা বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিতর্কের মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা। সমষ্টির তাড়নাতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। এই কারণে ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পৌরকর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতাবোধ। সমস্যা ভারাক্রান্ত যুগের কুফলের ফলে অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, রোগ-শোক, মহামারী প্রভৃতিতে বিভিন্ন দেশ ভরিয়া গিয়াছে। মানবসমাজের দুর্গতির মূলে এই কারণগুলি চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে। এই গুলিকে সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ সহজসাধ্য নহে। ইহাদের ক্রমে ক্রমে অপসারিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে যাহা প্রয়োজন তাহা হইল দায়িত্ববোধপ্রসূত বিভিন্ন পৌরজনদের সচেতন করিয়া তোলা।

পৌরকর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সচেতনতাবোধ

জাতীয়তাবোধ, সংযম-নিষ্ঠা, ত্যাগ প্রভৃতি গুণগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া তোলাও প্রয়োজন। এ যুগের পৌরজনদের সচেনতা শুধু আপন আপন অধিকার কিংবা দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সজাগ থাকিলে চলিবে না, উহার সহিত প্রয়োজন রাষ্ট্রের পরিচালকদের রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কে দোষ ত্রুটী সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকা। কারণ, এ যুগে ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রশ্ন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই, নিজ দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার সহিত কতটুকু দেশরক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিধানের দিকেও সমআগ্রহী উহার দিকেও নজর রাখার প্রয়োজন। কারণ, ইহার মাধ্যমেই পৌরজনের যথার্থ সচেতনতাবোধের পরিচয় ফুটিয়া ওঠে।

এ যুগের রাষ্ট্র নাগরিকদের কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দেয়। ধর্মাচরণ, বৃত্তিনির্বাচন, শিক্ষা, রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসরণ, স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, জীবনরক্ষা, সুবিচারলাভ প্রভৃতি তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি সুযোগ সুবিধা। কিন্তু ইহার বিনিময়ে নাগরিককে কতগুলি কর্তব্যপালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নাগরিক যে কোন বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। নাগরিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নিয়মিত কর দেয়। সর্বদিক হইতে নাগরিক রাষ্ট্রের উৎকর্ষ ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য চেষ্টিত হয়। ইহার সহিত ব্যক্তির তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টির তাড়নাও মিলিয়া থাকে। কিন্তু উহাই সব নহে।

পৌরকর্তব্যের বিষয়

অশিক্ষার দূরীকরণ, জনকল্যাণ, দুস্থ ও নিরন্নদের সাহায্য, পল্লী সংস্কার, প্রতিবেশীর সহিত হৃদ্যতা স্থাপন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর্তব্যপালনের অপরিহার্য দায়িত্ব থাকে নাগরিকদের। শুধু মাত্র মনেপ্রাণে নহে, প্রত্যক্ষ কর্মানুশীলনের মাধ্যমে দায়িত্ববান নাগরিক রাষ্ট্রের সেবা করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নিজ রাষ্ট্রকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য আইন-শৃঙ্খলাও মানিয়া

চলিতে হয়। যুদ্ধের সময় দেশরক্ষা, দেশের আর্থিক-প্রগতির উন্নতির জন্য আদর্শ নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে সম-চেতনাবোধ। নিরক্ষদের সংখ্যাধিক্যের জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ শিক্ষিতদের কর্তব্য হইতেছে নিজের সহিত অপরকেও পৌরকর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করান।

অতীত আমাদের দেশে পৌরকর্তব্যের সমুন্নত বিকাশ দেখা গিয়াছিল। তাই মানুষের মাঝে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া মানবসেবার মহতী আদর্শ অনেকেই মানিয়া চলিত। এজন্য পৌরকর্তব্যের অপরদিক হইল জনসেবা। যুদ্ধ, কালোবাজার, লোভ, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতায় অন্ধ মানবমন আজ সঙ্কীর্ণ ও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। উহাকে অপসারিত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত সততা ও ন্যায়পরায়ণতার মহত্বর বিকাশ প্রয়োজন। আর সে কারণেই নাগরিকদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত থাকাই বাঞ্ছনীয়। উহাকে জয়যুক্ত করিবার অর্থ ই হইতেছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ডাকিয়া আনা। প্রীতি, সৌহার্দ ও মৈত্রীর বন্ধনে এক নাগরিক অপর নাগরিককে বাঁধিতে পারিলেই আরও সুউন্নত আদর্শের আশ্রয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সফলতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

উপসংহার

কুমারী হিমা চ্যাটার্জী

স্বাধীন ভারতে জনসংখ্যা-সমস্যা

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এদেশের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের। আজ অন্ন-বস্ত্র সমস্যা মানুষের নিত্য সহচর। উপযুক্ত খাদ্যাভাবে মানুষ দিন দিন জীবনীশক্তি হারাইয়া রুগ্ন ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। দারিদ্র্য মানুষকে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় আবার আদম সুমারী (১৯৫১-৬১) হিসাব অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ভারতের মত দরিদ্র দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজদেহে নানারূপ সমস্যা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতে শতকরা প্রায় পচাত্তর জন লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই কৃষিব্যবস্থাও আজ অবনতির শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। তাই প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া দেশের খাদ্যাভাব মিটাইতে হইতেছে। বর্তমান দেশে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের তেমন প্রসারলাভ করে নাই। তাহার ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কৃষিব্যবস্থার উপর দারুন চাপ সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে যেমন জমির উৎপাদন কম হইতেছে অন্যদিকে তেমন জনসংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। সেইজন্য অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কোন প্রতিকার করতে পারিতেছে না।

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার কারণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ ধনবিজ্ঞানী ম্যালথাস খাদ্যদ্রব্যের সহিত

জনসংখ্যার সম্বন্ধ বিষয়ক একটি মতবাদ প্রচার করেন। তাহার মতবাদে বলা হইয়াছে যে নসংখ্যা বৃদ্ধি যে ভাবে হইয়া থাকে, খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন সেই অনুপাতে না হইলে দেশ ম দারিদ্র্য ও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। তাঁহার মতে জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে র্ধি হয় (Geometric Progression) অর্থাৎ, ১, ২, ৪, ৮, ১৬ এইভাবে এবং খাদ্যদ্রব্য পাটীগণিতিক হারে বৃদ্ধি হয় (Arithmetical Progression) অর্থাৎ, ১, ২, ৪, ৬, ৮, এইভাবে। এইরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণতর হইয়া দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব ঘটে।

ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব

যুরোপীয় দেশগুলিতে ম্যালথাসের তত্ত্ব অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ, যুরোপীয় দেশগুলি কৃষি ও শিল্পে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষাবাদের দ্বারা তাহাদের সামগ্রিক উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু ভারতের মত দরিদ্র দেশে ম্যালথাসের তত্ত্ব এখনও পর্যন্ত ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত করিবার উপায় নাই।

যুরোপে ম্যালথাসের তত্ত্ব

আমাদের দেশে ম্যালথাসের জনসংখ্যাধিক্যের আরও দুইটি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইল ভারতে জন্ম ও মৃত্যুর হার সমান। শিক্ষাহীনতার দরুন আমাদের দেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রচলন করা এক দুরূহ ব্যাপার। সেই কারণে জন্মের হারও যেমন অত্যধিক, মৃত্যুর হারও তেমন অস্বাভাবিক। ইহা ব্যতীত উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অনেক লোক রোগে আক্রান্ত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের পথে অন্তরায়

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহাকে কাম্য জনসংখ্যা বা Optimum Population বলা হয়। এই কাম্য-জনসংখ্যাতত্ত্ব প্রচার করেন অধ্যাপক ক্যানন্। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে আমাদের দেশ কাম্যজনসংখ্যাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কারণ উৎপাদনের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক সভ্য দেশ এই কাম্যজনসংখ্যা স্তরে অবস্থান করিতেছে। আবার কোন কোন দেশে উৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক কম পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্ব

দেশের উৎপাদন ব্যাপারে একটু যত্নবান হইতে পারিলে আমাদের জনসংখ্যা সমস্যার প্রতিকার করা মোটেই কষ্টকর নয়। ভারতের কৃষিব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। তাহার উপর অনেক জমি অনাবাদী হইয়া পড়িয়া আছে। আমাদের দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারও তেমন হয় নাই। অথচ আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদও যথেষ্ট পরিমাণে

রহিয়াছে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিলে অনেক লোক বেকারীর হাত হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারিবে।

প্রতিকারের উপায়

ফলে দেশের জাতীয় সম্পদও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইবে। রাষ্ট্রকে উন্নত পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বাড়াইবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অবশ্যই দেশের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে দেশে ধনতান্ত্রিক কুফলতা দেখা দিবে। সেইজন্য সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যদি উৎপাদিত জিনিস বণ্টিত না হয়, তাহা হইলে সমাজের অধিকাংশ জনগণের মঙ্গল সাধিত হইবে না। দেশের বৃহত্তর অংশ 'যেই তিমিরে সেই তিমিরেই' থাকিয়া যাইবে এবং মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণী সমাজের উপর প্রভুত্ব করিবে। ফলে সাধারণ মানুষ নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া সমাজকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইবে।

উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিলে আমাদের দেশে জনসংখ্যাসমস্যা বিদূরিত হইবে। দেশ তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অভিশাপরূপে না দেখিয়া সমাজের উপর আশীর্বাদরূপেই দেখিবে। ভারতের সেই জনশক্তি তখন পৃথিবীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

উপসংহার

পরীক্ষার পূর্বরাত্রি

পাশ ফেল পরিক্ষার্থীর জীবনে অবিসংবাদিত ঘটনা। উহাকে অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। তাই ছাত্র-জীবনে পরীক্ষা-প্রস্তুতির ইচ্ছা স্বাভাবিক প্রেরণা। কিন্তু কার্যকালে এই প্রস্তুতির কথা বিস্মৃত হইয়া শুধুমাত্র নৈরাশ্যকে আকড়াইয়া রাখিলে কোন পরীক্ষার্থীর পক্ষেই সাফল্যলাভ করা সম্ভব নয়। অথচ সাফল্য লাভ ব্যতিরেকে সম্ভাব্য উন্নতি উপস্থিত হইতে পারে না। তাই প্রস্তুতিগত অক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাসের শিথিলতা পরীক্ষার পূর্বদিন পরীক্ষার্থীর মনে এক ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি করে। পাশ না ফেল—এই চিন্তায় পরিক্ষার্থীর অন্তর্জগত নিরন্তর আলোড়িত হইয়া ওঠে। সেজন্য ছাত্রজীবনে পরীক্ষার পূর্বদিনের রাত্রিটি যেন এক যন্ত্রণা-দায়ক অস্বস্তি বহন করিয়া আনে। কি হইবে, কি করিব, কোন্ প্রশ্নটা পরীক্ষায় আসিতে পারে—বারবারই মনে এই প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

অনেক দিনের আকুল প্রতীক্ষার পর ছাত্রজীবনে এক একটি পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়। ছাত্র যথার্থ কতটুকু শিখিয়াছে তাহা জানিবার জন্যই পরীক্ষা নেওয়া হয়। সারা বছর ক্লাশ করিয়া, শিক্ষকদের আলোচনা শুনিয়া যে ছাত্র একটি বছর কাটাইয়াছে, তাহার

নিকট পরীক্ষা কেনই বা এত ভয়াবহরূপ লইয়া আসে, তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। এ বিস্ময় ছাত্রদের দুর্বল মনের জন্য হয়। জীবনে বহু রকম পরীক্ষা দিতে হয়। ইস্কুল জীবনের পরীক্ষা তাহারই সূচনা। তাই তাহার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বাসের দৃঢ়তা, স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধিবৃত্তির স্পষ্টতা, উপস্থাপনার চটুলতা আর চিন্তাশক্তির প্রখরতাই পরীক্ষা পাশের অন্যতম অবলম্বন। এইগুলির যথার্থ বিচারের পক্ষে পরীক্ষার পূর্বদিনের রাত্রিটি যথেষ্ট তাৎপর্য বহিয়াছে। প্রস্তুতির সফলতা নিরূপণের পক্ষে পরীক্ষার পূর্বদিন রাত্রি যেন একটা মস্তবড় আশীর্বাদ। চিন্তাবৃত্তির অহরহ সচলতা পরীক্ষার্থীর মনে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আনিয়া দেয়।

এই দিনটির তাৎপর্য

বাস্তবে কিন্তু পরীক্ষার পূর্বদিনের রাত্রিটি ছাত্রদের কাছে আরও ভিন্ন অবস্থা লইয়া আসে। ইংরেজির প্রস্তুতির কথা চিন্তা করিতে একে একে বাঙলা, অঙ্ক, ইতিহাস, সংস্কৃত প্রভৃতির চিন্তা জাগিয়া ওঠে। বারবারই ছাত্রদের মনে হয় প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ। খারাপ ছাত্ররা ভাবে পরীক্ষায় এবার পাশ করিতে পারিব না। ভাল ছাত্ররা ভাবে পরীক্ষায় এবার ভাল ফল দেখাইতে পারিব না। অঙ্কে দুর্বল ছাত্র বারবারই অঙ্কে ফেল করিবার কথা চিন্তা করে। শিক্ষকদের সারা বৎসরের উপদেশ একদিনেই একটির পর একটি করিয়া জাগিয়া ওঠে। তখন মাথা থাকে ঘুরিতে চিন্তা যায় সব গুলাইয়া। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতি সম্পর্কে মনে জাগিয়া ওঠে সংশয়।

বাস্তব ব্যবস্থা

এইরূপ বাস্তব অবস্থা সৃষ্টির মূলে অস্থির ভাব-ভাবনা বর্তমান। তাই এইরূপ বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্ন অবস্থাকে কোনক্রমেই মনোরাজ্যে স্থান দিতে নাই। শান্ত, ধীর, স্থিরভাবে ও অবিচলচিত্তে এই দিন ছাত্রদের চিন্তা করা উচিত। সব কিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা পরীক্ষাকে দুরধিগম্য বলিয়া মনে করে—তাহারাই এই দিনটিকে বিপজ্জনক চিন্তা করে। তাই সকল পরীক্ষার্থীর অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষার পূর্বদিনের রাত্রিটি অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়।

কারণ ও উপায়

আমাদের দেশে পরীক্ষার উপর এতটা জোর দেওয়া হয় যে, সমস্ত বছর পড়াশুনা করা হোক আর নাই হোক—পরীক্ষার আগে কিছুদিন ছাত্রসমাজে সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। আর সেই প্রস্তুতির শেষ মহড়া হয় পরীক্ষার পূর্ব দিন রাত্রে। যাহারা দুর্বল, ভীরু এবং আত্মবিশ্বাসহীন তাহারাই পরীক্ষার পূর্বদিনের রাত্রিটাকে বিভীষিকাপ্রদ বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে উহা অসার চিন্তা মাত্র। মানুষ যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। ছাত্ররাও মনুষ্য-পদবাচ্য। সুতরাং যুক্তি-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে সমগ্র বিষয়টি তাহাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। ইহাই হইবে পরীক্ষার পূর্বদিনের রাত্রিকে সহজভাবে গ্রহণ করিবার একমাত্র উপায়।

উপসংহার

গ্রামোন্নয়ন

বাঙলা গ্রাম প্রধান দেশ। গ্রামের উন্নতিতেই যথার্থ উন্নতি এবং তাহার অবনতিতেই ইহার অবনতি। আজ বাঙলার গ্রাম অবনতির শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে। একদিন বাঙলার গ্রামগুলিতে শান্তি বিরাজ করিত। আজ সেই গ্রামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বাঙলার শান্তিময় পল্লীগ্রাম আজ আর নাই। বাঙলার গ্রামের মাঠে মাঠে ধান হইত, গোয়ালভরা গরু থাকিত, নদীতে, পুকুরে মাছের প্রাচুর্য ছিল, গ্রামবাসিগণ সুখে স্বচ্ছন্দে খাইয়া পরিয়া নিশ্চিন্তে গ্রামে বাস করিত। তখন বার মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই ছিল। সেদিন বাঙলার প্রত্যেকটি গ্রাম আমোদ-উৎসবের একটা আকর্ষণের বস্তু ছিল।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বাঙলার নগর সভ্যতা দেখা দিল। সেই সঙ্গে দেখা দিল চাকরির মোহ। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই তুইটি জিনিসের আমদানি হইল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশের চেহারাও বদলাইয়া গেল। ইংরেজি শিখিলে চাকরি পাওয়া যাইবে এবং চাকরি পাওয়া গেলে ভালভাবে নাগরিক জীবন যাপন করা যাইবে। নাগরিক জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ ছিল—পরিশ্রম না করিয়াই আরামবহুল জীবনযাপন করার সুবিধাটুকু। এই মোহই বাঙলার গ্রাম-জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা গ্রাম-জীবনের শান্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা আসলে এমন কিছু মন্দ জিনিস নয় কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে ইহা গ্রাম্য-জীবনের শান্তি নষ্ট করিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা একটি বিলাসবহুল জীবনযাত্রার স্বপ্ন দেখিয়াছি। সেইজন্য ঐ প্রকার ইংরেজি জীবনযাত্রার স্বপ্ন আমাদের ক্ষতিই করিয়াছে। কিন্তু এই কথা আমরা বুঝিতে পারি না যে, বাঙলার মাটিতে সহস্র বৎসরেরও বিলাতী জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। আমরা কৃষিজীবী, মাটিই আমাদের প্রাণ।

গ্রামের বর্তমান অধঃপতন

নানা কারণে আজ পল্লীগ্রাম হতশ্রী হইয়া গিয়াছে; প্রথমে পল্লীবাসীদের মধ্যে সহরমুখী হইবার একটা প্রবল বাসনা দেখা দিয়াছে। তাহারা পল্লীগ্রামে যে সব অসুবিধা অনুভব করেন তাহা এড়াইবার জন্য তাঁহারা সহরে ছুটিতেছেন। আজ তাঁহারা নগরমুখী হওয়ায় পল্লীগ্রামের নানা অসুবিধা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। উপকরণ-প্রিয়তা ও শ্রমবিমুখতা পল্লীবাসীদের অন্যতম ত্রুটি। পল্লীগ্রামে থাকিয়া পল্লীবাসীরা যদি সমবেতভাবে চেষ্টা করেন, তবে গ্রামের অনেক অসুবিধাই দূর করিতে পারেন। অবশ্য সহরের মত সকল রকমের স্বাচ্ছন্দ্য পল্লীগ্রামে

সহরমুখী নীতি

সম্ভব হইবে না ; কাজেই পল্লীগ্রামের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে, বিলাস বাহুল্যের কথা ভাবিলে চলিবে না। বিলাসের বাসনা কমাইতে পারিলে সহরের আকর্ষণ কমিয়া আসিবে। আজকাল বাঙালী নগরজীবনের অসুবিধা কিছুটা অনুভব করিতেছেন। সহরের ব্যয়বহুল জীবনযাত্রায় অনেকেই আজ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

বর্তমানে গ্রামের সার্থক উন্নতির জন্য আমাদেব ভাবিবার দিন আসিয়াছে। আজ পল্লীবাসীরা অত্যন্ত দুঃখে কালযাপন করেন। তাঁহাদেব মনের ঘন অন্ধকার শিক্ষার আলোকে দূরীভূত করিতে হইবে। বালক-বালিকাদের জন্য গ্রামে আরও বিদ্যায়তন খুলিতে হইবে। পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য গ্রামে বড় পুষ্করিণী ও অনেকগুলি কারিয়া নলকূপ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ছেলে-মেয়েরা যাহাতে রীতিমত ব্যায়াম ও খেলাধূলা কবিয়া শরীরের উন্নতিবিধান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাত্রাগান, কবিগান, কথকতা প্রভৃতি পুনরায় চালু করা দরকার। এই সমস্ত কবিতে পারিলেই গ্রামের উন্নতি সম্ভব। অবশ্য এই সকল বিষয়ে সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন

গ্রামের চাষীরা যাহাতে চাষ-আবাদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেসব কৃষকের আপন জমি নাই তাহাদিগকে জমিদান, উপযুক্ত বীজ সরবরাহ ও অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। চাষীদের অধিকাংশই ঋণভারগ্রস্ত। পল্লীগ্রামের মহাজনেরা চাষীদের মোটা সুদে টাকা ধার দেয়। আর এইসব ঋণের দায়ে চাষীদেব ভিটামাটি পর্যন্ত বিক্রয় করিতে হয়। চাষীদের প্রয়োজন মত বিনা সুদে ধার দেওয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে সমবায় কৃষি-ঋণদান সমিতির প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

কৃষকদের প্রতি লক্ষ্য

এখন হয়ত আর প্রাচীন দিনের শান্তিময় গ্রাম অচিরে দেখা দিবে না। কারণ, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। তবুও যতই আমরা শিল্পকেন্দ্রিক হই না কেন, দেশের প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইতে দিলে চলিবে না। গ্রামের উন্নতি ব্যতীত বাঙালীর উন্নতিই যে সম্ভব নয়, একথা আমাদিগকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। গ্রামবাসীদের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য বোধ করি অজ্ঞতা ও অশিক্ষা। আমাদের প্রধান কর্তব্য গ্রামবাসীদের সাধারণভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা। একদিন এই ভারতের তপোবন ও গ্রামাঞ্চল হইতেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি রূপলাভ করিয়াছিল। গ্রামের প্রাণকেন্দ্র যাহাতে শুষ্ক হইয়া না যায় সেদিকে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উপসংহার

নাগরিকজীবন ও পল্লীজীবন

সাধারণতঃ দেখিতে গেলে পল্লীবাসিগণের অনেকেই সরল প্রকৃতির লোক ; সেই কারণে শিক্ষিত-সমাজের আধুনিক সভ্যতার তুলনায় পল্লীবাসী কিছু অসভ্য। পল্লীবাসী স্থানবিশেষে বেশভূষার পারিপাট্য করিতে পারেন না, লোকবিশেষের সহিত আলাপ করিবার পদ্ধতি জানেন না, আহারে-বিহারে কৃত্রিমতার পরিচয় প্রধান করিতে অনভিজ্ঞ ; সেই কারণে বোধ হয়, পল্লীবাসী নগরবাসীর নিকট সময়ে সময়ে 'অসভ্য' বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকেন। নগরবাসী বেশভূষায়, আহার বিহারে, আচার-ব্যবহারে, স্থান ও পাত্রভেদে যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইভাবে আচরণ করিতে পারেন ; সেই কারণে বোধ হয়, তাঁহারা সভ্য ও উন্নত।

প্রকৃতি

নগরবাসিগণ সাধারণতঃ পরিশ্রমী ও কর্মশীল। পল্লীবাসিগণের ন্যায় তাঁহারা আলস্যে কালাতিপাত করেন না। তাঁহারা প্রায়ই কোন-না কোন কর্মে লিপ্ত থাকেন। ইহার কারণও সহজে অনুমান করা যায়। পল্লীগ্রামে অন্নচিন্তা বিরল। জমিতে যে ধান ও অন্যান্য শস্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহাতে কোন প্রকারে সারা বৎসরের খাদ্যের সংস্থান হইয়া থাকে। যাহাতে আহারের সংস্থান হয়, পল্লীবাসিগণ প্রথমে সেই চেষ্টা করেন। সুতরাং যে সময় ধান ও অন্যান্য শস্যাদি বপন ও রোপন করিতে হয়, সেই সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁহাদিগের অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের হৃদয়ে উচ্চাশার নিতান্ত অভাব, সেই কারণে আলস্যের সমধিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের অবস্থা কিন্তু এরূপ নহে। সেখানে প্রত্যহ পরিশ্রম না করিলে সাধারণ লোকের দৈনিক আহারেরও সংস্থান হওয়া দুরূহ ব্যাপার। সেইজন্য সকলেই স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী সুবিধামত কর্মে নিযুক্ত থাকেন। উচ্চাশা নাগরিক-জীবনের একটি প্রধান বিশেষত্ব। যাহাতে স্বীয় অবস্থার উন্নতি হয়, সকলেই তাহার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করেন। এই কারণে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ভদ্র, কি অভদ্র সকলেরই কোন-না-কোন কর্মে লিপ্ত থাকিতে হয়।

আলস্য ও শ্রমশীলতা

নগরবাসী নিত্য নূতন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অনুকরণশীল হন। ব্যবসায়োপলক্ষে নগরে নানা প্রদেশের নানাবিধ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। নগরবাসিগণ প্রায়ই তাহাদের বেশভূষা, আচার-ব্যবহারাদির অনুকরণ করেন। অধিকন্তু আধুনিক উদার পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার যথেষ্ট প্রচার-নিবন্ধন নগরবাসীর হৃদয় কুসংস্কারপূর্ণ নহে। সুতরাং অপরের সহিত তুলনা করিয়া স্বীয় আচার-ব্যবহারের কোন অপ্রয়োজনীয়তা বা অপকারিতা দেখিলে তাহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করেন। পল্লীবাসীরা কিন্তু ইহার বিপরীত-ভাবাপন্ন। তাঁহারা অতিশয় রক্ষণশীল। তাঁহারা প্রাচীন আচারাদির কিছুমাত্র পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক

অনুকরণপ্রিয়তা ও উদার মনোভাব

নন। অধিকাংশ পল্লীবাসীর হৃদয়ে ভূয়োদর্শন ও উচ্চশিক্ষার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়।

নগরবাসী নানাবিধ লোকের সহিত বাস করিলেও তাহাদের সকলের সঙ্গে পরস্পরের পরিচিত নহে। পল্লীগ্রামের লোকেরা যেমন গ্রামস্থ সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় থাকে, নগরে সেরূপ নহে। নগরে অনেকস্থলে প্রতিবেশীর সহিত ভালরূপ পরিচয়ই থাকে না, এরূপ আলাপ-পরিচয়হীনতায় উপকার ও অপকার দুই-ই আছে। ঘনিষ্ঠতা-

প্রতিবেশী

হেতু পল্লীগ্রামে প্রতিবাসিগণের নিকট যেমন সহানুভূতি এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া যায়, নগরে সেরূপ আশা নাই বটে, কিন্তু পরিচয়াভাবের জন্য নগরবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির আধিক্য প্রায় দেখা যায় না। দলাদলি, মামলা-মোকদ্দমা, পরনিন্দা-পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা, দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি দোষ পল্লীজীবনে অধিকতর পরিমাণে দেখা যায়।

নগরে কেহ কাহারও উপর আধিপত্য প্রকাশের সুবিধা পান না; অধিক কি, আপন-আপন অধিকার মধ্যেও সকলে অযথা প্রভুত্ব বিস্তারের সুবিধা পান না। পল্লীগ্রামে

আধিপত্য ও শাসন

জমিদারবাবু প্রজাশাসনে, পণ্ডিতমহাশয় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা-প্রদানে, ব্রাহ্মণঠাকুর জাত্যভিমান প্রদর্শনে, মণ্ডলমহাশয় শাসনবাক্য প্রয়োগে যেরূপ সুবিধা পান, শহরে সেরূপ সুবিধা একেবারে নাই।

আজকাল অধিকাংশ পল্লী অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান। জলনিকাশের ভালরূপ ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এবং পরিষ্কৃত পানীয়জলের অভাবে কলেরা

স্বাস্থ্য

বসন্ত প্রভৃতি নানা রোগের প্রাদুর্ভাব পল্লীগ্রামে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। সুপেয় জল ও সুচিকিৎসকের অভাবে এ সমস্ত রোগ পল্লীগ্রামে সুখে রাজত্ব করিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সহিত আবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির আবির্ভাব হওয়াতে এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অধিকাংশ পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা বেশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে।

পল্লীগ্রাম এইরূপ কতকগুলি দোষে কলঙ্কিত হইলেও এখানে নানারকমের মনোহর ও প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইয়া চিত্তের তুষ্টিসাধন করে। নগরে যানবাহনাদির বিকট শব্দে, লোকের কোলাহলে, নানারূপ প্রলোভনে চিত্তবৃত্তি সর্বদা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামের গভীর নিস্তব্ধতা মনকে প্রত্যেক কার্যে একাগ্র হইবার সুযোগ প্রদান

প্রাকৃতিক দৃশ্য

করে। পল্লীগ্রামে প্রশস্ত রাজপথ অথবা বৃহৎ অট্টালিকা নাই বটে, কিন্তু যদি গ্রীষ্মকালে বিবিধ ফলপরিপূর্ণ ও নবপল্লবাচ্ছাদিত উপবন দর্শন করিতে চাও, বর্ষা ও শরৎকালে শ্যামলক্ষেত্র অথবা হেমন্তকালে শস্যসম্ভারপূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তিসাধন করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি বসন্তকালে বিহঙ্গকুলের সুমধুর সঙ্গীতে কর্ণকুহর শীতল করিবার ইচ্ছা হয়, অথবা পল্লীবাসিগণের আড়ম্বরহীন সরল

মধুর ব্যবহারে আপ্যায়িত হইবার বাসনা জন্মে, তাহা হইলে পল্লীগ্রামেই গমন কর। নগরে এই সকল দৃশ্য দেখিতে পাইবে না। স্থানে স্থানে পল্লীগ্রামে মুক্ত বায়ুতে, সরোবরের নির্মল সলিলে, প্রকৃতির নীরব মাধুর্য বিশেষ নূতনত্ব দেখিতে পাইবে।

গ্রামের হাট

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০]

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সভ্যতা ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আয়তন, লোকবসতি পরিবহন ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার দিক হইতে কোন গ্রামই স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

তাই শহরের মত গ্রামে প্রতিদিন বাজার বসে না। সপ্তাহে একদিন কি দুই দিন গ্রামে হাট বসে। এই হাট শহরের বিভিন্ন বাজারের মত নহে। তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর প্রয়োজন ইহার মাধ্যমে নির্বাহ হয়। যত প্রকার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই হাটের দিনে গ্রাম্যবাসীরা কিনিতে পায়। একাধারে ক্রেতার ভীড় অন্যদিকে বিক্রেতার জিনিস বিক্রয়েচ তাগিদ হাটে পরিলক্ষিত হয়।

দশ-বারটি গ্রামের অধিবাসীদের প্রয়োজনে একটিমাত্র গ্রামের অভ্যন্তরে হাট বসে। নদীরতীরে কিংবা জনবহুল রাজপথের নিকটেই হাটের স্থান নির্ধারিত হয়। গ্রাম্য চিকিৎসক, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, মনোহারী ও ষ্টেশনারী দোকান, মহাজন, মুচি প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিচিত্র বৃত্তিসম্পন্নদের দোকান, ডাক্তারখানা সব কিছুই এই হাটের নিকটেই রহিয়াছে। সামাজিক গ্রাম্য-মানুষ বহুদূরের গ্রামের মানুষের সহিত এইদিন দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সুখ-দুঃখের আলাপ-আলোচনা করে। জিনিস-পত্রের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি হইবার জন্য অনেকে চিন্তা প্রকাশ করে। কেহ বা বলে, "ব্রিটিশ শাসনেই আমাদের দেশ ভাল ছিল।" আবার কেহ বা বলে, সরকার সব মানুষের তো সমান সুখ-সুবিধা করিয়া দিতে পারে না। কেহ বা অতীতের স্বর্ণোজ্জ্বল অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া আড়াই টাকা মণের চালের উল্লেখ করে। এমনি সব ঘটনা প্রতিটি হাটেই ঘটে।

গ্রাম্য হাটের বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য

গ্রামের অধিকাংশ লোকই সহজসরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাই তাহারা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে না। এমনকি প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করিবার সুযোগও তাহারা পায় না। হাটের কল্যাণে অনেকেই সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ লাভ করে। কে হারিল, কে জিতিল—এই চিন্তা কাহারও মনে আলোড়নের সৃষ্টি করে না। দরিদ্র নিপীড়িত গ্রামবাসীরা চড়া সুদে মহাজনদের কাছে ঋণ নেয়। তাই মহাজনেরা বহু নোট, সিকি, আধুলি, পয়সা প্রভৃতি সাজাইয়া লইয়া বসে।

হাটবারের দিন গ্রামের রাস্তাঘাট গ্রামবাসীদের সোরগোলে মুখরিত হইয়া ওঠে। চাল,

ডাল, তেল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী। কাপড়, গামছা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসন-কোসনের ন্যায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সবকিছুই এই হাটে পাওয়া যায়। কৃষক, জেলে গোয়ালা প্রভৃতিরা উপযুক্ত মূল্যে জিনিসপত্রের বিক্রয়ের মত সুযোগ এই হাটের মাধ্যমেই পায়। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজনিজ অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস এই হাট হইতেই কিনিয়া লইয়া যায়। নির্দিষ্ট হাট দিনে বসে। হাটের মূলতত্ত্বই হইল বেচাকেনা। তাই এখানে নানা লোক নানা প্রয়োজনে জড়ো হয়।

গ্রাম্য হাটের গুরুত্ব

কিন্তু এই বেচাকেনার মধ্যে নানা তর্ক-বিতর্ক, নানা দরাদরি এবং জিনিসপত্র পরখ করিয়া দেখার প্রয়োজন ঘটে। প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। দরাদরির অন্ত নাই। হাটের বেচাকেনায় কাহার বা ক্ষতি কাহারও বা লাভ হয়। দিনের কোলাহল থামিয়া গেলে যে যার ঘরে ফিরিয়া যায়।

গ্রামের হাট ক্ষণকালের জন্য গ্রামবাসীর মনে বিচিত্রাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির সুযোগ আনিয়া দেয় এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করে। হাটের বেচা-কেনার মুহূর্তগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। গ্রামবাসীর মনে কর্মচাঞ্চল্য জাগে। আবার নিশীথের অন্ধকার ঘনীভূত হইলে হাটের বুকে নামে অনন্ত নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে দল হারানো পাখীর কাতর স্বর শোনা যায়। গ্রাম্য হাটের সচলতা কবি মনে বিশ্বহাটের কল্পনা আনিয়া দেয়। ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এক একটি অধ্যায় যেন হাটের রূপের সহিত মিলিয়া যায়। শহরে সভ্যতার আকর্ষণে বহু গ্রামবাসীই আজ শহরে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা এখনও গ্রামে রহিয়াছে তাহাদের পূর্ণ পরিচয় লইবার পক্ষে গ্রাম্য হাটগুলির মূল্য অনেক।

উপসংহার

একটি প্রদর্শনী

'প্রদর্শনী বস্তুটি পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রদর্শনী বলিয়া কিছু ছিল না। নানা মেলা উপলক্ষ করিয়া দেশের বিভিন্ন সময়ে দেশের কৃষিজ ও শিল্পজ দ্রব্যাদির একটা সমবেত প্রদর্শনী হইত। ইহাতে কৃষি-শিল্প বিষয়ক জ্ঞান ও পারস্পরিক আলোচনা অপেক্ষা বাণিজ্যের প্রতিই বেশী লক্ষ্য করা হইত। ইউরোপ দেশটি সত্যই বৈজ্ঞানিক দেশ। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সব কাজই ইউরোপের লোক চায়; অনুমান ও অদৃষ্টবাদ ছাড়িয়া তাহারা তথ্য ও পুরুষাকারের উপরই বেশী নির্ভর করে। তাহারা কোন বস্তুর উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি বিচার না করিয়া তাহাদের কার্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় না করিয়া কোন কাজ করিতে চায় না। তাঁহাদের সেই বিজ্ঞানসম্মত কার্যপদ্ধতি হইতেই প্রদর্শনীর উৎপত্তি।

প্রদর্শনীর উৎপত্তি

যে কোন প্রদর্শনীতে আমরা কি দেখি? ধরা যাক, একটা কৃষি প্রদর্শনীতে কি দেখা

যায় ? বিভিন্ন স্থানের কৃষিজাত দ্রব্য এক স্থানে জড়ো করা হইয়াছে ; বিভিন্ন আকৃতির দ্রব্য তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে। তাহাদের আবার ভাল, মন্দ, মাঝারি প্রভৃতি প্রকার-ভেদ আছে। এইভাবে তুলনামূলক পদ্ধতিতে সাজানোর ফলে মনে স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা জাগে একই প্রকার শস্য বিভিন্ন হয় কেন ? বিভিন্ন স্থানের মাটি, জলবায়ু এক নহে বলিয়াই বিভিন্নতা। ইহার পর আবার প্রশ্ন জাগিবে, কোন্ মাটি কিরূপ, কিরূপ জলবায়ু এই প্রকার ফসলের উপযোগী, সে স্থানে এইরূপ মাটি বা জলবায়ু কৃত্রিম উপায়ে করা যায় কিনা, মাটির কিরূপ তেজস্বিতা থাকিলে সেইরূপ হইতে পারে, মাটির সেই শক্তি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা যায় কিনা। কোন্ ঋতুতে, কি মাটিতে, কত সার দিয়া ফসল লাগাইলে কি পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিলে লক্ষ্য মত ফসল উৎপাদন করা যাইবে ইত্যাদি নানা জিজ্ঞাসা ও তাহাদের উত্তর প্রদর্শনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর কোন্ দেশে কোন্ কোন্ ফসল বেশী ও উৎকৃষ্টভাবে জন্মে, কোন্ ফসলের চাষ করা লাভজনক ইত্যাদি নানা কৃষি-বাণিজ্যজাত প্রশ্নের উদয় ও মীমাংসা হয়। তখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করার সুবিধা হয় এবং কৃষি-বাণিজ্যের নানা উন্নততর উপায় আবিষ্কৃত হয়।

প্রদর্শনীর উপাদান

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কৃষি-বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য নানা বিষয়ক প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন জীব বা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি বিকাশ ও অগ্রগতির সম্বন্ধে আলোচনা করা। কিন্তু তাছাড়া ইহার অন্য একটি প্রধান উদ্দেশ্যও আছে। লোকশিক্ষার ইহা অন্যতম প্রধান উপায়। নিরক্ষর ব্যক্তিও যে কোন প্রদর্শনী দেখিলে—প্রদর্শনীর বস্তুগুলির উৎপত্তি, বিকাশ, উন্নতির বিষয় বুঝাইবার লোক থাকিলে, যে কোন বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয় ও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সে বিষয়ে কাজ করিবার মত জ্ঞান জন্মে। মূর্তি, চিত্র ও বাক্য মানুষের মনে অসীম আধিপত্য বিস্তার করে। প্রদর্শনীর মধ্যে মূর্তি ও চিত্রের সাহায্যে এবং প্রকৃত বস্তুর সাহায্যে যে সরাসরি শিক্ষা মানুষ লাভ করে তাহা সে সহজে ভুলিয়া যাইতে পারে না।

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য

লোকশিক্ষার সঙ্গে প্রচারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রদর্শনী দেখিয়া যেমন লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, তেমনি লোকমতও গঠিত হয়। কোন একটি বস্তু বা শিল্প মতবাদের প্রতি লোকের অনুকূল মত গঠন করার জন্য প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য খুবই বেশী ; তাহাতে রাজনৈতিক বক্তাগণ দৃষ্টান্তের বক্তব্য প্রমাণিত করিবার সুযোগ পান, তাহাতে লোকচিত্তের উপর অধিকার ও প্রভাব বাড়ে। স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর দ্বারা জনস্বাস্থ্যের অবস্থা, রোগের উৎপত্তির ও বিস্তারের কারণ, রোগের প্রতিকারের উপায় ইত্যাদি নানা বিষয় চিত্র, বক্তৃতা ও প্রচারপত্রের দ্বারা জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে লোক অনেক উপকৃত

হয় এবং দেশে রোগের বিস্তার কমে, লোকে রোগনিবারণ করিতে শিখে,মৃত্যু-সংখ্যা কমে, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

সাম্রাজ্য-ব্যাপী ও পৃথিবী-ব্যাপী প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য পৃথিবীর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা ও প্রচার; প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ বণিকবৃত্তির ইচ্ছাও ইহার মধ্যে নিহিত থাকে। তাই দেখা যায়, প্রদর্শনীর প্রয়োজন আধুনিক যুগে অত্যন্ত বেশী। ভারতে যত বেশী সার্থক প্রদর্শনী হয় ততই মঙ্গল।

উপসংহার

বিতর্কসভা

[প্রাক্ ৰবি. ১৯৬২]

পাশ্চাত্ত্যকবি লর্ড এভেবরী সত্যই বলিয়া গিয়াছেন—'জগতের অর্ধেক কলহই ভুল বোঝাবুঝি হইতে। তুমি আমাকে একভাবে একটা কথা বলিলে আমি অন্যভাবে নিলাম। তুমি আমাকে ঠাট্টা করিয়া একটা কথা বলিলে আমি সেটা গম্ভীর ভাবে নিলাম।" এইভাবেই দুনিয়ার অর্ধেক ঝগড়া-বিবাদের উৎপত্তি। বাস্তবিক এবিপুল দুনিয়ায় মানুষে মানুষে যত ভুল বোঝাবুঝি—যত মন ভাঙ্গা-ভাঙ্গি সব কিছুর মূলেই কথা বলিতে না পারা।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি আইনজীবীরা কথা বেচে খায়। যে যত বড় ব্যারিষ্টার, তার তত কথার কারসাজী। ভাল আইন জেনেও কথার কারসাজি না জানলে আইন ব্যবসায় পশার জমানো যায় না। শুধু আইনজীবীই নন শিক্ষক, ব্যবসাদার, রাজনীতিক সবাই কথা বেচে খায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কি সবাইকে কম-বেশী কথা বলিতে হয়? অতএব কথা বলার ধরনটা সবারই আয়ত্ত করা দরকার। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, আমরা একটি লোককে মোটেই চটাইতে চাই না। কিন্তু আমাদের কথা বলার ভঙ্গীতে তিনি একেবারে চটিয়া লাল। যুক্তি যাহাই হোক না কেন, সর্বদা সতর্ক হইয়া কথা বলিতে হয়। কথা সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারিলে দুনিয়ার অনেক ঝঞ্ঝাট হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ভালভাবে কথা বলিতে পারিলে জীবনে সফলতা লাভও করা যাইতে পারে। কিভাবে কথা বলিতে শিক্ষা করা যায় তাহা আয়ত্ত করিতে মাঝে মাঝে তর্ক জুড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু এই তর্ক যাহাতে মন কষাকষি বা ঝগড়া বিবাদে পরিণত না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে রাখা দরকার তর্কের মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তর্কে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

কথাই মূল

এজন্য চাই মাঝে মাঝে বিতর্কসভায় যোগ দেওয়া। বিতর্কসভায় একটা বিষয়-বস্তু নির্দিষ্ট থাকে। দুই দিকে দুইদল বিতর্কসভায় যোগদান করে। সভায় একজন সভাপতি থাকেন। কাহার বক্তৃতা ভাল হইয়াছে, শ্রোতাদের মন্তব্য শুনিয়া

সভাপতিই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেককে তাহার বক্তব্য হাজির করিতে হয়। প্রথমতঃ একজন প্রস্তাব বা বিষয়-বস্তুর পক্ষে আলোচনা

বিতর্ক সভা

সুরু করেন। তিনিই হইতেছেন সেই মতবাদের দলপতি। তারপর উঠে বিপক্ষ দলের দলপতি। এই দলপতিগণ অন্যান্য বক্তাদের চেয়ে অধিক সময় পাইয়া থাকেন। একবার এই দলের কেহ—আর একবার অন্য দলের কেহ বিতর্কে যোগ দেন। এইভাবে চলিতে থাকে উত্তর প্রত্যুত্তর। দলে প্রত্যেকের বলা হইয়া গেলে বিষয়টির পক্ষে বা বিপক্ষে একটি সামগ্রিক বক্তব্য শ্রোতাদের সম্মুখে হাজির করা হয়। সকলের শেষে বিপক্ষ দলের সমালোচনার জবাব দিবার সুযোগ পান প্রস্তাব পক্ষের দলপতি।

তারপর শ্রোতাদের মত নেওয়া সুরু হয়। স্বভাবত যুক্তি, তর্ক ও বাকপটুতার দ্বারা যে দল শ্রোতাদের মন জয় করিতে পারে সে দলই জিতিয়া থাকে। এইভাবে ভোটদান সমাপন হইয়া গেলে বিতর্কের বিষয়-বস্তুটির উপর সভাপতি আলোকপাত করিয়া থাকেন। বিতর্ককালীন কেহ কাহারও উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কাহারও বিরুদ্ধে কোন অশোভন উক্তি করিতে পারেন না। বিতর্ক-সভায় কথাবার্তা সবসময়ই সভাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়। শ্রোতারা বিপক্ষদলের লোকদিগকে কখনই কোন কথা বলিতে পারেন না। কেহ যদি সভার নীতি মানিয়া না চলে তবে তাহাকে সভায় বলিতে না দেওয়া যাইতে পারে।

সুস্পষ্ট উচ্চারণ, যুক্তিপূর্ণভাবে বলা, নির্দোষ রসিকতা করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি হইতেছে বিতর্ককারীর গুণ। অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তব্য বিষয় বলাও তাহার

গুণাগুণ

অন্যতম গুণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই বিতর্ক সভায় বক্তৃতা দিতে শিক্ষা করিয়াই লোকে আইনসভা বা পার্লামেণ্টে ভাল ভাল বক্তৃতা দিয়া থাকে। প্লাটফর্ম লেকচারও এখান হইতেই তৈয়ারী হয়। রাজনীতি, ধর্মনীতি বা অর্থনীতি বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন যুক্তি-তর্ক ব্যতীত একপা-ও চলিবার উপায় নাই। তোমার মতবাদ ঠিক প্রমাণ করিতে হইলে অপরের মতবাদ যে ভুল তাহা যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে। তোমার মতবাদ যে অভ্রান্ত তাহা প্রমাণ না করা পর্যন্ত কেহ উহা মানিয়া লইবে না।

ছাত্রাবস্থা হইতে মানুষ নানাভাবে নানা বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে শিক্ষা করে। বিভিন্ন ছাত্র-সমস্যাগুলি বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করে বলিয়া সমস্যাটি চারিদিক

উপসংহার

হইতে বেশ ভালভাবে বুঝিতে পারা যায়। এইভাবে নানা সমস্যার সহিত ছাত্রাবস্থা হইতে পরিচিত থাকায় বিতর্কসভায় বাগ্‌বিন্যাস কৌশল ভালভাবে শিক্ষা করিয়া উত্তরকালে কর্মজীবনে তাহারা নানা ভাবেই সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।

বাঙলার নদ-নদী

মানবসভ্যতা নদীমাতৃক। নব্যপ্রস্তর যুগ অতিক্রম করিয়া তাম্রযুগে উপনীত হইয়া গুহাবাসী অরণ্যচারী মানব কৃষির উপযোগী উর্বর জমি, তৃষ্ণার জল এবং শত্রুর আক্রমণে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ লাভের জন্য নদীকূলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মানবসভ্যতার সেই ঊষালগ্নেই নীলনদের কূলে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রীস-ইউফ্রেতিস নদীকূলে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর তীরে চৈনিক সভ্যতা এবং সিন্ধুনদীতীরে সিন্ধু-সভ্যতার এক বিস্ময়কর বিকাশ ঘটিয়াছিল।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বাঙলাদেশও নদীমাতৃক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'নদীজপমালাধৃত প্রান্তর।' বাঙলাদেশের সৃষ্টি ও পুষ্টির মূলে রহিয়াছে ইহার অগণিত নদ-নদী। নদীর পলিমাটি দিয়া গঠিত বলিয়াই বাঙলাদেশের ভূমি এত কোমল, নরম ও উর্বরা—এত সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, আবেগ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ, ভাবালু বাঙালীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের মূলেও রহিয়াছে বাঙলার নদ-নদীগুলির অনস্বীকার্য প্রভাব। বাঙলীর শিল্প বাণিজ্য, সাহিত্য-সঙ্গীত ও সংস্কৃতি সভ্যতার সহিত বাঙলার নদ-নদীগুলির সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। এককথায়—বাঙলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাঙলার ছোটোবড়ো অসংখ্য নদ-নদী।

নদ-নদীর পরিচয়

বোধকরি, বাঙলাদেশের নদ-নদীগুলির মত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের নদ-নদীগুলির নাম এত ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও মধুর নয়। কাব্য-রসিক বাঙালীর নদ-নদীগুলির নামকরণের মধ্যেও রসবোধের পরিচয় সুপরিস্ফুট। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, গঙ্গা, পদ্মা, ভাগীরথী, সরস্বতী, মহানন্দা, সুরমা, করতোয়া আত্রাই, পুনর্ভবা ত্রিস্রোতা বা তিস্তা, ইছামতী, জলঙ্গী, কপোতাক্ষ, চূর্ণী, শিলাই, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা কংসাবতী, মধুমতী, দামোদর অজয়, কৌশিকী প্রভৃতির নাম বাঙালী রসবোধেরই পরিচায়ক।

বাঙলাদেশের প্রধান দুইটি নদ-নদী ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা এবং ইহাদেরই শাখানদী উপ-নদীগুলিতে বাঙলাদেশের বিস্তৃত ভূভাগ বিধৌত, পলিসমৃদ্ধ ও শস্যশ্যামলা। ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের মানসসরোবর হইতে উৎসারিত হইয়া আসামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙলায় আসিয়া দ্বিধাবিভক্ত—একটি ধারা ব্রহ্মপুত্র নামে এবং অপর ধারাটি যমুনা নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্র পূর্বপাকিস্তানের ভৈরববাজারের সন্নিকটে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। গঙ্গা হিমালয়ের গঙ্গোত্রী গুহামুখ হইতে বাহির হইয়া উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মালদহ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। ভগবানগোলার নিকট গঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া একভাগ দক্ষিণমুখী

হইয়া প্রথমে ভাগীরথী পরে হুগলী নদী নামে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে এবং অন্যধারা পদ্মানামে পূর্বমুখে বহিয়া গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের শাখাধারা যমুনার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। ভাগীরথীকে ত্যাগ করিয়া গঙ্গার অবরুদ্ধ স্রোত সৃষ্টি করিয়াছে ভৈরব, ইছামতী, কাঁসাই, গড়াই, মধুমতী। পশ্চিমবাঙলার রাঢ় অঞ্চলের নদ-নদীর মধ্যে ময়ুরাক্ষী দামোদর, রূপনারায়ণ বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া বীরভূম বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আছে শিলাবতী, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীগুলি। মাথাভাঙ্গা, পিয়ালী, মাতলা, ইছামতী চব্বিশপরগণার উল্লেখযোগ্য নদী।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙলাদেশের নদ-নদীগুলির প্রভাব অপরিসীম। কৃষি-বাঙলার শস্যসম্ভার এই নদ-নদীগুলিরই অকৃপণ দান। সুদূর অতীতে বাঙালী বণিকের পণ্যবাহী নৃত্যপর সপ্তডিঙ্গা এইসব নদীর উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে নীলাম্বু সমুদ্র পাড়ি দিয়া সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে উপনীত হইত, পণ্যবিনিময় করিয়া ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ বাঙালী বণিক প্রত্যাবর্তন করিত বাঙলায়—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' আজ সেই অতিক্রান্ত অতীতের স্মৃতিবহ কথা। অধুনা বিশীর্ণ আর একদা সমৃদ্ধ সরস্বতী নদীর তীরে ছিল ইতিহাসপ্রখ্যাত সপ্তগ্রাম বন্দর। মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজারের সমৃদ্ধির মাত্র অনতিকাল অতীতের ইতিহাস।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে নদ-নদীর প্রভাব

বাঙলাকাব্যের উন্মেষপর্ব চর্যাপদ হইতেই বাঙলাসাহিত্যে নদ-নদীর প্রভাব সুস্পষ্ট। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের চন্দ্রধর, ধনপতি, শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা এবং সতী বেহুলার ভেলাযাত্রার সহিত বাঙলার নদ-নদীগুলির গৌরবময় পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রকাব্যে একটি বিরাট পর্বের পটভূমিকা, বরং নায়িকা হইতেছে পদ্মানদী। "বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা—আমার যথার্থ বাহন।" রবীন্দ্রনাথের বহু ছোটগল্প ও গদ্যলেখায় পদ্মা অবিচ্ছেদ্য। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরিক্ত, আধুনিক পর্বের পদ্মা, কোপবতী, চলনবিল, পদ্মানদীর মাঝি, পদ্মা প্রমত্তা নদী, তিতাস একটি নদীর নাম, কালিন্দী, মহানন্দা, ইছামতী, কর্ণফুলি, গঙ্গা, দক্ষিণের বিল প্রভৃতি উপন্যাসগুলির নাম নিঃসংশয়ে নদীকেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রয়াস-বাহুল্যের পরিচায়ক। শুধু সাহিত্যই নয়, বাঙলা সঙ্গীতেও—ভাটিয়ালি গান, মাঝিমাল্লার গান, এমনকি, বাউল সঙ্গীতেও নদ-নদীর প্রভাব অনতিক্রম্য।

বাঙলার নদ-নদীগুলির সেই পূর্ব গৌরব আজ আর নাই। বারংবার গতি পরিবর্তনের ফলে বহু নদী মজিয়া গিয়াছে। গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে যমুনা, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, জলঙ্গী, ইছামতী প্রভৃতি নদীগুলি মজিয়া গিয়াছে। পিয়ালী, বিদ্যাধরী নদী বিশুষ্কপ্রায়,

অতীতের সমৃদ্ধ সরস্বতী আজ বিশীর্ণা ভাগীরথীর উৎপত্তিমুখে চড়া পড়ায় ইহার স্রোত কমিয়া আসিয়াছে। দামোদবের গতিপথ আজ অনুসন্ধানের বিষয়। বিস্তার গতি পরিবর্তনের ফলে করোতোয়া, আত্রাই ও পুনর্ভবা নদীর স্রোত মন্দীভূত হইয়াছে। নদীর খেয়ালী গতি পরিবর্তন এবং নদী মজিয়া যাওয়ার ফলে বন্যায় জনপদসমৃদ্ধ অঞ্চল প্লাবিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং জলের অভাবে শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চল শস্যহীন উষর অঞ্চলে পরিণত হইতেছে। তাই নদীগুলির সংস্কার জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। বিদেশী শাসনে ইহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে দেশের জাতীয় সরকার আমেরিকার টেনেসী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়ণের অনুরূপ বিভিন্ন নদ-নদী পরিকল্পনা রূপায়ণের অগ্রসর হইয়াছেন। অধুনা ভারতসবকার দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা ও নদী-পরিকল্পনা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টায় ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কার্যকরী হইয়াছে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তব সীমান্তে গঙ্গানদীর উপর আরও একটি বাঁধ পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাগুলির ফলে দামোদব উপত্যকা বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জলসেচের ফলে বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া সোনার ফসল ফলিবে এবং জলবিদ্যুৎশক্তি দ্বারা বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থান শিল্পোন্নয়নের উন্নতি ঘটিবে। কৃষি-শিল্পে, স্বাস্থ্য ও সম্পদে বাঙলাদেশে এক স্বর্ণোজ্জ্বল নবযুগ দেখা দিবে।

সুপ্রাচীনকাল হইতেই নদীমেখলা বাঙলাদেশেব লোক নদীকে ভালবাসিয়াছে, পূজা দিয়াছে এবং ভয়ও করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপনীত হইয়া বাঙলী নদীকে বিজ্ঞানের অভিষেকে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিল। ইহাতে বাঙালীব নদীপ্রীতি হ্রাস পাইবে না বরং বাঙালী বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে বাঙলার প্রাকৃতিক সম্পদ নদীর অন্তর্নিহিত অফুরন্ত শক্তি ও অকৃপণ দান প্রত্যক্ষ করিবে—মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবে বাঙালীর সভ্যতা ও সম্পদ একান্তভাবেই নদীনির্ভর।

উপসংহার

মেট্রিক পদ্ধতির ওজন

দশমিক মুদ্রার প্রচলন দ্বারা হিসাবপত্র রাখার ব্যাপারে অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই ব্যবস্থা আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এখন আমরা মূল্যের ক্ষেত্রে দশমিক মুদ্রার হিসাব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি। বর্তমানে পয়সার হিসাব করিতে এখন আর তালিকা দেখিতে হয় না। সেই কারণে মূল্যমানের সহিত সমতা রক্ষা করিবার জন্য মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই মেট্রিক পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে চালু হইয়া গেলে দশমিক মুদ্রা প্রবর্তনের সাথকতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাইবে। সেই উদ্দেশেই ভারত

প্রারম্ভিক ভূমিকা

সরকার দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন।

ভারতে প্রচলিত ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি অসংখ্য রকমের। এক একটি জিনিস এক একটি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়। যেমন চাউল প্রভৃতি পণ্যের ওজন হয় মণ সের ছটাকের ভিত্তিতে। আবার চা কফি প্রভৃতির ওজন করা হয় পাউণ্ডের হিসাবে। এই মণ সেরেরও আবার জেলা ভেদে বিভিন্ন প্রকারের হিসাব হইয়া থাকে। সাধারণতঃ

উদ্দেশ্য

৮০ তোলায় এক সের হয়। কিন্তু কোন কোন জেলায় ইহার ওজন ৮২ তোলায় আবার অনেক জেলায় ৮৪ হইতে ৮৬ তোলা পর্যন্ত এক সের হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া তৈল ইত্যাদির ওজনের ব্যাপারেও মণ-সের-পোয়া প্রচলিত। কিন্তু অনেক সময় ইহার বাটখারার মাপের সঙ্গে সমতা রক্ষিত হয় না। আবার দৈর্ঘ্য পরিমাপ হয় হাত-বিঘৎ বা গজ-ফুটের ভিত্তিতে। তাই ওজন ও মাপের জটিলতা দূর করিবার জন্য সব ওজনের মধ্যে একটা 'মান' নির্ধারণ করা দরকার। একই রাষ্ট্রের মধ্যে স্থান ভেদে ওজন ও মাপের এই পার্থক্যও দূর করা প্রয়োজন। এই সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া ভারত সরকার আমাদের দেশে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন।

মেট্রিক পদ্ধতির কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও আছে। তাহা হইল, প্রথমত

এই ব্যবস্থায় সুবিধা

মূল্যমানের মানের সহিত সমতা রক্ষিত হইয়া হিসাব নিকাশ অনেক সহজতর হইবে। দ্বিতীয়ত এই ওজন ও মাপের পদ্ধতি একবার আয়ত্ত হইলে আমাদের কাজ কর্ম পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ ও ত্বরান্বিত হইবে। তৃতীয়ত এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ওজন এবং মাপ প্রভৃতির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই হিসাবের নিয়ম একটিই মাত্র। দেশের বর্তমান ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে এই সুবিধা নাই। তাহা ছাড়া বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারেও মেট্রিক পদ্ধতি সুবিধা দান করিবে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই দশমিক পদ্ধতি চালু থাকার দরুন ব্যবসা বাণিজ্যে লেনদেনের ব্যাপার সহজতর হইয়া যাইবে।

এই পদ্ধতিতে ওজনের ব্যাপারে কিলোগ্রাম, পরিমাণ-পরিমাপের ব্যাপারে লিটার ও দৈর্ঘ্য ইত্যাদি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মিটার ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে দৈনন্দিন লেন-দেন কার্যের জন্য গ্রাম, কিলোগ্রাম ও কুইণ্টাল এই তিনটির সহিত ওজনের জন্য পরিচিত

নূতন পদ্ধতি

হইতে হইবে। পরিমাণ ও দৈর্ঘ্যের পরিমাপের জন্য সেন্টিমিটার, মিটার কিলোমিটার ও লিটার এই চারিটির সহিত পরিচিত হইতে হইবে। প্রাত্যহিক কাজকর্মের সঙ্গে এই সাতটির সম্পর্ক থাকিবে। এই সাতটির সহিত ভাল ভাবে পরিচিত হইতে পারিলে আর কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। ১৯৫৬ সালে লোকসভা ওজন ও মাপের মান আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও

১৯৫৮ সালে এক আইন দ্বারা মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলন করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় পূর্বেকার ওজনের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া নূতন নামকরণ করা হইয়াছে। মেট্রিক পদ্ধতির ওজনের বাটখারাগুলি অন্যান্য প্রচলিত বাটখারা হইতে স্বতন্ত্র আকারে রূপ দান করা হইয়াছে। যাহাতে ইহা চিনিতে কোনরূপ অসুবিধায় না পড়িতে হয়, সেইজন্য বাটখারাগুলির আকার ছয় কোণ বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটিতে বিশেষ ওজনের ভিত্তিতে ছাপ মারাও হইয়াছে।

উপসংহার

মেট্রিক পদ্ধতি বা দশমিক ওজন ও পরিমাপ আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ও লেন-দেনের ব্যাপারে অনেক সুবিধা দান করিবে। আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইহার সমতা রক্ষা করিবে। ইহার দ্বারা জনসাধারণ আর অসৎ ব্যবসায়ীদের হাতে প্রতারিত হইবে না। তাই এই মেট্রিক বা দশমিক ওজন পদ্ধতি অভিনন্দন যোগ্য।

মহাভারতের একটি প্রধান চরিত্র

[কর্ণ]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মহাভারতের যে কয়টি প্রধান চরিত্র আমাদের মনোরাজ্যে স্থায়ী আসনলাভ করে তাহার মধ্যে কর্ণের চরিত্রই শ্রেষ্ঠ। দানবীর বা মহারথী কর্ণের খ্যাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, পৌরুষে এবং শক্তিমত্ততায় কর্ণ চরিত্র স্বকায় মহিমায় উজ্জ্বল। কর্ণের জীবন এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের জীবন। মানবীয় মহিমায় তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁহার জীবন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এক দৈবনিগৃহীত পূর্ণশক্তিধর মহাপুরুষের জীবন। তাই মহাভারত মহাকাব্যে কর্ণ-চরিত্র দানে, শৌর্যে-বীর্যে, আত্মবিশ্বাসে, স্নেহ-মমতায়, দোষে-গুণে এক বিশিষ্ট চরিত্র।

কর্ণ-চরিত্রের বিশিষ্ট দিক

মহাভারতের অন্যান্য চরিত্রে যেমন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব বা দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি চরিত্র এমন এক একটি বিশেষ গুণের বা দোষের অধিকারী যাহা অস্থিমজ্জায় গড়া মানুষ হইতে তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া লইলে কাহাকেও বা দেব পর্যায়ে উন্নীত করে আবার কাহাকেও বা নীচতার শেষ স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়া পিশাচে পরিণত করে। কর্ণ-চরিত্র পূর্ণ মানবের চরিত্র। কিন্তু দৈবের প্রভাবে পড়িয়া তাঁহাকে প্রতি ক্ষেত্রেই নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তথাপিও সে আপনার উপর বিশ্বাস হারায় নাই। সর্বাবস্থায় সে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই কারণেই তাঁহার চরিত্র বিশিষ্টতার দাবী রাখে। একের পর এক ঘটনাবর্তে পড়িয়া তাঁর চরিত্র বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। কর্ণের জন্মের পরই মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দৈবের বিধানেই

তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সূত অধিরথের গৃহে সে লালিত পালিত হইয়া নিজেকে সূতপুত্র ও রাধেয় নন্দন বলিয়া জানিয়াছে। ফলে সূতপুত্র বলিয়া কর্ণের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইয়াছে। নীচকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি কখনও আপনাকে হীন মনে না করিয়া বরং গর্বের সঙ্গেই নিজেকে রাধেয় নন্দন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সূতপুত্র হিসাবে নিজেকে তিনি গৌরবান্বিত মনে করিতেন।

কর্ণের শিক্ষা পরিহাস

অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যেদিন গুরুগৃহ ত্যাগ করিবেন ঠিক সেইদিনই তাঁহার উপর দুইটি অভিশাপ বর্ষিত হইল। একটি আসে তাঁহার গুরু পরশুরামের নিকট হইতে আর অপরটি আসে জনৈক তাপসের নিকট হইতে। তাপসের গোধন শব্দভেদী বাণ দ্বারা মৃগভ্রমে বধ করার দরুন তাপস তাহাকে অভিশাপ দিলেন সমরাঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে 'রথের চক্র গ্রাসিবে মেদিনী।' কর্ণ নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পরশুরামের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু যখন তাঁহার সত্যিকারের পরিচয় গুরু পরশুরাম পাইলেন তখন তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যুদ্ধকালে কর্ণ গুরুর সমস্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইবে।

দানবীর কর্ণ

একদিকে বিরাট অভিশাপ অন্যদিকে দৈবের বিড়ম্বনা। আবার কেহ তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার ইচ্ছা সর্বদা পূর্ণ করেন। তাইতো নিজের একমাত্র পুত্র বৃষকেতুকেও নরমাংসভুক ব্রাহ্মণের সেবায় হাসিমুখে বলি দিতে পারিয়াছেন। এই দানব্রতের জন্যই তিনি যেন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। কারণ সকলেই জানিত কর্ণ সহজাত কবচকুণ্ডলের অধিকারী এবং ইহার জন্য সে দেবেরও অবধ্য। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কবচকুণ্ডল ভিক্ষা লইয়া কর্ণের বিনাশের পথ সুগম করিলেন। এইভাবে জানিয়া শুনিয়াও কর্ণ এক প্রকার স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিলেন।

মানুষ কর্ণের দোষ-ত্রুটি

কর্ণ দোষে-গুণে মিলাইয়া মানুষ। কর্ণ-চরিত্র কেবলই যদি গুণের আকর হইত তাহা হইলে যুধিষ্ঠির, বিদুর বা ভীষ্মের চরিত্রের মতই একমুখী হইত। আবার যদি কেবল দোষই থাকিত তাহা হইলে মানুষের পর্যায় হইতে অনেক নীচে নামিয়া যাইত। সেইজন্য মানব চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্যই হইল দোষে-গুণে তাহা সম্পূর্ণ। তাহার মধ্যে যেমন গুণ ছিল তেমন দোষও ছিল। নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়া গুরুর নিকট অস্ত্র শিক্ষা দ্যূতক্রীড়ার সময় প্রকাশ্য রাজসভায় পণবদ্ধা দ্রৌপদীর প্রতি অশিষ্ট আচরণ তাহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। তাহা ছাড়া বালক অভিমন্যু বধের জন্য অস্ত্রধারণ তাঁহার মত বীরের পক্ষে অশোভন হইয়াছে। এই সমস্ত অন্যায় কার্যের জন্য তাঁহাকে মানুষ হইতে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া যায় না

কারণ মানুষই ভুল করে, মানুষই অন্যায় করে, আবার সে এমন অনেক কার্যও করে যাহা তাহাকে মহিমান্বিত করিয়া মানবের মধ্যে অতি উচ্চে স্থান করিয়া দেয়—ইহাই মানুষের ধর্ম।

অবশেষে একদিন কর্ণের জীবনে সত্যই দৈবের প্রভাব আসিয়া পড়িল। ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব সেনাপতিগণ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে নিহত হইবার পর কর্ণ কৌরবের সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন। আত্মশক্তির বলে কর্ণ ছিলেন বলীয়ান। তাঁহার এই শক্তিমত্তায় পাণ্ডবসৈন্য বিব্রত বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু আত্মশক্তি আর কতক্ষণ চলে? দেবানুগৃহীত শক্তির নিকট মানবশক্তি পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। তাহার উপর একের পর এক অভিশাপ তাঁহার মৃত্যুকে নিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই পরিণতি ঘটিল অর্জুনের হাতে। দৈব তাড়িত মানুষ দেবানুগৃহীত শক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া মৃত্যু বরণ করিল।

কর্ণের জীবনের শেষ পরিণতি

কর্ণ-চরিত্র সত্যই "এক দৈব নিগৃহীতপূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন।" যুগে যুগে মানুষ তাই কর্ণ-চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। আত্মশক্তির উপর অবিচল বিশ্বাস ছিল বলিয়াই কর্ণ নিজেকে মানবমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাই কর্ণ-চরিত্র আমাদের হৃদয়কেই অতি সহজেই স্পর্শ করে।

উপসংহার

৩ আধুনিক যুগে যন্ত্রই শক্তি

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০]

পশুচারণ যুগ হইতে যন্ত্রযুগ পর্যন্ত নানা ধারা বিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান যুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই স্তরপরম্পরায় মানব সভ্যতা প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছে। এই সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের বেগবতী ধারা মানবজীবনকে সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। জীবনের নিরাপত্তা, বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক চাহিদা ও স্বল্পায়াসে অধিকতর সম্পদ উৎপাদন করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া যন্ত্র আমাদের জীবিকানির্বাহের বহুবিধ অসুবিধা মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

গতিশীল এ সভ্যতা। যুগে যুগে তাহা বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বিবর্তনের পথে পথে কত বৈচিত্র্য আসিয়া ভীড় করিয়াছে। ভয়াল প্রকৃতির হিংস্ররূপ সভ্যতার উষালগ্নে মানবচিত্তকে ভীত, সন্ত্রস্ত ও জড়সড় করিয়া রাখিয়াছিল। প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সেদিন অসভ্য বর্বর মানুষ দিনাতিপাত করিত। উপলব্ধি করিত আপন অসহায়তা। কিন্তু একটি বাঘের জন্যও তাহার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার পথ-নির্দেশ মানুষ সেদিন খুঁজিয়া পায় নাই।

যন্ত্রের উদ্ভব

তারপর ইতিহাসের রূপান্তর হইল। মানুষ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া আপন অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। সে নিত্যনূতন হাতিয়ার উদ্ভাবন করিল। আপনার ক্ষমতা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা স্বল্পায়াসে অধিকতর সম্পদ উৎপাদনের উপায় বাহির করিল। এমনি করিয়া আদিম যুগের বর্বর মানুষ আধুনিক মানুষে পরিণত হইয়া উন্নত সভ্যতার অধিকারী হইয়া উঠিল। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে সুপরিচালিত করিবার মত দৃঢ় সংহতি গড়িয়া তুলিত।

আধুনিক যুগ মানে যন্ত্রযুগ

আধুনিক যুগ হইল বিজ্ঞানের যুগ। যন্ত্রের সর্বময় আধিপত্য বিস্তারের যুগ। এ যুগে যন্ত্রের সাহায্য লইয়াই মানুষ পণ্য উৎপাদন করে। সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের নিমিত্ত কত শত যন্ত্র উদ্ভাবন করে। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে সস্তাদরে স্বল্প পরিশ্রমে অধিকতর পণ্য উৎপাদন করিয়া সর্বসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা, উৎসাহ ও জীবনযাত্রা প্রণালী সুস্থ, সবল ও সুন্দর কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে।

যন্ত্রের সর্বময় প্রভাব

শুধুমাত্র জীবনযাত্রানির্বাহের প্রশ্ন নয়, সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উদ্ভাবনের সহিতও যন্ত্রের ইতিহাস জড়িত। এই ইতিহাস আবার সুসভ্য উন্নত মানুষের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গভীর অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নবতর সৃজনী ক্ষমতারও পরিচয় দেয়। খাওয়া-পরা, বিশ্রাম, অধ্যয়ন সর্বদিকেই রহিয়াছে যন্ত্রের অসামান্য ক্ষমতার গভীরতর প্রভাব। যানবাহনের সুবিধার মূলেও রহিয়াছে এই যন্ত্রশক্তি। শত শত শ্রমিকের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা মিটানোর দিক হইতেও রহিয়াছে যন্ত্রের অপরিসীম প্রভাব। দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া তোলার ব্যাপারেও যন্ত্রের প্রবল পরাক্রান্ত স্বাক্ষর মুদ্রিত। এমনকি, দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভাব পর্যন্ত এই যন্ত্রের সাহায্যে দূর করা যায়। অতএব আধুনিক যুগের সমাজে সর্বদিকেই রহিয়াছে প্রবল ক্ষমতাশালী যন্ত্র-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পদচিহ্ন।

যন্ত্রের অপব্যবহার-জনিত কুফল

এ যুগ যন্ত্রের যুগ। যন্ত্রই এ যুগের সুখ, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য ও শক্তির মূলাধার। অথচ, এই যন্ত্রের অপব্যবহারে ইহার কল্যাণীশক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে না। আবার সুচারুভাবে যন্ত্রের সদ্ব্যবহার না করিতে পারিলেও তাহার জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই যন্ত্রশক্তির জন্যই ধনী তাহার মেদস্ফীত করে এবং দরিদ্র দিনের পর দিন দরিদ্রতর দিন মজুরে পর্যবসিত হয়। একটানা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মজুরেরা যান্ত্রিক হইয়া ওঠে। নেশা-ভাঙ খাইয়া পরিশ্রমের ক্লান্তি অপনোদন করিতে যাইয়া দুর্বলতর হইয়া ওঠে। প্রচণ্ড শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত ধনী-গরীবের মধ্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধানের কারণও এই যন্ত্রশক্তি।

যন্ত্রশক্তি বিজ্ঞানের দান। মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভাই বিজ্ঞানের জনক। সুতরাং

বিজ্ঞানের এই প্রিয় সন্তানটিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। অকল্যাণ নয় কল্যাণই হইবে যন্ত্র ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য। যন্ত্র ব্যবহার করিয়া যান্ত্রিক হইবার কোনই প্রয়োজন হয় না। মানুষের মানুষী মনোভাবকে রক্ষা করিয়া যন্ত্রকে সর্বদা সদ্ব্যবহার করা দরকার।

উপসংহার

৩ স্বাধীন ভারতে সামরিক শিক্ষা

পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রেই জনগণকে সামরিক শিক্ষাদান জাতীয় শিক্ষারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতবাসীর ক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষা এতকাল একটা প্রধান সমস্যার বিষয় ছিল। ইহার জন্য মূলত দায়ী সুদীর্ঘ কালের রাজনৈতিক পরাধীনতা। ভারতবাসী স্বভাবতই বুদ্ধিমান ও সাহসী; পাছে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ইংরেজদের এই দেশ হইতে বিতাড়িত করে, এই ভয়ে তাহারা সর্বপ্রকার ভারতবাসীকে সামরিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশে অহিংসানীতি প্রচারিত হইতেছে। ইহার মূল কথা হইল প্রেম ও প্রীতির দ্বারা হিংসাকে জয় করা। নীতি হিসাবে ইহার মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতি কতখানি প্রযোজ্য এ কথাটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। মানুষের সীমা বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ছলে বলে তাহারা পরদেশ অধিকারের চেষ্টায় রহিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে সুয়েজ খালের ব্যাপারে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং বর্তমানে চীনের ভারত আক্রমণে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে

এ পরিস্থিতিতে অন্ততঃপক্ষে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম প্রস্তুতির প্রয়োজন রহিয়াছে। সবলের অত্যাচার বন্ধ করিতে যেখানে অহিংসানীতি অপারক, সেখানে যুদ্ধের আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এ বিশ্বে মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। বর্তমানে পৃথিবীতে নানা কারণে সংগ্রাম যখন একরকম অনিবার্য, তখন মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আধুনিকতম সংগ্রাম কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। সুদীর্ঘকালের পরাধীনতার কথা মনে করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে যে সামরিকক্ষেত্রে অনগ্রসরতা কতখানি কুফল-প্রসূ হইতে পারে। ইহা ছাড়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেও যুদ্ধ হইতে পারে, সেদিক দিয়াও সমর প্রস্তুতির যে প্রয়োজন আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বিশ্বশান্তি

সামরিক শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে নূতন কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের আমলেই ভারতের জনগণ নানা বাধা নিষেধের আবর্তে পড়িয়া যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্র ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছিল। ভারতবাসীকে বহুবার বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তখন তাহাদের

আত্মরক্ষার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। অতীত ভারতের রাজপুত, শিখ, মারাঠা ও বাঙালী জাতির শৌর্য, বীর্য ও রণকুশলতার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ভারতের বহু সেনা বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসীম শক্তি, সাহস ও রণকুশলতার পরিচয় দিয়াছে।

বীর ভারতবাসী

ভারতে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা যে একেবারেই হয় নাই একথা ঠিক নয়। তবে যতটুকু হইয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নেহাৎ-ই সামান্য। দেরাদুনে সমরবিদ্যালয়ে মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; ইহা ছাড়া সামরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রদেশের তরুণদের সমান অধিকারও নাই। সাম্প্রতিক যুদ্ধে পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের সমরপটু সেনার পাশে তথাকথিত সমরে অপটু বিহারী কিংবা মাদ্রাজী সেনা সমান কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়াছে। সুবিধা ও সুযোগ পাইলে বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের যুবকও যে যথেষ্ট শক্তি মত্তার পরিচয় দিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে যুদ্ধোপকরণেরও প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এইসব অস্ত্রের ব্যবহার জানিতে হইবে এবং আধুনিকতম পদ্ধতিতে যুদ্ধশিক্ষা করিতে হইবে।

সামরিক ক্ষেত্রে ভারত অনগ্রসর

আয়তনে ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী ইহার সীমান্ত বিস্তৃত। বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সীমান্ত ভাগের স্থানগুলি সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। ভারতের সমুদ্রতীর অনেক হাজার মাইল লইয়া প্রসারিত। এতবড় দেশ ইহা রক্ষার জন্য চাই সমর বিদ্যায় নিপুণ বিশাল নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী। ভারত বিভাগ সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে যদিও বহুগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে তথাপিও আমাদের এ সত্যটি ভুলিলে চলিবে না যে বর্তমান পৃথিবী রণোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

ভারতবাসীকে ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইলে সমর বিদ্যালয়ের ব্যাপক প্রসার একান্ত আবশ্যক। তদুপরি সমরে পটু এবং সমরে অপটু এরূপ শ্রেণীবিভাগ অচিরেই তুলিয়া দিতে হইবে। প্রাদেশিকতাব সংকীর্ণ মনোভাব এখনও যদি আমরা বর্জন করতে না পারি, তাহা হইলে দেশরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

উপসংহার

ভারতের বিভিন্ন স্থানে সমর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলিতে রাজ্যের স্বাস্থ্যবান তরুণদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবাসী স্বাধীনতা পাইয়াছে বটে কিন্তু এখনও তাহাদের চরিত্রে নানাপ্রকার দুর্বলতা বিদ্যমান। দেশের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য আমাদিগকে সকল প্রকার চারিত্রিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। দেশপ্রীতি, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবাসী সামরিক শক্তিতে অবশ্যই দুর্বার ও দুর্জয় হইয়া উঠিবে।

ইহাতে কোনও ভাষাতেই আমরা পরিপক্কতা লাভ করিতে পারি না। তথাপি আমরা এইরূপ জঘন্য দাস-মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে, ইংরেজিতে কথাবার্তা বলিতে, চিঠিপত্র লিখিতে ও সভায় বক্তৃতা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করি। অথচ তাহা যথাযথ ইংরেজ জাতির সহজাত ক্ষমতার ন্যায় পারি না। অপরপক্ষে আমাদের মাতৃভাষাতেও অজ্ঞতার সীমা নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা মাতৃভাষায় অজ্ঞতাকে গর্বের ও আভিজাত্যের বিষয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু 'ইংরেজি জানি না' বলিতে যেন তাহাদের অপমানের সীমা থাকে না। স্বাধীন দেশে এমনটি পাওয়া যায় না।

ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে পাইয়া আমরা তাহাতে এমনই জড়িত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের মাতৃভাষা যে শিক্ষার বাহন হইতে পারে ইহা একদল লোক কল্পনাই করিতে পারে না। কারণ তাহারা মনে করে, আমাদের মাতৃভাষা এত দুর্বল যে, সমস্ত ভাব বা অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা ইহার নাই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দলিল ইত্যাদি প্রত্যেক স্বাধীনজাতি আপন আপন ভাষায় লিপিবদ্ধ করে। অন্যান্য দেশবাসী প্রয়োজনবোধে উহা নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়।

নিজের ভাষায় কথাবার্তা বলা, চিঠি লেখা, গ্রন্থ রচনা প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী মানবেরই কর্তব্য। ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ রচনাকে আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষিত গ্রন্থকারগণ বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। যতদিন আমাদের দেশীয় এই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দুর্বল মনোভাব দূরীভূত না হইবে ততদিন আমাদের মাতৃভাষার দুর্দিন ঘুচিবে না।

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের ও দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আজকাল সমস্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। সরকারের সমস্ত আফিসে এবং আদালতে বাঙলাভাষা গৃহীত হইয়াছে। জ্যামিতি, গণিত, বীজগণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতির পরিভাষা স্থির হইয়াছে। এই পরিভাষা আমাদের নিকট প্রথম প্রথম শ্রুতিকঠিন বোধ হইলেও অদূর ভবিষ্যতে ছাত্র ছাত্রীগণ এই সকল প্রতিশব্দে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে ভারতীয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও মাতৃভাষাকে সম্মান প্রদর্শনে ব্রতী হইয়াছে। মাতৃভাষার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিপাতের ফলে দেশীয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আজ দেশীয় ভাষার প্রতি নজর দিয়াছেন। অনেকে তাঁহাদের মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ গবেষণা সকল মাতৃভাষায় লিখিয়া ভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়া তুলিতেছেন। এই জন্য তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। যে জাতি স্বীয় মাতৃভূমিকে, মাতৃভাষাকে এবং স্বীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ধর্ম ও সমাজকে শ্রদ্ধা করিতে না শিখে, তাহার জাতীয়ত্বের গর্ব ও মূল্য আর কি রহিল?

কর্মবীর বিধানচন্দ্র

[চলিত ভাষা]

বঙ্গজননী রত্ন প্রসবিনী। যুগে যুগে তাই বঙ্গজননীর গর্ভ হতে কত অমূল্য রত্ন উত্থিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার ফল ..পুণ্য হউক'... কবি চিত্তের এ প্রার্থনা যেন অলক্ষ্যচারী বিধাতা পুরুষ অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির সাথে উপলব্ধি করেছিলেন। এ যেন ছিল বিধাতা পুরুষেরও গোপন অভিপ্রায়। তাই একই দেশে এত সব পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের আবির্ভাবের ইতিহাস পৃথিবীতে বিরল। বিধির আশিষে অমৃতের টিকা পরে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন সাধনায় চির অমরতার তপস্যায় সেদিনও বাঙালী নিয়োজিত ছিল। আজও আছে, হয়ত বা ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু যে সব অমূল্য রত্ন হারিয়েছি, তাদেরও আর ফিরে পাব না। পাব না তাদের সদেহ উপস্থিতি। যা পাব তার মূল্যই বা কম কিসে। আমরা পাব তাঁদের কর্মময় জীবনের সজীব আলেখ্য। সেই অমূল্য-রত্নের ভীড়ে বিধানচন্দ্র রায় একটি মূল্যবান হীরের টুকরো। তিনি আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু আছে তাঁর বিরাট বিস্তৃত একাশি বছরের দীর্ঘ জীবনের কর্মময় ইতিহাস। সে ইতিহাস জীবন সংগ্রামের ইতিহাস, সে ইতিহাস কর্মের ইতিহাস, সে ইতিহাস স্বদেশ হিতৈষণার ইতিহাস, সে ইতিহাস বাঙলা ও বাঙালীর সুপ্রতিষ্ঠা দেবার জন্য গভীরতর উদ্যমের ইতিহাস, সে ইতিহাস মহত্ত্বের আদর্শের, উন্নততর কর্মব্রতের, শুচিশুদ্ধ ত্যাগের জ্বলন্ত ইতিহাস। সে ইতিহাস যদি বাঙালী কোনদিন না ভুলে, তবে বিধান রায়ের নামও ভুলবে না।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

দীর্ঘ জীবন, নীরোগ দেহ, প্রগাঢ় মানবপ্রীতি নিয়েই যেন বিধান রায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। সাধ্যমত তাই তিনি চেষ্টা করে গেছেন দেশের ও দশের হিতার্থে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে ঢেলে সেজে নিতে। আজ হতে একাশি বছর আগে পাটনায় তাঁর জন্ম। ঐ পাটনা থেকেই তাঁর ছাত্রজীবনের একটা মোটা অংশ কাটে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর লণ্ডন হতে তিনি একাদিক্রমে চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে একের পর এক এল. আর. সি, পি; এম. আর. সি. এস; এম-আর. সি. পি এবং এফ-আর. সি. এস. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৯-৪৫ সালে ভারতীয় মেডিক্যাল চিকিৎসকদের কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ইহার কিছুদিন পরেই তিনি এখানকার ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪২-৪৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে

জন্ম ও কর্মজীবন

ডি. এস. সি—এই সম্মানসূচক ডিগ্রী লাভ করেন। অন্যদিকে জাতীয় দুর্দিনে তিনি ছিলেন নেতাজীর সহচর। এ জন্য একাধিকবার তিনি কারাবরণও করেছেন।

পরপর দু'বার তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে একটানা ছয়মাস তিনি কারাবরণ করেন। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৮ হতে দীর্ঘ চৌদ্দ বছর তিনি স্বাধীন বাঙলায় মুখ্যমন্ত্রীত্বের আসনে উপবেশন করে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর প্রগাঢ় দেশপ্রীতি ও গভীরতর কর্তব্যবোধের জন্য ভারত সরকার তাঁকে ১৯৬১ সালে ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের চেয়ারম্যান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই কাউন্সিলের অধীন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত চ্যান্সেলারের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাঙলা দেশ আর বিধানচন্দ্র দু'টি নাম একত্রে উচ্চারিত। একের বিচ্ছিন্নতায় অপরকে উপলব্ধি করা আজ সম্ভব নয়। শতকীর্তি বিধানচন্দ্র বাঙলার সেই সন্তান—যাকে নিয়ে বাঙলা দেশ আর বাঙালীর গৌরবের অন্ত নেই। তাঁর জীবনই—তাঁর বাণী। প্রবাদতুল্য তাঁর চিকিৎসক খ্যাতি, যা ভৌগোলিক সীমা উত্তরণ করে দূরবিস্তৃত। সর্বজন পরিচিত তাঁর কুশলী প্রশাসন ও বাঙলাদেশের মুখ্যমন্ত্রীরূপে নানা পরিকল্পনার রূপকার তিনি। বিস্ময়কর তাঁর বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা ও সে ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নানা ভাবনার সুদৃঢ় রূপায়ণ। সশ্রদ্ধ স্মরণীয় তাঁর বাঙলাদেশের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষানায়কের ভূমিকা। তর্কাতীত তাঁর বাঙলাদেশে নেতৃত্বের সহজাধিকার।

আদর্শবোধ ও চরিত্রায়ন

'জনগনমন অধিনায়কে'র সার্থক আসন তবু এসবের উপরে বড়ো বিধানচন্দ্রের বিরাট অতুলনীয় চারিত্রধর্ম। সেই চারিত্রধর্ম যা উনবিংশ শতকের ধ্যান-ধারণা-নীতিবোধ-নিষ্ঠা-আত্মবিশ্বাস হতে লব্ধ। বিদ্যাসাগর-রামমোহনে এই চারিত্রধর্মের সুরু এবং বিধানচন্দ্রে হয়ত তার শেষ। এই চারিত্রধর্মই বিধানচন্দ্রকে বিরাট বাঙালী চরিত্রের সব দুর্লভ ও মহৎ গুণে অলংকৃত করেছিল। তাই শ্রদ্ধানত চিত্তে আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বাঙালীর শেষ প্রতীক রূপে ন্যায্য মর্যাদা দিয়েছি। সেই চারিত্রধর্মই ব্যষ্টি স্বার্থের উর্ধ্বে তাঁকে সমষ্টি স্বার্থকে ভাবতে শিখিয়েছিল। সেই চারিত্রধর্মই তাঁকে স্বাধীন ভারতে নানা লোভনীয় মসনদকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রেরণা দিয়েছিল। আশি বৎসর বয়সেও কোন ক্লান্তি, আদর্শের কোন বিচ্যুতি, কর্মের কোন আলস্য তাঁকে অভিভূত করেনি। সেই চারিত্রধর্মই প্রতিনিয়ত তাঁকে স্বাধীন ভারতে বাঙলাদেশের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বরণ করেছিল। এই বিরল গুণের বিরলতম সমাবেশ, আজকের বন্ধ্যা রিক্ত বাঙলাদেশে বিরলতম। যে চরিত্র, ব্যক্তিত্ব বাঙলাদেশে ঘোষণা করতে পারত :

চরিত্র

'তোমরা সকলে এসো মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।'

সেই কর্মগুরুর আত্মবিশ্বাসে গাঢ়কণ্ঠস্বর, বাঙলাদেশে বিধান রায়ের মৃত্যুর সংগে সংগে স্তব্ধ হয়ে গেল। তাই নেতৃত্বহীন স্বদেশের নিকট এবং দূর ভবিষ্যতের অনিবার্য পরিণতির বেদনাও, বিধানচন্দ্রের শূন্যতার বেদনাকে দুঃসহতর করছে।

উনিশ শো বাষট্টি, ১লা জুলাই কলকাতার আর্তি, ইতিহাসে আরো একটি দিন অবিস্মরণীয় মূল্যে গ্রথিত হয়ে রইবে। এমনি এক পয়লা জুলাই একাশি বছর আগে বাঙলার ভাগ্যাকাশে বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়। একাশি বছর পরে আরেক পয়লা জুলাই আবার এল বাঙলার ভাগ্যাকাশে চরম দুর্যোগের অভিশাপ বয়ে, তারই মৃত্যুদিন হয়ে। একই দিনে জন্ম মৃত্যুর এমন রাখীবন্ধন, ইতিহাসে অঘটন। অঘটন হলেও তা অপূর্ব। জন্মদিনের প্রদীপে মৃত্যুদিনের শিখায়—মৃত্যুর রূপ আরও মহিমময় হয়ে উঠেছিল।

মৃত্যু

শ্রুতকীর্তি বিধানচন্দ্র আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর বিয়োগ ব্যথা যতই দুঃসহ হোক না কেন, তবুও তাকে সুসহ করে তুলতে হবে। দেশ আর দেশবাসীকে ঘিরে অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে তিনি যে কর্মযজ্ঞ ও স্বপ্ন রচনা করে গেছেন, সেই অসমাপ্ত কর্ম ও অকৃতার্থ স্বপ্নকে উত্তরাধিকারত্বের দায়িত্বে বহন করাব ব্রত আমাদের। সেই দায়িত্ব আমরা যেন না ভুলি, সাধনা ভ্রষ্ট যেন না হই, কোন বিভেদে আমরা যেন বিচ্যুত না হই, তাঁর মহৎ জীবন-সাধনাকে যেন কলংকিত না করি নিজেদের ক্ষুদ্রতা-দীনতা-হীনতায়। শুধু স্মৃতিরক্ষার তহবিলে নয়, শুধু মর্মর ফলকে নয়, শুধু আড়ম্বর সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে-অনুষ্ঠানে নয়—বিধানচন্দ্রের আদর্শকে সফল করার দুরূহ দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের উপর সমর্পিত। আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, কঠোর প্রতিজ্ঞা সহকারে সেই সুকঠোর দায়িত্বকে তাঁর অমর স্মৃতিকে যেন মর্যাদা দিই। সেই মর্যাদাই তাঁর শ্রেষ্ঠ স্মরণ হোক্।

উপসংহার

বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী

বাঙলা চলিত কথায় প্রিয়জনের দীর্ঘায়ু কামনায় প্রায়শই বলা হয়ে থাকে 'শতায়ু হও। এই শতায়ু কামনার অন্তরালে ব্যক্তিবিশেষের কর্মময় জীবনের সর্বাত্মিক বিকাশের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। সামান্য লাভ লোকসানের মানদণ্ডে আত্মস্বার্থ সিদ্ধির সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের উর্ধ্বে পার্থিব জীবনে গৃহী মানুষ উঠতে পারে না। তাই মানুষের

জীবনে আয়ুর ক্ষয় বৃদ্ধিতে কিছু যায় আসে না। এ সংসারে এসে তারা খাওয়া-পরা এবং বাঁচার উপরে উঠে জীবনের পরিপূর্ণ সুষমা উপলব্ধি করতে অপারগ হন। তাই শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারনের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত সাধারণ মানুষের সামান্যতম কীর্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে 'শতায়ুকামনা' কথার কথা মাত্র। মরণশীল মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তিতে তাদের সামান্য কর্মটুকুও যায় বিলীন হয়ে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিদের অমরতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের শতায়ু কামনা করার একটা আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। মানুষ মরে যায়, কিন্তু যা টিকে থাকে তা হোল তাঁর স্মৃতি। এই স্মৃতি দীর্ঘজীবনের কর্ম-সাধনা, ত্যাগ, আদর্শবোধ ও সুগভীর ঐতিহ্য-প্রীতির উদ্দেশ্যের সাথে জড়িয়ে মিশিয়ে থাকে। সামান্যকে অসামান্যের গৌরবদান, শূন্যকে পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা, ক্ষুদ্র জীবনের সংকীর্ণতার মধ্যে বৃহত্তর জীবনের ছায়াপাত ঘটাবার প্রয়োজনেই যেন একেকজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, দশকে একাদশের কোঠায় পৌঁছে দেবার সাধু উদ্দেশ্যে। বিবেকানন্দ আমাদের দেশেরই সেই মহাপুরুষ যাঁর কীর্তি, ত্যাগ, সাধনা, আদর্শ, স্বদেশপ্রীতি ও ঐতিহ্যানুরাগ তাঁকে দিয়েছে চিরস্থায়ী অমরতা। তাই বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রচেষ্টা হবে পরোক্ষত বিবেকানন্দের বিরাট কর্মময় জীবনের মহান আদর্শকে নবীন মূল্যে যাচাই করবার প্রয়াসে।

ভারত পথিক বিবেকানন্দ বিশ্বপথিকও। তাঁর আবির্ভাব অগ্নিক্ষরা উনিশ শতকের দীপ্ত মধ্যাহ্নে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যাদুস্পর্শে সেদিন ভারতবাসী জড়তা, ক্লীবতার হাত হতে অব্যাহতি পেয়ে নতুন চিন্তায় ও চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। তাই রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দিক হতে পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবীতায় এ দেশবাসীর চিত্ত থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। সঞ্চারিত হয়েছিল নবতর আলোড়ন। সুপ্ত জাতি মোহনিদ্রার আবেশে মুক্ত চিত্তে শুনেছিল বিশ্বমানবতার বাণী। অন্তরে অন্তরে জেগেছিল গতানুগতিকতার হাত হতে মুক্তি পাবার স্বপ্ন। অতীতকে বর্তমানের পটভূমিকায় এনে শুরু হয়ে গিয়েছিল বিচার বিশ্লেষণ। সদ্য ঘুম ভাঙা জাতি মাথা উঁচু করে সর্বপ্রকার জড়তা, পঙ্কীলতা ও কুশ্রিতার উর্ধ্বে উঠেছিল। বিশ্বের কাছে স্পর্ধাভরে ঘোষণা করেছিল নিজ দেশের সাধনা, তপস্যা, আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির উন্নত আদর্শের কথা। বিবেকানন্দের আবির্ভাব এই পরিবর্তমান বাঙলা দেশে। এই পরিবর্তনের স্রোতকে দুর্বার বেগে চালিত করবার ক্ষেত্রে বাঙলার ব্যাপক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিবেকানন্দের অবদান নিঃসন্দেহে অপরিসীম। উনিশ শতকে রামমোহনের আবির্ভাবের পর ভারতীয় পরিচয়ে তিনিই পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর কাছে উপস্থিতি হয়ে ভারতীয় সাধনা, তপস্যা, আদর্শ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার কথা সর্বপ্রথম

বিবেকানন্দের অবদান

শুনিয়েছিলেন। নিজ দেশের বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়েছিলেন; তাই বাঙলাদেশের জনপ্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন:

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে ও বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।"

বিবেকানন্দের ব্যাপক পরিচয়

সাধারণ্যে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচিতি সন্ন্যাসী হিসেবে। এইরূপ খণ্ড-পরিচয় সবটুকু নয়। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী কিন্তু তিনি তাঁর চেয়েও অনেক বড়। শুধুমাত্র সন্ন্যাসী বললে তার বিরাট কর্মময় জীবনের সবটুকু পরিচয় সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় না। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেজন্য তিনি জড়িত ছিলেন ধর্মের সাথে। কিন্তু তিনি ধর্মনীতিকে সমাজনীতি বহির্ভূত করে দেখেননি। ঐ জন্যেই তিনি সংরক্ষণশীল, গতানুগতিক ও একপেশে মনোভাবের উর্ধ্বে উঠে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন:

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

যুগ যুগ লাঞ্ছিত আচারের মরুবালুরাশিতে কর্দমলিপ্ত জাতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি শুনিয়েছিলেন পরম সুন্দর ঐক্যের বাণী। "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই।"

প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের আদর্শগত বিরোধ যত বড়ই হোক, এদের মধ্যকার অন্তর্নিহিত বিরোধ যতই গভীর হোক না কেন, বিবেকানন্দ সর্বধর্ম সমন্বয়কারী উদার চিত্ত তার মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আনয়নের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিল। প্রচণ্ড শক্তিশালী পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর নিকট বেদান্তের প্রচার ও প্রসারের দ্বারা নিজ দেশের গৌরব, ঐতিহ্য ও মহত্ত্বের স্পর্ধিত ও অবশ্য-প্রাপ্য আসন তিনিই সবার আগে দাবী করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, বেদান্তের নব মূল্যদাতা ও শ্রীরামকৃষ্ণের মানব-ঘনিষ্ঠ ধর্মীয়চেতনার সমর্থক বিবেকানন্দের পরিচয় তিনি মানব হিতব্রত সন্ন্যাসী। তাঁর প্রতিভার রয়েছে নানান্ দিক। প্রতিটি দিকই খণ্ড দীপ্তিতে ভাস্বর। তিনি সন্ন্যাসী,

স্বদেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক, নবযুগের বার্তাবহ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলন সেতু—কি নন তিনি! এ কারণেই খণ্ড দিক নয়, প্রয়োজন হল অখণ্ড জীবনের তাৎপর্য ও সার্থকতার সম্পূর্ণ বিচার। অতএব, বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রচেষ্টা হল, এই বিরাট প্রতিভার বিশ্বরূপ দর্শনের দৃপ্ত অঙ্গীকার গ্রহণ।

বিবেকানন্দ বিচারের নতুন নিরীখ

কিন্তু এটুকু উদ্দেশ্যকে চরমভাবা ভুল। বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের গভীরতর উদ্দেশ্য এর চেয়ে অনেক বড়। এই উদ্দেশ্য যাতে পূর্ণতর সফলতার আলো দেখতে পায় এ জন্য সচেতনভাবে নজর রাখতে হবে। তাই—(১) তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনে অবলম্বিত আদর্শের বাস্তবপ্রয়োগ; (২) সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার অন্ধতা বিস্মৃত হয়ে অস্পৃশ্যতা ও আত্মস্বার্থপর মনোভাবের উপরে উঠবার প্রেরণায় উদ্দীপিত হওয়া দরকার। তারজন্যই প্রয়োজন বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে ব্যক্তিজীবনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান। (৩) বিবেকানন্দের অখণ্ড পরিচয় গ্রহণের সাধু প্রচেষ্টা গ্রহণ (৪) নিজদেশ, জাতি ও সমাজের সাথে সাথে বিশ্বমানবতাবোধের প্রেরণা রসের সন্ধানও চালিয়ে যেতে হবে বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে আলোকবর্তিকা স্বরূপ গ্রহণ করে। এই বিশ্বমানবতাবোধের উদ্দীপনা মর্মমূলে সঞ্চার করবে মনুষ্য জীবনের প্রতি অসামান্য মমতা ও সম্প্রীতিবোধ। চিত্তের গভীরে ধ্বনিত হয়ে উঠবে এই জীবনসত্য 'জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

বিবেক-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যগত ব্যাপকতা

দেশ-বিদেশে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীকে সফল করে তুলবার উদ্যোগ আয়োজন আজ সার্থক হতে চলেছে। বিগত ১৭ই জানুয়ারী '৬৩ সারা ভারত ব্যাপী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে পালিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে নবমূল্যে বিচার-বিশ্লেষণের আন্তরিকতা। ইতিমধ্যেই বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা বেশ কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বিবেকানন্দের আদর্শকে চিরঞ্জীবী করে তুলবার দিকে লক্ষ্য রেখে বেদান্ত শিক্ষার জন্য সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এই শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের গভীরতর উদ্দেশ্যের প্রতি নজর রেখে বিভিন্ন কমিটি গড়ে উঠেছিল। এই সব কমিটিগুলির উদ্যোগ আয়োজনে সায় দেবার জন্য সারা দেশব্যাপী চিন্তাশীল প্রগতিকামী বুদ্ধিজীবীর দল এগিয়ে এসেছেন। যতদূর জানা গেছে, পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন দেশেও বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর মহত্তর উদ্দেশ্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার আন্তরিক সাধু প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্যোগ আয়োজন

এই আয়োজনের সফলতা ও ব্যর্থতার সাথে জড়িত রয়েছে এই যুগন্ধর হিমালয়তুল্য

বিরাট মহাপুরুষের কর্মকৃতিকে যোগ্য মূল্যদানের অভীপ্সা। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সফলতার আশা করা দুরাশা মাত্র নয়। এ আশা করা নিশ্চয়ই অসম্ভব কিছু অলীক কল্পনা নয়। এজন্য দু' একটি স্মারক গ্রন্থও সম্ভবত বেরুবে। দেখতে হবে যে এরূপ স্মারকগ্রন্থ প্রণয়নের অন্তরালে যেন কোনভাবেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ না ঘটে।

উপসংহার

অন্যদিকে, রাজনৈতিক নেতাদের দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে যেন এ শতবার্ষিকীকে অধিকতর জাঁকজমকে পর্যবসিত না করা হয়। কারণ তা হলে 'বিবেকানন্দ মেড ইজি' অথবা বিবেকানন্দ ধর্মকে বড় করে দেখতেন ইত্যাদি......"শ্লোগানই বড় হয়ে দেখা দেবে। পরিপূর্ণতা লাভের পূর্বেই উদ্দেশ্যগত তাৎপর্যের ঘটবে অপমৃত্যু। তাই অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে এই বিরাট প্রতিভাধরের স্মরণী উৎসবকে পরিপূর্ণতা ও সফলতাদানের মহতী উদ্দেশ্যে কল্যাণে দেশের প্রতিটি মানুষের অংশ গ্রহণ করা।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী রবীন্দ্র পূজারীদের গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার একটি বিশেষ সুযোগ। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়াতলে বর্ধিত বাঙালীজীবনের একটি স্বীকৃত দেবার সুযোগ এই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই সেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অতি-অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে এই দুর্বার লাভ, অনন্য সুযোগ। গোবিন্দদাস বলেছেন—'আমি মলে আমার চিতায় দিও মঠ।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মরণের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' তিনি আরও বলেছেন' 'তখন সকালখেলায় করবে খেলা এই আমি।'

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বাস্তবিকই কথাটি যেন ভবিষ্যতবাণীর মতই ফলে গেছে। বাঙালী তাঁর স্থান সেই সুউচ্চ মানসিক হিমালয়ে আবেগ ও শ্রদ্ধার নানারূপ অঞ্জলিতে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। তাঁর স্থান বাঙলাদেশেই সীমাবদ্ধ নেই কয়েকটি মানুষ, কিছু কবিতা আর কিছু আলোচনার মধ্যে—তিনি বাঙলাদেশ ছাড়িয়ে, ভারতের সাগরসীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর দেশে দেশে নিজেকে উপস্থিত করেছেন। তাইত সর্বত্র রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ প্রদর্শনে চেষ্টা সাফল্যলাভ করেছে।

তা সত্ত্বেও কিন্তু বাঙালাদেশে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি নাম যা সবার আগেই উচ্চারিত হয়। কেননা রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙলা সাহিত্যকেই পরিপুষ্ট করেননি, পরন্তু, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর আশা এবং সেই সঙ্গে বাঙালী জীবনের প্রতিটি ফাঁককে সচেতনভাবে পূর্ণ করে গেছেন। তিনি বাঙালী জীবনে ছিলেন অপরিহার্য। ব্যক্তিগতভাবে দেশকে আজীবন জেনে দেশ গঠনে স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করে

রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের প্রভাব

জনসেবায় নেমে এসেছেন। যৌবনে গ্রামের জমিদারি পরিভ্রমণকালে তিনি দেশকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছেন—বুঝেছেন এর প্রাণের,রস কোথায় শুকোচ্ছে—অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় চিন্তা করেছেন। প্রবন্ধে, কবিতায়, গল্পগুচ্ছে, নানা চিঠিপত্রে তিনি আবেগাকুল কলমে যে বেদনার কাহিনী তুলে ধরেছিলেন—পরবর্তীকালে, অনেক পরে হলেও, তা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এমন কি তৎকালীন রাজনৈতিক বক্তৃতার আসরে দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার মাধ্যম আনার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানে দেশবাসীকে সচেতন করার উদ্যোগে তিনি পিতার প্রদর্শিত পথে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, পরিশেষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাই সহিংস সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে প্রাণের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা আনার প্রচেষ্টায় বোলপুরের শিক্ষায়তনগুলিতে আপ্রাণভাবে পরিশ্রম করেছেন।

শতবার্ষিকী আজ তাই আমাদের জীবনে সেই সেই উপকারকে স্মরণ করার দিন। সমগ্র দেশকে শিক্ষায়ই উন্নত করা সম্ভব—এই আদর্শে তাই আজ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। একাডেমিতে রবীন্দ্রচর্চার প্রচুর বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

সরকারী দিক থেকে নানারূপ চেষ্টা করা হচ্ছে ও হয়েছে। সরকারী তরফ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী সুলভ সংস্করণে প্রকাশ করার বন্দোবস্ত করে একটি মহৎকার্য সম্পন্ন করেছেন।

শতবার্ষিকী পালন
সাধারণ ও সরকারী

অতি সম্প্রতি সমগ্র সরকারী কাজে বাঙলাভাষা চালানোর চেষ্টায় বর্তমান পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি অভূতপূর্ব কার্য সম্পন্ন করেছেন। এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বহুকালের একটি আশা আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। সরকারী তরফ থেকে ফিল্ম নির্মাণ একটি শ্রদ্ধেয় কার্য সন্দেহ নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রচেয়ার স্থাপনে বন্দোবস্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য। কিন্তু যথার্থভাবে রবীন্দ্রনাথের Practical training এর পদ্ধতি একান্তভাবে গ্রহণ করা ততটা হচ্ছে না।

বিশ্বভারতী প্রকাশন সংস্থা—রবীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত কার্য হাতে তুলে নিয়েছেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মনের আশা বাস্তবে প্রস্ফুটিত করতে সচেতন হচ্ছেন। 'বিচিত্রা', 'দীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরাট সাগর থেকে মন্থন করা কিছু অমৃত পরিবেশনের চেষ্টা হচ্ছে।

এতদুপলক্ষে রবীন্দ্র শব্দকোষ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বহু গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বর্তমান লেখকগোষ্ঠীর সচেতনতাকেই প্রমাণ করছে।

আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকারও রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতে কম সচেষ্টতার পরিচয় দেন নি। তাদের প্রচেষ্টায় বাঙালীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই প্রতি সবিশেষ আগ্রহের পরিচয়

পাওয়া যাচ্ছে—যা কম আশার কথা নয়। বিদেশেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহ দেখা গেল। পশ্চিমী প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ছবি লক্ষ্য করা যায়। নানা দেশ পুরোনো রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠকে উদ্ধার করে নোতুনভাবে রেকর্ড করে ভারতবর্ষকে উপহার দিচ্ছেন। আমেরিকায় রবীন্দ্র-গবেষণা যথেষ্ট হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়া রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত নানাগ্রন্থ ভারত সরকারকে উপহার দিচ্ছেন। বিশেষতঃ সোভিয়েত প্রভৃতি দেশে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ের বহুল প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রবীন্দ্রনাথের চর্চা সূচিত। আজ "গীতাঞ্জলির" লেখক রবীন্দ্রনাথ নয়, নোবেল লরিয়েট রবীন্দ্রনাথ নয়, পরন্তু তারা চেনেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে।

বিদেশে উদ্‌যাপন

"এখনো তোর গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি।
নীরবে উপেক্ষা করি জঠরে নিঃশব্দ ভ্রূকুটি"

সুকান্তর এই পংক্তি দুটিতে রবীন্দ্রাথের শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টির সঙ্গে আমরা নিজেদেরও মিলিত করছি। আজ আমাদের মনে শান্তি সচেতন প্রতিটি মানুষের মনে, রবীন্দ্রনাথ পূজনীয়। শুধু বাঙলাদেশে নয়, ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবী রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী পালনের দ্বারা একটি মহৎ প্রাণকে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে না—বরঞ্চ নিজেরাই শ্রদ্ধা পাচ্ছে। বিদেশী কবির কল্পনা আজ রবীন্দ্রনাথেই উপমেয়ঃ

উপসংহার

Hark ! hark ! the lark at heaven's
gate sings *

কলিকাতা নগরীর বহুমুখী সমস্যা

কোনও নগরীর সমস্যা নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই আসে সেই নগরীর অধিবাসীর বাসস্থান, পথ-ঘাট, খাদ্য-বস্ত্রাদি সংগ্রহ, চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ, লেখা-পড়া যাহা কিছু লইয়া মানুষ বাঁচে, তাহার ভালমন্দ বিচার। কলিকাতা নগরী ভারতের শ্রেষ্ঠ মহানগরী। এই নগরী ঐতিহ্যে, সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক প্রেরণায়, নবভাবের চেতনায় ও সংস্কার বুদ্ধিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এখনও বিশ্বে এই মহানগরীর স্থান উর্দ্ধ্বে। কলিকাতা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা, সমস্যাপীড়িত নগরী। এই শহরের অধিবাসীদের জীবন দুবিসহ করে তোলার পেছনে যে ক'টি কারণ প্রধান তাহাদের মধ্যে গৃহসমস্যা অন্যতম। কারণ সহরের মাত্রাবিহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি। গত দুই দশকে এই সহরের

---

*প্রবন্ধকার শ্রীঅচিন্ত্য বসুর সৌজন্যে।

অবিশ্রান্তভাবে জনসমাগম ঘটিয়াছে কখনও ধীরে কখনও দ্রুত। গত ১৯৪২ সাল হইতে তা স্থির গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যে কলিকাতায় জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে প্রতি বর্গমাইলে এখানে ৭৩১৮২ জন লোক বাস করে।

এই অবিশ্বাস্য জনবসতির ফলে আজ কলিকাতার গৃহসমস্যার চিত্র এক ভয়াবহরূপ ধারণ করিয়াছে। সুস্থ ও সুসংহত জীবনযাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রত্যেক কল্যাণকামী রাষ্ট্রেরই একমাত্র কর্তব্য। বিশেষ করিয়া বর্তমানে বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন যখন বিপর্যস্ত তখন এই বাস-সমস্যা মেটাইবার দায় একান্তভাবেই সরকারের।

কলিকাতা মহানগরীর যানবাহন অপ্রচুর। একমাত্র ট্রাম-বাসেই সংখ্যা বাড়ালেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। পরিবহনযোগ্য রাস্তা করা একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণে পরিবহনের জন্য প্রাচীন পরিকল্পনার প্রবর্তনেরও প্রয়োজন। পরিবহন ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগ উল্লেখযোগ্য। ভূগর্ভস্থ রেল লাইন ও সার্কুলার রেল লাইন নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। যদিও রাজ্য সরকার সি-এম-পি ও-কে এ সম্পর্কে একটি বিশদ ও সুসংহত পরিকল্পনা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্পর্কে কোন কোন মহলে বেশ কিছু সংশয় দেখা দিয়াছে। রেল কর্তৃপক্ষ নাকি সার্কুলার রেলের প্রস্তাবটি ১৯৬৬ সালের পূর্বে বিচার করা সম্ভব নয় বলিয়া মনে করেন। অথচ সি. এম. পি. ও কর্তৃপক্ষের ধারণা, রেল কর্তৃপক্ষের অনুমোদনলাভ করিলে এই পরিকল্পনা বর্তমান বৎসরের শেষ দিকেই ট্রেন চলাচল সম্ভব। ইহা ব্যতীত গঙ্গায় মোটর লঞ্চ ও ফেরী ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলে ইহাতেও কিছু উপকার হইতে পারে।

পানীয় জল সরবরাহ ও ময়লা জল নিঃসরণ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নয়ন দরকার। পানীয় জল সম্বন্ধে যে মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহারও দূর করিবার প্রয়োজন আছে। সামান্য বৃষ্টিতে এই মহানগরীর যে সকল অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হয়, তাহা একমাত্র জল নিঃসরণ ব্যবস্থারই ত্রুটি। সুতরাং এইসব দিক বিবেচনা করিয়া যাহাতে রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও জল নিঃসরণ প্রণালী দূর হয় তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বেই করা একান্ত প্রয়োজন। এই সব বৃহত্তর সমস্যা ছাড়াও সাধারণ সমস্যাও কলিকাতাকে কম ব্যতিব্যস্ত করে না। এই মহানগরীর ফুটপাথের ফেরীওয়ালাদের জন্য রাস্তায় চলা এক বিরাট সমস্যা। ইহারও সমাধান করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত এই বৃহত্তর নগরীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেও অধিকতর মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। সর্বপ্রকার ব্যাধি এই কলিকাতার বুকে বিচরণ করে। তাহা ছাড়া এখানে লোক সংখ্যাও অত্যধিক। অথচ লোকসংখ্যা অনুযায়ী হাসপাতাল নাই, এই কারণে সাধারণ মানুষ কোন সাহায্য পায় না। কাজেই হাস-

পাতালের সংখ্যা যেমন বাড়ান দরকার সেইরূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করাও একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতায় পৌর নিগমের দায়িত্বও স্মরণীয়। কারণ, প্ল্যান যত বড়ই হোক না কেন, যদি পৌরসংস্থার কর্মী ও পৌর পিতাগণ অযোগ্য হন, তবে তাহা কখনই সার্থক হইতে পারে না।

উপরিউক্ত সমস্যা ছাড়াও শিক্ষা সংস্থাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। এই নগরীতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনেক থাকিলেও মূলতঃ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। যদি আঞ্চলিক ভিত্তিতে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত করা হয় তাহা হইলে শিক্ষাগ্রহণের অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

কলিকাতার উন্নতির অধিকাংশই নির্ভর করে গঙ্গার উপর। যদি গঙ্গার ধারা শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে জাহাজ গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইয়া বাণিজ্য গৌরব হইতে চ্যুত হইবে। ফলে আধুনিক জীবনযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মরুভূমির মতো কলিকাতার মৃত্যু ঘটিবে। সেই কারণে গঙ্গার সংস্কার এবং ইহার প্রধান সূত্র ফরাক্কা বাঁধের উপর কলিকাতার ঐতিহ্য ও গৌরব অনেকখানি নির্ভর করে। কলিকাতার প্রাণধারা গঙ্গা শুষ্ক হইয়া গেলে, যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হইয়াছে কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতার পুনর্গঠনে তাহাও ম্লান হইয়া যাইবে।

একটি শিল্পনগরী ঃ দুর্গাপুর

প্রারম্ভিক ভূমিকা

পশুচারণ যুগ হতে শিল্পযুগ—নানা ভাঙাগড়া আর বৈচিত্র্যের পথ বেয়ে এগিয়ে এসেছে মানব-সভ্যতা। প্রকৃতির দামাল ছেলে মানুষ। যন্ত্রের তাল-বেতালকে বশ করে সে স্নেহময়ী প্রকৃতির বক্ষ হতে তুলে নিয়ে এসেছে কত ঐশ্বর্যসম্ভার। এজন্য মানুষকে উদ্ভাবন করতে হয়েছে অসংখ্য যন্ত্রের। আর এইসব যন্ত্রের সাহায্যেই মানুষ উৎপাদিত করেছে কতশত পণ্যের। যে পণ্য ব্যষ্টি আর সমষ্টির জীবনধারণে সহায়তা করে। তাই মানুষ পণ্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে গড়ে তুলেছে অসংখ্য শিল্প নগরীর। এই শিল্প নগরীগুলি যুগ ও জীবনের যেমন চরম-পরম আশ্রয়স্থল তেমনি প্রয়োজনাতীত পণ্য সরবরাহ ও উৎপাদনেরও প্রধানতম কেন্দ্র। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের পরিচয়বাহী এইসব শিল্প নগরীগুলি।

সারা ভারতবর্ষের মধ্যমণি দুর্গাপুর। সমগ্র বাঙলাদেশের আশা-ভরসার আশ্রয় এই দুর্গাপুর। উড়িষ্যার 'রৌরকেল্লা' মধ্যপ্রদেশের 'ভিলাই'-এর মতই ভারতবর্ষের প্রধানতম শিল্পনগরী দুর্গাপুর। নিত্য উদ্ভাবনে ব্রতী মানবচিত্তের অসামান্য সৃজনী ক্ষমতায়

স্বাক্ষরই দুর্গাপুরের গোপন ইতিহাস। আশ্চর্য! কয়েক বৎসর আগেও এখানে শাল আর বনজঙ্গলে ঘেরা এক অখ্যাত পাড়া-গাঁ ছিল। কলকাতা হতে ১১৮ মাইল দূরে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পাশেই এটি অবস্থিত পূর্বে এখানে ছিল চোর ডাকাতের আশ্রয় এবং ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের এক বিচিত্র ডিপো। কিন্তু কালের বিধানে যন্ত্রের অমোঘশক্তিতে। সেই অখ্যাত গণ্ডগ্রাম আজ সুন্দর শিল্পনগরীতে রূপান্তরিত। দেশ-বিদেশের নানা মানুষের কোলাহলে সে মুখরিত।

দুর্গাপুর : বাঙলার শ্রেষ্ঠ শিল্পনগরী

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর এ দুর্গাপুর। দামোদরের উপর বাঁধ নির্মাণকালে বাঙলার জনপ্রিয় পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মনে সর্বপ্রথম এ দুর্গাপুরের ন্যায় বৃহৎ শিল্পনগরী গড়ে তুলবার পরিকল্পনা প্রথম জাগে। বিহার আর পশ্চিমবঙ্গের নানা কয়লাখনি অঞ্চলের মাঝে দুর্গাপুর নব পরিচয়ে পরিচিত। Coke oven plant-এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আর পার্শ্ববর্তী লৌহ আকরের খনি ছাড়াও বৃহত্তর কলকাতার বাজারগুলির সাথে সহজ সান্নিধ্য রয়েছে দুর্গাপুরের। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় শ্রমিক সংগ্রহের দিক হতেও বিস্তর সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই শিল্পনগরীর।

দুর্গাপুরের গুরুত্ব

শিল্পনগরী দুর্গাপুরকে সর্বদিক হতে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলবার জন্য এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ১৪৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। তার মধ্যে কোকচুল্লীর জন্য ৭২০ লক্ষ টাকা, তাপবিদ্যুৎ যন্ত্রের জন্য ৬৬১ লক্ষ টাকা, আর সাধারণ শিল্পোন্নয়ের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পরলোকগত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপস্থিতিতে এখানে যে বিরাট কোকচুল্লীটি স্থাপিত হয়েছে তাহাতে দৈনিক প্রায় এক হাজার টন শক্ত কোক উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

দুর্গাপুর পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ

শুধু শক্ত কোক নয়। অনেক কিছু আবশ্যকীয় সামগ্রী যাতে সহজে এখানে উৎপন্ন করা যায় সে উদ্দেশ্যেও নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সব সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম হল গ্যাস। বিভিন্ন কারখানা কিংবা গৃহস্থের ঘরে যাতে কম মূল্যে গ্যাস সরবরাহ করা যায় তার চেষ্টাও দুর্গাপুরে হয়েছে। অবশ্য প্রচেষ্টা পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত।

গ্যাস উৎপাদন

দুর্গাপুরের প্রসিদ্ধি ইস্পাত নির্মাণ কেন্দ্র হিসেবে ভারতবর্ষের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প নগরী-রূপে। এই ইস্পাত কারখানার জন্য মোট ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৪০ কোটি টাকা। এখানে বছরে প্রায় দশ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়। সম্মিলিত তেরটি ব্রিটিশ কোম্পানী কর্তৃক দুর্গাপুরের

ইস্পাত কারখানা

কারখানায় যন্ত্রপাতিগুলি স্থাপিত হয়েছে এবং তাদের নির্দেশ অনুসারে এ কারখারনা কাজ চলছে। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল ওয়ার্কস বা সংক্ষেপে 'ইস্কন' (ISCON) নামে তা পরিচিত। এই কারখানা নির্মাণের উদ্দেশ্য যাতে সর্বপ্রকারে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে তারজন্য অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই শিল্পোদ্যমকে সার্থকতর করে তুলবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গাপুরে বৃহৎ যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য একটি কারখানা নির্মাণ করেছেন। এজন্য ৫০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। বে-সরকারী উদ্যোগ হিসেবে এখানে 'দি এ্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর' শিল্পপ্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। সর্বনাশা বেকার সমস্যার আংশিক সমাধানে অদূর ভবিষ্যতে দুর্গাপুর হবে পরম আশ্রয়। এর সমস্ত পরিকল্পনাগুলি সর্বপ্রকারে সার্থক করে তুলবার পেছনে তাই রয়েছে পশ্চিম-বঙ্গের অনেকখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আশা ও ভরসা।

দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ

ভারত ও ব্রিটিশ যুগ্ম উদ্যোগ ও মৈত্রীর পরিচয়বাহী এই দুর্গাপুর। দুর্গাপুরে শত শত শ্রমিকের নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টায় যে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উঁকিঝুঁকি মারছে তার সার্থকতার সাথে জড়িয়ে রয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের প্রধান প্রশ্ন। আর এর সর্বপ্রকার সাফল্য পরোক্ষতঃ ব্রিটিশ-ভারত মৈত্রীকে দীর্ঘজীবী করে তুলবে। স্থাপিত হবে নতুনতর সম্পর্কের।

ভারত-ব্রিটিশ মৈত্রী

দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ অনেক আশা ও স্বপ্নের রঙে রঙিন। দুর্গাপুরের সার্থকতা এনে দেবে নবতম সমৃদ্ধির জোয়ার। সারা ভারতবর্ষের হৃৎ-স্পন্দন একদিন এই দুর্গাপুরে পাওয়া যাবে। তবুও আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, এতদিন পর্যন্ত দুর্গাপুরে শুধু ক্ষয়-ক্ষতি আর লোকসানই হয়ে এসেছে। বিরাট সম্ভবনার উজ্জ্বল পরিচয় আজও দুর্গাপুরে মেলে নি। আশা করা যায় ভবিষ্যতে তা মিলবে। এবং কালে-দিনে এই দুর্গাপুর হবে কলকাতার মতই বাঙলা আর ভারতের গর্বের ও ঐশ্বর্যের শিল্পনগরী।

উপসংহার

মহামানবের জীবন ও বাণী : বুদ্ধ

[স্কুল ফাইনাল ১৯৬০]

জাগতিক জীবনে গৃহীমানুষ একক নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। পার্থিব সুখ-সুবিধা ছাড়াও জীবনের যে একটা আলাদা তাৎপর্য আছে, সমাজের নিকটও যে একটা দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে সাধারণ মানুষ প্রায়ই ইহা বিস্মৃত। এ জন্য স্বার্থমগ্ন জীবনের শরিকানা প্রাপ্ত সাধারণ মানুষ বৃহত্তর স্বার্থের, গভীরতর ঐক্যের এবং সমষ্টি

কল্যাণের উন্নত আদর্শের কথা কখনো চিন্তাও করিতে পারে না। কিন্তু এই পৃথিবীতেই যুগে যুগে এমন মানুষ জন্মাইয়াছেন, যাঁহারা ব্যক্তিগত সুখের ঊর্ধ্বে সমষ্টিগত সুখকেই স্থান দিয়াছেন। গভীরতর মানব হিতৈষণার প্রবল আগ্রহ তাঁহাদিগকে দশের কোঠা ভাঙ্গিয়া একাদশের কোঠায় টানিয়া লইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের অমর সন্তান বুদ্ধদেবের নাম উপরোক্ত শ্রেণীর অসামান্য প্রতিভার অধিকারী মহামানবদের নামের তালিকায় শীর্ষস্থানে শোভা পাইবে। তাঁহার জীবন ও বাণী প্রকৃতই একজন মহামানবের জীবন ও বাণী। এবং উহার মূল্যায়ন প্রগাঢ় সত্যানুরক্তি ও গভীরতর মানবপ্রীতির পরিচায়ক।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু জনপদের রাজার নাম শুদ্ধোদন। বুদ্ধদেব তাঁহারই পুত্র। আজ হইতে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে তাঁহার জন্ম। অবারিত ভোগ, ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার মধ্য দিয়া বুদ্ধদেবের বাল্যজীবন কাটে। বাল্যকাল হইতেই সিদ্ধার্থ নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। কিন্তু নির্জনতা প্রিয় বিষণ্ণ মনের অধিকারী ছিলেন গৌতম বা বুদ্ধ। রাজা শুদ্ধোদন তাঁহার পুত্রের অনাসক্ত ভাব দেখিয়া তাঁহার সহিত গোপানামা একটি সুন্দরী রমণীর বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহ বন্ধন বা রাজৈশ্বর্য সিদ্ধার্থের অন্তরে কোন স্থায়ী প্রভাব রাখিতে পারিল না। কথিত আছে, একদিন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ রোগী ও মৃতব্যক্তিকে দেখিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি স্থির করিলেন, মানুষকে জরা, রোগ ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই হইল তাঁহার জীবনের সাধনা। এই সময় এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তাই রাজপ্রাসাদের ভোগী জীবনের বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি গৃহত্যাগী হইলেন।

জন্ম বংশ পরিচয়

গৃহী সিদ্ধার্থ ক্রমে সংসারে জড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে স্ত্রী, পুত্র, সংসার সব কিছু ত্যাগ করিয়া আসিলেন। জ্ঞানান্বেষণের আকাঙ্ক্ষায় নানা স্থানে বহু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার তৃষ্ণায় বারিপ্রদান করিতে পারিল না, পারিল না তাঁহার অনন্ত জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে। অতঃপর তিনি গয়ায় বোধিদ্রুম মূলে সুকঠোর তপশ্চর্যায় মগ্ন হইয়া দীর্ঘকাল সাধনার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার পর হইতে তাঁহার নাম হইল বুদ্ধ। বুদ্ধ শব্দটির অর্থ হইল জ্ঞানী। আপন ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। বারাণসীর নিকট মৃগদাব নামক স্থানে তিনি সর্বপ্রথম তাঁহার ধর্মপ্রচার করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্ম যাঁহারা গ্রহণ করিলেন তাঁহারা বৌদ্ধ নামে পরিচিত। বুদ্ধদেবের ধর্মমতে আকৃষ্ট

কর্মজীবন

হইয়া একে একে মগধ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যের পরাক্রান্ত রাজারা এই ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। ভারতের বহু রাজ্যে এই ধর্ম প্রচারিত হইল। পরবর্তীকালে মহামতি অশোকের চেষ্টায় ও আগ্রহে এই ধর্ম চীন, জাপান, ব্রহ্ম, মালয়, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হয়। বুদ্ধদেবের শিষ্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বুদ্ধের বাণী 'ত্রিপিটক' গ্রন্থে সংকলিত হয়। দেশ বিদেশের পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা এই ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় লাভে উদ্যোগী হন।

ইতিহাসের এক পরম মাহেন্দ্রক্ষণে বুদ্ধের আবির্ভাব। যাগ-যজ্ঞ পশুবলির মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্যে বিক্ষুব্ধ মানবপ্রেমিক সিদ্ধার্থের হৃদয় সেদিন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন নূতন পথ সন্ধানে। যে পথ আনিয়া দিতে পারে জীবন ধারণের উন্নত আদর্শ ও সুগভীর তাৎপর্য। তাই বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মের মূলমন্ত্র অহিংসা। সর্বজীবে প্রেম, পবিত্রতা, সংযম, সৎপথ ও অনাসক্তিই জীবের মুক্তির উপায়। ইহাই বৌদ্ধধর্মের সারকথা। মানুষ এই অনুশাসন পালন করিলে অনায়াসে জরা প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। উপবাস, যাগযজ্ঞ প্রভৃতির উপর বুদ্ধদেবের বিশ্বাস ছিল কম। জন্মান্তরবাদও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'মানুষ যদি সৎ পথে চলে, সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়, সংযম দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করে, তবে সে পার্থিব দুঃখ-কষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।' বৌদ্ধধর্মের মোক্ষ সাধনার চরম পর্যায় নির্বাণ। জাতিভেদ প্রথায় বুদ্ধদেব অবিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের মধ্যে কোন ভেদনীতিও তিনি স্বীকার করিতেন না।

বুদ্ধদেবের বাণী

সর্বযুগের, সর্বক্ষণের চির-আরাধ্য মহামানব হইলেন বুদ্ধদেব। তাঁহার জীবনই তাঁহার বাণী। সহস্র বর্ষব্যাপ্ত এই মহামানবের জীবন ও বাণী পৃথিবীর মানুষকে চির ঐক্যের আস্বাদ দিয়াছে যুগে যুগে, কালে কালে, এবং দেশে দেশে। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'...এখানে চলিতেছে নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। তাই রক্তপাত, মারামারি, হানাহানি এ যেন প্রতিদিনকার দৈনন্দিন ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এজন্যেই আজ এই মহামানবের 'অহিংসাই পরম ধর্মের' উন্নত আদর্শের নব মূল্যায়ন ও উপযোগিতা বিচারের প্রয়োজনীয়তা দিনের পর দিন বড় হইয়া দেখা দিতেছে। মানুষ মরিয়া যায় কিন্তু তাঁহার কীর্তি কখনও লুপ্ত হয় না। বুদ্ধদেবের শরীরী উপস্থিতি নাই বা রহিল, তাঁহার বাণী ত রহিয়াছে। উহাই হইবে এযুগের মানুষের যথার্থ বাঁচার মত বাঁচার প্রকৃষ্ট পন্থা।

উপসংহার

জাতীয় সংহতি

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। ভৌগোলিকের বিস্ময়, ঐতিহাসিকের সমস্যা, প্রত্নতাত্ত্বিকের জিজ্ঞাসা, দার্শনিকের কৌতূহল, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির শ্রদ্ধা, এবং সমাজবিদের পর্যবেক্ষণ—সবই এই বিরাট ভারতবর্ষকে ঘিরে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এর বিচিত্র সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির উন্নত শুচিশুদ্ধ আদর্শ বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় হয়ে রয়েছে। বর্তমানে ১৫টি প্রদেশ ৬টি কেন্দ্র-শাসিত অঙ্গরাজ্য, দশের অধিক ভাষা ও বেশ কয়েকটি উপভাষা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীর সমবায়ে এদেশ বিচিত্র-বিস্তৃতরূপ লাভ করেছে। এই বিচিত্রতা অব্যাহত রেখে গভীরতর ঐক্যের বাঁধনে সমস্ত জাতিকে বাঁধবার সুমহান আদর্শের জন্যই আজ দেশের প্রতিটি চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী জাতীয় সংহতি সাধনে উদগ্রীব এবং আগ্রহী।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে : 'United we stand divided we fall.' এই প্রবাদের সার্থকতা আমাদের জীবন চালনার প্রয়োজনেও অত্যাবশ্যক। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীক সব দিক হতেই এই 'United' বা ঐক্য প্রয়োজন। এই ঐক্যবোধ পুষ্ট চিন্তাই জাতীয় সংহতি ভাবনার মূল।

জাতীয় সংহতি
কি এবং কেন

'জাতি' শব্দটির অর্থ বহু ব্যাপক। ভাষাগত সম্প্রদায়, প্রদেশগত বৈশিষ্ট্যকে ঘিরেই জাতি শব্দটির বহুধা ব্যবহার করা হয়। এই উপমহাদেশ সদৃশ ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে সুমহান ঐক্য না গড়ে তুলতে পারলে অখণ্ড ভারত-বর্ষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। কারণ, অখণ্ড ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির মধ্যকার একীভূত স্বরূপটির উপলব্ধি শুধুমাত্র আদর্শগত বা ভাবগত নয়। এর উপলব্ধি সম্পূর্ণ বস্তুগত। এজন্যে সমস্যা জটিল ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক সব সমস্যার সমাধান একা সরকারের বা রাষ্ট্রের পক্ষে করা অসম্ভব। এজন্য প্রয়োজন দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা। নতুবা, শুধুমাত্র পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করে দেশের স্বয়ং স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে টিকিয়ে রাখা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক কৃপাদৃষ্টি নিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করেছেন : 'India offers unity in diversity' অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অবস্থান ভারতবর্ষে ছিল। এর স্বপক্ষে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ- ধর্মচারণা প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আসলে বৈচিত্র্য ও ঐক্য শব্দটির মধ্যে যথেষ্ট আপেক্ষিক দূরত্ব

রয়েছে। বৈচিত্র্য স্বভাবজ। শুধু ভারতবর্ষ নয় সব দেশেই বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য ছিল কিনা তাহাই বিচার্য। আসলে, যে ঐক্যের উল্লেখ করা হয় তা মূলতঃ ভাবগত। মনে মনেই এর অবস্থান, জন্ম ও বৃদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে যথার্থ বাস্তব ঐক্য বা গভীরতর জাতীয়তাবোধ ইংরেজ আগমনের আগে কখনও জন্মায়নি। প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজের অত্যাচার রোধ করার উচ্চতর আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে ভারতবাসী সেদিন গভীরতর ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ঐক্যবুদ্ধিই স্বাধীন ভারতবাসীর চিন্তায় ও চেতনায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

জাতীয় সংহতি কী পূর্বে ভারতবর্ষে ছিল

প্রথমতঃ ভারতবর্ষের বিরাটত্ব এবং এর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য জাতীয় সংহতি সাধনের পক্ষে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার তারতম্য রয়েছে। তৃতীয়তঃ সমগ্র ভারতবাসী সমস্যাভারে পীড়িত হয়ে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে সমষ্টিকে স্থান দিতে পারছে না। চতুর্থতঃ কতকগুলি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের অপপ্রচারের অতিরেকতা রয়েছে। পঞ্চমতঃ সুযোগ-সুবিধার দিক হতে স্বজনপোষণ নীতির প্রাবল্য ঘটেছে। ষষ্ঠতঃ রাষ্ট্রের তরফ হতে দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখা হচ্ছে। ফলে সমষ্টি কল্যাণবোধের আদর্শ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থেকেই বেশী করে দেখছে রাষ্ট্র। সপ্তমতঃ উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তৃতির অভাবে দেশের প্রতিটি মানুষ সমভাবে জাতীয় সংহতির উপযোগিতা ও তাৎপর্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছে না।

জাতীয় সংহতি সাধনে অসুবিধা

বৃহত্তর সমষ্টি কল্যাণের উচ্চতর আদর্শে প্রয়োজন হচ্ছে দেশের প্রতিটি মানুষের সমচেতনা-বোধের। এজন্য দরকার সর্বস্তরে শিক্ষার বিস্তারসাধন। ইহা ব্যতীত সর্বপ্রকার প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিগোষ্ঠির হীন অপপ্রচার বন্ধ করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানেরও ব্যবস্থা করা দরকার। তাছাড়া অখণ্ড ভারতের ব্যাপক সমস্যা সম্বন্ধে যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ সজাগ সচেতন হয়ে উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জানাতে হবে। সর্বপ্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও শ্রেণীবৈষম্য যাতে না থাকে তারও চেষ্টা করতে হবে।

জাতীয় সংহতি সাধনের উপায়

সমস্ত জাতির অনাগত ভবিষ্যৎ ছাত্রদের ঘিরে। ছাত্রদের কর্মাদর্শের দ্বারাই সম্ভব সমস্ত জাতির আশা ভরসাকে বাস্তবরূপ দেওয়া। এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক ও উহার সহমর্মি মনোভাবের প্রসারের প্রয়োজন। একাধিক ভাষা শিখে নানাপ্রদেশবাসীর সাথে পরিচিত হবারও দরকার রয়েছে ছাত্রদের। তারাই একমাত্র পারে ভাষাগত বিভেদকে দূর করে, ধর্মীয় গোঁড়ামির উচ্ছেদ

ছাত্রদের ভূমিকা

করতে। প্রয়োজন হলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

বাঙলা ও বাঙালী চিরদিনই জাতীয় সংহতির স্বপ্ন দেখে এসেছে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি উনিশ শতকের মনীষীরা ঐক্যের কথাই ভেবেছিলেন। বাঙালী কবির কণ্ঠে আমরা শুনেছি আশার বাণী 'বল বল সবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' বাঙালী আজও পিছিয়ে থাকবে না। মহাজ্ঞানী মহাজনদের চলা পথে চলে পাথেয় স্বরূপ তাঁদের বাণীকে বহন করে বাঙালী জাতীয় সংহতি সাধনে সুযোগ্য ভূমিকা বেছে নেবে। এই জাতীয় সংহতিবোধই আন্তর্জাতিক মনোভাবের প্রতিষ্ঠা দেবে।

উপসংহার

ঐক্য সন্ধানে ভারত

ভারত আবহমান মানবতার পূজারী। ভারতের আত্মা চিরকাল ঐক্যের সন্ধান করিয়া আসিয়াছে। ভারতের বুকে যুগে যুগে মানবতার পূজারীর জন্মলাভ ঘটিয়াছে। ভারতের আত্মা বেদ বেদান্ত, শ্রুতি-স্মৃতি, উপনিষদের যুগ হইতে ঐক্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিয়াছে। ভারত জানে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' আবার 'মানুষের মাঝে স্বর্গনরক মানুষেতে সুরাসুর' একথাও ভারত ভুলে নাই। তাই ভারতের সাধনা ঐক্যের এবং 'সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার।'

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ভারতের একদিকে রহিয়াছে দুর্ভেদ্যশিখর হিমালয় অন্যদিকে সমুদ্রের তরঙ্গ। একদিকে আসামের অসীম জংলা পাহাড় অন্যদিকে সুদূর বেলুচিস্তান। ভারতের জাতীয় বৈচিত্র্য বুঝি এই পরিবেশকে অনুসরণ করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, মুসলমান, খৃষ্টান এই বিভিন্ন ধর্মের আওতায় অবস্থান করিতেছে বাঙালী, বিহারী, আসামী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, কাশ্মিরী প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ব্যবহারের, বিভিন্ন আচারের এবং বিভিন্ন চরিত্রের লোকেরা। ভারতের একদিকে আর্য, অন্যদিকে দ্রাবিড় অনার্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বংশধরেরা স্থান পাইয়াছে। কালোর পাশে ধলো, আলোর পাশে অন্ধকার, দিনের পাশে রাত্রিকে ভারতীয়

বৈচিত্র্য মণ্ডিত ভারতবর্ষ

জীবন অস্বীকার করে নাই। সেই কারণে ভারতের প্রেমের প্রদীপের নীচে কখনো আঁধার জমিয়া যায় নাই।

আশ্চর্য এই যে এই পর্বত প্রমাণ বৈচিত্র্য ভারতের ঐক্যকে কখনো বিনষ্ট করিতে পারে নাই। ভারতের আশ্চর্য প্রেমের বাণী 'যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী' প্রেম বন্ধনের পথকে দিনরাত্রি মুখরিত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে হয়ত পাশ্চাত্ত্য জগতের, কথা না মনে পড়িয়া যায় না। সে দেশে বৈচিত্র্যে ঐক্য সাধন সম্ভব হয় নাই, সেই দেশ সকলকে ডাকিয়া বলিতে পারে নাই।

বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য

'হে রুদ্রবীণা, বাজো বাজো বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে।'

'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে' একথা ভারতের কবিই উপলব্ধি করিয়াছেন। আজ যেখানে বর্ণ বিদ্বেষী ধোঁয়ায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা কলুষিত সেখানের একটু ছোঁয়াও ভারতে স্পর্শ করে নাই, যদিও ভারতে কালো ধলোর অভাব নাই, আর অনেক ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ভারতে আশ্চর্যজনক। ইংরেজ কবি টমসন বলিয়াছেন :

The angles keep their ancient places,
Turn but a stone, and start a wing ;

ভারতের সাধকও বাদ যান নাই। তাঁদের কাছে, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'! তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন—'মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক'—তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, হিংসার দ্বারা রাজ্য জয় করা যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথা মনে পড়িয়া যায়। অতি প্রাচীনকালেও আমরা ভারতের মধ্যে এই ঐক্যবোধের প্রচার দেখিয়াছি। ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে চোখে পড়িয়া যায়, এই ঐক্যের সাধনা কেমনভাবে আমাদের সর্বদা প্রভাবিত করিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি অশোক বলিয়াছেন, 'বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি'।

আমরা আরও লক্ষ্য করিয়াছি, অশোক কি কঠিন প্রেমের মায়ায় সমস্ত দেশকে শাসন পাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। ভরতের ঐক্য শাসনের সেই একজন শ্রেষ্ঠ শাসকের কথা আমরা কখনো ভুলিতে পারি না। কেনই বা বিস্মৃত হই আকবরের কথা—আকবর যদিও মুসলমান তথাপি, ঐক্যের জন্য তিনি অসীম ত্যাগ সহ্য করিয়া হিন্দু-মুসলীমকে প্রীতিবন্ধনে বাঁধিতে সর্বদা সচেতন ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, আকবরের পথপ্রদর্শক শেরশাহের কার্যাবলী

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য-ঐক্য

আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেশী বিদেশী রাজন্যবর্গের ঐক্যবন্ধনের আগ্রহের কি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত দেখিয়াছি।

আধুনিক ভারত 'শক-হুন-দল পাঠান মোগল'-এর এই একত্রিত রূপকে সযত্নে অনুসরণের মাধ্যমে পূর্ণ করিতে সচেষ্ট। আমরা লক্ষ্য করিতেছি ভারতের বুকে ঐক্য সন্ধান ভাষা, জাতি প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও মুছিয়া যায় নাই। পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলন, বাঙলা-আসাম বিরোধ তারই উদাহরণ। অবশ্য '৪৭ সালের পরে বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগে অনেকের মনেই ঐক্য সাধনের চিন্তায় সংশয় ঘটিয়াছে। অনেকে ভাবিতেছেন হয়ত 'মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান'। আমরা এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারি না।

বর্তমান ভারত ও ঐক্যবোধ

অস্বীকার না করিয়াও আমরা ভারতের ঐক্যের সন্ধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা বান্দুং সম্মেলনের কথা এত শীঘ্র বিস্মৃত হইতে পারি না, আমরা পঞ্চশীলের নীতির কথাকে কেমন করিয়া এড়াইব। আজ মেগাটন, এ্যাটমে সমৃদ্ধ রাশিয়া ও আমেরিকা ধ্বংসের নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে। আজ হয়ত,

'শান্তির ললিত বাণী
শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'।

তবুও ভারতের শান্তির বাণী ঐক্যের সন্ধানে চলিয়াছে। অশোকের সেই একটিমাত্র রাষ্ট্রব্যাপী-নীতি, ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলালের (পঞ্চশীলের উদ্গাতা) প্রচেষ্টায় আজ আন্তর্জাতিক নীতিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভারতের মৃত্তিকা তাই শান্তি-গামীর বারাণসী। অধ্যাপক হলডেন প্রভৃতি শান্তিকামী পুরুষেরা তাই ভারতের এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ত আজ সমস্ত পৃথিবীতে সেই পঞ্চশীল নীতি এত আদরণীয়। সাম্প্রতিক চীনের সহিত সীমানা দ্বন্দ্ব বা পাকিস্তানের সহিত বিবাদ ভারতের সেই শাশ্বত আত্মাকে কখনোই পরাজিত করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ তার ঐক্যের আহ্বানে সমগ্র পৃথিবীকে শান্তির পতাকাতলে একত্রিত করিবে। ভারতের চিরকালের সাধনা সমগ্র পৃথিবীতে একটিমাত্র পরিবার থাকিবে, সেই পরিবার হইবে মানব-পরিবার। মানুষের ভেদাভেদ যার দ্বারা দূরীভূত এবং বন্ধন-দৃঢ়ীভূত হইবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীও সমস্ত জীবন এই ঐক্য সন্ধানে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে, কঙ্গোয়, আমেরিকায় কোন স্থানেই আজ তাই ভারতের নিরপেক্ষ নীতিকে ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। তাই আজকের এই দুর্দিনের রাত্রির মেঘ কাটিয়া গিয়া ভোর হইবার সাথে সাথে সূর্য আসিবেন অগ্নিরথে। তবুও এই ঐক্য সাধনা এখনও অসম্পূর্ণ; এখনও নিগ্রো ও শ্বেতাংগের

উপসংহার

দ্বন্দ্ব, আমেরিকা রাশিয়ার মন কষাকষি প্রভৃতি নানা ঘাত-প্রতিঘাত এই ঐক্যসন্ধানে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি 'এই মহামানবের সাগরতীরে' আমাদের চিত্তের ঐক্য জাগিয়া উঠিবেই। কেন না,

'মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে।'

তাই আজও ভারতের ঐক্যচেতনা—যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।

নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি

প্রারম্ভিক ভূমিকা

অতীতকালে যুদ্ধবিদ্যাকে বৈচিত্র্য নিবৃত্তির উপায় হিসাবে গণ্য করা হইত। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ যুগের রূপ ও প্রকৃতি যে কি ভয়াবহ পরিণতি লাভ করে তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্ববাসী সচেতন। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কুফল আজও বিশ্ববাসী ভুলিতে পারে নাই। সর্বনাশা আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগের ফলে কতশত জীবন, কত শস্যভূমি ও শিল্প-সামগ্রী যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আশাময় জীবনে বাজে করুণ বেদনাহত সঙ্গীত। সোনালী শস্যক্ষেত্র মরুভূমির ধূসরতাকে আহ্বান করিয়া আনে। পরিবার হইতে সমাজ, সমাজ হইতে জাতি এবং জাতি হইতে সমগ্র বিশ্ববাসীকে উহার কুফল ভোগ করিতে হয়। তবুও বিশ্ববাসী বলিবে যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য

নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে আসিতে হইলে এ যুগের যথার্থ উদ্দেশ্য কি তাহা জানা প্রয়োজন। যুদ্ধের পশ্চাতে থাকে ক্ষমতার দম্ভ, রক্তপাত ঘটান স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য। এইরূপ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় উদ্দম নহে। যুদ্ধের সক্রিয় উদ্দেশ্য হইল ধ্বংসকে ডাকিয়া আনা। আর সেই ধ্বংসের মাশুল-স্বরূপ বহু লোকের মৃত্যু এবং শত শত গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হয়। ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নিত্যসঙ্গী হইয়া দাঁড়ায়।

বিশ্বের বর্তমান অবস্থা

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি নিশ্চয়ই সুখদায়ক নহে। পৃথিবী আজ দুইটি শিবিরে বিভক্ত। একটি শিবিরের পরিচালক ধনকুবেরের দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যটির পরিচালনা করে সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া। এই উভয় শিবির পরিচালকদের মতপার্থক্যের ফলে বর্তমান বিশ্বে সব সময় চলে শীতল স্নায়বিক যুদ্ধ। একদিকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি চায় অর্থনৈতিক সহায়তা করিয়া অন্যান্য দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দানের সহিত পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতি মানিয়া চলে। ফলে সন্দেহ, ঈর্ষা এবং ভয় প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীকে সন্ত্রস্ত এবং চমকিত করিয়া তুলে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের জিগির আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও দলাদলির জন্য আরও ভয়াবহরূপ দেখা দিতেছে। যথার্থই মানবসভ্যতা আজ দুর্বিসহ পরিবেশে আবদ্ধ। শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতা, আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বিকাশ বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিকে আরও জটিলতর করিয়া তুলিতেছে।

সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চিত এবং বিপদসঙ্কুল। এরূপ পরিস্থিতিতে

মানবমনীষার জ্ঞান ও সম্প্রীতিবোধ অবশ্য প্রয়োজন। জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়াই তাই স্বাভাবিকভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা আজ অত্যন্ত গভীরভাবে দেখা দিয়াছে। যুদ্ধবাদীরা সম্ভবত যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা বলিবে। কিন্তু উহা স্বার্থপ্রসূত উদ্ভট পরিকল্পনা মাত্র। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে আজ বিভিন্ন রকমের মারণাস্ত্র নির্মাণ করা অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠিয়াছে। আর উহার সার্থক ব্যবহার বিশ্ববাসীকে কখনও যুদ্ধের পরে শান্তি অক্ষুণ্ণ আছে কিনা তাহা দেখিবার মত সুযোগ দিবে না। এ কারণেই যুদ্ধ ব্যতিরেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার একটি মাত্র পথ হইল নিরস্ত্রীকরণ।

নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা

ইহা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, বিশ্বের পরাক্রমশালী দেশগুলির নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ মানিয়া চলা প্রয়োজন। কারণ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে তাহারাই। যে কোন প্রকারের বৃহৎ যুদ্ধই সমগ্র মানবজাতির সমূহ অনিষ্ট ডাকিয়া আনিবে। কিন্তু মানুষ কখনও নিজের মৃত্যুকে বরণ করিতে চাহে না। যুদ্ধকে কখনও কেহই জীবনের মধ্যমণিস্বরূপ গণ্য করিতে চায় না। ইতিপূর্বে মানবমনের অন্তর্নিহিত পশুশক্তির বিকাশ বহুবার যুদ্ধ ডাকিয়া আনিয়াছে। প্রত্যেক মানুষই কামনা করে সমগ্র বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক্। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যুদ্ধখাতে ব্যয় হ্রাস করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দম্ভকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানবজাগরণ দেখা দিয়াছে।

বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলির ক্ষেত্রে নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ

বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ এবং মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সহাবস্থানের নীতি মানিয়া চলা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিরোধ ও শত্রুতাকেও সহাবস্থানের আদর্শের মানদণ্ডে মিটাইয়া ফেলার চেষ্টা করা উচিত। সহাবস্থানের নীতি কার্যকরী করিতে হইলে নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ কার্যকরী করা প্রয়োজন। নিরস্ত্রীকরণই একমাত্র পথ যাহার দ্বারা বিভেদ, বৈষম্য এবং অনৈক্য অপসারিত করিয়া জাতিতে জাতিতে অবিসংবাদিত মিলনকে বোধন করিবার মত সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ মানিয়া চলিবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী শান্তি কামনাকারী বিশ্ববাসী তাই বারবারই অনুরোধ জানায় ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনায়কদের নিকট। ভারত শান্তি কামনা করে বলিয়াই পরাধীনতার অবসান চায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজনীন নিরস্ত্রীকরণ ও যুদ্ধাস্ত্র বর্জনও চায়। এই কারণে পারমানবিক বোমার পরীক্ষার বর্জনের উপদেশও দেয় ভারত।

উপসংহার

আধুনিক মারণাস্ত্র ও এবিষয়ে মানুষের দায়িত্ব

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২]

বিজ্ঞান অভিশাপ নয় আশীর্বাদ। মানুষের শুভ ও কল্যাণ বুদ্ধিই বিজ্ঞানের প্রসূতি। বিজ্ঞানের যথার্থ সদ্ব্যবহারও মানুষের কার্যক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। সুদূর অতীতকাল হইতে মানবসভ্যতার বহু রূপান্তরের মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞান। যথেচ্ছ সদ্ব্যবহার দ্বারা বহু জাতি নানাক্ষেত্রে ইহার কৃতিত্ব ও দক্ষতা দেখাইয়াছে। আবার এই বিজ্ঞানের অসদ্ব্যবহার দ্বারাও মানবজাতির ইতিহাস বহুবার নানাভাবে কলঙ্কিত হইয়াছে। তাই অনেকের ধারণা, বিজ্ঞান হইল অভিশাপ। হয়তো এই বিজ্ঞানই একদিন পৃথিবীকে সর্বনাশা ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া যাইবে, এই আশঙ্কার ভয়াবহতা সমগ্র মানবজাতিকে অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক ভবিষ্যতের দিকে লইয়া যাইবে। এ কারণেই বিজ্ঞানের অবদানের গুরুত্ব বিচারের সহিত ইহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের প্রশ্নও সমানভাবে চিন্তা করিবার মত।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল—এদের সবারই জন্ম মানবমনে। মানুষের আচার-আচরণে এরা ব্যক্ত হয়ে উঠে। মানুষের ভিতরে পশুভাবও সুপ্ত রহিয়াছে। এই পশুভাব মাঝে মাঝে মানবিক আচরণে প্রকাশিত হয়। মারণাস্ত্র আবিষ্কারের পিছনেও এই পশু-ভাব লুকাইয়া আছে। তাহা না হইলে যে বিজ্ঞান কল্যাণময়ী—সে বিজ্ঞানের অসদ্ব্যহার মানুষ করে কেমন করিয়া। যে বিজ্ঞানের অবদানে নব নব আবিষ্কারে মানবজাতির উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে, আবিষ্কর্তা মানুষ তাহার বিকৃতবুদ্ধির তাড়নায় হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কার করিয়াছে মারণাস্ত্র—আরও কত কি। এই সব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার কত বিপজ্জনক, কত ভয়াবহ তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে। তবুও শক্তিশালী জাতিগুলি দম্ভ করে মারণাস্ত্র আবিষ্কারের দিক হইতে কে কত অগ্রগামী, কে কত শক্তিশালী। অথচ এই মারণাস্ত্রকেও অন্যভাবে ব্যবহার করা যায়। এই মারণাস্ত্র ঊষর মরুতে মন্দাকিনীর ধারা আনিয়া দিতে পারে। দুর্জয় পর্বতের দুর্ভেদ্যত্বকে সমূলে উৎপাটন করিয়া দিতে পারে। কই সেদিকে ত কাহারও লক্ষ্য নাই।

মারণাস্ত্র প্রসঙ্গ

এ যুগে যুদ্ধ সকলেরই অনাকাঙ্ক্ষিত। যুদ্ধ সর্বধ্বংসী বিপজ্জনক ও ভয়াবহ। এ যুগের নিয়ন্তা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের পূজারী বৈজ্ঞানিক। তিনি মানবজাতির নমস্য ও শ্রদ্ধেয়। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির কর্মক্ষমতা অপরিসীম। বিজ্ঞানের সবটুকু ঐশ্বর্য, সবটুকু অবদান তাই এঁদেরই দৌলতে। অথচ এঁরাই হইতেছেন আবার মারণাস্ত্রের আবিষ্কারক। যে মারণাস্ত্রের ব্যবহার শুধুমাত্র যুদ্ধে। যে যুদ্ধ কাহারও ঈপ্সিত নয়। যাহাতে কাহারও আনন্দ নাই, কাহারও সুখ নাই। ইহার একমাত্র লক্ষ্য শত শত মানব নিধন। তবুও মানুষ কামনা করে যুদ্ধ,

বিজ্ঞান, মারণাস্ত্র ও বর্তমান যুদ্ধ

লক্ষ্য রাখে মারণাস্ত্রের কার্যক্ষমতা ও ইহার সর্বধ্বংসীতার প্রতি। এ কালের নোবেল পুরস্কার প্রাপক ঔপন্যাসিক তাঁহার অভিজ্ঞতা দিয়া মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন :
"They wrote in the old days that it is sweet and fitting to die for one's country. But in modern war there is nothing sweet nor fitting in your dying. You will die like a dog for no good reasons." [Farewell to arms : A. Hamingway.]

আজও মানুষ ভুলে নাই হিরোশিমা, নাগাশাকির কথা। তাই যুদ্ধ এ যুগে সবারই অপ্রিয়। সারা পৃথিবীতে রহিয়াছে দুইটি শক্তিশালী শিবির—রাশিয়া ও আমেরিকান। একটি সমাজতান্ত্রিক ও অপরটি ধনতান্ত্রিক। এই দুই শিবিরের মধ্যকার দ্বন্দ্বও বড় প্রবল। তাই রাশিয়া যদি কোন হুমকি দেয়, আমেরিকা তখন বেপরোয়া হইয়া উঠে। এই দুই শিবিরের কলহ যখন চরমে উঠে তখন তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের আশঙ্কায় বিশ্ববাসী ভয়ে জড়সড় হয়। আপন আপন শক্তিমত্তা ও দম্ভ প্রকাশ কামনায় বিশ্বের শক্তিশালী জাতিগুলি ব্যাপৃত হয় আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। আধুনিক মারণাস্ত্রের কুফল পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া, সুন্দর ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ বিশ্ববাসী নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। চারিদিকে নাগিনীর বিষাক্ত নিশ্বাস। এখানে শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাস। তবুও 'জাহান্নামের আগুনে বসিয়া পুষ্পের হাসি' হাসিয়াছে মানুষ। তাই বিশ্ববাসীর শান্তিকামনা কখনও অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না। বিশ্বের সব শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীর নেতারা তাই বড়ই সতর্ক, বড়ই হুঁসিয়ার। অবশ্য ইহার তলে তলে ঠাণ্ডা স্নায়বিক লড়াই এবং আধুনিক মারণাস্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা সমান-ভাবে সক্রিয় রহিয়াছে।

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি

সমাজজীবন হইতে যুদ্ধ সম্পূর্ণ রোধ করার কার্যকরী ও শ্রেষ্ঠ পন্থা হইল সর্বপ্রকার মারণাস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করা এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইয়া ফেলা। সম্মিলিত জাতিসংঘের তরফ হইতে এ ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া দরকার।

উপসংহার

অবশ্য মারণাস্ত্রের যদি এতটুকু কল্যাণকামীতার দিক থাকে, তবে তার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সারা পৃথিবী জুড়িয়া এক নব আলোড়নের সঞ্চার হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগোষ্ঠীর বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই আদর্শ পূর্ণতর প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসরমান। অতএব তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির অপমোহ বিস্মৃত সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া অদুর ভবিষ্যতে একটি শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতির নির্মল বাসনা-ধারার স্রোত প্রবাহিত হইবে। আশা করা যায় দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রনায়করা এই উচ্চতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মারণাস্ত্র ব্যবহারের কুফল পরিপূর্ণভাবে

হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার ব্যবহার বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন। তবেই বিশ্ববাসী অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে নগণ্য জ্ঞান করিয়া গভীরতর ঐক্যবোধে উদ্দীপিত হইবে। আর আক্ষেপের কারণ নাই। বিশ্ববাসীর নিরন্তর প্রচেষ্টায় সেই বহুজন আশা আজ বাস্তব রূপায়ণের দিন সমাগত প্রায়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

মানবসভ্যতার এক বিশেষ পর্বে ধর্মের উদ্ভব। ইহার উৎপত্তির মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস। ঊর্ধ্বচারী অলৌকিকশক্তি অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন এ পৃথিবী—প্রত্যেক মানুষই তাঁহার সন্তান, প্রত্যেক ধর্মেই ইহা স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। বিভিন্ন মহাপুরুষ বিভিন্ন সময়ে ধর্মমতের জন্ম দিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্মের মূলেই রহিয়াছে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ। একই দেশের মাটিতে একাধিক ধর্মেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষে যেমন হিন্দুধর্মের বিরোধী হিসাবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উৎপত্তি, পাশ্চাত্ত্য দেশেও তেমনি ইহুদি ধর্মের বিরোধী হিসাবে জন্ম হইয়াছে খৃষ্টান ধর্মের। সেই কারণেই একই দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা অবস্থান করে পাশাপাশি। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই চায় স্বাধীনভাবে ধর্মপালন করিবার মত সুযোগ সুবিধা এবং স্বীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা। এই প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সর্বধর্মের পাশাপাশি অবস্থান সত্ত্বেও যাহাতে কোন বিভেদ-অনৈক্য দেখা দিতে না পারে তাহারই চেষ্টা করা হয়। এই কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্ভব।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানব ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে ছিল পৃথিবীব্যাপী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। রাজতন্ত্রে রাজাই ছিল সর্ব-শক্তিমান। তাহার ধর্মই প্রজার ধর্ম। প্রজাদের স্বাধীন ধর্মাচরণের কোন প্রকারই স্বাধীনতা নাই। ইহার ফলেই রাজতন্ত্রের যুগে সমগ্র ইউরোপব্যাপী একই খৃষ্টান ধর্ম দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল—প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক। একই ধর্মের দুইটি রূপের ফলে ইউরোপের ইতিহাস কলঙ্কিত। আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইসলামীদের আধিপত্য বিস্তারের সময়েও সেই একইরূপ পরিলক্ষিত হইয়াছে। রাজনীতির সহিত ধর্মকে পাশাপাশি বসান হইয়াছে। ইহার ফলেই সংকীর্ণতা, গোঁড়ামী, নিষ্ঠুরতা ও কুসংস্কারপ্রসূত অন্ধদৃষ্টি মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। আধুনিক গণতন্ত্র স্বীকৃতির যুগে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নাগরিকদের অন্যান্য অধিকারের ন্যায় ধর্মাচরণের অধিকারও দান করিয়াছে। তবে উহার জন্য যাহাতে রাজনৈতিক সংঘাত উপস্থিত না হয়, সে কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়াছে। প্রত্যেক নাগরিকই স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনযাপন

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কেন ?

করার সাথে সাথে যাহাতে ধর্মের দিক হইতে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ না করে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তাহারই চেষ্টা করা হয়। আইনের চোখে সব নাগরিকই সমান, কেহ এতটুকু কম নহে—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাহারই কথা বলে।

জনসাধারণের জন্য জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা হইল গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের লক্ষ্য হইতেছে সব মানুষকে সমানাধিকার দান। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পুরোহিত কিংবা যাজকের প্রাধান্য স্বীকৃত অথবা ধর্মপালনের নাম করিয়া গোঁড়ামি কিংবা কুসংস্কারের আশ্রয় গ্রহণ করার কোনই সার্থকতা থাকিতে পারে না। সব ধর্মই সমন্বয়ের আদর্শে প্রোজ্জ্বল। সব মানুষের মধ্যকার ঐক্য, সৌহার্দ ও মৈত্রীলাভের আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তির জন্যই গণতন্ত্র। তাই ধর্মগত সংকীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সংকীর্ণ চিন্তার আশ্রয় গ্রহণের পন্থা এ যুগে অচল। ধর্মের দিক হইতে পারস্পরিক বৈরীভাব বিদূরিত করিবার প্রয়োজনেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ইহা সাম্প্রদায়িকতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে চাহে না। একই রাষ্ট্রের নাগরিক অথচ ধর্মের দিক হইতে পৃথকত্ব স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার স্বাভাবিক উপায়। ইহার উৎকর্ষের সহিত প্রগাঢ় মানব সম্প্রীতিবোধ আনয়ন করা সম্ভব। তাই ইহার আদর্শ ঔদার্যে, মহত্ত্বে, স্বাভাবিকত্বে ও সমষ্টি স্বীকৃতিতে উজ্জ্বলতর রূপ লইয়া এযুগে দেখা দিতেছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ

ভারত চিরদিনই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল এবং এখনও আছে। অতীত ভারতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত, রাজর্ষি অশোক, হর্ষবর্ধন এবং মধ্যযুগের আকবর, শেরশাহ প্রভৃতি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতে নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। উহাতে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই সম-অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করিতে পারে। এই ভারতবর্ষেই পারে যোগ্যতার মানদণ্ডে সব নাগরিকই যে কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইতে। এখানে এক ধর্মাবলম্বীরা অপর ধর্মাবলম্বীদের ধর্মাচরণকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখেন। সর্বোপরি ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বর্গতঃ জওহরলাল নেহেরু মুক্তকণ্ঠে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "আমরা যে ধর্মাবলম্বীই হই না কেন, আমরা সমান অধিকার সম্পন্ন একই ভারত মাতার সন্তান।"

ভারত কি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ?

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া অনেক সনাতন পন্থীরা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি। কোন ধর্মকেই পৃথিবী হইতে মুছিয়া দিবার উপায় নাই। কারণ ধর্মের প্রেরণা মানবমনে। তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে এককে প্রতিষ্ঠার আদর্শই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ। মানবমনের অন্তর্নিহিত বিকাশের কথা

উপসংহার

চিন্তা করিয়া গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে ধর্মের স্বীকৃতি অবিসংবাদিত ঘটনা। সেদিক বিবেচনা করিয়াই বলিতে হয় এ যুগে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

জাতীয় প্রতিরক্ষা ও ছাত্রসমাজের কর্তব্য

[চলিত ভাষায়]

ভারতবর্ষ এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। স্বাধীনতালাভের পর থেকে ভারতবর্ষ শুধু তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্বের মাধ্যমে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছে। কোনো রাষ্ট্রজোটে সে যোগ দেয়নি, সামরিক আঁতাতের বিরুদ্ধেও তার অনিচ্ছা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। ভারতবর্ষ কমিউনিজমে বিশ্বাসী না হয়েও স্বাধীন ও সার্বভৌম কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। ধনতন্ত্রের প্রতি ভারতবর্ষ বীতরাগ হওয়া সত্ত্বেও, মৈত্রী স্থাপন করেছে ইউরোপ ও আমেরিকার ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে। এ থেকেই বোঝা যায়, ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির ভিত্তি হলো শান্তি ও সহাবস্থান। কাজেই, বিদেশী কোনো রাষ্ট্র ভারতভূমি আক্রমণ করে তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করবে এমন আশঙ্কা ভারতের কোনদিনই ছিল না। অথচ, সেই আশঙ্কাই একদিন সত্যে পরিণত হলো। প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন ভারতের অকপট বন্ধুত্বের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলো তার নির্লজ্জ আক্রমণ চালিয়ে। চীনের সেই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতেই জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করলাম সর্বপ্রথমে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

যে চীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব আবহমানকালের, সেই চীন অকস্মাৎ কেন ভারত আক্রমণ করলো, এ-কথা স্বভাবতই মনে একটা চরম বিস্ময়ের ভাব জাগায়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, লাল-চীনের উপরে এতকাল আমরা বিশ্বাসস্থাপন করে ভুল করেছি, বহুদিন আগেই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু চীনের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন যে, চীনের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, এশিয়া মহাদেশে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে আর কোনো রাষ্ট্র চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হোক বর্তমান চীন সরকার তা আদৌ চান না। চীন চায় যে, এশিয়ার সমস্ত দেশই তার কাছে মাথা নত করুক, আর সে নিজে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এই তার মনোগত অভিপ্রায়। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতালাভের পর থেকেই ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক পন্থায় দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়েছিল, ভারতবর্ষ কমিউনিজম গ্রহণ করেনি, অথচ দ্রুত উন্নতি করছে—চীনের কাছে

চীনা আক্রমণের কারণ কি?

এই দৃশ্য অসহনীয়। তৃতীয়তঃ, চীন ভারতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করছিল যে, ভারতবর্ষই তিব্বতে চীনের বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টি করছে। চতুর্থতঃ, চীন এই মর্মে প্রচার করছে যে ভারতবর্ষের জোটনিরপেক্ষতার নীতি একটা ভণ্ডামি মাত্র, আসলে সে পশ্চিমী-গোষ্ঠির সঙ্গেই রয়েছে। ভারতবর্ষ আক্রমণ করে চীন তার সেই মতবাদ প্রমাণ করতে চাইল। পঞ্চমতঃ, চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এই পররাষ্ট্র আক্রমণের জন্য দায়ী। তাছাড়া, চীনের এটা মনঃপূত নয় যে, সোভিয়েট রাশিয়া জোটনিরপেক্ষ কোনো দেশকে সাহায্য করুক। সে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চায় যাতে সোভিয়েট রাশিয়া একমাত্র চীনকে সাহায্য দিতে বাধ্য হয় এবং অন্য কোন দেশকে সাহায্য না করে।

চীন হয়তো এ-কথাও ভেবছিল যে, ভারতের ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলি, ভারত আক্রমণের সময় তাদের সাহায্য করবে। কিন্তু, তাদের সে ভুল ভেঙ্গে গেল। সারা ভারত প্রথম বিপর্যয়ের বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠে 'এক জাতি এক প্রাণ' হয়ে চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য সমগ্র দেশ হলো ঐক্যবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর। সারা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই ভারতকে জানাল সহানুভূতি, সামরিক সাহায্য দিতে এগিয়ে এলো পৃথিবীর অনেক দেশ, আর নিন্দা জানালো চীনের অসঙ্গত ও নির্লজ্জ আক্রমণের। বেগতিক দেখে চীন হঠাৎ একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলো এবং ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলো নিজের সীমারেখার কাছাকাছি। কিন্তু ভারতের সঙ্গে আপসে সমস্ত বিবাদ মিটিয়ে ফেলবার জন্য এখনও যেন সে প্রস্তুত নয়—ভারতের ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে 'ভালো মানুষ' সাজবার যথাসাধ্য চেষ্টাও সে করছে। চীনের এই যুদ্ধবিরতির জন্য আমরা যেন না মোহগ্রস্ত হই, জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য সারা দেশ জুড়ে আজ যে প্রস্তুতি চলেছে, সে-কাজে যেন দেশবাসীর বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা না যায়।

জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি

আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি, যুদ্ধ করা আমাদের শান্তিনীতির পরিপন্থী; কিন্তু তাই বলে কেউ আমাদের আক্রমণ করলে আমরা কখনই চুপ ক'রে তা সহ্য করব না। সেই কারণেই 'জাতীয় প্রতিরক্ষা'-র মহান্ ব্রতে ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ সচেষ্ট হতে হবে। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বলতে মূলতঃ সামরিক ব্যবস্থাকেই বোঝায়। সৈনিকেরা তো আছেই, তারা তাদের কর্তব্য পালন করবেই, যেমন করবে হোমগার্ড, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্স প্রভৃতির সাহসী কর্মীরা। সমরোপকরণের উৎপাদনে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরাও আজ অধিকতর উৎপাদনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। সেই সঙ্গে দেশের প্রতিটি লোক কিভাবে আজ জাতীয় প্রতিরক্ষার কাজে সহায়ক

জাতীয় প্রতিরক্ষার বিভিন্ন দিক

হতে পারে সে-কথাও চিন্তা করবার সময় এসেছে। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে, যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজগুলি আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। কৃষি ও শ্রমশিল্পের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কলকারখানায় আরও বেশি কাজ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুশীলন আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। যেহেতু আধুনিক যুদ্ধ বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের উপরে নির্ভরশীল, সেহেতু এই দুটি ভিত্তি আমাদের আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি চাই আত্মবিশ্বাস। নিজেদের দুর্বলতার সমালোচনা না করে আজ আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যদি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে, তাহলেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হবে সুদৃঢ় এবং পৃথিবীর কোনো শক্তিই ভারতীয় জওয়ানদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হবে না।

জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে দেশের ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যও বড় কম নয়। কারণ ছাত্রসমাজই হলো দেশের যুবশক্তি ও ভবিষ্যতের আশা-ভরসা। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ছাত্রসমাজকে আজ দৃঢপ্রতিজ্ঞ হতে হবে এবং রাজনীতির দিকে না ঝুঁকে চরিত্রগঠনের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, দেশের স্বাধীনতার চেয়ে রাজনৈতিক মতবাদ বড় নয় এবং কেউ যদি সেই স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে চায় তাহলে তার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। সামরিক শিক্ষণ গ্রহণ করা ছাত্রসমাজের একটি বিশেষ কর্তব্য। কারণ, জাতীয় সংকটমুহূর্তে প্রয়োজন হয় শিক্ষণপ্রাপ্ত যুবশক্তির। সেইজন্য প্রত্যেকটি ছাত্রের উচিত ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরে ভর্তি হয়ে নিজেদের সামরিক শিক্ষায় গড়ে তোলা। এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই আসে শৃঙ্খলাবোধ, সাহসিকতা ও ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে পড়াশোনা—সমস্ত বিষয়েই ছাত্র-সমাজকে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে, যাতে করে ভবিষ্যৎ ভারতে দেখা যাবে বিরাট এক শিক্ষিত বীর্যবান ও দেশপ্রেমী তরুণশক্তি। জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হবে সেই তরুণশক্তির ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় ও নিষ্ঠায়।

ছাত্রসমাজের কর্তব্য ও উপসংহার

সমাজ জীবনে শেষ পর্যন্ত সাধুতারই জয়

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২]

মর্ত্যচারী মানুষই সমাজের জন্মদাতা, কোন দেবতা নয়। সমষ্টি জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার দিকে নজর রাখিয়াই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিল সমাজ। বহু মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা ও আন্তরিক অনুরাগের উপর যে সমাজের বনিয়াদ, তাহার স্থায়িত্বের মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ ও

প্রারম্ভিক ভূমিকা

কল্যাণকাম মনোভাব। এই কল্যাণকামী শুভবুদ্ধি পরিচালিত মনোভাবের দ্বারাই সমাজের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়। সাধুতার প্রযোজন তাই অপরিহার্য। ইহাকে বাদ দিয়া কোনভাবেই সমাজে শৃঙ্খলা, নীতিবোধ, শুভবুদ্ধি, সমষ্টি মঙ্গলেচ্ছা প্রভৃতির জন্ম হইতে পারে না। তাই মানুষ যে সমাজের জন্মদাতা, তেমনি ইহার রক্ষাকর্তাও। আর এই সমাজ রক্ষণের মূলে কেন্দ্রিয় শক্তি হইল সাধুতায় ন্যায় অন্তর্নিহিত মানবিক গুণাবলী।

মানবসমাজে সাধুতাব আদর চিরদিনই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কিন্তু সাধুতার প্রকৃতি নিরূপণের মানদণ্ড যুগে যুগে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। অতীতকালের ধর্মনির্ভর সামাজিক পরিবেশে সাধুতা বলিতে বুঝাইত ধর্মের বিধিনিষেধ মানিয়া চলা। ইহাব সহিত সত্যনিষ্ঠার উপরও গুরুত্বারোপ করা হইত। আর অসত্যবাদী অধর্মাচারীদের বলা হইত অসাধু। কিন্তু বর্তমানে অসাধু বলিতে অন্য অর্থ বুঝায়। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের পরোপকাব, মহৎ কর্ম, সদাচাব, সৎপথ চাৎণ, ও সৎভাবে জীবিকানিবাহ করাকে এ কালে সাধুতার পরিচায়ক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার বিরুদ্ধাচারণ অর্থাৎ জাল জুয়াচুরি ও অসৎপথে সামাজিক জীবননির্বাহ করাকে এ যুগে অসাধুতা বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

সাধু অসাধুব প্রকৃতি নিরূপণ

সমাজবদ্ধ মানুষের সবাপেক্ষা বড় কাম্য হইল অপার শান্তি, গভীরতর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও দুনিবার ন্যায় ও নীতির প্রতি অনুরাগ। ইহাদের ছাড়া সমাজ জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি ও ঐশ্বয আনয়নেব চিন্তা করা যায় না। সাধুতা হইল সেই অন্তর্নিহিত মানবিক গুণ, যাহার দ্বারা এই সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। একের নীতিবোধ ও ন্যায়ানুগত্য অপরের নিকট অনুকরণ যোগ্য আদর্শস্বরূপ বিবেচিত হয। ক্রমে ক্রমে তাহা ব্যক্তিচিত্তেব মারফৎ সমষ্টিচিত্তে সঞ্চারিত হইয়া নবতর অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত কবিয়া তোলে। এ জন্যেই সমাজ জীবনে সাধুতার উপযোগিতা নিঃসন্দেহাতীতভাবে অত্যন্ত গভীর। ইহা ছাড়া সমাজ জীবনকে বলিষ্ঠতর পৌরুষদৃপ্ত ও দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া তোলা যায় না। এজন্যে চিরদিনই সাধুত অপ্রতিহত বেগে সমাজে আপন প্রতিষ্ঠার পথ করিয়া লইয়াছে।

সমাজ জীবনে অসাধুতার উপযোগিতা

সাধুব্যক্তিরা একদিকে যেমন চিরদিনই সমাজে প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছেন, অন্যদিকে অসাধুরা তেমনি উপেক্ষা, লাঞ্ছনা, ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্রস্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে। অসত্যচারী, অধার্মিক ও সমাজশত্রু এই অসাধু ব্যক্তিরা। ইহারা সংকীর্ণ মনোভাবের আলোকে সমাজ জীবনকে দেখে। ইহাদের চিন্তায় আপন স্বার্থসিদ্ধির উপায় ছাড়া অন্য কোন কিছুই আসে না। এ কারণে সমাজে ইহারা আত্মস্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও অনুদার

অসাধু মনোভাবের পরিণতি

মনোভাবের পৃষ্ঠপোষক। সমাজের কল্যাণ নয় অকল্যাণ, মঙ্গল নয় অমঙ্গল, শুভ নয় অশুভ আচরণই ইহাদের ক্রিয়াকলাপে প্রকাশিত পায়। সেইজন্য সমাজে কাহারও ভাল ইহারা দেখিতে পারে না। সাধুব্যক্তির মহৎ উদ্দেশ্যকে ইহারা স্বার্থপর মনোভাবের আলোকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। অসাধুতার ষড়যন্ত্র যত প্রচণ্ডই হোক্‌না কেন, সমাজে তারা কোন দিনই মর্যাদা পায় না। আশা করা যায় বর্তমান —অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও তারা সমাজে অবজ্ঞার পাত্রস্বরূপই গণ্য হইবে।

এ যুগের জটিল সমাজ ব্যবস্থায় সাধুতার উপযোগিতা লঘুতর হইয়া উঠিতেছে। নিত্য নূতন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার জাঁতাকলে দলিত-মথিত ও বিপর্যস্ত হইয়া আপন অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখা বর্তমান কালে বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি সাধুতার আদর্শগত মূল্যবোধ এখনও ফুরাইয়া যায় নাই। জটিলতার মধ্যে সরলতার সন্ধানের দ্বারাই সম্ভব জটিলকে সরল করিয়া তোলা। তাই সমস্যার বাহুল্যবোধে যেমন ভীত হওয়া অনুচিত, তেমনিভাবে সমস্যার গুরুত্বকে লঘু করিয়া দেখাও সম্ভব নয়। যা ভাল, যা শুভ, যা একের কল্যাণ, দশের কল্যাণ আনিয়া দিতে পারে তাহাই সাধু। এই সাধুতার জয়ই পরম কাম্য। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সাধু চিন্তা, সাধু কর্ম, সাধু উদ্দেশ্যকে প্রয়োগ করিবার চেষ্টায় উদ্যোগী হইতে হইবে। যতই বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন সমাজ জীবনকে পরিচালিত করিবার সাধুতার পথ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ নাই।

জীবনে সাধুতার স্বীকৃতি দানের উপায়-নির্দেশ

সমাজের সহিত নিবিড়তর ঐক্যের সম্পর্কোপলব্ধির তাড়নাই সাধুতার নিশ্চিত জয়ের পথ। এ যুগের মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন চারণে অভ্যস্ত। সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের সাথে ব্যক্তিগত মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন জড়িত। অতএব ব্যক্তির চিত্তে সাধুতার প্রতি অনুরাগ ও সমর্থন অপরের অনুপ্রেরণার পাথেয়। ব্যক্তিচিত্তে সাধুতার প্রতিষ্ঠাই সমাজ জীবনে সাধুতার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা ও জয়ের সম্ভাবনা আনয়ন করিবে।

উপসংহার

পঞ্চশীল ও বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি

সাম্প্রতিক বিশ্বের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিলতর। রাজনীতির আকাশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালিমা অপসারিত হইতে না হইতেই আবার সুরু হইয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ধ্বংসাত্মক বিভীষিকামণ্ডিত আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তিরক্ষার সমস্যা বর্তমানে আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। জার্মান সমস্যা রাজনীতির আকাশকে আরও ঘোলা করিয়া তুলিয়াছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের যেন প্রস্তুতি চলিতেছে দিকে দিকে, শিবিরে শিবিরে। যুদ্ধবিধ্বস্ত

প্রারম্ভিক ভূমিকা

দেশের মানুষ আর এক বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মানুষ শান্তি স্থাপনের জন্য বিশ্বরাষ্ট্র সংস্থা বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ (U.N.O.) প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু তবুও শান্তির সমস্যা আরও প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের ঐকান্তিক কামনাকে বিফল করিয়া দিতেছে আজিকার বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। দিন দিন শক্তিশালী আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হইতেছে। শক্তি দম্ভে বিভিন্ন রাজনৈতিক মণ্ডল মাতিয়া উঠিতেছে। ফলে সমগ্র বিশ্ব এখন তিনটি শিবিরে বিভক্ত। প্রথমত সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টায় ব্যস্ত। পৃথিবীর নানা স্বাধীন অঞ্চল তাহারা গ্রাস করিবার জন্য উন্মুখ। শক্তিশালী আণবিক বোমা আবিষ্কার ও তাহার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাইয়া নিজেদের শক্তির পরীক্ষা দিতেছে। দ্বিতীয় শিবিরে বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা গড়িবার জন্য তাহাদের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো নূতনভাবে গঠনে প্রয়াসী হইয়াছে এবং নানাভাবে তাহাদের আদর্শ প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহারা হইতেছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্গত। তৃতীয় শিবির ঔপনিবেশিকতার বন্ধন হইতে সবেমাত্র মুক্ত হইয়া দুই শিবির হইতে নিরপেক্ষ থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। ঔপনিবেশিকতাবাদের কুফল তাহাদের নিকট আজ আর অস্পষ্ট নহে। এই তিন শিবিরের নেতৃত্ব তিনটি রাষ্ট্রের হাতে রহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং নিরপেক্ষ ও শান্তিকামী শিবিরের নেতৃত্ব করিতেছে ভারত।

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি

অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পরলোকগত শ্রীনেহরু ও চীনের প্রধান মন্ত্রী 'পঞ্চশীল' বা পাঁচটি মূলনীতি প্রচার করিলেন। দুই-হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের মূলনীতি অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তিতেই পঞ্চশীলের উৎপত্তি। এই পাঁচটি নীতি হইল : (১) প্রত্যেক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক ঐক্যের ও সার্বভৌমত্বের প্রতি প্রত্যেক রাষ্ট্রের শ্রদ্ধাশীল থাকা ও স্বীকৃতি দান করা। কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করিলে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকে। তাই সার্বভৌমত্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলিয়া স্বীকৃত। (২) পারস্পরিক অনাক্রমণ। ইহার ফলে হিংসা দূর করা সহজসাধ্য এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠাও সহজতর হয়। (৩) কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করা। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে পারে ও যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতে পারে। তাই কোন রাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত ও যুক্তিযুক্ত। (৪) পারস্পরিক মঙ্গলসাধন ও সমতাস্থাপন। অনুন্নত দেশগুলিকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করা যে কোন

পঞ্চশীলের স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য

শক্তিশালী রাষ্ট্রের উচিত। ইহাতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব গড়িয়া উঠে। পরোক্ষভাবে ইহা পৃথিবীতে যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিয়া বরং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। (৫) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। এই নীতির দ্বারা যে কোন রাষ্ট্র যে কোনভাবে তাহার সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিতে পারে। তাহা ধনতান্ত্রিকই হোক আর সমাজতান্ত্রিকই হোক। তাহার জন্য পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা হারানো উচিত নহে। ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদী সমাজ-রাষ্ট্র, সমাজবাদী রাষ্ট্র বা যে কোন নীতিবাদী রাষ্ট্র পরস্পর বন্ধুভাবেই বাস করিতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই তাহার রাষ্ট্রীয় পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা ও নৈতিক সহনশীলতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আজিকার দ্বন্দ্বক্লিষ্ট পৃথিবীর বুকে যখন শান্তি রক্ষা একটি বিরাট সমস্যারূপে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তখন 'পঞ্চশীল' নূতন আশার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে। দুই হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ ও হিংসা দূর করিবার জন্য যে নীতির ইঙ্গিত দিয়াছিল, তাহা আজ বিশ্বের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে। ভগবান বুদ্ধের 'পঞ্চশীল' নীতির উপর ভিত্তি করিয়া যে পাঁচটি নীতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবে। ইহাদের মধ্যে বিশ্বের শান্তিকামী জাতির শান্তি প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে বিশ্বের বর্তমান দুর্যোগময় পরিস্থিতির অবসানের। তাই আজিকার দিনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা লইয়া বিশ্বের আকাশে-বাতাসে আণবিক বোমার ধূমাঙ্কিত কালিমা যখন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে তখন তাহাকে মুছিয়া ফেলিতে একমাত্র পঞ্চশীল সহায়তা করিতে পারে। একমাত্র ইহারই দ্বারা বিশ্বে শান্তির বাণী সিঞ্চন সম্ভব। ইহা ছাড়া আর কোন পথ নাই।

উপসংহার

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের ভূমিকা

সুদূর অতীতকালে বিশ্ব যখন তমিস্রার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন হইতেই ভারতবর্ষের ধ্যান-ধারণার অপূর্ব বিকাশসাধন ঘটিয়াছিল। তাই আর্যঋষিদের মুখে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল অখণ্ড ব্রহ্মের স্বরূপ, প্রেম-মৈত্রী ও অহিংসার বাণী। যুগে যুগে কোন সংকটের মুহূর্তে ভারতের ঋষি ও যুগ প্রবর্তকেরা ভারত তথা বিশ্বের মানবগোষ্ঠীকে তাই শুনাইয়া আসিতেছে অখণ্ডতার বাণী প্রেম-মৈত্রী ও অহিংসা। তাই আজও যখন বিশ্বে হিংসা-হলাহলের উন্মাদনার বিষাক্ত নিশ্বাস আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছে, তখন ভারত বিশ্ববাসীকে শান্তি, প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হইল প্রেম-মৈত্রী ও অহিংসা মন্ত্র। যাহার দ্বারা আজ প্রচারিত হইয়াছে পঞ্চশীলের নীতি। যাহার দ্বারা আজিকার পৃথিবীর চরম সংকটক্ষণের অবসান সম্ভব হইবে। যুদ্ধের ভয়াবহতা দূরীভূত হইয়া শান্তির আলোকে বিশ্ববাসী উদ্বোধিত হইতে পারিবে, ভারতের বর্তমান নীতিতে বিশ্ববাসীর বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে। তাই ভারত আজ তাহার এই নীতি বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপনা করিয়াছে।

ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। নানারূপ সমস্যা আসিয়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে জটিলতর করিতেছে। একদিকে কাশ্মীর সমস্যা, কঙ্গো পরিস্থিতি, জার্মান সমস্যা, ভারত-চীন সীমানা বিরোধ প্রভৃতি। অন্যদিকে বড় বড় শক্তিগোষ্ঠী ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে নানারূপ অবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখে তুলিয়া তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিগুলি মারাত্মক আগ্নেয় অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপন আপন শক্তিদম্ভ প্রচার করিতেছে। ইহার ফলে ঠাণ্ডা লড়াইকে যেন আরও দ্বিগুণ করিয়া আর একটি বিশ্বসংহারী যুদ্ধকে তরান্বিত করিয়া তুলিতেছে।

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি

এই অবস্থায় ভারত শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিশ্ববাসীর মনে মৈত্রী, অহিংসা ও মানবতাবোধ উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। যাহাতে বিশ্বের মানুষ যুদ্ধের হিংসা-উন্মত্ততা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। এই নীতির বলেই ভারত বর্তমান সভ্যতাকে ধ্বংসের পথ হইতে বাঁচাইবার জন্য ভারতের পঞ্চশীল নীতি অনেক সহায়ক হইয়াছে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ তাই ভারতের এই নীতিকে অভিনন্দিত ও গ্রহণ করিয়াছে। বান্দুং সম্মেলনে তাই ভারত শান্তি স্থাপনের বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের ভূমিকা

সীমান্ত বিরোধ লইয়া চীনের পররাজ্য গ্রাসের নীতি আজ বিশ্বে এক ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। তাহা দূর করিবার জন্য ভারত ও চীন এই দুই দেশের নেতার মধ্যে শীঘ্রই একটা আপোষ মীমাংসা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অনুরূপভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও কিছুটা বিরোধ আছে। যত শীঘ্র সম্ভব তাহারও একটা মীমাংসা হইয়া উভয় দেশের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত।

ভারত ও তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্র

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারত যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সত্যই আশাজনক। কারণ ভারতের বৈদেশিক নীতি স্বাধীনতা ও শান্তির নীতির দ্বারা পরিচালিত। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বিরোধ শান্তি ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে মীমাংসা হইয়া যাইবে। কারণ ভারত

জানে যুদ্ধের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হয় না। যুগ যুগ ধরিয়া এই নীতির দ্বারাই সে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ ভারতের জয়গান গাহিয়াছে। যুগে যুগে তাই আক্রমণকারী রূপে বহু জাতি ভারতে ছুটিয়া আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, আবার কালক্রমে তাহারা ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সহিত এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। বিদেশীরা শত্রুর ভূমিকা নিয়া আসিয়াও এখানে পরম মিত্ররূপে মিলিয়া গিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। তাই ভারত যে কালক্রমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং বিশ্বসভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সক্ষম হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। ভারত আবার বিশ্ববাসীর কাছে পুণ্য তীর্থরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে।

উপসংহার

কলকাতায় বর্ষা

[চলিত ভাষায়]

বর্ষা আমাদের মনে কল্পনার উৎস। বর্ষাকালে কবির কাব্যে ঝরণা ধারার স্ফুরণ। কালিদাসের আমল থেকে আজ পর্যন্ত বর্ষা আমাদের মনের গোপন দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। যখন বাহির দুয়ার বন্ধ থাকে তখন মনের দুয়ার খোলে। নানা কবি নানাভাবেই বর্ষাকে বন্দনা করেছেন। তাঁদের কল্পনায় ভেসে এসেছে অমরাবতী—ভেসে এসেছে ঝাপসা গাছপালার ছবি। তাঁরা বলেছেন, 'কইগো কই মেঘ উদয় হও'। তাঁরা মেঘের কাছে প্রার্থনা করেছেন, 'অংগে অংগে বিথারী চলে যাও অংগে হর্ষের পড়ুক ধুম'।

প্রারম্ভিক সূচনা

বর্ষাকালের ছবি আমরা অনেক দেখেছি। অনেক পড়েছি 'মত্ত দাদুরী ডাকে, ফাটি যাওত ছাতিয়া'। অনেক তাকিয়ে দেখেছি 'কালিমাখা মেঘ ওপারে ঘনিয়েছে'। গগনে মেঘের গর্জন শুনেছি। বাদলা হাওয়ায় মনে পড়েছে ছেলেবেলার গান, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর'…। যুগ যুগ ধরে আমরা বর্ষার মোহিনীরূপে মুগ্ধ। কিন্তু 'হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল'। আজ আর আমাদের বর্ষার ভুবনমোহিনী রূপ চোখে পড়ে না। আমরা কলকাতা বাসী। কলকাতার বর্ষা যেন এক অন্য লোক—অন্য মন, অন্য নগরী। তার চলায় চপল নৃত্য নেই, খিল্‌খিল্ হাস্য, ঝিরিঝিরি লাস্য নেই। কলকাতার বর্ষা বাউণ্ডুলে। তার হাতে কখন শিলের ঢিল, কখনও ঝিরঝিরানির ছুঁচফোটানো মরসুম, আবার কখনো বা লোককে বেকুব করেই তার আনন্দ।

বর্ষার বিচিত্র অনুভূতি

কলকাতায় বর্ষার কোন দয়ামায়া নেই। বর্ষার কোন আগমন প্রত্যাগমনের হদিস

নেই। হঠাৎ এলো—হঠাৎ হারিয়ে গেলো। কি জানি কি হোল তা জানতে না জানতেই ভিজে যেতে হয় বেড়ালের মতো। বর্ষাকালের সারাদিনে সূর্যের মুখ দেখার জো নেই। সারাদিন যেন আমরা পাতালবাসী। কখনও যে সকাল গড়িয়ে দুপুর আসে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল তা জানা যায় না। বৃষ্টির আতিশয্যে প্রায় স্কুলে স্কুলে রেনি-ডে। শিয়ালদহের ফুটপাতের ঘরগুলো যেন ইতালীর দ্বীপবাসী সম্প্রদায় কিংবা ঠেলাগাড়ীর উপরে চড়ে গমনরত অফিসযাত্রীদের দেখে আমাদের কাশ্মীরের নৌকাগৃহের কথা মনে পড়ে যায়। কলকাতার বর্ষার কোন প্রাণ নেই। কাদা আর ধুলোর জঞ্জালে যখন জলের ফোয়ারা এসে ধুইয়ে নিয়ে যায়, তখন কলকাতার পথে হাঁটা-চলাও দুঃসাধ্য। বাড়ীর সংগে রিক্সার সেতুবন্ধন করে তবে বর্ষার হাত থেকে গৃহাগত প্রাণেরা জলস্পর্শ থেকে নিজেদের রক্ষা করেন। এই বর্ষায় টালা থেকে টালিগঞ্জ, বালি থেকে বালীগঞ্জে যেন গঙ্গার জল স্থানান্তরিত হয়। যাত্রীরা মেরুপথযাত্রী। হাঁটতে হাঁটতে বৃষ্টি এসে যায়—গাড়ী বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করেন—সেই হতভাগার দল। আবার বৃষ্টির প্রকোপ কমলে তাদের যাত্রা সুরু।

কলকাতায় বর্ষার রূপ

এই কলকাতার বর্ষা সত্যিই সৃষ্টিছাড়া। তবুও এই বর্ষার কল্যাণে ছোট ছেলে-মেয়েদের মনে এখানেও জেগে ওঠে এক রঙীন কল্পনা। বর্ষার জলে ভিজে তারা কাগজের নৌকা ভাসায়, লিখে রাখে তাতে আপনার নাম। দলবেঁধে জুতোর ভিস্তিতে জল ভরে নিয়ে এসে শুকনো দালানে বন্যা বইয়ে দেয়। ছাদের নালার হাতীর শুঁড় দিয়ে ঝরাজলে পরম আদরে বালতী পেতে দেয়, দাদার গামছা নিয়ে মাছ ধরতে ছুটে যায় নদী-নালার মাঝখানে, উপচে পড়া পুকুরের ধারের নর্দমায়। ছোটাছুটি, জলছেটানোর নানা খেলায় তাদের মত্ততা।

বয়স্করা মাতে অন্য খেলায়। বর্ষার আবির্ভাবে জল সপ্‌সপে জামা নিঙড়োতে নিঙড়োতে তারা গিয়ে পৌছায় চায়ের দোকানে। ফুলুরী আর চায়ের পরিমাণে বিক্রেতার ষ্টক যায় ফুরিয়ে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির গল্পে তারা মত্ত হয়ে পড়েন। বেশি চলে কলকাতার মাঠের ফুটবল খেলার গল্প।

তবুও কলকাতার বর্ষা ঢের বেশী ভালো। অনেক বেশী ভালো গ্রামের বর্ষার চেয়ে। যদিও বর্ষায় টিনের চাল ফুটো করে অনেক বাড়ীতেই জল পড়ে, যদিও কলকাতায় পথে চলাই দায়, তবুও গ্রামে বর্ষার প্রকোপে ঘরে থাকাও নানা অসুবিধা। জলের প্রকোপ ঘরের মধ্যে এসেও উৎপাত করে। সাপের আর ব্যাঙের ডাকই নয়, নানা পোকামাকড়ের আমদানী বর্ষায় পল্লীগ্রামের একটি বিচিত্র বীভৎস সম্পদ। বর্ষায় কলকাতায় নিজেদের রক্ষা করার অনেক অস্ত্র

গ্রাম্য বর্ষার সঙ্গে পার্থক্য

আছে। গাড়ী বারান্দা, দোকান,—পল্লীগ্রামে সেটার বদলে গাছের ছায়া অনেক ক্ষেত্রে সম্বল।

কলকাতার বর্ষা সকলের মনেই নতুন ইলিশ মাছের কল্পিত গন্ধ নিয়ে আসে। সুদূর গ্রামের চাষের টাটকা ফসল কলকাতার বাজারে চাহিদার হার বৃদ্ধি করায়।

সহর জীবনে বর্ষার প্রভাব

কলকাতার প্রখর একঘেয়েমির জীবনে যেন একটি মিষ্টি চুম্বন। প্রাত্যহিক জীবনে বর্ষা সকল অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের মনে একটি নতুন সুরের আমেজ তৈরী করে। কোন ষোড়শী হাতে রবীন্দ্র-রচনাবলী নিয়ে পড়তে-বসেন :

গগনে গরজে মেঘ ঘনবরষা
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

কখনো বৃদ্ধ মেঘদূত খুলে সুরু করেন—আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে কিংবা যৌবনোদ্ভিন্ন যুবতীরা ছাদের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে অকারণেই নিজেদের অংগে বর্ষাকে আহ্বান করেন। অবেলায় বাচ্চা ছেলেটা মায়ের শত বকুনি উপেক্ষা করে ভিজতে থাকে—মেঘে মেঘে হারিয়ে যেতে নেই মানা। আপন মনে সদ্য সংগীতরত কিশোরী গান ধরে—'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা।' বর্ষার তৃষ্ণাকে লক্ষ্য করে কোন কিশোর কবি হয় ত কবিতা লেখে মনের গোপন কথাকে সাজিয়ে। আবার কলকাতায় বর্ষাকে নিয়ে অদ্ভুত একটি কবিতাও পড়েছি—কোন কবির।

"হায় ওগো বৃষ্টি
তুমি বড় মিষ্টি
আসবে না আজকে পাওনাদার
মেটাতে হবে না আজ বায়না তার।"

কলকাতার বর্ষার একটি অংশ খালি পড়ে থাকে। চিত্রগৃহে লাইন ধরে টিকিট কাটার যেন ভাটা পড়ে। তবুও অদ্ভুত কলকাতার ফুটবল খেলা। অসহ্য বৃষ্টিতেও

শেষকথা

এখানকার লর্ডস গ্রাউণ্ড, গড়ের মাঠে তিলধারণের স্থান থাকে না। কলকাতায় বর্ষা তাদের মনোযোগের সামান্যতম হানি ঘটাতে সাহস পায় না। বিশেষ করে ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলায়। ভিজে বেড়ালের মত ভিজলেও বর্ষার ভিজে বেড়ালময় তাদের কোন ক্ষতি করার স্পর্ধা রাখে না। অদ্ভুত এই কলকাতার বর্ষা। কখনো করুণ, কখনো অরুণ, কখনো মিষ্টি, কখনো সৃষ্টিছাড়া। সারাদিনের বৃষ্টির জলে ভিজে সন্ধ্যেবলায় ঘরের দাওয়ায় এককাপ চা বড় ভালো লাগে—ভালে লাগে খিচুড়ি আর ইলিশমাছ। কিন্তু কই সে ঠাকুরমা, কোথায় সাতভাই-চম্পা, কিংবা শংখমালা, অরুণ[illegible], কিরণমালার কাহিনী, ঠাকুরদাদার ঝুলি,—'সামনে

দিকে গুড়্গুড়িটা পেছন দিকে পা—কই সে ভুতুড়ে গল্প। কই সে টিম্‌টিমে মাটির প্রদীপ। না, হারিয়ে গেছে সেই কিরণমালার কাহিনী, কলকাতার স্নেই বর্ষা নেই। তবুও গভীররাতে সার্সিতে যখন জল পড়ে, ঠুংঠুং আওয়াজ হয়—তখন বিছানায় স্বপ্নের কোলে মন যদি হারিয়ে যায় যাক—কলকাতার বর্ষায় এটুকুই সার্থকতা।*

॥ ভবিষ্যং অধ্যয়ন ও কর্মজীবনের কিরূপ পরিকল্পনা করিয়া তুমি উচ্চতর মাধ্যমিকের পাঠক্রম বাঁছিয়া লইয়াছ ॥

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৩]

ছোটবেলায় মার মুখে শুনেছি: 'মনের গোপন উদ্দেশ্য নাকি কাউকে জানাতে নেই'। তা' জানালে নাকি সে উদ্দেশ্য কোনদিন সফলতার আলো পায় না। তাই আমার উচ্চতর পাঠক্রম বেছে নেবার উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিতে কিছুটা দ্বিধা জাগছে। হয়ত বা মায়ের সে নিষেধ একটা সংস্কার মাত্র। জানি, তার নেই কোন বাস্তবভিত্তি। তবুও মনে দ্বিধা জাগে। কারণ কি? যদি সত্যকথা বলতে হয়, যদি নিজের মনের কথা ব্যক্ত করতে হয় তা হলে এর একটিমাত্র উত্তর আছে: আমি এখনও তা ভাবিনি। কারণ ভেবেচিন্তে অধ্যয়ন করতে হয়—এ কথায় আমি অবিশ্বাসী। আর কর্মজীবনের পরিকল্পনার প্রশ্ন? সে ত একটা কথার কথা মাত্র। প্রকৃত সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কত উচ্চতর স্বপ্ন, কত মহত্তর কর্মজীবনের পরিকল্পনা কেমন করে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—তার অনেক গোপন ইতিহাস আমার নখদর্পণে। তাই সরাসরি এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না বলে আমি দুঃখিত।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

তবুও প্রশ্নকর্তা তথা পরীক্ষক মহাশয়দ্বয়ের জিজ্ঞাসাকে সরিয়ে দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলবার মত দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চার দেখানোর যে কি বিপদ তাও ভাববার মত। তাই বলছিলাম আগে উদ্দেশ্য না বেছে কর্মজীবনের গোলক ধাঁধায় অকারণে রেসের ঘোড়ার মত দৌড় করে নেবার কোনই সার্থকতা নেই। আসলে একটার পর একটা ক্লাস এত দ্রুত টপকেছি যে—কোন দিনই কোন উদ্দেশ্যকে বড় করে দেখবার মত অবসর জোটে নি। সে কারণে উচ্চতর পাঠক্রম বেছে নিয়ে যেদিন বিজ্ঞানের ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেম—সেদিন অত তলিয়ে ভেবে দেখেনি এখন শুনছি বিজ্ঞান পড়লে নাকি এ যুগে স্বর্গ হাতে পাওয়া যায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ান—আরও কত কি হওয়া যায়। আমি কিন্তু অতশত ভেবে দেখেনি। এর পেছনেও দুটো কারণ ছিল। প্রথম কারণ আমার বাবা-মা অত্যন্ত গরীব। আর দ্বিতীয়

উদ্দেশ্য

* প্রবন্ধকার অচিন্ত্যকুমার বসুর সৌজন্যে।

কারণ আমি সেরূপ অসাধারণ ছাত্র নই। এ দুটো কারণেই আমি নিজের জন্য মোটেই কিছু চিন্তা করিনি।

দেখছি বাবা-মা, প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রার রূপ। কত নিত্যনূতন সমস্যা এসে দিনের পর দিন তাদের দিকে হিংস্র শ্বাপদের মত লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করছে—দেখেছি তাও। দেখেছি ক্ষুধার জ্বালায় কেমন করে গরীব বাপ তার একমাত্র ছেলেকে রাস্তায় আঁছড়ে মেরেছে। এখনও চোখে ভেসে আছে সেই হতভাগ্য বেকার যুবকটির মুখচ্ছবি। যার স্বপ্ন ছিল বিরাট পরিবার পোষণ করে সুখের হাসি হাসবে। কিন্তু শেষ পরিণতিতে সে কিনা করল আত্মহত্যা। তাই এ যুগের কবির মুখে: 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবীর গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসান রুটি।'

যুগ, জীবন ও সমস্যা

এতসব শুনেও যদি কারও মনে প্রশ্ন জাগে, আমি কেন উচ্চতর মাধ্যমিকের পাঠক্রম বেছে নেবার আগে ভবিষ্যৎ অধ্যয়ন ও কর্মজীবন পরিকল্পনা স্থির করে নিইনি,—তা হলে তার উত্তর আমি দিতে পারব না। ভবিষ্যৎ যেখানে অন্ধকার নিশীথ রাত্রের বার্তাবহ—সেখানে উচ্চতর স্বপ্ন বা মহত্ত্বর আদর্শের বড় কথা বলা—সব ভাববিলাস মাত্র। সমস্যা চিরদিনই থাকবে—একথা সত্য। তবে তাতে ভয়ে পড়ার কোন মানেই হয় না। সব সময় যদি প্রতিটি বাধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সক্রিয় হয়ে, দুর্দম প্রাণাবেগে, গভীরতর আত্মবিশ্বাসে ভর করে জীবনপথে এগোন যায় তা হলে হয়ত বা সমস্যার বোঝা কিছুটা মুক্ত করা যাবে। অবশ্য এ সব কথা মুখে বলা যত সহজ কাজে পরিণত করা তত টা নয়।

দূরীকরণের উপায়

কেবল একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকলেই যে কোন বিষয়ে সফল হওয়া যাবে তা নয়। সিদ্ধির জন্য সাধনার প্রয়োজন। 'আমি বড় হব, মানুষ হব, দেশের ও দশের উপকারে নিয়োজিত হব'—এগুলিই হল আমার কর্মজীবনের চিরদিনের পরিকল্পনা। আর তার জন্য যুগোপযোগী চিন্তার সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। দরকার রয়েছে দুর্জ্ঞেয়তার রহস্যাবদ্ধন গ্রন্থি উন্মোচন করবার মত প্রখর জিগীষা বোধ। আমার মনে তাও রয়েছে। তবে সেটার সার্থকতা—ব্যর্থতার স্বরূপ অদূর ভবিষ্যতে আমার ব্যক্তিগত জীবনে জানাবার সুযোগ এলে জানাব নিশ্চয়ই।

উপসংহার

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

[illegible] বি. প্র. ১৯৪৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালী মনীষার সর্বময় বিকাশ সম্ভাবিত হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া পরাধীনতার গ্লানি বহন করিয়া জাতি আত্মবিশ্বাস এবং আত্মম[illegible]বোধ হারাইয়াছিল। একাদিক্রমে বহু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ

জন্মগ্রহণ করিয়া জাতির অন্তরে সুগভীর বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার করিয়াছিলেন। বিশ্বের অন্যান্য সুসভ্য ও উন্নত দেশবাসীর নিকট জাতির গৌরব ও প্রতিষ্ঠার স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় মেলিয়া ধরিবার জন্য তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যতিরেকে যুগের দুর্দম দুর্বারগতির সহিত তাল মিলাইয়া চলা কষ্টসাধ্য। সে কারণেই চাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা। সেই প্রেরণাই আমরা লাভ করিয়াছি প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট হইতে। তিনি ছিলেন ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার হোতা এবং রসায়ন শিল্প বিজ্ঞানের প্রথম পথ-প্রদর্শক।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

১২৬৮ বঙ্গাব্দে খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের সমৃদ্ধির ক্ষীণশিখা তাঁহার জন্মকালেও প্রজ্জ্বলিত ছিল। তাঁহার পিতা হরিশচন্দ্র রায় সর্বপ্রকার গোঁড়ামি ও কুসংস্কারবোধের বিরোধী ছিলেন। শৈশবে প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ে পিতৃপ্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে উহা তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির পথে অন্যতম সহায়ক উপাদানরূপে কাজ করিয়াছিল। নয় বৎসর বয়সে পাঠশালার অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি তাঁহার পিতার সহিত কলিকাতায় চলিয়া আসেন। প্রথমে হেয়ার ও পরে আলবার্ট স্কুলে পাঠ শেষ করিয়া অবশেষে তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শৈশব হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র রোগে ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। রুগ্ন দেহ ক্ষীণ স্বাস্থ্যকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করিয়া সেদিন হইতেই তিনি অধ্যবসায় পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসার দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন।

জন্ম ও বাল্যকাল

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'গিলক্রাইষ্ট' বৃত্তিলাভ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণি-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অবশেষে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আজৈব রসায়নে বিদ্যায় ডি. এস. সি. উপাধিলাভ করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্বীয় উদ্ভাবনী প্রতিভার দ্বারা পরিচালিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ছাত্রমহলে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে 'মার্কিউরিয়াস নাইট্রাইট' নামক একটি যৌগিক পদার্থের আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেন। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যোগ্যতার সহিত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উত্তরোত্তর উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। দেশের শ্রমশিল্পের উন্নতি ও কর্মসংস্থানের সুবিধার দিকে তাকাইয়া তিনি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকিয়া উহাদের [illegible] চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কর্মজীবন

চিরকুমার, নিরহংকার জ্ঞানানুরাগী প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি অতুলনীয়। অতীত ভারতের ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তিনি হিন্দু-রসায়ন বিদ্যার ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত করেন। সংগঠনমূলক কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁহার বিরাট প্রতিভার কাজ করিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আপদে-বিপদে সব সময় তিনি দেশবাসীর পাশে পাশে থাকিতেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উত্তর বাঙলায় বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য তিনি যে প্রচেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির স্পষ্ট পরিচয় ফুটিয়া উঠে। তিনি বলিতেন, "আমরা বাঙালী নই—আমরা মানুষ—যুগে যুগে দেশে দেশে যে মানুষ হয়েছে কাজ করেছে, স্মৃতি চিহ্ন রেখে গিয়েছে —আমরা তাদের ভাই। আমরা বিশ্বের সর্ববিধ সত্যের সর্ববিধ ধনের সমান অধিকারী।"

চরিত্র ও কৃতিত্ব

মহাত্মা গান্ধীর খদ্দর প্রচার ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলনে তিনি জড়িত ছিলেন। বিজ্ঞানের সাধনা করিয়াও তিনি কোনক্রমে একথা বিস্মৃত হন নাই যে, দেশ-জাতি ও সমাজের প্রয়োজনে তাঁহার যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তমান রহিয়াছে। ইহাই হইল তাঁহার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

ঊনিশ শতকের চার দশকে তিনি পরলোক গমন করেন। নিজ আত্মবল, চরিত্র মাহাত্ম্য এবং কর্মনিষ্ঠায় যে মহতী আদর্শ তিনি দেশবাসীর নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা চির অম্লান। তাঁহার আজন্ম লালিত বাসনার প্রতিষ্ঠাই জাতির সর্বতোময় কল্যাণ ডাকিয়া আনিবে। তাই পৃথিবীতে জাতিগত ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার বাণী, "পৃথিবীতে বাঁচিতে হইলে আমাদেরও বিবেক ও বিচার শক্তিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চিরাগত অনেক বিষয়ের মূলে কুঠারাঘাত করে জীবনের পথে অগ্রসর হতে হবে। অন্য কোন পথে শ্রেয়ের সন্ধান মিলবে না।"

উপসংহার

বিদ্রোহী কবি নজরুল

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন রবি-রশ্মির উজ্জ্বল আলোকে বাঙলার সাহিত্য-গগন দেদীপ্যমান, যখন সেই আলোকের অন্তরালে উদীয়মান কবিগণ আত্মগোপন করিলেন, ঠিক সেই সময় এক উজ্জ্বল মশাল হস্তে বাঙলার সাহিত্য মঞ্চে আবির্ভূত হইলেন এক শক্তিমান কবি—কাজি নজরুল ইসলাম। বঙ্গভাষার কাব্য ও সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তাঁহার এই আকস্মিক আবির্ভাব সত্যই এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডার বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বাঙলা ১৩০৬ সালে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় চুরুলিয়া গ্রামে আমাদের

এই জনপ্রিয় কবি নজরুলের জন্ম হয়। কবির পিতা ফকির কাজি আহম্মদ ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। কবির জীবনের শেষদিকে যে ঈশ্বরভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার পিতার জীবনাদর্শই তাহার উৎস। তাঁহার পিতৃব্যের সাহিত্যানুরাগও কবি জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। অতি অল্প বয়সেই কবির পিতৃবিয়োগ হয়। তাই জীবনের প্রথম হইতেই তাঁহাকে দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই দারিদ্র্যপীড়িত জীবন তাঁহার লিখিত 'দারিদ্র্য' কবিতায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে তিনি প্রথম য়ুরোপের মহাসমরে 'বাঙালী পল্টনে' যোগদান করিয়া মেসোপটেমিয়া গমন করেন। অতঃপর হাবিলদারের পদে উন্নীত হইয়া যুদ্ধান্তে দেশে ফিরিয়া আসেন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশই তাঁহার কাব্যস্ফূর্তের অনুকূল হইয়াছিল। কবিব বয়স যখন এগার বৎসর তখন বর্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত 'লেটো' নাচ নামক একপ্রকার যাত্রাভিনয় দলে যোগদান করিয়া 'লেটো' দলের জন্য গান বাঁধিয়া, পালা রচনা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

কবিরসংক্ষিপ্ত জীবনী

য়ুরোপের মহাসমর শেষ হইলে দেশে ফিরিয়া তিনি 'মোস্‌লেম ভারত' নামক একখানি নূতন সাহিত্য পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশ করেন। তাঁহার ঐ কবিতাগুলির ছন্দো-নৈপুণ্য ও প্রবল কবিত্বপূর্ণ আবেগ তৎকালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকায় তাঁহার লিখিত কবিতাবলী অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহাকে যশস্বী করিয়া দিল। তাঁহার কবিতায় আধুনিক যুব-মনের বিশেষ প্রকৃতি জীর্ণ প্রাচীন সমাজের নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহা কবির ভেরীর এক গম্ভীর ছন্দে বাজিয়া উঠিল।

কাব্য প্রতিভার প্রথম প্রকাশ

গল্প রচনার মধ্য দিয়াই নজরুলের লেখক জীবনের সূচনা হয়। কবির সর্বপ্রথম রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'। একটি ব্যর্থ প্রেমেরকাহিনী লইয়া তিনি 'বাঁধনহারা' নামে প্রথম উপন্যাস লেখেন। পরিণত বয়সে তিনি অনেকগুলি ভাল ভাল উপন্যাস লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহার উপরেই তাঁহার কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পরাধীন শৃঙ্খলিত জাতি উপভোগ করিয়াছে সত্য কিন্তু নজরুলের কবিতায় পাইয়াছে তাহারা শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার এক উদ্দীপনা। ১৯২০ সালে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করিয়া তিনি বিপুল খ্যাতি ও 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা অর্জন করিয়াছিলেন। এই কবিতার মধ্য দিয়া কবি মানুষকে শুনাইলেন এক মুক্ত জীবনের সঙ্গীত—মানুষকে আহ্বান করিলেন এক অনন্য আদর্শের পথে, দীপ্তকণ্ঠে কবি ঘোষণা করিলেন—'আমি বেদুইন, আমি চেংগিস, আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'। নিপীড়িত জনগণের বেদনা, অপমান মূর্ত হইয়া উঠিল কবির কবিতায়।

কবির লেখক জীবনের সূচনা

রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁহারা কাব্য রচনা করিয়া [illegible] প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন

নজরুল তাঁহাদের অন্যতম। একদিকে যেমন হৃদয়াবেগের গভীরতা ও তীব্রতা প্রকাশিত হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ পাইয়াছে শব্দ চয়নের পারিপাট্য ও ছন্দ চাতুর্যের অসাধারণত্ব প্রকাশ। নজরুলের যে রচনা বাঙালী পাঠককে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছে তাহা কবির অবিচারের প্রতিবাদমূলক কাব্য। মানুষ, প্রকৃতি ও পল্লীকে লইয়া

কবি প্রতিভা

তাঁহার যে কবিতা তাহার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কবি নজরুলের প্রকৃত কবিরূপ। ১৩৩৫ সালে মানিকগঞ্জে সাহিত্যসভায় মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল কবি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন: 'নজরুলের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিলাম—এত কম নয়। এ খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে……তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই……দেশে যে নূতন ভাব জাগিয়াছে তাহার সুর পাই।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন তাহার 'বলাকার যুগে' যৌবনের জয় সংগীত সীমাহীন উন্মাদনায় তরুণ প্রাণকে সঞ্জীবিত করিতেছিলেন তখনই অকস্মাৎ এক বিদ্রোহীর ভূমিকা লইয়া 'ঝড়ের মাতন বিজয় কেতন নেড়ে অট্টহাস্যে আকাশখানি

বিদ্রোহী কবি নজরুল

ফেড়ে' অবতীর্ণ হইলেন নজরুল। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙ্গার গান', 'প্রলয় শিখা', 'সাম্যবাদ', 'সর্বহারা' প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্যে প্রকাশ পাইল সর্বহারা, অবিচার, অত্যাচার পীড়িত সাধারণ মানুষের হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনার কাহিনী। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি নানা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল এক তীব্র প্রতিবাদ—কবির মনে দেখা দিল এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ।

সংগীত সৃষ্টির মাধ্যমেও আমরা পাই নজরুলের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। দেশ-প্রেমের গান, ভক্তিমূলক গান, গজল, কীর্তন, ভাটিয়ালী, সাঁওতালী, ঝুমুর প্রভৃতি গান রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে তাঁর অসাধারণ কবিপ্রতিভা। সাম্প্রদায়িক কিংবা ভেদমূলক কোন প্রশ্নই কবির চিত্তে সংকীর্ণতা আনয়ন করিতে পারে নাই।

চারণ-কবি নজরুল

তাঁহার নিকট এই কথাটিই ছিল বড় 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। হিন্দু ও মুসলমান বঙ্গ-জননীর দুইটি সন্তান ইহা তাঁহার পক্ষে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির লাঞ্ছনায় তাঁহার 'বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত' অভিমান ফেনাইয়া উঠিয়াছিল। কবি বুঝিয়াছিলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিকেই এক সঙ্গে পার হইতে হইবে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'।

নজরুল সাম্যবাদের কবি—সুগভীর মানবপ্রীতিই বিদ্রোহী কবি নজরুলকে সমানাধিকার-বাদে দীক্ষিত করিয়াছে। [illegible] ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তীক্ষ্ণাগ্র বচন কখনই ভগবান-এর [illegible] প্রয়োগ হয় নাই। এখানেই রাশিয়ার সাম্যবাদের সহিত

সাম্যবাদী নজরুল

কবির সাম্যবাদের পার্থক্য। অভিমানীভক্তের ন্যায় ভগবানের কাছে ফরিয়াদী কবি অত্যাচারী, [illegible]ক, লোভী-ভণ্ড মানুষের বিরুদ্ধে ভগবানের নিকট নালিশ

জানাইয়াছেন। তাই কবি উদাত্তকণ্ঠে জানাইয়াছেন, 'তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করি ভোগ।'

নজরুলের বহুমুখী প্রতিভার স্পর্শে শিশুপাঠ্য হালকা ছন্দ কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক সংগীত পর্যন্ত তাঁহার কাব্যবীণায় ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

উপসংহার

রবীন্দ্র প্রতিভার নীচে থাকিয়া বাঙলার একটানা বাউল সুরের মাঝখানে নজরুল যে রণগীতির বিজয় নির্ঘোষ আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহা বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাসে সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। এইখানেই কবির অনন্যত্ব ও বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে আজ তাহার প্রিয় কবির দান হইতে সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত। তিনি আজ জীবন্মৃত। কিন্তু তাঁহার নিকট বাঙালী যাহা পাইয়াছে, তাহার অসাধারণ মূল্য বাঙালী চিরদিন কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিবে।

যে সকল বিষয় তোমাকে পড়িতে হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন্ বিষয়টি তোমার সর্বাধিক প্রিয় এবং কেন

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২]

ইংরাজীতে একটি কথা আছে "Variety is the spice of life. আমাদের সীমাবদ্ধ ব্যবহারিক জীবনের পক্ষেও এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাই কৃত্রিম, গতানুগতিক ও একঘেয়ে জীবনযাপনে মানুষ বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ। যুগে যুগে মানুষের বৈচিত্র্যাকাঙ্ক্ষা নতুনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ তবুও বহুর মধ্যে একের সন্ধান করিয়াছে। স্নেহময়ী

প্রারম্ভিক ভূমিকা

জনক-জননীর বহু সন্তানের মধ্যে একজনকেই বেশি স্নেহ করিয়াছেন। সংখ্যাতীত বন্ধুর মধ্যে একজন বন্ধুকেই মনে হইয়াছে আকর্ষি। সুতরাং বিষয়ের যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন—স্নেহময়ী জননীর মত, একান্ত আপনার বন্ধুর মত একটি বিষয়ই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। বলা বাহুল্য, তা সাহিত্য।

প্রবল জ্ঞানাকাঙ্ক্ষায়, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ হইবার উদগ্রতায় নানান্ বিষয় পড়িয়াছি। বড় ডাক্তার হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছি। অথচ সাহিত্যের মত কোন বিষয় আমার মন এত বেশি রেখাপাত করে নাই। ইহার স্বপক্ষে হয়ত বা একাধিক কারণও দেখান চলে, কিন্তু

বিষয় প্রিয়তার স্বপক্ষে যুক্তি

সে কারণ গৌণ, আসল কারণ হইল ভাল লাগা। কেউ কথনও ওজন করিয়া সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মভাবে পর্য[illegible] করিয়া ভাল বলে না। ভাললাগা বা প্রেয়ত্বে বরণ করিয়া নিবার জন্য যা সবচেয়ে বেশি দরকার তা হল, মনোরাজ্যে চিরস্থায়ী রেখাপাত। [illegible] দ্বিধা নাই [illegible]হিত্যের চিরস্থায়ী রেখাপাত আমার সারা মনোজগৎ জুড়ে। [illegible] সুখে-আনন্দে, দুঃখে

সান্ত্বনা-ব্যাথায়-সর্বংসহতা—সবকিছুই সাহিত্যে পাই। নিষ্কাম জ্ঞানই শুধু নয়, ভাবের আকরও সাহিত্য—তাই সাহিত্য আমার সবচেয়ে প্রিয়। আর সে সাহিত্য আমার দেশের বাঙ্‌লা সাহিত্য। প্রাণের, মনের, হৃদয়ের স্পর্শে তা রঞ্জিত।

অসীম জানিবার আগ্রহে বিভিন্ন সময় বহু বিষয় পড়িতে হইয়াছে—ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সাধারণ জ্ঞান, সমাজবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা —আরও কত কি। এগুলির প্রতিও যে এতটুকু মোহ নাই তা অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সে মোহ মূলতঃ প্রদীপ্ত জিগীষাবোধের—তার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি আমার যে মোহ রহিয়াছে তা হইল হৃদয়ের। সুকোমল হৃদয় স্পর্শের অতিরেকতায় সাহিত্য আমার চিরন্তন বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে। নেহাৎ লাভলোকসানের মানদণ্ডে হয়তবা সাহিত্য অপ্রিয় মনে হইবে, ইহার ব্যবহারিক মূল্য অস্বীকৃত হইবে। আমার মনে হয় সে বিচার সাময়িক বিচার মাত্র। চিরন্তন বিচারে সাহিত্যেরই ভাগ্যে জয়মাল্য জুটিবে। তাই তুলনার রেখা না টানিয়া হৃদয়ের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া বলিব সাহিত্যই আমার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয়।

তুলনামূলক বিচারে বিষয় প্রিয়তা

প্রকাশই মানবমনের সবচেয়ে বড় ধর্ম। সে প্রকাশ মনের ভাবপ্রকাশই হোক, আর হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সুন্দর অভিব্যক্তিই হোক—সাহিত্যের সব প্রকাশই সহজ, স্বাভাবিক, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠে। এজন্যে আমার প্রকাশকামী চিত্ত সাহিত্যপাঠের দ্বারা নিত্য নূতন বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়াও 'সাহিত্যই' যে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয়—একথা বলিতে দ্বিধাবোধ করে না। সত্যিকথা বলিতে কি, সাহিত্য পাঠের দ্বারা লাভ করি এক অপার্থিব আনন্দ, আচমকা শিহরণ আর মৌহূর্তিক বিদ্যুদ্দীপ্ত। ইহাকে বাক্য ও মনের ভাব দিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কেমন জানি একটা না বলিতে পারা অনুভবই সাহিত্য পাঠের সবচেয়ে বড় ফলশ্রুতি। একারণেই সাহিত্যের প্রভাব আমার মনের গভীরে। মনের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কতশত যুক্তি তুলিয়া আনিয়া প্রতি মুহূর্তে সাহিত্যকে মনে হয়, তা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয়—আবেশ বিহ্বল মুহূর্তে কতশত ভাব-ভাবনার যুক্তিগুলির মধ্যে রঙবেরঙের মণিমুক্তার সুসমারোহ দেখিয়া চি[illegible]সিত হইয়া উঠে।

বিষয়ের প্রভাব

উপ[illegible]হারেও ব[illegible]াহিত্যই আমার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয় বিষয়। ব্যবহারিক মূল্যের মানদণ্ডে উহার মূল[illegible]তই কম হোক্ না কেন—চিত্তের গভীরে স্থায়ীপ্রভাব মুদ্রন করিয়া[illegible]াহিত্য আ[illegible]র ম[illegible]নারাজ্যের নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের গুরু-ভারে মস্তিষ্ক চা[illegible]র্বহ হইয়া উঠে, সাহিত্য তখন নতুন প্রাণরস সঞ্চার করে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তাই প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গী। Law of Gravitation এর ন্যায় পদার্থ বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্বও এই সাহিত্যে আস্বাদ্য মানতার কাছে হার মানে। বিজ্ঞানীদের আমি শ্রদ্ধা করি, দূর হতে প্রণতি জানাই। কিন্তু সাহিত্যকারদের ভালবাসি—তাঁহাদের নিত্য উপস্থিতিতে আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নিকটের আপনার জনকে ছাড়িয়া কেউ কখনও দূরের মানুষকে প্রিয়জন বলে? ইহা বলা যায় না বলিয়াই আবার বলি 'সাহিত্য আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়।'

উপসংহার

৮ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ভারতের সভ্যতা প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহের অন্যতম। ইহা এখনও জীবন্ত ও চলিষ্ণু। ভারতের সভ্যতা প্রধানত আর্য সভ্যতা। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বে আর্যগণ ভারতে আসিয়া সভ্যতা পত্তন করেন। আজ পর্যন্ত সভ্যতার স্রোত ভারতের মাটিতে সবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ভারতের সংস্কৃতি তথা হিন্দুসংস্কৃতি বলিতে আর্য ও অনার্যের যুক্ত সংস্কৃতিকেই আমরা বুঝিয়া থাকি।

প্রাক্-আর্য সংস্কৃতি

ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী বলতে নেগ্রিটো বা নিগ্রবটু নামে এক জাতির নাম জানা যায়। এই ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণবর্ণ জাতি অরণ্যসমূহে এবং সমুদ্র উপকূলে বাস করিত। এই নেগ্রিটো জাতির পর সর্বপ্রথম বিদেশ হইতে ভারতে অস্ট্রীক জাতীয় লোকেরা আগমন করে। এই অস্ট্রীক লোকেদের সহিত পূর্বস্থিত নেগ্রিটো লোকেদের রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়া কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির উদ্ভব হয়। এই অস্ট্রীক জাতীয় লোকেরা ক্রমে ক্রমে আর্যভূত হইয়া গেলেও ইহাদের সংস্কৃতির প্রভাব আর্য সংস্কৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রীক ভাষার বহু শব্দ আর্য ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাদের বহু দেব-দেবী আর্য সমাজে পূজিত হইতেছে। ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী দ্রাবিড়গণ অস্ট্রীকদের পরে ভারতে আগমন করে। দ্রাবিড়গণ সুসভ্য ও উন্নত জাতি ছিল। মহেঞ্জোদড়োতে যে সভ্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ঐ দ্রাবিড় সভ্যতা বলিয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দ্রাবিড়ভাষা দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলির মধ্যে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। শিব, উমা, বিষ্ণু প্রভৃতি দ্রাবিড় দেবতা সম্পূর্ণরূপে আর্য দেবতা হইয়া গিয়াছেন। দ্রাবিড় সমাজ-ব্যবস্থা, রাজনীতি প্রভৃতিও আর্যসমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

আর্যগণ কবে ভারতে আগমণ করিয়াছিল তাহা লইয়া পণ্ডিতেরা নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে ১৫০০ [illegible] কাছাকাছি তাঁহারা ভারতে

আসেন। তাঁহাদের দ্বারা অন্যতম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়।

বৈদিক যুগ

বেদ ও উপনিষদের মধ্য দিয়া বৈদিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। আর্যগণ উত্তর ভারত হইতে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে ভারতের প্রাগার্য অধিবাসিগণ ক্রমে ক্রমে আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে।

প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতের মধ্যে অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিবার পর ক্রমে ক্রমে আর্য সমাজের মধ্যে দুর্বলতা ও ক্ষয় দেখা দিল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম

বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগ

শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। বৌদ্ধ যুগে ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পের বিশেষ প্রসার হইয়াছিল। কালক্রমে মহারাজ কণিষ্কের আমলে বৌদ্ধধর্ম 'হীনযান' ও 'মহাযান' এই দুই শাখায় বিভক্ত হইল। মহাযান শাখার শাস্ত্রাবলী সংস্কৃতে লিপি ই শাখায় বুদ্ধদেব দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হইলেন এবং তাঁহার মূর্তিসমূহ বিহারে বিহারে পূজিত হইতে লাগিল। এই মহাযান ধর্মের বহু দেবদেবীর উদ্ভব হইল এবং কালক্রমে মহাযান ধর্ম হিন্দু ধর্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গেল। সপ্তম শতাব্দীতে শৈবধর্মের বিখ্যাত প্রচারক শঙ্করাচার্যের দ্বারা ক্ষীয়মান বৌদ্ধধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া পুনরায় হিন্দুধর্মের বৈজয়ন্তী ভারত ভূমিতে স্থাপিত হইল।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া আর্য সভ্যতা এবং আর্য-অনার্যের সম্মিলিত হিন্দু সভ্যতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিবার পর বৈদেশিক মুসলমান দ্বারা আহত ও

মধ্যযুগ

বিপ্লুত হইল। মুসলমান ধর্ম ও সমাজ ভারতের মধ্যে অনেক প্রভাব স্থাপন করিয়াছে সত্য—সামাজিক-শিষ্টাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, দেশীয় সাহিত্যের উদ্ভব, ইতিহাস লিখিবার রীতি প্রভৃতির উপর এই প্রভাব চিহ্নিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতে থাকিয়াও তাহারা বৈদেশিক ধর্ম, আচার-ব্যবহার-ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা চালিত হইতে লাগিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির তরঙ্গ ভারতের তটদেশে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত

আধুনিক যুগ

যুবকগণ সেই তরঙ্গে নিজেদের ভাসাইয়া দিতে চাহিল। ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাবধারা বিশ্বের সহিত যুক্ত হইল, ভারতের সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য দূর হইল।

ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা চিরকাল ধরিয়া নিরন্তর নানা বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও মিলন সম্পাদন করিতেছে। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় যে, ভারতে বুঝি কোন জায়গায় মিল নাই—এখানে ভাষার সংখ্যা নাই, ধর্মমতের অন্ত নাই, আচার ব্যবহারের [illegible] নাই। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করিলেই ইহা স্পষ্ট

বুঝা যাইবে যে, মিলনের দৃঢ়সূত্র ইহাদের মধ্য দিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে। শ্রুতি-স্মৃতি, সংস্কৃত ভাষা, পুরাণ এবং জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও সম্প্রদায়কে এক অখণ্ড জাতীয়তা ও সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ভারতের সাধনা

ভারতের মাটি বড় উদার, বড় সহিষ্ণু। শত প্রকার ঝড়-ঝঞ্ঝা ও সর্বরকমের আঘাতের মধ্যেও তাহা অটল অবিচল। কত বৈদেশিক জাতি রুদ্র আক্রমণের মধ্য দিয়া তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু ভারত সীমাহীন ক্ষমা লইয়া সকলকে উদার পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়াছে। দ্রাবিড়, শক-হুন, প্রভৃতি কত জাতি বিদেশের স্বভাব ও প্রকৃতি লইয়া উদ্ধত আঘাতে ভারতকে জর্জরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ভারত তাহার অতিথিশালায় তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আবার কিছুকাল পরেই দেখা গিয়াছে তাহাদের পরিধানে এদেশের পরিচ্ছদ ও আভরণ, তাহাদের হৃদয়ে এদেশের রক্ত ও রস। ভারত কাহাকেও ঘৃণা করে নাই, আবার কাহাকে ত্যাগও করে নাই, সেজন্যই তাহার মাটিতে সব রকম মত ও পথের উদ্ভব হইয়াছে। এই উদারতা ও সহিষ্ণুতার বলেই সে কখনও মরে নাই, কখনও মরিতে পারে না।

সমীকরণ শক্তির বিকাশ

আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী ভারতে পুনর্জন্মবাদ এবং কর্মবাদের আদর্শ পাশ-পাশি বহিয়া চলিয়াছে। পরিণতিতে উহা জড়বাদের প্রতি ভারতবাসীর আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ফলে পাশ্চাত্ত্য যেখানে ভোগকে 'একমেব' মনে করিয়াছে, সেখানে ভারতবর্ষ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শে সমুজ্জ্বল। একদিন এই ভারতের বাণীই পৃথিবীর বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মধ্য-এশিয়া চীন, জাপান, মালয় ব্রহ্মদেশ, তিব্বত প্রভৃতি দেশ ভারতের দ্বারা একদিন বিজিত হইয়াছিল—অস্ত্রের দ্বারা নয়, প্রেমের দ্বারা। ভারতের বাণী মিলনের বাণী, ঐক্যের বাণী, শান্তির বাণী। এই বাণী যুগ যুগ ধরিয়া বিক্ষুব্ধ, বিপ্লুত বিধ্বস্ত জগৎকে আশার পথ দেখাইয়াছে। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি-বেদব্যাস, বুদ্ধদেব-শঙ্করাচার্য, নানক-চৈতন্য, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা সকলে একই বাণী প্রচার করিয়াছেন, একই সত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা মানবের শিক্ষয়িতা, পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা।

উপসংহার

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

পুষ্প যেমন আপন সৌরভ বিস্তার করিয়া উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আনন্দে বিমোহিত করে, সূর্য যেমন আপন দীপ্তি বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত বিশ্বকে আপন করিয়া লয়, রবীন্দ্রপ্রতিভাও তেমনি আপন মহিমা সারা বিশ্বের মানুষের দরবারে [illegible] করিয়াছে—বিস্তার করিয়াছে। বাঙলার মাটিতে জন্মিয়া বাঙলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। আপন প্রতিভা এবং প্রেমের স্পর্শে তিনি সারা পৃথিবীকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। তাই দেশ-কালের গণ্ডী ছাড়াইয়া তিনি আজ সারা পৃথিবীর কবি হিসাবে পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে চিরকালের স্থায়ী আসনে আসীন। এইখানেই রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশালতা, এইখানেই রবীন্দ্রপ্রতিভার সার্থকতা। কবির বাঁশিতে সারা পৃথিবীর সাড়া লাগিয়াছিল বলিয়াই সমগ্র পৃথিবী আজ কবিবন্দনায় মুখর। আজ তিনি শুধু তাঁহার দেশবাসীর নহে, সেই সঙ্গে সারা পৃথিবীর গর্বের বস্তু।

[illegible]ক সূচনা

রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু কবিই হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় বিশ্ব জুড়িয়া তাঁহার বিগত জন্ম[illegible]তবার্ষিকী উপলক্ষে এমন বিপুল সাড়া জাগিত না। পৃথিবীতে বহু বিখ্যাত কবির জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সাহিত্যক্ষেত্রে মহাকবি সেক্সপীয়রের পরে তাঁহার ন্যায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন কবি জন্মগ্রহণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও চিন্তাশীল। মনগড়া কাল্পনিক রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া কবিদের যে অপবাদ প্রায়ই দেওয়া হইয়া থাকে, তিনি তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। কবি হইয়াও তিনি প্রত্যক্ষগোচর বাস্তবজীবনকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার শিক্ষাচিন্তা, সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, মানবচিন্তা এই সব কিছুই উহার প্রমাণ দেয়। তাঁহার সবগুণকে ছাপাইয়া গিয়া যাহা তাঁহাকে সারা পৃথিবীর প্রিয় করিয়াছে, তাহা হইল তাঁহার অকৃত্রিম মানবতাবোধ, মাটির পৃথিবীর সহিত সুগভীর মমতা, বি[illegible]াতৃত্বের সুদৃঢ় সাধনা এবং সত্যের প্রতি তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা

আজ [illegible] একশ' চার বছর পূর্বে এক শুভ পঁচিশে বৈশাখে কলিকাতার একপ্রান্তে জোড়াসাঁকোর ঠাকু[illegible]বারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজে[illegible] একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। শৈশবে পিতার স্নেহদাক্ষিণ্যে, ভ্রাতা[illegible]র আন্তরিক সহচর্যে এবং সমসাময়িক চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীদের সদুপরামর্শে কবিচিত্তে ঔদার্য, ম[illegible]ও [illegible]ত চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়াছিল। পিতার নিকট হইতে তিনি

ঔপনিষেধিক চিন্তার খোরাক লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে উহা তাঁহার চেতনার মূলে প্রোথিত হইয়াছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত হইতে সুরু করিয়া আরোগ্য রোগশয্যায় প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলিতে তাঁহার ভাব-ভাবনার রূপান্তরশীল রূপটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। গতিবাদ, সৌন্দর্যবাদ, প্রকৃতিপ্রীতি, মর্ত্যঘনিষ্ঠ জীবন-সম্প্রীতিবোধ, সত্যানুরাগ প্রভৃতি বিচিত্রতর ভাব-ভাবনার শিল্পসম্মত রূপ দিয়াছেন।

রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি

সর্বত্রই কবিচিত্তে 'মানুষের মাঝে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা'র ভাব-গম্ভীর রূপটি প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষুদ্রের মধ্যে ভূমা, সীমার মাঝে অসীম, বিচিত্রের মধ্যে একক অনুভব করিবার জন্য একদিকে যে মানসের নিয়ত পরিবর্তনশীল, সদাচঞ্চল, ভাবৈশ্বর্যের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার ছোটগল্পে ছোট ছোট সুখ-দুঃখ কল্লোলিত মানবমনের রহস্যের এক একটি খণ্ড ক্ষুদ্র রূপালেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে। নাটকে জীবনের দ্বন্দ্ব-মধুর রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসে স্বচ্ছ জীবন জিজ্ঞাসা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়াছে। আর লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রগতিশীল চিন্তাধারার যুক্তিসিদ্ধ উপস্থাপনা। তাঁহার 'পোষ্টমাষ্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'অধ্যাপক', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি ছোট গল্প ; 'ডাকঘর', 'রাজা', 'শারদোৎসব', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটক ; 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাস ; 'আধুনিক সাহিত্য', 'কালান্তর' প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যে প্রথম সারিতে স্থান পাইতে পারে। তাঁহার সমালোচনা রীতিও গতানুগতিকতা বর্জিত স্বাধীন চিন্তাপুষ্ট। সাহিত্যরাজ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বাতিশয়ী বিকাশ যে কোন দেশের সাহিত্য পাঠকের নিকট বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। 'গীতাঞ্জলি' লিখিয়া নোবেল পুরস্কার না পাইলেও রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা অনায়াসে বিশ্ববাসীর প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনলাভে ধন্য হইত.

পরাধীন দেশের কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাম্রাজ্যবাদীর পূর্ণ পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন তিনি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি গাহিতে গাহিতে অনেকের সহিত পথ পরিক্রমা করিয়া রাখীবন্ধন উৎসব পালন করেন। জালিওনয়লাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দরুন তিনি ইংরেজ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন এবং তীব্রকণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ জানান। তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিবার জন্য যত্নবান ছিলেন। তিনি দেশের ঐতিহ্য, আদর্শ, স্বপ্ন সব কিছুই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই উহাদের বাস্তব রূপায়ণের জন্য দেশবাসীর অন্তরে সুগভীর প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশভ্রমণের সৌভাগ্য তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি নানাদেশের

সর্বতোভাবে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সংগঠনমূলক কার্যকলাপের সহায়ক, তাহাই তিনি দেশবাসীকে অনুসরণ করাইবার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর যেখানে যখন অন্যায় আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, তখনই তিনি বজ্রকণ্ঠে তাহার প্রতি ধিক্কার জানাইয়াছেন। কবির ভাবতন্ময়তা সেদিন তাঁহাকে বাস্তব জগতের সুখ-দুঃখ হইতে অপসারিত করিয়া রাখিতে পারে নাই। এই পৃথিবীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন তাই চাহিয়াছিলেন এই পৃথিবীতে এমন এক সু[illegible] প্রতিষ্ঠা করিতে যাহা কল্যাণময়, যাহা শুভময়। তাঁহার জীবনের প্রতিটি [illegible] এবং কর্মে ছিল এই মনুষ্যত্বতার স্পর্শ। তাই তাঁহার কবিতায়, তাঁহার প্রবন্ধে, তাঁহার চিঠিপত্রে, তাঁহার কথোপকথনে সর্বত্রই দেখিতে পাওয় যায় এই বিশ্বজননীতার স্পর্শ, মনুষ্যত্বকে আপন মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা। তাই পরপারের গমনোদ্যত বৃদ্ধ কবি বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলেন :

দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম

"সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"

পৃথিবীতে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব চলিতেছিল, পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের অবমাননা যখন [illegible]ম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তখনও চির আশাবাদী কবি বিপুল বিশ্বাসে ঘোষণা করিয়াছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। মানুষের প্রতি এই অবিচলিত বিশ্বাসই কবিকে আপন করিয়াছে। জীবনের প্রতি পলে পলে কি ভাবে এই অনন্যসাধারণ বিশ্বাসের ভিত্তি কবিমনে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই খবরের জন্য লোকে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করিয়াছে।

'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা কেবলমাত্র উহার চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। ইংরেজ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আপন বুদ্ধি-বিবেচনার বলে তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। দেশের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য তাই দেশ জুড়িয়া শিক্ষার বেড়াজাল পাতিবার কথা তিনি বলিয়াছেন। [illegible]নের ভাব প্রকাশের বাহন নিজনিজ দেশে মাতৃভাষা হইবে উহার মাধ্যম। এ যুগের [illegible]রচঞ্চল গতিধারার সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে হইলে চাই টেনিসনের যুলিসিসের মত জীবন [illegible] আকণ্ঠ পান করিবার স্বপ্ন। তিনি মনে-প্রাণে ঐ প্রকার জ্ঞানানুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই কারণে তিনি বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের মাধ্যমে [illegible]মূল্যে 'বিশ্ব[illegible]' সিরিজের পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে সর্ব[illegible] দেশবাসীকে তিনি জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ

শিক্ষানুরাগী রবীন্দ্রনাথ

করিয়াছিলেন। লোকায়ত জীবনের সহজ স্বাভাবিক প্রণালীকে স্বীকার করিয়া উহার সহিত যুগোপযোগী শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধানের কথা তিনি বলিয়াছেন।'

সঙ্গীত হইল অন্তর্জগত আলোড়িত মর্মবাণী। শৈশব হইতেই তিনি দেশীয় সঙ্গীতের সর্ববিভাগের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তাই তিনি কথা ও সুরের হরগৌরী মিলনে এক নতুন শ্রেণীর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি সহস্রাধিক গানও রচনা করিয়াছেন। বাউল, ভাটিয়ালী, কী[illegible] ন্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত নামে উহা আজ স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

সঙ্গীতগুরু রবীন্দ্রনাথ

সাত আট বৎসর হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সুদীর্ঘকাল তাহা অবিরাম নিত্য নূতন সম্পদ সৃষ্টি করিয়া অবশেষে ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া যায়; তিরোধান ঘটে এই মহাপুরুষের।

মনুষ্যত্ব যেদিন আপন মর্যাদা লাভ করিবে কবির স্বপ্নের সাধনার পৃথিবী সেদিন আপন মহিমায় রূপলাভ করিবে। রবীন্দ্রনাথ আজ নাই আছে তাঁহার বিপুল সাহিত্য সম্পদ। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসা, বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে দেশপ্রেমের অপূর্ব মিলনসাধন করা, ইউরোপীয় চিন্তার সহিত প্রাচীন ভারতীয় সমন্বয় সাধন করা, সব কিছুরই সাক্ষ্য বহিয়াছে তাঁহার সৃষ্টিতে।

উপসংহার

'ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে,
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।'

কবির মানসলোকে যে মহামানবের আগমনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকে বন্দনা করার, তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার সাধনাই হইবে কবি-বন্দনার শ্রেষ্ঠতম পন্থা।

বাঙলার লোকসাহিত্য

অভিজাত অনভিজাত দুই শ্রেণীর মানুষই সমাজে আছে। এই দুইয়ের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচিগত তারতম্য রহিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই তার[illegible]ম্যের পরিচয় স্পষ্টতর। উন্নতশিক্ষা ও রুচির [illegible] অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহিত্য চিরদিনই লিখিত ও সমাদৃত হই[illegible] আসিয়াছে। অন্যদিকে অনভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা অলিখিত মৌখিক সাহিত্যে[illegible] স্বাদেই তৃপ্ত [illegible] লোক-চক্ষুর অন্তরালে এই মৌখিক সাহিতের ধারা নিত্য বহমান [illegible] বেদের আ[illegible] হইতে মৌখিক সাহিত্যের সমাদর অদ্যাবধি সমান রহিয়াছে। [illegible] সব সাহিত্যই ছিল

প্রারম্ভিক ভূমিকা

অলিখিত, সেখানে সব সাহিত্যই মৌখিক। মুখে মুখে রচিত এবং মৌখিক প্রচারিত সাহিত্য চিরদিনই সমাজে সমাদর পাইয়া আসিয়াছে। এই মৌখিক অলিখিত সাহিত্যের ধারাই লোকসাহিত্য নামে অভিহিত হয়।

অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায় বাঙলা সাহিত্যেরও লিখিত ও মৌখিক—এই দুই ধারা রহিয়াছে। লিখিত সাহিত্য উচ্চশিক্ষিত ও উন্নত রুচিবানদের দ্বারা সৃষ্ট। আর মৌখিক সাহিত্য নিরক্ষর গ্রামীন কবিদের সহজাত কবিত্বশক্তির স্পর্শে সজীব।

ব… …র

গ্রামীন মানুষ লোকায়ত জীবনের খণ্ড পরিবেশ সুখ ও আনন্দলাভের তাড়নায় এই লৌকিক সাহিত্যের জন্ম দিয়াছে। সহজ-সরল মনের অধিকারী গ্রামীন মানুষ অল্পতেই তৃপ্ত। তাই তাদের সৃষ্ট সাহিত্যে বুদ্ধির দীপ্তি নাই। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির স্পর্শে তা বঞ্চিত নয়। বড় বড় শহরের পত্তনের ফলে এবং যুগোপযোগী শিক্ষা প্রসারের দরুন আধুনিক কালে লোকসাহিত্য উপেক্ষিত ও অনাদৃত। অনেকের ধারণা লোকসাহিত্য শুধুমাত্র ছেলেভুলান মনগড়া কল্পকথা মাত্র। আসলে তা নয়। লোকসাহিত্যেও উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি ও গভীর রসবোধ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পরিমিত সহানুভূতি লইয়া লোকসাহিত্য পাঠ না করিলে ইহার সম্পূর্ণ আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

ছড়া

ছড়া বাঙলা লোকসাহিত্যের এক আকর্ষণীয় বিষয়। অতি শৈশবকাল হইতেই আমরা ছড়ার সহিত পরিচিত। ইহার একদিকে যেমন মনোরঞ্জনী ক্ষমতা অপরিসীম, অন্যদিকে তেমন গভীরতর হৃদয়প্রীতি ও অপরিসীম অন্তরঙ্গ পরিচয়ে তা প্রোজ্জ্বল। অবাধ্য সন্তানকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে স্নেহময়ী জননী যখন অনর্গল ছড়া বলিয়া যান, তখন অবাধ্য শিশু মনের আনন্দে ঘুমাইয়া পড়ে। কৃষক ধান কাটিতে কাটিতে মনের সজীবতায় ও উল্লাসে কত বিচিত্র ছড়া বলিয়া চলে। মেয়েলী ব্রত-অনুষ্ঠানেও এই ছড়া সমান মর্যাদালাভে ধন্য হয়। অথচ এই ছড়া সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে, ইহা শিশুসাহিত্য। ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসিকে যখন বাঁটা ভরে পান, চালকড়া ভাজিয়া …র প্রলোভন দেখাইয়া জননী সাদর আহ্বান জানায়—তখন সকলেই শিশুর সারল্য … ছড়াকে পরম সমাদরে গ্রহণ করে। 'তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা,' 'চাঁদ উঠেছে, ফুল … টেছে,' 'খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ি' প্রভৃতি ছড়া আজও বাঙলা দেশে সমান-ভাবে সমাদ… …ত হইয়া আসিতেছে। আসলে কিন্তু ছড়া পুরাপুরি শিশুসাহিত্য নয়। বয়স্করাও ইহার সবুজ … …মায় চিরমুগ্ধ, চিরতৃপ্ত। আবাহমানকাল ধরিয়া বাঙালী জননীর স্নেহ-প্রীতির উদার … তা এক অনির্বচনীয় মোহাবেশ জাগাইয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনা… বিশ্বকবি হইয়াও এই ছড়ার আকর্ষণীতার দিক বিস্মৃত হন নাই। তাই আজ হইতে ষাট বছর আ… … দেশের লোক ভুলান ছড়ার মর্মস্পর্শী বিশ্লেষণ করিয়া-

ছিলেন। সেদিন হইতেই বাঙালী পাঠক এই ছড়ার উচ্চতর সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে সজাগ হইল।

বাঙলা দেশে ছড়ার পরই লোকসঙ্গীতের আদর। বাঙলা লোকসাহিত্যের ব্যাপক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়িয়া আছে বাঙলার লোকসঙ্গীত। এই লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্য অসীম। ইহাকে সাধারণতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, আঞ্চলিক সঙ্গীত। অঞ্চল বিশেষের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই শ্রেণীর সঙ্গীতের জন্ম। ইহাদের মধ্যে মানভূমের টুসুগান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূ[illegible]ন ও ঝুমুরগান, মালদহের গম্ভীরা গান, মেদনীপুরের [illegible]ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাঙলা দেশে অঞ্চল বিশেষের প্রকৃতি ও সমাজ এই শ্রেণীর গা[illegible] সজীব, মর্মস্পর্শী ও চিত্তচমৎকারী রসস্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারিক সঙ্গীতের উল্লেখ করা যায়। এই শ্রেণীর সঙ্গীত প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক উৎসব উপলক্ষে গীত হইয়া থাকে। হিন্দু সমাজের এই শ্রেণীর সঙ্গীতে রামায়ণ ও রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর স্পর্শ রহিয়াছে। কিন্তু ধর্মবর্জিত শাশ্বত আবেদনে উজ্জ্বল মুসলমান সমাজে সৃষ্ট সঙ্গীতগুলি। এই শ্রেণীর সঙ্গীতকে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতও বলা হয়। এর পর আসে প্রেম-সঙ্গীতের প্রসঙ্গ। নিরক্ষর সমাজের সাধারণ মানবীয় [illegible]বনার আধারে এই শ্রেণীর সঙ্গীতের জন্ম। ইহাতে লোকায়ত জীবনের স্পর্শ আছে, কিন্তু এতটুকু কলুষিতা নাই। আর এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত আছে—তাহার নাম কর্ম সঙ্গীত। সাধারণতঃ কর্মজীবী সম্প্রদায় মনের আনন্দে গুন্ গুন্ করিয়া এই প্রকার গান গায়। পাটকাটা, ধানকাটা ও নৌকা বাইচের গান ইহাদের অন্যতম। রূঢ় বাস্তবের কঠোর কর্মানুশীলনেও যে চিত্তের স্বাভাবিক সজীবতা এতটুকু ম্লান হয় না—এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলি তাহারই পরিচয় দেয়। ব্যাপক অর্থে বাউল, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতিও বাঙলা লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর সঙ্গীতকে ধর্মীয় লোকসঙ্গীত বলা চলে।

লোকসঙ্গীত

বাঙলা লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা গীতিকা। এই শ্রেণীর রচনায় থাকে একটি মাত্র ভাব এবং দ্রুত সঞ্চারী কাহিনী। ইহার কাহিনী সম্পুণ ধর্মনিরপেক্ষ। শাশ্বত মানবিকতার আবেদনে তা উজ্জ্বল। ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রভৃতি সংগ্রহ এই শ্রেণীর রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নর-নারীর প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা, ত্যাগ-দুঃখ, তিতিক্ষা-সং[illegible] আত্মবিসর্জন ও কঠোর অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনীতে উহা জীবন্ত। চরিত্র বিকাশের দিক [illegible] হইতেও উহাদের একমাত্র তুলনা আধুনিক উপন্যাস। মলুয়ার দুঃখ, চন্দ্রাবতীর তপস্যা, ম[illegible]র আত্মত্যাগ; মদিনার প্রতীক্ষা—দেশাতীত, কালাতীত মানবিক আবেদনে ম[illegible] কথা এই যে, কলিকাতা

গীতিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহিত গীতিকার ইংরেজী অনুবাদ বিশ্বের লোকসাহিত্যের রসিকদের মধ্যেও বিস্ময় ও আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

বাঙলা মৌখিক কথা সাহিত্যের তিনটি প্রধান বিভাগ। যথা—রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথা। রূপকথার মধ্যে কল্পনার প্রাচুর্য, উপকথার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি এবং ব্রতকথার মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ঐহিক কামনা বাসনার

লোককথা

পরিচয় পাওয়া যায়। এই রূপকথা হইতেছে পরিণত মনের সৃষ্টি। আ[illegible]া সকলেরই প্রিয় এক আজব রোমান্স ভিত্তিক কাহিনী ইহাতে রহিয়াছে। প[illegible]র-নারীকে একই সঙ্গে নায়ক-নায়িকা কল্পনায় যে কাহিনী রচিত, তাহাই উ[illegible]কথা। এই শ্রেণীর রচনায় একাধারে উপস্থিত বুদ্ধি ও অন্যদিকে কৌতুকরসে মৃদু শিহরণ রহিয়াছে। ইহাদের আবেদন কালাতীত, দেশাতীত ও শাশ্বত।

ইহা ছাড়াও প্রবাদ, ধাঁধাঁ, পুরাকাহিনী ইত্যাদিকেও লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাদের মধ্য দিয়া সহজবুদ্ধি ও সরলমনের মধুরিমা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, লোকসাহিত্য সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা

উপসংহার

গিয়াছে। লোকসাহিত্যসম্বন্ধে নানাভাবে গবেষণার চেষ্টাও চলিতেছে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষিত, অভিজাত পাঠকরা বিপুল উৎসাহে ও উদ্দীপনায় লোকসাহিত্য পাঠে ব্রতী হইবে।

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস

সংগ্রামবিক্ষুব্ধ এ মানব জীবনে প্রতিনিয়ত কর্মের আহ্বান আসিয়া চঞ্চল করিয়া তুলে। কর্মের নিগূঢ় আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টা যুক্তিহীন ও অসার প্রয়াস। আপন আপন কর্মনৈপুণ্যবলেই মানুষ এ পৃথিবীকে

প্রারম্ভিক ভূমিকা

নিজের বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। জড় অদৃষ্টকে চরম-পরম ভাবিয়া 'যে শুইয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও তাই শুইয়া থাকে'। একারণেই ভূত-ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করিয়া কর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। যুক্তিহীন পারলৌকিক চিন্তা, মানবমনে অদৃ[illegible]নামক এক কাল্পনিক বস্তুর জন্ম দিয়াছে। বিশ্বাসের অনিশ্চয়তা সত্যবোধের শিথিলতা ও [illegible] বিমুখতা পরিণতিতে মানবমনে অদৃষ্ট-চিন্তার জন্ম দিয়াছে। যুক্তির তৌলদণ্ডে ওজন করিয়া [illegible] অনায়াসেই উহার জঙ্গমত্ব প্রমাণিত হইবে।

পুনর্জন্মবাদের প্রতি [illegible]র আধিক্যই পরলোকের প্রতি বিশ্বাস আনিয়া দেয়। বাস্তবে উ[illegible] মনের প্র[illegible]র [illegible] করিয়া দিয়া দুর্বলতার আত্মবিশ্বাস আনে। এই দুর্বলতার আত্মবিশ্বাস [illegible]বিমুখ অদৃষ্টবাদকে প্রাধান্য দেয়। কর্মে, চিন্তায়,

প্রেরণায় সর্বদিক হইতে মানবমনে অদৃশ্য ও অলক্ষ্যচারী অদৃষ্টের সর্বাতিশয়ী প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলেই অবস্থাগত তারতম্যের মানদণ্ডে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট নিজ অদৃষ্টের দোহাই দেয়। ছল-চাতুরী, মিথ্যা-ভণ্ডামী ও সর্বপ্রকার অসৎ প্রবৃত্তির আশ্রয় নিয়াও অদৃষ্টের দৌলতে বিভিন্ন ব্যক্তি গর্বপ্রকাশ করিয়া থাকে। হয়ত বা ইহার জন্য একজন আর একজনের উপর টেক্কা মারিয়া ভূরি ভূরি ন্যায়-নীতিপ্রসূত সন্দর্ভবাণী উচ্চারণ করে।

অদৃষ্ট-চিন্তার জন্ম এবং বিকাশ

দেশেই পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসের প্রচলন ছিল। ক্রমে ক্রমে বাস্তব অবস্থার [illegible]ইয়া ভারতবর্ষের ন্যায় বহু দেশের মনুষ্যচিত্তে যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা[illegible] ঘটিয়াছে। উহাই পল্লবিত রূপ লইয়া বর্তমান যুগের মানুষকে অদৃষ্টবাদের [illegible] সজাগ করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা। আর এই ভাগ্য নির্মাণের ভিত্তি হইল কর্মবাদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। কর্ম হইল পবিত্র। উহার ক্ষমতা অপরিসীম। তাই গীতায় আছে: 'কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। দৈবী ভাবে বিশ্বাস কিংবা অদৃষ্টের সর্বময় প্রাধান্য স্বীকৃতি জীবনযুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের যথার্থ পথ নহে। অদৃষ্টবাদের প্রতি বিশ্বাসের ফলেই মানুষ সবগুলি কর্মপ্রয়াসের পশ্চাতে অদৃশ্যচারী ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী হয়। এই কৃপা যাহার অভিপ্রায় সে আদৌ যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন মানবচিত্তের স্বাচ্ছন্দ্যময় বিকাশকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিতে পারে না। তাই

কর্মই জীবন

জগতে যে সব মানুষ নিজ নিজ কর্মনৈপুণ্যবলে অক্ষয় যশ অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহারা জীবনের সংগ্রামমুখর রূপটি অত্যন্ত ভালভাবে চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। ফলে কর্মই তাহাদের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, অদৃষ্ট নহে। প্রতিকূল পরিস্থিতির দুর্ভেদ্যরূপ দেখিয়া তাঁহারা কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। কর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই তাঁহাদের সর্বপ্রকার কর্তব্য-কর্মে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে। যীশু, বুদ্ধদেব, হজরত মুহম্মদ, চৈতন্যদেব প্রভৃতি পুণ্যাত্মাদের স্মৃতিই কর্মবাদের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিয়া দেয়। তাঁহারা নিজ নিজ জীবনের প্রজ্ঞাদৃষ্টিবলে লব্ধ আদর্শকে বহুর মাঝে প্রচার করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছেন। তথাপি তাঁহারা কর্তব্য ও লক্ষ্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। সম্ভবত সেই কারণেই মানবজাতির ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল তারকার ন্যায় তাঁহারা দীপ্তিমান।

কর্ম ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচিতে পারে না। তাই জ[illegible] প্রতিক্ষেত্রে সফলতার মূলে রহিয়াছে কর্মের প্রতি সুগভীর আসক্তি। সমাজবদ্ধ জীব বলিয়া একক স্বার্থ সিদ্ধি সাধন করাটা মানুষের নহে উহা পশুর। দশজনের যাহাতে উপকার হয় উহার দিকে নজর রাখিয়াই কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করা উচি[illegible] কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের

প্রচেষ্টা যদি অপরের অনিষ্টদায়ক হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ অবশ্যই করিতে হইবে। সমাজ-প্রগতির যুগে যদি কোন দেশ আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া তাহার বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের প্রমাণ দিতে চেষ্টা করে, তবে সে ভুল করে। কারণ কর্মানুশীলনের মাধ্যমে অপরের ক্ষতি করা সার্থকতার পন্থা নহে। এমনকি উহার এতটুকুও বাস্তব উপযোগিতা নাই। ঐরূপ অসার কর্মকে অপকর্ম বলি... হইবে না।

কর্ম নির্বাচন

... এ বসুন্ধরা। ইহাকে ভোগ করিবার অধিকার মানুষের জন্মগত। তাই ইহ...ত পারলৌকিক চিন্তা অস্বাভাবিক ঘটনা। জগৎ ও জীবনের নিগূঢ়তর সম্পর্ক কর্মের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়া উঠে। তাই যথার্থ কর্মকে উপজীব্য করিয়া বিচিত্রতর জীবনরস সম্ভোগের চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতিটি কর্মসম্পাদনের পিছনে উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত মনোবল সঞ্জীবিত করিয়া রাখাই বাঞ্ছনীয়। মনোবলের ইস্পাত কঠিন রূপটি এ কথা সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিবে যে, মানুষই তাহার নিজ নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের মূলাধার অদৃষ্ট নয়। তাই কবির সহিত সুর মিলাইয়া বলা চলিবে, 'Failure is but the pillar of success.'

উপসংহার

যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে

শায়িতাবস্থায় অবাধ চলাফেরা করা অসম্ভব। শুইয়া থাকিয়া ফকিরও রাজা হইবার স্বপ্ন দেখে। বাস্তবে কিন্তু পরিশ্রম না করিয়া স্থাণুবৎ জড়ের ন্যায় শায়িত থাকিলে ফকির ফকিরই থাকে, রাজা আর হইতে পারে না। অন্যদিকে খারাপ অদৃষ্টের কারণ দেখাইয়া উদ্যমহীনতা এবং আলস্যের আশ্রয় গ্রহণ করাও অযৌক্তিক। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে মৃত্যুর পূর্বাবধি সর্বপ্রকার আলস্য অনুদ্যম চিত্ততার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কর্মক্ষমতা লাভের চেষ্টা করাটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক কাজ। তাই মানুষের ইতিহাস কর্মজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনীতে উজ্জল। আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তন খুব কম মানুষের ভাগ্যেই ঘটে। আর ... তাই মনুষ্য জীবনে সর্বতোভাবে উন্নতিলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে আলস্য ও জড়তাকে পরি... করিবার চেষ্টা করাটাই বাঞ্ছনীয়।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানসিক জড়তা ও দৈহিক অবসাদ পরিণতিতে আলস্যের রূপ পরিগ্রহ করে। মনতুরঙ্গের চঞ্চলা-চঞ্চল গতিকে যাহারা অস্বীকার করেন, তাহাদেরই চিত্তদৌর্বল্য উপস্থিত হয়। অশক্ত ... দুর্বল ব্যক্তির মধ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণে মনের জোর

থাকে, তবে তিনিও উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য চেষ্টিত হন। কিন্তু যদি উহা না থাকে, জড়-অদৃষ্টের অমোঘ বিধানকেই যদি স্বতঃসিদ্ধ ভাবা হয়, সুযোগ সুবিধার অভাব দেখাইয়া যদি ক্ষণভঙ্গুর আত্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে জীবনযুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত। শায়িত ব্যক্তির মতই তাহার অবস্থা দেখা দিবে। উত্তরাধিকার সূত্রে যদি কোন ব্যক্তি প্রচুর ধনদৌলত লাভ করিয়া আলস্যের উপকরণ যোগাইবার নিমিত্ত ব্যয় কর[illegible]ইয়া [illegible]লও মানবমনে উদ্যমহীন অবাস্তব কল্পনা দেখা দিবে। উহা পরিণামে [illegible]ষ[illegible]ত্মক সামাজিক ব্যাধির রূপ লাভ করিবে। এই ব্যাধির হাত হইতে দেশ, জাতি ও সমাজকে বাঁচাইতে হইলে সর্বাগ্রে মানসিক দুর্বলতাকে মন হইতে দূর করিতে হইবে।

আলস্যের স্বরূপ ও কারণ

বহুদিন যে রোগী রোগে ভুগে এবং বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্গ একাকীত্বের ভিতর দিয়া দিন যাপন করে, তাহার নিকট দিন যাপনের ও প্রাণধারণের গ্লানির কোনই মূল্য নাই। সে শুইয়া থাকাটাকেই স্বাভাবিক মনে করে। তাহার শারীরিক দুর্বলতা মনেও সংক্রামিত হইবে। কার্যক্ষেত্রে উহা ব্যক্তি বিশেষকে দুর্বল ও পঙ্গু করিয়া তুলিবে। তখন বীরভোগ্যা এ বসুন্ধরাকে সম্পূর্ণভাবে চিনিয়া লইবার মতও তাহার বিবেক-বুদ্ধি থাকিবে না। ক্রমে ঐ আলস্য ব্যক্তি হইতে পরিবার, পরিবার হইতে সমাজ, সমাজ হইতে সমগ্র জাতির মধ্যে প্রসারিত হইবে। ফলে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে শৈথিল্য সমষ্টিগতভাবে একটি জাতিকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিবে।

আলস্যের অপকারিতা

কর্মই জীবন। কর্মহীনের এ পৃথিবীতে টিঁকিয়া থাকিবার অধিকার নাই। আলস্য একটি মানসিক প্রবণতা। পৃথিবীতে যে সব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ জীবনের আচরিত আদর্শ উদাহরণ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন; কর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের আদর্শের অনুসরণ করাটাই আলস্য পরিহারের অন্যতম হাতিয়ার। ক্ষণজন্মা ব্যক্তিরা কর্মটাকেই বড় করিয়া চিনিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও অদৃষ্টের দোহাই দিতে পারেন নাই। [illegible]ভিন্ন শ্রেণীর এবং বিচিত্র মানুষের অধিষ্ঠানে এ সমাজ-সংস্কার পরিপূর্ণ[illegible] ব্যক্তিভেদে কর্তব্যভেদে, দায়িত্বভেদে নানা মানুষের নানা রূপ। প্রত্যেকেই যদি নিজ [illegible] কর্তব্য অবিচলিতচিত্তে ও দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন করেন, তবেই সম্পূর্ণভাবে সমাজের অভ্যন্তরে প্রাণশক্তির সঞ্চার হইবে।

আলস্য অপসারণের উপায়

ইতিহাস স্থিতিশীল নয়—গতিশীল। আর [illegible] প্রগতির যুগে কর্মবিমুখ হইয়া

থাকাটা অনুচিত। পারিপার্শিক অবস্থার সহিত পূর্ণসঙ্গতি রাখিয়া ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য-পরিবর্তনের সহিত সমগ্র জাতির উন্নতির কথা চিন্তা করা উচিত।

উপসংহার

গোঁড়ামি, কুসংস্কার, আলস্য প্রভৃতি মানসিক রোগ-লক্ষণ। উহাকে কাটাইয়া উঠিয়া সর্বদা একথাটিকে বেদ-স্বরূপ স্মরণ করিয়া জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উচিত, 'Man is the architect of his own fortune.'

জন্ম হউক যথা তথা কর্ম হউক ভাল

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 'Man is the architect of his own fortune.' বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদ ও আর্থিক অবস্থার মানদণ্ডে কোন মানুষেরই পূর্ণস্বরূপ আবিষ্কৃত হয় না। আপন বুদ্ধি-বিবেচনা ও সূক্ষ্ম কর্মনৈপুণ্যের বলেই মানুষ এ পৃথিবীতে অক্ষয় মহিমা অর্জন করে। তাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া গোঁড়ামী ও কুসংস্কার প্রবণচিত্তে

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানুষের যথার্থ স্বরূপ বিচার করা কল্পনামাত্র। তাই একটি বহুল প্রচারিত প্রবাদ আছে 'কীর্তির্যস্য স জীবিত।' সার্থকতর কীর্তি অর্জন সব মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তবুও একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলিতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে মানুষের পরিচয় নির্ভর করে তাহার আচার-ব্যবহার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর ভিত্তি করিয়াই।

মানবচরিত্র গঠনের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইল সংসর্গের। অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিশুর আচরণ নিশ্চয়ই কোন উন্নত পরিবারের শিশুর আচরণের মত হইবে না। অন্যদিকে অনুন্নত পরিবারের শিশু যদি কোন উন্নত পরিবারে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে তাহার আচরণ অনেক ভাল হইবে। উহার মধ্যে অবশ্যই কিছু না কিছু রূপান্তর পর্যবেক্ষণ করা যাইবে। সৎ ও সচ্চরিত্র বংশের সন্তান যদি হীনতর পরিবেশে লালিত-পালিত হয় তবে সে কোন সময়েই বংশ ঐতিহ্যের দৌলতে অতিভাল কিংবা অতি মহৎ হইয়া উঠিতে

সংসর্গ

পারিবে না। লোকালয় হইতে দূরে যদি কোন মানব সন্তানকে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার মুখ দিয়া কিছুতেই বাক্যস্ফূরণ ঘটিবে না। গৃহপালিত বিভিন্ন জীবজন্তুর আচরণের মাধ্যমে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সংসর্গ এবং পরিবেশে উহারাও উন্নতস্তরের আচার-আচরণ পালন করিতে পারে। বংশের ঐতিহ্য, পরিবেশ, [illegible] বিচারবোধের সংসর্গ নির্বাচন করা সহজ সাপেক্ষ হইয়া উঠে। নিজ নিজ রুচিবোধের মাধ্যমে মানুষ আপন আপন সংসর্গ নির্বাচন করে এবং ঐ সংসর্গ কালে-দিনে অধমকে উত্তম, অনুন্নতকে উন্নত এবং অসৎকে সৎ—হিসাবে গড়িয়া তোলে।

জন্ম হইতে পিতামাতার আশ্রয়ে থাকিয়া শিশু লালিত-পালিত হইতে থাকে। শিশু যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে উহার সহিত তাহার নিবিড় সম্পর্ক। শৈশব হইতে

বুদ্ধিবৃত্তি

বিভিন্ন মানুষের আচার-আচরণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া শিশু সচেতন হইয়া উঠিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে ঐ সচেতনতাবোধ তাহাকে আপাত-বিরোধী বস্তুদ্বয়ের মধ্যে ভালটি বাছিয়া লইতে চালিত করে। কর্তব্যকর্মের ব্যাপারে সমাজের আরো অনেকের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করাইতেই শিশুকে প্রণোদিত করে। এই যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, [illegible] বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমনের যে রূপ ফুটিয়া ওঠে, উহাই বুদ্ধি। বুদ্ধিবৃত্তির [illegible] বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তি ভাল-মন্দবোধের সহিত নিজ নিজ কর্তব্যকর্মের যথার্থ স্বরূপটি অনুভব করিতে পারে।

জীব জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষের মত যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনাবোধ অন্য কোন জীবেরই নাই। তাই সব মানুষের মধ্যেই এই বুদ্ধি-বিচার ও বিবেচনাবোধ সুপ্ত অবস্থায়

জন্ম ও বংশগত উপাদান

থাকে। বিকাশের উপযোগী পরিবেশ পাইলে উহা সার্থকতম উপায়ে বিকশিত হইয়া উঠে। স্বভাবতই একারণে জন্ম-বংশ ও রক্তের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আপন আপন বৈশিষ্ট্য একটু ভিন্নরূপ হইয়া দেখা দেয়। পরবর্তীকালে আপন বুদ্ধি ব্যক্তির মাধ্যমে মানুষ উহার দ্বারা উন্নত ভাবভাবনার পরিচয় দেয়। মহাভারতের বিদুর দাসীপুত্র এবং কর্ণ সূতপুত্র হইয়াও আপন আপন কৃতিত্ব ও দক্ষতাবলে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। জন্ম যেমনই হোক্ না কেন সাধনার বলে মানুষ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়। পদ্ম যেমন পচাপুকুরে জন্মিয়াও নিজগুণে পুষ্পদের মাঝে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে, মানুষও তেমনি নীচকুলে জন্মিয়া আপন গুণে লোকসমাজে আদৃত হন।

উচ্চকুলে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা বংশের ঐতিহ্য এবং প্রতিষ্ঠার বলে সহজসাধ্য উপায়ে বড় হইবার সাধনা করেন। কিন্তু যাঁহারা দরিদ্র পরিবারে জন্মিয়া

উপসংহার

খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং ঐতিহ্যহীন বংশের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনে বড় হইয়া উঠিবার সাধনা করেন, তাঁহাদের যথেষ্ট বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। তাই নীচকুলে জন্মিয়াও যাঁহারা আপন কর্মদক্ষতার গুণে বড় হইয়া উঠিয়াছেন, মানবজাতির ইতিহাসে তাঁহাদের গৌরবের কাহিনী চির ভাস্বর।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী

[জন্ম : ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ : ২০ আগস্ট

মৃত্যু : ১৯১৯ খৃষ্টাব্দঃ : ৬ই জুন ।]

নবজাগ্রত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাঙ্গণ বহু প্রতিভার আবির্ভাবে দীপ্ত। নানা বিচিত্র বিষয়ে বাঙালী তখন তার সৃজন পিপাসাকে চরিতার্থ করিয়া চলিয়াছে। একদিকে গীতিকাব্যে ও আখ্যায়িকা কাব্যে সে তার বিচিত্র স্বপ্ন-কল্পনাকে রূপায়িত করিয়া চলিয়াছে, অপরদিকে আরম্ভ হইয়াছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখায় চিন্তা বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ অনুশীলন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া স্থায়ী কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক নূতন আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর যখন বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইলেন, তখন একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্ণশস্যের সমারোহ, অপরদিকে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিচিত্র কলস্বর, তবুও রামেন্দ্রসুন্দর আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

[illegible]মকা

মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দি গ্রামে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট (বাংলা ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র) আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয়। তাঁর পিতা গোবিন্দসুন্দর ও মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী, আজ হইতে প্রায় দু'শো বছর পূর্বে ত্রিবেদী পরিবার মুর্শিদাবাদ জেলার এক গণ্ডগ্রাম টেঁয়া বৈদ্যপুরের বাসিন্দা হন। রামেন্দ্রসুন্দরের প্র-পিতামহ বলভদ্র ত্রিবেদী জেমো রাজবাটীতে বিবাহ করেন এবং তখন হইতে ত্রিবেদী পরিবার জেমো গ্রামে অধিবাসী হন। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতচর্চা করিতেন। সেই কারণে বাল্যকাল হইতে এই দুই শাস্ত্রের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের মনে অনুরাগ জন্মে। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী।

জন্ম-বংশপরিচয় ও শৈশব পরিবেশ

ছাত্রজীবনে রামেন্দ্র গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া কান্দী ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনেই তিনি বাঙলায় কবিতা লেখা সুরু করেন। তখন হইতে সহজাত সাহিত্য-প্রতিভা তাঁর মধ্যে বিকাশলাভ করে। ছাত্রজীবনে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন একটি উজ্জ্বল রত্ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা[illegible]য়ের গৌরব। কান্দী ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে তিনি ১৮৮১ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থা[illegible] অধিকার করেন। বৃত্তিলাভ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ-এ পড়িতে সুরু করেন। শৈশবেই তাঁর নানাপ্রকার বই পড়ার ঝোঁক ছিল। তাই কলেজে [illegible] বিজ্ঞান বিষয়ে নানা পুস্তক পড়িতে সুরু করিলেন। দৈহিক অসুস্থতার জন্য কলে[illegible] পড়াশুনার ক্ষতি হইতেছিল। তবু একাগ্রমনে তিনি

ছাত্র জীবন

১৮৮৩ সালে এফ-এর শেষ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। সেই বৎসরই তিনি ঐ কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হইলেন। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদদের রচনা পড়িয়া রামেন্দ্রসুন্দর অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। তখন হইতেই তিনি ভাবিতেন মাতৃভাষায় এমন লেখা কি সম্ভব নয়? এমন সহজ সাবলীলভাবে বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলিকে যদি ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে সেগুলি কি মাতৃভাষার সম্পদ হইবে না? তখন হইতে তিনি কবিতা, গল্প, প্রভৃতি লেখা বন্ধ করিয়া বিজ্ঞান বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লিখিতে সুরু করেন। [illegible] হইয়

১৮৮৪ সালে পিতার মৃত্যুতে রামেন্দ্রসুন্দরবাবু পড়াশুনার সাময়িক [illegible] কিন্তু পিতার মৃত্যুতে তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। অভাবনীয় মেধার অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৮৬ সালে বি. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম স্থান লাভ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৭ সালে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং ১৮৮৮ সালে প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

কলিকাতায় অবস্থান করিয়া বঙ্গ-ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, কলেজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।

আদর্শদীপ্ত কর্মজীবন

সে সুযোগও তাহার জীবনে আসিল। ১৮৯২ সালে তিনি রিপন কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হইলেন। দীর্ঘ ষোল বছর এই কলেজে অধ্যাপনার পর সেই কলেজে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। অধ্যাপক হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দর সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর যখন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন তখন বিজ্ঞানশাস্ত্র ইংরাজীতে পড়ানো হইত। রামেন্দ্রসুন্দর কিন্তু বাঙলা ভাষাতেই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতির ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন: 'ক্লাসে' বসিয়া অধ্যাপনার সময় বাঙলার ব্যবহার বোধহয় এখনও অধিকাংশ স্থলে লজ্জার

শিক্ষাবিদ রামেন্দ্রসুন্দর

হেতু বলিয়া বিবেচিত হয়। আমি স্বয়ং অধ্যাপনা ব্যবসায়ী। বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত আমার কিছু সম্পর্ক না থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারণ অনুসারে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনাই আমার জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেইজন্য অন্ততঃ জীবিকার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞান আলোচনাও আমাকে করিতে হইয়াছে। অধ্যাপকদের আসনে বসিয়া [illegible] ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন তাহা হইলে [illegible] মত অপরাধী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংঘ মধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না।' ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ। রামেন্দ্র-সুন্দর [illegible] সাধনা করিয়াছেন।

তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়া সারাজীবন এই পরিষদের ক্রিয়া কর্মে বিজড়িত ছিলেন। সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দরের কর্ম ও সাধনার ইতিবৃত্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

মাতৃভাষার ন্যায় মাতৃভূমির প্রতিও তাঁর মনে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর সরকার যখন বঙ্গ অঙ্গচ্ছেদের দিন হিসাবে ঘোষণা করিল তখন রামেন্দ্রসুন্দর এই ঘোষণার প্রতিবাদ জানাইলেন। জাতীয় আন্দোলনের সেই সঙ্কট মুহূর্তে কবিগুরুর পার্শ্বে দাড়াইয়া তিনি পুরনারীদের কাছে আবেদন জানাইলেন, সরকার নির্দিষ্ট এই দিনটিকে 'অরন্ধন-দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপন করিবার জন্য। নূতন আঙ্গিকে বাঙলার দুর্দশাকে বিবৃত করিয়া তিনি 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখিলেন। প্রতি বছর এই দিনটিতে বাঙলার ঘরে ঘরে পুরনারীরা সেই ব্রতকথা পড়িবেন। কর্মে চিন্তায় আচারে-ব্যবহারে রামেন্দ্রসুন্দর আপন পরিবেশকে উজ্জ্বল করিয়া গেছেন।

প্রীতি

বাঙলা সাহিত্যে তার কীর্তি অমর। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দুরূহ বিষয় এমন সহজ সরল কথায় তিনি আলোচনা করিয়াছেন—সে আলোচনা এতই হৃদয়গ্রাহী যে, পাঠক মন দুরূহ বিষয়ের মধ্যে অতি সহজেই প্রবেশ করিয়া তার মধ্যেকার নিহিত সত্য ও মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দরের এই সাবলীল রচনার উল্লেখ করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন: 'দর্শনই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিবেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্যসত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত।' রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন একজন চিরজিজ্ঞাসু পথিক তাঁহার সাধনা ছিল সত্যের সাধনা—পূর্ণতার সাধনা। সত্যসাধকের স্মৃতির বেদীতে এই সমস্ত স্মরণাঞ্জলি-সশ্রদ্ধনিবেদনের দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দী তাই 'স্মরণীয় শতাব্দী' আখ্যা পাইয়াছে।

অতঃপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর দেহত্যাগ করেন। উপসংহারে কবিগুরুর ভাষায় বলা যায় যে সত্যই সারাজীবন সুন্দরের সাধনা করিয়া, সুন্দর জীবন যাপন করিয়া তিনি তাঁর নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন। ১৯৬৪ সালে তাঁর শতবার্ষিকীর শুভক্ষণে বাঙলা দেশের সেই পরিপূর্ণ মানুষটির প্রতি বঙ্গভারতীর সেই একনিষ্ঠ সেবকের প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করি আর সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা উত্থাপিত করিব। মনে-প্রাণে কবে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আমাদের অবলুপ্ত শ্রদ্ধাকে ফিরিয়া আনিব? উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চায় মাতৃভাষার ব্যবহার কবে সুরু করিব আমরা? কবে রামেন্দ্রসুন্দরের স্বপ্ন সফল হইবে?

মৃত্যু ও উপসংহার

শিক্ষাব্রতী পুরুষ-সিংহ স্যার আশুতোষ

[জন্ম : ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ।]

জন্ম

উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন মহামানব বাঙলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙলা তথা ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করেন, বাঙলার বাঘ আশুতোষ সেইসব মহাপুরুষের অন্যতম। বাঙলাদেশের শিক্ষা-বিস্তার ব্যাপা[illegible] মহাপুরুষের অবদান চিরস্মরণীয়। শিক্ষাব্রত যেন মূর্তি[illegible] আশুতোষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ কলিকাতা[illegible] গ্রহণ করেন।

পিতৃ-পরিচয়

আশুতোষেব পিতার নাম গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম জগত্তারিণী দেবী। তাঁহার পিতা তৎকালে কলিকাতাব অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন এবং বহু অর্থ উপার্জন করিতেন। তিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, রাজারাজড়ার গৃহেও তদ্রূপ হওয়া সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ গঙ্গাপ্রসাদের ন্যায় ধীর, বিচক্ষণ, যত্নশী[illegible] ও বহুদর্শী পিতা না থাকিলে আশুতোষ এত বড় হইতে পারিতেন কিনা সন্দে[illegible]। মাতা জগত্তারিণী দেবীও নানাগুণে বিভূষিতা ছিলেন। মাতাপিতার সব গুণই পুত্র লাভ করিয়াছিল।

বাল্য ও শিক্ষা-দীক্ষা

ছাত্রহিসাবে আশুতোষের কৃতিত্ব অসাধারণ। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভবানীপুর সাউথ সাবারবন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এফ. এ. পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন; এমন কি পরীক্ষা হলে তাঁহার হাতে ব্যাটারী লাগাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সবটা তিনি লিখিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর আবার পদার্থ বিদ্যায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ঐ বৎসর তিনি বি-এল পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ ডক্টর. অব. ল. (D. L.) উপাধি লাভ করেন। আশুতোষ গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার গবেষণা 'Cambridge Messenger of Mathematics' পত্রিকায় প্রকাশিত [illegible] অধ্যাপক গ্রেলাশার

ও বেইলি তাঁহার প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করেন। আশুতোষের খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ সিনেটের সভ্য ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রেরিত সিনেটের ক্যালেণ্ডার ও মাইনিউটস্ আশুতোষ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন। এদেশ ও বিদেশের প্রত্যেকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস যে আশুতোষের নখদর্পণে ছিল তাহার কারণ এই যে, তিনি সব বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত পুস্তকাদি আনাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতেন।

[illegible]তোষের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইলে সরকারী শিক্ষাবিভাগে তিনি উচ্চপদ [illegible]লেন। কিন্তু আশুতোষের পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র হাইকোর্টের জজ ব্যতীত [illegible]ান পদ গ্রহণ করিবে না। তাই আশুতোষ অন্য কোন কাজ করেন নাই।

হাইকোর্টে স্থার আশুতোষ

আশুতোষ বিখ্যাত আইনজ্ঞ স্থার রাসবিহারী ঘোষের নিকট শিক্ষানবীশ হিসাবে হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। অত্যল্পকাল মধ্যে আইনজ্ঞ হিসাবে চতুর্দিকে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর ১৮৯৯ সালে তিনি 'ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক' এবং ১৯০৪ সালে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন ও ১৯২৩ সাল অবধি সেই পদ অলঙ্কৃত করেন। বিচারকরূপে আশুতোষের গভীর পাণ্ডিত্যের সীমা ছিল না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত দেশের আইন ও সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার নখদর্পণে তো ছিলই, তাহা ছাড়া অন্যান্য সভ্যদেশে প্রচলিত আইনসমূহেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। ১৮৮৯ সালে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সভ্য হন ও ১৯০৩ সালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার হইয়া তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল সংস্কারসাধন ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ স্থাপন করেন। অদম্য তেজ ও অদ্ভুত বুদ্ধিতে বহু সরকারী বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যদেশে জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানে পরিণত করেন। লর্ড কার্জন ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যে সমিতি নিযুক্ত করেন, আশুতোষ উহার সভাপতি নিযুক্ত হন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থার আশুতোষ

অধিকাংশ বিধানই আশুতোষের উদ্ভাবিত। এই সব নিয়ম-কানুন দ্বারা তিনি লর্ড কার্জন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের আয়ত্তে আনার চেষ্টা বহুল পরিমাণে ব্যর্থ করেন। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ সৃষ্টিকালে সরকার নানাভাবে আশুতোষকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অদম্য কর্মশক্তি ও অসাধারণ মনীষার নিকট সবই দূর হইয়া যায়। ১৯২[illegible] সালে লর্ড লিটনের অপমানজনক চিঠির যে উত্তর আশুতোষ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অপূর্ব চারিত্রিক [illegible]তা অথবা স্বাধীনচেতার পরিচায়ক। আশুতোষের অপূর্ব

কর্মকুশলতা ও দূরদৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া দেশের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহার হস্তে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেন। তন্মধ্যে স্যার তারকনাথ পালিত, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, দারভাঙ্গার মহারাজ রামেশ্বর সিংহ, বনেলীর রাজা কৃত্যানন্দ খয়রা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমবেত অর্থসাহায্যে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ স্থাপিত হইয়া ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

মাতৃভাষার সেবা

আশুতোষের নিকট বাঙালী জাতি চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে তাঁহার মাতৃভাষা সেবার জন্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরী[illegible] বাংলাভাষা পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট করিয়া তিনি মাতৃভাষা [illegible] করিবার পথ সুগম করিয়াছেন।

বেশ-ভূষা

জীবনযাপনে তিনি সরল ও অনাড়ম্বর ছিলেন। বাঙালীর পোশাক তিনি কখনই পরিত্যাগ করিতেন না। স্যাডলার কমিশনের সদস্যরূপে তিনি যখন ভারত পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি ধুতি চাদর পরিয়াই তাহা করিয়াছেন। দুর্দমনীয় তেজস্বিতার জন্য তাঁহাকে "বাঙলার বাঘ" বলা হইত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সত্যই বলিয়াছেন যে পরপদ লেহন না করিয়া কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া একজন বাঙালীও একটা মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে, আশুতোষের জীবন তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

মৃত্যু ও উপসংহার

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পাটনা—বাঁকিপুরে এই জ্ঞানতপস্বী, স্বদেশানুরাগী ও স্বাধীনচেতা মহাপুরুষের জীবনাবসান হয়। আশুতোষের মহাপ্রয়াণে বাঙলা ও বাঙালীর যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপূরণীয়। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু একজন মানবদরদী, আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিককেই হারাইল না সেই সঙ্গে সে হারাইল একজন মানবতাসম্পন্ন বিরাট মনীষীকে।

জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা

প্রারম্ভিক ভূমিকা

সুসংবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত জীবনচর্যার তাগিদে শৃঙ্খলা বোধের উপযোগিতা অপরিসীম। মানবশিশু যেদিন প্রথম সভ্যতার আলো দেখতে পেল সেদিন হতে আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপেই রয়েছে দ্বিধাহীনভাবে শৃঙ্খলার অনুশাসন মেনে জাগতিক জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠা করবার মত আন্তরিকতা। সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় জীবনেই প্রয়োজন রয়েছে এই শৃঙ্খলার। শৃঙ্খলা বোধ তাই হাল্কা কথার রঙিন ফুলঝুরি নয়। তা নীতির অক্টোপাশে বাঁধা সস্তা বুলিও নয়, জাগতিক জীবনের পক্ষে অবশ্য প্রযোজ্য এবং অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ।

বর্তমানে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা (ন্যাশনাল ডিসিপ্লিন

স্কীম) বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা রচনার সংকল্প স্থির হয়েছিল চৈনিক কম্যুনিস্ট অভিযান শুরু হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে। তারপর বর্তমান আপৎকালীন অবস্থায় এই পরিকল্পনা কার্যকর করা আরও জরুরী হয়েছে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মত সামরিক শিক্ষাদান এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। তবে জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনার লক্ষ্য কেবল সামরিক শিক্ষাদান নয়, দেশের তরুণ সম্প্রদায় যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তীভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয় সেজন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আচার-আচরণ ও ... সুগঠিত করাই জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনার লক্ষ্য। আপাতবিচারে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই যখন চরিত্র গঠন তখন পৃথকভাবে জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা নামে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন কী? প্রয়োজন যে আছে তার প্রমাণ গত দশ-পনেরো বৎসরে দেশের সর্বত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকম উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অনাচারের প্রাদুর্ভাব। ব্রিটিশ আমলের বিক্ষোভপন্থী রাজনৈতিক ঐতিহ্য এর জন্য কতখানি দায়ী সে-প্রশ্ন এখন না তোলাই ভাল। অতীতের ভুল-ত্রুটি এবং আতিশয্যের জের টেনে চলায় আমাদের জাতীয় সংহতি দীর্ঘকাল নানাভাবে যে বিপর্যস্ত হয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কারণ ও বাস্তব ...

জাতীয় শৃঙ্খলার গোড়ার কথা জাতীয় ঐক্যবোধ। সেই ঐক্যবোধে ভাঙন ধরলে জাতির নিরাপত্তা, বৈষয়িক উন্নতি এবং শক্তি-সামর্থ নষ্ট হইতে বাধ্য। জাতীয় ঐক্যবোধ নষ্ট করার জন্য বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি দেশের মধ্যেই সক্রিয় রয়েছে। এই সব অনিষ্টকর শক্তির প্রভাবে কেবল রাজনীতি নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও নানারকম আদর্শবিকার ও নীতিভ্রষ্টতা দেখা দিয়েছে। প্রগতির ছলনায় তথাকথিত রাজনৈতিক মতবাদের জাতীয়তা-বিরোধী প্রভাব বিস্তার এর সবচেয়ে মারাত্মক দৃষ্টান্ত। দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে এই প্রভাব-মুক্ত করাই হবে জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনার সর্বপ্রধান লক্ষ্য। বৈদেশিক আক্রমণে বিপন্ন দেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণকে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে জাতির ঐতিহ্য এবং আদর্শের মর্যাদা রক্ষা ব্যাপারে কোনরকম ছল-চাতুরী অথবা মতবাদগত প্রলোভনকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

ঐক্য, ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধ

জাতীয় শৃঙ্খলার শত্রুরা অবশ্য সব সময় সরাসরিভাবে জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে অভিযান চালায় না। অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য জাতীয় স্বার্থ দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তারা নানা উপায়ে ছিদ্র সন্ধান করে, কখনও অভাব অভিযোগের প্রতিকারের অজুহাতে জনদরদীর ভূমিকায় দেখা দেয়; কখনও ভাষা আন্দোলন, কখনও শ্রেণী সংগ্রাম, যখন যেখানে যেমন সুবিধা উচ্ছৃঙ্খলতার ইন্ধন

জাতীয়তা বিরোধ

এবং সুযোগ সংগ্রহে এই সব বিভেদ কামীদের জাতীয়তা-বিরোধী চেষ্টার অন্ত নেই। জাতীয় শৃঙ্খলার দৃঢ় দুর্গ রচনা করতে হবে এই ঘোর অনিষ্টকর শক্তি প্রতিরোধের জন্য।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হতে.. পারেনি নানাবিধ কারণে। প্রথমত আমাদের শিক্ষাধারাটা পুঁথিগত খাতে প্রবাহিত। 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই', পুরানো ছড়ার এই রঙীন আশ্বাস কালক্রমে হাস্যকর মিথ্যা প্রতিপন্ন হলেও প্রচলিত অর্থে লেখাপড়াকে স্থূল লাভ-লোকস্মানের হিসাবের সঙ্গেই মিলিয়ে দেখা হয়েছে। স্কুল কলেজে রুটিন-মাফিক পড়া এ[illegible] সিঁড়ি ভেঙ্গে জীবিকার সন্ধানে নিরুদ্দেশযাত্রা ছাড়া লেখাপড়ার সঙ্গে শৃঙ্খলা, নি[illegible] এবং আচার-আচরণে উৎকর্ষতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। তার ফলেই রাজনৈতি. অথবা আধ-রাজনৈতিক বিকার, বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের চিন্তা ও চরিত্রকে আচ্ছন্ন করতে পেরেছে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি

পুঁথিগত শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ামকগণ এই সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন অনেক দেরীতে। নতুবা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আলদা করে জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হত না। প্রকৃত শিক্ষামাত্রেই শৃঙ্খলার জনক ও পরিপোষক। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে শৃঙ্খলার বিচ্ছেদ অনেক কালের, সেই বিচ্ছেদের ফাঁক দিয়েই নানাবিধ জাতীয় সংহতিনাশী বিভেদকামী শক্তি দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে বিপথে পরিচালনার অবাধ সুযোগ পেয়েছে।

জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা কতকগুলি শুষ্ক আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালনের বিধিব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ হলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না, এ-কথা শুরুতেই জেনে রাখা ভাল। দেশের যুবশক্তির কল্পনা এবং কর্মোৎসাহকে উদ্বুদ্ধ করার উপযুক্ত উপাদান জাতীয় শৃঙ্খল পরিকল্পনায় থাকা অবশ্য প্রয়োজন। নতুবা দৈনন্দিন রুটিনমত স্কুল-কলেজে ক্লাস শুরুর পূর্বে শুদ্ধ কয়েকটি বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান প্রবর্তন দ্বারা জাতীয় চেতনাকে প্রাণবন্ত করা দুঃসাধ্য হবে।

সমাধানের পথ নির্দেশ

শৃঙ্খলা শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া খুবই সঙ্গত, কিন্তু তরুণ সম্প্রদায়ের আচার আচরণে ও মনোভাবে দায়িত্ব বিকাশে ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক করা উচিত। আমাদের দেশের স্কুলে-কলেজে শিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা একেই অস্বাভাবিক, তারপর বৈচিত্র্যহীন। সকলের খেলাধূলার, ব্যায়াম চর্চার সুযোগ নেই এবং এই সুযোগের অভাবও শৃঙ্খলা শিক্ষার অভ্যাসের[illegible]ষম বাধা। জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনায় ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টির সুযোগ পায় তার প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। কারণ বাধ্যতামূলক পরিকল্পনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করবে এই পরিকল্পনা দ্বারা কার্যক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বচ্ছন্দে আকর্ষণ করবার ক্ষমতার উপর।

শিক্ষা-তালিকায় নিয়মানুসারী শৃঙ্খলার তাৎপর্যের যোগ্যতর মর্যাদা পরোক্ষত সমষ্টি-জীবনকে সুন্দর ও সংহত করে তুলবার সাধু প্রচেষ্টা। জাতির ভবিষ্যৎ ছাত্র সমাজের আচার-আচরণের দ্বারা সমগ্র জাতি ও সমাজ প্রভাবিত। অতএব তারা যাতে সুগঠিত হয়ে বলিষ্ঠ কর্মোদ্যোগ নিয়ে জীবনপথে অগ্রসর হতে পারে, তারজন্য, সরকারের এই সাধু প্রচেষ্টাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাতে হয়। শুধু ছাত্রসমাজ নয়, সমগ্র জাতি ও সমাজ যাতে সুগভীর শৃঙ্খলার বাঁধনে বেঁধে জী... তুলতে পারে, সেজন্য প্রত্যেকেরই সমভাবে জীবন প্রস্তুতির অত্যাবশ্যকতা অ... য়ে দেখা দিয়েছে।

উপসংহার

জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর

বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে এক অলক্ষ্যগোচর নেপথ্য সত্তার অধিষ্ঠান কল্পনা পৃথিবীর সব দেশের ধর্মের ইতিহাসে গৃহিত হইয়াছিল। এই সত্তাকে বর্ণাঢ্য করিয়া তুলিয়াই মানুষ নবতর অপার্থিব চেতনায় উদ্দীপিত ও উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই উল্লাস যতই সাময়িক, যতই মৌহূর্তিক ভাবোদ্বেলতা অটুট থাকুক না কেন—এই উল্লাস অন্তরে সঞ্চারিত করিয়াছিল এক অসামান্য অনুপ্রেরণা। এই অনুপ্রেরণার বশেই মানুষের পরিকল্পনায় আসিয়াছে ঈশ্বর। এই ঈশ্বর আছেন কি নাই, তিনি সাকার কি নিরাকার তাহা লইয়া যতই বিচার বিতর্কের তুফান উঠুক না কেন—তবুও ইহা অনস্বীকার্য যে, এই অপার্থিব সত্তার পরিকল্পনার জন্য মানুষ এই পৃথিবীকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে। অনুভব করিয়াছে ইহার গভীর নিহিত এক অনন্য-সুন্দর ঐক্য, মঙ্গল ও কল্যাণের অধিষ্ঠাতাকে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

এই কারণেই ম্যারী বেকার এড্ডি নামে জনৈক পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক তাঁহার Science and wealth নামক গ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন: "God is in corporeal, divine, supreme, infinite, mind, sprit, soul, principle, life, truth and love."

সর্বধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাই ঈশ্বরানুসন্ধান। ঈশ্বরকে জানা ও বোঝার তাড়নাতেই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে ধর্মের নবভাষ্য। মর্ত্যভূমির স্নেহসিঞ্চিত মানুষ মর্ত্যকে যেমন ভুলিতে পারে নাই, ভুলিতে পারে নাই তেমনি এই অদৃশ্যগোচর অলৌকিক জ্যোতির্ময় সত্তাকে। পরিচিতিতে যাহার নাম ঈশ্বর। তিনি কল্যাণ, মঙ্গল, সৎ, শুভ, ন্যায় এবং পবিত্রতায় মিশ্রিত। তাঁর অধিষ্ঠান

সর্বধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: ঈশ্বরানুসন্ধান

জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে। তিনি অদৃশ্যগোচর, অপ্রকাশিত কিন্তু পরম কারুণিক। কল্যাণ, মঙ্গল, পবিত্রতায় সমৃদ্ধ প্রজ্ঞাবল সত্তা এই ঈশ্বর। তাই আমাদের উপনিষদে বলা হইয়াছে: "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বম্" অর্থাৎ ঈশ্বর সব কিছুকেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। উপনিষদে আরও বলা হইয়াছে: ব্রহ্মা হইতে সামান্য একটি তৃণ পর্যন্ত সমস্তই ব্রহ্মময়। আর বাইবেলের Old Testament-এ অত্যন্ত যথার্থভাবেই বর্ণিত হইয়াছে "So God created man in his own image in the image of God created by him."

ধর্মের উপায় ও পদ্ধতি

মানুষ 'সর্বজীব সার'। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বকীয় চিন্তাবৃত্তির স্বপ্রকাশে, [illegible] এবং বৈচিত্র্যলিপ্সায়। মানুষের স্বয়ং সম্পূর্ণতা তাঁহার চি[illegible] করিবার ক্ষমতায়। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য এ সবকিছুর মূলেই রহিয়াছে মানুষের চিন্তাবৃত্তির নিপুণতা। ইহাদের উদ্ভাবনাতেই মানুষ ক্ষান্ত হয় নাই, চেষ্টা করিয়াছে—প্রতিটি বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির। এই অকৃত্রিম প্রেরণা মানুষের নবন্মেষশালিনী প্রতিভার মর্মকোষে সঞ্চিত ও পুষ্ট হইয়াছে যুগে যুগে। ধর্মাচারণের ক্ষেত্রে ইহার অন্যথা ঘটে নাই। তাই মানুষ বাহির করিয়াছে, ধর্মাচারণের নানা উপায় ও পদ্ধতি। পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরকে অন্বেষণী কল্পনায় সঞ্জীবিত ও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল মানুষ। এ জন্যেই ধর্মের মূলে বাহিরাচারণ মুখ্য নয়, গৌণ উপায় মাত্র। মানুষের তথা সর্বজীবের সুকল্যাণ কামনায় ব্রতী মানুষ সত্যকে ধারণ করিয়াছে ধর্ম নাম দিয়া। আর এই ধর্ম তাই সত্যানুসন্ধান, ঈশ্বরানুগত্য ও সর্বজীবের মধ্যে ঈশ্বরকে লাভের আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া ব্যক্ত। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের প্রেক্ষাপটে তাই মানুষের চিন্তায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল পাপ-পুণ্য বোধ। পৃথিবীর মানুষের সাথে সর্বজীবের মঙ্গলের কামনায় উদ্দীপিত হইয়া সুদূর দেশের ধর্মশাস্ত্রেই তাই নির্দেশিত হইয়াছে: "There is no god but good" [Mahomet, Koran III]

বিশ্ব-নিয়ন্তা সর্বশক্তিময় ঈশ্বরের অপার ক্ষমতা। যুগে যুগে তাঁহার এই অপার ক্ষমতাকে নানা অলৌকিক ব্যাখ্যায় বর্ণায়িত করিয়া তোলা হইয়াছে। ঈশ্বর অলক্ষ্য-গোচর অথচ সর্বব্যাপি বিরাট এক অখণ্ড সত্তা। তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এই পৃথিবীকে আপন বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে মানুষ। বিশ্বের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে একের কল্পনায় যুগে যুগে মানবচিত্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। আসলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনের ভার মানুষেরই হাতে। তাই স্বর্গরাজ্য নয়, পৃথিবীই মানুষের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আবাস। অংশের মধ্যে সমগ্রের উপস্থিতি কল্পনা করিয়া পৃথিবীর মানুষ দেখে ঘরের ছেলের চোখে বিশ্বরূপের ছায়া। যেথায় চাষা চাষ করে, শ্রমিক

উদয়াস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করে—ঈশ্বরের অধিষ্ঠান সেখানেই। যেখানে শত শত নিরন্ন, অশক্ত, দুর্বল ও নিরুদ্যম ব্যক্তি রহিয়াছে, সেখানে কর্ম উপেক্ষিত। অথচ একমাত্র কর্মের দ্বারাই সম্ভব যথার্থ ভগবান সেবা। এই কর্মের পিছনে করুণাপ্রার্থী, মঙ্গলকামী মানুষ দেখে ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছায়া। সীমার মাঝে যেমন অসীমের উপস্থিতি, সামান্য বীজের মধ্যে যেমন মহীরুহের অভ্রান্ত পদধ্বনি—ঠিক তেমনিভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রায় সকল ক্ষুদ্র জীবই ঘোষণা করে তাঁহার [illegible] ও অতুল ঐশ্বর্য। অতএব, ঈশ্বর যেখানে অনুপস্থিত অদেখা মাত্র, [illegible]হার অংশ হিসাবে জীবসেবার উন্নত আদর্শই হইবে তাহাদের সর্বাপেক্ষা [illegible]হান উপায় ও পদ্ধতি। কর্মের মধ্য দিয়া, সেবার মধ্য দিয়া, ত্যাগের পথে, সংযমের পথে, বৈরাগ্য ও সহিষ্ণুতার উন্নত আদর্শকে চরম ভাবিয়া জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থিতি কল্পনা করাই ঈশ্বরানুসন্ধানের যথার্থ পথ, তাঁহার সাধনার মহত্তম পন্থা।

ঈশ্বর সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ঃ জীবসেবা

ইহজীবন বঞ্চিত পারলৌকিক চিন্তায় উদ্দীপিত হইয়া নন্দন লোকের পারিজাত আকাঙ্ক্ষায় 'মুক্তি মুক্তি' করিয়া সোল্লাসে যতই আকুতি দেখান হোক না কেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা এত সহজ নয়। সৃষ্টির প্রতি প্রেম-শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাইয়াই একমাত্র সম্ভব বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরকে মনে রাখা। তাই নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, জ্ঞানহীনকে জ্ঞানদান, পাপাত্মাকে পুণ্যের পথে টানিয়া আনা নিরন্তর সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে আগাইয়া চলিলেই সীমায়িত মেদিনীতে সুদূরের স্বর্গরাজ্যের আভাস পাওয়া যাইবে। অলক্ষ্য পথে বাহ্যিক আচরণের বাহুল্যের মধ্য দিয়া জগদীশ্বরকে সন্ধান করা ভুল। স্রষ্টাকে স্মরণ রাখিয়া এ বিশ্বকে মনে প্রাণে ভালবাসিতে পারাই যথার্থ ঈশ্বর সেবা। কর্মে যদি সততা থাকে, প্রেমে যদি পবিত্রতা থাকে, দানে যদি উদারতা থাকে—তবে প্রতিটি জীবন মনে হইবে ঈশ্বরের প্রতিভস্বরূপ। তাই এই বিরাট অখণ্ড মানব সমাজ সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষি একদা বলিয়াছেনঃ সর্বেবাং মঙ্গলং ভূয়াৎ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিদ্ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। অর্থাৎ সকলের মঙ্গল হউক, সকলে নীরোগ হউক, সকলের দৃষ্টি শুভ হোক কেহই যেন দুঃখ না পায়। আমাদের দেশে বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং পাশ্চাত্যদেশের যীশু এই কথাই আমাদের মনে করাইয়া দিয়াছেন। তাই এই সব পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদের দৃষ্টির ঐশ্বর্যে বলীয়ান হওয়ায় মনে হয় মানবপ্রেমে ঈশ্বর প্রেমেরই নবভাষ্য। ভারতের মাটিতে যাহার জন্ম, জীবে শিবজ্ঞান উপলব্ধি তাহার পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। জীবাত্মা যে পরমাত্মার অংশ ইহা তাহার জন্মগত সংস্কার। হিন্দুর শাস্ত্র বলিয়াছে, 'এই বিরাট সৃষ্টি ব্রহ্মের বিকৃতি।'

উপসংহার

দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কী মহীতে

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬১]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানুষের জীবন বড়ই বৈচিত্র্যময়। এ জীবনের একদিকে আছে সুখ, অন্যদিকে দুঃখ; একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে নিরানন্দ; একদিকে অর্থ ধন-দৌলতপ্রসূত প্রাচুর্য, অন্যদিকে নিরানন্দময় হতাশামণ্ডিত দরিদ্র জীবন। অর্থাৎ জীবনের একপিঠে আলো অপরপিঠে কালো সহাবস্থান রহিয়াছে বলিয়াই জীবন এত বৈচিত্র্যময়। ইহার একটির অনুপস্থিতিতে জীবনের সব সুখ-সৌন্দর্য বে[illegible]। জীবনকে একঘেয়ে ম্যারম্যারে জীবনের এক রঙা ছবি বলিয়া প্রতিভাত হয়।

দুঃখই সুখ প্রাপ্তির মূল

মানুষের জীবন বড়ই স্বল্পকালস্থায়ী। এই স্বল্পকালীন জীবনে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার অবসান হয় না। অথচ, মানুষের কামনা-বাসনার অন্ত নাই। মানুষ তাহার স্বল্পস্থায়ী জীবনে সব রকম পরিতৃপ্তির আনন্দ পাইবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া থাকে। ফলশ্রুতি বিচারে হয়ত বা মানুষের সবটুকু চাওয়ার সামান্যতম অংশ অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তবুও মানুষ অবিরত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়। আগত দুঃখকে মনে করে অনাগত ভবিষ্যতের সুখ-স্বর্গলাভের উপায়। এ জন্য দুঃখ শুধু দুঃখ হিসাবে মানুষের কাছে মনে হয় না। উহা অনাগত ভবিষ্যতের সুখের সম্ভাবনাও বহন করিয়া আনে।

শুধু সুখ কিংবা শুধু দুঃখে আনন্দ দেয় না

অনেকের মনের ধারনা, পৃথিবীর পান্থশালায় আমরা সামান্য পথিক মাত্র। তাই নিরন্তর হাসি-খুশিতে ভরিয়া অবারিত ভোগের মধ্য দিয়া জীবনটাকে কাটাইয়া দেই না কেন। দুঃখ ভোগের প্রয়োজন কি অথবা দুঃখের পথে সুখ-লাভের উপায় সন্ধানের। অন্যদল আবার বলেন, মানুষের এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাটাই দুঃখের। তাই কোন প্রকার 'সুখ সুখ' বলিয়া তৃষ্ণার্ত চাতকের মত হা হুতাশ করার কোনই অর্থ হয় না। তৃতীয় পক্ষ যদি প্রত্যক্ষ গোচর বাস্তব জীবনের দিকে তাকান, তিনি স্পষ্ট জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে বলিবেন—সুখ-দুঃখ দুই ভাই। একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কথা চিন্তা করা ভুল। শুধু সুখ কিংবা শুধু দুঃখ বহন বোকামির নামান্তর মাত্র। তাই মধ্য পন্থাই শ্রেয়।

বিশুদ্ধ সুখবাদীর পরিণতি

যে জীবনে শুধু সুখই চায়—একটিবারের জন্য সামান্যতম দুঃখ বহনের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারে—সে কখনও সুখী হয় না। সে আপনাতে আপনি আবদ্ধ থাকিয়া বৃহৎ জগৎ-সংসারের ব্যাপক পরিচয় লাভ করিতে পারে না। অহং সর্বস্ব দম্ভপরায়ণ ভোগী জীবনে যথার্থ সুখের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে না। ফলে তাহার অতৃপ্ত, অশান্ত বেদনার লৌহশলাকাবিদ্ধ জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বে নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হয়।

অন্যদিকে যে দুঃখকেই বড় ভাবে এবং চিন্তায় জীবনের সামান্যতম বৈচিত্র্য ও আনন্দের সন্ধান করে না—সেও অসুখী। তাহার জীবনও নিরানন্দ, বিষাদময় ও চির অতৃপ্তিতে ভরা। অবিরত অশ্রুর জলে নিষিক্ত করিয়া যে জগৎ ও জীবনকে চিনিতে চায়, প্রতিনিয়ত তার মনোরাজ্যে দুঃখের তরঙ্গ বহিয়া চলে। সে অপ্রতিষ্ঠ, বৈচিত্র্যবিরল জীবন অতিবাহিত করিয়া ভবিষ্যৎ পরিণতির আশঙ্কায় দিন গুণে। এই পৃথিবীতে এমন কোন স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যায় না, যাহার দ্বারা সে অমরতালাভে সক্ষম হয়। পৃথিবীর সামান্যতম ভোগ্যবস্তুও তাহার ...কীর্ণ মনে হয়। এজন্য অবিরত দুঃখ বহন করার অর্থ হইতেছে জীবনের খণ্ড রূপকে বড় করিয়া দেখিয়া সঙ্কীর্ণ মনোভাবের অধিকারী হওয়া মাত্র।

•যে শুধু দুঃখকেই বড়...



সুতরাং সুখকে যে চিনিতে পারে বা উপলব্ধি করিতে পারে, সে দুঃখ বহনের যন্ত্রণাও সহ্য করিতে পারে। চরম আনন্দ মুহূর্তে দুঃখের কথা আবার প্রচণ্ড দুঃখের জ্বালায় জর্জরিত হইয়া সে কখনও ভোগের কথা মনে করে না। দুঃখকে চিনিবার পাকা জহুরি সুখের প্রত্যাশাতেই উহাকে পরখ করিয়া দেখে। হয়ত বা, কাহারও জীবনে মুহুর্মুহু দুঃখকষ্টের অবিরত ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া যায়। উহাতে কখনও বিচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ যে দুঃখ বহন করিয়াছে সে জীবনে একদিন সুখী হইবেই। মজবুতহীন টিনেচালা পাকা বাড়ীর ন্যায় দুঃখ বিনা সুখ—প্রাসাদ রচনা অসম্পূর্ণ। দুঃখই সুখ প্রাচীরের মজবুত ভিত্তিকে দৃঢ়, সংহত এবং শক্ত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করে।

উপসংহার

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০]

নৃতাত্ত্বিকের মতে সমগ্র মনুষ্য জাতি এক আদি উৎস হইতে উদ্ভূত। যুগে যুগে সভ্যতার বিবর্তনে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার আপাতবৈষম্য এবং প্রকৃতির উদারতা—এ সব কিছুই গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়া নানা জাতি, নানা সমাজ ও নানা শাখায় মানুষ জাতিকে ভাগ করিয়াছে। ইহার ফলে দেশভেদে, কালভেদে ও সমাজভেদে মানবসভ্যতা বিচিত্রতর ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে জগৎ জুড়িয়া একটিমাত্র জাতিই আছে—সে জাতির নাম মানুষ জাতি। ভাষাগত, দেশগত, আচার-ব্যবহার তথা সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিচিত্রতার মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তর্গূঢ় ঐক্য, গভীরতর সংহতি। এই ঐক্য ও সংহতি থাকার দরুন বিধাতার চতুর সন্তান মানুষ এ পৃথিবীকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। তাই মানুষের গড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি—এ সব কিছুই

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বৃহত্তর গোষ্ঠীর সম্পত্তি। গভীর সমষ্টিবোধে উদ্দীপিত হইয়াই মানুষ উহাদের জন্ম দিয়াছে।

এই ঐক্যবোধ এবং সংহতিবোধ ছিল বলিয়াই সবধর্মেই ঘোষিত হইয়াছে মহত্তর ঐক্যের পরম কল্যাণকর বাণী। তাই মানুষ শুধু মানুষই নয়—সমষ্টিগতভাবে সব মানুষ হইল অমৃতের সন্তান। সমগ্র মানুষ জাতিকে একান্ত আপনার ভাবিয়া 'জীবে দয়া করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। অর্থাৎ জীব সেবাই শিব সেবা। এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সহি[illegible] ঐক্যের অনুভবই ঈশ্বর ভজনার সর্বোত্তম পন্থা। অহিংসাই পরমধর্ম। 'বহু[illegible] বহুজন সুখায়!' ইহাই হইল আদর্শ ঐক্যবোধের সবচেয়ে বড় পরিচয়। হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষা প্রভৃতি সব কিছুই ভুলিয়া গিয়া প্রতিটি মানুষের সহিত সৌহার্দ, মৈত্রী ও প্রগাঢ় সহানুভূতিই হইল উন্নত পর্যায়ের ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য ধর্মাচরণ।

ধর্মে ঐক্যের স্বীকৃতি

ধর্ম যাহাই বলুক না কেন, নৃতত্ত্বের রায় যতই সত্য হউক না কেন জটিল যুগের জটিলতার মানুষ এই ঐক্যের আদর্শ বিস্মৃত হইয়াছে। নানাবিধ সমস্যার ভারে পীড়িত ও সন্ত্রাস্ত মানুষের কাছে আপনার বাঁচিবার আদর্শই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। লোভের প্রচণ্ডতা মানুষ জাতির ঐক্যের মূলে ফাটল ধরাইয়াছে। প্রবল ধনদৌলতে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবার জন্য এক জাতি অপর জাতির সহিত সংগ্রামে নামিয়াছে। এক জাতি তাহার উগ্র জাতীয়তাবোধের তাগিদে অপর জাতির সহিত জঘন্য আচরণ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। এই অনৈক্যের কুফলের জন্য সারা পৃথিবী জুড়িয়া সর্বনাশা বিপর্যয় ও সবধ্বংসী অনৈক্য প্রসূত ক্রিয়াকলাপ দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

অনৈক্যের কারণ

সমগ্র জাতির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অবশ্যম্ভাবী অনৈক্য ও উগ্র মানব বিরোধী আচরণের কুফল পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকেই ভোগ করিতে হইবে। কারণ এ যুগের যুদ্ধ শুধু দেশে দেশে নয়, মামুলি অস্ত্রের ব্যবহারেও নয়, উহা সমগ্র মানুষ জাতিকেই চরম ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া যাইবে। এই ধ্বংসাত্মক পরিণতির সমূহ সম্ভাবনা ডাকিয়া আনিবার জন্যই বোধ হয় দিকে দিকে প্রবল পরাক্রান্ত জাতিগুলি বর্তমানে আনবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত।

অনৈক্যের কুফল

পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের খামখেয়ালের শিকার সমগ্র মানুষ জাতি নয়। চির-সুখী এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ জাতি সুখে শান্তিতে তাহার কল্যাণ অভিপ্রায়কে চালিত করুক। সর্বপ্রকার অনৈক্য, অশান্তি, লোভ, হিংসা ও ঈর্ষার অবসান শেষে জগৎ জুড়িয়া পরম ঐক্যের ঐক্যতান বাড়িয়া উঠুক। দেশভেদে, কালভেদে ও জাতিভেদে যে [illegible]

ছিল তাহা দূর হইয়া সমগ্র মানুষ জাতি আপনাকে একই উৎস হইতে উদ্ভূত মনে ভাবুক।

মানুষ জাতিকে বাঁচাইবার উপায়

ছোট ও গরিব দেশ ধনী ও ধনদৌলত ঐশ্বর্য বহুল দেশগুলি পারস্পরিক বিবাদ ও বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া—ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অন্তহীন সুখ-সমৃদ্ধি ও আনন্দের সঞ্চয় রাখিয়া যাক। আনবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করিয়া সহাবস্থাননীতি কার্যকরী হইয়া উঠুক—ইহাই সমগ্র পৃথিবীর নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষেব আজ সবচেয়ে বড় কামনা।

উপসংহার

...ড়িয়া এক জাতি আছে—সে জাতির নাম হইল মানুষ জাতি। এই মানুষ ...া সমাজ ও সভ্যতার মুখোমুখি হইয়া অগ্রসরমান। নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা উহার পথে বাধা হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু একদিন না একদিন এই মানুষ জাতি ঐসব বাধাকে অপসারিত করিয়া চির ঐক্য ও কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে। তাই মানবপ্রেমিক কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে :

'নিবিড় ঐক্যে যায় মিলে যায় সকল ভাগ্য, সব হৃদয়।
মানুষে মানুষে নাই সে বিশেষ নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময়।'

ক্ষমা দয়া তারেই সাজে, যে জন বলীয়ান

[স্কুল ফাইনাল ১৯৬২]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মনের ঐশ্বর্যই সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য যার আছে সে সত্যসত্যই বলীয়ান। বাইরের পরিচয়ের চেয়ে অন্তরঙ্গ পরিচয়েই মানুষকে ভাল করিয়া চেনা যায়। অন্তরঙ্গ পরিচয়ে মানুষের পরিপূর্ণ মানবী চেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা আর বিপদগ্রস্ত অসহায়কে দয়া করার মাধ্যমে মনের ঐশ্বর্য ও উদারতার সার্থক পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। কারণ ব্যক্তির প্রকাশ ব্যক্তিতে আবদ্ধ নয়, সমগ্র সমাজের সাথে তার সম্পর্ক অন্তরঙ্গ সৌহার্দ, উদারতা, ক্ষমা ও দয়া করিবার মত মনোবলের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া উঠে। ব্যক্তি সমাজ-সংশ্লিষ্ট থাকিয়াই আপনাতেই আপনি বিকশিত ও বলীয়ান হইয়া উঠে।

বহু জন নিয়াই সমাজ। এই সমাজে আমরা বাস করি। সুখী-অসুখী, ধনী-নির্ধনী, সৎ-অসৎ, উদার-অনুদার—এইসব বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের অবস্থিতি এই মনুষ্য সমাজে। এইসব বিচিত্র ধরণের মানুষের উপস্থিতি যে সমাজে, তাহার একজন হইয়া তাহার সহিত নিবিড়তর গভীরতর নৈকট্যানুভব ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য করণীয় কর্তব্য। এ জন্যেই বাইরের জগতের ন্যায় নিজ নিজ অন্তর জগতেও প্রস্তুতি লওয়া দরকার। সূক্ষ্ম হৃদয় চর্চার মাধ্যমে মনের সজীবতা বাড়াইয়া তোলা আবশ্যক। ক্ষমা একটি

গুণের নাম। সমাজের একজন হইয়া প্রতিবেশীর আচরণের উপরও নজর রাখা কর্তব্য। প্রতিবেশী যদি অন্যায় পথে বিবাদ বিসম্বাদ বাধাইয়া কলহ ডাকিয়া আনে, তবে তাহার প্রতিষেধক ক্ষমা নামক হৃদয়বৃত্তির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার।' একজন

ক্ষমা একটি গুণের নাম

দোষ করে, অপরে সেই দোষ ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখিয়া দোষীকে আপন ভুল বুঝিতে সহায়তা করে। সুদূর অতীতকালে পৃথিবীতে যেসব অমৃতের বরপুত্র মহাপুরুষরা জন্মিয়াছেন—তাঁহারা সব মানুষের অন্যায়, অ[illegible]কৃত আচরণকে ক্ষমার চোখে দেখিবার সৎ পরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন। তাই [illegible] ধর্মেই ক্ষমা নামক গুণটির চর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ক্ষমা ক[illegible] মনোবল যাহার আছে, সে আপনাতে আপনি বলীয়ান। তাঁহার অন্তরঙ্গ সমাজানুভব 'বহুজন হিতায়ে'র উন্নত আদর্শে পরিশুদ্ধ ও শুচিস্নাত।

পৃথিবীতে যত বড় ধর্ম আছে—সব ধর্মেই দুর্বলের অসহায়তাকে দয়া ও করুণার চোখে দেখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ছোট ছোট জলবিন্দু

দয়া

বা বারিকণার সমন্বয়ে বিরাট সমুদ্র এবং মনোরম ভূমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইরূপ কবির ভাষায় :

Little deeds of kindness, little words of love
Help to make earth happy like the heaven above.

মহাকবি সেক্সপীয়র তাঁহার ম্যাকবেথ নাটকে সুন্দরভাবে 'দয়া'র তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়াছেন নীচের এই কয়টি ছত্রে :

Yet do I fear they Nature,
It is too full o' the milk of human kindness
To catch the nearest way.

এহেন দয়াবান ব্যক্তি চিরদিনই সমাজের বরণ্য হইয়া আসিয়াছেন। একের দয়া করিবার মত উদারতা অপরকে আকৃষ্ট করে, অপরকে অনুপ্রাণিত করে। একের দয়ার্দ্র চিত্তের মধুময় সংসর্গে পাপীও পুণ্যের পথে নামিয়া আসিয়া জিঘাংসা প্রবৃত্তি বিস্মৃত হয়। ইতিহাসে এরকম বহু নজির আছে। দয়ার দ্বারা ব্যক্তিমনে সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া যায় এবং মানসিক পরিমণ্ডল বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়। প্রগাঢ় আত্মশক্তি উদ্ভূত হইয়া ব্যক্তিমনকে বিশ্বমনের সহিত গাঁথিয়া দেয়। মনের উদারতা, ঐশ্বর্য, সজীবতা, পরোপকার প্রভৃতি সংগুণ ব্যক্তিচিত্তকে সমৃদ্ধিশালী করে। ব্যক্তি তখন মনে প্রাণে বলীয়ান হইয়া উঠে।

উপনিষদে মানুষকে বলা হইয়াছে অমৃতের পুত্র। মানুষের তপস্যা অমৃতেরই তপস্যা। মানবমনের উন্নত পরিশুদ্ধ চিন্তায় বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে এক দুর্জয় জ্যোতির্ময় সত্তার

অধিষ্ঠান কল্পিত হইয়াছে। এই সত্তাই হইল ঈশ্বর। তিনি অদৃশ্যচারী, কল্পিত স্বর্গ-রাজ্যে অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁহার বিভূতি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। ধর্মের মতে মানুষ এই ঈশ্বরেরই সন্তান। মানুষকে নারায়ণ ভাবিয়া ক্ষমাসুন্দর চোখে, দয়াবান চিত্তে গ্রহণ করাই ঈশ্বর সেবার প্রকৃষ্ট পন্থা। শুধু মানুষ কেন, সমগ্র জীবকুলের প্রতি দয়া ও ক্ষমা দেখান উচিত। এ যুগের সর্বচিত্তজয়ী মহাপুরুষ বিবেকানন্দও [illegible]ছেন : জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। সুতরাং বলা [illegible]া ও দয়া নামক সংগুণ দুইটির চর্চার দ্বারাই পরোক্ষভাবে মানুষ ঈশ্বর সেবা করিয়া থাকে।

ক্ষমা ও দয়া পরোক্ষত মানুষকে ঈশ্বরের নিকটে আনে

সব মানুষই ক্ষমা এবং দয়া করিতে পারে না। যে সকল সময় অন্যায়-অধর্মের পথে জীবনাচরণ করে নিষ্ঠুর হিংস্রমুখে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করে তাহার পক্ষে ক্ষমা এবং দয়ার বলে বলীয়ান হওয়া কষ্টসাধ্য। আবার ধর্মের ধ্বজা-ধারী স্বার্থপর, লোভী ব্যক্তিরাও সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টায় ক্ষমা ও দয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মনে প্রাণে যিনি উদার, পরোপকারী তাঁহার পক্ষেই সম্ভব ক্ষমা ও দয়া গুণের চর্চার দ্বারা আপন বলে বলীয়ান হইয়া উঠা। যাহারা মনে করে যে ধর্মের আশ্রয়ে অথবা ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যতায় যাহারা প্রতিপালিত তাহারাই পারে ক্ষমা কিংবা দয়া করিতে, এরূপ চিন্তা করা ভুল। কারণ দয়া যিনি করেন, ক্ষমার তাৎপর্য যিনি হৃদয়ঙ্গম করেন—তিনিই জীবনের যে কোন অবস্থায় ক্ষমা এবং দয়া গুণদুইটির চর্চা কবিতে সক্ষম হন।

ক্ষমা এবং দয়া করিতে কে পারে ?

ক্ষমা করার উদ্দেশ্য জনপ্রিয়তা লাভে নয়। দয়া করার অর্থ আর্থিক প্রাচুর্যতা দেখান নয়। এই দুইয়ের উদ্দেশ্য আরও বড়, আরও মহৎ। কোন প্রকার স্বার্থ চিন্তার আলোকে এই দুইটি সৎ গুণের বিচার করিলে ভুল করা হইবে। মনে প্রাণে দশের সহিত একাত্মকতা উপলব্ধির তাড়নাই আলোচ্য গুণদুইটির চর্চায় মানুষকে নিয়োজিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে। তাই উপনিষদে যথার্থই বলিয়াছে : "নাল্পে সুখম অস্তি, ভূমৈব সুখম"। এই ভূমালাভের প্রকৃষ্ট পন্থা হইল দয়া ও ক্ষমা নামক গুণদ্বয়ের বহুল চর্চা। এই ভূমার আকাঙ্ক্ষাই একমাত্র হৃদয়বৃত্তিকে প্রসারিত করিয়া তোলে। মানুষ আপন আত্মশক্তিকে বলীয়ান হয় এবং তার চিত্তে সীমাতীত জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হইয়া উঠে। ব্যষ্টি ছাড়িয়া সমষ্টি কল্যাণে জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। মানুষের উচিত সকল অবস্থায় নিজের প্রতি আস্থা রাখা এবং সৎকর্ম ও চারিত্রিক গুণাবলীর সাহায্যে নিজেকে বিকশিত করা।

উপসংহার

বৃহত্তর কলিকাতা নগরী পরিকল্পনা

ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের যতটুকু স্থায়ী সুফল প্রসব করিয়াছিল তাহার মধ্যে অন্যতম হইল একাধিক বৃহত্তর নগরীর গোড়াপত্তন। সেইসব বৃহত্তর নগরীগুলির মধ্যে কলিকাতা অন্যতম। ইংরেজ কর্মচারী জব চার্ণকের খামখেয়ালেই কলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি ক্ষুদ্র গ্রামের সমবায়েই একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতা।

কালের অগ্রগতীর সাথে সাথে এই কলিকাতা নব নব রূপান্তরের [illegible] দেহে বহন করিয়া আসিতেছে। শুধু বাঙলা নয়, ভারতবর্ষ নয় সমগ্র পূর্ব-[illegible] বৃহত্তর নগরী এই কলিকাতা। নানা ধারা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও এই নগরীর আলো-হাওয়া ও স্বাস্থ্যের প্রতি কাহারো দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই দীর্ঘকাল রাজধানী গৌরবে ভারতবর্ষের শোভা বর্ধন করিয়া আসিয়াছে এই কলিকাতা।

সারা ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব কিছুর প্রাণকেন্দ্র এই কলিকাতা। তাই নানা ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, এমন কি দেশ-বিদেশের লোকেদের পর্যন্ত সাগ্রহে আপন বক্ষে স্থান করিয়া দিয়াছে কলিকাতা। এই নগরীর মতো বাণিজ্যিক বন্দর সারা ভারতে অল্পই আছে। কয়লা, লৌহ, অভ্র, পাট প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান খনিজ ও কৃষিজ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ এই নগরীর অনেকটা সমীপবর্তী; বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় এই নগরেই, কিংবা ইহার আশে পাশে গড়িয়া উঠিয়াছে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ও মধ্য—প্রায় গোটা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক নির্ভরতা এই নগরকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতেছে। নানা পেশা ও বিচিত্র জীবিকার্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল এই কলিকাতা। তারপর দেশ-বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের অসংখ্য হিন্দু পরিবার জীবিকার্জনের সহজ পথ খুঁজিয়া পাইবার আশায় কলিকাতা আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

কলিকাতা সারা ভারতের মধ্যমণি। ইহার উদারতার সীমা নাই। সে অকৃপণ হস্তে সমগ্র ভারতবাসীকে আশ্রয় দিয়া কিংবা ভারত সংস্কৃতির বিরাট বিপুল রূপ বক্ষে ধারণ করিয়া থাকুক না কেন—কলিকাতার বাস্তব চেহেরা কিন্তু সবটুকু তা নয়। ইটের পরে ইটে গাঁথা মানুষ নামক জন্তুর আশ্রয় কেন্দ্র এই কলিকাতা। নানা অভাব-অভিযোগ ও সমস্যা-ভারাক্রান্ত 'মিছিলের সহর' ও দুঃস্বপ্নের নগরী এই কলিকাতা। জনসংখ্যার আধিক্যের দরুন বাসগৃহের সমস্যা আজ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে। এক চতুর্থাংশ বস্তীবাসী, দুইঅংশ ফাটল ধরা বাড়ির অধিবাসী আর মুষ্টিমেয় বিরাট ইমারৎ-এ বাসকারীদের নিয়েই এই কলিকাতা। আলো নাই, বাতাস নাই, পানীয় জলের সুব্যবস্থা নাই, কলহ-বিবাদের অন্ত নাই, সমস্যার শেষ নাই—এই কলিকাতায়। সভ্যতা দীপ্ত

বিশ শতকে যেন অভিশাপ বহন করিয়া টিকিয়া আছে এই কলিকাতা। চারিদিকে ময়লা আবর্জনা, বীভৎসতার সমারোহ। ট্রামে-বাসে, ফুটপাথে, পার্কে, বৃহৎ এভিন্যুতে, অন্ধকার গলিতে সর্বত্রই জনারণ্য, জনতার মিছিল যেন চলিয়াছে। এই তো সহর কলিকাতার পরিচয়, বাস্তব চেহারা।

দীর্ঘদিন অনাদর ও উপেক্ষায় কলিকাতা নগরীর সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল হইতে এই মহানগরীতে বাসস্থানের সমস্যা প্রকট হইয়া [illegible] এতদিন ধরিয়া মনে হইতেছিল কলিকাতা যেন অপরিকল্পিত নগরী, খেয়াল-[illegible]হার সূচনা ও ক্রমবিকাশ ঘটিয়া চলিতেছে।

কিন্তু সব দিন সমান যায় না। সমস্যা চিরদিনই সমস্যা হইয়া থাকে না। কলিকাতার ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। সম্প্রতি কলিকাতা নগরীর উন্নতি বিধানের দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বৃহত্তর কলিকাতা নগরীর পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বারা এই সচেতনতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের দ্বারাই সম্ভব সমস্যা ভরাক্রান্ত কলিকাতাকে অনিবার্য বিপদের হাত হইতে বাঁচান। বিশ্বব্যাঙ্ক ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দুইটি প্রতিনিধি দল এই নগরীর বিচিত্র সমস্যা অনুধাবন করিয়া বৃহত্তর কলিকাতা গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন। 'কলিকাতা মেট্রোপলিটান অথোরিটি' নামক একটি সংস্থার অধীনে থাকিয়া বজবজ হইতে কল্যাণী পর্যন্ত তিনশত বর্গ মাইল ব্যাপী অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ লইয়া বৃহত্তর কলিকাতা গড়িয়া উঠিবে। নগরীর জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে উন্নততর করিয়া তুলিতে হইবে, বন্দরটিকে রক্ষা করিবার জন্য ফরাক্কা বাঁধ ও হলদিয়ায় একটি উপবন্দর নির্মাণ করাও অত্যাবশ্যক। সর্বোপরি এই সকল পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সম্বন্ধে অবহিত হইয়া সম্প্রতি উদ্যোগী হইয়াছেন। কলিকাতা মেট্রোপলিটান কর্তৃপক্ষ কলিকাতার আশে পাশে কয়েকটি উপনগরী নির্মাণের দ্বারা বৃহত্তর কলিকাতার বহু সমস্যা লাঘবের চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতার পূর্বাঞ্চলের জলাভূমি বুজাইয়া ৩½ বর্গমাইল ব্যাপী একটি উপনগরী নির্মাণের দ্বারা ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ পরিবারের পুনর্বাসনের সুবিধার কথা চিন্তা করা হইতেছে। বেহালা হইতে ডায়মণ্ড-হারবার রোডের দুই দিকে পঞ্চান্ন হাজার একর জমি লইয়া সেখানে আর একটি উপনগরী নির্মাণ করিয়া তথায় ২½ লক্ষ বাসগৃহ নির্মিত হইবে। স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিবে। আনুমানিক হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে প্রায় ২২০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

এই পরিকল্পনাকে সর্বপ্রকার সফল করিয়া তুলিতে হইলে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়কেই সম-আগ্রহী হইয়া উঠিতে হইবে। হয়ত বা এই পরিকল্পনার জন্য বেকারের সংখ্যাধিক্য ঘটিবে। বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিকল্প কর্ম-সংস্থানের সুযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া সর্বতোভাবে এই পরিকল্পনাকে সর্বপ্রকারে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

পারমাণবিক শক্তি

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২]

আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে নিত্য নতুন আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করিতেছে। জড় ও চেতন, উভয়েই তাহার সমান আগ্রহ। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানী পদার্থের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া, তাহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে আপন প্রয়োজন মাধ্যমেও নিযুক্ত করিয়াছে। অসংখ্য অণু পরমাণুর সমবায়ে যে পদার্থ গঠিত, এই সত্য যে শুধু আধুনিক বিজ্ঞানীরই আবিষ্কার তাহা নহে, প্রাচীন ভারতে 'অণু' অস্তিত্ব পরিচিত ছিল। উপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অণুর উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

আধুনিক বিজ্ঞানী পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া 'পরমাণু' (atom) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা বলেন পরমাণুই হইল পদার্থের শেষতম অবস্থা। পূর্বকার বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল 'অণু'ই (molecule) বুঝি পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষণায় তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অণুকে বিশ্লেষণ করিয়া পরমাণু পাওয়া গিয়াছে। এই পরমাণু অসীম শক্তিশালী। পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। ইহা এত ক্ষুদ্র যে, অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও ইহা ভাল করিয়া দেখা যায় না। এই পরমাণুকে বিভক্ত করিলে প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হয়। পরমাণু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার ভিতরে 'ইলেকট্রন', 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' রহিয়াছে। এইগুলি হইল পরমাণুর শক্তির উৎস।

পরমাণু কাহাকে বলে

দীর্ঘকাল ধরিয়াই বিজ্ঞানীগণ পদার্থের এই শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য গবেষণা চালাইয়া আসিতেছিলেন। অবশেষে একদিন বিজ্ঞানের এই প্রয়াস সফল হইল। পদার্থমধ্যস্থ পরমাণু বিভক্ত করিয়া তাঁহারা আধুনিক কল্পনাতীত শক্তির সন্ধান পাইলেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে সর্বপ্রথম এই পরমাণুর শক্তি মানুষের কাজে লাগিল। যে সকল বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে পরমাণু শক্তি বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে আইনস্টাইন, নিল্‌স্ বোর, ওপেনহিমার, অটোহান তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। দুঃখের কথা এই যে, 'পারমাণবিক' শক্তি

পরমাণু শক্তি ও তাহার ব্যবহার

আবিষ্কৃত হইয়া সর্বপ্রথম মানুষের প্রাণসংহারেই নিয়োজিত হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করিয়া জাপানের নাগাসিকি ও হিরোসিমা নামক দুইটি শহরে তাহা বর্ষিত করে। এই বোমাবর্ষণের ফলে ঐ দুইটি শহরের কয়েক লক্ষ লোক নষ্ট হয়। সম্প্রতি আরও উন্নততর গবেষণার ফলে পারমাণবিক শক্তি বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছে এবং তাহা প্রধানত মারণাস্ত্র নির্মাণেই ব্যবহৃত হইতেছে।

পরমাণুর শক্তি আবিষ্কার করিয়া মানুষ আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু [illegible] ইহার ব্যবহারে আজও সে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে নাই। পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিসমূহ পরমাণু শক্তিকে মারণাস্ত্র নির্মাণেই ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে। ইহারই ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে পরমাণু বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র। সোভিয়েট রাশিয়া,

পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতা

আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর শক্তি পরমাণু বোমাকে দিনের পর দিন অধিকতর শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীতে নিত্য নূতন পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা করা হইতেছে। এক কথায় এই সর্বনাশা মারণাস্ত্র লইয়া শক্তিমত্ত দেশগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে, ফলে বিশ্বশান্তি ক্রমশই বিঘ্নিত হইতেছে। পারমাণবিক শক্তির অপপ্রয়োগে শুধু যে পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বশান্তি সুদুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। পরমাণু বোমা কোনস্থানে বর্ষিত হইলে বহু মাইলব্যাপী আকাশ বাতাস তেজস্ক্রিয় ভস্মে নষ্ট হইয়া যায়। এই পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা মানুষের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকারক। জাপানে বর্ষিত পরমাণু বোমার অভিশাপ আজও বহু জাপানীর দেহে মনে বহিয়া বেড়াইতেছে। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীর প্রতিটি দ্রব্যকে বিষাক্ত করিয়া মানব জীবনকে যে কোন মুহূর্তে বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে।

পরমাণু অসীম শক্তির আধার। সুপ্রযুক্ত হইলে এই শক্তি মানুষের অশেষ কল্যাণ-সাধন করিতে পারে। পৃথিবীর কয়েকটি অগ্রসর দেশ অবশ্য পারমাণবিক শক্তিকে

মানব কল্যাণে ব্যবহার

যন্ত্রচালনার কাজে ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছে। বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ-জাহাজ, সাবমেরিণ ও অন্যান্য যুদ্ধযানে পারমাণবিক শক্তিকে সার্থকভাবে কাজে লাগাইয়াছে। কিন্তু শুধু যুদ্ধোপকরণ নির্মাণেই নয়, মানবসমাজের নানাবিধ কল্যাণমূলক কর্মেও পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পারমাণবিক শক্তির বহুমুখী সম্ভাবনা আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণ এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়া পর্যন্ত সেই সম্ভাবনা কার্যকারী হইবে না।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা মানুষকে পারমাণবিক শক্তির সর্বনাশা

রূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর শান্তিকামী জনসাধারণ বুঝিয়াছে এই শক্তি রণোন্মত্ত রাষ্ট্রের হাতে পড়িলে দানবীয় মারণযজ্ঞেরই প্রকাশ ঘটাইবে এবং বিশ্ব-শান্তির সম্ভাবনাকে ক্রমশই দুর্লভ করিয়া তুলিবে। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার অহি-নকুল সম্পর্ককে এই পারমাণবিক শক্তিই জিয়াইয়া রাখিতেছে। এ সম্পর্কে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের প্রতিনিধি মনীষী

উপসংহার

দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সাবধানবাণী স্মরণযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন —বিশ্বসরকার গঠন করিতে না পারিলে বিশ্বের বিলুপ্তি [illegible]। ভারতের নেতৃত্বে প্রাচ্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীও পারমাণবিক শক্তির নিষিদ্ধকরণ ও মানবসেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু যতদিন না মানুষের শুভবুদ্ধি জাগরিত হইবে ততদিন পর্যন্ত আধুনিক পৃথিবীর সাধারণ মানুষ পারমাণবিক শক্তির বিভীষিকার মধ্যে সন্ত্রস্ত জীবনযাপন করিবে। যে শক্তির মধ্যে মানবজাতির অশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা নিহিত আছে তাহা যদি মানুষেরই মুহূর্তের অবিমৃষ্যকারিতায় বিশ্ব-ধ্বংসে প্রযুক্ত হয়, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের আর কী থাকিতে পারে?

ভারতের তৃতীয়-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্রত্যেক অনুন্নত কিংবা অর্ধোন্নত দেশই অর্থনৈতিক প্রগতি ও সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দীর্ঘদিন পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী ও বিদেশী শাসন কবলিত ভারতবর্ষেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছে। জটিল সামাজিক ও আর্থনীতিক দুরবস্থা দূরীকরণই এই পরিকল্পনা গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

গত ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় এবং পর বৎসর জুলাই মাসেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হয়। কৃষি, খাদ্য ও সেচের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেষ পর্যন্ত এই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৭৮ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে সূচনা হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ইহার ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ সরকারী ও বে-সরকারী মিলিয়া মোট ৭২০০ কোটি টাকা। এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পিছনে প্রধানত চারিটি উদ্দেশ্য ছিল। (১) গুরুভার শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া দ্রুত-শিল্পায়ণের পথ প্রশস্ত করা। (২) কর্মসংস্থানের ব্যাপক প্রসারতা সম্পাদন। (৩) জাতীয় আয়ের পরিমাণ অন্ততঃ ২৫% বৃদ্ধি এবং (৪) আয় ও ধনের অসমতা হ্রাসে আর্থনীতিক অবস্থার সমবণ্টনের মুখে অগ্রগতি। এই পরিকল্পনার কাজ চলে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত।

উদ্দেশ্যগত ব্যাপকতা যত বড়ই হোক না কেন, বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সর্বতোভাবে সফলতা লাভ করেনি। কারণ এই পরিকল্পনা সমাপ্তির পর

দ্রব্য মূল্য ২০% বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে আনুপাতিক হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বৈসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর জাতীয় উন্নয়নের বিশেষ কোন পরিচয় এখনও মেলে নাই।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অসম্পূর্ণ জাতীয় উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী খসড়া রচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা গ্রহণের পশ্চাতে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একাধিক বৃহত্তর উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বেকার সমস্যার প্রচণ্ডতা লাঘব করিয়া কর্মসংস্থান ও কর্মে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়তঃ খাদ্যশস্যের দিক হইতে দেশবাসীকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী করিয়া রাখা। তৃতীয়তঃ আয় ও সম্পদের বৈষম্য যথাসম্ভব হ্রাসে সামঞ্জস্য বিধান ও আর্থনীতিক শক্তির অধিকতর সুসম বণ্টনবিধি প্রবর্তন করা। চতুর্থতঃ আগামী দশ বৎসরের মধ্যে যাহাতে দেশকে নিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল করিয়া সর্বপ্রকারে শিল্পায়নে সহায়তা করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ইস্পাত, জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও যন্ত্রপাতির নির্মাণের মত মূল শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা। পঞ্চমতঃ পরিকল্পনা চলাকালীন অবস্থায় বাৎসরিক শতকরা পাঁচ হারে পাঁচ বৎসরে মোট ২৫% জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। এই পরিকল্পনায় মূল শিল্পের সহিত খাদ্য ও কৃষির উপর সমান ভাবে গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনার নিমিত্ত সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগ মিলিয়া ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল মোট ১০,২০০ কোটি টাকা। কিন্তু সরকার কর্তৃক বিনিয়োজিত অর্থবণ্টনের নীতি শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছে মোট ১১,৪৫০ কোটি টাকা। অতিরিক্ত কর স্থাপন ও বৈদেশিক সাহায্যই এই পরিকল্পনা রূপায়ণে অর্থ সংস্থানের প্রধানতম উৎস। ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে অবশ্য এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া মতাদর্শগত তারতম্য দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও মনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, চীন ও পাকিস্তানের সহিত ক্রমবর্ধমান সীমান্ত বিরোধ জাতীয় দুর্দিনের কথা চিন্তা করিয়া, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয়-বরাদ্দের কিছুটা পরিমাণ অর্থ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুউন্নত ও মজবুত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে। অবশ্য এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয়ও মনে রাখিতে হইবে যে, জাতীয় দুর্দিন বিবেচনায় দেশবাসী অকৃপণ হস্তে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিরক্ষা তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ধার্য মোট ব্যয়-বরাদ্দের টাকা কমাইয়া শুধুমাত্র প্রতিরক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া না হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নানাবিধ অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া রচিত

হইয়াছে। অবশ্য পূর্ববর্তী দুইটি পরিকল্পনার বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও শেষোক্ত পরিকল্পনাটিকে সফলতর করিয়া তুলিতে সহায়ক হইয়া উঠিবে। কৃষি ও শিল্পের প্রতি সম-গুরুত্ব আরোপ করার জন্য অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র জাতিকে আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী করিয়া তোলা যাইবে। বেকার সমস্যা সমাধান করিয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িবে। প্রকৃতপক্ষে কৃষি ও শিল্পের সু-সমউন্নয়ন ব্যতীত বৃহত্তর ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইবে না।

উদ্দেশ্যগত ব্যাপকতা ও আদর্শগত তাৎপর্য যত বড়ই হোক্ না কেন, [illegible]সী তাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অদ্যাবধি বিভিন্ন পরিকল্পনায় কোনই সুফলতার আলো দেখিতে পায় নাই। দিনের পর দিন দেশবাসীর দুর্গতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ জন্যই দেশবাসী আজ অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছে। সে কারণে এখন পর্যন্ত তাহারা পরিকল্পনাকে সন্দেহের চোখেই দেখে। সে যাহাই হোক, সমস্যার জটিলতা যত বেশীই থাকুক না কেন, সরকারের সহিত দেশবাসীর পূর্ণ সহায়তা ছাড়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ সফল করিয়া তোলা অসম্ভব হইবে। তাই প্রয়োজন দেশবাসী ও সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টার দ্বারা তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতিটি উদ্দেশ্য যাহাতে সার্থক করিয়া তোলা যায় তাহার চেষ্টা করা।

আমার প্রিয় গ্রন্থ : কমলাকান্তের দপ্তর

শত-সহস্র সঙ্গতি-অসঙ্গতি, ভাল-মন্দ আর দোষ-ত্রুটি নিয়েই মানুষের জীবন। সাহিত্য হল জীবনায়ন। সর্বস্তর স্পর্শী অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীই হল সার্থক সাহিত্য স্রষ্টার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মাপকাঠিতেই সার্থক সাহিত্যে স্রষ্টার কাছে প্রতিভাত হয় জীবনের সার্বিক রূপ। সেখানে মেলে হাসি-কান্নার আলো-ছায়া ঘেরা এক বিচিত্রতর রূপের পরিচয়। এই বৈচিত্র্য-সন্ধানে ব্রতী জীবন রস-রসিক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী মুখে একদিন নিঃসৃত হয়েছিল 'কমলাকান্তের দপ্তর'। ঔপন্যাসিক আর চিন্তানায়ক বঙ্কিমের সেদিনই পাওয়া গিয়েছিল নব-পরিচয়।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল কান্নার চেয়ে হাসির জয়গান গেয়েছেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর আমার কাছে প্রিয়। কারণ জন্মলগ্নে কেঁদে যে শিশু এ পৃথিবীতে আসে, সারাজীবন ধরে নানা দুঃখ আর অশান্তির জন্য তাকে কাঁদতে হয় অবিরত। এর হাত হতে অব্যাহতি নেই কারুরই। তাই বাস্তব জীবনে যখন কান্না নিত্য সঙ্গী, সাহিত্য রাজ্যে আবার তাকে ডেকে আনি কেন? সাহিত্য রাজ্যের অপার্থিব পরিবেশে নাই বা পাইলাম কান্নার জয়গান। তার চেয়ে বরং হেসে যাই না প্রাণভরে। যে হাসির অন্তরালে মুহুর্মুহু ঝলকে উঠবে

ভাল লাগার স্বপক্ষে

জীবনের নব পরিচয়। সুখের কথা, আমি আমার প্রিয় গ্রন্থ কমলাকান্তের দপ্তরে তা পেয়েছি। তাই কমলাকান্তের দপ্তর আমার প্রিয় গ্রন্থ।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত কমলাকান্তের দপ্তর এক আশ্চর্য জাতের গ্রন্থ। এটি যে কোন্ জাতের গ্রন্থ তা বলা মুস্কিল। উপন্যাস নয়, প্রবন্ধ নয়, নয় রম্য রচনাও। কমলাকান্তের দপ্তর যেন নিজেই একটি জাতি। সাহিত্য রাজ্যে কমলাকান্তের দপ্তর নতুনতর সংযোজনা। মনে হয়, রাশভারি চিন্তানায়ক বঙ্কি[illegible] সম্ভবতঃ প্রাণভরে হাসাবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। হয়ত বা তা ছাড়াও সঙ্কীর্ণ বাঙালী জীবনের নানা অসঙ্গতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবার জন্যই যেন বঙ্কিমচন্দ্র এ গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

জাতি পরিচয়

কমলাকান্তের দপ্তরে মোটমাট তিনটে কি চারটে চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও আসলে তার একমাত্র প্রধান চরিত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্ত আফিম খোর। আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে সে চিন্তায় মাতে। আর মেতেও ওঠে উদ্ভট চিন্তায়। আবার মাঝে মাঝে সে বেশ রাশভারি হয়ে ওঠে। হাস্যরসিক, স্বদেশপ্রেমিক, দার্শনিক, কবি আরও কত কি পরিচয় যেন এই একটিমাত্র ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। মাঝে মাঝে ঘটেছে তারই বিদ্যুদ্দীপ্ত আচমকা প্রকাশ। প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরুর দুধ খায় সে, অথচ তার জন্য পয়সার ধার ধারে না। দুধ প্রত্যাশী অথচ চৌর্য-পরায়ণ বিড়ালের মুখে কমলাকান্ত শোনে চির সাম্যের বাণী। দুর্গোৎসবের ভাসানের সময় তার মনে জাগে বাঙালী জীবনের অসংখ্য সমস্যার দুঃখ-দীর্ণ চিত্র। আবার অবলীলাক্রমে বাঙলা তর্জমা করে ইংরেজী utopia কে সে বানিয়ে দেয় উদরদর্শন। ফুলের বিয়েতে নানা ফুলের মিছিল সে নেশার ঘোরে দেখে। নসীবাবুর দুঃখে সে হা-হুতাশ করে ওঠে। গলাবাজিতে অদ্বিতীয় সুধাকণ্ঠী কোকিলকেও সে গালিগালাজ করে। একটিমাত্র ব্যক্তিকে নিয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যেন এক বিস্ময়চকিত রাজ্যে পাঠককে হাতছানি দিয়ে নিয়ে গেছেন।

ব্যাপক পরিচয়

কমলাকান্তের দপ্তর অবিমিশ্র হাস্যরসেপুষ্ট এক বিচিত্র গ্রন্থ। হাসির পর যে কাঁদতে হয় আর শতসহস্র অসঙ্গতিকে ঘিরেই যে হাসি পায়, বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে তাই-ই দেখাতে চেয়েছেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের অসঙ্গতিকে ঘিরে অবশ্য এর আগেই নির্মল শুভ্র হাস্যরসের যোগান দিয়েছেন। তথাপি তাঁর উপন্যাসে যে হাস্যরস প্রকাশ পেয়েছে, কমলাকান্ত দপ্তরের হাস্যরসের সাথে তার কোন তুলনাই হয় না।

কমলাকান্তের হাস্যরস

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একাই একশ'। নানাদিক হতে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা ভরাট করে তৎকালীন পাঠকদের বৈচিত্র্যের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার

উদ্দেশ্য নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঔপন্যাসিক ও

উপসংহার

চিন্তানায়ক বঙ্কিম বিরাট বিস্তৃত বহুমুখী সাহিত্য কর্মধারার নবতর পরিচয়ে সমুজ্জ্বল কমলাকান্তের দপ্তর। বঙ্কিম ব্যক্তিত্বের নতুন দিক এতে প্রকাশিত। এবং সে দিক সবার প্রিয়—এক আলোঝলমল হাসি-খুশির রাজ্য। কমলাকান্তের ব-কলমে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কাছে সে রাজ্যের খবর পৌঁছে দিয়েছেন। তাই সকল কালের সকল বয়সের বাঙালী পাঠকের একান্ত প্রিয় গ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর।'

পশ্চিমবঙ্গের বহুমুখী অগ্রগতি

দীর্ঘদিন পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ভারতবর্ষ যেদিন মুক্তি পাইল, সেদিন হইতেই এ দেশবাসীর একমাত্র লক্ষ্য হইল নিজ দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তোলার। এ জন্য প্রয়োজন হইল প্রগতিশীল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ও প্রতিটি প্রদেশের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবার। সেদিক দিয়া বিচার করিলে লক্ষ্য করা যায় যে, ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সরকার সমানভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দিক হইতে অগ্রগতি সম্পাদনে আজ নিয়োজিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশগুলির মত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও বহুমুখী অগ্রগতি সম্পাদনের প্রচেষ্টা সন্ধ্যায়িত।

স্বাধীন ভারতে পর পর দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়াছে। বহু দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীদের নেতৃত্বে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এ পরিকল্পনা দুইটি যদিও সর্বাংশে সার্থক হয় নাই, তবু ইহাদের ফলাফল একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক নয়, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। অবশ্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়া গিয়া চতুর্থ যোজনার কাজও শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলাফলের প্রতি ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বেই বৃহত্তর বাঙলা বিভক্ত হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান নামে দুইটি প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ অখণ্ড বাঙলা দেশের অতি অল্প অংশ লইয়াই গঠিত। দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ হইতে আগত অসংখ্য উদ্বাস্তুর চাপ ও উর্বর চাষের জমিগুলি হারাইবার ফলে পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়াছে নানা সমস্যা। খাদ্যবস্তু, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে সর্বদিক হইতে সৃষ্টি হইয়াছে অনিশ্চয়তার। যদিও এখন এই সব দুরবস্থার অবসান হয়নি তবুও ইহার পুনরুদ্ধারের অল্পবিস্তর আশার আলো দেখা দিয়াছে। বিগত দশ বছরের মধ্যে এই পথের উল্লেখযোগ্য বিবরণগুলি আলোচনা করিলেই সমগ্র চিত্রটি বোধগম্য হইবে।

ধান ও খাদ্য শস্যের উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য করিলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব দিক হইতে উল্লেখ্য অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেচ, সার, বীজ ও কৃষিশিক্ষা—এই সবগুলিই

কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজন। জমির পরিমাণগত স্বল্পতার দিক বিবেচনা করিয়া ব্যাপক চাষের পরিবর্তে আত্যন্তিক চাষের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উন্নততর বীজ সরবরাহের প্রয়োজনে ৮টি বৃহৎ বীজ পরিবর্ধন খামার ছাড়াও ১১টি খামার স্থাপন করিয়াছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে থানা-হিসাবে ফার্মের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় দুইশত। রাসায়নিক সার বিতরণ ছাড়াও ময়লা পচানো সার প্রসারের চেষ্টা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এক লক্ষ দশ হাজার একর জমিতে জাপা[illegible]প্রথায় চাষ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।

সেচ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। দামোদর ও ময়ূরাক্ষী সেচ যোগান ছাড়াও ৭৬টি নলকূপ খনন, মজা পুষ্করিণীর উদ্ধার প্রভৃতির দ্বারা প্রায় ১২,৫০০ একর জমিতে সেচ যোগান সম্ভব হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ কল্পনা মারফৎ ২০ লক্ষ টাকার সেচ ঋণ দেওয়া হইয়াছে। কংসাবতী ও উত্তরবঙ্গের তালামা-কবতোয়া পরিকল্পনার কাজও শেষ হওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে প্রায় ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

মৎস্য দুগ্ধের উৎপাদন ও পরিবেশনের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। শহর হইতে খাটাল অপসারণ করিয়া দুগ্ধ কলোনী গড়িয়া তোলার প্রতি নজর দেওয়া হইয়াছে। হরিণঘাটায় একটি বিরাট দুগ্ধ বিতরণী কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সেখান হইতে বৃহত্তর কলিকাতায় প্রায় ১ লক্ষ লিটার পরিমাণ দুগ্ধ সরবরাহ করা হয়। ইহা ভিন্ন গঙ্গার পশ্চিম তীরে বালীতে এবং দার্জিলিং-এ একটি বহুমুখী দুগ্ধ কলোনী গড়িয়া উঠিবে।

দ্বিতীয় পাঁচশালায় সরকারী শিল্পোদ্যোগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দুর্গাপুরের কোক-চুল্লী। ইহার সহিত সমানভাবে উল্লেখ করা যায় তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা ও অসমাপ্ত গ্যাস সরবরাহ কারখানার। স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয়েও সরকারের দৃষ্টি রহিয়াছে। তাই সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের জন্য প্রতিষেধক টিকা ও পৃথক হাসপাতাল ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে অসংখ্য হাসপাতাল নির্মাণ করা এবং ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। যক্ষ্মা রোগীদের আরোগ্যলাভের পর স্বাস্থ্যনিবাসে রাখিবার জন্য কয়েকটি স্বাস্থ্যনিবাস খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতায় তিনটি মেডিকেল কলেজ, হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী বিদ্যার ফ্যাকালটি গঠন করা হইয়াছে।

শিক্ষা ব্যাপারেও এই মৌলিক পরিবর্তনের স্বাক্ষর বর্তমান। উচ্চশিক্ষার প্রসার ও সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বর্ধমান, কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ছাড়াও সংস্কৃত শিক্ষার

আলাদা একটি বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে অসংখ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। শিক্ষকদের জীবনধারণের মত পর্যাপ্ত বেতন দানের প্রচেষ্টাও এ প্রদেশের সরকার করিতেছেন।

কলিকাতার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের নিমিত্ত উত্তর কলিকাতার লবন হ্রদের ৩·৭৫ বর্গমাইল এলাকা পুনরুদ্ধার করিয়া প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহা ছাড়া ডায়মণ্ডহারবার রাস্তার দুই দিকে পঞ্চান্ন হাজার একর জমিতে একটি উপনগরী স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরিবহনের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় সরকারের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা হইয়াছে এবং উহাকে আরও অপসারিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বিগত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী দিবসে (৯ই মে, ১৯৬৩) প্রশাসনিক কাযে সারা পশ্চিমবঙ্গে বাঙলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বেসরকারী প্রয়াস ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গে বহুমুখী অগ্রগতির যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য এই চেষ্টা সবক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সফল হয় নাই। অল্প বিস্তর ত্রুটি বিচ্যুতিও ইহাতে রহিয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী যুগ্ম প্রচেষ্টা ছাড়া এইসব ত্রুটি সম্পূর্ণভাবে দূর করা অসম্ভব।

মহানায়ক নেহেরু

ভারতমাতা চিরকালই রত্নপ্রসবিনী। ১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর তাঁর কোল আলো করে এলেন আর এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম রূপকাররূপে জহরলাল ভারতকে যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বিশ্বশান্তির অগ্রদূত এই মহানায়ক আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যস্থাপনে বিদেশের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন স্বদেশের অঙ্গনে এবং ভারতের শুভেচ্ছাবাণী বিলাইয়াছেন বিশ্ববাসীকে। জহরলাল ছিলেন বিশ্বমানবতার পূজারী, তাই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত বিশ্ববাসীকে তিনি ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন। বিশ্ববাসীও তাঁদের প্রিয় নেতাকে অন্তরের শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতম উত্তরসাধক ভারতের শান্তি-মৈত্রী ও ত্যাগের চিরাচরিত ঐতিহ্যের বলিষ্ঠতম প্রবক্তা নেহেরু। প্রাক্ স্বাধীনতার পর্ব হইতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি উদাত্তকণ্ঠে এই আদর্শ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়া বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে

প্রারম্ভিক ভূমিকা

উহাকে সার্থকভাবে প্রযোগ করিয়া বার বার বিশ্বকে অনিবার্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদের তৎকালীন এক সম্ভ্রান্ত কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পরিবারে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ছিলেন তৎকালীন একজন প্রখ্যাত জননায়ক। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার দান অপরিসীম। মাতা স্বরূপরাণীও ছিলেন নিষ্ঠাবতী ও সত্যিকারের একজন আদর্শ জননী।

বংশপরিচয়

শৈশবে জহরলাল চরম ঐশ্বর্যের মধ্যেই প্রতিপালিত হইতে থাকেন। তাঁহার বয়স যখন মাত্র এগার বৎসর তখন ফার্ডিন্যানড ব্রুক্‌স্ নামে তাঁহার এক গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তিনি ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর ১৯০৫ সালের ১৩ই মে তাঁহাকে শিক্ষার্থে বিলাত যাইতে হয়। প্রথমে তিনি বিলাতের হ্যারো স্কুলে ও পরে কেমব্রিজ-ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ স্নাতক হইয়া ব্যারিষ্টারি পড়া শুরু করেন পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া ১৯২১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ছাত্রজীবন হইতেই জহরলালের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মেধা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় মেলে।

শৈশব ও পাঠ্যজীবন

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আভিজাত্য ও ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়াও এই সময় হইতেই তাঁহার মনে তথাকথিত আভিজাত্য ও ধনতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। সেই ঘৃণাই উত্তরজীবনে তাঁহাকে সাম্যবাদে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছিল।

জহরলাল যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন ভারতের রাজনীতির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেসের চরমপন্থীদল মহামান্য তিলকের নেতৃত্বে প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠিল—কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশ দ্রুত পদক্ষেপে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীরাও বিক্ষিপ্তভাবে সশস্ত্র অভিযান করিয়া ইংরেজ সরকারকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। স্বাধীনতার এই মহাযজ্ঞে জহরলাল নিজেকে নিক্ষেপ করিলেন—স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব। জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিয়া প্রথমেই তিনি রাউলাট আইন অমান্য করেন এবং সত্যাগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু পিতা ও গান্ধীজীর বিশেষ অনুরোধে তখনকার মত তাঁহাকে বিরত থাকিতে হয়। পরে জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়ে। এই সময়ে তিনি সক্রিয়ভাবে সত্যাগ্রহে যোগদান করায় ছয়মাসের জন্য সর্বপ্রথম কারাবরণ করেন। কারাগারে বন্দী থাকিবার

স্বাধীনতা আন্দোলন ও শ্রীনেহেরু

সময় কয়েদীদের সাধারণ সুযোগ সুবিধার জন্য তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট এক তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ের সেক্রেটারী এবং এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই সময়েই তাঁহার মত সুযোগ্য নেতাকে বিপথে চালিত করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে যে সব প্রস্তাব আসে, তিনি ঘৃনার সহিত ঐ সব প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পরে কোকনদ অধিবেশনে তিনি সভাপতি মহম্মদ আলীর ও বেলগম অধিবেশনে সভাপতি মহাত্মাজীর সেক্রেটারীরূপে কাজ করেন। ১৯২৮ সালে পাঞ্জাব, মালাবার, দিল্লী, বোম্বাই এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে তাঁহাকে কংগ্রেস সভাপতি হইতে আমন্ত্রণ জানান হয়। ঠিক ঐ বৎসরই তিনি বাঙলাদেশে ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন প্রভৃতি সভাতে সভাপতিত্ব করেন।

ইহার পর তিনি 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন' সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন ও শ্রমিক কল্যাণে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেন। এই সময়ে তিনি গান্ধীজীর সহকর্মীরূপে দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

এই সময় বৃটিশ সরকার জহরলালের প্রতি এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেন; ঐ নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী জহরলাল কোন সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে পারিবেন না এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলিতে পারিবেন না কিন্তু জহরলাল উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের ৭ই আগস্ট ভারত ছাড় আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মহাত্মাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সহ পুনরায় তিনি কারাবরণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে দেশবরেণ্য নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজে'র তিন জন বিশিষ্ট কর্মী সাহনওয়াজ, ধীলন ও সাইগলকে সরকার রাজদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু জহরলাল এই রায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। পরে জঙ্গীলাট ইহাদের শাস্তি মকুব করেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁহার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সার্থক হইল—ভারত স্বাধীন হইল। জহরলাল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইলেন।

স্বাধীন ভারত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু মৈত্রী ও সৌহার্দ্য স্থাপনের নিমিত্ত বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি কমনওয়েলথ মন্ত্রিসভায়ও ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ভারতে শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম জার্মানীর সহযোগিতায় উড়িষ্যার অন্তর্গত রাউরকেল্লায় ও বৃটেনের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ভারত সরকার দুইটি বৃহদায়তন ইস্পাত কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা হইলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আংশিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিগত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ভারত এক নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছে, কি শিল্পোন্নয়ন, কি বৈদেশিক বাণিজ্যবিস্তার, কি কৃষিউন্নয়ন সর্বোপরি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ভারত বেশ কয়েক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ক্লান্তিহীন ও বুদ্ধিদৃপ্ত নেতৃত্ব। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই দীর্ঘ সতেরো বৎসরে সাম্প্রদায়িকতা ভাষা ও অঞ্চলবিন্যাস লইয়া বহুবার বহুরকম বিরোধ দেখা দিয়াছে। কিন্তু জহরলাল নেহেরু প্রতিটি ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত উহার সমাধান করিয়াছেন। কাশ্মীর লইয়া বিরোধের ব্যাপারে পাকিস্তান বহুবার ভারতকে বিশ্বসমক্ষে হেয় ও দোষী সাব্যস্ত করিবার কূটচক্রান্ত করে। কিন্তু পণ্ডিতজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ যুক্তিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করিয়া বারবার ঐ চক্রান্তকে বানচাল করিয়া দিয়াছেন। পাকিস্তান সরকার সহযোগিতা করিলে বহুদিন পূর্বেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে আদৌ ন্যায়বাদী নন। গোয়া প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সহজ সমাধান করিয়া নেহেরুজী আর একবার তাহার অসীম রাজনৈতিক জ্ঞান ও অতুলনীয় বিচক্ষণতার নজীর স্থাপন করিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে তীব্র নিন্দা করিতেন। গত জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয় তিনি উহাতে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং দ্বিধাহীন কণ্ঠে উহার তীব্র নিন্দা করেন।

স্বাধীনতা উত্তর ভারত ও নেহেরু

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ছিলেন বিশ্বশান্তির অন্যতম অগ্রদূত তথা বাহক ও ধারক। হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপন ও জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলাই ছিল নেহেরুজীর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৫৬ সালে ভারত প্রধান শ্রীনেহেরু চীনা প্রধান চৌ-এন-লাই বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সুবিখ্যাত পঞ্চশীল নীতি প্রচার করেন যাহার মূলমন্ত্র হইতেছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পঞ্চশীলের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা স্বয়ং চীনই এই নীতি হইতে আজ বিচ্যুত। গত কয়েক বছর পূর্বে কিউবা লইয়া যখন কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ এক সর্বগ্রাসী সমরে লিপ্ত হইতে উদ্যত হইয়াছিল, শ্রীনেহেরু বিশ্বের দরবারে দৃপ্তকণ্ঠে উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সুয়েজখাল লইয়া বিরোধ প্রশ্নেও তিনি সাম্রাজ্যবাদের উন্মুক্ত অসির সম্মুখে নির্ভীকচিত্তে শান্তির পারাবত লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যেখানেই যুদ্ধ ও অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, দ্রুত পদবিক্ষেপে সেখানেই তিনি ছুটিয়া গিয়াছেন—শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। এই সেদিনও শ্রীনেহেরু ইচ্ছা করিলেই, ভারত চীনা বিশ্বাসঘাতকতার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিত কিন্তু সামান্য ক্ষতি স্বীকার বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা

বিশ্বসাহিত্যে নেহেরু

অপেক্ষা বিশ্বশান্তির মূল্য তাঁহার কাছে অনেক বেশী ছিল আর সেজন্যই বিশ্বশান্তি আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

মহাকালের অমোঘ বিধানে ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে এই বিশ্ববরেণ্য মহানেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু আজ আর আমাদের মাঝে নাই কিন্তু

মৃত্যু

অক্ষয় আছে তাঁর কীর্তি আর আদর্শ। বৃহত্তর, মহত্তর ও উন্নততর ভারতবর্ষ গঠন করিবার মহান্ বিশ্বকর্ম যে ব্রত শুরু করিয়াছিলেন তাহা সার্থকভাবে সম্পন্ন হয় নাই। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কাহারা? দায়ী দেশপ্রেমিকের মুখোসপরা একদল কালোবাজারী স্বার্থান্বেষী ও কুচক্রী। শেষদিকে নেহেরুজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁরই বিশ্বস্ত কর্মীদের এক বিরাট অংশ কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের সাহায্য করিতে অথবা নিজেরাই কালোবাজারী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইতে বদ্ধ পরিকর। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়াছেন "দেশবাসী, তোমাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ব্যতীত দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব নয়" আমরা সে ডাকে সাড়া দিই নাই সুতরাং দোষী আমরাও। সমগ্র দেশবাসী বিশেষতঃ কালোবাজারী আর স্বার্থান্বেষীর দল আজ মহাকালের বিচার দরবারে আসামীরূপে অভিযুক্ত। বিচারকের কঠোর দায়িত্ব আজ আমাদের পালন করিতে হইবে।

গণতান্ত্রিক ত্রুটির যূপকাষ্ঠে নেহেরুজীকে সত্য ও আদর্শ অনেক সময় বলি দিতে হইয়াছে কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সার্থক সৈনিকরূপে বহুবার আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি,

উপসংহার

মতবিরোধ ও মনোমালিন্য হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত মতকে প্রাধান্য না দিয়া তিনি মহান নেতা গান্ধীজীর আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছেন। ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। পণ্ডিতজীর উদ্যম ছিল ক্লান্তিহীন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। তিনি দেশ ও বিশ্বের মঙ্গলচিন্তায় মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী বলিতেন, 'সচেতন নির্ভেজাল ঐক্যবোধকে বিশ্বমানবতার ছাঁচে ঢালিতে পারিলেই সত্যকার বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে'। শান্তিময় জগৎ গঠনই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাই দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তিনি বিশ্বজনমানসে এক অক্ষয় আসনের অধিকারী হইয়া থাকিবেন।

"জয়হিন্দ"

পঞ্চম খণ্ড

বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

মানুষ শিল্পী। আবহমান কাল ধরে সে নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করে চলেছে। সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র, সাহিত্য ইত্যাদি সকলই মানুষের শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর। জীবন-ধারণের জন্য যুগে যুগে মানুষকে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু কোন কালের মানুষই কেবলমাত্র খেয়ে প'রে বেঁচে থাকাকেই জীবনের চরম বলে মনে করে নি। জীবন সংগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে সে আপন সৌন্দর্য ও আনন্দানুভূতিকে রূপ দিয়েছে বিভিন্ন এবং বিচিত্র শিল্পে। এই ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সে আপন শিল্পলোক সৃষ্টি করে নিয়েছে।

সংকীর্ণ অর্থে জীবন হ'ল এ পৃথিবীতে টিকে থাকা। আর ব্যাপক অর্থে জীবন হ'ল, নানা কল্পনার আলোকে অমৃতপিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টা। ব্যাপক অর্থের আশ্রয়ীকৃত হ'ল সাহিত্য শব্দটির অভিধানগত অর্থ হ'ল জীবনচর্চা। মানবমনের ইঙ্গিত সত্য সুন্দরের সমন্বয়ে জীবনের সাধ সাধনা, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বচ্ছ শিল্পদৃষ্টিতে প্রোজ্জ্বল করে সহৃদয় সম্মুখে পরিবেশন করা। মহাভারতের যুগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখাবার যে দায় নিয়েছিলেন, এ যুগের সাহিত্য সে দায় নিয়েছে।

চারিদিকে প্রবহমান মানবজীবন সাহিত্যে রূপ পায়। এই জীবন জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বলা যেতে পারে যে, জগৎ এবং জীবনের ভিত্তিতে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। জগৎ এবং জীবন থেকে সাহিত্য রচনা করবার মত উপাদান সংগ্রহ করে সাহিত্যিক সৃষ্টি করেন শিল্পলোক।

কিন্তু কোন সৃষ্টিই অকস্মাৎ সম্পূর্ণ হতে পারে না। সূচনার পর থেকে বিকাশ-বিস্তৃতি এবং উন্নয়নের পথ বহু পরিবর্তন, বিবর্তন বা রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত। যে বীজ আজ অংকুরিত হয়েছে, পূর্ণ মহীরুহে পরিণত হওয়ার জন্য তাকে অনেক ঝড়-জলের আঘাত, অনেক আলো-হাওয়ার স্পর্শ, অনেক পরিবর্তন-রূপান্তরের পথ অতিক্রম করে যেতে হবে। কলিও অকস্মাৎ প্রস্ফুটিত হয় না। মুদিত কলি ধীরে ধীরে এক সময় শতদলে পরিণত হয়। যে কোন সৃষ্ট বস্তু সম্পর্কেই একথা বলা যেতে পারে। অতীত সাধনা ভবিষ্যতে একদিন সিদ্ধিলাভ করে। সাহিত্য সাধনাও শুরুতেই সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। পরিণত শিল্প-সুষমালাভ করবার জন্য সাহিত্যকেও ইতিহাসের বিভিন্ন রূপান্তরিত পথ অতিক্রম করে আসতে হয়। অতএব দেখা

যাচ্ছে যে, মানুষের জীবনের সঙ্গে তার সাহিত্যেরও ইতিহাস আছে। যেমন জীবন ও জগতের ভিত্তিতে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, তেমনি জীবন তথা সমাজও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পূর্বেই বলেছি, সাহিত্য-শিল্পী জীবন ও জগৎ অর্থাৎ সমাজ রাষ্ট্র থেকেই তার সাহিত্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন. কিন্তু যত বৈপ্লবিক পরিবর্তনই সাহিত্যের ইতিহাসে নেমে আসুক না কেন, গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ব্যাপক পরিবর্তন বা রূপান্তরের পরেও অতীতের সঙ্গে কোথাও না কোথাও একটা যোগসূত্র রয়েছে। শূন্য বায়বীয় মণ্ডলে গৃহ নির্মাণ করা যেতে পারে না। উৎসকে অস্বীকার করে ধারাবাহিক ক্রমাগ্রগতি হতে পারে না। সাহিত্যের ঐতিহাসিকের তাই কর্তব্য এই সকল যোগসূত্রগুলিকে আবিষ্কার করা। এখানে বলা যেতে পারে যে যে কোন ইতিহাস পাঠের পশ্চাতে একদিকে যেমন থাকে অতীত কৌতূহল, অপরদিকে তেমনি থাকে ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করে পরিণতি পর্যন্ত বিভিন্ন যোগসূত্রগুলিকে জানা। সাহিত্যের ইতিহাস থেকেও তাই একদিকে যেমন অতীত জীবনের সাহিত্যকে জানা যেতে পারে, অপরদিকে তেমনি সাহিত্যের ইতিহাসের সমগ্র পথটির ক্রমাগ্রগতিরও পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। কী করে কোন্ দেশের সাহিত্য তার বর্তমান যুগ পর্যন্ত পৌছেচে, কবে কোথায়, কী ভাবে প্রথম তার সাহিত্যের বীজ অংকুরিত হয়েছিল এবং তারপর কত রকম পরিবর্তন বা রূপান্তর তার ইতিহাসে এসেছে, এসব কিছুকে জানাই সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকের সাধারণ কর্তব্য।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানতঃ তিনটি যুগে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে। কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ লক্ষ্য করে এই যুগ বিভাগ করা হয়েছে। আদি যুগের সাহিত্য ছিল প্রধানতঃ ধর্মনির্ভর। মানুষ তখনও তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়নি। প্রকৃতি রাজ্যের অনেক রহস্যই সেদিনের মানুষের নিকট ছিল অবগুণ্ঠিত। প্রাকৃতিক নানা বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো সাহস বা শক্তি সেদিনের মানুষের ছিল না। সেদিন মানুষ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। অসহায় মানুষ জীবনের নানা বাধা-বিপত্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অতিমাত্রায় দেবভক্ত হয়েছিল। স্বভাবতই তাদের রচিত সাহিত্যেও এই দেবপ্রাধান্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র অলৌকিক দেবতার কথা নিয়েই সাহিত্য রচিত হতে পারে না। ধর্মপুস্তক ও সাহিত্য এক নয়। আদিযুগের সাহিত্যে দেবপ্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে যে মানবিক আর্তিটুকু প্রবেশ করেছে, সেইজন্যই সেগুলি সাহিত্য-পদমর্যাদা পেয়েছে। বলা চলে যে আদিযুগে দেববাদ নির্ভর সাহিত্য রচিত হয়েছে।

মধ্যযুগের সাহিত্যে অনেকাংশ জুড়ে আছে মানুষ। আদিযুগের দুর্বলতা অনেকটা কেটে গেছে। মানুষ তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু সচেতন হতে আরম্ভ করেছে। তাই দেবতাকে উদ্দেশ্য করে সাহিত্য রচিত হলেও মানবিক সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার স্পর্শে দেবতার প্রভাব অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে দেববাদ নির্ভর মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

আধুনিক যুগের মানুষ আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই এতদিন সাহিত্যে যে স্থান দেবোপম মানুষ অধিকার করে বসেছিল, আধুনিক যুগের সাহিত্যে সে স্থান দখল করেছে মর্ত্যমানুষ। মানুবজীবনের বিচিত্র কথায় এ যুগের সাহিত্য রচিত হয়েছে। এক কথায় আধুনিক যুগের সাহিত্যে অবিমিশ্র মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা।

মোটামুটি ভাবে সাহিত্যের যুগবিভাগ ও বিভিন্ন যুগবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা হল। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের গতি এত জীবন্ত যে বার বার তার নানা-রূপ আকারগত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সেইজন্য প্রধানত এই তিনটি যুগকে স্বীকার করে নিয়েও, সাহিত্যরসিকেরা বিভিন্ন রূপান্তর লক্ষ্য করে সাহিত্যের ঐতিহাসিক যুগকে আরও অন্যান্য নামে নামাঙ্কিত করেছেন। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে, সে যুগের নাম দেওয়া হয়েছে চৈতন্য যুগ। আবার লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য বাঙলায় গড়ে উঠেছে, সে সাহিত্যকে রবীন্দ্রযুগ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সাহিত্যের এই সকল যুগ বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা অনেক বিস্তৃতি সাপেক্ষ এবং আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিধিতে তা সম্ভব নয়। এখানে কেবলমাত্র একটি রেখাচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা গেল।

খ্রীষ্টাব্দ ভাগ করে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের প্রধান তিনটি যুগকে নিম্নোক্তরূপে দেখানো যেতে পারে :

১। আদিযুগ—(আনুমানিক ৯০০ হতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)

২। মধ্যযুগ—(আনুমানিক ১২০০ হতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে)

৩। আধুনিকযুগ—(১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে বর্তমান পর্যন্ত)

বাঙলা ভাষার উদ্ভব

(খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে আর্যগণ ভারতে আসেন। তখন তাঁরা যে ভাষায় কথা বলতেন, সে ভাষার নাম বৈদিক ভাষা। ঐ ভাষাতে বেদ রচিত হয়েছিল বলে উক্ত ভাষাটির নাম হল বৈদিক ভাষা। বৈদিক ভাষা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও নীরস।) তাই তৎকালীন পণ্ডিত মহল এবং সাহিত্যসেবীরা ঐ ভাষাটিকে সংস্কৃত করে সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত করে তুললেন। এ বিষয়ে

শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের দাবী রাখেন বৈয়াকরণ পাণিনি। সংস্কৃত শব্দের অর্থই হল মার্জিত। এইভাবে বৈদিক ভাষাকে মার্জিত করে সৃষ্টি হল সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষাতে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হ'তে থাকল।

কিন্তু কোন দেশেই সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার সমতা থাকে না। বিশেষ করে সংস্কৃতের মতো অভিজাত শ্রেণীর ভাষা ব্যবহার করা সাধারণ মানুষের সাধ্য ছিল না। সাধারণ মানুষেরা তাই তাদের সুবিধানুযায়ী সংস্কৃত ভাষাকে রূপান্তরিত করে অন্য এক ভাষায় কথাবার্তা বলতো। অভিজাত সংস্কৃত মহল ঐ অভিজাত ভাষার নাম দিলেন প্রাকৃত ভাষা। প্রকৃতি শব্দের একটি অর্থ প্রজা-সাধারণ এবং প্রজাসাধারণের কথ্য ভাষা বলে ঐ ভাষার নাম রাখা হল প্রাকৃত।

কালক্রমে এই প্রাকৃত ভাষাতেও সাহিত্য রচিত হল এবং বিভিন্ন প্রদেশে ঐ ভাষা রূপান্তরিত হয়ে অপভ্রংশ ভাষা রূপে পরিচিত হল। মগধ অঞ্চলে তখন যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তার নাম মাগধী অপভ্রংশ এবং এই মাগধী অপভ্রংশ ভাষা থেকেই ধীরে ধীরে আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে আমরা যে বাঙলা ভাষায় কথা বলি বা সাহিত্য রচনা করি, শুরুতে কিন্তু বাঙলা ভাষার এই রূপটি ছিল না। দু'টি স্তর (আদিস্তর ও মধ্যস্তর) অতিক্রম করে বাঙলা ভাষা আজকের এই বলিষ্ঠরূপে পরিণত হয়েছে। সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবার সময় আমরা ভাষার এই স্তরবিভাগগুলি লক্ষ্য করব। লক্ষ্য করব ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরিবর্তিত পথ বেয়ে বাঙলা ভাষা কেমন করে আজকের বাঙলাতে পরিণত হয়েছে।

॥ চর্যাপদ ॥

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' এবং আদিযুগের বাঙলা সাহিত্যের এটি প্রধানতম নিদর্শন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রাচীনতম গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন নেপালের রাজদরবার থেকে। এটি কতক-গুলি গীতের আকারে লেখা পদ-সংকলন। প্রত্যেকটি পদের পূর্বে কোন্ রাগে গাইতে হবে, তার উল্লেখ আছে। পুঁথিটিতে পঞ্চাশটি পদ ছিল। কিন্তু সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে। এই পদসংকলন একই কবির রচনা নয়। বিভিন্ন পদে বিভিন্ন পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধককবিগণ এই পদগুলি রচনা করেছিলেন। এতে বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায় এবং এ কারণেই এর অর্থ উদ্ধার করা সহজ নয়। বিশেষতঃ পদকর্তাগণ অধিকাংশ কথাই হেঁয়ালির আকারে বলতে চেয়েছেন

বলে প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা সত্যই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে ভাষায় চর্যাপদ রচিত সে ভাষাকেও 'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'আলো আঁধারি ভাষা' বলা হয়। যেমন :

'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥'

যার আধুনিক বাঙলা রূপ :

কায়া রূপ তরুবর, পাঁচ তার ডাল।
চঞ্চল চিত্ত মাঝে পশে আসি কাল॥

(মনীন্দ্রমোহন বসু-কৃত অনুবাদ)

আর একটি উদাহরণ :

'উঁচা উঁচা পাবত তাহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥'

আধুনিক বাঙলা রূপ :

উঁচা পাহাড়েতে বসতি করিছে
সবরী নামেতে বালা।
ময়ূরের পাখ করি পরিধান
গলেতে গুঞ্জার মালা॥

(মনীন্দ্রমোহন বসু কৃত অনুবাদ)

চর্যাপদ ধর্ম নির্ভর হলেও মাঝে মাঝে এর মধ্যে মানবিক সুখ-দুঃখের কথা প্রবেশ করেছে। বাঙলা সাহিত্যের উষালগ্নে ধর্মের উপলব্ধির সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে দিয়ে চর্যাপদ রচয়িতারা এক অক্ষয় সাহিত্যকীর্তি রেখে গেছেন। প্রাচীনতম বাঙলা গ্রন্থের নিদর্শনরূপেও এর মর্যাদা এবং মূল্য কম নয়।

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে যে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের অভ্যুদয় হয়েছিল, যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করে আজও পর্যন্ত পল্লী বাঙলায়, নগর বাঙলায় সেই মধুর রসধারা প্রবাহিত। বৈষ্ণব পদসাহিত্য তার মর্মস্পর্শী গীতি আকুলতা দ্বারা ভাবাবেগ প্রধান, রসিক বাঙালী মানসকে সর্বকালে আলোড়িত করেছে। মধুর পদাবলী রচয়িতা কবি চণ্ডীদাসের নাম জানে না, এমন বাঙালী খুঁজে পাওয়া কষ্ট হবে। অথচ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই 'চণ্ডীদাস'ই এক বৃহৎ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৩০৬ বঙ্গাব্দে রাজা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলার কোকিল্যা গ্রামের এক গোয়ালঘর থেকে বড় চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পুঁথি আবিষ্কার

করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের নাম রাখেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা এই পুঁথিতে বিস্তৃত আকারে বর্ণিত আছে। কিন্তু পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের মধুবর্ষী পদসমূহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাব-ভাষা ও রচনা ভঙ্গি প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমূল পার্থক্য রয়েছে। তাই মনে হয় বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্ততঃ দু'জন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। কবি 'দানখণ্ড', 'তাম্বুলখণ্ড', 'বংশীখণ্ড', 'বিরহখণ্ড' ইত্যাদি নামে খণ্ডগুলিকে ভাগ করেছেন। এ কাহিনীর বৈশিষ্ট্য শ্রীরাধার চরিত্র। শ্রীরাধার একটি পূর্ণরূপ এই কাহিনীতে কবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা অন্যান্য বৈষ্ণবকাব্যে পাওয়া যায় না। অনেকে এই কাহিনীটিকে অশ্লীল কাব্য বলে অপাংক্তেয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু এমন একটি সুপরিকল্পিত কাহিনী মাঝে মাঝে কবিত্বশক্তির আশ্চর্য প্রকাশ এবং সমকালীন সমাজের বাস্তবচিত্রকে অশ্লীল বলে সাহিত্যসমাজ থেকে বিদূরীত করা চলে না। আসলে এই কাব্য-কাহিনীর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন জীবন-রসিক শিল্পী।

বড় চণ্ডীদাস কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পদাংশ উল্লেখ করে এখানে দেখানো যেতে পারে:

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥'

আধুনিক বাঙলা রূপ:

বাজায় কে বাঁশী বড়ায়ি কালিন্দী নদীর কূলে।
বাজায় কে বাঁশী বড়ায়ি এ গোষ্ঠ গোকুলে ॥

চর্যাপদের ভাষা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার প্রাঞ্জলতা লক্ষণীয়।

অন্যান্য উদাহরণ:

(ক) 'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ [মো] য়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিব শঙ্খচুর ॥'

(খ) 'দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে ॥'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য

মধ্যযুগেরবাঙালা সাহিত্যে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান শাখার পরিচয় পাওয়া যায়: (১) মঙ্গলকাব্য, (২) বৈষ্ণব সাহিত্য ও (৩) অনুবাদ সাহিত্য।

বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন করে মঙ্গলকাব্য নামে এক শ্রেণীর সাহিত্য মধ্যযুগের বাঙলায় দেখা গিয়েছে। ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি এইসকল মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী। মানুষের মঙ্গলের জন্য এইসব দেব-দেবীদের পূজা করা হত এবং কাব্যসমূহে এদের মাহাত্ম্যকীর্তন করা হত। লুপ্ত প্রায় এ সকল দেব-দেবীদের চিহ্ন এখনও পল্লী বাঙলায় কিছু কিছু বর্তমান আছে

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে বৈষ্ণবপদসাহিত্য এবং শ্রীচৈতন্যের জীবনকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব পদসাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যসমূহের সঙ্গে একাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং এগুলি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল ঐশ্বর্যরূপে বিরাজিত থাকবে। বাঙালী-মানস যুগে যুগে এইসব মধুবর্ষী পদাবলী থেকে মধুপের ন্যায় মধু আহরণ করে নিজেদের ধন্য করেছে। শ্রীচৈতন্যকে মধ্যযুগের বৈষ্ণবেরা অবতাররূপে মনে করতেন। সন্দেহ নেই যে, মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিলেন এই দেবোপম মহাপুরুষ। ভক্তেরা ভক্তির আতিশয্যবশতঃ শ্রীচৈতন্যের জীবনকাব্যের মধ্যে আলৌকিকত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তথাপি এর মধ্য থেকেও প্রেমমন্ত্র সাধক মানুষ শ্রীচৈতন্যকে আবিষ্কার করতে কষ্ট হয় না। ইতিহাসের উপাদান এবং ভক্তের ভক্তি দুই-ই এই জীবনীকাব্যসমূহে বর্তমান।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের আর একটি শাখা অনুবাদ সাহিত্য। বাল্মীকি কৃত সংস্কৃত রামায়ণ এবং ব্যাসদেব কৃত সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। কোন ভাষাই আপন সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না। বিভিন্ন ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসমূহ থেকে অনুবাদ করলে ভাষার সংকীর্ণ সীমানা প্রসারিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারত বাঙলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার ফলে বাঙলা ভাষার পরিধি বৃহত্তর হয়েছিল সন্দেহ নেই। তা'ছাড়া গৌড় তথা বাঙলার সংস্কৃত অজ্ঞ প্রকৃতিপুঞ্জ রামায়ণ-মহাভারত রূপ দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের অমৃতরস হতে বঞ্চিত ছিল। বাঙলায় এই দুই মহাকাব্য অনূদিত হওয়ার ফলে তারা সেই অমৃত রস পান করতে সক্ষম হয়। অনুবাদের ফলে অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গেও বঙ্গ-মানস পরিচিত হতে পেরেছিল।

মঙ্গলকাব্য

দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য-কীর্তনই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। মঙ্গল শব্দের অর্থ বিজয় এবং যেহেতু দেব দেবীর বিজয়গান রচনা করাই কবিদের উদ্দেশ্য, সেহেতু এই কাব্যসমূহকে মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত করা হয়। কেউ কেউ আবার বলেন যে, যেহেতু মানুষের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এই কাব্যসমূহে দেব-দেবীর মহিমা কীর্তিত হয়েছিল, সেহেতু এগুলির নাম হয়েছে মঙ্গলকাব্য।

উক্ত দু'টি সংজ্ঞারই যাথার্থ অস্বীকার করবার উপায় নেই। মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেব দেবীর বিজয়গাথা বর্ণনা করাই যে এ সকল কাব্যের উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজয়গাথা বর্ণনার পশ্চাতে ছিল মানুষের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা। নিয়তি-পীড়িত মানুষ জীবনের নানা দুঃখ কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং মাহাত্ম্য কীর্তন করতে আরম্ভ করেছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করলে দেব বা দেবী তুষ্ট হবেন এবং পরিণামে তাদের মঙ্গল সাধিত হবে। আর দেব-দেবীর আরাধনা এবং বিজয়কীর্তন না করলে পরিণামে ঘোর অমঙ্গল হবে। মঙ্গলকাব্যসমূহ পাঠ করলে এই সত্যই উপলব্ধ হয়।

অনার্য-কল্পনাপ্রসূত এইসব বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা বা মঙ্গলকীর্তন আর্য প্রভাবেও স্তিমিত হয়ে যায়নি। পল্লী বাঙলার নিভৃত অন্তঃপুরে মানুষের মঙ্গলের জন্য এইসব দেব-দেবীরা যুগের পর যুগ পূজিত হতে লাগলেন। কালক্রমে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে এইসব অনার্য সংস্কৃতির একটি মিলন গড়ে উঠতে লাগল। কবিরা মঙ্গলকাব্যসমূহে দেব-দেবীদের জয়গাথা রচনা করতে লাগলেন। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য এবং প্রচণ্ড শক্তির কাহিনী এইসব কাব্যে রচিত হতে লাগল।

দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে এই মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হলেও মানুষের কথাই এইসব কাব্যে বড় হয়ে উঠেছে। মানুষের দুঃখ-লাঞ্ছনা আশা-নিরাশা, সুখ-সমৃদ্ধির কথা দেবতাকে উপলক্ষ্য করে কবিরা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। মনসামঙ্গলের চন্দ্রধর দেবীবিদ্রোহী পরাজিত মানবের এক করুণ চিত্র। চণ্ডী-মঙ্গলের কালকেতু ফুল্লরার নিদারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ এবং পরে সুখ মানবজীবনের এক জীবন্ত আলেখ্য। স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে ধীরে ধীরে মানুষ তার আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। মঙ্গলকাব্যসমূহের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো—এইসব কাব্যের নায়ক-নায়িকারা প্রায়ই নীচ কুলজাত, যদিও রচয়িতারা অধিকাংশই ছিলেন উচ্চ কুলোদ্ভব।

১। মনসামঙ্গল কাব্য

মনসামঙ্গলের কাহিনী

মনসা সর্পের দেবী। পদ্মবনে জন্ম হয়েছিল বলে মনসার অপর নাম পদ্মা এবং মনসামঙ্গল পদ্মপুরাণ নামেও পরিচিত। এ ছাড়া তিনি বিষহরী, জাগুলি প্রভৃতি নামেও পরিচিতা। সর্পভীত মানুষেরা সর্পদেবী মনসা পূজার প্রচলন করেছিল। এই জল-জঙ্গলের দেশে বিষধর সর্পের অভাব নেই এবং সর্পাঘাতে অনেক মানুষকে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। উপায়ান্তর না দেখে এই নিষ্ঠুর আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তাই সর্পদেবী মনসার পূজা প্রচলিত হল এবং মনসামঙ্গলে দেবী-মাহাত্ম্য কীর্তিত হল।

মনসা শিবকন্যা। কিন্তু তিনি ছিলেন নাগলোকে। একদিন বনে ফুল তুলতে গিয়ে শিবের সঙ্গে মনসার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। মনসা পিতার সঙ্গে পিতৃগৃহে যেতে চাইল। পিতা মনসাকে কৈলাসে নিয়ে এলেন। কিন্তু সৎমা চণ্ডী মনসাকে আশ্রিত দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। প্রায়ই দু'জনে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকতেন। অবশেষে একদিন চণ্ডী খোঁচা মেরে মনসার এক চোখ কানা করে দিলেন। ঘরে এই ভীষণ কাণ্ড দেখে শিব মনসাকে এক পাহাড়ে রেখে এলেন। আসার সময় কন্যার দুর্দশার কথা ভেবে এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্লেন। সেই অশ্রুবিন্দু থেকে মনসা পরিচারিকা নেতার জন্ম হল। এদিকে সাগর মন্থনোদ্ভূত বিষ পান করে শিবের হল মৃত্যু। বিষহরী মনসা এসে পিতা শিবকে বাঁচালেন। এতে মা চণ্ডীর সঙ্গে মনসার পূর্ব বিবাদের আপোষ হয়ে গেল। শিব জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিয়ে দিলেন। দেবসভায় মনসার স্থান হল। এবার মনসা মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচারে মন দিলেন।

গাঙ্গুর নদীর তীরে ছিল চম্পাই গ্রাম। সে গ্রামে চাঁদসদাগর নামে এক বণিক বাস করত। প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিল এই চাঁদবেনে এবং সমাজের সে ছিল নেতা। ঘরে তার লক্ষ্মী অচলা। সাত পুত্র তার ঘর আলো করে আছে, সপ্তডিঙা মধুকর ভাসিয়ে চাঁদসদাগর বাণিজ্যযাত্রা করে। এই চাঁদসদাগর ছিল শৈব। মনসা ভাবলেন যে এই বণিককে দিয়ে তার পূজা করাতে পারলে মর্ত্যে মনসাপূজার প্রচলন করতে আর কষ্ট হবে না। কিন্তু পরম শৈব চাঁদসদাগর কিছুতেই মনসার পূজা করতে রাজী হলেন না। চাঁদের স্ত্রী সনকা গোপনে মনসার পূজা করত। চাঁদ সে খবর জানতে পেরে লাথি মেরে মনসার পূজার ঘট ভেঙ্গে দিলেন। কুপিতা মনসা এবার চারিদিক থেকে বিদ্রোহী চাঁদসদাগরকে বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করলেন।

তিনি তার সকল বাণিজ্য তরী ডুবিয়ে দিলেন অতল জলে। ঘর আলো করা ছয় পুত্রের প্রাণ হরণ করলেন। চাঁদের শ্রীপূর্ণ ঘর একেবারে শ্রীহীন হয়ে গেল। এত আঘাত সত্ত্বেও দৃঢ় পৌরুষের অধিকারী চাঁদসদাগর কিন্তু মনসার পূজা করলেন না। এক শুভদিনে তিনি শেষ পুত্র লখিন্দরের বিয়ে দিলেন উজানী নগরের সাধু সদাগরের কন্যা বেহুলার সঙ্গে। বেহুলা সুলক্ষণা এবং অসামান্য রূপবতী ছিলেন।

মনসা যা'তে লখিন্দর বা বেহুলার কোন ক্ষতি করতে না পারে এজন্য চাঁদসদাগর সাস্তালি পর্বতে লৌহবাসর নির্মাণ করালেন এবং নিজে হেঁতালের লাঠি নিয়ে বাসরঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু এত করেও চাঁদ সদাগর লখিন্দরকে বাঁচাতে পারলেন না। গোপন ছিদ্র দিয়ে মনসার কালনাগ লখিন্দরকে দংশন করে এল। লখিন্দরের মৃত্যু হল আর দুর্ভাগ্যবতী বেহুলা বাসরঘরে হল বিধবা।

স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে বেহুলা এবার ভাসলেন গাঙ্গুরের জলে। কতজনে কত অনুরোধ করল বেহুলাকে ঘরে ফিরে যেতে। কিন্তু স্বামী সোহাগিনী বেহুলা কারও কথা শুনলেন না। স্বামীকে বাঁচিয়ে আনবে এই তাঁর পণ। রাত্রিদিন কলার ভেলায় মৃত স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে ভেসে চললেন বেহুলা। দিনে দিনে দেহ পচে যেতে লাগল। গলিত মাংসের গন্ধ পেয়ে শকুন ছুটে আসতে লাগল। বেহুলা আঁচল দিয়ে স্বামী দেহ ঢেকে রাখলেন। ক্রমে ভেলা এসে গেল সাগরসঙ্গমে।

বেহুলা দেখলেন ঘাটে এক ধোপানী কাপড় কাচছে। তার কোলের ছেলে তাকে বিরক্ত করাতে এক সময় সে তাকে মেরে ফেলল। কাপড় কাচা শেষ হয়ে গেলে সে আবার ছেলেটিকে বাঁচিয়ে তুলল। এ ধোপানী হচ্ছে মনসা পরিচারিকা সেই নেতা। বেহুলা তার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তার কাছে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। নেতা বললে যে একাজ একমাত্র মনসা দেবীর দ্বারাই সম্ভব। নেতার সাহায্যে বেহুলা স্বর্গে এসে উপনীত হলেন। সেখানে নৃত্যগীত প্রদর্শন করে বেহুলা দেবতাদের তুষ্ট করলেন। দেবতাদের অনুরোধে মনসা এবার লখিন্দর এবং তার অন্যান্য ভাইদের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন। কিন্তু এক সর্তে। চাঁদসদাগরকে মনসার পূজা করতে হবে। বেহুলা বললেন যে তিনি শ্বশুরকে দিয়ে মনসার পূজা করাবেন। একথা শুনে মনসা সকল ভাইয়ের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। ডুবে যাওয়া সপ্তডিঙ্গা আবার ভাসিয়ে দিলেন। চম্পাই গ্রামে আনন্দের উচ্ছ্বাস বয়ে যেতে লাগল। পুত্রবধূর অনুরোধে চাঁদসদাগর এবার

মনসাপূজা করতে রাজী হলেন। কিন্তু যে ডান হাতে তিনি শিবের আরাধনা করেন, সে হাতে নয়। বা হাতে তিনি কানী মনসার পূজা করলেন।

মনসামঙ্গলের কাহিনী চাঁদসদাগর এক পৌরুষের প্রতীক। চরিত্রের এই দৃঢ়তার জন্য চাঁদসদাগর দেবতা অপেক্ষাও অনেক উচ্চ আসেন অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অজস্র দুঃখের মধ্যেও তাঁর উন্নত মাথা অবনমিত হয়ে যায়নি। মনুষ্যত্বের শক্তিতে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী এবং দেব বিদ্রোহী। কিন্তু দেবতার নিষ্ঠুর চক্রান্তের কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। নিগৃহীত মানবের জীবন বাণী চাঁদসদাগরের চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

বেহুলা চরিত্রও আপন ব্যক্তিত্বে মহান। অসূর্যম্পশ্যা বাঙলার পল্লীবধূ সে নয়। ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামে সে পরাঙ্মুখ নয়। সে শক্তিময়ী, কিন্তু রুক্ষ নয়। স্বামীর প্রতি তার গভীর প্রেম। সেই একনিষ্ঠ প্রেম তাঁকে অসাধ্যসাধনে ব্রতী করেছে। সেই ব্রতে সে অবিচলিত। কঠোর নিপীড়নের মধ্যেও আপন সাধনায় সে রত। বেহুলার চরিত্র-মাহাত্ম্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। বরং মনসা চরিত্রকেই তুলনায় অনেক ছোট বলে মনে হয়েছে মনসামঙ্গলে। সহজ উপায়ে পূজা প্রচারের সম্ভাবনা নেই দেখে তিনি যে কোন নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করতে পারেন। আপন দৈবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দৃঢ় পৌরুষকে অবনমিত করেন। কিন্তু চাঁদসদাগর বা বেহুলা পাঠকের কাছ থেকে যে অশ্রুসজল সহানুভূতি আদায় করতে পারেন, মনসা তা পারেন না। দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করতে গিয়ে এভাবে মনসামঙ্গলে মানুষের কথাই বড় হয়ে উঠেছে।

মনসামঙ্গলের কবি

মানব-জীবন রসে পূর্ণ মনসামঙ্গলের এই চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিয়ে বাঙলা দেশের অনেক কবিই কাব্য রচনা করেছেন। তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হোল।

১। কানাহরি দত্তঃ কানাহরি দত্তকে মনসামঙ্গলের আদি কবি বলা যেতে পারে। অবশ্য কানাহরি দত্ত রচিত মনসামঙ্গলের কোন আস্ত পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন। তবে তিনি যে মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন তা বিজয় গুপ্তের ভণিতা থেকেই জানা যায়ঃ

"মূর্খে রচিল গীত না জানে বৃত্তান্ত
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত।"

অবশ্য কানাহরি দত্তের সম্বন্ধে বিজয় গুপ্তের এই উক্তিকে সার্থক বলে মনে করা

যায় না। কবিত্বের বা পাণ্ডিত্যের দৈন্য কানাহরি দত্তের ছিল বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ ময়মনসিংহ জেলাতেই এ কবির জন্ম হয়েছিল।

২। **নারায়ণ দেব** : নারায়ণ দেবকে মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলা যেতে পারে। নারায়ণ দেবের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে সংশয় বর্তমান। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় বোরগ্রামে কবির বসতি ছিল। মনসামঙ্গলকাব্য করুণারসে পূর্ণ। নারায়ণ দেবের কাব্যে এই করুণ রসের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়।

৩। **বিজয় গুপ্ত** : মনসামঙ্গল রচয়িতা নারায়ণ দেবের পরবর্তী কবি বিজয় গুপ্ত। বরিশাল জেলার গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে কবির বসবাস ছিল। এই গ্রামে অদ্যাবধি বিজয় গুপ্ত পূজিত মনসাদেবীর মূর্তি আছে। কবির পিতার নাম ছিল সনাতন এবং মাতার নাম রুক্মিণী। কবি বৈদ্য বংশজাত। বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলের একজন বিখ্যাত কবি। কবির রচনায় বাস্তবানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষা তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন বলে মনে হয়।

৪। **দ্বিজ বংশীদাস** : দ্বিজ বংশীদাস ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও মনসামঙ্গলের একজন বিখ্যাত কবি। অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিক সুরে তাঁর কাব্যখানি হৃদয়গ্রাহী। কথিত আছে যে দ্বিজ বংশীদাসের মুখে বেহুলা ভাসানের নাম শুনে কেনারাম নামে এক দস্যু ভালো হয়ে গিয়েছিল। কবির কন্যা চন্দ্রাবতীও বাঙলার লোক সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

৫। **কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ** : ক্ষেমানন্দ নামের উপাধি ছিল হয়তো। কেতকা শব্দের অর্থ মনসা। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী

মনসামঙ্গলের কাহিনী অপেক্ষা চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী আরও দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। অরণ্যচারী ব্যাধ জাতি প্রথমে চণ্ডীর উপাসনা করত। পরে আর্যধর্মে চণ্ডী দেবী প্রভাব বিস্তার করেন এবং বণিক সম্প্রদায় চণ্ডীর উপাসনা আরম্ভ করেন। চণ্ডী শিবপত্নী। মনসামঙ্গলে চণ্ডীর সঙ্গে মনসার বিরোধের যে সংবাদ পাওয়া যায়, এখানে তার কোন পরিচয় নেই। তিনি এক ধারে মানুষ ও পশুর ত্রাণকর্তা ও ঐশ্বর্যদাত্রী। দেবী মনসার মতো ক্রোধান্ধতা তার ছিল না। কৌতুক দেখার জন্য তিনি ভক্তদের

পরীক্ষা করেন এবং মাতৃঅন্তরের করুণা প্রকাশ করে তাদের রক্ষা করেন, তাদের সুখ সমৃদ্ধ করেন। চণ্ডীমঙ্গলে দু'টি কাহিনী রয়েছে। প্রথমটি কালকেতুর উপাখ্যান এবং দ্বিতীয়টি ধনপতি সদাগরের কাহিনী। সংক্ষেপে ঐ দু'টি কাহিনী এখানে উপস্থিত করা হল।

॥ কালকেতুর উপাখ্যান ।

কালকেতু ও তার স্ত্রী ফুল্লরা ব্যাধ রমণী। বনে পশু শিকার এবং মাংস বিক্রি করে এরা জীবনধারণ করতো। সংসারে তাদের অভাব। এদিকে কালকেতুর নিষ্ঠুর আক্রমণে এবং প্রাণ সংহারের ফলে বনের পশুকুল আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। বনের সমস্ত পশুরা তাই চণ্ডীর কাছে গিয়ে তাদের দুর্দশার কথা জানালো। তাদের আবেদন শুনে দেবী তাদের অভয় দিলেন রক্ষা করবেন বলে।

পরদিন কালকেতু শিকারে গিয়ে কোন শিকার না পেয়ে মনের দুঃখে যখন বনের পথ দিয়ে হাঁটছে, তখন একটি স্বর্ণগোধিকা দেখতে পেল। ভাবলে একে পুড়িয়েই খাওয়া যাবে। স্বর্ণগোধিকাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এসে কালকেতু গেল বাজার করতে। এদিকে ঘরে চাল নেই। ফুল্লরা তাই গেল পড়শীর কাছে চাল ধার করে আনতে।

স্বর্ণগোধিকা কিন্তু আর কেউ নয়। দেবী চণ্ডী স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশ ধরেছিলেন। ফুল্লরা ঘরে এসে দেখে স্বর্ণগোধিকার পরিবর্তে এক পরমাসুন্দরী রমণী ঘর আলো করে বসে আছে। ফুল্লরা সেই রমণীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে যে, কালকেতু তাকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছে। একথা শুনে পতি সোহাগিনী ফুল্লরার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। তার পতির সোহাগের ভাগ অন্য কোন রমণী পাবে, এটা সে ভাবতেও পারে না। তাই সে নানারকম ভাবে সেই রমণীকে বিদায় করে দিতে চাইল। বললে ব্যাধ জীবনের দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্যের কথা জেনেও কেন এত কষ্ট সে রমণী ভোগ করতে যাবে। সুন্দরী রমণী কিন্তু নড়ে না। সে স্বেচ্ছায় ফুল্লরার স্বামীর ঘরে আসেনি। আর নিজের ভালোমন্দ সে নিজেই বুঝে। উপায়ান্তর না দেখে ফুল্লরা তাই ছুটে গেল কালকেতুর সন্ধানে। পথে কালকেতুর সঙ্গে দেখা হলে ফুল্লরা তাকে সব কথা বললে। কালকেতুও ঘরে এসে সুন্দরী রমণীকে চলে যেতে বলল। সুন্দরী রমণীর কিন্তু তখনও ঘর ছেড়ে চলে গেল না। অবশেষে অনেক অনুরোধের পরেও রমণী যখন ঘর ছেড়ে নড়বার কোন উপক্রম করলো না, তখন ব্যাধ কালকেতু ধনুতে শর জুড়ে দিল।

সেই মুহূর্তে দেবী চণ্ডী আপন মূর্তিতে প্রকাশিত হলেন। কালকেতুর চরিত্র পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কালকেতুকে তিনি একটি আংটি উপহার দিলেন।

সেই আংটি নিয়ে গেল বেনের কাছে বিক্রী করতে। চতুর বেনে কি সহজে দাম দিতে চায়। শঠ বেনে আংটি দেখে বলে—

"সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছে উজ্জ্বল।" (মুকুন্দরাম)

যাই হোক অবশেষে কালকেতু আংটি বিক্রি করে সাতঘড়া মোহর পেল। দেবীর আদেশে ঐ অর্থ দিয়ে বন কাটিয়ে গুজরাট নগরে নূতন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল। রাজ্যে দেবী চণ্ডীর দেউল স্থাপন করা হল। বহু লোক এল রাজ্যে বসতি করতে। এদের মধ্যে একজন ছিল শঠ বনিক ভাড়ু দত্ত। কালকেতুর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে প্রজাদের উপর নানারকম অত্যাচার আরম্ভ করল। কালকেতু তা বুঝতে পেরে ভাড়ু দত্তকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিল। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য ভাড়ু দত্ত কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করল। কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে যুদ্ধে পরাস্ত করল। নিরুপায় কালকেতু তাই পালিয়ে রইল গুপ্তস্থানে। ভাড়ু দত্ত কৌশলে ফুল্লরার কাছ থেকে জেনে নিল কোথায় কালকেতু পালিয়ে আছে। কালকেতু বন্দী হল শত্রুর কারাগারে। সেখানে তার উপর অসহনীয় নির্যাতন চলল। তখন কালকেতু দেবী চণ্ডীকে আহ্বান করলেন। দেবী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্ন দেখালেন কালকেতুকে মুক্তি দিতে। দেবীর আদেশে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে মুক্তি দিলেন। মুক্ত কালকেতু এবার নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগল।

॥ ধনপতি সদাগরের কাহিনী ॥

ধনপতি নামে এক সদাগর উজানী নগরে বাস করত। ইছানী নগরের ধনী সাধুর কন্যা লহনাকে সে বিয়ে করেছিল। কিন্তু লহনার গর্ভে কোন সন্তান হল না। ধনপতি তাই লহনার বোন খুল্লনাকেও বিয়ে করল। এর কিছুদিন পরে ধনপতিকে রাজার আদেশে গৌড় নগরে যেতে হল। ধনপতির অনুপস্থিতিতে দুর্বলা নামে এক দাসী লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। এবার লহনা খুল্লনাকে নানাভাবে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। একদিন লহনা খুল্লনাকে ধনপতির লেখা একটা জাল চিঠি দেখালে। তাতে ধনপতি, খুল্লনাকে ছাগল চরাবার দাসী নিযুক্ত করেছে। দুঃখিত মনে খুল্লনা তাই ছাগল চরাতে আরম্ভ করল। একদিন একটা ছাগল গেল হারিয়ে। পাগলের মতো সে ছাগল খুঁজতে লাগল। কারণ, ছাগল পাওয়া না গেলে লহনার হাতে অসহ্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। বনের মধ্যে ছাগল খুঁজতে খুঁজতে এবার খুল্লনা একটা পুকুরের ধারে চলে এল। সেখানে একটি মেয়ে ঘট পেতে

পূজা করছিল। খুল্লনা জিজ্ঞেস করে জানলো যে মেয়েটি দেবী চণ্ডীর পূজা করছে। খুল্লনা যদি দেবীর পূজা করে, তা'হলে ছাগল ফিরে পাবে এবং সৌভাগ্যবতী হবে। মেয়েটির কথানুসারে খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করল। দেবী খুল্লনার পূজায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং হারানো ছাগল ফিরিয়ে দিলেন। এরপর ধনপতি ফিরে এলে খুল্লনা দুঃখভোগ থেকে নিষ্কৃতি পেল। কিন্তু ধনপতিকে আবার বাণিজ্য যাত্রা করতে হল সিংহলে। সমুদ্রের পথে যেতে যেতে ধনপতি দেখল এক অদ্ভুত দৃশ্য। পদ্মের উপর বসে এক তরুণী একটি আস্ত হাতিকে গ্রাস করছে, আবার উদ্গীরণ করছে। এই দৃশ্যটি 'কমলে কামিনী' নামে পরিচিত। কিন্তু এই 'কমলে কামিনী' দৃশ্যটি ধনপতি বাদে আর কেউ দেখতে পেলনা। সিংহলে পৌছে ধনপতি সিংহলরাজকে এই 'কমলে কামিনীর' কথা জানল। রাজা এই দৃশ্য দেখতে চাইলেন। কিন্তু দৃশ্যটি আর দেখা গেল না। রাজা ধনপতিকে তাই কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

এদিকে খুল্লনার গর্ভে ধনপতির এক ছেলে হল। ছেলের নাম রাখা হল শ্রীমন্ত। ক্রমে ছেলে বড় হল এবং পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করল। সমুদ্রে শ্রীমন্তও পিতার মতো 'কমলে কামিনী' দৃশ্য দেখতে পেল। কিন্তু শ্রীমন্তও রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাতে গিয়ে ব্যর্থ হল। ফলে শ্রীমন্তকেও কারারুদ্ধ হতে হল। পুত্র বা স্বামী কেউ ফিরে এল না দেখে খুল্লনা আবার চণ্ডীকে স্মরণ করলেন। দেবী চণ্ডী বৃদ্ধার ছদ্মবেশে সিংহল রাজের কাছে ধনপতি আর শ্রীমন্তর মুক্তি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কোনই ফল হল না। রাজা শ্রীমন্তকে শূলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড দেবার ব্যবস্থা করলেন। তখন দেবী ভূত-প্রেত প্রভৃতি নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণা হলেন। পরাজিত হয়ে এবার রাজা দেবীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করলেন। শ্রীমন্ত ও ধনপতি মুক্তি পেল। খুশী হয়ে সিংহলরাজ নিজের কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিলেন। ধনপতি এবার পুত্র-পুত্রবধূকে নিয়ে ফিরে এল উজানীতে খুল্লনার কাছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি

চণ্ডীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি দু'জন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও দ্বিজমাধব। এ ছাড়া আরও দু'জন কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

১। মানিক দত্ত: মানিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি বলা হল। সম্ভবতঃ ইনি প্রাক্‌চৈতন্য যুগে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন।

২। দ্বিজমাধব: দ্বিজমাধবের বসতি ছিল চট্টগ্রামে। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্য 'সারদামঙ্গল' নামে পরিচিত।

৩। **কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম**ঃ চণ্ডীমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম। কবিত্ব শক্তি গুণে তিনি কবিকঙ্কণ উপাধি লাভ করেছিলেন। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে কবির বসতি ছিল। তিনি ছিলেন গৃহস্থ চাষী। চাষী জীবনে বিপর্যয় উপস্থিত হলে কবি সপরিবারে দেশত্যাগ করেন। পথে তাঁকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। এমন সময় দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ তিনি লাভ করলেন চণ্ডীমঙ্গল রচনা করবার জন্যে। পরে আড়রার রাজার আশ্রয়ে মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। মুকুন্দরাম ছিলেন জীবনরসিক শিল্পী। নির্যাতিত পশুকুলের মধ্যে তিনি নিগৃহীত মানবজীবনকে দেখতে পেয়েছিলেন। কালকেতুর অত্যাচারে পীড়িত ভালুক দেবী চণ্ডীর কাছে যখন বলে :

"উই চারা খাই আমি নামেতে ভালুক—
নেউগী চৌধুরী নহি, না করি তালুক।"

তখন মুকুন্দরামের সহানুভূতিপূর্ণ বাস্তবদৃষ্টি দেখে আমরা বিস্মিত হই। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মুকুন্দরাম নিঃসন্দেহে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

৩। ধর্মমঙ্গল কাব্য

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের তুলনায় ধর্মমঙ্গলের সাহিত্যিক মূল্য কম। ধর্মঠাকুর ছিলেন ডোমদের দেবতা অর্থাৎ সমাজের নিম্নস্তরেই ধর্মঠাকুরের গান ও পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যের অধিকাংশ রচয়িতারাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের দেবী ছিলেন নারী। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের দেবতা পুরুষ ধর্মঠাকুর। অনেকে এই পূজাতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে বলে মনে করেন। কোথাও কোথাও আবার ধর্মঠাকুরকে সূর্যরূপেও বন্দনা করা হয়। কোথাও বা আবার তিনি বিষ্ণু, কোথাও বা শিবরূপে পূজিত হন। ধর্মঠাকুরের বিশেষ কোন মূর্তি নাই। কচ্ছপাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতিবিশিষ্ট শিলাখণ্ডই ধর্মঠাকুররূপে পূজিত হয়ে থাকেন। সাধারণতঃ বৃক্ষমূলে এইরূপ ধর্মঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যায়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাতে ছাগ বা পায়রা বলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনাবৃষ্টির সময় কৃষকেরা এবং সন্তানলাভের আশায় রমণীরা ধর্মঠাকুরের পূজা করে থাকে। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে অনেকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলে থাকেন এবং বিশেষভাবে ধর্মঠাকুরকে বাঙলা দেশেরই দেবতা বলা চলে। পালযুগে রাঢ় দেশের যুদ্ধাদির কথা এই কাব্যে বর্ণিত আছে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে কবি হৃদয়ের যে স্পর্শ আমরা পাই, ধর্মমঙ্গলে তার অভাব দৃষ্ট হয়। তা'ছাড়া ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর পশ্চাতেও সুপরিকল্পনার অভাব আছে।

কাহিনীতে যুদ্ধ ও বীরত্বের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু গল্পের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংযোগ খুব ক্ষীণ। হয়তো বা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বহুদিন এ কাহিনী আবদ্ধ ছিল বলে এর মধ্যে এ সকল দুর্বলতা ছিল।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী

গৌড়েশ্বরের অধীনে এক সামন্ত নৃপতির নাম ছিল কর্ণসেন। কর্ণসেনের রাজধানী ছিল ঢেঁকুরগড়ে। ইছাই ঘোষ নামে এক বিদ্রোহী প্রজা যুদ্ধে কর্ণসেনকে পরাস্ত করে তার ছয় পুত্রকে নিহত করেন। কর্ণসেনের পত্নী স্বামী-পুত্র হারিয়ে শোকে প্রাণত্যাগ করেন। তখন গৌড়েশ্বর তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিয়া ময়নাগড়ে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামাত্য কিন্তু এই বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। বিবাহের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। কিন্তু রঞ্জাবতীর কোন পুত্র সন্তান হল না। সেজন্য রঞ্জাবতীর মনে কোন সুখ ছিল না। এমন সময় রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের কথা জানতে পারলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপা লাভ করলে নাকি সন্তান লাভ করা যায়। তাই ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করবেন বলে রঞ্জাবতী কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে পুত্র বর দিলেন। রঞ্জাবতীর গর্ভে পুত্র লাউসেনের জন্ম হল। কিন্তু কর্ণসেনের শ্যালক মহামাত্য লাউসেনের প্রাণনাশের নানা প্রকার চেষ্টা করতে লাগল। লাউ-সেনকে কিন্তু সে হত্যা করতে সমর্থ হল না। এ দিকে লাউসেন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। চারিদিকে তার বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। লাউসেন এবার এল গৌড়ের রাজদরবারে। মহামাত্য কিন্তু চেষ্টা করতে থাকল কি করে লাউসেনকে ধ্বংস করা যায়। বীরত্ব প্রদর্শন করে লাউসেন কলিঙ্গা ও কানাড়া নামে দুই রাজ-কন্যাকে বিয়ে করল। ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে লাউসেন যে কোন দুঃসাধ্য কাজ সাধন করতে পারত। ঈর্ষান্বিত হয়ে মহামাত্য এবার বল্লে যে লাউসেনের যদি এতই ক্ষমতা তবে পূর্বাচলের সূর্যকে পশ্চিম দিগন্তে উদিত করে দেখাক। গৌড়েশ্বর লাউসেনকে এই অসম্ভব কার্য সাধন করতে আদেশ দিলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন এই অসম্ভব কাজকেও সম্ভব করে দেখালেন। এই দেখে চতুর্দিকে লাউসেনের মহিমা ছড়িয়ে পড়ল। লাউসেনের জয়গানে দিগদিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠল। এর পর লাউসেন ময়নাগড়ে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগলেন। ধর্মমঙ্গল কাহিনীটিতে মহাভারতের ছায়া পড়েছে। লাউসেনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এবং মহামাত্যের সঙ্গে কংসের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণেরই মতো লাউসেন দৈবশক্তির অধিকারী

এবং যে কোন দুঃসাধ্য কাজ তিনি সাধন করতে পারেন। ভাগ্নেকে হত্যা করার জন্ম কংসের সমস্ত প্রচেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে তেমনি মহামত্যেরও লাউসেনকে হত্যা করার সমস্ত হীন চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। দৈবী গুণে বিভূষিত হয়ে লাউসেন তখন মানুষের ঘরে ঈশ্বররূপে পূজিত হতে লাগলো।

ধর্মমঙ্গলের কবি

॥ ময়ূর ভট্ট ॥ ময়ূরভট্টকে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি বলে মনে করা যেতে পারে। ধর্মমঙ্গলের অন্ম কবি ঘনারামের রচনায় ময়ূরভট্টের উল্লেখ পাওয়া যায়। ময়ূরভট্ট প্রণীত ধর্মমঙ্গলের গ্রন্থের নাম ছিল 'হাকন্দ পুরাণ'। কিন্তু ময়ূরভট্ট প্রণীত কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

॥ মানিকরাম গাঙ্গুলী ॥ খুব সম্ভব যোড়শ শতাব্দীতে এই কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করেছিলেন। এঁর রচিত কাব্যে বীররস বর্ণনায় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ রূপরাম ॥ বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাইতি গ্রামের নিকটে শ্রীরামপুরে কবি রূপরাম চক্রবর্তীর জন্ম হয়। রূপরাম পিতার অধীনে পড়াশুনা করেছিলেন। পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বরের প্রতি বিরূপ হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। রূপরামের একটি মনোমুগ্ধকর আত্মবিবরণ তাঁর রচিত ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে অসাধারণ বাস্তব দৃষ্টিশক্তির পরিচয় মেলে। ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিও রূপরাম চক্রবর্তীকে বলা যেতে পারে।

॥ রামদাস আদক ॥ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে রামদাস আদক ধর্মমঙ্গল রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যে রূপরামেরই অনুসরণ দেখতে পাওয়া যায়। রূপরামের মতো তিনিও একটি সুন্দর আত্মবিবরণী রচনা করেছিলেন। ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনিও ধর্মমঙ্গল রচনা করেছিলেন।

॥ সীতারাম দাস ॥ সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গল নামে এই দুইখানি কাব্যই রচনা করেছিলেন। বর্ধমান জেলার সুখসাগর গ্রামে কবির বাড়ী ছিল। গৃহ দেবতা গজলক্ষ্মীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কবি সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় কবির যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় জানতে পাওয়া যায়।

॥ ঘনারাম চক্রবর্তী ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনারাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বাস্তবচিত্র রচনায় তাঁর সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

অনুবাদ সাহিত্য

অনুবাদ শব্দের অর্থ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর। কেউ কেউ হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ করে থাকেন, কেউবা আবার ভাবানুবাদ করে থাকেন। অনুবাদকের উভয় স্বাধীনতাই আছে। রামায়ণ-মহাভারত বাঙলায় ভাবানুবাদ করা হয়েছিল।

আগেই বলেছি যে কোন ভাষাই তার আপন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে বলিষ্ঠ হতে পারে না। অন্য ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাব-কল্পনাগুলিকে নিজেদের ভাষায় স্বাঙ্গীকৃত করে নিতে পারলে পরিধি বৃহত্তর এবং বলিষ্ঠ হয়। সেজন্য যে কোন ভাষারই উন্নতির জন্য অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য।

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য বাঙলা সাহিত্যে ইতিহাসে অনুবাদ সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই দু'টি মহাকাব্য যুগে যুগে বাঙলার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সমাদৃত হয়েছে। নগর বাঙলা, পল্লী বাঙলা, ধনীর প্রাসাদ, দরিদ্রের কুটীর সর্বত্রই রামায়ণ ও মহাভারত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়েছে। রামায়ণী গানের করুণ কাহিনী কত পল্লীর কত ধূলিকে অশ্রুসিক্ত করেছে, সীতাহরণের করুণ গাথা বর্ণনা করতে গিয়ে নীরব নিশীথের গ্রামে বাঙলার উন্মুক্ত প্রান্তরে কত কথক ঠাকুরের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেছে। রামের দেবোপম চরিত্র মাহাত্ম্য, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠা, অর্জুনের বীরত্ব বাঙলার প্রকৃতিপুঞ্জ হৃদয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিল। রাজা-মহারাজাদের জয়-পরাজয়ের কাহিনী নিয়ে রামায়ণ-মহাভারত রচিত হলেও স্নেহ-প্রেম, ভালোবাসা ও ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি চিরন্তন মানবিক গুণের স্পর্শে এই দুই মহাকাব্য বাঙালীর হৃদয়কে এমন করেই স্পর্শ করতে পেরেছিল। অনুবাদের পূর্বে বাঙালী এই দুই অমৃতরসনির্ঝর মহাকাব্যের কথা শুনেছিল এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করেছিল অনুবাদের আশায়। অনুবাদ হওয়ার ফলে ঐ দুই মহাকাব্যের অমৃত-আস্বাদ লাভ করে সর্বকালের বাঙালী হল ধন্য ও রসসিক্ত।

॥ রামায়ণ ॥

কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ অনুবাদের পূর্বেও বাঙলা দেশে পাঁচালীর আকারে রামায়ণ গান প্রচলিত ছিল। কথকঠাকুর ও পাঁচালী গায়করা বাল্মীকি রামায়ণের ইচ্ছানুযায়ী রূপান্তর করে নিয়ে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করতেন। রামায়ণ মহাকাব্য এদেশে তাই রামায়ণ পাঁচালী নামেও পরিচিত।

রামায়ণ রচয়িতা কবি কৃত্তিবাসের নাম জানেনা, এমন বাঙালী বিরল। কৃত্তিবাস বাঙলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং জনপরিচিত কবি। কৃত্তিবাস রাণাঘাটের কাছে ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ সম্বন্ধে নানা সংশয় ও বিতর্ক

বর্তমান। পিতার নাম ছিল বনমালী এবং মাতার নাম মালিনী। কৃত্তিবাসী রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। পরবর্তীকালে বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সকল কবিই কৃত্তিবাসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আজ পণ্ডিতমহলে কৃত্তিবাসকে নিয়ে নানা সংশয় ও বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু রামায়ণরূপ মধুচক্র রচনাকারীরূপে কৃত্তিবাস বাঙালীর হৃদয়াসনে যে ভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সেখানে কোন বিতর্ক বা সংশয়ের অবকাশ নেই। সত্যই কৃত্তিবাস 'কীর্ত্তিবাস' কবি।

কৃত্তিবাস ভিন্ন আরও যাঁরা রামায়ণী কাহিনী লিখেছিলেন, হয়তো তাঁরা কৃত্তিবাসের খ্যাতির পশ্চাতে হারিয়ে গেছেন। মনসামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী রামায়ণী গান রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। পূর্ববঙ্গে চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণী গান আজও লোক মুখে মুখে প্রচলিত আছে। সত্যিই যদি চন্দ্রাবতী রামায়ণী গান রচনা করে থাকেন, তাহ'লে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এক বিশেষস্থান অধিকার করে আছেন।

॥ মহাভারত ॥

বাঙলায় প্রথম মহাভারত অনূদিত হয়েছিল চট্টগ্রামে। হুসেনশাহের সেনাপতি (লস্কর) পরাগল খাঁর অনুরোধে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস মহাভারত রচনা করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী মুসলমানদেরও যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিল। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে হুসেনশাহ ও পরাগল খাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। মহাভারতের মতো বিরাট গ্রন্থ যে তিনি অনুবাদ করেছিলেন, এটাই তার কবি কৃতিত্বের পরিচায়ক।

মহাভারত রচনা করে সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন কাশীরাম-দাস। রামায়ণ রচনা করে কৃত্তিবাস যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন মহাভারত রচনা করে কাশীরামদাস সেই খ্যাতিই লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কমলাকান্ত। বর্ধমানে সিঙ্গি গ্রামে কবির পিতার বসতি ছিল। পরে তাঁরা বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে উঠে আসেন। অনেকে বলেন যে কাশীরাম তাঁর মহাভারত সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। বাকী অংশ নাকি সম্পূর্ণ করেছিলেন কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম। যাই হোক, কাশীরাম দাস সে অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙালী মানস কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত বাঙলার ঘরে ঘরে কাশীদাসী মহাভারতের সমাদর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সত্যই বলেছিলেন যে, 'কাশীরাম বাঙলার প্রাণগঙ্গার ভগীরথ'।

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রেমমন্ত্র সাধক শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলে শ্রীচৈতন্যদেব ভিন্ন অপর কোন প্রতিভা বাঙলা সাহিত্যিকে এতখানি প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় শ্রীচৈতন্যদেব নিজে কিছুই রচনা করে যান নি। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুধর্ম কতকগুলি শাস্ত্রাচারের কারগারে বন্দী হয়েছিল। সেই জরাগ্রস্ত পরিবেশ থেকে মুক্তিমন্ত্র তথা প্রেমের বাণী ছড়িয়ে দিয়ে বাঙলা ও বাঙালীকে নূতন করে জাগ্রত তথা মুক্ত করলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। ঘোষণা করলেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। এই মানুষকে ঘৃণা ক'রো না। মানুষকে হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে ঢেলে দাও। জাতিতে জাতিতে কোন ভেদ নাই, ধর্মে ধর্মে কোন তফাৎ নেই। এই মহামিলনের অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ল তৎকালীন বাঙলা। দূরদূরান্তরে প্রচারিত হল এই প্রেমধর্ম। যারাই এই প্রেমমন্ত্রের সংস্পর্শে এল, তারাই নূতন করে এক দিব্য চেতনালাভ করল। মানুষ মানুষকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখতে শিখল। সাহিত্য প্রবাহকেও দুকুলপ্লাবী উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এই প্রেমস্রোত। প্রেম ও ভক্তির নবীন স্পর্শে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সূচিত হল এক অভিনব পরিবর্তন। শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল বলে সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এই যুগটিকে বিশেষভাবে 'চৈতন্যযুগ' বলে চিহ্নিত করে থাকেন। একটিমাত্র মানুষকে কেন্দ্র করে বাঙালীর জাতীয় জীবনের এমন ভাববিপ্লব, এমনি প্রেম-পিপাসা হয়তো পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় রহিত। তাই গর্বের সঙ্গে আমরা বলতে পারি শ্রীচৈতন্যদেব অনন্য।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পীঠস্থান নবদ্বীপে এই যুগাবতার মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের আদি বাসভূমি ছিল শ্রীহট্টে। চৈতন্যদেবের পিতার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচীদেবী। বিশ্বরূপ নামে চৈতন্যদেবের এক অগ্রজ ছিল। তিনি অল্প বয়সেই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমেই কিন্তু চৈতন্যদেব চৈতন্য নামে পরিচিত ছিলেন না। তাঁর নাম ছিল বিশ্বম্ভর। ডাক নাম ছিল নিমাই। দেহের রঙ অত্যধিক ফর্সা ছিল বলে তিনি গৌরাঙ্গ (গৌর) নামেও পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে যিনি দিব্য চেতনাবিভোর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হয়েছিলেন, তিনি বাল্যকালে কিন্তু মোটেই শান্ত-শিষ্ট সুবোধ প্রকৃতির ছিলেন না।

পাড়াপড়শীদের হাড় পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাড়তেন। টোলের ছাত্রদের নানা দুষ্টবুদ্ধি করে ক্ষ্যাপাতেন, এমন কি টোলের পণ্ডিতেরাও তাঁর দুষ্টামির হাত থেকে রেহাই পেতেন না। পুত্রের বিরুদ্ধে লোকের নালিশ শুনতে শুনতে পিতামাতা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। তবুও শচীদেবী নিমাইকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কারণ ইতিপূর্বে তাঁর এক সন্তান সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়েছিল।

কিন্তু কালক্রমে এই চঞ্চল নিমাই টোলের সেরা ছাত্র হয়ে উঠলেন। টোলে পাণ্ডিত্যে তাঁর সমকক্ষ শেষ পর্যন্ত আর কেউ ছিল না। তর্ক করে তিনি নবদ্বীপের অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতদের হারিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে অধ্যাপক হয়ে তিনি নিজেই টোল খুলে বসলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হননি। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম পত্নীর নাম ছিল লক্ষ্মী দেবী। সর্পদংশনে লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হলে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন।

কিছুদিন পরে তিনি গয়ায় গেলেন পিতৃকৃত্য করতে। সেখানে গিয়ে তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করার পরেই শ্রীচৈতন্যদেব যেন নূতন মানুষ হয়ে গেলেন। বাল্যের চঞ্চল নিমাই শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে সূচিত হল নূতন অধ্যায়।

গয়া থেকে ফিরে এসে শ্রীচৈতন্যদেব ভগবৎপ্রেমে পাগল হয়ে গেলেন। সাথীদের নিয়ে নবদ্বীপের পথে পথে হরিসংকীর্তনে মেতে রইলেন। এই প্রেম-ভাবের স্পর্শে সমস্ত নবদ্বীপ বিভোর হয়ে গেল। কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে তিনি তখন রোদন করতে থাকতেন। কৃষ্ণের কথা ভাবতে ভাবতে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। সংসার, বিষয়-সম্পত্তি সবকিছু গেলেন ভুলে। কৃষ্ণপ্রেমে বন্যা যার হৃদয়কে প্লাবিত করে দিয়েছে, সংকীর্ণ সংসারের চার দেওয়ালের বেড়া তাঁকে আর বন্দী রাখতে পারবে কেন? কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হয়ে শ্রীচৈতন্য তাই ঘর-সংসার সব ভুলে রইলেন। বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া আর মা শচীদেবীর ব্যর্থ অশ্রুজল ঝরে পড়ল বারে বারে। সেই সময় শ্রীচৈতন্যের প্রধান সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ এবং যবন হরিদাস। এঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রচার করতে লাগলেন প্রেমধর্ম মাহাত্ম্য। নবদ্বীপবাসী দলে দলে চৈতন্যভক্ত হতে লাগল।

চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্য কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তাঁর নাম হল শ্রীচৈতন্য। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর শ্রীচৈতন্য পুরী গমন করেন। পুরীতে জগন্নাথদেবের মূর্তি দর্শন করার পর চৈতন্যদেবের হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন নীলাচলেই হল মহাপ্রভুর পীঠস্থান। এর পর তিনি

তীর্থ পর্যটনের জন্য যাত্রা করেন। ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে তিনি তাঁর এই মানুষের মিলনমন্ত্র প্রচার করতে লাগলেন। প্রেমের স্পর্শ লাভ করলে চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হতে পারে। মানবতার এই মহামন্ত্র উদ্বোধকরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে তীর্থ পর্যটনে শ্রীচৈতন্যদেবের ছয় বৎসর কেটে গেল। এরপর তিনি পুরীধামে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকলেন। এরূপে ভগবৎপ্রেমে বিভোর হয়ে তাঁর জীবনের বাকী আঠার বৎসর কেটে গেল। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিরোধান ঘটে।

আদ্বিজচণ্ডাল সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমসুধাসঞ্চিত বক্ষে আশ্রয় পেয়েছে। প্রেম ও ভক্তির বন্যায় তিনি ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর একজন প্রধান সঙ্গী ছিল মুসলমান যবন হরিদাস। তাঁর প্রেমধর্ম প্রসারের জন্য তীর্থ পর্যটনকে দিগ্বিজয়ও বলা যেতে পারে। যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই নরনারী তাঁর এই প্রেমধর্মের স্পর্শে নূতন জীবনলাভ করেছে। তারা দলে দলে চৈতন্যদেবের ভক্ত হয়েছে। বাঙলার সুলতান হোসেন শাহের দু'জন মন্ত্রী 'সাকর মল্লিক' ও 'দবীর খাশ' মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এঁরাই বিখ্যাত রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী। প্রেমধর্ম প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব এঁদের বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য ছিল অসংখ্য। এঁদের মধ্যে রামানন্দ, হরিদাস, দামোদর, গদাধর, কাশীমিত্র প্রমুখদের নাম করা যেতে পারে। এই শিষ্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন, দর্শন এবং ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বাঙলায় অনেক পুঁথি রচনা করেছিলেন। এখানে চৈতন্যজীবনী সম্পর্কিত পুঁথির কথা উল্লেখ করা হল।

চৈতন্য জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ

চৈতন্য ভাগবত—'এই গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন বৃন্দাবন দাস।' সম্ভবতঃ বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের সাহচর্য পাননি। শ্রীচৈতন্য শিষ্য নিত্যানন্দের অনুপ্রেরণায় এবং সান্নিধ্যে তিনি এই বিরাট এবং মহান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'বৃন্দাবন দাসের কাব্যে তৎকালীন বঙ্গসমাজের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।' চৈতন্যদেবের বাল্যজীবন তিনি সুন্দররূপে চিত্রিত করেছেন। 'তাঁর জীবনীকাব্য থেকে বাল্য-জীবনের দুরন্ত নিমাইকে চিনতে কষ্ট হয় না।' চৈতন্য ভক্তেরা চৈতন্য জীবনের উপর অনেক অলৌকিকত্ব আরোপ করেছিল।' চৈতন্য ভক্তরূপে বৃন্দাবন দাসই সেই সব অলৌকিকত্বকে সহজ ও সরলভাবেই গ্রহণ করেছিলেন'। চৈতন্যলীলা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের গুরু নিত্যানন্দেরও লীলা মাহাত্ম্যও বর্ণনা করেছেন। মানব

প্রেমিক চৈতন্যদেবের জীবনের অনেক সহজ সুন্দর কথা এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে বলে কাব্যখানি মানবরসে ভরপুর। তা'ছাড়া বৃন্দাবন দাসের এই কাব্যখানিতে সহজ পয়ার ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় এবং এ কারণেই বইখানি জনসাধারণের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল।

গোবিন্দদাসের কড়চা—গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালীন বিবরণ তিনি তাঁর 'কড়চাতে' লিপিবদ্ধ করেছেন। কাব্যখানি উচ্ছ্বাসবর্জিত। প্রত্যক্ষদর্শীরূপে 'ডায়েরীর' মতো তিনি চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক অভিনব তথ্য পরিবেশন করেছেন। কিন্তু অনেকেই গোবিন্দদাসের চৈতন্যজীবনী বিষয়ক এই কড়চার প্রামাণিকতা স্বীকার করতে চায় না। এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দ আধুনিক ধর্মী। এসব নানা কারণে গ্রন্থখানিকে চৈতন্যদেবের প্রামাণিক জীবন কাহিনী বলে মনে করা যেতে পারে না।

চৈতন্যমঙ্গল—চৈতন্যমঙ্গল নামে চৈতন্যজীবনী বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা দু'জন। জয়ানন্দ ও লোচনদাস। দু'জনের মধ্যে লোচদাসের চৈতন্যমঙ্গলই অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল আসরে বসে গাইবার জন্য রচিত হয়েছিল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত অপেক্ষা গ্রন্থখানি আকারেও ছোট।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলও জনসমাজে প্রচারিত হয়েছিল। পালাগান করবার জন্য কাব্যখানি রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটি নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্বন্ধে এই গ্রন্থে অভিনব কাহিনী আছে। কিন্তু এ কাহিনী কবি-কল্পিত বলেই মনে হয়। কিন্তু তাঁর কাব্য বৈচিত্র্যপিপাসু পাঠকের রস নিবৃত্তি করেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—চৈতন্যজীবনী বিষয়ক যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থখানিতে একাধারে দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটিকে সার্থক ও মহৎ সৃষ্টি বলা যেতে পারে। চৈতন্যজীবন এবং তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আর কোন চৈতন্য-জীবনীকারই করেননি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত এই জীবনীকাব্যে আমরা যেমন নরদেহধারী প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পাই, আবার অপরদিকে তেমনি প্রেমমন্ত্রসাধক মানুষ শ্রীচৈতন্যকেও উপলব্ধি করতে পারি। অসাধারণ যুক্তিনিষ্ঠা সহকারে বৈষ্ণবদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে এই গ্রন্থে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ জীবনের কথা কেবলমাত্র এই গ্রন্থখানিতেই পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থানে দুরূহ বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবির উপমা প্রয়োগ নৈপুণ্য লক্ষ্য করার মতো।

'কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃদ্ধবয়সে এই গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন।' বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন চিরকুমার ছিলেন। চৈতন্যভক্ত নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেছিলেন।' ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে কৃষ্ণদাস অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। দর্শনের দুরূহ তত্ত্বকে কাব্যে প্রকাশ করা আরও দুরূহ ব্যাপার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। 'পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় তাঁর তুল্য মানুষ ভারতবর্ষে আর অল্পই জন্মগ্রহণ করেছিল।' তাঁর রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' যতদিন বঙ্গসাহিত্য ধারা প্রবাহিত হবে, ততদিনই অক্ষয় হয়ে থাকবে।'

জীবনী সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করেই সূত্রপাত হয়। অবশ্য চৈতন্যজীবনী সাহিত্যসমূহে চৈতন্যদেবের যথাযথ মানবরূপ অঙ্কিত করা হয়নি। চৈতন্যদেবের অধ্যাত্মজীবনকে আশ্রয় করে রচিত বলে এই সব জীবনী কাব্যসমূহে নানা অলৌকিকত্ব প্রবেশ করিছে। তৎসত্ত্বেও মানুষ শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পেতেও কষ্ট হয় না এবং তৎকালীন বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসও এই সব জীবনীগ্রন্থ থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। 'চৈতন্যদেব ছিলেন অবতারকল্প মহাপুরুষ।, তা'ছাড়া তিনি সেদিন প্রেমধর্মের বন্যায় সমগ্র বাঙলাদেশকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে বাঙলা দেশে জীবনীসাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেখান থেকেই জীবনী-সাহিত্যের সুরু। এর পর মহাপুরুষের জীবন অবলম্বন করে বাঙলায় অনেক জীবনীসাহিত্য গড়ে উঠেছে।

গীতিসাহিত্য

সুরে ভরা বাঙলার আকাশ-বাতাস, বাঙলার প্রকৃতি। বাঙলার মানুষের কণ্ঠেও অজস্র সুরলহরীর বিচিত্র উচ্ছ্বাস। আবেগ-অনুভূতি প্রধান বাঙলার কবি সমাজ মনের গোপনের নিভৃত ভুবনস্থিত সকল কথাকেই প্রকাশ করে দিয়েছেন বাঙলার গীতিসাহিত্যে। সুরের সোনার কাঠির স্পর্শে সেই সব মর্মরস-সিক্তগীতি চিরকালের বাঙালীর চিত্তহরণ করেছে। কীর্তন, শ্যামা-সঙ্গীত আর বাউলগানের সুরের রেশ যখন বাঙালী শুনতে পায়, তখন জীবনের আর সব দুঃখ-দৈন্য ও বেদনা ভুলে গিয়ে সে আপনার বাঙালীত্ব অনুভব করে। কীর্তন গানের মধুবর্ষী সুরলহরী, শ্যামাসঙ্গীতের হৃদয়সঞ্জাত গভীর করুণ আর্তি এবং বাঙলার বিষণ্ণ বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে বাউলের উদাসীসুর সর্বকালের রসিক বাঙালীকে করেছে ভাবরসাম্মুখ, করেছে মুগ্ধ।

কবি হৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ পদাবলী সুরের মধুরসে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন বিষয়কে আশ্রয় করে কবিগণ পদাবলী রচনা করেছেন। বাঙলার পদাবলী সাহিত্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) বৈষ্ণব পদাবলী এবং (২) শাক্ত পদাবলী। রাধাকৃষ্ণ লীলা ও গৌরাঙ্গ বিষয়কে অবলম্বন করে পদাবলী সাহিত্যের যে শাখা গড়ে উঠেছে, তাকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলী। আর শক্তি-দেবীকে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে যে পদাবলী সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাকে বলা হয় শাক্ত পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী বাঙলা সাহিত্যের দুই বিশিষ্ট সম্পদ।

১। বৈষ্ণব পদাবলী

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসকে দুইটি যুগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) প্রাক্ চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী এবং (২) চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলী। বহু কবি সুমধুর বৈষ্ণবপদ রচনা করেছিলেন। রচনাগুণে এদের অনেকের পদসমূহ গীতিকাব্য প্রধান বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। অনেকগুলি পদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য নিঃসন্দেহে এক পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কয়েকজন বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা এবং তাঁদের পদের পরিচয় আমরা এখানে গ্রহণ করব।

জয়দেব ঃ বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় প্রথমেই যাঁর নাম স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন কবি জয়দেব। কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় :

"বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্তকোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে"

জয়দেব যদিও তাঁর "গীতগোবিন্দ" সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন তথাপি তাঁর কাব্যে বাঙলা ভাব ও ভাষার অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া জয়দেবের পরে রচিত বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী নিশ্চয়ই জয়দেবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে একটি পদ উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে :

"স্মর গরল খণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারম্।"

বিদ্যাপতি ঃ জয়দেব সংস্কৃতে পদাবলী রচনা করে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদায় অধিকারী হয়েছেন। আর বিদ্যাপতি বাঙালী না হয়েও বাঙালীর হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। বিদ্যাপতি যে ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন, তার নাম 'মৈথিলি'। বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার অধিবাসী। বিদ্যাপতির মৈথিলি ভাষাকে

কেন্দ্র করে বাঙলার বৈষ্ণব পদসাহিত্যে একটি মিশ্র ভাষা গড়ে উঠেছিল। উক্ত ভাষার নাম 'ব্রজবুলি'। ব্রজবুলি কিন্তু ব্রজের ভাষা নয়। বাঙলা ভাষার সঙ্গে বিদ্যাপতি রচিত মৈথিলি ভাষা মিশে গিয়ে ব্রজবুলি নামে এক মধুর ভাষা বাঙলায় বৈষ্ণব পদসাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক্ পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। পদাবলী রচনা করতে গিয়েও তিনি সংস্কৃত ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। তার সুমধুর পদাবলী পান করে বাঙালী মুগ্ধ হয়েছে। সঙ্গীত ধর্মী ব্রজবুলি ভাষা পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কবিরা সাগ্রহে অনুকরণ করেছে এবং সার্থক সুরস্পন্দিত পদ সৃষ্টি করেছে। ব্রজবুলিতে আধুনিক যুগের কবি রবীন্দ্রনাথও পদ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী ব্রজবুলিতে রচিত। বিদ্যাপতির পদাবলী অলংকার ছটায় সমুজ্জ্বল। অপূর্ব ছন্দের ঝংকার পাঠকের কানে সঙ্গীতের রেশের মতো বাজে। বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদ:

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোহ।"

উদ্ধৃতিটি কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার আর্তি প্রকাশ। শ্রীরাধা বলেছেন যে তাঁর দুঃখের শেষ নেই। ভাদ্রমাসে বর্ষার জল ঝরছে। কিন্তু শ্রীরাধিকার ঘর শূন্য।

অপর একটি বিখ্যাত পদে পাই:

"অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥"

অর্থাৎ অঙ্কুর অবস্থাতেই যদি সূর্য তাপে শুকিয়ে যায় তাহ'লে বৃষ্টির মেঘ এলে আর কি হবে! এই নূতন যৌবনই যদি প্রিয় বিরহে কাটাতে হয়, তাহলে সেই প্রিয় ফিরে এলে আর কি হবে?

চণ্ডীদাস: বৈষ্ণব পদাবলী সমুদ্রে বিদ্যাপতির কাব্যকে যদি তরঙ্গোচ্ছ্বাস বলা যায়, তবে চণ্ডীদাসের পদাবলীকে বলতে হয় সেই মহাসমুদ্রের অতল গভীরতা। এমন সহজ-সরল ভাষায় প্রাণের এবং মনের এমন গভীর মর্মস্পর্শী কথা চণ্ডীদাসের মতন করে আর কেউ বলতে পারেন নি।

"শোন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" মানবতার

এই জয়গানের উদ্গাতা কবি চণ্ডীদাসের কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। চণ্ডীদাসকে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে বিশেষ সমস্যা রয়েছে তাও বলেছি। যাই হোক, যত সমস্যাই থাকুক না কেন, পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস যে একজন শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তা সকল সমস্যা, সকল তর্ক, সকল প্রশ্নের অতীত। চণ্ডীদাস রচিত প্রায় সকল পদই রচনামাধুর্যে ও ভাবগভীরতায় আমাদের মুগ্ধ করে। এখানে তাঁর কয়েকটি পদাংশ উদ্ধৃত করে দেখানো হলো।

যেমন পূর্বরাগের একটি বিখ্যাত পদ :

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যাথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনীপারা॥"

আর একটিতে রাধার উক্তি :

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কেলুঁ পর॥"

অথবা :

"বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অল্প বয়সে পীরিতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥"

চণ্ডীদাসের যে পদই উদ্ধৃত করা যাক্‌না কেন সর্বত্রই সহজ কথায় প্রাণের গভীর আকুতি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস চিরকাল একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবেন।

জ্ঞানদাসঃ জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি। তাঁর কাব্যে বিশেষভাবে চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাসের মতো তিনিও সহজ কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁর কতকগুলি পদ সত্যই অতুলনীয়। নিম্নোদ্ধৃত পদটি স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন:

"মনের মরম কাহারে কহিব এথা
শোন শোন পরাণের সই।
স্বপন দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে (দেহ)
তার বিনা আর কারও নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজনে
রিমি ঝিমি শবদ বরিষে
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোঁল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁ ঝাঁ ঝিনকি বাজে ডাহুকী সঘনে গাজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥"

পদটি বর্ষা রজনীর একটি স্বপ্নময় মুহূর্তকে যেন পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করে। আর একটি বিখ্যাত পদ্যাংশ:

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

অথবা:

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।"

জ্ঞানদাস রূপোল্লাসের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বাঙলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই তিনি পদ রচনা করেছেন।

গোবিন্দদাসঃ সব দিক বিচার করে গোবিন্দদাসকে চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ

পদকর্তা বলতে হয়। জ্ঞানদাসের কাব্যে যেমন চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় গোবিন্দদাসের কাব্যে তেমনি বিদ্যাপতির প্রভাব লক্ষণীয়। গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যদেবকে চাক্ষুস দেখতে পান নি। এইজন্য অনেক পদেরই শেষে "গোবিন্দদাস রহু দূর" এই বলে আক্ষেপ করেছেন। গোবিন্দদাস সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সুললিত ছন্দ এবং কবিকল্পনার বৈচিত্র্য পাঠককে মুগ্ধ করেছে। গোবিন্দদাসকে অভিসারের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলা হয়। তার উদাহারণ :

"কণ্টক গাড়ি কমল সমপদতল
মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি।
দূতর পন্থ গমনধনী সাধয়ে
মন্দিরে জামিনী জাগি॥"

শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের অভিসারে যেতে হবে দুর্গম পথ অতিক্রম করে। এখানে তারই মহড়া চলছে। ঘরের মেঝেতে কাঁটা পুতে পথকে দুগম করে নেওয়া হয়েছে। কলসীর জল ঢেলে দিয়ে সে পথকে পিচ্ছিলকরে দেওয়া হয়েছে। পায়ের নূপুরে চীরবস্ত্র প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আঙ্গুল চেপে চেপে শ্রীরাধা সতর্ক পদক্ষেপ করছেন। নূপুরের যাতে কোন ঝংকার না বাজে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। কেননা শ্রীরাধাকে লুকিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিসারে যেতে হবে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড গ্রামে গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে কবি ছিলেন শাক্ত। পরে তিনি বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হন। এ ছাড়া বলরামদাস, রায়শেখর প্রভৃতি আরও বিভিন্ন পদকর্তা বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। এঁরা প্রায় সকলেই পদ রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) গৌরচন্দ্রিকা এবং (২) রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ। পৌরাণিক কাহিনী থেকে এই রাধা-কৃষ্ণলীলার বিষয়কে নিয়ে লোকে গান রচনা করত। ক্রমে এই গানই পরিমার্জিত হয়ে বৈষ্ণব পদাবলীতে পরিণত হয়। কৃষ্ণকে হিন্দুরা ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করে। স্বভাবতঃই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদে পদকর্তাদের ভক্তিও প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর এই ভক্তিরস বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে সাধারণ সাহিত্যের সঙ্গে এক পংক্তিতে রাখা যায়

না। যাঁরা এই পদসমূহ রচনা করেছিলেন তাঁরাও সাহিত্য রচনা করার জন্য এইসব পদ রচনা করেন নি। অধ্যাত্মসাধনায় বিভোর হয়ে তাঁরা এইসব পদ রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই পদসমূহের অধ্যাত্মমূল্য ছেড়ে দিয়েও এমন মানবরসের সন্ধান এতে পাওয়া গেছে, যার জন্য মানুষ অধ্যাত্মজীবন অনুরাগী না হয়েও এই পদসমূহকে সাদরে গ্রহণ এবং রস পান করেছেন। পুত্রের জন্য মায়ের শঙ্কা ও স্নেহ, সখার জন্য সখার অথবা সখির জন্য সখির ভালোবাসা, প্রণয়ীর জন্য প্রণয়িণীর আবেগ-উল্লাস-বেদনা প্রভৃতি চিরন্তন মানবিক গুণগুলি বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্তমান থাকায় সর্বকালে রসিক মানুষ এই কাব্যামৃত আস্বাদ করেছে এবং বৈষ্ণব পদাবলীকে সাহিত্য পদবাচ্যে ভূষিত করেছে। রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। বাল্যলীলা, পূর্বরাগ, রূপোল্লাস, অভিসার, মান, বিপ্রলব্ধা, মাথুর, প্রার্থনা প্রভৃতি নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবপদাবলীর কাহিনী প্রস্তুত। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবদের মধ্যে পালাগান করার পূর্বে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ গাওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। উহা 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে খ্যাত। অধ্যাত্মভাবে শ্রোতার মনকে পূর্ণ করে তোলার পালা গাইবার পূর্বে এই গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক গানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যাই হোক, সমস্ত দিক বিচার করে এবং কাব্য পাঠ করে এ কথাই মনে হয় যে, বৈষ্ণবপদাবলী বাঙলা সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ।

২। শাক্ত পদাবলী

শাক্ত পদাবলীতে বাঙালী জগৎজননী মহামায়ার সঙ্গে এক অভূতপূর্ব স্নেহময় সম্পর্ক স্থাপন করেছে। বৈষ্ণবদের যেরূপ কৃষ্ণ, শাক্তদের সেরূপ কালী। শাক্ত কবিরা তাঁদের আন্তরিক সুর আকুতি দ্বারা জগৎজননীকে আমাদের ঘরের মায়ের মতো করে নিয়েছেন। যে মায়ের সঙ্গে আমাদের স্নেহ, ভালোবাসা, অভিমান ও আব্দারের সম্পর্ক। ফলে শাক্ত পদাবলীতে জগৎজননী মহাকালীর দেবী আভিজাত্য ও স্বর্গীয় দূরত্ব ঘুচে গিয়েছে। আমাদের ঘরের মায়ের মতই তিনি যেন আমাদের প্রতি স্নেহময়ী, আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সন্তানের কাতর আহ্বানে মাতৃঅন্তর বুঝি বিচলিত হয়ে পড়ে। শাক্ত পদাবলীর পদসমূহের মধ্যে এই আন্তরিক ভাবটিই নিহিত আছে এবং এ কারণেই এগুলি নিছক আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে পর্যবসিত না হয়ে বাঙালীর মনের কথা হয়ে উঠেছে। বাঙালীর গৃহ জীবনের নিখুঁত ভাবনার কথা সুরের যাদু স্পর্শে এখানে অনুরণিত হয়ে উঠেছে এবং শাক্ত পদাবলীকে বাঙালী যতটা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে তেমন বুঝি বৈষ্ণব পদাবলীকেও নয়। এই পদসমূহের আব-

ভাষা, সহজ ও সরল। দুর্বোধ্য ভাষায় কোন আধ্যাত্মিক চেতনাকে এখানে রূপ দিতে চেষ্টা করা হয়নি এবং অলংকারের বিদ্যুৎদীপ্তিও এ পদসমূহে খুব বেশি নেই। এর যা' গুণ, তা হচ্ছে এর সহজ আন্তরিকতা। এই আন্তরিকতার স্পর্শেই শাক্তপদাবলী এতখানি কাব্যমহিমা লাভ করেছে।

শাক্তপদাবলীর অন্তর্গত আগমনী ও বিজয়া অংশে বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের এমন এক আশা-আনন্দ ও বিরহপূর্ণ অশ্রুসজল কাহিনী রূপ পেয়েছে যে আগমনী বিজয়াকে বাঙলা ও বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীত বলা হয়ে থাকে। শাক্তপদাবলীকে যদি একটি সুন্দর পুষ্পমালা বলতে হয়, তবে আগমনী ও বিজয়া সে মালার দু'টি শ্রেষ্ঠ কুসুম। দুর্গাপূজা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। 'এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করেই আগমনী ও বিজয়া অংশ রচিত হয়েছে। দুর্গা গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা। তপস্যা করে দুর্গা পতিত্বে বরণ করলেন ভিখারী শিবকে। ভিখারী স্বামীর ঘরে রাজনন্দিনী দুর্গার দুঃখ-দুর্দশার আর অন্ত নাই। তাই দেখে অভাগিনী মা মেনকার প্রাণ সকল সময় কাঁদে। অবশেষে মেনকা অনেক ব'লে ক'য়ে হিমালয়কে পাঠালেন শিবের কাছে, কন্যাকে কিছু দিনের জন্য পিতৃগৃহে নিয়ে আসতে। হিমালয় কিন্তু পাগলা জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করলো না। প্রথমেই কন্যাকে গিয়ে জনালেন মা মেনকার করুণ আবেদন। কন্যা গিয়ে কৌশলে এবার শিবকে বল্লে :

"গঙ্গাধর হে শিবশঙ্কর
কর অনুমতি হর, যাইতে জনকভবনে
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন
ধারা বহে দুই নয়নে।"

পত্নীর পিতৃগৃহে যাবার এই আকুল বাসনা দেখে শিব সানন্দে রাজী হলেন। কিন্তু মাত্র তিনদিনের জন্য। তারপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিনের জন্য উমা এলেন পিতৃগৃহে। এই অংশ নিয়ে রচিত হয়েছে আশা-নিরাশা আনন্দেভরা মধুর আগমনী সঙ্গীত। পরবর্তী বিজয়া অংশ রচিত হয়েছে উমার স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনকে অবলম্বন করে। নবমী নিশি ফুরিয়ে গেলেই উমা আবার স্বামীগৃহে চলে যাবে।' মা মেনকার মন তাই কেঁদে উঠে। অসহায় নারী নবমী নিশিকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

"যেয়োনা নবমী নিশি ধরি দু'টি পায়
তুমি না সদয় হলে, উমা আমার চলে যায়।"

কিন্তু নবমী নিশিরতো থাকবার উপায় নেই। দশমীর বিষণ্ন প্রভাতে মা মেনকার হৃদয়ে হাহাকার জাগিয়ে, কন্যা উমা স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

তৎকালীন বাঙলার সমাজ জীবনের একটি করুণ চিত্র রূপায়িত হয়েছে আগমনী ও বিজয়াতে। কুলীন পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে সেকালের পিতামাতারা গৌরীদানের পুণ্য অর্জন করতো। এই কুলীন পাত্ররা প্রায়ই হতেন অতিবৃদ্ধ বা অতিদরিদ্র। অল্পবয়স্কা কন্যার ঐরূপ স্বামীর ঘরে দুঃখ দুর্দশার অন্ত থাকতো না। কন্যার দুঃখে বাঙলার বাতাসে মাতৃহৃদয়ের যে করুণ আর্তনাদ অব্যক্তভাবে ছিল, শাক্তপদাবলীর আগমনী ও বিজয়া অংশে তা সার্থকভাবে প্রকাশিত হল। আগমনী ও বিজয়াকে তাই বাঙালী এমন হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে।

জগৎজননীকে ঘরের মেয়েরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে বাঙালী। জগৎজননীকে ঘরের মারূপে আকুল আহ্বান করেছে বাঙালী। আগমনী বিজয়া অংশে জগৎজননী কন্যা। জগৎজননীর রূপ, ভক্তের আকুতি প্রভৃতি অংশে মাতৃ আহ্বানে, মাতৃরূপ বর্ণনায় বাঙালী কবির লেখনী আশ্চর্য আন্তরিক, আশ্চর্য করুণ কোমল। বৈষ্ণবপদাবলীতে মধুর রসের প্রাচুর্য। শাক্তপদাবলী বাৎসল্যরসে পূর্ণ। বৈষ্ণবপদাবলীতে যে বাৎসল্যরস আছে, শাক্তপদাবলীর তুলনায় তা নিতান্তই গৌণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয়তো বা বৈষ্ণবপদাবলীরই প্রভাবে শাক্ত সঙ্গীত রচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু শাক্তপদালীর রচয়িতাগণ বৎসল্যরস সৃষ্টিতে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বৈষ্ণব কবিরা শাক্ত মতের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শাক্ত কবিরা শ্যাম ও শ্যামার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয়সাধন করেছিলেন। ভক্ত রামপ্রসাদের বিখ্যাত সঙ্গীত এর উপযুক্ত সাক্ষ্য ও দৃষ্টান্ত :

"কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।"

শাক্ত সঙ্গীতের আদি রচয়িতাকে জানা যায় না। তবে রামপ্রসাদকেই শাক্ত সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলতে হয়। কাব্য রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে রামপ্রসাদ 'কবিরঞ্জন' উপাধিলাভ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হালিশহরের নিকটে কুমারহট্ট গ্রামে এক বৈদ্যবংশে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। শাক্তপদ ভিন্ন তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' নামে এক কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। উক্ত কাব্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কিন্তু রামপ্রসাদের আসল কৃতিত্ব শ্যামাসঙ্গীত রচনায়। সমস্ত জীবন তিনি কালীসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মায়ের সঙ্গে এমন নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক রামপ্রসাদ ভিন্ন অপর কোন শাক্তপদকার স্থাপন করতে পারেন নি। তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীত তাঁকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। এখনও বাঙালীর কণ্ঠে রামপ্রসাদী সঙ্গীতের সেই মনভোলান বিষাদ করুণ সুর শোনা যায়।

'মা আমায় ঘুরাবি কত ?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ॥'

অথবা :

'মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা ॥'

রামপ্রসাদ ভিন্ন আর যাঁরা শাক্ত সঙ্গীত রচনা করে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কমলাকান্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমলাকান্ত বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় শাক্তসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত পদ রামপ্রসাদের সমকক্ষ না হলেও ভক্তির একনিষ্ঠতাগুণে মর্মস্পর্শী। রামপ্রসাদের মতো তিনিও ছিলেন ভক্ত কবি। এ ছাড়া আর যাঁরা শাক্তসঙ্গীত রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাম বসু, দাশরথী রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও রসিকচন্দ্র রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

১। বাঙলা ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

২। মঙ্গলকাব্য কাহাকে বলে ? মনসামঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান বর্ণনা কর এবং মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান কয়েকজন কবির উল্লেখ কর। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)

৩। চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনীর যে কোনও একটি বিবৃত করিয়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি সাধারণ পরিচয় দাও। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২)

৪। নিম্নলিখিত কবিগণ কে কোন্ শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন ? তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম ও রূপরাম।

৫। অনুবাদ সাহিত্য বলিতে কি বুঝ ? রামায়ণ ও মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে ? তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। মহাভারত কে কে অনুবাদ করেছিলেন ? তাঁদের পরিচয় দাও।

৭। বাঙলা সাহিত্যের একটি যুগকে বিশেষভাবে 'চৈতন্যযুগ' বলা হয় কেন ?

৮। চৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)

৯। বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব বর্ণনা কর। তুমি তাঁকে কেন ভালবাস? (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬১)

১০। চৈতন্যজীবনী বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয় দাও এবং উহার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটির রচয়িতার পরিচয় দাও।

১১। পদাবলী কাহাকে বলে? একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার পরিচয় দাও। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২)

১২। কয়েকজন বৈষ্ণবপদকর্তার পদশ্রেষ্ঠত্ব আলোচনা কর। 'গৌরচন্দ্রিকা' বলতে কি বুঝ?

১৩। শাক্তপদাবলীর জগৎজননী বাঙালীদের নিকট কী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন? শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবির পরিচয় দাও।

১৪। আগমনী গানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙলা সাহিত্যে গদ্য অনুশীলন

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগ তথা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা গদ্য চর্চা আরম্ভ। ইতিপূর্বে বাঙলা সাহিত্যের সীমানা ছিল পদ্য রাজ্যেই সংকুচিত। যদিও গদ্য কথ্যভাষারূপে প্রচলিত ছিল, তথাপি আদিযুগ বা মধ্যযুগের কবি, সাহিত্যিকরা গদ্যকে সাহিত্যিক ভাষারূপে ব্যবহারের কথা চিন্তা করেন নি। গদ্য মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের ফলে মলিন। অতএব সাহিত্যের মতো অভিজাত তথা মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়কে গদ্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রধানতঃ এই প্রাচীন ধারণা আটপৌরে গদ্যকে সাহিত্যের শিল্পসুন্দর কক্ষ থেকে নির্বাসিত করে রেখেছিল। দ্বিতীয়তঃ সর্বকালের শিল্পীরই থাকে যশোকাঙ্ক্ষা। আধুনিক যুগে সাহিত্য প্রচার এবং খ্যাতিলাভ করা যতটা সহজসাধ্য, প্রাচীন বা মধ্যযুগে ততটা ছিল না। তখনও পর্যন্ত মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি। ফলে স্থানান্তরে সাহিত্য প্রচারের অসুবিধা ছিল যথেষ্ট। স্বভাবতঃই রচয়িতাগণ গায়ক বা কথকের কণ্ঠ অবলম্বন করে তাঁদের সাহিত্য প্রচার করেই খ্যাতিলাভ করতেন। বিস্তৃত গদ্য সাহিত্য রচনার সুযোগ তাই তাঁরা পাননি। সঙ্গীত বা পাঁচালী বা গায়ক বা কথকঠাকুরের মাধ্যমে দেশবাসীকে শোনানো যেত, কেবলমাত্র সেটুকুর মধ্যেই তাঁদের

রচনা ছিল সীমাবদ্ধ। এই একই কারণে দেখা যায় যে আধুনিক সকল সাহিত্যেই গদ্য আবির্ভূত হয়েছে পদ্যের অনেক পরে।

আজ গদ্য আমাদের প্রায় সকল লেখার বাহন। কিন্তু এই গদ্যসাহিত্যের স্বল্পকালীন ইতিহাস বিস্ময়কর। ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে সর্বপ্রথম আমরা বাঙলা গদ্য রচনার প্রেরণা পাই। অবশ্য ইউরোপীয়ানরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই বাঙলা ভাষায় গদ্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের অবসানে 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে' প্রতিষ্ঠিত হবার পর শাসকসম্প্রদায় লক্ষ্য করলেন যে এদেশ শাসন করতে হলে দেশের ভাষার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত হতে হবে। এর পরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যখন মিশনারিগণ এদেশে এলেন তাঁরাও তখন বাঙলা ভাষা নানা উপায়ে প্রচারে সচেষ্ট হলেন। কারণ বাঙলা গদ্য ভিন্ন তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারতো না। এইভাবে বাঙলা দেশে আরম্ভ হল বাঙলা গদ্যের অনুশীলন।

ইউরোপীয়ানদের পূর্বে বাঙলা গদ্য যে একেবারে অপ্রচলিত ছিল তা বলা যায় না। অবশ্য বাঙলা গদ্যের ব্যাপক অনুশীলনের পথিকৃৎ ইউরোপীয়ানরাই। ইতিপূর্বে চিঠিপত্রে, দলিলে বাঙলা গদ্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসা, দর্শনশাস্ত্র, নাট্য ও কথকতার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু গদ্যের প্রচলন ছিল। গদ্যে লেখা কুচবিহারের মহারাজের একটি চিঠি পাওয়া যায়। বাঙলা গদ্যের এটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন। এইসব চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ভিন্ন, বাঙলা গদ্য প্রসারের জন্য পর্তুগীজ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগালের রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিগণ এদেশে আসেন। ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁরা বাঙলা গদ্য চর্চার প্রয়োজন বোধ করলেন। এ প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে 'দোম আন্তনিও' নামে এক ধর্মান্তরিত বাঙালী একখানি বাঙলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন কিন্তু এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নি। এর পর মানোএল দা আস্সুম্পসাওঁ নামে অপর এক পর্তুগীজ দু'খানি বাঙলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্তও বাঙলা হরফ প্রস্তুত হয়নি বলে, বই দু'খানি রোমান হরফে মুদ্রিত হয়।

এরপর ইউরোপীয়ানদের প্রচেষ্টায় বাঙলা গদ্যের ব্যাপক প্রচার ও চর্চা আরম্ভ হয়। পূর্বেই বলেছি শাসনকার্যের সুবিধার্থে এবং মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে গদ্যচর্চা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ গদ্য শিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা কেউ কেউ বাঙলা গদ্যে আইন গ্রন্থের অনুবাদ করলেন। হালহেড নামে কোম্পানীর এক অন্যতম কর্মচারী কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীদের বাঙলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে একখানি বাঙলা ব্যাকরণ রচনা করলেন।

গ্রন্থখানি ইংরাজি ভাষায় রচিত হয়েছিল এবং 'A Grammar of the Bengali Language' এই নামেই প্রকাশিত হয়েছিল।

বাঙলা গদ্য চর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়ান মিশনারীদের প্রচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এলারটন ও টমাস নামে দু'জন ইংরেজ বাইবেলের কিয়দংশ অনুবাদ করেন। শ্রীরামপুরে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় 'দিগ্‌দর্শন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাতে খ্রী ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙলা গদ্য চর্চা হতে থাকে। ইতিপূর্বে উইলকিনস্ নামে এক ইংরেজের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম বাঙলা ছাপার হরফ প্রস্তুত হয়। তিনি বাঙলা দেশের পঞ্চানন কর্মকারকে হরফ প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়ে দিয়ে যান। পঞ্চাননের সহযোগিতায় মিশনারিগণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানার কাজ আরম্ভ করেন। সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ বাইবেল প্রকাশ করেন উইলিয়ম কেরী। এভাবেই মিশনারীদের প্রচেষ্টায় বাঙলা গদ্যের ব্যাপক অনুশীলন আরম্ভ হয়।

॥ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ॥

কোম্পানীর কর্মচারীদের বাঙলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে বাঙলা ভাষার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন উইলিয়ম কেরী। উইলিয়ম কেরী বাঙলা পড়াতে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করলেন যে পড়াবার মত বাঙলা গদ্য পুস্তকের বিশেষ অভাব। তাই তিনি কয়েকজন দেশীয় পণ্ডিতের সহযোগিতায় পনের বছরের মধ্যে তেরখানি বাঙলা গদ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করলেন। এ গ্রন্থগুলি ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালারূপে পরিচিত। এ গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। গ্রন্থটির রচয়িতা রামরাম বসু। রামরাম বসু গ্রন্থখানি রাজা রামমোহন রায়কে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিয়েছিলেন। যদিও রচনাতে আরবী-পারসী শব্দের আধিক্য ছিল, তবু রামরাম বসুর রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য।

রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশের পরে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' প্রকাশিত হয়। বিদেশীদের দেশী কথ্যভাষার সঙ্গে পরিচিত করানোই এ পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য ছিল। ঐ একই সময়ে গোলোকনাথ শর্মা রচিত 'হিতোপদেশে'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এর ভাষা ছিল সংস্কৃত ঘেষা।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসুর দ্বিতীয় গদ্যপুস্তক 'লিপিমালা' প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন'। বত্রিশ সিংহাসনের ভাষাও সংস্কৃতানুসারী। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তারিণীচরণ মিত্রের 'ঈশপের

গল্পাবলী।' এ বইয়ের ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য হয়েছে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় চণ্ডীচরণ মুনসীর 'তোতা ইতিহাস।' এটি 'তোতা নামা' নামে এক পারসী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। চণ্ডীচরণ ও তারিণীচরণ প্রভৃতি গদ্যলেখকেরা রামরাম বসুর গদ্যাদর্শকেই অনুসরণ করেছিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দেই রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র' প্রকাশিত হয়। সারল্য ও সহজবোধ্যতার দিক থেকে রাজীবলোচন পূর্ববর্তী সকল গদ্য লেখক অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। এরপরে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হিতোপদেশের অনুবাদ এবং 'রাজাবলী' প্রকাশিত হয়। তবে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'রাজাবলীতে' চন্দ্রবংশের রাজা বিচিত্রবীর্যের কাহিনী থেকে আরম্ভ করে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্টার যুগ পর্যন্ত সংক্ষেপে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'তে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্মৃতি প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থের সারমর্ম, ব্যাখ্যা প্রভৃতি আছে। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে রামকিশোর তর্কালঙ্কারের 'হিতোপদেশে'র আর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে পূর্ববর্তী অনুবাদগুলির তুলনায় এটি খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাস মালা' প্রকাশিত হয়। কেরীর ইতিহাস মালার ভাষা পূর্ববর্তী গদ্যরচনার ভাষা অপেক্ষা বিশুদ্ধ এবং অনাড়ম্বর। এই গ্রন্থমালার সর্বশেষ গ্রন্থ 'পুরুষ পরীক্ষা' প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন হরপ্রসাদ রায়। এটি বিদ্যাপাতির একটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ।

বাঙলা গদ্য চর্চার ইতিহাসে ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজ এবং বিশেষ করে উইলিয়ম কেরীর নাম মনে রাখতে হবে। যদিও তাঁদেরই প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা বাঙলা গদ্য চর্চায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তথাপি তাঁরাই যে বাঙলা গদ্য অনুশীলনের পথিকৃৎ তাতে সন্দেহ নেই। প্রয়োজনের তাগিদে রচিত হয়েছিল বলে গ্রন্থগুলি শিল্প-সুন্দর তথা সাহিত্য গুণে গুণান্বিত হয়ে উঠতে পারে নি। তা ছাড়া গ্রন্থগুলি এত দুর্মূল্য ছিল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলি পাঠ করবার সুযোগ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা গদ্য চর্চার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত করেন রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও উইলিয়ম কেরীকে পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের স্মরণ করতে হবে।

॥ রাজা রামমোহন রায় ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। এ শতাব্দী বাঙলার নবজাগরণের যুগ। যে সব মনীষী এ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে বাঙলার

চিত্তভূমিকে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা করে তুলেছিলেন, রামমোহন রায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনিই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সমন্বয়ের আদর্শ সর্বপ্রথম অনুভব করেন এবং ভারতীয় মনের জড়ত্ব দূর করার জন্য বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। উনবিংশ শতাব্দির নবজাগরণের উদ্গাতা রাজা রামমোহন রায়কেই বলা চলে।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগরে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রামকান্ত রায়। তিনি একজন ভূম্যাধিকারী ছিলেন। রামমোহনের মাতা তারিণী দেবী একজন নিষ্ঠাবতী হিন্দু গৃহিণী ছিলেন। বিষয় বুদ্ধিতে রামমোহনকে অভিজ্ঞ করে তোলার উদ্দেশ্যে রামকান্ত রামমোহনকে আরবী-ফারসী ভাষায় শিক্ষিত করেন। আরবী-ফারসী ভাষায় রামমোহন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং তাঁর জ্ঞান-পিপাসা তখন থেকেই আরও বেড়ে যায়। এই আরবী ফারসী ভাষা শিক্ষার কালেই রামমোহন একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আরবী-ফারসী ভাষা ভিন্ন তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষাতেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর রামমোহন লক্ষ্য করলেন মাতৃভূমির দীনাবস্থা। মাতৃভূমির সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। কুসংস্কারের অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলার জন্য তিনি হলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অপরদিকে বিদেশী ধর্মপ্রচারকদের আঘাতের বিরুদ্ধে স্বধর্ম রক্ষায় অবিচলিত। রামমোহন মানুষকে ভালবাসতেন, মানুষকে মর্যাদা দিতে জানতেন। এই মানব-প্রেমই রামমোহনকে স্বাধীনতা চঞ্চল করে তুলেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রথম রামমোহনই দেখেছিলেন। অসাধারণ মনীষাদীপ্ত এবং কর্মক্ষমতাসম্পন্ন এই মহামানব বাঙালী জাতিকে আলোকতীর্থের সন্ধান দিয়ে গেছেন। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব বা চরিত্রালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের মূল্য নির্ণয় করাই আমাদের লক্ষ্য।

ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা নানাকারণে বাঙালীর ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। অতএব গদ্য অনুশীলনের ইতিহাসে এঁদের মূল্য গৌণই থেকে গেছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা গদ্যের জনক বলতে হবে রামমোহন রায়কে। প্রথম সহজবোধ্য গদ্যরীতির প্রবর্তন করে রাজা রামমোহন রায় গদ্য চর্চার পথ সুগম করে দেন। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার লেখকবর্গ ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিতান্তই প্রয়োজন এবং অর্থের তাগিদে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের গ্রন্থ কোন সার্থক গদ্যরীতির স্রষ্টা হতে পারেনি। আর রামমোহন দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ নিয়ে গদ্যচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। দেশানুরাগ যে বলিষ্ঠ রীতির

প্রবর্তক হতে পেরেছে, নিছক স্বার্থ বা প্রয়োজনের পক্ষে যে রীতির প্রবর্তন করা সম্ভব ছিল না। (তাই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা গদ্যের ব্যবহার আরম্ভ হয় রাজা রামমোহন থেকেই।)

রামমোহন ব্যবহৃত বাঙলা গদ্যে মাধুর্য বা সরসতা ছিল না; কিন্তু সরলতা, বোধগম্যতা এবং কার্যোপযোগিতা ছিল। একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি উপনিষদের কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। রামমোহনের প্রথম গ্রন্থ ছিল 'মূর্তিপূজার সমালোচনা'। এই পুস্তক প্রকাশে সনাতনপন্থী একদল রামমোহনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আরম্ভ করলেন। এর থেকেই বুঝা যায় যে, রামমোহনের উক্ত গ্রন্থ বাঙালী সমাজে কতখানি প্রচারিত হয়েছিল। উপনিষদের অনুবাদ তিনি যদি সহজবোধ্য করে তুলতে না পারতেন, তাহ'লে গোঁড়াপন্থীদের বিচলিত হবার কোন কারণ থাকত না। বহু বিদেশী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে রামমোহন বাঙলা গদ্যের একটি বলিষ্ঠ রীতি প্রবর্তনে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলেও, বাঙলাকে সকল সময় সংস্কৃত অনুসারী হলে চলবে না। বাঙলা গদ্যের রূপ কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে তাঁর একটা খুব সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর রচিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে' এর প্রমাণ মিলবে। গদ্যচর্চা ভিন্ন প্রাত্যহিক জীবনের উপযুক্ত ভাব প্রকাশের বাহন নেই। কর্ম ও চিন্তাকে রূপ দিতে গেলে গদ্য সাহিত্য অবশ্য প্রয়োজন। দেশপ্রেমিক রামমোহন এই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে উত্তরসূরীদের জন্য বাঙলা গদ্যের ধ্রুব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। রামমোহনের রচিত বাঙলা গদ্যের রূপ :

"কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে / বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শোনাতে পাপ আছে / এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয় / তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে / যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনি সূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান / তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কিনা / আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কিনা / এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কিনা।"

॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥

বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর প্রতিভার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষায় সর্বপ্রথম যথার্থ শিল্পী

ছিলেন।” বিশ্বকবির এ মন্তব্য বিদ্যাসাগর প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করেছে। কিন্তু তিনিও স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। কর্ম-যজ্ঞের আহ্বান বিদ্যাসাগরকে শিল্পসৌন্দর্যের কুঞ্জবন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তবুও শিল্পীমনের অজ্ঞাতে তাঁর রচিত গদ্যের শাখা-প্রশাখায় শিল্পের কুসুম ফুটে উঠেছে। জাতিগঠনের এবং সমাজসেবার দুরূহ ব্রত যদি ঈশ্বরচন্দ্রকে সাধন না করতে হত, তাহলে বাঙলা গদ্যসাহিত্য হয়তো এই শিল্পীর কাছ থেকে আরো অনেক রসোজ্জ্বল সম্ভার পেতে পারতো।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গ উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়োজনে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁদের রচনা বাঙলা গদ্যসাহিত্যকে আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান দিতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায়ই বাঙলা গদ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা [illegible]লেন। বাঙলা গদ্যের একটি বলিষ্ঠরীতি প্রণয়ন করে রামমোহন উত্তর-[illegible] গদ্যের তার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনাও প্রয়োজনের সংকীর্ণ সী[illegible] অতিক্রম করে শিল্পসৌন্দর্য লাভ করতে পারেনি। তিনি বাঙলা গদ্যের সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু যথার্থ শিল্পী তাকে বলা চলে না। বিদ্যাসাগরও প্রয়োজনের তাগিদেই বাঙলা গদ্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন। দেশে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে অক্লান্ত লেখনী ধারণ করেছিলেন। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত সমাজসংস্কারমূলক পুস্তক রচনা করেছিলেন। বাঙলার অনুবাদ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই কর্মবীরের বজ্র কঠিন হৃদয়ের নেপথ্য-লোকে ছি[illegible] এক শিল্পীমন। বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতেই নেপথ্যাচারী এই শিল্পীমানস তাঁর রচনার স্থানে স্থানে রঙ ও রস বুলিয়ে দিয়ে গেছে। প্রয়োজনের নীরস তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে রঙ ও রূপ, সুর ও ছন্দ, রেখা টেনে গেছে, দোলা দিয়ে গেছে। বিদ্যাসাগরের গদ্য সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর যখন বাঙলা গদ্য রচনা আরম্ভ করেন, তার পূর্বেই গদ্য উন্নত ভঙ্গিতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙলা গদ্যচর্চায় সাধকবৃন্দ রামমোহনের যুগ অতিক্রম করে গদ্যকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলেছেন। তবুও গদ্যের যে রীতি নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করলেন, তা নূতন। ইতিপূর্বের রচনায় গদ্য সহজ এবং সরল হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতে গদ্য সরস ও ছন্দোময় হয়ে উঠল। ব্যবহার উপযোগী যে গদ্যের প্রতিষ্ঠা ইতিপূর্বেই হয়েছিল, বিদ্যাসাগর তাতে সৌন্দর্য সঞ্চার করলেন। যে গদ্য ছিল কেবলমাত্র তত্ত্ব ও তথ্যের বাহন, সেই গদ্য কলা-লক্ষ্মী আরাধনার যোগ্যতা অর্জন করল। বাঙলা গদ্যের

কাষ্ঠতরণীকে বিদ্যাসাগর ময়ূরপঙ্খীতে পরিণত করলেন। বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির এই বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যাসাগরের রচিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় অর্ধ-শতাধিক। পাঠ্যপুস্তক, সমাজ-সংস্কারমূলক গ্রন্থ, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় রচনা তিনি বাঙলা গদ্যে করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম পুস্তক 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। এ গ্রন্থটি তিনি মূল সংস্কৃতগ্রন্থ অবলম্বন করে রচনা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য 'বৈতাল পচ্চিসী' নামক হিন্দী গ্রন্থাবলম্বনে তিনি এই পুস্তক-খানি রচনা করেছিলেন। প্রথম পুস্তকেই বিদ্যাসাগর তাঁর বি[illegible]রীতির সার্থক স্বাক্ষর রেখেছিলেন। বেতাল পঞ্চবিংশতির পরে যথাক্রমে ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ও 'জীবন চরিত' প্রকাশিত হয়। পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর দেশের ইতিহাসের বিশেষ অভাব অনুভব করলেন। কোন জাতি[illegible] আপন ইতিহাস না জানলে জাতীয়তাবোধে জাগ্রত হতে পারে না। [illegible] শতাব্দীর জাগৃতি পিপাসু বঙ্গমানস ইতিহাস গবেষণায় বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিল। অবশ্য বিদ্যাসাগর ইতিহাস নিয়ে কোন গবেষণা করেন নি। মার্শম্যান রচিত বাঙলার ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। বাঙলার জনসাধারণকে বাঙলাভাষার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করানোই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। 'জীবনচরিত' গ্রন্থটিতে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানতপস্বী, উদ্যমী মনীষীদের জীবনকথা আলোচনা করেছেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক। পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের জীবন আলোচনা করায় বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কূপমণ্ডুক ছিলেন না। তাঁর উদ্যমী চরিত্রের সঙ্গে তিনি হয়তো ঐ সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রমকারী পৌরুষপ্রধান চরিত্রের সাদৃশ্য উপলব্ধি করেছিলেন। জরাগ্রস্ত সমাজকে কর্মোদ্যোগী ও উদ্যমী করে তোলবার উদ্দেশ্যে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' প্রকাশিত হয়। এর পর বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারত অনুবাদ করছেন জেনে তিনি বিরত হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।' বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যালোচনা বিষয়ক গ্রন্থরূপে এই পুস্তকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক অবলম্বনে 'শকুন্তলা' কাহিনী রচনা করেন। নাটকটিকে তিনি আখ্যায়িকায় পরিণত করেছিলেন। তবু শিল্পী মনের

অনুভূতিপ্রধান স্পর্শে আখ্যায়িকাও নাটকীয় রসমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এরপর বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় তাঁর দু'খানি পুস্তক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সমাজসংস্কারের কাজে ব্রতী থাকলেও ঐ একই সময়ে কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক 'কথামালা' ও 'চরিতাবলী' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ দু'খানি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের বিশেষ খ্যাতনামা গ্রন্থ 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ রচনায় তিনি ভবভূতির 'উত্তর রাম চরিত' নাটক এবং বাল্মীকির রামায়ণের সাহচর্য নিয়েছিলেন। যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর রাম-সীতাকে রক্তমাংসের মানব-মানবী করে তুলেছেন।

এ সব পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদগ্রন্থ ও সমাজ-সংস্কারমূলক পুস্তক ভিন্ন তিনি দু'খানি মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। 'বিদ্যাসাগর চরিত' ও 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' এ দু'টি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিদ্যাসাগর চরিত' আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। কিন্তু গ্রন্থটি লেখক শেষ করেন নি। দেশের সেবার আহ্বান যাকে সকল সময়ে বিচলিত করে তুলতো সেই নিঃস্বার্থ পুরুষের নিজের কথা বলবার সময় কোথায়? আত্মজীবনী তাই আর সমাপ্ত হয়নি। বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুতে শোকাকুল বিদ্যাসাগর 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' পুস্তকখানি রচনা করেছিলেন। বজ্রকঠিন বিদ্যাসাগরের বেদনাক্ষুব্ধ হৃদয়ের যে কোমল স্পর্শ এ পুস্তকে পাওয়া গেছে, বিদ্যাসাগরের অপর কোন রচনায় এমনটি আর পাওয়া যায় নি।

প্রসন্ন-স্বচ্ছ, যুক্তিবাদী, গম্ভীর, করুণ কোমল বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি বাঙলা গদ্য সাহিত্যকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। গদ্যকে শিল্পশালার কারুকার্যখচিত কক্ষের প্রবেশপত্র দিয়েছে। উপসংহারেও রবীন্দ্রনাথের কথাই পুনরাবৃত্তি করব, "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।"

॥ অক্ষয়কুমার দত্ত ॥

বাঙলা গদ্য অনুশীলনের ইতিহাসে অক্ষয়কুমার অক্ষয় হয়ে থাকবেন। বাঙলা গদ্য সাহিত্যের সংকীর্ণ সীমানা ও ক্ষুদ্র পরিধিকে তিনি নূতন নূতন চিন্তা ও ভাবনার জগতে প্রসারিত করেছিলেন। বাঙলা গদ্য জগতের এই প্রতিভাকে আবিষ্কার করেন গদ্যরচনার আর এক সংস্কারক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অক্ষয়কুমারের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'। এর পর তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমারের প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'ভূগোল' প্রকাশিত

হয়। তাঁর প্রথম রচনাতেই নিজস্ব রীতি প্রকাশ পেয়েছে। ভাষায় পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের মত কোন জড়তা বা গ্রাম্যতা নেই। অক্ষয়কুমারের পরবর্তী রচনাসমূহে বাংলা গদ্য ক্রমশ পরিমার্জিত হতে থাকে। বাংলা গদ্যকে শ্রুতিমধুর অথচ প্রাঞ্জল করে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এবিষয়ে তিনি সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য অক্ষয়কুমার তিন খণ্ডে 'চারুপাঠ' নামে পুস্তক রচনা করেছিলেন এবং তা বহুদিন পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার 'পদার্থবিদ্যা' নামক একখানি ইংরাজী গ্রন্থও অনুবাদ করেছিলেন। 'উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে লেখক ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেছেন। 'এছাড়া অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ও উল্লেখযোগ্য। ... টি সামাজতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক। বিচিত্র এবং দুরূহ বিষয় সমূহকে অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যে সার্থক প্রকাশ করেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে অক্ষয়কুমার প্রমুখ লেখক নিছক গদ্য শিল্প রচনা করার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেন নি। ... চালনার পশ্চাতে চালিকা শক্তি রূপে কাজ করেছিল সুগভীর দেশানুরাগ। ... জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। অক্ষয়কুমারের বক্তৃতাই এর প্রমাণ :

"আমরা পরের শাসনের অধীনে রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম ... দেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমাদিগকে স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে ... নবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না ইত্যাদি।"

। প্যারীচাঁদ মিত্র ॥

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলা গদ্য এক বলিষ্ঠ রীতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালী সাধকবৃন্দের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে কৈশোর-যৌবনের পথে অগ্রসর হবার মত পথ খুঁজে পেয়েছিল। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে কৈশোর প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে এলেন। ইতিহাসের কণ্টক কঠিন পথ অতিক্রম করে বাংলা গদ্যের বয়ঃবৃদ্ধি হতে থাকল। কিন্তু অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি গদ্য লেখকবৃন্দের রচনায় শব্দের প্রাচুর্য এত বেশী ছিল যে সাধারণ লোকের কথাবার্তা থেকে সাহিত্যের ভাষার মধ্যে বিস্তর-ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বাংলা জ্ঞানচর্চা সংস্কৃতেরই মত মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা

অংকুরেই দেখা দিয়েছিল। এ সংকটকে উপলব্ধি করলেন বাঙলা গদ্য সাহিত্যের আর এক প্রতিভা—প্যারীচাঁদ মিত্র। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহযোগিতায় প্যারীচাঁদ বাঙলা গদ্যকে এক নূতন পথে চালিত করতে সচেষ্ট হলেন। বাঙলা গদ্য সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে নিয়ে আসার জন্য তাঁরা তৎপর হলেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র 'মাসিক পত্রিকা' নামে এক সাময়িক পত্র প্রকাশ করলেন। এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই পত্রিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্য লিখিত ছিল : "যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব ... রচ ...।" এ পত্রিকাতেই টেকচাঁদ ঠাকুর' (ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ) তাঁর সুবিখ্যাত ... আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশ করেন। আলালের ঘরের দুলাল ...কেই বাঙলা উপন্যাসের সূত্রপাত। এ পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এর গদ্য রচনা- ... বাঙলা ...হিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করল। চলিত ভাষার মাধ্যমেও যে উত্তম ...রবেশন করা যেতে পারে, আলালের ঘরের দুলাল তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ ...দিন ঘরোয়া জীবনের ভাষাকে সাহিত্যে রূপ দিতে গেলে ভাষাকেও ...রূপ হতে হবে। সেখানে সাধুভাষা অচল। চলিত ভাষায় ঘরোয়া জীবনের ...স্তবচিত্র এঁকে প্যারীচাঁদ বাঙলা গদ্য সাহিত্যে নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে কেরী সাহেব তাঁর 'কথোপকথনে' এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার তাঁর 'প্রবোধ চন্দ্রিকার' স্থানে স্থানে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের রচিত চলিত ভাষায় শিল্প-সৌন্দর্য ফুটে উঠতে পারেনি। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম সার্থকতা অর্জন করেছিলেন 'আলালের ঘরের দুলাল' রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁর এ রচনা-রীতি পরবর্তী কালের গদ্য সাহিত্যিকদের বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ গদ্যলেখকবৃন্দ প্যারীচাঁদের গদ্যরীতির উত্তর সাধনা করেছিলেন। কিন্তু প্যারীচাঁদ কেবলমাত্র চলিত ভাষাই ব্যবহার করেননি। তাঁর অন্যান্য পুস্তকে তিনি প্রধানভাবে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা সাধুভাষা। কিন্তু প্যারীচাঁদের সাধুভাষা পূর্ববর্তীদের ন্যায় সংস্কৃত শব্দবহুল ছিল না। আসলে প্যারীচাঁদ ভাষাকে প্রাণবন্ত ও গতিবান করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাধু-ভাষাতেও সে প্রচেষ্টার আশ্চর্য সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়। সাধুভাষায় রচনা করতে গিয়ে তিনি তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশী-বিদেশী প্রভৃতি অনেক লোক মুখে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এ কারণেই প্যারীচাঁদের সাধুভাষাও এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলালের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি তাঁর রচনার সরলতার এবং প্রাঞ্জলতার সাক্ষী দেবে :

"শারদীয় পূজার সময় উপস্থিত—বাজারে ও স্থানে স্থানে অতিশয় গোল—ঐ গোলে মতিলালের গোলে হরিবোল বাড়িতে লাগিল। স্কুলে থাকিতে গেলে ছটফটানি ধরে—একবার এদিকে দেখে একবার ওদিকে দেখে-একবার বসে-একবার ডেস্ক বাজায় এক লহমাও স্থির থাকে না। শনিবার স্কুলে আসিয়া বক্রেশ্বর বাবুকে বলিয়া কহিয়া হাপ স্কুল করিয়া বাটী যায়। পথে পানের খিলি খরিদ করিয়া দুই পাশে পায়রাওয়ালা ও ঘুড়িওয়ালার দোকান দেখিয়া যাইতেছে—অম্লান মুখ, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত নাই, ইতিমধ্যে কয়েকজন পেয়াদা দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।"

[illegible]টি স! [illegible] তত্ত্ব

॥ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ।

বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে ভূদেবের নাম অবশ্য উ[illegible]ার বাঙলা গদ্যে [illegible] লেখক তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনাকে দেশ ও সমাজসংস্কা[illegible]মুখ লে[illegible] করেছিলেন। আদর্শ নিষ্ঠা ভূদেবের লেখনীকে তাই তেমন শি[illegible] পারেনি। তবু ভূদেবের সকল রচনায় একটি বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন মনে[illegible] যায়। প্রথমতঃ ভূদেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। পরে হিন্দু[illegible] সেখানে মধুসূদন, রাজনারায়ণ প্রভৃতি তৎকালীন বাঙলার প্রতি[illegible] সতীর্থ ছিলেন। হিন্দু কলেজে ভূদেব বিপ্লবী শিক্ষক ডিরোজীওর সান্নি[illegible] তখনকার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে [illegible]চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উগ্র [illegible] ধরিয়েছিল। হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই তাই নিজের দেশকে ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণে সচেষ্ট হয়েছিল। ভূদেব এ দল থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা থেকে আধুনিকতার তথা মানবতার মন্ত্র তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কখনও নিজের দেশ এবং ধর্মকে ভুলে যান নি। বিশৃঙ্খল সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে তুলতে ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধাবলী মৃতসঞ্জীবনী সুধার মত কাজ করেছে। ভারতীয় সনাতন আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর আস্থা এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নূতন আলোক—এই দ্বিমুখী চেতনা ভূদেবের গদ্য রচনাকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে।

৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতানুসারী হয়েও ভূদেবের ভাষা ছিল সরল ও প্রাঞ্জল। শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব গ্রন্থেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। ভূদেবের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এ গ্রন্থের ভাষা ছিল বৈচিত্র্যময়। বিষয়বস্তু ও কল্পনার অভিনবত্ব ছিল এ গ্রন্থের প্রাণ। উদ্ধৃতি তুলে দেখানো যেতে পারে :

"একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন।